ভারতী ও বালক।

নববর্ষ-উপহার।*

তোমরা আরো কাছে আইস, আজ এই নববর্ষে নববৈশাখের প্রথম উষায় এই নবীন মাল্যদামগুলি তোমাদিগের গলায় পরাইয়া দি।

বৈশাখ।

কি প্রচণ্ড তীব্র রৌদ্র! রবির কিরণে
অভিতপ্ত, গতিহারা হয়েছে ধরণী;
শিখিনী পড়িয়া আছে ক্লান্তদেহমনে;
কলাপমণ্ডলে তার শুয়েছে ফণিনী!
ফণিনীরে মহাসুখে করি আবেষ্টন,
আকুল দর্দ্দুরকুল রয়েছে পড়িয়া
চন্দনে চর্চ্চিত, সূক্ষ্ম দুকূল পরিয়া,
আছে বধূ; প্রিয় তারে করে না চুম্বন!
ওই যুন্না সূর্য্যমুখী——ছাড়ি ভয় বাধা;
কেন আহা চেয়ে আছে তপনের পানে?
ক্রূর সূর্য্য বুঝিবেনা উহার মর্য্যাদা;
ওই দেখ, ওই দেখ, গেল অস্তস্থানে!
ঢাল ঢাল শিশিরাশ্রু, হে সুর সুন্দরি;
নিদাঘার্ত্ত কুসুমেরে বাঁচাও শর্ব্বরি!

জ্যৈষ্ঠ।

একি রে বিপ্লব ঘোর! দাবাগ্নি জ্বলিছে
শাল্মলীর বনে বনে; সমীর সহায়ে
হইয়ে কনক-গৌর; স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে,
বৃক্ষের কোটরে শাখে স্ফুরিছে ছুটিছে!
বিকচ অশোক-দীপ্ত অগ্নির ঝলকে,
দিশি দিশি পরিদগ্ধ ত'ল বনস্থলি;
মর্ম্মরিছে বংশপত্র; কুরঙ্গ শাবকে
পোড়াইয়া লোলজিহ্বা হাসিছে বিজলি!
হে মৃগ, পলাও শীঘ্র। অগ্নি-যাদুকর
করিছে কি ভোজবাজি? সেমন্তী-কুসুম
রাজিছে কি রক্তরাগে? উদ্গারিয়া ধূম
ওই আসে, ওই আসে, পলাও সত্বর।
ধূধূ ধূধূ একি বহ্নি! সোণার সুহার
হরকোপানলে পড়ি, হ'ল ছারখার!

আষাঢ়।

গভীর নিঃস্বনে গর্জ্জে ভীম জলধর
তিমির (শলাকা ভেদ্য) বিহরে আকাশে;
নিশাচর বেশধরি ক্রূর শনৈশ্চর
বিকট, উলঙ্গ হয়ে তাণ্ডবে উল্লাসে;

---

* কবি দেখিতেছি আমাদের কাব্য-গুলিকে সূতা করিয়া তাঁহার সুগন্ধি-ফুলে এই মালা গাঁথিয়াছেন। মালার সৌন্দর্য্য ফুলে, সূতায় নহে, সুতরাং ইহার গৌরব যাহা তাহা কবির। ভাং সং।

থেকে থেকে চমকিয়া স্ফুরিছে দামিনী!
হে কামিনি, একি একি, কোন্ অভিসারে
যাও তুমি? তুমি কি গো রাজার নন্দিনী
উষাবতী? কোথা যাও বিজন কান্তারে?
শঙ্কা কি জান না চিত্তে? চমকে চপলা!
কর্ণের কদম্ব আর বকুল খসিল।
সর্ব্বনাশ, সরে যাও, সরে যাও, বালা,
সর্ব্বনাশ, ওই, ওই অশনি পড়িল!
ভারতের সুখস্বপ্ন হ'ল অবসান;
মূর্চ্ছিত ভারতলক্ষ্মী ত্যজিল পরাণ।

শ্রাবণ।

মূর্ত্তিমতী বর্ষা তুই! রিমঝিম করি
পড়ে জল; হে কনক, হে চির দুঃখিনী,
কত মেঘ আছে তোর প্রাণের ভিতরি?
কত গরজন আছে; কত বা অশনি?
প্রকৃতির লীলা খেলা বুঝিবারে নারি!
তোর চক্ষে অবিরল বহে বারিধারা;—
ময়ূর ময়ূরী নাচে কলাপ প্রসারি;
কদম্ব ফুটিয়া উঠে পাগলের পারা!
বিধি হে গড়েছ তুমি কোনউপাদানে
অপূর্ব্ব মানব চিত্ত? শোকের কাহিনী
শুনিলে, প্রাণের তারে বাজে এক তানে
বসন্ত বাহার আর পাহাড়ি রাগিণী!
গুরু গুরু গরজন; চমকে দামিনী;
তবু ফোটে জাতি যূথি মল্লিকা কামিনী!

ভাদ্র।

ছিলে গো রজতাম্বরা কাঞ্চন বসনা;
কেন হ'লে বরিষার চঞ্চল তটিনী?
হাব ভাব লীলা রসে সতত মগনা;
বনে বনে, মনানন্দে, নাচিতে ভাবিনী!
কাঞ্চিতে শোভিত চারু মরালের শ্রেণী;
বাজিত পাখীর স্বর—মধুর কিঙ্কিণী!
রজত সলিলে সদা হাসিত নলিনী;
তুমি ছিলে কাননের মোহনীয়া বেণী
হে নীরজা, এবে তুমি ভাদ্রের চঞ্চলা
শৈবলিনী; উপাড়িছ তুটতরু দল
মুহুর্মুহু; প্রাণ নিয়া একি লীলাখেলা!
আহা আহা, গেল, গেল কনক কমল!
সমুদ্রে বাড়বা হেরি, জলদে অশনি,
চিত্রিল চতুর কবি তোমারে রঙ্গিণি!

আশ্বিন।

শারদীয় জ্যোৎস্নারাশি কবি হৈম গেহে
অধিষ্ঠিত মূর্ত্তিরূপে; কমল কেয়ুর
দুই হস্তে; হংসরব-শিঞ্জিনী নূপুর
কি মধুর!—কাশাংশুক শোভিছে সুদেহে;
নেচে উঠে থেকে থেকে নয়ন শফরী;
দুলে উঠে অবতংসে মালতী মুকুল;
মুখের শেফালিবাসে ভ্রমর আকুল;
অলকে ধান্যের শিষ দুলিছে আমরি!
নীলোৎপল সম ওই চঞ্চল নয়ন
কুসুদ কহ্লারে ভরা সরসী হেরিয়া,
রাজহংসী চলে যথা আহ্লাদে মাতিয়া,
তেমতি এ বালিকার ললিত গমন!
বহুক্ষণ চাহি চাহি, চিনিনু বালারে,
জ্যোৎস্নাময়ী শৈলবালা কবি-রত্নাগারে!

কার্ত্তিক।

শারদীয় ফুল তুই লো নব মালতি!
শেষা আশ্বিনেতে তুই কেন লো ফুটিলি?
দুরন্ত হেমন্ত এ যে—আর কিরে অলি
আছে হেথা? মহাখেদে কমলিনী সতী

গেছে চলি: তুই হেথা কেন লো আইলি?
হেথা সুধু স্বর্ণকান্তি গ্যাঁদার আদর—
সভয় শশককুল পলায় সত্বর;
শেষ আশ্বিনেতে তুই কেন লো ফুটিলি?
প্রমদা পরে না আর মালতীর মালা।
অগুরু চন্দন আর মাখেনা'ক ভালে!
তুষারে জর্জ্জর হয়ে, হে কুসুম বালা,
অনাদরে ক্ষুদ্র প্রাণ হারালি অকালে।
আমি পান্থ এসেছিনু হেরিতে কান্তার,
ঝরিছে আমারো প্রাণে কঠিন তুষার!

অগ্রহায়ণ।

কাল-শুক্রাচার্য্য আসি বর্ষ যযাতিরে
দিল শাপ; অমনি সে নবীন যুবার
সহসা জাইল ভাটা যৌবন জোয়ারে!
সহসা মধ্যাহ্ন রবি হইল আঁধার!
কেশরাশি হয়ে গেল ধবল তুষার;
আবক্ষ সে শ্মশ্রুরাজি ছিল সুশোভিত,
তুহিন-উপলে আহা হইল মণ্ডিত;
ভ্রুযুগ হইল হায় ভস্মের অঙ্গার!
হে বুড়া, আমারি মত তুমিও যে ওই,
পরেছ গ্যাঁদার মালা কুঞ্চিত গ্রীবায়;
হে বুড়া, আমারি মত ম্লান-আভাময়ী
পাণ্ডুর চন্দ্রের টীকা ধরেছ মাথায়!
এস বন্ধু, এস এস; কেঁদনা, কেঁদনা,
এ বিশ্বে তোমারি সুধু নহে এ লাঞ্ছনা।

পৌষ।

আমিও তোমারি মত যৌবনে প্রবীন;
হাত পা দুরন্ত শীতে হয়েছে অসান্;
(উঃ! কি শীত! জ্বাল জ্বাল অগ্নি খরশান্)
ঘন কুজ্ঝটিকা লেগে আঁখি মোর ক্ষীণ!
জানুতে জানুতে মোর হয় ঠকাঠকি;
(বন্ধ কর বাতায়ন; অস্থি মোর কাঁপে!)
হইতেছে শিলাবৃষ্টি!—আর্ত্ত ক্রৌঞ্চ পাখী,
কাঁদিতেছে ইক্ষুক্ষেত্রে গভীর বিলাপে।
পরিয়ে পুষ্পের মালা, টীকা দিয়া ভালে,
সাধ যায় আমরাও নবযুবা সাজি!
কই হয়? নারী চায়, আনি স্বর্ণথালে,
দি তাহারে উপহার স্ফুট পদ্মরাজি!
কোথা পাব? বুড়া মোরা; প্রাণের ভিতর
কাঙাল দোপাটি ফোটে, তুষারে জর্জ্জর!

মাঘ।

হে বর্ষ, সহসা মোর দক্ষিণ নয়ন
করিছে স্পন্দন; কেহ অনুচ্চে আমারে
কহিছে "ফিরিয়া পাবে বসন্ত-যৌবন!"
এই যে সমীর বহে মণ্ডিত তুষারে,
ইহাও বাসন্তী বার্ত্তা করিছে বহন!
ওই শোন, ওই শোন, কোকিল ঝঙ্কার!
নামিল জলে মরাল; করি গুঞ্জরণ
এল অলি; ওই শোন কোকিল ঝঙ্কার!
দে মোরে, পরায়ে দেরে, বাসন্তী উড়ানি।*
(ধন নাই, পদ নাই, গিয়াছে যৌবন;
বাকি সুধু কবিযশ!) ললাটমণ্ডন
করে দেরে; বাছি বাছি বনপুষ্প আনি!

---

* উড়ানি!—শুনিতে পাই এ শব্দটা লইয়া সৌরজগতের অনেক দুষ্টলোক আমোদ করিয়াছিল। অরুণসারথি অদ্ভুত ক্ষিপ্রহস্তে রথ চালাইয়া থাকেন; রথের ঘর্ঘর শব্দে আমরা জগতের হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ কিছুই শুনিতে পাই না।

ইতি শ্রীবালখিল্য।

আর দেরে, দেরে মোরে বাসন্তী মদিরা—
পান করে গাব গান ; ভুলিবে অমরা !

ফাল্গুন।

তুমি গো বসন্ত-লক্ষ্মী ! কর্ণে কর্ণিকার,
গলে আম্র পুষ্পমালা ; যেন রে পুষ্পিতা
নব সহকার শাখা; অপূর্ব্ব পূজার,
কবি হৃদয়ের তুমি জাগ্রত দেবতা !
প্রফুল্ল নব মল্লিকা সুনীল অলকে ;
কুঙ্কুম অরুণরাগে রঞ্জিত চরণ ;
শ্যামল পল্লবে আর অরুণ অশোকে
ঝলকে ও রূপরাশি ভানুবিগঞ্জন !
কভু তুমি অরুণাক্ত মদির অধরে
চুম্বিয়া, কিংশুকে কর হিঙ্গুল বরণ,
কভু তুমি চুপে চুপে, সোহাগ আদরে,
পরাও বনস্থলীরে পুষ্প-আভরণ !
যুগে যুগে, জন্মে জন্মে, আছহে পূজিতা,
কবি হৃদয়ের তুমি অপূর্ব্ব দেবতা !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

চৈত্র।

হে ভগিনি, হে জননি, মূরতি হইয়া,
দিও না, দিও না দেখা, এ চিত্ত-আগারে ;
"ধ্যান ধারণার বস্তু", হৃদয়ে থাকিয়া,
লও এ পবিত্র বলি হৃদয়-আধারে !
বহ, হয়ে কবিচিত্তে বসন্ত অনিল,
মন্দ মন্দ আন্দোলিয়া লতা পুষ্প পাতা ;
গাও, হয়ে কবিচিত্তে অদৃশ্য কোকিল,
মর্ম্মে মর্ম্মে দশদিশি করে আকুলিতা !
এস তুমি, ভুরু ভুরু সুগন্ধ হইয়া,
বনতুলসীর মৃদু অজানা সৌরভ ;
লতার বিরহশ্বাস সুধীরে বহিয়া,
এস, হয়ে কুসুমের মদির আসব !
তোমার সুরভিশ্বাসে হয়ে উলসিত,
প্রাণের মদিরা মোর হোক্ সুবাসিত !

সন্ন্যাসিনী।

(১)

নদীতীরে সুবিস্তৃত শ্মশান-প্রান্তে ভস্মাবশেষ চিতার সম্মুখে কে ঐ দীনবেশা, আলুলায়িত-কুন্তলা, মলিনমুখী রমণী বসিয়া? ও বুঝি সন্ন্যাসিনী ? ঐ নির্জ্জীব নিষ্প্রাণ চিতা ভস্মের মত উহার হৃদয়ও বুঝি আজ সুখ-দুঃখহীন ? আপনার মর্ম্ম শোণিতে ঐ চিতাবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া জীবন্তে বুঝি আজ ও জীবনহীনা ? হায় ! সবে মাত্র যে কচি হৃদয়, নবীন প্রেমে, নবীন আশায়, নবীন বাসনায় মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কে জানিত সূর্য্য না অস্ত যাইতেই শুষ্ক পত্রের মত এইরূপ ঝরিয়া পড়াই তাহার পরিণাম ?

যখন নলিনী ফুলের মত মুখটী লইয়া, বাল্যসখা কুমারের হাত ধরিয়া হাসিতে

হাসিতে এই নদীতীরে বসিয়া গল্প করিত, নদীর জলে ফুল ভাসাইয়া, ছোট ছোট পা দুখানি দিয়া ঢেউ গুলির সঙ্গে সঙ্গে ফুল-গুলি নাড়াইয়া দিত, নদীর জলে নামিয়া সাঁতার কাটিয়া দুজনে খেলিয়া বেড়াইত, তখন কে জানিত তাহার এই পরিণাম ?

সে দিনও যখন এই নদীতীরে বসিয়া কুমার তাহাকে তাহাদের ভবিষ্যৎ কাহিনী শুনাইতেছিলেন, কল্পনার চক্ষে উভয়ে সুখের ছবি আঁকিতেছিলেন—তখন কি নলিনী একবার স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল যে, এক দিন সে শ্মশানবাসিনী সন্ন্যাসিনীবেশে এই নদীতীরে আসিবে ?

সে দিন বসন্তের প্রভাত, নদীর চঞ্চল বুকে রবির কিরণগুলি তরঙ্গভঙ্গে খেলা করিতেছে। নদীরধারে মুকুলিত আমের গাছে একটি পাপিয়া সুর ভাঁজিতেছে, তলায় কুমার ও নলিনী বসিয়া আছে। নলিনীর মুখখানিতে আজ হাসি নাই—তাহার চোখে জল।

মিবার-সেনাপতি অজয়সিংহ এই উপত্যকা পথ দিয়া যবনসেনাপতি মহবৎ খাঁর গতিরোধ করিতে যাত্রা করিবেন, কুমার সেই অবকাশে তাঁহার সৈন্যদলে ভুক্ত হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিবেন,—এই সংবাদে নলিনী কাতর হইয়া পড়িয়াছে। একবৃন্তে দুইটি ফুলের মত তাহারা পাশাপাশি বাড়িয়াছে, কুমার গেলে নলিনী একাকী কি করিয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া নলিনীর নয়নে অশ্রুজল।

কুমার নলিনীর চোখ মুছাইয়া বলিলেন, "নলিনী কাঁদিস কেন ? আমি আবার শীঘ্রই আসিব"। নলিনী উত্তর করিল না—নীরব অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুমার আবার বলিতে লাগিলেন—"যখন শত্রু নিপাত করিয়া মহারাজের নিকট হইতে জয়মাল্য পুরস্কার আনিয়া তোর চুলে পরাইয়া দিব—তখন—" বলিতে বলিতে কুমারের মুখ উদ্দীপ্ত, চক্ষু সজল অথচ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তাঁহার আজন্মের আশা বাসনা কল্পনার সফলতা যেন তাঁহার চক্ষে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর একবার কেবল আস্তে আস্তে বলিলেন—"তখন নলিনী তখন—" ? নলিনী সজল-নেত্রে একটু হাসিল, কুমারের আর কোন কথা বলা হইল না, তাহার হাতখানি দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া আনন্দ-বিহ্বল নেত্রে মুগ্ধের মত তিনি কেবল তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কত সময় গেল—কে জানে, সহসা উপত্যকা পথে, সৈন্য কোলাহল, অশ্বপদশব্দ, বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল, কুমার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"ঐ বুঝি রাজধানী হইতে সৈন্য আসিতেছে, নলিনি, দেখিবি আয়—"

দুই জনে উঠিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

(২)

আজ পথে বড় জনতা, বড় গোলমাল। এই ক্ষুদ্র উপত্যকা-গ্রামের প্রাণে এত কলরব আর কখনও স্পর্শ করে নাই। রাজধানী হইতে সৈন্য আসিয়াছে। সুসজ্জিত

অশ্বারোহী সৈন্যগণ শ্রেণী বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহাদের বর্ষাফলকে রৌদ্র কিরণ পড়িয়া ঝকমক করিতেছে। গ্রামের সকলেই আজ ঘর ছাড়িয়া এই সৈন্য সমারোহ দেখিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নলিনীও এই নূতন মহাদৃশ্য দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে যে জন স্রোত-তাড়নে কুমার কখন যে তাহার পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন—তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সহসা বালিকার মুগ্ধ নেত্রে ভয়-বিহ্বল চকিত কটাক্ষ প্রকটিত হইল, তাহার ক্ষীণদেহ লতিকার মত কম্পিত হইয়া উঠিল, সে দেখিল—একটি বিশৃঙ্খল অশ্ব জনতা ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে দ্রুতগতিতে এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ আর দু একটি উন্মত্ত লম্ফ, আর দু একটি মুহূর্ত্ত--তাহার পর এখনি সে অশ্বপদে দলিত হইয়া যাইবে। বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পড়িতে না পড়িতে একজন অশ্বারোহী পুরুষ নিমেষের মধ্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন।

বালিকার যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, দেখিল সে তাহার পিতৃগৃহে শয়ান, নিকটে এক অপরিচিত সুন্দর যুবাপুরুষ ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া।

(৩)

কুমার একাকী বসিয়া আছেন, নদীরধারে বকুলের তলাটি ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে, নলিনী এখনো মালা গাঁথিতে আসে নাই,—কুমার একাকী বসিয়া আছেন। এখন আর নলিনী আগেকার মত প্রত্যহ এখানে খেলিতে আসে না, যদি কোন দিন আসে, তেমন করিয়া আর কুমারের সঙ্গে গল্প করেনা, ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া, আর কুমারকে আগের মত পরাইয়া দেয় না, কুমার তাহাকে ফুল পরাইয়া দিলে সে আর হাসিয়া উৎফুল্ল নয়নে তাহার দিকে তেমন করিয়া চাহে না, কুমারের সহস্র চেষ্টায় তাহার মুখে আর পূর্ব্বের সেই সরল অনুরাগের হাসি ফুটিয়া উঠে না—কিন্তু অজয়-সিংহকে দূর হইতে দেখিলে তাহার এ ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার নয়নের স্বাভাবিক জ্যোতি, অধরের অনুরাগ হাসি, আপনা হইতে আবার বিকাশিত হইয়া উঠে।

কুমার ও নলিনী ছেলেবেলা হইতে দুজনে একত্র বাড়িয়াছেন—একত্র খেলিয়াছেন, দুজনের জীবন অচ্ছেদ্য ডোরে গ্রথিত ভাবিয়াছেন। তাঁহাদের দু জনের হৃদয় দুজনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল না, কাহারো প্রেমে কাহারো অবিশ্বাস ছিল না, তবে যে এতদিন বিবাহ হয় নাই, সে কেবল কুমার ভাবিয়াছিলেন নলিনীর যোগ্য হইয়া তবে নলিনীর পিতার নিকট তাহাকে ভিক্ষা চাহিবেন; এইবার যখন তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার দিন উপস্থিত, যুদ্ধ শেষে বীরত্ব গৌরব আনিয়া নলিনীর চরণে উপহার দিয়া তাহার হাত হইতে বরমালা গ্রহণ করিবেন এইরূপ যখন আশা করিতেছেন,

তখন তাঁহার সে আশা যে স্বপ্ন বজ্র আঘাতে সহসা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগ্রত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, নলিনী আর তাঁহার নাই—নলিনী অজয়সিংহের!

কুমার একাকী বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, আর নলিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন—যুদ্ধে যাইবার আগে একবার তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা। তাহার পর—ভুলিতে পারেন, দেশে ফিরিবেন, নহিলে এই শেষ দেখা। কেনই বা ভুলিতে পারিবেন না, তাহার জীবনের একটি আশা-আলো নিভিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাই কি তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব? সমর ক্ষেত্রে যশস্বিতা লাভ করা তাঁহার আর একটি আশৈশব প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, বাল্যকালে মাতৃ ক্রোড়ে বসিয়া দুষ্ট যবনদিগের অত্যাচার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, শত্রু-শোণিতে রঞ্জিত হইয়া পিতার ন্যায় "বীর" নাম লাভ করিতে মর্ম্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিত।

নলিনীর প্রেমও তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে পারে নাই, বরঞ্চ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল; কেননা যশগৌরবই তিনি নলিনী-লাভের উপায়-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং এতদিন যশাকাঙ্ক্ষা ও প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব রাসায়নিক মিলন লাভ করিয়াছিল, সহসা অজয়সিংহ মধ্যে আসিয়া তাহাদের সে একত্ব নাশ করিয়া দিলেন, একমাত্র যশাকাঙ্ক্ষাই এখন কুমারের হৃদয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে, কেননা প্রেমাকাঙ্ক্ষা আর তাঁহার পূর্ণ হইবার নহে। নলিনী এখন অজয়কে ভালবাসে! নলিনী এখন অজয়ের বাকদত্তা,—যুদ্ধশেষে অজয়সিংহ এখানে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবেন।

কুমার একাকী বসিয়া আছেন, নদী পূর্ব্বের মতই কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে, আকাশ অপরাহ্নের সুবর্ণ আলোকে পূর্ব্বের মতই রঞ্জিত হইয়া নদীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, আর বটবৃক্ষের একটি আনত প্রকাণ্ড শাখা প্রতিদিনের মত আজও সেই সুবর্ণ স্রোতের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া বিস্তার করিয়াছে, কুমার সেই তরঙ্গিত ছায়া আলোকের দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া আছেন। অপরাহ্নের লোহিত আভা যখন মিলায় মিলায় তখন সেই কৃষ্ণবর্ণ ছায়ার উপর আর একটি ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল, কুমারের হৃদয় সশব্দে উঠিতে পড়িতে লাগিল, তিনি কিছুক্ষণ সেই ছায়ার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই বটবৃক্ষ তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন—পশ্চিমাকাশের প্রশান্ত লোহিতাভা নলিনীর অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণ মুখ মধুরভাবে উজ্জ্বল করিয়াছে, নলিনী আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে। নলিনীর অশ্রুজল কুমারের প্রাণে পূর্ব্বে কখনও সহে নাই, আজও সহিলনা, তিনি নিজের দুঃখ ভুলিয়া কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নলিনী কাঁদিতেছ কেন?"

কুমার যে নলিনীকে ভালবাসেন, একদিন যে নলিনীও তাহাকে ভাল বাসিত, তাহার অনুরাগ এখন ভিন্ন পাত্রে অর্পিত দেখিয়া কুমার যে ব্যথিত হইতে পারেন, এ সকল

তাহার কিছুই মনে আসিল না, সে কেবল আকুল-হৃদয়ে পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাস-ভরে তাহার বাল্যসখার নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিয়া কহিল "কুমার, অজয় যুদ্ধে যাইতেছেন, আর বুঝি আমাদের দেখা হইবে না!"

কুমারের মর্ম্মতল হইতে ধীরে ধীরে একটি রুদ্ধ নিশ্বাস নির্গত হইল, কুমার প্রাণপণে সংযত হইয়া সবলকণ্ঠে বলিলেন—"হইবে বই কি?"

(৪)

আর আশা নাই, অজয়সিংহ আর শত্রুর গতি রোধে অসমর্থ, পঙ্গপালের মত শত্রুসৈন্য মিবার-সৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে; হতবুদ্ধি, বিশৃঙ্খল সৈন্যগণ, কেহ দাঁড়াইয়া বর্ষার আঘাত সহ্য করিতেছে, কেহ শূন্যে তরবারি চালনা করিতেছে, কেহ সেনাপতির অনুজ্ঞা অবহেলা করিয়া পলায়নপর হইতেছে, হিন্দুসৈন্যের চারিদিকে এমনি একটা আতঙ্ক, নৈরাশ্য হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। অজয় সিংহ নিরুপায় হইয়া অগত্যা সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। যবন সৈন্যের মধ্যে সগর্ব্ব জয়ধ্বনি উঠিল। কুমার সিংহ এতক্ষণ তাঁহার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া অন্যদিকে যবন সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের পরাভব করিয়া তিনি এই সময় অজয়সিংহের সাহায্যে আসিয়া পঁহুছিলেন, সেই বিজয়ী সৈন্যের হুহুঙ্কারে অজয়সিংহের পলাতক ভীত সৈন্যগণ পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল, কুমার জয়োন্মাদে সৈন্যদল হইতে সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অনুজ্ঞা দিতে লাগিলেন, উৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া প্রবল প্রতাপে তাহারা অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। ভাগ্যস্রোত ফিরিল। যবন সেনাপতি মহবৎখাঁ পলাতক হইলেন, এবার তাহার সেনাদিগের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইল, তাহারাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল, কুমার সিংহ পলাতক মহবৎখাঁর অনুবর্ত্তী হইয়া অশ্বচালনা করিলেন। মহবৎখাঁর আহত অশ্ব কিছুদূর গিয়া ভূপতিত হইল, কুমার সিংহ নামিয়া মহবৎখাঁর নিকটে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন মহবৎখাঁ সংজ্ঞাহীন। তাঁহার অনুবর্ত্তী সৈন্য কয়েক জনের প্রতি তাহাকে উঠাইয়া লইবার ভার দিয়া তিনি তখন শিবিরাভিমুখী হইলেন; অর্দ্ধপথে এক বৃক্ষতলে অজয়সিংহকে দেখিয়া তিনি সেই দিকে অশ্ব চালিত করিলেন, বুঝিলেন, তিনি আহত হইয়া এইখানে অসহায় পড়িয়া আছেন। কুমার অশ্ব হইতে সবেমাত্র নামিয়াছেন—এখনো অজয়সিংহ ও তাঁহার মধ্যে দুই তিন হাত ভূমি ব্যবধান এই সময় দেখিলেন—দূর হইতে একজন যবনসেনা অজয়ের প্রতি বর্ষা লক্ষ্য করিতেছে—তিনি নক্ষত্রবেগে অজয়কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন—মুহূর্ত্তে বর্ষা বিদ্ধ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। পড়িতে পড়িতে নলিনীর বিদায় দিনের সেই অশ্রুমুখ তাঁহার মনে পড়িল।

(৫)

যুদ্ধ জয়ের পর অজয়সিংহ সসৈন্যে রাজধানীতে আসিয়াছেন, আহত কুমারও এখানে

আনীত হইয়াছেন, বর্ষাঘাতে তাঁহার তখনি মৃত্যু হয় নাই, তবে বাঁচিবার আশা অতি অল্প।

সংসার ভোজবাজি, অদৃষ্ট বাজিকর কি কৌশলে যে এই বাজি খেলিতেছেন তাহা বুঝা দেবতার অসাধ্য মানুষের কি কথা। কুমারের জন্যই যুদ্ধ জয় হইয়াছে, কিন্তু সেনাপতি অজয়সিংহেরই যশগৌরবে রাজধানী ধ্বনিত; ক্ষমতার প্রভাব সর্ব্বত্র, তাহার বিপক্ষে ন্যায়ও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে অক্ষম, সুতরাং কুমারের সৈন্যগণও এই প্রশংসার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে না, কি জানি তাহা শুনিলে অজয় সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাহাদের শাস্তি প্রদান করেন। প্রথম প্রথম তাহারা সত্য কথাটা বলিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু রাজধানীর লোক তাহা শুনিলে হাসে, সে কথা বিশ্বাস করে না, আর অজয়সিংহের সৈন্যগণ তাহা শুনিয়া শাসাইতে থাকে, সুতরাং তাহার পর হইতে তাহারা আপনাদের মধ্যে কানাকাণি করে, কিন্তু প্রকাশ্যে অজয়সিংহের প্রশংসা বাদে জয়ধ্বনি তুলে। কুমার শয্যাগত, ক্ষমতার রাজ্য হইতে তিনি দূরে পড়িয়া, তাঁহার পক্ষ হইয়া কে এখন সহ্য করিতে যায়!

আজ রাজধানীতে মহোৎসব, মহারাজ আজ সেনাপতিকে পুরস্কৃত করিবেন। দুর্গ প্রাঙ্গনে সভা বসিয়াছে, শত শত সৈন্য, নাগরিক, সভা বেষ্টন করিয়া উৎসুক চিত্তে দণ্ডায়মান। রাজা যখন সিংহাসন হইতে উঠিয়া হীরকখচিতশীর্ষ-তরবারি কোষ মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "সেনাপতি অজয়সিংহ, তোমার জন্যই আজ মিবার শত্রুমুক্ত, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহার যোগ্য পুরস্কার ইহা নহে, ইহা কেবল—"

রাজার কথা শেষ না হইতে দর্শক মণ্ডলির জয়ধ্বনিতে দিক বিদিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সেই জয়ধ্বনি বিলীন হইতে না হইতে একজন বৃদ্ধ সৈনিক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া উচ্চস্বরে কহিল—"মহারাণা, রাজাধিরাজ, আপনি যে কার্য্যের জন্য যাহাকে পুরস্কার দিতেছেন, তিনি তাহার যথার্থ অধিকারী নহেন। অজয়সিংহ যুদ্ধ জয় করেন নাই, অজয়সিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যখন সন্ধিস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন প্রভু কুমারসিংহ নিজ বাহুবলে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন।"

চারিদিক বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, অজয়সিংহের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মহারাজ অজ্ঞাতভাবে যেন অসি কোষ বদ্ধ করিয়া অজয়সিংহকে বলিলেন—"সেনাপতি, ইহার মধ্যে কিছু কি সত্য আছে?"

অজয়সিংহের রক্তবর্ণ মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া পড়িল, ক্ষত্রিয় হইয়া মিথ্যা বাক্য তাঁহার মুখ হইতে কিরূপে নির্গত হইবে? কিন্তু যে যশ, যে গৌরব তাঁহার বলিয়া ভোগ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এতক্ষণ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যের ধন বলিয়া মনে হয় নাই, হঠাৎ কি করিয়া তাহা চোরের ন্যায় ত্যাগ করিবেন? অজয়সিংহ কিংকর্ত্তব্য

বিমূঢ় হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, যিনি আমাকে অপরাধী করিতেছেন—তিনি দোষের প্রমাণ করুন, নিজের পক্ষে নিজে বলিলে তাহা প্রামাণ্য হইবে না"—

অজয়সিংহের এই মহত্ত্বের পরিচয়ে সভাসদ সকলে সাধুবাদ করিল, মহারাজ বক্তা-সৈনিককে বলিলেন—"সৈনিক, তোমার প্রভু যে যুদ্ধ জয় করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ কি ?"

রণসিং সত্যের বল কণ্ঠে ধারণ করিয়া বলিল—"প্রমাণ আমার কথা, আমি ক্ষত্রিয়"।

মহারাজ। সত্য, কিন্তু অজয়সিংহও ক্ষত্রিয়, তোমার কথা সত্য হইলে তিনি চোর হইয়া পড়েন।"

রণসিং তাহার ক্রোধ দমন করিতে পারিল না, বলিল—"অজয় সিংহ চোর হইতেও অধম, কুমারসিংহ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

মহারাজ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—সৈনিক, চুপকর; ইহা রাজসভা, গালাগালি দিবার স্থল নহে, প্রমাণ যদি কিছু দিবার থাকে বল, নহিলে চলিয়া যাও—"

রণসিং বলিল—"প্রমাণ কুমার সিংহের দুই সহস্র সৈনিক।

মহারাজ। দুই সহস্রের আবশ্যক নাই, দুইজনকে ডাক।

রণসিংহ সেনা দুই জনকে ডাকিতে যাইতেছে, রাজা বলিলেন, "তোমায় ডাকিতে হইবে না, প্রহরি, তুমি ডাক",

প্রহরী জন-মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উচ্চস্বরে কহিল—"কুমারসিংহের সৈন্যগণ কোথায় ? তাহাদের মধ্যে দুই জন এদিকে এস, সাক্ষী দিতে হইবে"—কুমারসিংহের সৈন্যগণের ত্রাস উপস্থিত হইল, বুঝিবা অজয়সিংহের বিরুদ্ধে তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিচার হইবে,—প্রথমে সাক্ষ্য, তাহার পর প্রাণ-দণ্ড। প্রহরীর ডাকে কেহ কোন উত্তর করিল না, আবার প্রহরী ডাকিল, "কুমার সিংহের সৈন্য দুই জনকে মহারাজ ডাকিতেছেন, অগ্রসর হও" চৌদিক নিস্তব্ধ, কেহ এক পদ অগ্রসর হইলনা। প্রহরী ফিরিয়া গিয়া কহিল, কুমারসিংহের কোন সেনা সম্ভবতঃ এখানে নাই, ডাকিয়া কোনই উত্তর পাওয়া গেল না।" রণসিংহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। মহারাজ বলিলেন, সৈনিক, "তোমার অন্য কোন প্রমাণ আছে ?"

সৈনিক বলিল—"প্রভু কুমারসিংহ স্বয়ং ইহার প্রমাণ, তাঁহার সাক্ষী লওয়া হউক।"

অজয়সিংহ বলিলেন—"কিন্তু তিনি এখন শয্যাগত এখানে তাঁহাকে আনিলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে"

সৈনিক বলিল—"ক্ষত্রিয়ের জীবন অপেক্ষা তাহার নাম, বীরত্বযশ অধিক মূল্যবান, তাঁহার নাম রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আনা হউক—"

মহারাজ বলিলেন—"আচ্ছা তাঁহাকে শিবিকা করিয়া এখানে আনয়ন কর"—

রণজিৎসিংহ দুই জন প্রহরী সঙ্গে কুমারকে আনিতে গমন করিল। প্রহরী দুইজনকে একখানি মুক্ত শিবিকা আনয়নের ভার দিয়া রণসিং যখন কুমারসিংহের কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন কুমার বলিলেন—"রণসিং তুমি কোথায় গিয়াছিলে, আমি সেই অবধি তোমাকে ডাকিতেছি কাহারো সাড়ানাই" রণসিংহ বিষণ্ণ মুখে বলিল—"প্রভু, শুনিলাম আজ অজয়সিংহ রাজ হস্ত হইতে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার পাইতেছেন, যিনি যথার্থ বিজয়ী তিনি শয্যাগত তাঁহার নাম কাহারো মুখে নাই, আর অজয়সিংহ ভীরু পাষণ্ড আজ মিথ্যা করিয়া গৌরব লাভ করিতেছে। তাহা শুনিয়া সহ্য হইল না, আপনাকে একাকী রাখিয়াও তাই রাজসভায় সত্য প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম"।

কুমারসিংহ বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, কুমারের যশ অজয়সিংহ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতেছিল!

রণসিং বলিল—"প্রভু, আমার কথা মহারাজ বিশ্বাস করিলেন না, আপনাকে সাক্ষী দিতে যাইতে হইবে,"

ক্রোধে কুমারসিংহের সর্ব্বাঙ্গ তখন কম্পমান! তাঁহার নলিনী লইয়াই অজয়সিংহ ক্ষান্ত নহেন, নিজের ক্ষমতা নিজের পরিশ্রমে তিনি যে যশ যে নাম লাভ করিয়াছেন, চোরের মত তাহা হইতেও তিনি তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত। মনের অতিরিক্ত আবেগে তিনি শয্যায় সবলে উঠিয়া বসিলেন, বক্ষের আহত স্থান রক্ত প্লাবিত হইয়া উঠিল, আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন "রণসিং শিবিকা এখনি আন, আমি সভায় যাইব"।

রণসিংহের চক্ষে জল আসিল, সে বলিল—"দেব, শিবিকা আনিতে পাঠাইয়াছি।" কিছু পরে কুমারকে বহন করিয়া একখানি মুক্ত শিবিকা রাজ সভায় আসিয়া পৌঁছিল। কুমারের সেই ক্ষীণ অথচ উদার বীরমূর্ত্তির প্রতি সকলের চক্ষু পড়িল, কুমার কেবল অজয়সিংহের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

কুমারের শিবিকা মহারাজের অতি নিকটে আনীত হইলে, মহারাজ বলিলেন,—"কুমারসিংহ, তুমি মৃত্যু শয্যায় শয়ান, তুমি যেখানে যাইতেছ সেখানে পৃথিবীর মান যশ, তোমার সঙ্গে যাইবে না, সত্য মাত্র তোমার এখন সাথের সাথী, এই বুঝিয়া তুমি বল কি সত্য ? অজয়সিংহ বিজয়ী না—তুমি!

কুমারসিংহ উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একবার অজয়ের শুষ্ক মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল "একবার ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন এইবার প্রতিশোধ দিবেন ? কিন্তু প্রতিশোধ! ইহা কাহার প্রতি প্রতিশোধ হইবে ? অজয়ের প্রতি না নলিনীর ? অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিলে কাহার জীবনের সুখনষ্ট

হইবে? নলিনীর পিতা একথা শুনিবার পর যদি অজয়কে জামাতা না করেন ত কাহার হৃদয় চির নৈরাশ্যে দগ্ধ হইবে? কিম্বা বিবাহ হইবার পর নলিনী কখনও যদি অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিতে পায়, যদি জানিতে পারে সে প্রতারক চোর, তাহা হইলেও তাহার কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। বিদায় দিনের নলিনীর সেই অশ্রুপূর্ণ বিষণ্ণ মুখ কুমারের মনে আবার জাগিয়া উঠিল, কুমারের আর সত্য বলা হইল না, তিনি বলিলেন "মহারাজ আমাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, প্রলোভন সম্বরণ করা মানুষের দুঃসাধ্য।"

মহারাজ বলিলেন—"এই মৃত্যু শয্যাতে শুইয়াও!"

কুমার। হাঁ।

মহারাজ। তবে আর তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অজয়সিংহকে পুরস্কার প্রদান করা হউক!"

কুমার। হউক।

মহারাজ তখন উচ্চস্বরে বলিলেন—"অজয়সিংহ বিজয়ী, আর কোন কথা নাই।" চারিদিকে অজয়সিংহের নামে জয়ধ্বনি উঠিল, কুমার হৃদয়ের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া মৌন হইয়া তাহা শুনিলেন, তাঁহার বীরত্ব গৌরব অন্যের নামে ধ্বনিত হইল, তাঁহার প্রাণের বিফলআকাঙ্ক্ষা প্রাণকে অলোড়িত করিয়া তুলিল!" তিনি রণজিৎকে কহিলেন "শীঘ্র আমাকে এখান হইতে লইয়া চল"—বাহক শিবিকা তুলিল, রণসিংহ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার অনুগামী হইল, তিনি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় মনে মনে নলিনীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অজয়সিংহের কটীদেশে উপহার তরবারী বাঁধিয়া কহিলেন—"অজয়সিংহ তুমি যে মহাকার্য্য সাধিত করিয়াছ—সামান্য ধনরত্ন তাহার যোগ্য পুরস্কার নহে, আমার গৃহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসামান্য রত্ন যাহার জ্যোতিতে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোকিত তাহা তোমাকে অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিব।"

সেইদিনই রাজকন্যা মায়াবতীর সহিত অজয়সিংহের বিবাহ হইয়া গেল।

(৬)

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, অজয়সিংহ মহাবিজয় লাভ করিয়াছেন, একথা নগরে গ্রামে রাষ্ট্র, তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া নলিনীর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, গর্ব্ব-বিস্ফারিত উৎসুক হৃদয়ে সে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে চলিল, তাঁহার আসিবার কোন চিহ্ন নাই, তাঁহার পত্রাদিও অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; নলিনীর ফুল্লমুখ দিন দিন শুকাইয়া আসিতে লাগিল—তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের আশা দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল। যে উপত্যকা ভূমিতে প্রথমে সে অজয়কে দেখিয়াছিল, প্রতিদিন সে সেইখানে একটি নিভৃত বৃক্ষ

তলে গিয়া বসে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দূরোত্থিত অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠে, অবশেষে সন্ধ্যাকালে হতাশ ক্লান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসে। একদিন তাহার অনুমান সত্য হইল, তাহার অনুমিত অশ্বপদ ধ্বনি শূন্যে বিলান না হইয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, নলিনীর আনন্দপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অবশেষে একটি ক্ষুদ্রসমারোহ প্রতিভাত হইল। দেখিল বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈনিক একখানি সুসাজ্জত শিবিকার অগ্র পশ্চাতে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া আসিতেছে। শিবিকা যে বরবেশী অজয়সিংহকেই বহন করিয়া আনিতেছে তাহাতে বালিকার আর সন্দেহ রহিল না।

শিবিকা একটি বৃক্ষতলে নামিল, বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, বর শিবিকা হইতে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আর বিলম্ব সহিল না, সে দ্রুত গতিতে কম্পবান হৃদয়ে শিবিকার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল শিবিকার অর্দ্ধরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া রণসিংহ ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেছে। রণসিংহ কুমারের ভৃত্য, তাহাকে বালিকা চিনিত। কুমারের ভৃত্য অজয়সিংহের ভৃত্য হইয়া কেন আসিয়াছে ইহা তাহার তখন মনেই হইল না। মনের আগ্রহে সে শিবিকার অন্য পার্শ্বে গিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর সমস্ত মস্তক তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শিবিকাশায়ীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিল শিবিকার মধ্যে অজয় নহেন, কুমার শুইয়া আছেন, তাঁহার মুখে মৃত্যুর প্রশান্তি বিরাজ করিতেছে।

... .

নলিনী সব শুনিয়াছে, রণসিংহ তাহাকে কুমারের আমৃত্যু বিবরণ, অজয়সিংহের শঠতা সমস্ত খুলিয়া বলিয়াছে, নলিনী এখন সন্ন্যাসিনী। শ্মশান তাহার বাসস্থান কুমারের চিতাভস্ম তাহার একমাত্র উপভোগ্য-দর্শনীয় বস্তু।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বোল্‌তা ও মধ্যাহ্ন।

আমি সন্ধ্যারও নহি, উষারও নহি, আমি মধ্যাহ্নের জীব। বৈশাখের প্রখর রবিকিরণে আমার জন্ম—জন্মাবধি রবিকিরণ পান করিয়া এ দেহ গঠিত। সারা হিমরজনী অন্ধ জীবনভার বহন করিয়া চাকের মধ্যে জড় হইয়া থাকি, ভীতি-বিহ্বল বিবশ দেহে ক্ষীণ প্রাণ কোনোপ্রকারে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রভাতে রবিকিরণ আসিয়া প্রথম আমাকে জাগাইয়া তুলে—আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, নয়নে দৃষ্টি দেয়। আমি মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে জন্মিয়াছি, তাই রবিকরে আমার এত আনন্দ।

রবিরই মত আমার কনক-বর্ণ, মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য্য তীব্র। সন্ধ্যা ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে, উষা ছায়ার হৃদয়ে একটুক্ মৃদু তরুণ অরুণ-আভা, মধ্যাহ্নের মত এত আলো কোথায়? এত রূপ কাহার? মধ্যাহ্ন আর আমি। দুই জনেই কেবল মাত্র আলোক, কেবল মাত্র ঔজ্জ্বল্য, ছায়া নাই, অন্ধকার নাই, ম্লান পাণ্ডু-মধুরতা নাই। এ রূপ কেবলি তপ্ত তীব্র দহন-জ্যোতি। তাই ত তোমাদের কবিরা মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য কদাচ গাহেন, বোল্‌তার সৌন্দর্য্যও গাহেন না। এ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদের হৃদয় জ্বলিয়া যায়, এ রূপ মর্ম্মে মর্ম্মে তীক্ষ্ণাগ্র সূচির মত বিঁধিতে থাকে, দারুণ দহনে কবিতা উথলে না। সন্ধ্যা উষা তরল কোমল ভাবে হৃদয় প্লাবিত করে, প্রখর জ্বলন নাই, তরঙ্গভঙ্গে মধুর ছন্দে কবি-হৃদয় সে সৌন্দর্য্যে বহিয়া যায়। মধুকাতরহৃদয়ে মৃদুগুঞ্জনে পদ্মিনীর সহিত ভ্রমর মধুরালাপ করে, কবিহৃদয় মধুকাহিনীমুগ্ধ। কিন্তু মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্যও ন্যূন নহে, ভ্রমরও সৌন্দর্য্যে বোল্‌তার নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। সৌন্দর্য্যই ত প্রখর। আলোক ঝলসিবে না ত কি অন্ধকার ঝলসিবে?

আমি মধ্যাহ্নের—তা' কাব্যে স্থান পাই বা না পাই। মধ্যাহ্নকে আমি আপনার অন্তরে অনুভব করি—এমনি আমার মত হৃদয়, এমনি নীরব নৈরাশ্য, নিশিদিন অন্তরে অন্তরে এমনি দারুণ দহন। এই চাকে বসিয়া দেখিতেছি, আমার চাকের সম্মুখে বহুদূরবিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্তদেশ ব্যাপিয়া অনল-মধ্যাহ্ন বহিয়া গিয়াছে—কম্পিত তীব্র লাবণ্যে ধরণী দিশাহারা। এই ত সৌন্দর্য্য। এমন প্রখর তেজ! এমন সুতীব্র স্নেহ! যেখানে দিয়া বহিয়া যায় সব শুকাইয়া, যেখানে হৃদয় খুলে হৃদয় জ্বালাইয়া। জ্বালা নহিলে ত সৌন্দর্য্য মৃদু। আমারও সৌন্দর্য্য তাই এমনি জ্বালাময়—যেখানে বিঁধে তীব্র মদিরার মত প্রতি শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া। তোমরা ত এ জ্বালা সহিতে পার না, সৌন্দর্য্য কিরূপে অনুভব করিবে? আমি হুল বিঁধাইয়া আপন অন্তরে মধ্যাহ্নের তীব্রতা উপভোগ করিতেছি। এক একবার ইচ্ছা হয়, ঐ কবি-হৃদয়ে এই হুল ফুটাইয়া সে তীব্রতা বিঁধিয়া দিই। কিন্তু তোমাদের কবি কি এ সৌন্দর্য্য সহিতে পারিবেন?

তোমাদের কাব্যে ত কোথাও দারুণ তীব্রতা অনুভব করা যায় না। কেবলই ঢল ঢল কোমলতা, শিথিল মৃদু আলস, মধুর প্রেমে অর্দ্ধ নিমীলন। এত মধুরতার মধ্যে তোমরা নিমগ্ন হইয়া থাক কিরূপে? আমি কেমন মধ্যাহ্নের প্রখর হৃদয়ে জ্বালাবিদ্ধ জীবন লইয়া চিরদিন এই রবিকিরণের জ্বলন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি। মধ্যাহ্নে আমাকে জানে, আমি মধ্যাহ্নকে জানি। সন্ধ্যার মত এ কেবলি প্রশান্ত মধুরতা নহে। তাই ত এত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াও একেবারে গলিয়া যাই না, আশ মিটে না। সন্ধ্যায় দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে, হৃদয় অবসন্ন, একরত্তি জীবনের পরে বৃহৎ সংসার যেন ঝুঁকিয়া পড়ে, সৌন্দর্য্য তখন কোথায়? অন্ধকার ঘনাইয়া

ত সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করে না। তোমাদের কবিরা বোধ করি আধ ঘুমঘোরে স্বপ্নে সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন। মধুরতা বৈ তাহা আর কিছুই নয়। মধ্যাহ্ন সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র। পূর্ণালোকে স্বপ্ন রচিত হয় না, কোমলতাও তাদৃশ নাই। কোনও কোনও কবি মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া। এই জন্য মধ্যাহ্নের তরল আলস-ভাবেই তাঁহারা মুগ্ধ! কিন্তু এ মৃদুতায় আমার মন উঠে না। আমার মত এমনি হুল বিঁধিয়া সে তীব্রতায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মধ্যাহ্নকে একবার অন্তরে অনুভব না করিলে সকলই ব্যর্থ। তোমরা তীব্র প্রখর জ্বালা উপভোগ করিতে পার না, হুল নাই, মধুরতায় গলিয়া যাও। আমি চিরদিন এই প্রখর জ্বালায় জ্বলিতে থাকি।

এই জ্বালায় মধ্যাহ্নের প্রেম ব্যক্ত হয়। মধ্যাহ্নের প্রেম মর্ম্মবেধী—আমারই মত বিঁধিয়া বিঁধিয়া। বেধন প্রেমের ধর্ম্ম—জ্বালা প্রেমে অনিবার্য্য। তোমরা এত করুণ-হৃদয়, প্রিয়জনের অন্তরে ব্যথা দিয়া সুখ অনুভব কর না? প্রিয়জনকে ভিন্ন পৃথিবীতে কে কাহাকে ব্যথা দিয়া থাকে? এই জন্যই এ দারুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে এমন একটু সুতীব্র কোমলতা, এ কঠোর জ্বালায় এমন করুণ আনন্দ। প্রেম জ্বালাইয়া জ্বলে এবং এই জ্বলনেই তাহার জীবন। মধ্যাহ্ন মধুর ধার ধারে না, কোমলতায় হৃদয় হরণ করে না, অন্তরের অন্তরতম নিভৃতে দারুণ জ্বালা বিদ্ধ করিয়া কেবলি দহিতে থাকে। গুঞ্জনে এবং মধুরতায় যে যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহে আমি ত তাহার প্রেম বুঝি না। তাই প্রেমে মধ্যাহ্ন আর আমি। মধুরতায় সন্ধ্যা আছে, উষা আছে, ভ্রমরও আছে বৈকি।

ইহাদের প্রেমে কি জ্বালা নাই? কিন্তু সে জ্বালা বড়ই মধুর। এত মধুর যে তাহাতে প্রেম জ্বলে না। সন্ধ্যার প্রেমে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব, উষার ত জ্বালা নাই বলিলেই চলে, আর ভ্রমরের মধুতেই পরিতৃপ্তি। ভালবাসিয়া আশ মিটে না শুধু আমার আর মধ্যাহ্নের। যতই বিঁধি ততই বিঁধিতে চাহি—যতই জ্বলি ততই আরও জ্বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ ভালবাসা ত কেহ অনুভব করে না। মধুবিহ্বল মদির-মোহই এখানে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। প্রেম যেন নিতান্তই ছায়ায় ছায়ায়, একটুক্ আলোক সহে না, উত্তাপ সহে না, কেবলি অতি মৃদু ললিত গলিত কোমলতা—কৃষ্ণ অন্ধকার এবং ছায়ালীন অনাতপ মাত্র অবলম্বন।

কৈ আলোকে ত তোমাদের প্রেম ফুটে না। বিধাতা, কালোর প্রতি তুমি বুঝি কিছু সদয়। তাই এই মর্ত্ত্য মানবেরাও দেখি সারাক্ষণ কোকিল ভ্রমর আর সন্ধ্যা লইয়াই রহিয়াছে। ঐ কৃষ্ণবর্ণের সহিত কোমলতা যেন অবিচ্ছেদ্য। কেবল, গৌরাঙ্গে যে তোমাদের প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া বুঝিতে পারি না। আর এই পূর্ণিমা নিশীথে বিমল জ্যোৎস্নালোকে এত প্রেমের গানই বা উঠে কোথা হইতে? এ কি

বিদ্রূপ! না ছলনা! জানি না, জ্যোৎস্নালোক অস্পষ্ট এবং ছায়াময় বলিয়া যদি তাহার মধ্যে প্রেমের রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমার নিকট প্রেমে তীব্রতার মত আর দারুণ রহস্য নাই।

এই জন্যই মধ্যাহ্নের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়। দিগন্ত হইতে দিগন্ত তপ্ত স্বর্ণপ্লাবন! যেমন তীব্রতা তেমনি প্রেম! প্রেম নহিলে এত সৌন্দর্য্য টিঁকিয়া রহিবে কিসে? কিন্তু কাব্যে ত এ সৌন্দর্য্য তেমন স্থান পায় না। নাইবা পাইল। আমি তোমাদের অন্তরে এই সৌন্দর্য্য চিরদিনের তরে বিঁধিয়া দিতে চাহি। বিধিহে, কবিকে যদি আমার মত এমনি হুল দিতে। মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য হুল বিঁধিয়া অনুভব করিবার—জ্বলিতে হইবে কিনা। মধুরতাই যদি চাও ইহাতে কি নাই? প্রখর যৌবনে কি আর কোমলতা অনুভব করা যায় না? কিন্তু তাহা এই তীব্রতার মধ্যেই। হুল ফুটাইয়া যে এই তপ্ত তীব্রতা না অনুভব করিল, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য তাহার নিকটে অসম্পূর্ণ। তবু ছায়ায় দাঁড়াইয়াও হে কবি, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য তুমি যে গাহিয়াছ, ইহাতেই তোমার কাব্যরস পানে আনন্দ পাই। তাই আরও ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ উদার হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া দিই—তুমি আমাকে অনুভব কর, আমি তোমাকে অনুভব করি।

অতৃপ্ত হৃদয়ে কবিকে অনেক কথা বলি—কবিকে নহিলে আর কাহাকে বলিব?—কিন্তু সহসা একএকবার মনে হয় যে, তোমাদের কবিও যেন কোথায় কবে মধ্যাহ্নের তীব্রতা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু অনুভব করিলে কি হইবে,—সে কেবল ক্ষণিকের চকিত-অনুভব—আমার মত এমন নীরবে সে অনলজ্বালা সহিতে পারেন নাই, জ্বালা ধরিতে না ধরিতে ছায়ায় গিয়া হৃদয় জুড়াইয়াছেন। তাই প্রখর মধ্যাহ্নে মালিনী নদী তীরে কম্পিত তরুতলে শকুন্তলা। শকুন্তলা ছায়া। বৃক্ষান্তরাল হইতে মুগ্ধ দুষ্মন্ত উঁকি মারিতেছেন। দুষ্মন্ত প্রখরতেজ মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ছায়ার প্রেমে মুগ্ধ। কবি-হৃদয়ও ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। দুষ্মন্তের প্রখর জ্যোতি কবি নীরবে সহিতে পারেন না। শকুন্তলায় তাঁহার হৃদয় শান্তি পায়। এই শকুন্তলার হৃদয়ে বসিয়াই তিনি দুষ্মন্তের সৌন্দর্য্য পান করিতেছেন। শকুন্তলা হইতে দূরে পরিপূর্ণ-হৃদয়ে দুষ্মন্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে কে? তবু জগতের প্রাচীন কবি তুমি মধ্যাহ্নকে অনুভব করিয়াছ। শকুন্তলার হৃদয়ে দুষ্মন্তের প্রেম বিঁধিয়া অবধি শকুন্তলা জ্বলিয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রেম না জ্বলিয়া ত অনুভব করিবার যো নাই। মধ্যাহ্ন ত চিরদিন জ্বলিয়া সারা।

কিন্তু এই সুন্দর মধ্যাহ্ন-তীব্রতায় একটা কাল ভ্রমর আসিয়া দেখা দিল কেন? কবি, তুমি ঐ কাল রূপে বড়ই মুগ্ধ। ভ্রমরকে ছায়ায় রাখিয়া তবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছ বটে—সে ত আর প্রখর মধ্যাহ্ন সহিতে পারিবে না। কিন্তু যে ছায়া মধ্যাহ্নকে চায়, ভ্রমরের গুঞ্জন তাহার ভাল লাগিবে কেন? শকুন্তলা ঐ বাচাল ভ্রমরটার প্রতি

বড়ই বিরক্ত—বারবার সখীদিগকে উহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিতেছেন। ভ্রমরের ভাগ্যে অঞ্চলতাড়না! শুধু আমার কপালে নয়? হোক্ হোক্, মানব-সমাজে বিচার আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুনিতে পাই, শকুন্তলাও নাকি মনে মনে ভ্রমরের উপর সদয়। তাইত মিলন না হইতে হইতে শকুন্তলার কপালে দারুণ বিচ্ছেদ। ভ্রমর মধু-গুঞ্জনে যত বিঘ্ন ঘটায় বৈ ত নয়। কবি, আমাকে ত ডাকিবে না। ভ্রমর তোমার প্রিয় পাত্র। কিন্তু আমার হুল বিঁধিলে তোমার হৃদয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইটুকু সহিতে এত কাতর? আমি যে তোমার হৃদয়ে চিরদিন মধ্যাহ্নকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারি। আমার মত তুমিও এমনি জ্বলিবে—এ জ্বলনের অবসান নাই—চিরদিন মগ্ন হইয়া সৌন্দর্য্য অনুভব কর।

যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবে তখন না হয় ভ্রমরকে ডাকিও। তাহার গুঞ্জনে ঘুমঘোরে সন্ধ্যা আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে। ঐ কাল রূপ দিয়া ত মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবে না। ভ্রমর গুণ্‌গুণ্ করিয়া তোমাদেরই মত সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য গাহে ও বটে। গাহিবে না কেন? সন্ধ্যারই মত অন্ধকার রূপ কিনা। আমার ত তাহা নয়। মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য্য তীব্র, প্রেম তীব্র, হুল তীব্র। বিধাতা ভ্রমরকে বৃথা হুল দিয়াছ। হুলই যদি দিলে তবে অমন কাল রূপ করিলে কেন? কাল রূপে বড়ই যেন কেমন সুখের ভাব; হুলে এত সুখ সহে না। আর ভ্রমর সৌন্দর্য্যেরই বা কি ধার ধারে? বিস্তৃতি সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অন্ধকার ত কেবলই গুটাইয়া আসে। কিন্তু এখানে বোধ করি লোকে অন্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য দেখে। তাই অন্ধকারের প্রভাবে আমি আর মধ্যাহ্ন বাদ পড়িয়া যাই। তা' হোক্। এ সৌন্দর্য্য ত আর অস্বীকার করিবার যো নাই। কাব্যে স্থান দিয়া সূর্য্যের গৌরব কেহ বৃদ্ধি করিতে পারে? না চোখ বুজিয়া সে সৌন্দর্য্য হ্রাস করা যায়?

তোমাদের কাব্যে আমার হুলের জ্বালা না বিঁধিলে আর মধ্যাহ্নকে সুতীব্ররূপে উপভোগ করিতে পারিতেছ না! এখন দূর হইতে কেবল রাখালবালকের বংশীধ্বনির উদাস কোমলতায় তোমরা মুগ্ধ। বোধ করি, যাহা কিছু বিঁধে তাহাই তোমাদের নিকট কোমল—কেবল আমার এই দারুণ হুলই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বংশীধ্বনিতে তীব্রতা কতকটা যেন কমিয়া আসে বটে। রাখালেরা ছায়ায় বসিয়া বাজায় কিনা, তোমরাও ছায়ায় বসিয়া শুন। আর তাহারা ছায়ার প্রেম যেমন অনুভব করে মধ্যাহ্নের দারুণ ভালবাসা ত তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবু কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাইতেন, রাধিকার হৃদয় কি জ্বলিত না? মধ্যাহ্ন-বংশীধ্বনিতে তীব্রতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে উদাস নৈরাশ্য ফুঁ দিয়া কোমলতা বাহির করে। এই জন্য এ কোমলতা ঔদাস্যে, মধুরতায় নহে।

মধুরতা যেমন সন্ধ্যায়! ম্লানমুখে রবি ধীরে অস্ত যায়, চন্দ্র উঠে—তাহাও মধুর।

আলোক কোথাও ফুটিতে পায় না। নীল আকাশ, অস্ফুট ছায়া, প্রশান্ত নীরবতা মিলিয়া কেবলি বিমল মাধুরী রচনা করে। মাধুরী গার্হস্থ্যে। তাই সন্ধ্যার কেমন সুকুমার গৃহস্থ ভাব। ইহার মধ্যে আমরা যেটুকু ঔদাস্য অনুভব করি তাহা শান্তিপ্রধান। কিন্তু এত মধুরতা আমার পোষায় না। মধ্যাহ্নে আমি যেন ছুটিয়া জগতের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ি; সন্ধ্যায় জগৎ নিতান্ত মধু-ভাবে হৃদয় প্লাবিত করে। আমি জ্বলিতে চাহি—মধু লইয়া কি করিব? জ্বালা নহিলে সৌন্দর্য্য আমার নিকট ব্যর্থ।

আর সন্ধ্যাকে ত তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। স্বল্পালোকে সুস্পষ্ট দেখা যায় না। তাই আজও কেহ সন্ধ্যার রঙ্‌ ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। তোমাদের কাব্যে তাম্রবর্ণের কথাও শুনি, ধূসর বর্ণের উল্লেখও দেখি, কেহ কেহ সন্ধ্যাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া সারিতে পারিলেও ছাড়েন না। বোধ করি, দূর হইতে যাহার যেরূপ বোধ হইয়াছে আন্দাজে বর্ণনা করিয়া সারিয়াছ। এখন তাই কোনও বর্ণনা অপর বর্ণনার সহিত ঠিক মিল খাইতেছে না। আমি ত স্বল্পালোকে তেমন দেখিতে পাই না, তবে অন্তরে তাহার প্রভাব কতকটা অনুভব করি বটে। আর ঐ আকাশের গায়ে রবির রাঙ্গা আলোটুকু যত ক্ষণ থাকে ততক্ষণ একরূপ দেখিও। কিন্তু এত অল্প দেখিয়া কি কাব্যে বর্ণনা করা চলে? তবু কিন্তু তোমাদের কবিদের বর্ণনা মর্ম্ম স্পর্শ করে।

কিন্তু সন্ধ্যা তোমাদের এত প্রিয় কিসে? বোধ করি, ভ্রমরগুঞ্জনেই সন্ধ্যার প্রতি তোমাদের অনুরাগ। নহিলে, সন্ধ্যাকে ত আর কেহ বড় দেখ নাই। ভ্রমর পদ্মিনীর চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুণ্‌গুণ্‌ করিতে থাকে, তোমরা প্রেম অনুভব কর। কিন্তু পদ্ম ত রবিকিরণপানে বিহ্বল—ভ্রমরের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। দূর হইতে তাহা ত আর তোমরা জানিতে পাও না। তবে মধু দেয় কেন? মধু কি আর সাধ করিয়া দেয়? কত সাধ্য সাধনা, কত গুঞ্জন, অবসরমত ছোঁ মারিতেও ত্রুটি নাই। আর যে গুঞ্জনে তোমরা ভুল, ক্ষুদ্রা পদ্মিনী যে ভুলিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুণে নয়, ঐ গুঞ্জনেই ভ্রমরের ছলনা।

প্রেমে যাহারা কেবলি সুখ চাহ, ভ্রমরের গুঞ্জন শুন, ভ্রমরের পদানুসরণ কর। তোমাদের নিকটেই ত ভ্রমরের পদমর্য্যাদা—আদর করিয়া ষট্‌পদ নাম দিয়াছ। জ্বালা সহিতে পার না, কাঁটার ঘায়ে কাতর, ভ্রমরই তোমাদের আদর্শ। গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, ফুলের মধু লুটিয়া প্রেম ব্যক্ত কর, জ্বলিতে ত হইবে না।

কবি, তুমিই কিন্তু ভ্রমরকে বাড়াইয়া দিয়াছ। না জানি কোন্‌ সন্ধ্যার স্বপনে কোন্‌ ফুলবনে কি শুভক্ষণেই তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলে! সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ করি ঐ কাল রূপ আর ঐ আরও কাল হৃদয় সুস্পষ্ট দেখিতে পাও নাই। উষার মৃদু আলোকেও ত তুমি বাহির হও, একবার সে রূপ ভাল করিয়া দেখিয়া এ দারুণ

ভুল সংশোধন করিয়া লইলে না কেন? ভ্রমরকে দেখিতে হয় মধ্যাহ্নে—ভ্রমর আর আমি পাশাপাশি। কেবলি স্বপ্নের কাব্য রচনা! একটুকু মধ্যাহ্নের আলো সহে না, হুলের জ্বালা সহে না! এ ছায়ালীন স্বপ্নরাজ্যে আমি স্থান চাহি না। যে দিন তোমার হৃদয়ে এই দারুণ হুল-জ্বালা বিদ্ধ করিতে পারিব, তোমার নশ্বর কাব্যকে অমর করিয়া দিয়া মরিব। সে দিন হইতে তোমার কাব্যে মধ্যাহ্ন জ্বলিতে থাকিবে—সেই জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে মগ্ন হইয়া কেবলি জ্বলিয়া রহিব। আপনাকে ভুলিব, জগৎকে ভুলিব, আর তাহার পূর্ব্বেই জগতের হৃদয় হইতে ভ্রমরের স্থান ঘুচাইব। এখন কবি তুমি হৃদয় লইয়া এস— আমি সেখানে এই হুল ফুটাইয়া দি। বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ।

বোল্‌তা।

মহাযজ্ঞ।

৩০ শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার।

আজি মাতৃ পূজার শেষ দিন। মাতৃভক্ত সন্তানগণের হৃদয় আজি কতই অনির্ব্বচনীয় ভাবে আন্দোলিত হইতেছে—আজি ষোড়শোপচারে জননীর চরণে শেষ আহুতি দান করিতে হইবে এই ভাবিয়া সকলেই উৎসাহে উৎফুল্ল হইতেছেন; আবার যখন তাঁহাদের মনে হইতেছে যে আজিকার দিবাবসানে মঙ্গলময় মহাযজ্ঞেরও অবসান হইবে—শত শত ভাই পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিবেন—তখন তাঁহাদের হৃদয়ের এই অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভব ভিন্ন প্রকাশ করা একান্ত দুঃসাধ্য। শারদীয় মহোৎসবে প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামিকা, সুখ শান্তি ও সম্পদের অগ্রনায়িকা, ত্রিভুবনের অবিনশ্বর পরিচালিকা ও মহাশাধনার প্রাণরূপিণী মহাশক্তির উদ্বোধনান্তে সপ্তমী ও অষ্টমী পূজায় আহুতি দান পূর্ব্বক যে ভাবে বিভোর হইয়া নবমী পূজায় ব্রতী হন, একপ্রাণ-ভূত নব ভারতের সুসন্তানগণ এই অপূর্ব্ব হৈমন্তিক মহোৎসবে জাতীয় শক্তির উদ্বোধন পূর্ব্বক প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস জন্মভূমির বিধিমত পরিচর্য্যায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া আজি শেষ দিনে সেই অনির্ব্বচনীয় ভাবে উন্মাদিত হইয়া জননীর চরণে আহুতি দান করিতে সমবেত হইয়াছেন!

আজি পূর্ব্বদিনের বিধান অনুসারে মধ্যাহ্ন একঘটিকার সময় মহাসমিতির কার্য্যারম্ভ হইল। সভাপতি যথা সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মাননীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথকে অষ্টম প্রস্তাবের অবতারণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

অষ্টম প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল সাহেব গত বৎসর ভারতভূমির কল্যাণার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে যে সকল অমূল্য কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই মহাসমিতি তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দান করিতেছেন; এবং শ্রীযুক্ত সার উইলিয়ম ওয়েডারবারণ, শ্রীযুক্ত কেন্, শ্রীযুক্ত ম্যাক্‌লারেন্, শ্রীযুক্ত এলিশ, শ্রীযুক্ত ইয়ুল এবং শ্রীযুক্ত দাদাভাই নারোজী মহোদয়গণ যেরূপ দক্ষতা ও উৎসাহ সহকারে জাতীয় মহাসমিতির বৃটিশ এজেন্সির কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব বিধান করিয়াছেন, এই মহাসমিতি তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিতেছেন; অধিকন্তু উক্ত এজেন্সির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডিগবী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুধলকার. শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নর্টন ও শ্রীযুক্ত হিউম মহাসমিতির প্রতিনিধি স্বরূপে গতবৎসর ইংলণ্ডে যেরূপ দক্ষতার সহিত স্বস্ব গুরুতর কার্য্য-ভার সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই মহাসমিতি তাহাও বিশেষরূপে অনুভব করিয়া চিরস্মরণীয়রূপে লিপিবদ্ধ করিতেছেন এবং সর্ব্বোপরি ইংলণ্ডের যে সকল সহৃদয় নরনারী তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনা দানে প্রায় পঞ্চাশটি প্রকাশ্য সভায় এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক অপ্রকাশ্য সভাস্থলে এই সকল প্রতিনিধিগণের প্রতি একান্ত সহানুভূতি প্রদর্শন ও তাঁহাদের বাক্যে গভীর আস্থা ও মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, মহাসমিতি এই সুযোগে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন!

তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক বৃন্দ একান্ত পরিতৃপ্ত ও উৎসাহিত হইয়া আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন; বিশাল মন্দির-অভ্যন্তরে ঘোরতর উদ্দীপনার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এইরূপে শ্রদ্ধাস্পদ হিউম্ সাহেবের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন;—"ইংলণ্ডের গৌরব-স্বরূপ ভারত-বন্ধু হিউম্ এই মহা সমিতির প্রাণ। লোকে যথার্থই তাঁহাকে এই মহা সমিতির পিতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। তিনি অতি অসময়ে সরকারী কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, এবং একটী সমগ্র প্রদেশের শাসন কর্ত্তার পদ তুচ্ছ জ্ঞানে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণে অবঃপতিত ভারতভূমির কল্যাণার্থে দেহ ও মন উৎসর্গ করেন। এবং তদবধি এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য সাধনার্থে অকাতরে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন। তিনি নিজের অত্যাবশ্যক কার্য্য-ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমাদের জন্য দিবারজনী

পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন আমরা স্বয়ং স্বস্ব হিতের জন্য অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত তিনি তখন হইতে অসঙ্কুচিত চিত্তে আমাদের জন্য অর্থ ব্যয়ে প্রবৃত্ত। তিনি রোগ-শয্যা-শায়ী অবস্থাতেও আমাদের কল্যাণ কামনায় খাটিতেছেন। তিনি এইরূপে আমাদের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিয়া স্বীয় স্বাস্থ্যধ্বংশ করিয়াছেন, একথা আমি ভিন্ন আর কেহই ভালরূপ জানেন না। ঐরূপ কার্য্যপ্রভাবে তিনি তাঁহার মহৎবংশের সুনাম ও গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার পিতা স্বকীয় জন্মভূমির কল্যাণার্থে এবং বৃটিশ পার্লমেণ্টের সংস্কার সাধন জন্য কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং সেই সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র স্বীয় প্রবাস ভূমি ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন। এদেশের প্রতি তাঁহার এত দয়ামায়া থাকিতেও তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর হইতে যাইতেছেন। তিনি সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন যে এক্ষণে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, তিনি অবাধে মহাসমিতির সাধারণ সম্পাদকীয় কার্য্য-ভার পরিত্যাগ করিতে সক্ষম। তাঁহার উক্ত প্রস্তাবের কেবল একমাত্র উত্তর আছে। মহা সমিতি তাঁহাকে কেবল এই একটী কথা বলিবে—"নিষ্ঠুর হইও না—তুমি জীবিত থাকিতে তোমার স্নেহাস্পদ শিশু-সন্তান এই জাতীয় মহাসমিতিকে পিতৃহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করিও না।" যতদিন আমরা জীবিত থাকিব ততদিন এই মহা সমিতির সহিত তাঁহার পবিত্র সম্বন্ধ ভঙ্গ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। যৎকালে আমরা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিব, তখন ভারতের ভবিষ্য বংশীয় সুসন্তানগণ তাঁহার পবিত্র স্মৃতি গভীরতর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত পূজা করিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমার মৃত্যুর বহুকাল পূর্ব্বে এদেশের কৃতজ্ঞ সন্তানগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার উপযুক্ত প্রতিমূর্ত্তি বিনির্ম্মিত হইতে দেখিয়া আমি সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইব।"

তিনি উপবিষ্ট হইলে পর লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হামিদ আলি সংক্ষিপ্ত হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। এবং তৎপরে কলিকাতার প্রতিনিধি সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান্ মিররের" সুবিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন উহার অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জে, কে, কামা, কলিকাতার আর্ম্মাণিয়ন্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বেগলার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় এবং দিল্লীর প্রতিনিধি মৌলভি রুকুনুদ্দীন্ একে একে দণ্ডায়মান হইয়া উহার পুনরনুমোদন করিলেন; পরিশেষে উহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে নবম প্রস্তাবের অবতারণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

নবম প্রস্তাব।

টিবলি গার্ডেনের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক ও তদীয় ভ্রাতৃগণ এবং মোহন বাগান-বাটীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু নিমাই চরণ বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মাননীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত, বাবু জানকীনাথ রায়, গোপীমোহন রায়, হরেন্দ্রনাথ রায়, কিশোরীমোহন রায়, রমানাথ ঘোষ, ও ঘাসিরাম জমাদার—যাঁহারা মহাসমিতির অধিবেশন জন্য বিশাল উদ্যান এবং প্রতিনিধিগণের বাসের জন্য স্বস্ব আলয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিনাভাড়ায় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই জাতীয় মহাসমিতি বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। অভ্যর্থনা'-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন এবং শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পালচৌধুরী উহার সমর্থন করিবামাত্র সকলে আনন্দের সহিত উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

দশম প্রস্তাব।

মান্দ্রাজ, মধ্যভারত, এবং বেরার কমিটি ও জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটারীর সহিত পরামর্শ অনুসারে মান্দ্রাজ অথবা নাগপুরে আগামী ২৬ শে ডিসেম্বর জাতীয় মহাসমিতির সপ্তম অধিবেশন স্থিরীকৃত হউক।

এই প্রস্তাবের অবতারণার জন্য শ্রীযুক্ত হিউম্ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন; তদ্দর্শনে মণ্ডপের চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই অনির্ব্বচনী আনন্দ কোলাহলে মৃতবৎ অসাড় প্রাণও নবতেজে জাগিয়া উঠে। সেই গভীর আনন্দোচ্ছ্বাস বিরাট মণ্ডপ ভেদ করিয়া দূর গগনে বিলীন হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত হিউম্ সেই গভীর আনন্দোচ্ছ্বাসে একান্ত অভিভূত হইয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। আনন্দ-কোলাহল কিয়ৎপরিমাণে প্রশান্তভাব ধারণ করিলে তিনি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আপনারা আমাকে যে সদয়ভাবে সাদর অভ্যর্থনা প্রদান করিলেন তজ্জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি এরূপ উৎসাহ পূর্ণ অভিবাদন লাভের উপযুক্ত নহি। কিন্তু অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভারতবাসিগণের স্বভাবজাত ধর্ম্ম। আমার এমন কোন গুণ নাই যাহাতে আমি এইরূপ গভীর কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ সমাদরের অধিকারী হইতে পারি, আপনাদের প্রকৃতির উদারতা ও স্নেহ প্রবণতাবশতঃই আপনারা আমাকে এইরূপ অভ্যর্থনা দান করিতেছেন। এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট গত কয়েক বৎসরের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র প্রস্তাবের অবতারণা করিব। কোন স্থানে জাতীয় মহাসমিতির আগামী অধিবেশন হইবে তাহা এখনও

স্থির হয় নাই; মান্দ্রাজের কমিটী তথায় উক্ত অধিবেশনের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আমরা সকলেই মান্দ্রাজের লোকদিগকে ভালবাসি এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই আনন্দের সহিত মান্দ্রাজে যাইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় অনেক স্থানের প্রতিনিধিগণের পক্ষে তথায় অধিক দূরত্ব জনিত বিশেষ অসুবিধা হইবে। তথায় মহাসমিতির অধিবেশন হইলে পঞ্জাব, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বেহার এবং বাঙ্গালার অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত হইতে পারিবেন না; জলপথে গমন করিলে যাতায়াতের সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে অল্প লোকই সম্মত হইবেন। পক্ষান্তরে ৯৬ ঘণ্টা কষ্ট সহ্য না করিলে রেলগাড়ীতে তথায় যাওয়া যায় না, তাহাও অনেকের পক্ষে সহজ নহে। সেই জন্যই আমরা আগামী অধিবেশনের জন্য কোন অধিকতর সুবিধাজনক ও নিকটবর্ত্তী স্থান নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। নাগপুর মধ্য ভারতের প্রধান নগর এবং ভারতবর্ষের প্রায় মধ্যস্থলে স্থিত; তথায় ইতিপূর্ব্বে আর কখনও মহাসমিতির অধিবেশন হয় নাই; আগামী বর্ষের মহা সমিতির জন্য আমরা নাগপুরে সুবন্দোবস্ত করিতে পারিব, তদ্বিষয়ে বিশেষ আশা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শারীরিক অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণ প্রযুক্ত তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান মহাসমিতিতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এতদ্বিষয়ে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে না পারিব ততক্ষণ আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। আপনারা এক্ষণে আমার প্রস্তাবের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান ও সৎবিবেচক, যদি আপনারা এই প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে আর সময় নষ্ট না করিয়া সমর্থন ব্যতিরেকে উহা গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া তিনি উপবিষ্ট হইলে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ ক্ষণকালের জন্য গভীর আনন্দ ধ্বনি সহকারে উক্ত প্রস্তাবের অনুকুলে সম্মতির পরিচয় দান করিলেন।

একাদশ প্রস্তাব।

সুবিধা হইলে ১৮৯২ সনে ইংলণ্ডে মহাসমিতির একটী অধিবেশন জন্য আয়োজন করিতে হইবে; উহাতে অন্যূন একশত প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে। বিভিন্ন স্থানীয় স্থায়ী কংগ্রেস কমিটি সমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদের নামের তালিকা মহাসমিতির আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

সুবিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাসহকারে উল্লিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই;—"আমাদের দুঃখ ও অভাব জ্ঞাপনের প্রকৃত

স্থান ইংলণ্ড ভিন্ন আর কোন স্থান নহে এবং আমাদের অবস্থার যথার্থ বিচারক বৃটিশ সাধারণ ব্যক্তিবর্গ, বৃটিশ সংবাদপত্র সমূহ এবং বৃটিশ পার্লামেণ্ট। আজি পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির ছয়টি অধিবেশন হইল, অতঃপর লণ্ডনে উহার অধিবেশনের সময় আসিতেছে। ছয়টি অধিবেশনে আমরা যে ফল লাভ করিতে পারি নাই তথায় একটী অধিবেশনে আমরা সেই ফল পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে সমর্থ হইব। গতবর্ষে আমরা ইংলণ্ডে যে সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাঁহারা সকলেই এই প্রস্তাবের একান্ত পক্ষপাতী; এবং তাঁহারা সকলেই আগামী ১৮৯২ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে লণ্ডনে মহাসমিতির অধিবেশনের আবশ্যকতা একবাক্যে আগ্রহের সহিত প্রদর্শন করিতেছেন। সময়ে সময়ে আমরা ইংলণ্ডে যে সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছি তাঁহাদের চেষ্টায় এই একটী শুভ ফল জন্মিয়াছে যে আজি ইংলণ্ডের সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই দেশের হিতকর বিষয়ে অধিক পরিমাণে অনুরাগ ও আস্থা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জনকতক প্রতিনিধি হইতে যদি এরূপ হিত সাধিত হইয়া থাকে তবে তথায় মহাসমিতির একটী অধিবেশন হইলে কতই অধিকতর পরিমাণে কল্যাণ সাধিত হইবে। লণ্ডনের এক্সেটার হল্ অথবা সেণ্ট্ জেম্‌স্ হলে জাতীয় মহাসমিতির একটী মাত্র অধিবেশন হইলে তাহা হইতে যে কত মঙ্গল লাভ হইবে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা অসম্ভব। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংপ্রতি ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপে ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে আমরা এই উপায় অবলম্বন করি। ভারত হিতৈষী শ্রীযুক্ত কেন্ সাহেবেরও ঐরূপ অভিপ্রায়। আমি স্বয়ং অনেক দিন হইতে উহার উপযোগিতা অনুভব করিতেছি এবং যাহাতে ঐরূপ উপায় অবলম্বিত হয় তজ্জন্য গত তিন বৎসর হইতে উপদেশ দিতেছি। এতদিন আমরা বৃথা অরণ্যে রোদন করিয়াছি, একবার ইংলণ্ডে মহাসমিতির ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হউক—তথায় সমবেত প্রতিনিধিবর্গের মুখ হইতে যে ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হইবে তাহাতে ইংলণ্ডের হৃদয়বান অধিবাসী অমনোযোগী হইতে পারিবেন না। এ বৎসর আমরা যতগুলি প্রস্তাব অবতরণ করিয়াছি তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাবটি আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রধান—উহার আবশ্যকতা আমি বাক্যে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। বহু সংখ্যক প্রতিনিধির সহিত একটী বৃহৎ সমিতির আবশ্যক নাই—একশত প্রতিনিধি হইলেই আমাদের অভিপ্রায় যথেষ্ট রূপে সাধিত হইবে। ইংলণ্ডে গমনাগমন ও তথায় অবস্থিতি কালের জন্য এরূপ সুবন্দোবস্ত করা যাইবে যাহাতে প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দুও আপনার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। একশত অথবা তদধিক লোকের সহিত লণ্ডনে মহাসমিতির অধিবেশন হইলে তত্রত্য অধিবাসিবর্গ চমকিত হইবেন—তাঁহাদের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত

হইয়া আমাদের অভাব ও দুঃখ জ্ঞাপন করিলে তদ্বিমোচনের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। উহাতে যেমন রাজনৈতিক কল্যাণ সাধিত হইবে, তেমনই তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে সামাজিক মঙ্গল ও সাধিত হইবে। উহাতে আর এই একটী শুভকর ফল জন্মিবে ভারতবর্ষ অল্প কালের মধ্যেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। বলিতে আমার আনন্দ জন্মিতেছে যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগ ও প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া আবশ্যক অনুরূপ প্রতিনিধির সংখ্যা পূর্ণ হইবে।”

বেহারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু শালগ্রাম সিংহ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন; তিনি বলিলেন হিন্দু সিপাহীগণ যুদ্ধার্থে আবিসিনিয়া ও মীশর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিল তাহাতে তাহাদের জাতি যায় নাই; হিন্দুগণ স্বস্ব রাজনৈতিক অধিকার লাভ ও সুখ শান্তি বর্দ্ধনের জন্য ইংলণ্ডে গমন করিলে এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহারা জাতিচ্যুত হইবেন না; সহৃদয় নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে সাদরে সমাজবক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক অভ্যর্থনা দান করিবেন।

অনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বীরারাঘব চারিয়ার, বেরারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দেবরাও বিনায়ক, বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ধন্দোর শ্যামরাও গারুদ, গুজরাটের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরদেও রাম নানাভাই হরিদাস, মধ্যভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লচমণ রাও গোবিন্দ, অমৃতসহরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সোধি প্রতাপসিংহ, লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত শ্যামনারায়ণ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, কলিকাতার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, অযোধ্যার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রায় কাকুমল,এবং পাটনার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সরফুদ্দীন একে একে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তদনন্তর শোলাপুরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কেন্ সাহেব অনেকের অনুরোধে মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সুন্দর যুক্তির সহিত তেজস্বী বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। তাঁহার হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই—“আপনারা লণ্ডনে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি; এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা হইল তাহা শুনিয়া আমি একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি। চিরাগত প্রথানুরাগী নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগেরও জাতীয় উন্নতি লাভের জন্য ইংলণ্ডে গমনে আপত্তি নাই তাহা শুনিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে আপনারা ইংলণ্ডে গমন করিলে আপনাদের তত্রত্য বন্ধুগণ পরম সমাদরে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা প্রদান করিবেন। সেখানে মহাসমিতির অধিবেশন হইলে রাজকর্ম্মচারিগণকে উহাতে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়া কেহ কোন ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিবেন না, পক্ষান্তরে ভারত সচিব হইতে সামান্য পত্রবাহক পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মচারীই উহাতে উপস্থিত হইতে পারিবেন। সম্ভবতঃ ভারতেশ্বরী তদীয় বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণকে

উহাতে দর্শক স্বরূপে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ং আপনাদিগকে তাহার বকিংহাম রাজ-ভবনে সাদরে নিমন্ত্রণ করিবেন। যে দিন একশত অথবা শতাধিক ভারতবাসী একত্র সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রের পারে লণ্ডন নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের আয়োজন করিবেন আমি সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইংলণ্ডস্থ ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয়ের সভ্যগণ এবং ভারত হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ যতই যত্ন গ্রহণ করুন না কেন দূর হইতে এই জাতীয় মহাসমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্য্য তাঁহারা কখনই সহজে ইংলণ্ডবাসিগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। আমি ভারতবর্ষ হইতে অথবা এই মহাসভায় উপস্থিত থাকিয়া সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মহাসমিতির বিস্ময়জনক দৃশ্য ও মনোমুগ্ধকর বক্তৃতাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইংলণ্ডের কতিপয় সংবাদ পত্রে প্রেরণ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকি, কিন্তু এই মহাসমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্য্য নিচয় বৃটিশ সাধারণের মনশ্চক্ষুর নিকট যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে প্রবল ক্ষমতাশালী লেখনীর সাধ্যাতীত এবং সুনিপুণ শিল্পীর ক্ষমতার বহির্ভূত! যে দিন আপনারা এক্সেটারহল্ অথবা ক্রিষ্ট্যাল্ পালেসে এই মহাসমিতির অধিবেশন করিতে সক্ষম হইবেন সেই দিন উহার যথার্থ উদ্দেশ্য ইংলণ্ডবাসিগণ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে—আপনারা তথায় যে সকল সুযুক্তি ও রাজনীতিময় স্বদেশানুরাগোদ্দীপক বক্তৃতা করিবেন তৎসমস্ত তত্রত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্ণে শ্রবণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং উক্ত বক্তৃতানিচয় তত্রত্য প্রত্যেক প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রে আদ্যান্ত প্রকাশিত হইলে অনেকে তাহা পাঠ করিতে সক্ষম হইবেন। কল্য আপনারা ন্যায়ানুসারে গবর্ণমেণ্টের যে ঘোষণা পত্রের নিন্দা করিয়াছেন তাহার লেখকগণ, ঐ সকল বক্তৃতা অবিকল প্রকাশিত হইলে, যদি কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক তৎসমস্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহারা এজন্য নিঃসন্দেহ গভীর লজ্জা অনুভব করিবেন যে তাঁহারা রাজকর্ম্মচারিগণকে রাজভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়া ভাল কায করেন নাই। আমি এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া এই মহাসমিতির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বক্তৃতাই শুনিয়াছি, কিন্তু আমি এমন একটী মাত্রও কথা শুনিতে পাই নাই যাহার জন্য উক্ত কলঙ্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইতে পারে! আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে লণ্ডনে এই মহাসমিতির অধিবেশন হইলে ঐ সুযোগে পার্লামেণ্টের 'হাউস্ অব্ লর্ডস্' ও 'হাউল্ অব্ কমন্স' উভয় পক্ষীয় সভ্যগণ উহাতে উপস্থিত হইয়া স্বকর্ণে শিক্ষিত ভারতবাসিগণের প্রকৃত অভাব ও আশার বিবরণ শ্রবণ করিবেন। আপনারা তথায় গমন করিলে আমি আমার বন্ধুগণের সহিত আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষরূপে অয়োজন করিব। কিরূপ বন্দোবস্ত হইলে আপনাদের সমস্ত অভাব নিবারিত হইতে পারে এবং হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগের নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ স্বস্ব জাতি, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা পূর্ব্বক

অবাধে তথায় যাইতে পারেন, তাহা যদি আপনারা যথা সময়ে আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হইব। আপনাদের ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণের পক্ষ এবং মহৎ ইংরেজ জাতির পক্ষ হইতে আমি এই অঙ্গীকার করিতেছি যে যৎকালে আপনারা উক্ত উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমন করিবেন তখন আপনারা এরূপ মহাসম্মান প্রাপ্ত হইবেন যাহাতে আপনাদের হৃদয় উল্লাসে পরিপূর্ণ হইবে।" তদনন্তর সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল—সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সমবেত প্রতিবর্গের মধ্যে সকলেই হস্তোত্তলন পূর্ব্বক উহার অনুকূলে মত প্রদান করিলেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

জয়েণ্ট জেনারল্ সেক্রেটারীর নিকট এক্ষণে যে টাকা মজুত আছে এবং পরে যে টাকা আসিবে তদ্ব্যতীত আরও কুড়ি হাজার টাকা স্থায়ী কংগ্রেশ তহবিলে নির্দ্দিষ্ট সুদে জমা রাখিতে হইবে; এবং বর্ত্তমান ১৮৯০ সনের অবশিষ্ট টাকা জাতীয় মহাসমিতির বৃটিশ কমিটির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটারীর হস্তে জমা থাকিবে, কিন্তু আগামী ১৮৯১ সনে যে সমস্ত চাঁদা সংগৃহীত হইবে তৎসমস্ত অর্থ স্থায়ী তহবিলে জমা করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত ডি, ই, ওয়াচা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন এবং লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বসু হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতায় উহার সমর্থন করিবামাত্র উহা সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।

কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক কিছু অর্থ দান করা ব্যতীত ৪০,০০০, চল্লিশ হাজার টাকা বৃটিশ কমিটির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং ৬০০০, ছয় হাজার টাকা জেনারল সেক্রেটারীর কার্য্যালয়ের খরচের জন্য প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা করা হউক এবং কংগ্রেশ কেন্দ্র ও বিভিন্ন জেলা সমূহ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে অনুরুদ্ধ হউন।

শ্রীযুক্ত মুধলকার সংক্ষেপে এই প্রস্তাবের অবতারণা এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী উহার সমর্থন করিলেন এবং লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি মুন্সিসজ্জাৎ হোসেন উর্দ্দু ভাষায় উহার অনুমোদন করিলে পরে উহা সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ত্রয়োদশ প্রস্তাবের পরবর্ত্তী প্রস্তাবটি প্রতিবর্ষে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়া থাকে; ইহা গভীরতম দুঃখের বিষয় যে তিনি অদ্য এই মহা সমিতিতে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিতে সমর্থ হইলেন না। আমি অপর একজন প্রতিনিধিকে

তাঁহার স্থান গ্রহণ করিতে বলিয়াছি, আশা করি তিনি আমাকে আদেশ কর্ত্তা জ্ঞান করিবেন না।

আমি বক্তাকে বিশেষরূপে এই অনুরোধ করিতেছি যে তিনি উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা ভিন্ন যেন আর একটী মাত্রও অধিক কথা না বলেন, এবং আপনাদিগের নিকটেও আমার এই অনুরোধ যে আপনারাও যেন তাঁহাকে অধিক কথা বলিতে অনুরোধ না করেন। আমি অবশ্যই জ্ঞাত আছি যে তাঁহার একটী কথা কেন, তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণই আপনাদের আন্তরিক বাসনা, কিন্তু তিনি সংপ্রতি অতিকষ্টে রোগ শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই জন্য কোন ক্রমেই তাঁহার পক্ষে অধিক পরিশ্রম যুক্তি-সঙ্গত নহে।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত এ, ও, হিউম্ সাহেব এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথ আগামীবর্ষের জন্য যথা ক্রমে জেনারল সেক্রেটারী ও জয়েণ্ট্ জেলারল সেক্রেটারীর পদে পুনরায় নিযুক্ত হউন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের অবতারণার জন্য মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। অল্পদিন হইল তিনি কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে বক্তা স্বরূপে উচ্চমঞ্চে দণ্ডায়মান দেখিয় সহস্র হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল—সকলে প্রাণ খুলিয়া বিপুল আনন্দভরে তাঁহাকে সাদর অভিবাদন দান করিলেন। অনন্তর তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সভাপতি কর্ত্তৃক আমার এবং আপনাদের প্রতি যে নিষেধ আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, আমি তাহা লঙ্ঘন করিতে যাইতেছি না। আপনারা আমাকে যেরূপ গভীর উৎসাহ পূর্ণ অভ্যর্থনা দান করিলেন, শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ আমি তাহার সমুচিত প্রতিদান করিতে অসমর্থ; উহার জন্য আমি আপনাদিগের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞ; উহা আমাকে আমার জীবনা অপেক্ষা প্রিয়তর স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিবে। আমি যে প্রস্তাবের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি আশা করি আপনারা সকলেই তাহা একবাক্যে গ্রহণ করিবেন। আমি নিশ্চয় জানি এ প্রস্তাবের সমর্থন আবশ্যক হইবে না।"

এই বলিয়া তিনি উপবিষ্ট হইবামাত্র উহা সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।

মহাসমিতির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ইংলণ্ডের জন সাধারণের নিকট প্রচারার্থে এবং ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কার ও উন্নতির প্রতি তত্রত্য সহৃদয় ব্যক্তি সাধারণের অনুরাগ ও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আগামীবর্ষে তথায় ভারতীয় বিষয়ের আন্দোলন হেতু

এই মহাসমিতি শ্রীযুক্ত জর্জ্জ, ইয়ুল, ফেরোজসা মেটা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জে, য়্যাডাম, মনোমোহন ঘোষ, এ, ও, হিউম, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদা ভাই নারোজী, ডি, এ, খাঁড়ে প্রভৃতি মহাশয়গণকে এবং স্থায়ী কংগ্রেস কমিটি নিচয়ের নির্ব্বাচন অনুসারে যে সকল ভদ্র মহাশয়গণ স্বেচ্ছায় উক্ত কার্য্য-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদিগকে মহাসমিতির প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলে সমর্থন ব্যতিরেকে উহা সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

ষোড়শ প্রস্তাব।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের প্রস্তাবানুসারে শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের জন্য মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলেন; সমবেত প্রতিনিধি ও ও দর্শক মণ্ডলী গভীর আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক এই মহিলা প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা দান করিলেন। তিনি সংক্ষেপে সুমধুর ভাষায় সভাপতির গুণ কীর্ত্তন ও মহাসমিতির গুরুতর কার্য্য একান্ত দক্ষতার সহিত পরিচালন জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দান করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

গভীর আনন্দধ্বনির মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

উপসংহার।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটা মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মহাসমিতির কার্য্য উপসংহার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান অনুষ্ঠাতৃ বর্গকে ধন্যবাদ দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহিলা প্রতিনিধি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি ধন্যবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এজন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিলেন যে ইতিপূর্ব্বে মহাসমিতির যতগুলি অধিবেশন হইয়াছিল—তাহাতে আর কখনও কোন মহিলা প্রতিনিধি সভাপতিকে ধন্যবাদ দান করেন নাই; এই জন্য তাঁহার সভাপতিত্ব বিশেষ রূপে সার্থক। উহার প্রতি দানে তিনি উক্ত মহিলা প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে তিনি সহাসমিতির সুন্দর রূপে আয়োজন ও সুবন্দোবস্তের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি ও তৎসভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের নিকট বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল, যিনি দিবা রজনী অক্লান্ত ভাবে ঘোরতর পরিশ্রমের সহিত মহাসমিতির আয়োজনে

নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে এবং তদীয় সহযোগী শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু পশুপতিনাথ বসু ও বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি, যাঁহারা এই জাতীয় মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটী করেন নাই, তাঁহাদিগকে এবং ভলণ্টিয়র, ইঞ্জিনিয়র ও স্বাস্থ্য-কমিটির সভ্যগণ এবং যাঁহারা বিদেশীয় প্রতিনিধিগণের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনের ভার লইয়া তাঁহাদের সুখ ও আরামের জন্য সুবন্দোবস্ত বিধান করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও বিশেষ রূপে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে ভারতেশ্বরীর জয়োচ্চারণ পুরঃসর মহাসমিতির কার্য্য সমাপনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে মহাসমিতির সমস্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাসে তিনবার ভারতেশ্বরীর জয়োচ্চারণ করিলেন। সেই আনন্দধ্বনি বিরাট মণ্ডপভেদ করিয়া চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই মহান্ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে বিশাল ভারতের একপ্রাণ-ভূত জাতীয় মহাযজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইল। আবার একবৎসর পরে সম্ভবতঃ মধ্য-ভারতের রাজধানী নাগপুরে এই অনন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা পূর্ণ জাতীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। কবে এমন সুদিন আসিবে যে দিন প্রতিবর্ষে এই অপূর্ব্ব মহাযজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠান দিনে বিশাল ভারতের প্রতিগৃহে মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইবে—ভারতের কোটি কোটি নর নারীর বিপুল আনন্দ-ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত ও মৃতবৎ অসাড় প্রাণ নবপ্রাণে সঞ্জীবিত ও নব উৎসাহে উদ্দীপিত হইবে! ভারতের ঈশ্বর, তুমি এই অধঃপতিত দেশে কৃপা-কণা বিতরণ কর; উহার হতভাগ্য পরিবর্ত্তিত ও সৌভাগ্য-শ্রী পরিবর্দ্ধিত হউক। ভাই ভারতবাসি, দুঃখিনী জন্মভূমিকে আর ভুলিও না—ক্ষুদ্র অভিমান, তুচ্ছ আত্ম-সম্মান ও ঘৃণিত আত্ম-বিচ্ছেদ অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া আইস আমরা সকলে জননীর পরিচর্য্যায় দেহ-মন উৎসর্গ করি। জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে একদিন অবশ্যই আমরা তাঁহার ললাটের কলঙ্ক প্রক্ষালন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের এই প্রাণের বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

শ্রীবিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

শিবনারায়ণ পুনরায় বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্ববিষয়ে গুণ পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ। তোমরা প্রত্যক্ষ দেখ যদি বাল্যকাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাদের এমন গুণ আছে যে, পুরুষের যে বিদ্যা আট বৎসরে লাভ হয়,

স্ত্রী তাহা চারি বৎসরে উপার্জ্জন করিবে। এবং উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য উপাসনা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা ইত্যাদি পুরুষদের যদি আট বৎসরে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগকে উত্তম-রূপে শিক্ষা দিলে চারি বৎসরের মধ্যে হইবে। লোকের স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা না দিবার কারণ এই যে, যদ্যপি উহাদের উত্তম ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে নির্ভয় হইয়া পুরুষদিগের বিনা অনুমতিতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিবে—এবং স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের আজ্ঞাধীন কোন কার্য্য করিবে না—পুরুষ মহাত্মাগণ কেবল মাত্র স্বার্থ ও হিংসার কারণে স্ত্রীদিগকে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান না। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ নিয়ম নহে। তিনি সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে সকলেই উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে সকলেরই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য।

ইহার পর সভাভঙ্গ হইলে উপস্থিত একজন মহাজন বলিলেন, তোমরা আজ আমায় পরম মহাত্মা সাধু পুরুষ দর্শন করাইলে। আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ তোমাদের অনুগ্রহে এইরূপ সাধু দর্শন করিলাম। আজ আমার বাটীতে মহাত্মার সেবা হইবে। এই বলিয়া শিবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া সেই মহাজন বাটী আসিলেন। শিবনারায়ণ রাত্রে সেইস্থানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে গোদাবরী তীর্থাভিমুখে যাইলেন। সেখানে শুনিলেন সাঙ্গ বেদাধ্যায়ী অদূরে এক জ্ঞানবান পণ্ডিতের বাস। তিনি শান্তমূর্ত্তি ও সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে উত্তম রূপে সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপ অনেক স্থানে গল্প শুনিতে পাইয়া শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিলেন যে এই পণ্ডিত হয়ত ভেকধারি সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে সেবা করিয়া থাকে। কেন না যিনি যথার্থ পরমহংস এবং সন্ন্যাসীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার আত্মা ও পরমাত্মার এক স্বরূপ বোধ হইয়াছে তিনি ত কোন ভেকের চিহ্ন ধারণ অথবা লোককে জানাইবার জন্য অন্য কোন প্রপঞ্চ করিবেন না। যেরূপ ব্রহ্মের কোন অবস্থা বা লক্ষণ নাই যে সেই লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে চেনা যাইবে সেইরূপ যথার্থ অবস্থাপন্ন পরমহংস সন্ন্যাসী মহাত্মাকে কোন লক্ষণ বিশেষে চেনা যায় না। তবে সেই বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত কিরূপে চিনিয়া যথার্থ সন্ন্যাসী পরমহংসকে আদর অথবা সেবা করেন? এইরূপ ভাবিয়া শিবনারায়ণ পণ্ডিতের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে সেখানে একটি শিবালয় আছে। সেই শিবালয়ের মধ্যে কেহ কেহ শিবের পূজা করিতেছেন, কয়েকজন নিত্য নিয়ম করিতেছেন এবং কেহ কেহ বাহিরে পাঠ করিতেছেন। শিবনারায়ণের গায়ে ধূলা মাটি লাগিয়াছিল এবং একখানি মাত্র ছেঁড়া চাদর পরিধানে ছিল আর চুলও একটু বড় বড় ছিল। তাহাতে তাঁহাকে দেখিতে ঠিক পাগলের মত বোধ হইত। পণ্ডিত সেই অবস্থাপন্ন শিবনারায়ণকে দেখিয়া রাগে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কে, কোথায় হইতে আসিয়াছিস, এখানে কি জন্য আসিলি, তুই কি

জাতি ? শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমি আদমী, আমি মনুষ্য, তুমিও যে মনুষ্য আমিও সেই মনুষ্য। ইহাতে পণ্ডিত রাগ করিয়া বলিলেন যে, বেটা আমি ত তোকে মনুষ্য দেখিতেছি কিন্তু তুই কি জাতি ? শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমি বড়ই নিকৃষ্ট এবং ভ্রষ্ট জাতি, আমার জাতির মতন নিকৃষ্ট জাতি আর নাই, আমি সকল জাতি অপেক্ষা নীচ। পণ্ডিতগণ এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন যে, বেটা তুই নীচজাতি হইয়া আমাদের শিবালয়ের নিকট কেন আসিলি ? আমার এই ঠাকুর এবং সকল স্থান তোর আসার দরুন অশুদ্ধ হইয়া গেল। বেটা এখান হইতে দূর হ'। শিবনারায়ণ বলিলেন, আদিতে যে বস্তু অশুদ্ধ হইবে সেই বস্তু শেষেও অশুদ্ধ থাকিবে এবং যে বস্তু আদিতে শুদ্ধ থাকিবে সে অন্তেও শুদ্ধ থাকিবে—কোন মতে অশুদ্ধ হইবেক না। যদ্যপি আমার আসার দরুণ আপনি, আপনার মন্দির, ঠাকুর এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান—সকলই অশুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনার নিকট গোময় আছে উহার দ্বারা আপনি আপনার মন্দির এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান—সকল শুদ্ধ করিয়া লউন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

পণ্ডিত বলিলেন, বেটা আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। যা বেটা এখান হইতে দূর হ'।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে গোদাবরীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র এক নদীর তীরে আসিলেন। এবং পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণ যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থান উত্তমরূপ গোময়-জল দিয়া পবিত্র করিয়া লইলেন। ঐ নদীর তীরে একজন জয়পুরী মহাত্মার চেলা ধূনী জালিয়া বসিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে চিনিতেন এবং তিনিও শিবনারায়ণকে চিনিতেন। রাস্তায় দুই চারি দিবস তিনি শিবনারায়ণকে সেবা করিয়াছিলেন।

শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি দুই চারি ঘণ্টার জন্য আপনার সং আমাকে দাও; জগতে সত্যকে মানে না, প্রীতিপূর্ব্বক প্রপঞ্চকে মানে। শিবনারায়ণ তাহার নিকট হইতে গেরুয়াবস্ত্রের কৌপিন চাহিয়া লইলেন ও নাপিতের নিকট খেউরি হইলেন। এবং স্নান করিয়া উত্তমরূপে গাত্রে সাদা বিভূতি মাখিয়া লইলেন ও কপালে ত্রিপুণ্ড ধারণ করিলেন। চার পাঁচটী রুদ্রাক্ষমালা হস্তে এবং গলায় পরিয়া হাতে একটী উত্তম কমণ্ডলু ও পায়ে এক যোড়া খড়ম দিয়া সং সাজিয়া সেই পণ্ডিতের বাটীতে শিবালয়ের উপরে উঠিলেন। এবং শিবোঽহং শিবোঽহং করিতে করিতে মন্দিরের মধ্যে গেলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওঁ নম নারায়ণায় নমঃ বলিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। এবং সত্বর আসন আনিয়া ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক জোড়হস্তে আবাহন করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন ও বলিলেন যে, এমন মহাত্মা আমার বাটীতে পদধূলী দিলেন, ধন্য আমার অদৃষ্ট। পরে পণ্ডিতগণ

হাত যোড় করিয়া শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কৃপানিধান ! আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন ? আপনার আহারের বিষয়ে কি নিয়ম আছে এবং কি আহার করিবেন—অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমরা সেইরূপ আহার প্রস্তুত করিব। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার আহারে। বিষয় এই রূপ নিয়ম আছে যে বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক যে পুত্র বা কন্যার বিবাহ হয় নাই সেই পুত্র বা কন্যা ডান হাতে কূপের মধ্যে হইতে জল তুলিয়া আনিয়া ঐ জল দিয়া গোশালায় ঘৃতপক্ক অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিলে আমি সেই অন্ন দিন রাত্রের মধ্যে একবার আহার করিয়া থাকি। যদি বামহস্ত লাগে বা পাক করিতে করিতে পাচক উদ্গার করে তাহা হইলে ঐ অন্ন আমার আহার করা হইবে না। যদ্যপি এই রূপ প্রণালীতে অন্ন প্রস্তুত হয় তাহা হইলে অন্ন আহার করিতে পারি নতুবা আমি আহার করি না। কেবল মাত্র জল পান করিয়া থাকি। ইহাতে পণ্ডিত বলিলেন, আপনি সন্ন্যাসী মহাত্মা জগতের গুরু, আপনার মত কেহই এমন কঠিন আচার এবং নিয়ম ধারণ করিতে পারে না। আমরা আপনার আহারের ব্যবস্থা করিতেছি আপনি একটু বিশ্রাম করুন। পণ্ডিতগণ বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া ঐরূপ কঠিন নিয়মে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলায় তাহারা অন্ন প্রস্তুত করিতে স্বীকার করিল না। তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন যে, তবে আমাদের গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন হইল না। ইহাতে একজন বালক বলিল, এক হস্তে জল অতি কষ্টে আনিতে পারি এবং ময়দাও এক হস্তে আনিতে পারি কিন্তু পুরী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিব ? এবং অপর এক বালক স্বীকার করিল, আমি যেমন করিয়া হউক পুরী প্রস্তুত করিয়া দিব কিন্তু আমার এক টাকার মিষ্টান্ন খাইতে দিতে হইবে। পণ্ডিত তাহাই স্বীকার করিলেন।

পরে যখন পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া আহার করিতে বসিলেন তিনি বলিলেন, আহারের বস্তু অশুদ্ধ হইয়াছে, পাচক বালক পাক করিবার সময় উদ্গার করিয়াছিল। যাহা হউক আমি মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইব। পণ্ডিতগণ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ঐ বালককে বলিলেন যে, তুমি উদ্গার করিয়াছিলে ? বালক বলিল না। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে বালক, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সত্য কথা বল। মিথ্যা বলিও না, পাপ হইবেক। আমি পুরী শুদ্ধ করিয়া খাইব। তোমার কোন চিন্তা নাই। শিবনারায়ণের কথা শুনিয়া ঐ বালক বলিল, হাঁ মহারাজ, আমি দুইবার উদ্গার করিয়াছিলাম। শিবনারায়ণ তখন মন্ত্র পড়িয়া অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম মনে মনে লইয়া আহার করিয়া লইলেন।

পণ্ডিতগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে এমন মহাত্মা আমরা কখন দেখি নাই। বাড়ীর মধ্যের ঘরে বালক পাক করিতে করিতে উদ্গার করিয়াছিল উনি বাহির হইতে কি প্রকারে জানিলেন ? মহাত্মা অন্তর্যামী না হইলে কেমন করিয়া জানি-

বেন? ইনি নিশ্চয়ই অন্তর্যামী। পরে শিবনারায়ণ এবং পণ্ডিতগণ বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তখন শিবনারায়ণ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা পণ্ডিত লোক শাস্ত্র বেদ পড়িয়াছেন—শাস্ত্র বেদ পড়িবার ফল কি? এবং পণ্ডিত কাহাকে বলে এবং সন্ন্যাসী পরমহংস কি বস্তুর নাম? নিরাকার না সাকারকে পরমহংস সন্ন্যাসী বলে কিম্বা হাড় মাংস মল মূত্র ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে বলে অথবা খড়ম রুদ্রাক্ষমালা এবং বিভূতি তিলক ইত্যাদিকে বলে? কি বস্তু, পরমহংস সন্ন্যাসী? ভাবিয়া তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাও। তাহাতে একজন পণ্ডিত বলিলেন, মহারাজ শাস্ত্র বেদ পড়িবার ফল এই যে সত্যকে সত্য বোধ করা অসত্যকে অসত্য বোধ করা সত্যতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখা অসত্যতে চিত্তের আসক্তি না করা, সকলেতে সমদৃষ্টি ও জগতের হিত করা, পরোপকারে সর্ব্বদা রত থাকা, ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য উভয় বুঝিয়া যে কার্য্য করিলে ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করা এবং যে কার্য্য করিলে পরমার্থ সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য করিয়া পরমার্থ সিদ্ধ করা—এই সকল ভাব যাহার হয় তিনি পণ্ডিত এবং বেদ শাস্ত্র পড়িবার এই সার মর্ম্ম। এবং পরমহংস সন্ন্যাসীর ভাব অর্থ এই যে

দেহন্যাসোহি সন্ন্যাসঃ নৈব কাষায়বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্।

অর্থাৎ দেহত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস, গেরুয়াদি কষায় বস্ত্র পরিধানের নাম সন্ন্যাস নহে। দেহ ত্যাগের অর্থ এই যে আমি দেহ নহি আমি সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা স্বরূপ, অর্থাৎ দেহাভিমানী পুরুষ সন্ন্যাসী নহেন। যিনি আত্মদর্শী তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী। কিন্তু হাড় মাস সন্ন্যাসী নহে, এবং বিভূতি, খড়ম ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করাকে সন্ন্যাসী বলে না। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পণ্ডিত, যখন তুমি এই সকল কথা বলিতেছ কল্য প্রাতঃকালে একজন মহাত্মা ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাকে ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলে কেন? এবং আমি এখন রুদ্রাক্ষের মালা এবং বিভূতি গায়ে মাখিয়া আসিলাম তাহাতে আমাকে আদর করিলে কেন? পণ্ডিত বলিলেন যে আপনি হলেন মহাত্মা আর সে বেটা ভ্রষ্ট লোক। শিবনারায়ণ বলিলেন, সে যে ভ্রষ্ট লোক তাহা আপনি তাহার কি লক্ষণের দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন? পণ্ডিত বলিলেন, সে আপন মুখে বলিয়াছিল যে আমি ভ্রষ্ট লোক। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, যে যাহা বলিবে তাহাই কি তুমি বিশ্বাস করিবে তবে এক ব্যক্তি যদি বলে যে আমি বড় শ্রেষ্ঠ লোক অর্থাৎ আমি পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা হইলে কি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিবে? তবে তোমার বেদ শাস্ত্র পড়িবার ও পণ্ডিতির ফল কি? আমিই তখন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে আমি নিকৃষ্ট ও ভ্রষ্ট জাতি এবং এখন আমি সেই সং ছাড়িয়া অন্য সং

সাজিয়া আপনাকে বলিলাম যে আমি শিবোঽহং সচ্চিদানন্দ আমি সন্ন্যাসী। তখন আমার সেই মলিন অবস্থা দেখিয়া ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলে আর এখনও আমি সেই ব্যক্তি, কিন্তু এখন আমাকে আমার এই সং সাজার জন্য ইষ্ট গুরু মানিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছ। ধিক্ পণ্ডিতের এমন বুদ্ধিতে। এইরূপ যদি ঈশ্বর কোন মলিন বেশ ধরিয়া তোমাদের কাছে আসেন তাহা হইলে তাঁহাকে তোমরা হতাদর ও ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দাও এবং যদি কোন উত্তম সংয়ের সাজ দেখ তাহা হইলে তখন তাহাকে আদর কর। এই কথা শুনিয়া তখন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে হাত জুড়িয়া বলিলেন, ইহা ঠিক, মহারাজ! আমরা বিদ্যার অহংকারে মত্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া থাকি। পরব্রহ্মের মহিমা বুঝা বড়ই কঠিন। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। শিবনারায়ণ বলিলেন, পরব্রহ্মের নিকট ক্ষমা চাহিও এবং কে কাহাকে ক্ষমা করে বিচার করিয়া গম্ভীরভাবে থাক।

সেইখান হইতে শিবনারায়ণ নদীর ঘাটে যাইয়া জয়পুরী মহাত্মার চেলাকে সং সাজিবার দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। এবং আপনার কেবল মাত্র জীর্ণ চাদরখানি লইয়া সেইখান হইতে অপর এক গ্রামে চলিলেন। পথে দেখিলেন মাঠের মধ্যে রাস্তার ধারে চারিজন ঠগ সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন ইতর পশুর চুল লইয়া বেলের আটা দিয়া দশ বার হাত পরিমাণ জটা প্রস্তুত করিয়া আপন মাথায় ঋষির মত করিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে, সেই জটা সে জলে ভিজাইয়া রাখে। তাহাতে জল সর্ব্বদা থাকে এবং নিংড়াইলে পড়ে—যেরূপ তুলাতে তৈল থাকে। অপর তিন জন তাহাকে শিব বলিয়া অপর লোকের নিকট পরিচয় দেয় এবং বলে যে আমরা তিন জন সর্ব্বদা ইহাঁর চরণ সেবা করি। ইনি স্বয়ং শিবজী কৈলাসে থাকেন কেবল সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে জগত দেখিতে আসিয়াছেন। সেই সময় দুইজন গৃহস্থ পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের একজন কার্য্যবিশেষবশতঃ মাঠে গিয়াছিল এবং অপর একজন সেইখানেই ছিল। তাহাকে ঐ তিন জন ঠগ সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল যে তোমার কপাল ভাল তাই তুমি আমাদিগের দর্শন করিতে পাইয়াছ। আমাদের তোমার উপরে অত্যন্ত দয়া হইয়াছে এই জন্য তোমাকে বলিতেছি যে তুমি একটী কাজ কর। যে জটাধারি মহাত্মা শিবজী বসিয়া থাকেন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর এবং হাত যোড় করিয়া বল যে, হে পরমেশ্বর আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় মুক্ত করুন। এবং আমাকে রাজভোগের দ্রব্য সকল দিন। তিনি যখন তোমাকে জটা হইতে এক বিন্দু গঙ্গা জল দিবেন সেই সময় হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সেই গৃহস্থ, ঠগ সন্ন্যাসীর কথা অনুসারে কার্য্য করিল। এবং জটাধারী তখনই তাহাকে জটা নিংড়াইয়া গঙ্গাজল দিলেন ও বলিলেন, এই যে গঙ্গাজল তোমাকে দিলাম ইহা হইতে সকল ফল প্রাপ্ত হইবে। ধন্য

তোমার ভাগ্য যে আমি স্বয়ং তোমাকে দর্শন দিলাম। কিন্তু তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে এই তিন জন ব্যক্তি যাহারা তোমাকে বলিয়া আমার দর্শন করাইয়া দিয়াছেন উহারা যাহা তোমাকে বলিবে তুমি তাহাই শুনিও। তাহা হইলে তোমার ভাল হইবে। সেই তিন জন ঠগ সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন উঠিয়া গৃহস্থ ব্যক্তিকে ডাকিয়া তফাতে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিল যে, দেখ তোমাকে আমি স্বয়ং শিব দর্শন করাইলাম কিন্তু যদি তোমার নিকট কোন টাকা পয়সা থাকে তাহা হইলে তুমি তোমার ভালর জন্য ঐ টাকা পয়সা সমস্তই শিবের পায়ে ফেলিয়া দাও—সেই টাকা পয়সায় সিদ্ধি গাঁজা দুগ্ধ মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া উহাঁর ভোগ চড়াইব। সেই গৃহস্থ ব্যক্তি বলিল, মহাশয় আমার নিকট এমন বেশী কিছু নাই কেবল বার টাকা এবং চারি আনা পয়সা মাত্র আছে। ঐ ঠগ সন্ন্যাসী উত্তর করিল, যাহা আছে তাহাই ভক্তিপূর্ব্বক চড়াইয়া দাও। অবোধ গৃহস্থ ব্যক্তি না বুঝিয়া চারি আনা পয়সা আপনার নিকটে রাখিয়া ঠগ সন্ন্যাসী সাধুর পায়ে বার টাকা চড়াইয়া দিল। এবং জটাধারী শিব তাঁহার পীট চাপড়াইয়া বলিয়া দিলেন যে যাও তোমার কৈলাস প্রাপ্তি হইবেক। এই কথা বলিয়া তাহারা চারিজন ময়দান হইতে যাইতে লাগিছে এই সময় অপর যে গৃহস্থ ব্যক্তি ময়দানে ছিল সে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে একবার ঐ রূপ ঠগ সন্ন্যাসীর নিকট ঠকিয়াছিল; তাহাতে সন্ন্যাসীদিগকে ঐ স্থান হইতে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মিল। যে ব্যক্তি বারটাকা সন্ন্যাসীদিগকে দিয়াছিল তাহার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, সর্ব্বনাশ করিয়াছ, উহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে, উহারা ঠগ। যিনি শিব তিনি টাকা লইবেন কেন, তাঁহার টাকার কি প্রয়োজন? এখন কেমন করিয়া তোমার বার টাকা বাহির করিব? যাহা হউক যদি গ্রামের মধ্যে যায় তাহা হইলে কোন উপায়ে টাকা বাহির করিতে পারা যাইতে পারে। যদি থানা থাকে তবেই ভাল। সেইখান হইতে ঐ দুইজন গৃহস্থ ব্যক্তি সত্বর আসিয়া ঐ ঠগ সন্ন্যাসীর নিকটে প্রণিপাত করিল এবং হাত জোড় করিয়া বলিল যে, হে কৃপানিধান আপনাকে আমি সেবা করিতে পারিলাম না কারণ আমি পাপী। কিন্তু যদি অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রামের মধ্যে যান তাহা হইলে আমি উত্তমরূপে আপনার সেবা করিব এবং যথাশক্তি বিদায় দিব। আমি অন্যত্র গিয়াছিলাম এই হেতু আমি আপনার সেবা করিতে পারিলাম না।

পালিতা।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্নেহলতা দুই তিন মাস হইল, জীবনের বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু জগৎ বাবু ইহার কিছুই জানেন না। কি করিয়াই বা জানিবেন? গৃহিণী কিম্বা টগর কাহারোই এরূপ অভিমত নহে। তবে নিতান্ত সুশৃঙ্খলযুক্ত বাড়ীতেও ত'মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা ঘটে, সুতরাং কর্ত্রীদিগের এই অনভিমত সত্বেও একদিন জগৎ বাবু এ কথা শুনিতে পাইলেন।

আজ মধ্যাহ্ন ভোজনের পরই জগৎ বাবু তেতালার নূতন ঘরে, তাঁহার খাস মহলে আশ্রয় লইয়াছেন। নামে মহল, কিন্তু আসলে ইহা দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষে বিভক্ত একটি বৃহৎ গৃহ মাত্র। প্রথম কক্ষটি তাঁহার দাতব্য ঔষধাগার, ইহার প্রতি দেয়ালে অন্যূন আটটি করিয়া কাঠের থাক, থাকগুলি ঔষধের সিসিতে ভরা। অন্তর-কক্ষটি তাঁহার পাঠ গৃহ, এখানে কেবল আলমারী ও সেল্‌ফ-বোঝাই রাশি রাশি বিজ্ঞান-পুস্তক। আর অন্য জিনিষের মধ্যে একখানি কৌচ, একটি টেবিল ও দুইখানি চৌকি। টেবিলের সাজ সরঞ্জামের মধ্যেও পুস্তকই প্রধান। তেতালা অন্তর-বাটীরই সামিল, কিন্তু গৃহিণী দৈবাৎ ছাড়া এখানে পদার্পণ করেন না, তিনি বলেন এই হাঁসপাতালে আসিলে তাঁহার গা কেমন করে। আসল কথা, অতগুলা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিত্য নিয়মিত তেতালায় উঠা তাঁহার শরীরের পক্ষে একটু অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ। স্নেহলতা যখন ছিল, সে অনেক সময়— এই ঘরে জগৎ বাবুর কাছে বসিয়া পড়া শুনা গল্পস্বল্প করিত। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল সে গিয়াছে সেই অবধি এ গৃহ নিতান্তই তাঁহার নির্জ্জন বাস।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; সেই স্তব্ধ মধ্যাহ্নের নিঃশ্বাস শব্দের মত দূরে কলের বাঁশি বাজিতেছে। দূরকণ্ঠ দুই একটি পক্ষীর রব সেই বাঁশির শব্দে ঢাকিয়া পড়িয়াছে—কেবল জগৎ বাবুর ঘরের বারান্দার থামের উপরে বসিয়া দুইটি কপোত কপোতী যে প্রেমগীতি গাহিতেছে তাহা যেন এই সুপ্ত মধ্যাহ্নের সুখ-স্বপ্ন রচনা করিতেছে। সাম্যাচারী বৈষম্য-প্রচারী কালের প্রাণে এই সুখ-শান্ত ভাব অসহ্য, তাই জগৎ বাবুর টেবিলের ঘড়িটি ক্রমাগত সমতানে টক টক করিয়া কহিতেছে "এমন দিন রবে না—এ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে।" জগৎ বাবু এ সকল শুনিতেছিলেন কি না জানি না—দূরের অদূরের বাড়ী ঘর, গাছ পালা-আকাশ, ধূমস্তম্ভ শীতের স্নিগ্ধ রৌদ্রে প্রদীপ্ত হইয়া মুক্ত দ্বার পথে অঙ্কিত—তিনি গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেইদিকে চাহিয়াছিলেন।

ধূমস্তম্ভ ধূম উঠিতেছে, কুণ্ডলী বাঁধিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে,—উঠিয়া আবার কুণ্ডলি

খুলিতে খুলিতে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম বাষ্পে পরিণত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া পড়িতেছে।

জগৎ বাবুর গুড়গুড়ির নলোত্থিত ধূমরাশিরও পরিণাম তাহাই, কিন্তু যেমন সকলেরই হইয়া থাকে, তাঁহার দৃষ্টি নিজের প্রতি নহে, তিনি বাহিরের সেই ধূমপুঞ্জের দিকে চাহিয়া। বলা বাহুল্য ধূমের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন কিন্তু ধূম সম্বন্ধে নহে স্নেহলতার সম্বন্ধে।

যাহার যেখানে দরদ সেই খানেই প্রাণ। ধূমের জ্বালা কখনও জগৎ বাবুকে সহ্য করিতে হয় নাই, কিন্তু স্নেহলতা তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। সংসারের নিয়মই এই, যে যাহাকে যত সুখী করিতে পারে—সে তাহাকে তত দুঃখও দিতে পারে।

নির্জ্জনে একাকী উপবিষ্ট হইলেই জগৎ বাবুর প্রায় স্নেহলতাকে মনে পড়ে, তাহার সেই নম্র কোমল অথচ বুদ্ধি-প্রদীপ্ত মধুর মুখ তাহার সেই প্রাণভরা ভক্তির আবেগ আর সেই সঙ্গে তাহার না বলিয়া পলায়ন, তাঁহার আকুল দর্শন-ভিক্ষার উপেক্ষা, আর তাহার লঘু হৃদয়ের অসার মিথ্যা স্নেহ; এই সমস্ত একত্রে তাঁহার হৃদয় তরঙ্গিত করিয়া তুলে; এই দুই বিরোধী ভাবের মধ্যে তিনি কোন মতে সামঞ্জস্য করিতে পারেন না। ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়, অবশেষে একটা অকুল সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া প্রাণের অন্তর প্রাণ হইতে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ উঠিতে থাকে। আজও তাহাই হইতেছিল, ধূমের দিকে চাহিয়া তাঁহায় নয়ন ধূমময় হইয়া উঠিয়াছিল, হৃদয় যন্ত্রণায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তিনি মুখ হইতে গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া, হাতে মাথা রাখিয়া মুমূর্ষুর ন্যায় বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া ছিলেন। খানিক পরে যখন টং টং করিয়া দুইটা বাজিল, তিনি চমকিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর মাথা হইতে হাত তুলিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। ইহার কিছু পরে জীবন আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন "এই যে জীবন, অনেক দিন আসনি, সব ভাল ত?"

জীবন। আজ্ঞা হাঁ। মকদ্দমার জন্য কিছু ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

জগৎ। ন্যায়ের জয় শেষে পড়েই আছে। বিষয় এখন ক'ভাগ হবে?

জীবন। ভাগ করতে বড় কিছু থাকবে না, তবে হিসাবে তিন ভাগ হয় বটে। পরে যার থাকে যার না থাকে।

জগৎ। তোমার, কিশোরীর ও মোহনের?

জীবন। না, জেঠাইমা বিষয়ের ভাগ যদি পান—ত অর্দ্ধেক পাবেন। কিশোরীর ও আমার।

জগৎ। কেন মোহনের কিছু হবে না কেন? তার বিষয়ের অধিকারী, তার স্ত্রী তো বর্ত্তমান।

জীবন। আমাদের আইনে পিতা বর্ত্তমানে যদি পুত্র মরে ত পুত্রে আর বিষয়ের অধিকার বর্ত্তায় না—কাজেই পুত্রবধূ তখন পথের ভিখারী, খোরাক পোষাকেও তখন তাহার দাবী দাওয়া নেই।

জগৎ। কে জানে বাবু, তোমাদের আইন সব কি রকম, বুঝতে পারিনে। বৌ তখন কেউ নয়? কি ভয়ানক! এর ত একটা প্রতিকার করতে চেষ্টা করা উচিত?

জীবন। অন্যায়ের জন্য লড়াই করতে ত আমরা জন্মাইনি। এতে ত আর হিন্দুয়ানীর কোন হানি হচ্ছে না!

জগৎবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,

সে যাহোক আমি ভাবছি আমাদের দেশে এরূপ অবিচার কেন হোল! হিন্দু আইনে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ত যথেষ্ট উদারতা দেখতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে দেখ স্ত্রীধন বলে স্ত্রীলোকের নিজস্ব ধনই এতদিন ছিলনা—আজ দুদিন হয়েছে, স্ত্রীর যা কিছু সমস্তই স্বামীর। এদেশের স্ত্রীধনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার।

জীবন ভ্রুকুটী বদ্ধ করিয়া কহিল, "স্ত্রীধন ত ভারী! দুচার টাকা বা সামান্য সম্পত্তি যা সময়ে সময়ে তারা দান যৌতুক পায়—এই ত স্ত্রীধন! আমাদের দেশের স্ত্রীলোকে যেরূপ পর-মুখ-প্রত্যাশী তাতে তাদের এইটুক অধিকার না দিলে আইনের আইনত্ব থাকে না, এতে হিন্দু জাতির আপনি যতটা উদারতা দেখছেন—আমি তার কিছুই দেখিনে। আর ইংলণ্ডের কথা যা বলছেন ইংলণ্ডে এরূপ স্ত্রীধনের আবশ্যকই নেই। সে দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত নিতান্তই কৃপার পাত্র হয়ে জন্মায় না, বাপের ধনে ছেলেদের মত তাদেরও একটা right আছে। তা পর বিয়ে যদি হলো, স্বামীর ধন ত আছেই। আর যারা নেহাৎ সঙ্গতিহীন, তারাও শিক্ষার গুণে নিজে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম।

জগৎ। ও কথাটা বাবু কি রকম হোল! ইংলণ্ডে ত শুনা যায় বড় ছেলেই সব বিষয় পায়।

জীবন। সে শুধু যাদের entailed property; বংশ পরম্পরায় যাদের রাজা মহারাজ নাম রাখতে হবে। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ আইন তা নয়, বাপ যদি উইল করে কাউকে বঞ্চিত না করে, তাহলে বাপের বিষয়ে ছেলে মেয়ে সকলেরি সমান অধিকার আছে। আর যেখানে বড় ছেলেই আসল বিষয় পায়, সেখানেও মেয়েরা ছেলেদের মত অল্প পরিমাণে কিছু কিছু পেয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের আইনের মত অন্যায় আইন আর নেই, এ থেকে বোঝা যায়—স্ত্রীলোকের প্রতি আমাদের কিরূপ সম্মান!

জগৎ। তোমাদের sentimental স্ত্রী-সম্মানের এতে হানি হতে পারে, কিন্তু আমি ত বাবু এতে আইনের প্রকৃত অবিচার দেখছিনে। আবশ্যক অনুসারেই আইন

ব্যবস্থা। আমাদের দেশের মেয়েদের অবিবাহিত রাখার প্রথা নেই, বিয়ে দিতেই হবে, তাহলেই তারা স্বামীর ধনেই ধনী। এর উপর যদি তারা আবার বাপের বিষয়ও পাবে তাহলে ছেলেদের দশা কি হবে? অবিচারের কথা যদি বল তাহলে এতেই এক পক্ষে অবিচার করা হয়।

জীবন। আপনি একটু বিবেচনা করে দেখলে আর ও কথা বলবেন না। যদি মেয়েমাত্রেই বাপের ধনের অধিকারী হয়, তাহলে একদিকে বোনকে যেমন বিষয়ের ভাগ দিতে হবে অন্য দিকে তেমনি স্ত্রীর বিষয় ঘরে আসবে। হরে দরে সমানই কথা, এতে অবিচার কোন দিকেই নেই। *

জগৎ বাবু গোঁপে তা দিয়া বলিলেন, কথাটা ঠিক বটে!

জীবন। তা আর একবার করে! আমার ত দৃঢ় বিশ্বাস, এই ন্যায় বিচারের উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হলে কেবল স্ত্রীলোকের অবস্থা যে ভাল হবে তা নয় আমরা as a nation উঁচুতে উঠব। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ এই সব নিয়ে আজ কাল যে সমাজে এরূপ দ্বন্দ্ব চলেছে তার অর্থ—আমরাও আজ কাল কতক পরিমাণে বুঝতে আরম্ভ করেছি যে, স্ত্রীজাতির অবস্থাগত উন্নতির উপর জাতিগত উন্নতি নির্ভর করছে। অথচ আইনের এই অন্যায় পার্থক্য যে ঐ উন্নতি পথের একটি বিষম প্রতিবন্ধক তার দিকে কারো দৃষ্টি নেই। আমার ত মনে হয় এ এমন একটি বিষয় যাতে ন্যায়বাদী মাত্রেই তিনি সমাজ সংস্কারক হউন বা সংস্কার-বিরোধীই হউন মত-নির্ব্বিশেষে সমক্ষেত্রে মিত্র ভাবে দাঁড়াতে পারেন।

জগৎ। কি রকম করে তাত বুঝতে পারছিনে?

জীবন। যাঁহারা সমাজ সংস্কারের বিপক্ষ, তাঁহারা বাস্তবিক যে সমাজের অমঙ্গল চান—কিম্বা স্ত্রীজাতির দুঃখই প্রার্থনা করেন তাত আর নয়, তাঁরা যে বাল্য বিবাহের অনুকূল এবং স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রতিদ্বন্দ্বী এর অর্থ তাঁহারা এতেই সমাজের মঙ্গল জ্ঞান করেন, এই ত?

জগৎ। তাত সত্যি—

জীবন। কিন্তু তাঁরা ত দেখতে পাচ্ছেন, তাঁদের ইচ্ছা স্বত্ত্বেও কালের গতিকে বিবাহ কিরূপ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যাদের মেয়ে আছে বিবাহের ভাবনাতে তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু যদি আইনঅনুসারে মেয়েদের পিতৃ সম্পত্তিতে অধিকার থাকে তা হলে কি বিবাহের জন্য তাঁহাদের এত কষ্ট পেতে হয়? এখনকার চেয়ে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা তখন পুরুষের চোখে অনেক বাড়বে, সুতরাং মেয়ের বিয়েও ঢের সহজ হয়ে

---

* ইহা আমাদের নিজের কথা নহে, একজন সহৃদয় উকীল উক্ত আইনের অবিচার প্রতিপন্ন করিয়া যাহা বলেন তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

আসবে। শুধু তাই নয়, তখন বাপমাকে মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য এতটা ভাবতে হবে না, শ্বশুরকুলেও তাদের আদর বাড়বে, মেয়ে বাল-বিধবা হলেও ভাই ভাজ কিম্বা আত্মীয় কুটুম্বের ঝাঁটা লাথির উপর তাকে নির্ভর করতে হবে না—সংসারের অনেক দুঃখ কমে যাবে।

জগৎ বাবু নীরবে গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িলেন—জীবন আবার বলিল "আর যাঁরা বলেন—স্ত্রীশিক্ষার উপর সমাজের মঙ্গল নির্ভর করছে—বাল্য বিবাহ রহিত না হলে জাতিগত উন্নতি অসম্ভব, তাঁরা বিবেচনা করলে দেখতে পাবেন স্ত্রীলোকেরা নিজের জন্মাধিকারে পায়ের জোরে দাঁড়াতে পারলেই প্রকৃত শিক্ষার পথ মুক্ত হবে, সমাজ সংস্কারের প্রকৃত সুফল হবে। স্ত্রী শিক্ষা ও বাল্য বিবাহ উচ্ছেদের একটি অনিবার্য্য ফল বিবাহ-কষ্ট। স্ত্রীলোক শিক্ষিত হলে বিবাহ সম্বন্ধে তাহাদের নিজের মতামত গঠিত হবে, তা উপেক্ষা করে পিতামাতা নিজের সুবিধামত যেমন তেমন পাত্রে তখন কন্যাদান করতে পারবেন না,—কাজেই ইংরাজ সমাজের মত অনেক স্ত্রীলোককে এদেশেও চির কৌমার্য্য বহন করতে হতে পারে। অথচ আমাদের দেশে বিবাহই স্ত্রীলোকের সঙ্গতি, শ্বশুর ঘরই তার আপনার ঘর, প্রকৃত আশ্রয়, সুতরাং কন্যার অবিবাহিত অবস্থায় হঠাৎ পিতার যদি বিনা উইলে মৃত্যু হয়—অথবা প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে কন্যার প্রতি তিনি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ না করেন—তাহলে তাদের কি উপায়! এতে সমাজ সংস্কারের ফলে সুখ বৃদ্ধি না হয়ে দুঃখ বৃদ্ধি হবারই সম্ভাবনা। সুতরাং ন্যায়বাদী মাত্রেরই, সমাজ হিতৈষী মাত্রেরই এর প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত। আমি ত মনে করছি এবার কনগ্রেসে এ কথা উঠাব। দেখা যাক সবাই কি বলেন?

জগৎ। ঠিক বলেছ জীবন, আমিও আগে ভাবতুম, স্ত্রীশিক্ষা সমাজের পক্ষে ভাল, কিন্তু এখন আমার তোমার মত মনে হয় স্ত্রীশিক্ষা-ফিক্ষা কোন কাজের কথা নয়, এতে কেবল অসুখ বাড়ে। আমাদের যা ছিল বেশ ছিল।

জীবন হাসিয়া বলিল—"আপনি দেখছি আমাকে ভুল বুঝেছেন, স্ত্রীশিক্ষা মন্দ এমন কথা আমি বলিনি, কেননা আমার বিশ্বাস অন্য রকম। আমি কেবল বলছি—"

জগৎ। কিন্তু বাপু মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আবশ্যক কি? ভালবাসা দয়া ধর্ম্ম এই সকলেই তাহাদের গৌরব, এই সব নিয়েই তারা থাকুক না, বেশী লেখা পড়া শিখলে বরঞ্চ তাদের স্বাভাবিক ভাবের বিকৃতি ঘটে।

জীবন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠত্বেই যে স্ত্রীজাতির গৌরব তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সুশিক্ষায়, বুদ্ধি বৃত্তির চর্চ্চায় হৃদয়ও কি প্রসারতা লাভ করে না? মিশ নাইটিংগেল মিশ কার্পেন্টার মিশ ম্যানিং প্রভৃতি উদার হৃদয় স্ত্রীলোকের ইংলণ্ডে যে অভ্যুদয় হয়েছে সে কি জাতি-বিস্তৃত-উন্নত শিক্ষার ফল নয়!

জগৎ। ইংলণ্ডের কথা ছেড়ে দাও, সেখানে যেরূপ শিক্ষায় ভাল ফল হবে এখানে ও কি তাই? দেশ কাল পাত্র সব ত বিবেচনা করা চাই। আমি ত দেখছি শিক্ষার গুণে আমাদের দেশের মেয়েদের একটা পৌরুষিক ভাব এসে পড়ছে। মেয়েরা পুরুষ হয়ে দাঁড়ালে ত আর ভাল ফল হয় না?

জীবন। আজ কাল শিক্ষার বিরুদ্ধে ঐ একটা কথা শুনা যায় বটে, অথচ লোকে যে কিসে ঐ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে তার ত কিছু যুক্তি শুনা যায় না!

জগৎ। মেয়েরা আজকাল পরোপকার করবে তাও সভা সমিতি করে, পুরুষের মত কোমর বেঁধে—এসকল কি বাপু! তাদের নামে ঠাট্টা উপহাস শুণতে শুণতে ত প্রাণগেল।

জীবনের আর ধৈর্য্য রহিল না, উত্তপ্ত হইয়া বলিল,—"ভাল কাজে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করবে তা হলে আমাদের জাতীয় মাহাত্ম্য কোথা? সত্যিইত! মেয়েরা ঘরে বসে ঝগড়া করবে পরনিন্দা করবে, তবেই ত তাদের কোমল হৃদয়ের মাধুর্য্য রক্ষা হবে, তা না তারা কিনা পরের জন্য অনাথের জন্য, বিধবার জন্য কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়ে নারী স্বভাব বিরুদ্ধ পৌরুষিক কঠোরতায় সহৃদয়ের হৃদয়ভগ্ন করে! এরূপ কঠোরতা আমাদের পুরুষদের থাকলেও আমরা সৌভাগ্য জ্ঞান করতেম।"

জগৎ। অত রাগ কেন বাপু!

জীবন। মাপ করবেন। এরূপ নিন্দাবাদ অসহ্য হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের মেয়েরা পাঁচজনে মিলে ভাল কাজ করতে উদ্যত, কোথায় দেশের লোকে তাদের উৎসাহ দেবে, তাদের সহায়তা করবে—তারবেলা খোঁজ খবর নেই, নিন্দার বেলাই তাঁরা মস্ত উদার! জানেন মশায় পণ্ডিতা রমাবাই বিধবাশ্রম খুলেছেন তাঁকে সাহায্য করছে আমেরিকাবাসীরা। তবুও আমরা বলি আমাদের দেশের মত সহৃদয়তা অন্য দেশে নাই। হা ভগবান, এ জাতের মঙ্গল আছে?

জগৎ। আচ্ছা বাপু অত কথা কেন? তুমি আমার নামে ১০ টাকা চাঁদা লিখে নিও, তা হলেই ত হোল? কিন্তু বাপু একটি কথা, তুমি কি মনে কর—এরূপ বিধবাশ্রম সেকালের আদর্শ বৈধব্য ফেরাতে পারবে?

জীবন। কাল কখনো ফেরে না; জীবনের Ideal চিরদিন সমান থাকে না, আজ আমরা যাকে ভাল বলি কাল তা আমাদের নিকট মন্দ, সুতরাং আপনি যদি সেকালের আদর্শ বৈধব্য জীবন একালে দেখতে চান ত সম্ভবত আপনার সে আশা পূর্ণ নাও হতে পারে, তবে তাই বলে কি এরূপ আশ্রমের উপকারিতা নেই? কত অনাথা এখানে আশ্রয় লাভ করে ধর্ম্ম পথে থেকে সুখে জীবনযাপন করতে পারে বলুন দেখি।

জগৎ। আমাদের দেশের অনাথারা যে নেহাৎ নিরাশ্রিত তাত বাবু বলতে পার না—যার কেউ নেই—জ্ঞাতি কুটুম্বরাও তাকে দুমুটো ভাত দেয়—

জীবন। অনেক ঝাঁটা লাথি দিয়ে! কারো অদৃষ্টে তাতেও মেলে না, অন্ন কষ্টে অনেকে আত্মহত্যাও করে থাকে।

জগৎ। গরীব দুঃখীদের ঘরে এমনতর হতে পারে—ভদ্রলোকের ঘরে হয় না।

জীবন। আপনি এ কথা কি করে যে বলেন বুঝতে পারিনে। কেন, বৌদিদি—তিনিত ভদ্র ঘরের মেয়ে! তাঁর কষ্ট দেখলে মনে হয় এত কষ্ট বুঝি আর সংসারে নেই! যদি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত এমন কোন আশ্রম থাকত যেখানে তিনি পরোপকারে জীবন কাটাতে পারতেন, তাহলে কি আজ তাঁর এরূপ দুর্দ্দশা হোত? আর মনে করে দেখুন তিনিই কি এরূপ কষ্ট একলা পাচ্ছেন? এমন ত অনেক বিধবা আছে যার কষ্ট আরো বেশী।

স্নেহের নাম শুনিয়া জগৎ বাবু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, কিছু পরে দম লইয়া বলিলেন—"সম্প্রতি কি তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

জীবন। দেখা হয়েছে? আপনি কি জানেন না, কয় মাস হতে তিনি আমাদের বাড়ীতে?

জগৎ। আমি কি করে জানব? কত চিঠি লিখেছি একখানির উত্তর পর্য্যন্ত পাইনি, দেখা করতে গিয়ে ফিরে এসেছি।

জগৎ বাবুর চক্ষু আবার জল পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বজ্রাঘাতের কষ্ট যখন মনে পড়ে তখনি যেন বুক ফাটিয়া ওঠে। জীবন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সেকি কথা! আমিত জানি তিনিই আপনাকে চিঠি লিখিয়া উত্তর পান নাই, তাঁহার একবার খোঁজ খবর পর্য্যন্ত আপনারা করেন নাই। আমি দেখিতেছি এ সমস্তই কিশোরীর কীর্ত্তি।"

জগৎ বাবু বলিলেন "তা শ্বশুর বাড়ী থেকে তোমার বাড়ী এল কেন?"

জীবন। কষ্ট সহ্য করবারও ত একটা সীমা আছে। তা ছাড়া বাইরে গুজব প্রথমে নাকি কিশোরী ভেবেছিল বৌদিদি বিষয়ের ভাগ পাবেন—তাপর যখন"—

জগৎ বাবু শেষের কথা কিছু শুনিলেন না, তাঁহার কাণে বাজিতেছিল "কষ্ট সহ্য করিবারও ত একটা সীমা আছে"। তাহা হইলে স্নেহ নিতান্ত কষ্টে পড়িয়াই তাঁহার গৃহ ছাড়িয়াছে, তাঁহার সন্দেহ তবে সত্য। তিনি জীবনের কথার মাঝখানে আপন মনেই যেন বলিয়া উঠিলেন—অসহ্য কষ্টে সে চলিয়া গেছে? সত্যই কি চারু তাহার প্রতি কোন রূপ অন্যায়াচরণ করিয়াছিল?

জীবন নীরব হইয়া রহিল—জগৎ বাবুর আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। ক্রোধে, করুণায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "জীবন তুমি যাও, এখনি গিয়া স্নেহলতাকে পাঠাইয়া দেও তাহাকে দেখিয়া একবার আমি ঠাণ্ডা হই। এখানে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, তাই আমি নিজে যাইতে পারিতেছি না।"

জীবনের বিশ্বাস জগৎ বাবুর বাড়ী আসিতে পারিলেই স্নেহ যথার্থ সুখ শান্তি লাভ করিবে। সুতরাং জগৎ বাবুর কথায় সে নিতান্তই আহ্লাদিত হইয়া বাটী যাত্রা করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চারু ভাবিয়াছিল—স্নেহ নহিলে তাহার জীবন বৃথা হইবে, চির জীবনে আর কখনো সে সুখী হইতে পারিবে না, কিন্তু স্নেহ ছাড়াও সে বেশ সুখী হইয়াছে, বিবাহ করিয়া সে এখন নূতন আনন্দে ভরপুর।

স্নেহলতার কথা, তাহার যে কখনো মনে পড়ে না তাহা নহে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভের পর পূর্ব্ব উন্মত্ততার স্মৃতির মত, জাগিবার পর দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত তাহাতে সে শিহরিয়া উঠে। কি সর্ব্বনাশই সে করিতে বসিয়াছিল। স্নেহকে বিবাহ করিলে সমাজ ভ্রষ্ট, অর্থ হীন, গৃহহীন, সকলের উপহাসাস্পদ, হেয় জীবন বহন করিয়া তাহাকে বাঁচিয়া মৃত্যু ভোগ করিতে হইত। আর এই যন্ত্রণা, এত আত্ম ত্যাগ কাহার জন্য? সেই নিষ্ঠুর, বিশ্বাস-ঘাতিনী হৃদয়-হীনা পাষাণীর জন্য? সেও তাহার এই আত্ম-বিসর্জ্জনের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া হয়ত দুদিন না যাইতেই বলিত—আমি কেমন সুখে ছিলাম, তুমি কেন আমাকে বিবাহ করিলে?

স্নেহলতার কথা মনে পড়িলেই এইরূপ পূর্ব্ব সম্ভাবিত বিপদের স্মৃতিতে চারু জরজর হইয়া উঠে—এবং ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে ভাবিয়া শান্তিতে নিশ্বাস ফেলিয়া স্নেহকে মনে মনে অভিসম্পাৎ করিতে করিতে স্ত্রীকে প্রাণ ভরিয়া আদর করে। চারুর হৃদয়ের এইরূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতেও সে পরিবর্ত্তিত। সে এখন ঘোরতর আর্য্য। সমাজ সংস্কারের নামে সে জ্বলিয়া উঠে। হিন্দুয়ানীর পক্ষে প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের হিতসাধনে তাহার বিরাম নাই। তাহার সমস্ত প্রবন্ধেরই প্রধান মর্ম্ম এই, বিধবা বিবাহের মত অনার্য্য, গর্হিত কার্য্য আর নাই, ইহার পক্ষে যাহার মুখ হইতে একটি বাক্য নির্গত হয়—তাহাকেও সমাজচ্যুত করা উচিত। তবে অধিকাংশ প্রবন্ধই সম্পাদকগণ ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যর্পণ করেন, কিন্তু তাহাতে তাহার দুঃখ নাই কেননা, পত্নী প্রিয়তমা সেই প্রবন্ধগুলি বার বার পাঠ করিয়া তাহার ধর্ম্ম বুদ্ধি ও লেখনী শক্তির বিশেষ প্রশংসা করেন। সুতরাং চারুর লেখা সার্থক।

আজ মধ্যাহ্নে স্বামী স্ত্রীতে গল্প হইতেছিল। অনেক সময় দুজনের মধ্যে স্নেহলতার গল্পই হইয়া থাকে, চারু তাহাকে স্নেহলতার অনেক গল্প করিয়াছে তবে সব নহে, যতটা বলিলে অবশ্য ক্ষতি নাই, অর্থাৎ নিজের দোষটুকু বাদ দিয়া। আজ প্রিয়তমা বলিতেছিল সম্প্রতি চারুর ডেস্কে তাহার পুরাতন কবিতা খুঁজিতে গিয়া প্রিয়তমা স্নেহের একখানি পত্র পাইয়াছে, তাহা লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আজ মহা গুলজার, স্ত্রী সেই চিঠি হইতে নানা রূপ তর্ক যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে উদ্যত স্নেহ এখনো তাহাকে

ভাল বাসে, এত ভালবাসা দুদিনে যাইবার নহে। চারু অবশ্য বিরুদ্ধ পক্ষ, কিন্তু এখানে তাহার জিতিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রিয়তমা চিঠিখানি পুনঃ পুনঃ পড়িতেছে, তাহার টীকা ভাষ্য করিতেছে, আর বলিতেছে—"তুমি বল্লেই কি না শুনব? অবিশ্যি সে ভালবাসে"। চারু নিতান্ত না পারিয়া অবশেষে বলিল—"যো হুকুম মহারাণি, এখন চিঠিখানি কি রাখবেন, না সমস্ত দিন ঐ কথাই চলবে।"

প্রিয়তমা চিঠিখানি স্বামীর পকেটে ফেলিয়া কহিল, "এই রইল। এতেও বুঝি অন্যের চোখ সয় না? তা না স'ক্ আমার কিন্তু বাবু তাকে একবার ভারী দেখতে ইচ্ছা করে—শুনেছি ঠাকুরঝির বাড়ী এসেছে, যাব একদিন?"

চারু বলিল, "দেখে আর কি হবে?"

প্রিয়। দেখব কেমন রূপ খানা—অতটা যে হাবু ডুবু খেয়েছিলে—দেখিনা—

চারু। হ্যাঁ হাবু ডুবু! তাহলে বুঝি?

প্রিয়। না হয় সেই খেয়েছিল। আমার ভারী জানতে ইচ্ছা করে তোমাকে এখন দেখলে তার না জানি কিরূপ মনের ভাব হয়।

চারু। কি আবার হবে? আমি বলছি সে আমাকে ভাল বাসত না?

প্রিয়। না তা কি বাসত? তোমরা ত মেয়েদের মন বোঝ না।

চারু। তাহলে সে যাবে কেন?

প্রিয়। তার অন্য কারণ বুঝি আর থাকতে পার না! (প্রিয় টগরের নিকট শুনিয়াছিল মাতা কন্যায় মিলিয়া কিরূপ ফন্দীতে তাহাকে বাড়ী ছাড়া করেন।)

চারু। তুমি যাই বল, আমি জানি সে তোমাকে ভাল বাসত।

চারু হাসিয়া তাহার মুক্ত কেশ রাশি টানিয়া বলিল "আচ্ছা বাবু বেশ! তাকে দেখলে ত তোমার হিংসা হবে না!"

প্রিয়। হিংসা কেন হবে! এখন যদি তুমি তাকে ভাল বাসতে তাহলে বটে হিংসা হোত। এখন তার জন্য মায়াই হয়।

চারু। মায়া কেন?

প্রিয়। মায়া কেন? তুমি ত বেশ বে থা করে সুখে আছ—আর সে বেচারা হয়ত এখনো তোমার জন্য কষ্ট পাচ্ছে।

এই ঔদার্যে চারু একটু বিস্মিত হইল, এরূপ অবস্থায় তাহার এ উদারতাটুকুর উদ্রেক হইত কিনা সন্দেহ। সে প্রশংসা নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—"তাই ত! সে আমার জন্য মরে রয়েছে!"

প্রিয়। আবার ঐ কথা! ঐত তোমার দোষ! কিছুতেই যদি তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারি—যে সে তোমাকে ভাল বাসত!

চারু। আচ্ছা বলত সে কি তোমাকে মনের কথা বলতে গিয়েছিল?

প্রিয়। এ চিঠিটা কি! তাদের মনের কথা না? তাছাড়া ঠাকুরঝির কাছেও শুনেছি।

চারু। ওদের ও ভুল বিশ্বাস।

প্রিয়। জগৎ শুদ্ধ লোকের ভুল আর উনিই ঠিক, মরে যাই আর কি? আমি বলছি তোমাকে ভালবেসেছিল। তোমাকে দেখলে নাকি কেউ না ভালবেসে থাকতে পারে?

এরূপ যুক্তির উত্তর নাই, সুতরাং চারু আর একবার হার মানিয়া বলিল—"আচ্ছা বাবু, তোমার স্বামীর প্রেমে সকলেই পড়ে, হোল!"

প্রিয় আহ্লাদে হাসিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টিত করিয়া ঠাট্টাচ্ছলে আস্তে আস্তে গাহিল—

"এমনে কেমনে রব না দেখে তাহার রে,
গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে,
শব্দে চমকি উঠি দুরু দুরু হিয়া
পরাণ যাহারে চায় বিধি না মিলায় রে!"

এক দিন অনেক কষ্টে লজ্জা ভাঙ্গাইয়া চারু তাহাকে গান গাহাইয়াছিল, এখন আর তাহার মুখ বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। গান শেষ হইলে চারু তাহার গাল টিপিয়া বলিল "এই বুঝি! আমি কি তার জন্য দিন গুণছি নাকি?"

প্রিয়। তুমি না গোণ সেত গুণছে?

চারু। আচ্ছা শুক, তুমি আর একটা গাও—

প্রিয়। না গাইব না।

চারু। স্বামী আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

প্রিয়। কে বলে?

চারু। সর্ব্ব শাস্ত্র।

প্রিয়। শাস্ত্র ভুল। স্ত্রী আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। দেখবে কোনটা ঠিক?

চারু তাহাকে আদর করিয়া কহিল—"না আমি দেখতে চাইনে, মেনে নিলুম, তুমিই আমার চতুর্ব্বেদ।"

এই সময় দ্বার দেশ হইতে দাসী কহিল—'দাদা বাবু, কর্ত্তা বাবু তোমাকে বাইরে ডাকছেন, হরে ডাকতে এসেছে—"

বুদ্ধিবিকাশ।

ইন্দ্রিয়াণি পরণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং॥

ভগবদ্গীতা।

"স্থূল দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা সূক্ষ্ম মন, মন অপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি, বুদ্ধির পর যিনি, তিনিই জীবের আশ্রয়নীয়। এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আত্মতত্ত্বকে জ্ঞানবলে আশ্রয় করিয়া, হে মহাবাহো! দুরাসদ রাগদ্বেষ রূপ শত্রুকে জয় কর।"

"বিশ্ব"! ভাষার কি অসীম মহিমা! কি অপরিসীম শক্তি! কি বিশাল মহান্ ব্যাপ্তি! কি অপার অতল অনন্ত পরিধি! কি অচিন্ত ভাব! কি জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতিভা! এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ কথায় রবি, শশি, তারা আছে; স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল আছে; শতসহস্র সৌরজগৎ আছে; জড় অজড়, স্থাবর জঙ্গম, জীব অজীব, শক্তি অশক্তি, প্রকৃতি পুরুষ আছে; দেহ, চৈতন্য, মন, প্রাণ, আত্মা, পরমাত্মা আছে; অণু, পরমাণু, জীবাণু, বায়ু, বৃষ্টি, মেঘ, তরু, মেরু, সমুদ্র, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, নর, বানর, দেবতা, দৈত্য, মর, অমর আছে; অহং, নাহং, কাম, ক্রোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা, প্রেম, অনুরাগ, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আচার, ব্যবহার, ভাব, ভক্তি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম আছে; যাহা হইয়াছে তাহা সকলি আছে; যাহা হইতেছে তাহা তো আছেই, যাহা হইবে তাহাও আছে। সময়ের অপার অনন্ত, নীরব নিঃস্পন্দ, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ স্রোত আকাশের অস্তি-নাস্তি অগাধ অসীম উদরে জড়াইয়া, ছড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, খেলিয়া, ফেলিয়া, লুফিয়া, ছুঁড়িয়া, কাঁদায়ে, হাসায়ে, মাতায়ে, ভাসায়ে, সর্ব্বপালক, সর্ব্বশাসক, সর্ব্বনাশকের মত নিয়ত বীরাট ভাবে ছুটিতেছে; কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছে, কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, জানে নাই; বুঝে নাই, কাহারও দেখিবার, শুনিবার, জানিবার, বুঝিবার শক্তিও নাই; ছুটিতেছে বা ভীম আবর্ত্তনে ঘুরিতেছে তাহাও অনুমান করিবার সঙ্গতি নাই; অথচ অস্থির, চঞ্চল, ভীষণ বেগবান্, তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই; জড়শক্তিসংস্থান রূপ নিত্য বেলাভূমির মধ্যে একদিক্ উৎখাত করিয়া অপর দিক্ স্তূপসৌন্দর্য্যে সাজাইতেছে: সকলই অব্যয়, অবিনশ্বর—রূপান্তর, স্থানান্তর, ভাবান্তর হইতেছে মাত্র—কাহারও লয় নাই, ক্ষয় নাই, নির্ব্বাণ নাই, শুদ্ধ পরিবর্ত্তন আছে; কিন্তু সেই অনন্ত অপার তাড়নে, সেই অপরিমেয় সর্ব্বব্যাপী আলো-

ড়নে, সেই প্রলয়-তুফান-সঞ্চালনে এমন একটী অণুও নাই যাহার নিয়ম, নিয়তি, সম্বন্ধ, পারম্পার্য্য সুস্পষ্ট, সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে দেখা না যায়; এই অশেষ লীলাময়, কায়াময়, ছায়াময়, মায়াময় মহাব্যাপার সেই দুইটী সামান্য অক্ষরে বিশদ ভাবে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

অনন্ত অসীম আকাশের এক প্রান্তে, সরাবৎ ধরার এক কোণে, তুচ্ছ তৃণতলে বসিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্য আবহমানকাল প্রত্যক্ষের বালুকণা আহরণ করিয়া আপনার চিত্তসৌন্দর্য্যে পর পর স্তরে স্তরে বিজ্ঞান বন্ধনে সাজাইয়া আসিতেছে। এইরূপে দিন দিন তাহার যতই জ্ঞান সঞ্চয় হইতে লাগিল হৃদয়ের গভীর পিপাসাও ততই অন্তরের অন্তস্তল শুষ্ক করিয়া নিদারুণ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। 'কেন' র বেত্রাঘাতে তাহার প্রাণের প্রাণ প্রতি নিয়তই হা হা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। শান্তির জন্য সে সম্মুখে যাহা পায় তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায়। কিছুতেই কিছু হইল না। ফলের অনুষ্ঠানেরও লেশমাত্র ত্রুটী নাই। কিন্তু বিদ্যাবলে, বুদ্ধিবলে, জ্ঞানবলে, বিজ্ঞানবলে, অনুমানবলে, কল্পনাবলে সে এই আব্রহ্ম বিশ্বপ্রহেলিকার কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিল না। তাহার সে সান্নিপাতিক পিপাসাও ক্রমশঃ ঘোরতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অপিচ কল্পনাবলে, অনুমানবলে বিজ্ঞানের সোপানাবলি আরোহণ করত নিখিল সংসারের স্তরে স্তরে কল্পে কল্পে বিচরণ করিয়া পর পর ধারাবাহিক জগৎ হইতে জগদান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার হৃদয়ের এতদূর বেগ ও প্রশস্তি জন্মিল যে জ্ঞানের গণ্ডী মধ্যে আর তাহার প্রবৃত্তি নিচয়ের সংকুলান হইল না। এখন আর প্রত্যক্ষের রেখায়, জ্ঞানের স্তরে, বিজ্ঞানের সূত্রে, নিয়মের বন্ধনে, সাধারণ্যের প্রশস্তমার্গে, সত্যের ক্রোড়ে, তত্ত্বের আনন্দ হিল্লোলে তাহার সুখ শান্তি রহিল না। সে সাগর-শোষণী পিপাসা জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইল না—বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইল না। তাহার শান্তি কাব্যে নাই—দর্শনে নাই—ন্যায়ে নাই—অলঙ্কারে নাই—বিজ্ঞানের বিজ্ঞানেও নাই। এবার সে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও কাতর হইয়া উঠিল। শুষ্ক কণ্ঠ, শুষ্ক তালু, শুষ্ক চর্ম্ম, অবসন্ন শরীর, ওষ্ঠাগত প্রাণ! সে ক্রমশঃ বিবশ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তখন নিরুপায়, নিঃসহায়, নিরাশ, নির্ভরসা হইয়া আপনার প্রত্যক্ষের ক্ষুদ্র বেদিতে অধ্যাসিত হইয়া মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইল। সংসার প্রপঞ্চের ধ্যানে তন্ময়—অচল—অটল; ভবের ভাবে বিভোর; সতত প্রেম ও ভক্তি সুধাপানে সচ্চিদানন্দ প্রকৃতি। যোগবলে ক্রমে সংসারের আঁধার কক্ষ সকল আলোকিত—জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। এখন তাহার আর বহির্জগতে দৃষ্টি নাই; অন্তর্জগতে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট রহিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নূতন ধ্যান, নূতন জ্ঞান, নূতন যোগ, নূতন সাধনা, নূতন সিদ্ধি। সহসা তাহার আততায়ী হৃদয়ে স্বর্গ হইতে সুধা বর্ষণ হইল। এবার সে দিব্যচক্ষু পাইল। এই মায়া প্রপঞ্চে, পরিবর্ত্তন তুফানে, অনন্ত লীলায় সার, সত্য, সৎ, সনাতন, সারাৎসার

ভাব উদয় হইল। তখন সে ধর্ম্মের বিপুল ধ্বজা উড়াইয়া আপনাকে এ বিপুল সংসারে তন্ময় করিয়া তার স্বরে 'বিশ্ব' বলিয়া জীবন স্বার্থক করিল। যে দিন ক্ষুদ্র, কীটাণু-কীটবৎ ক্ষুদ্র, মনুষ্যের বিশাল বিশ্বোদর বক্ষে এই অনন্ত বিশ্বরূপ কার্য্যকারণমালা বিরাট সৌন্দর্য্য একাত্মিক—এক প্রকৃতিগত—এক ভাবাপন্ন ভাব অনুভূত হইল সেই দিনে মনুষ্যের মনুষ্যত্বের প্রারম্ভ—সেই দিন তাহার প্রকৃত রাজটিকা—সেই দিন সে ধরণীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত হইল।

গীতার বিশ্বরূপ একটী মহাকাব্য। ভাষাসমুদ্রে ইহার তুলনা নাই; অতুল—অনুপম। সে সৌন্দর্য্য অপরিমেয়, অপার, অতল, অগাধ; ভাবিয়া দেখিলে আনন্দে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে; ভয়ে, বিস্ময়ে, ভাবে, ভক্তিতে কণ্ঠরোধ হইয়া আইসে; কল্পনা অবসন্ন হইয়া পড়ে; মন সংকোচিত হইয়া যায়; প্রাণের প্রাণ আত্মহারা হইয়া গদ্গদ্ স্বরে কি বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলে; মস্তক স্বতঃই বিনত হইয়া আইসে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ মহাকাব্যে কাব্য নাই, অথচ রসরাশি জলন্ত, জীবন্ত ও জাগ্রত রহিয়াছে; অন্যের কথা কি, ইহাতে যাহা আছে, স্বয়ং বাল্মীকিতে তাহার এক কণাও নাই; আর কোথাও নাই—কাহারও নাই। ইহাতে বেদ আছে, বেদাঙ্গ আছে, উপনিষদ্ আছে, দর্শন আছে, শ্রুতি আছে, স্মৃতি আছে, ন্যায় আছে, অলঙ্কার আছে, জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে, সত্য আছে, তত্ত্ব আছে, নীতি আছে, ধর্ম্ম আছে; বস্তুতঃ, ইহাতে বিপুল বিশ্ব সংসার আছে; যাহা কিছু আছে তাহা আছে, যাহা কিছু নাই তাহাও আছে; অনন্ত, অচিন্ত, অসীম, অপার; আলোকময়, আঁধারময়, জড়ময়, শক্তিময়, চিন্ময়, আত্মাময়, ভাবময়, ভক্তিময়, চক্ষুময়, কর্ণময়, প্রাণময়, মনোময়, রূপময়, রসময়, গন্ধময়, শব্দময়, ভয়ময়, বিস্ময়ময়, সুখময়, শান্তিময়, আমিময়, তুমিময়; পূর্ণ, নিত্য, সৎ, সত্য, অমেয়, অব্যয়। এই দ্বৈত-অদ্বৈতবাদই আর্য্যধর্ম্মের প্রাণ—আর্য্যপ্রতিভার পরিচয়—আর্য্যবিদ্যার অক্ষয় কীর্ত্তি।

বিশ্বের এবম্বিধ সশরীরী সজীব বিরাট ভাব দর্শনের চরমকল্প। যুগযুগান্তর মনুষ্য অনন্ত রূপের সংশ্লেষ বিশ্লেষ করিয়া আরোহ অবরোহ প্রণালীর সীমান্তে এই সাধারণ সমন্বিত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। এ বিশ্বরূপ একান্তমূর্ত্তি কল্প কল্পান্তরের ধ্যানের ও সমাধির ফল। এ অনন্ত হিরণ্ময় রত্নমালা মনুষ্যের চিন্তা ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার—তাহার অমূল্য মনের অমূল্য মূল্য। কিন্তু ভাষার অপ্রতিহত সাহায্যে ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া মনুষ্যের মন ক্রমে আবার মোহান্ধ হইয়া পড়িল। আরও তাহার ঊর্দ্ধে উঠিবার প্রয়াস বাড়িল। সে বিশ্বব্যাপারের রহস্য ভেদ করিয়া অন্তস্তলে যাইবার যত্ন করিতে লাগিল। কথার ছটায়, শব্দের পারিপাট্যে ক্রমে সত্যে দৃষ্টি হারাইতে লাগিল। নিখিল জগতের আদি অন্ত বুঝিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত এবং সেই অসাধ্য সাধনে নিবেশিত থাকিয়া কথার কথাকে সত্য ভাবিয়া আদ্যন্ত বুঝিয়াছি বলিয়া মহা মাতিয়া উঠিল।

বস্তু হইতে অবস্তুতে, দেহ হইতে চৈতন্যে উঠিয়াছে ভাবিয়া সত্তা, স্বরূপ, তন্মাত্র লইয়া কথাসরিৎসাগরে লীলা করিতে লাগিল। বস্তুতঃ বিশ্বের আদি অন্ত আমাদের চির-দিনই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত থাকিবে। এ অনন্ত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের কয়েকটী গ্রন্থিমাত্র আমাদের কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্তাধীন হইতে পারে এবং সকলগুলি হইলেও প্রথম ও শেষ গ্রন্থটী চির আঁধারে লুক্কায়িত থাকিবে। গীতায় একথা স্পষ্টাক্ষরে আছে। শাক্যসিংহ, ইসা, মুসা, চৈতন্য প্রভৃতি দিক্‌পালগণের শিক্ষার ও এই স্থূল তাৎপর্য্য। ইদানীন্তন বিজ্ঞানপ্রবর কোম্‌ত, ডারিণ, স্পেন্‌সর, মিল প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতেরও এই ভিত্তি-ভূমি। ফলে আদি, অন্ত, মূল, স্বরূপ, সত্বা, প্রভৃতি লইয়া যুগযুগান্তর হইতে মহা বাদ বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। এখনও অনেকে তাহা লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আবহমান কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যাহার বিন্দু বিসর্গও উপলব্ধি হয় নাই, এবং যাহা নিরূপণ করা মনুষ্য অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক বুদ্ধিজীবীরও সঙ্গতি নাই, তাহাকে অভেদ্যরহস্য-প্রতিমা স্বরূপ আঁধার সমুদ্রে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বিশ্বের আদি, মূল, উৎপত্তি, প্রভৃতি লইয়া যে কয়েকটী মত প্রচলিত আছে তন্মধ্যে চারিটী প্রধান। বলিতে কি, সে চারিটীই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও যুক্তিসঙ্গত হইলেও এক-বারে নির্দ্দোষ নহে। ইহার কারণ অনয়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। জ্ঞানাতীত ধ্যানাতীত, চিন্তাতীত, সাধ্যাতীত বিষয়ের অনুধাবন করার ফল নিষ্ফল মাত্র। অসাধ্য সাধনে বিদ্যা, বুদ্ধি, ন্যায়, যুক্তি, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি যতই সমাবেশ, করা যায়, ততই চিন্তার অগম্য হইয়া পড়ে। সুতরাং মীমাংসা করা দূরের কথা, মানুষ আপনি আপনার শিল্পনৈপুণ্যে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত তন্তুকীটের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ বলেন বিশ্বের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ইহা এইরূপই আছে—আপনি আছে, সুতরাং আদি অন্ত নাই; এইরূপই চলিয়া আসিতেছে ও এই রূপই চলিবে। কেহ বলেন ইহা স্বোদ্ভূত—আপনি উৎপন্ন হইয়াছে, লয় হইবে, কি না, জানি না, বা আপনিই নির্ব্বাণ হইবে; ইহা কাহারও সাপেক্ষ নহে; ইহার কার্য্যকারণ ইহাতেই একাত্মিক ভাবে বিরাজমান। কেহ বলেন বিশ্ব সৃষ্টি ব্যাপারমাত্র, কোন বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারায় ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ বলেন ইহা দৃশ্যমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে এবং পর পর ক্রমে ক্রমে অবস্থান্তরে পর্য্যবসিত হইতেছে ও হইবে। ইহার আদি অবস্থা এ অবস্থা নহে, আর এ অবস্থাও ক্রমবিকাশের ফল মাত্র। এই চারিটী মতের সংক্ষেপতঃ কয়েকটী দোষ আছে।

প্রথমতঃ, আপনি আছে বলায় আমাদের কোন ও জ্ঞানবৃদ্ধি নাই এবং মনের পরিতৃপ্তিও হয় না। বস্তুতঃ আমাদের ধারণায় আপনি থাকার কোন আভাস বা নিদর্শন নাই; সুতরাং ইহা বিশ্বাসবিরুদ্ধ। বরং অশেষলীলাময় সংসারে আমরা কখন কিছুই একাবস্থায় দেখিতে পাইনাই, প্রতি নিয়তই পরিবর্ত্তন আমাদের নয়ন পথে পড়িয়া

রহিয়াছে, সুতরাং কোন বস্তুই তদবস্থ নাই ও থাকিতে পারে না, এইটীই আমাদের স্থির ধারণা ও বিশ্বাস। বিশ্বসংসারে পরিবর্ত্তন ধরিলে স্বতঃই পরিবর্ত্তনের কারণ আসিয়া পড়ে। সুতরাং বিশ্ব আপনি আছে বলা যায় না। যদি বল ইহা আপনিই আবহমান কাল এইরূপই পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে আর ও দুইটী কথা স্বতঃই উঠিতে পারে। কাহার পরিবর্ত্তন এবং কিসের জন্য পরিবর্ত্তন? এই দুই প্রশ্নের অন্তস্তলে আবার ঐ পূর্ব্ব সমস্যা আসিয়া পড়িল। একটী সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া তদ্রূপ অভেদ্য দুইটী সমস্যা উপস্থিত হইল। পুনশ্চ যাহা আপনি আছে তাহার মূল নাই—আদি নাই—সৃষ্টি নাই—আবশ্যক নাই, সুতরাং আদি কারণও নাই—উৎপত্তিও নাই। তবে আর ইহাতে উৎপত্তির মীমাংসা হইল কই? আদির অন্বেষণে দিশা হারাইয়া ঘোর বিপাকে পড়িয়া 'আদি নাই' বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়ায় ফল কি? 'আদি নাই' বলায় মনের পূর্ব্বগতির সম্বরণ হইতেছে কই? যদি আদি অনুসরণ পিপাসা মানুষের মনের অবস্থাগত লক্ষণ হয়, তবে নাই বলায় কি তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে? যে বেগে মন সেই দিকে ধাবিত হইয়াছিল এই নাস্তিক-বাদে তাহার প্রতিনিবৃত্তি হইতে পারে না। অপিচ আদি নাই বলিবার আমার সঙ্গতি কি? যাহা আছে তাহা পরে কি হইবে? যদি লোপ পায়—ধ্বংস হয়, তাহা হইতে আবার আপনি-পূর্ব্বে-এইরূপ-ছিল-না ভাব স্বতঃই মনে আসিবে! অন্ত থাকিলে আদি স্বতঃসিদ্ধ; ফলে 'অন্ত নাই' বলায় আদি নাই মীমাংসাও হয় না। একটী প্রশ্নের মীমাংসায় কয়েকটী বিষম গূঢ়তম প্রশ্নের উদয় হইল। যদি বল এমনি থাকিবে। তাহাও আমাদের জ্ঞান ও যুক্তির বহির্ভূত। বিজ্ঞান পরিবর্ত্তন কল্প বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। আমাদের প্রত্যক্ষে পরিবর্ত্তন, মনে পরিবর্ত্তন, ভাবে পরিবর্ত্তন, চিন্তায় পরিবর্ত্তন রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন রহস্যরাশিতে আমরা পরি-বেষ্টিত। এক্ষণে এইরূপ থাকিবে বলা অপ্রশস্ত। পুনশ্চ পরিবর্ত্তিত হইবে বলায় পরিবর্ত্তন কারণ স্বতঃই আসিয়া পড়ে; সেই কারণ আদিকারণ না হয় কেন? প্রত্যুত যদি বিশ্বসংসার—অনন্তপরিবর্ত্তনশীল, অশেষমায়াময় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এই প্রকার চিরকালই আছে বলা যায়, তাহা হইলে কাল অনন্তত্রয়ে বিভক্ত করা হইতেছে, অতীত অনন্ত, বর্ত্তমান অনন্ত ও ভবিষ্যৎ অনন্ত। যাহা বিভক্ত হইল তাহা আর অনন্ত কোথা? "To conceive existence through infinite past time, implies the conception of infinite past time, which is an impossibility." * আবার যাহা এখন আছে তাহা পূর্ব্বে ছিল একথা বলায় বিশেষ কি জ্ঞান লাভ হইল? তবে পূর্ব্বাবস্থা পরিণতিবাদের মত পরপর অনুধাবন করিলেও কতকটা জ্ঞানবৃদ্ধি হইত বটে; কিন্তু এ প্রকার অসার, তত্ত্বশূন্য, চিন্তাশূন্য, বিজ্ঞানশূন্য

* হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সর।

কথার কথায় কোন লভ্যই নাই। বরং এপ্রকার বাক্যব্যয়ে জ্ঞানের হানি আছে। আস্তিকেরা মনোবেগে যাহার অনুগমন করিয়া আপনাদের মত সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহাতে শুদ্ধ কয়েকটী 'না' বলিয়া সে মতের সুবিশাল প্রাসাদ ভূমিশায়ী করিবার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে মাত্র। যাহা আছে তাহা ছিল বলায় সমস্যাটী সময়ের অঙ্কান্তরে পরিচালিত করা হইল মাত্র—কিছুই মীমাংসা করা হইল না। শতরঞ্চের অশ্বের ন্যায় যুগ যুগ করিয়া সময়ের কক্ষে কক্ষে অস্তিত্ব চালনায় কোন ফলই নাই। ইহাতে জ্ঞানের বৃদ্ধিও নাই—মনের প্রশস্তিও নাই; পরিশ্রম আছে, শীরঃপীড়া আছে। যিনি আদি নাই বলেন তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় নাই—জ্ঞানের পিপাসা নাই; একথায় শুদ্ধ বুদ্ধির আলস্য ও ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানপিপাসু তত্ত্ববিদের ইহা উপযুক্ত কথা নহে।

বিশ্বসংসার স্বোদ্ভূত বলিলেও দোষ স্পর্শে। তবে ইহা পূর্ব্ব মতাপেক্ষা প্রশস্ত বটে। ফলে আপনি হইয়াছে বলায় অপ্রত্যক্ষ দোষ আসিতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষে, জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকি। প্রত্যক্ষকে সম্প্রসারিত করিয়া অপ্রত্যক্ষে গমন করি। জ্ঞাতের ভিত্তির উপর জ্ঞেয় ও অজ্ঞাতের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরিহার করিলে কোন মীমাংসাই হয় না। আমাদের জ্ঞানে বা ধারণায় সোদ্ভবনের কোন ছায়াই নাই। কোথায় কি আপনি হইতে দেখিয়াছি? কেন বীজ হইতে বৃক্ষ তো আপনিই হইয়া থাকে? আবার বৃক্ষ হইতেও বীজ আপনি উৎপন্ন হয়? মেঘে বৃষ্টি হয়; আবার মেঘ বহুরূপীর মত গগন গর্ভে অনন্ত রূপ ধরিয়া লীলা করিয়া থাকে। এই আপনি হইল এই আপনিই মিলাইয়া গেল? অন্তর্জগতে দেখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রভৃতিও আপনি হয়। বস্তুতঃ ইহার একটীও আপনি হয় না; ফলে উক্ত প্রকার জ্ঞান হইতেই কতকটা আপনি হওয়ার আভাস বা ভাব মনুষ্যহৃদয়ে আইসে। এইরূপ ধারণার আঁধার কক্ষে কতকটা স্বোদ্ভূত ধারণার জন্ম। তাই ইহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিলাম। ফলে উক্ত প্রকার ধারণা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে অবস্থান্তর বুঝায় মাত্র—উৎপত্তি বুঝায় না। বীজ হইতে বৃক্ষ আপনি জন্মে। ইহাতে বীজ পূর্ব্বাবস্থা, বৃক্ষ পরাবস্থা মাত্র। মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি হয় না। সুতরাং মেঘ এক অবস্থা—বৃষ্টি আর এক অবস্থা বুঝাইল। কই পূর্ব্বাবস্থা নাই অথচ পরাবস্থা আছে—আমাদের এরূপ জ্ঞানের আভাস বা নিদর্শন কোথায়? কিছু না হইতে আপনি কিছুর উৎপত্তি আমাদের জ্ঞানে বা কল্পনায় কোথা? যাহা ছিল না, তাহা হওয়ায়, কোন পূর্ব্ব অবস্থা, ভাব, পরিবর্ত্তন বা সুপ্তপ্রকৃতির সদৃশ কিছু না কিছু স্বতঃই মনে আইসে। তবে আর আপনি হইয়াছে কিরূপে বলা যায়? এস্থলে পূর্ব্বাবস্থার মীমাংসা কি প্রকারে হইবে? আর তাহাও যদি হইল তো তাহার পূর্ব্বাবস্থার সিদ্ধান্ত আবশ্যক। ফলে এপ্রকার ব্যাখ্যায় আদি নিরাকরণ কিছুই হয় না। পুনশ্চ যাহা

আপনি হইয়াছে তাহার আদি আছে, নতুবা হইল কি, বা কে? যাহার আদি আছে তাহার কাল আছে; সুতরাং যে সময়ে বিশ্বব্যাপার হইল তাহার পূর্ব্বে না হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি হওয়ার ধারণা আপনিই অন্তর্হিত হয়। অপিচ মনে কর বীজ হইতে বৃক্ষ আপনি হইল, ফলে বৃক্ষ নইলে বীজ কিরূপে সম্ভবে? একথায় আপনি হওয়ার আবার কল্প আসিল। আবার তাহাতেই বা নিস্তার কই? মন কল্প কল্পান্তরে এই আপনি হওয়ার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিয়া কোন নিরাকরণই করিতে পারিল না। যেমন আপনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু-না-কিছু ছিল মনে আইসে, যেহেতু কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি সম্ভাবিত নহে, নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব একবারেই মনে আইসে না; তেমনি আবার জড়শক্তিসংস্থানে কাহারই ধ্বংশ কল্পনা করা যায় না, এবং যাহার ধ্বংশ নাই তাহার চির-অস্তিত্বের ভাবই মনে আইসে, আপনি হইল ভাব মনে আইসে না। যখন এ আস্তিত্ব নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইবে না স্থিরসিদ্ধান্ত, তখন কখনও ছিল না বা হইয়াছিল বলা যায় না। অধিকন্তু যাহার ধ্বংশ কল্পনায় আইসে না তাহার কিছু না হইতে উৎপত্তি ও মনে স্থান পায় না। আবার প্রত্যক্ষে আমরা কার্য্যের কারণ পাই, সুতরাং এ সোদ্ভাবনের যদি কোন কারণ থাকে তবে তাহাই ইহার আদিকারণ বলিতে হইবে। কারণ সাপেক্ষ বলায় স্বোদ্ভাবন সিদ্ধান্ত হয় না। কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই নাই, এক্ষণে আপনি হইয়াছে বলায় বিনা কারণে কিছু-না হইতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইল। একথা মনে আইসে না। আবার কার্য্যকারণ সমন্বিত একাত্মিক ভাবের ধারণার সময় সম্বন্ধ (time relation) অপরিহার্য্য; সুতরাং যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই আদি কারণ বলিতে হইবে নতুবা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকে না। যে জ্ঞানলালসায় এবম্বিধ ব্যাখ্যা আসিল তাহার কিছুই পরিতৃপ্ত হইল না। সুতরাং এপ্রকার বিশ্বব্যাখ্যায় বিশেষ ফলই নাই।

সৃষ্টিপ্রকরণ প্রাচীন আর্য্যদর্শনে বা ধর্ম্মে নাই। ইহা পাশ্চত্য অনুশীলনের ফল বিশেষ। ইহা মনুষ্যকার্য্যের অনুরূপ ধ্যান মাত্র। আমার ইচ্ছায় কতকটা কার্য্য হয়, সেই ইচ্ছার বিরাটমূর্ত্তি বিশ্বসংসারের অন্তস্তলে আরোপিত হইয়াছে। ফলে প্রকৃত সৃষ্টি মানুষের নাই। মানুষে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তবে এরূপ অনুমান কিরূপে সঙ্গত হইল? আর্য্য ঋষিগণ তাই জন্য সৃষ্টিরহস্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বরঞ্চ আর্য্যদর্শনে নির্ম্মাণের ভাবই অনেকটা প্রবল। "এই ষড়্দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করেন নাই। কপিল কৃত শাঙ্খ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতা-বাদ, পতঞ্জলী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্ব স্রষ্টা না বলিয়া বিশ্বনিয়ন্তা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসা পণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রম মাত্র,

ইহাতে আর সৃষ্টিকর্ত্তার সম্ভাবনা কি?" * মনুষ্যের নির্ম্মাণ ব্যাপার দেখিয়া যদি তাহার বিস্তারিত মহান্ ভাব বিশ্বে নিয়োজিত হইল, তাহা হইলে তাহার আদিকাণ্ড অস্পর্শই রহিল। তাহাতে সৃষ্টির ধারণা আইসে কই? তাহাতে এ সৃষ্টি অনুমানের সঙ্গতি কই? আর যদি নির্ম্মাণই সৃষ্টি হয় তাহা হইলে যাহা হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বা নির্ম্মাণ, তাহার মূলে সেই অন্ধকারই রহিল। তত্ত্বানুসন্ধানের ফল হইল না। আর যদি প্রকৃত সৃষ্টিই ধরা যায়, তাহা হইলে অবস্তু হইতে বস্তুর সৃষ্টি ধারণায় আইসে না। আবার সৃষ্টি প্রকরণে আকাশ, কাল, প্রভৃতির সমস্যা পূরণ করা আরও দুষ্কর হইয়া উঠে। কে আকাশের সৃষ্টি করিলেন? সৃষ্ট বস্তুর ধ্বংশ সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছাধীন। এক্ষণে কোন বস্তুরই ধ্বংশ আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কৈ জড়শক্তির নাশ বা লোপ কিরূপে সম্ভবে? আকাশের সৃষ্টি নাই—ধ্বংশ নাই; সুতরাং একটী সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া এই প্রকার নানা দুর্ভেদ্য সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। আবার জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়ে। যদি তিনি স্বোদ্ভূত হন তবে বিশ্বব্যাপার না হয় কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আপনি হওয়া বলায় কোন ব্যাখ্যাই হয় না। এব্যাখ্যাটীও সবিশেষ জ্ঞানপ্রদ নহে। আবার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে তাহার সহিত অনন্ত প্রহেলিকা আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রকৃতি, সত্বা, ধারণা, অস্তিত্ব, কাল, আকাশ, অভিভ্রায়, সুখ, দুঃখ, ক্রিয়া, কৌশল, ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী মীমাংসার কোনটীই স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি পূর্ব্ব দুইটী মত অপেক্ষা তৃতীয়টী প্রশস্ত। কেননা সৃজন, নির্ম্মাণ, প্রভৃতি ভাবের কতক আভাস মনুষ্য মনে আছে। আমাদের চিত্তবিকাশের অবস্থা বিশেষে এ প্রকার ধারণা অপরিহার্য্য। সুতরাং ইহা বৈজ্ঞানিক রীত্যনুসারে বুদ্ধিবিকাশের একটী বিশিষ্ট সোপান বলিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

সেই তিরস্কার!

এমনি একটি সন্ধ্যা মধুর উজ্জ্বল,
পশ্চিমে সোণার মেঘে বহেছিল ঢল।
পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত সুতরুণ শশি
ছায়াখানি বিকম্পিত সরোবরে খসি।
একাকী বসিয়া ঘাটে, ছিনু অপেক্ষায়,
এমন মধুর সন্ধ্যা; কোথা সে? কোথায়!
নয়নে বিরহ অশ্রু অভাব পরাণে,
আবেগ আগ্রহে হৃদি পূর্ণ অভিমানে।

* অক্ষয়কুমার দত্ত।

সহসা সম্মুখে কার হেরিনু মূরতি?
কার হাসি সুধা পিয়ে
কার রূপ হ'রে নিয়ে
সহসা অপূর্ণ চন্দ্রে পরিপূর্ণ জ্যোতি?
আকুল আনন্দ মাঝে অবসিত প্রাণ,
(বুঝিনু) মৃত্যুত দুঃখের নহে, সুখের নির্ব্বাণ।
হায়রে ভাঙ্গিল কেন সেই মৃত্যু সুখ?
আবার ফিরিল কেন অভিমান দুখ।
উচ্ছ্বাস কাতর প্রাণে হাতখানি ধ'রে
বলিনু "বাসনা বুঝি ভাল আর মোরে?"
শুনিতে উথলে সাধ সে পুরাণ বাণী—
"বাসিনা তোমারে ভাল, হৃদয়ের রাণি!"
বার বার শুনিয়াছি এ সোহাগ ভাষা
তবু নহে মিটিবার জ্বলন্ত পিপাসা।
এক'ই জিজ্ঞাসা তাই, অতৃপ্ত ইচ্ছায়,
"বুঝেছি আমারে ভাল বাসনা ত আর।"
বুঝিল না ভাব মোর, বুঝিল না ভাষা,
বলিল—"সন্দেহ এ কি ঘোর মর্ম্মনাশা?"
নয়নে দেখিনু তীব্র তিরস্কার দৃষ্টি
মুহূর্ত্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি।
প্রথম হেরিনু সেই, সে নয়নে রোষ,
স্বার্থ ভরা আকুলতা, তোরি যত দোষ।
... ...
সে দিনো এমনি রাত্রি, মেঘস্তর কালো,
ঢেকে ঢেকে যেতেছিল চন্দ্রমার আলো।
রজনী সুখেতে ম্লান সে জ্যোৎস্না পরশে,
বিরহের ভয় যেন মিলন-হরষে।
জ্বল জ্বল সন্ধ্যা তারা নামে ধীরে ধীরে,
বিজনে দাঁড়ায়ে মোরা সারোবর তীরে।
হৃদয় বেদনা-ভরা আনত লোচন,
পরাণে কত কি কথা, না সরে বচন।
সে দিন কি আছে আর? কি কহিব কথা?
কি ব্যথা জানাতে গিয়ে শুধু দিব ব্যথা।
সম্বরি নয়ন জল বলিলাম শেষে,
"বিদায় দাও গো তবে যাই দূর দেশে।"
পাষাণ সে একটিও কথা কহিল না,
একবার বলিল না "যেয়োনা যেয়োনা।"
শুধু নয়নেতে সেই তিরস্কার দৃষ্টি,
মুহূর্ত্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি!
সেই দৃষ্টি আনিয়াছি প্রবাস-সম্বল;
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর একমাত্র বল।
প্রশান্তি বহিয়া আনি ঝড় জ্বালা ক্ষান্ত,
ঈশ্বরের রুদ্র বজ্রে পাপী তাপী শান্ত।
সেই তিরস্কার দৃষ্টি অন্য কিছু নয়
তাহাতে প্রকাশ দেখি তাহারি প্রণয়।
সেই খর স্মৃতি দিয়ে দগ্ধ হবে যত
স্বার্থ-পূর্ণ প্রেম হবে সুবিমল তত।
ভুল করেছিনু, তাহা নহে তিরস্কার;
বুঝেছি এখন তাহা ভাল-বাসা তার!

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১

পৃথিবী একটা নীরব দুঃখময় মহানাট্য। মনুষ্যের প্রত্যেক বাসনা প্রত্যেক অনুভূতি, প্রত্যেক হৃদ্‌কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে যে দুঃখাভিনয় হইতেছে—ইহা শোনাও মা—অস্ফুর

উদ্গমের শব্দ শোনাও তা। যদি আমরা অন্যের দুঃখ নিজের মত করিয়া অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে পৃথিবী হয় স্বর্গ নয় নরক হইয়া উঠিত।

২

আমাদের জীবন তৃতীয় খণ্ড উপন্যাসের মধ্য ভাগ। গোড়া নাই আগা নাই—মাঝের খানিকটা; আর, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই কল্পনা। এই অবোধ-গম্য রহস্যের মধ্যে যে একটা বিস্ময় ঔৎসুক্য আছে তাহাতেই জীবনের জীবনত্ব; যখনি সে ঔৎসুক্য দূর হইবে, অনুধাবনা শেষ হইবে, তখনি আমাদের সুখ দুঃখের অবসান—তখনি নির্ব্বাণ। সুতরাং পূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টিতে নাই, স্রষ্টারই তাহা একমাত্র উপাদান।

৩

স্থির নিরাশা ভাল না সন্দেহ ভাল? সন্দেহে আশা আছে, কিন্তু নিরাশা আশা-হীন,—তবুও নিরাশা ভাল, কেন না সন্দেহে যে আশা আছে তাহা নিরাশা হইতেও ভয়ানক। জর্জ এলিয়টের কথায় What we often call despair is nothing but the strained eagerness of unfed hope, এই ক্ষুধার্ত্ত আশা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তফাৎ এই যে একটা কষ্টের মধ্যে মুক্তি, অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর-বল; আর একটা কুলকিনারাহীন যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ। লোকে যখন খেলায় যথাসর্ব্বস্ব পণ করে তখন হৃদকম্পমান অবস্থায় যেমন হার জিতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, বাজি হারিয়া গেলে তাহা হইতে অনেক প্রশান্ত হইয়া আসে। আমরা জীবনের অধিকাংশ সময়েই জুয়া খেলিতেছি,—সময়ে সময়ে সামান্য জিনিষের জন্য আমাদের সমস্ত সুখ শান্তি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পণ রাখিতেছি, কিন্তু হাত উঠিয়া গেলে যখন দেখি আমরা সর্ব্বস্বান্ত, তখন আমরা রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। যাহারা হারিবে জানিয়াও সমস্ত পণ করে তাহারা পাগল, কিন্তু এরূপ পাগলের সংখ্যা পৃথিবীতে অল্প নহে, অন্ততঃ অর্দ্ধেক—কেন না রমণীরা কি?

৪

সূর্য্যমুখী সকালে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ফুটে, তাহার পর সমস্ত দিন সূর্য্যের আশায় থাকিয়া সন্ধ্যাবেলা হতাশ্বাস-ভাবে নিম্নমুখী হইয়া ঝরিয়া পড়ে। কতকগুলো মানুষ তেমনি জগতে আছে; তারা সারা জীবন হাঁ করে কোন মুখের পানে চেয়ে শেষে ঝরে যায়—সে চোখ আর তার দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফেরে না। কিন্তু গোলাপ জুঁই প্রভৃতির মত কতকগুলি ফুল আছে যাদের সকলেই আদর করে বুকে পরে। ইহাই সংসারের নিয়ম। তবে সূর্য্যমুখী কাঁদিয়া মরে কেন? সহস্র ক্রন্দনেও সে ত আর গোলাপ হইয়া ফুটিবে না? সূর্য্যমুখী সে চিরদিন সূর্য্যমুখই থাকিবে!

রহস্য-নাট্য।

অন্তঃপুরের বারান্দা, যাদবচন্দ্রের প্রবেশ।

যাদব। তোর হাতে কি রে, মানি? বড়এলাচ বুঝি? ফেলেদে—ফেলেদে, এমন অসুখ করবে!"

[মানির দ্রুতবেগে পলায়ন।

যাদব। (পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে পথে খোকাকে দেখিয়া)—তোর গাল ট্যাবলা যে? কি খাচ্ছিস?

খোকা। মিশলি।

যাদব। (কোলে লইয়া) ছিঃ! মিছরি খায় না, ফেলেদে, হাতে আরো রয়েছে যে,—দেখি—?

খোকা। কাকাবাবু,খাবি? (এক টুকরা যাদবের মুখে—এবং বাকী সমস্তটা নিজের মুখে পূরিয়া) তুই খা, আমি খাই?

যাদব। আচ্ছা খা, কিন্তু আর যেন খাসনে, বুঝলি? ঝি, খোকাকে নে। এই যে শশি, কচুরি খাচ্ছিস? কে দিলে? ফ্যাল বলছি—ফ্যাল, ফ্যাল, সদ্য এতে ওলাউঠা হবে, ডাক্তার কনেমারা স্পষ্ট লিখেছে।

শশির হাত হইতে কচুরী কাড়িয়া নিক্ষেপ—শশির কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

মেজ বৌয়ের ঘর, যাদবের প্রবেশ।

যাদব। শুয়ে যে? আহারের ব্যবস্থা কিরূপ চলছে বল দেখি?

বৌ। তুমি ভাই, যেমন বলেছ।

যাদব! বেশ বেশ,—এবার দেখবে দুদিনে কেমন হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। Secretটা কিজান? যে খাদ্য সহজে জীর্ণ করতে পারবে—তাই খাবে, হজমেই আমাদের শরীর; যদি বিশ্বাস না কর ত বরঞ্চ তোমাকে ডাক্তার কার্পেণ্টারের ফিজিয়লজী খানা খুলে দেখিয়ে দিই।

বৌ। তার দরকার নেই, তুমি যা বলেছ আমি ঠিক তেমনি করছি।

যাদব। ইনোস ফ্রূট-সল্ট-টা খাচ্ছত? ওতে হজমের একটু help করে—

বৌ। হাঁ।

যাদব। আয়রণ? ওটা একটু জোরাল—

বৌ। খাচ্ছি বই কি?

যাদব। তবে বল বেশ আছ, তোমার আর complain করার কিছুই নেই ?

বৌ। হ্যাঁ—তা তা মন্দ নেই কিন্তু গা মাথাটা কেমন ঘুরছে।

যাদব। সে আবার কি ? তাহলে নিশ্চয়ই আহারের কোন অনিয়ম হয়ে থাকবে। ও একটা অজীর্ণের লক্ষণ কি না। বোধ করি লুচি খেয়েছে ? আমিত বলেছি লুচিটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষ।

বৌ। না ঠাকুর পো, তুমি বলা পর্য্যন্ত লুচি আদপে খাইনি।

যাদব। পাঁটার মাংসটা বুঝি ছাড়তে পারিনি। তোমার ত দেখতুম লুচি আর মাংস নইলে চলেনা।

বৌ। না, মাংসও ছেড়েছি।

যাদব। মাংস একটু খেলে হানি আছে তা নয়, তবে তোমরা যে ঘি মসলা দিয়ে রাঁধ,—তাছাড়া দুধটাও তোমাদের সে সঙ্গেত বাদ পড়ে না,—মাংস আবার দুধ, বড় খারাপ।

বৌ। দুধ ও ছেড়েছি।

যাদব। তা ভালই,—কম খেলেই শরীর ভাল থাকে। তবে গা ঘোরাটা কেন হোল ? ফল খাও বুঝি ? ফলটা বড় বেহজমি—তা জান ?

বৌ। না ফল খাইনি।

যাদব। তবে আর ত কোন কারণ দেখছিনে, ওঃ! ফস্‌ফোডাইনটা খাওনি বুঝি ?

দাসীর বরফ জল লইয়া প্রবেশ।

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! বরফজল! তাই বল! আমি ভেবে মরছি—কেন ওরূপ হোল। কি ভয়ানক ? নিয়ে যা নিয়ে যা এ শরীরে বরফ জল খেলে এখনি ইন্‌টেস্‌টাইনের overturn হবে।

দাসী। বৌঠাকরুণ কদিন থেকে কিচ্ছু খাচ্ছেনা—অরুচি করেছে, না খেয়ে খেয়ে ঘুরনি রোগে ধরেছে একটু ঠাণ্ডা জল খেলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে, তাই নিয়ে এনু, খেতে দাও দাদা বাবু।

যাদব। খেতে দেব বই কি ? আমি নিজে হাতে বিষ দিই এই ওনার ইচ্ছা। বরফ জল খেয়েই ত গা ঘুরছে।

বৌ। না ঠাকুরপো, আমি আগে খাইনি এই খেতে যাচ্ছিলুম।

যাদব। অজীর্ণ ত আর অমনি আপনি হয়নি, অবিশ্যিই তাহলে আর কিছু কুপথ্যি করেছ।

দাসী। না গো না, মা সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দুটি ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় নি।

যাদব। ভাত! শুধু ভাত। দাঁড়া দেখি, তাতে কি প্রপার্টি আছে। ওঃ! বুঝেছি, গাত ঘুরবেই, ওতে আলকহল আছে কি না। কাজটা ভাল হয়নি। বোধ হচ্ছে পরিমাণে কিছু বেশী হয়ে পড়েছে, একটু বুঝে সুঝে খেও—

বড় বৌয়ের প্রবেশ।

বড়বৌ। ও মেজবৌ, কদিন থেকে তোর মুখে কিছু রুচছে না, এই টাটকা নিমকি ভেজে নিয়ে এলুম দেখ দেখি দুখানা, কেমন লাগে।

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! নিমকি! তবেই হয়েছে!

বড়বৌ। তুমিও খাওনা একখানা, দেখ না কেমন হয়েছে।

যাদব। না না ওসব খেতে নেই, অসুখ করে।

বড়বৌ। ডাক্তারির জ্বালায় ত আর বাঁচিনে বাবু, তবে তোমার খেয়ে কাজ নেই, মেজবৌ ধর্ একখানা খা।

যাদব। আচ্ছা কই দেখি ? বেশী না কিন্তু একখানা।

যাদব। মন্দ হয় নি, আর একখানা দেখি, না আর দুখানা দাও, আর চাইনে।

বড়বৌ। এই থালা শুদ্ধ রইল, তোমার যখানা ইচ্ছা খাও না বাবু।

(একে একে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া)

যাদব। স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, তোমাদের হাতে পড়ে দেখছি আমি শুদ্ধ মারা গেলুম। যাই এক গ্ল্যাস পাইরেটিক স্যালাইন খাইগে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সীতা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ প্রণীত।

(মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের চরিত্র সমালোচনা সমেত জগৎ পূজ্যা সীতাদেবীর অলৌকিক জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ চরিত্র সমালোচন ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।)

সূর্য্যে প্রখরতা আছে, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, মিষ্টে পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু রামায়ণ সাহিত্য জগতে এক অদ্বিতীয় অপূর্ব্ব বস্তু আজন্ম কাল হইতে আমরা তাহার গল্প শুনিয়া আসিতেছি, তাহা পাঠ করিতেছি, তবু তাহাতে আমাদের অরুচি নাই, প্রিয়তমের ন্যায় ইহা চির মাধুর্য্যময় সদানান্দদায়ক। রামায়ণের এই যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, 'সীতাতে' তাহার পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে, ইহা লেখকের পক্ষে কম প্রশংসার কথা

নহে। বইখানি পড়িয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ভাষা অতি সরল সুন্দর, বর্ণনার লালিত্য মনোহর। অধিকাংশ বর্ণনা মূল রামায়ণ হইতে অনুবাদিত। সীতার বনবাসাংশ এবং অবশেষে যজ্ঞস্থলে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ অতি মনোহর ভাবে হৃদয়াদ্রকারী।

উদাসীন পথিকের মনের কথা। মির মশররফ হোসেন প্রণীত।

ইনি বঙ্গভাষার নূতন লেখক নহেন। "বিষাদ সিন্ধু" ইতি পূর্ব্বেই ইঁহাকে বঙ্গসাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছে। সমালোচ্য পুস্তক-খানি ঠিক উপন্যাস নাই, ইহা উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ। অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে—তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটী হয় নাই।

ছিন্ন-আশা। শ্রীযতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত।

বই খানি পড়িলে মনে হয়, এই দুঃখময় কবিতাগুলির অধিকাংশ লেখক স্ত্রীবিয়োগে বিহ্বল হইয়া লিখিয়াছেন। আমাদের দেশে, স্বামী বিয়োগে স্ত্রী আজীবন কষ্ট পাইয়া থাকেন, মৃত স্বামীর স্মৃতিই তখন জীবন তাঁহার একমাত্র সম্বল, কিন্তু স্ত্রীবিয়োগে অধিকাংশ স্বামী তাহার চিতা ভস্ম শূন্যে বিলীন না হইতে হইতে নূতন স্ত্রীগ্রহণ করেন। এইরূপ স্থলে দৈবাৎ কোন স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যথার্থ অনুরাগ দেখিলে যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিতে হয়, সেই জন্য এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। "শব সম্বোধন" নামক কবিতাটি পড়িলে তাঁহার হৃদয়ের গভীর বেদনা আমাদিগকেও স্পর্শ করে। তবে দু একটি কবিতা—যেমন "অভাগার শশী," এই শোক সঙ্গীতের মধ্যে স্থান না পাইলে ভাল হইত, এইরূপ অর্থ শূন্য প্রলাপে শোকের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে।

অভিলাষ কুসুম। শ্রীবিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাও একখানি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয়—লেখকের বর্ণনাশক্তি আছে কিন্তু এখনো তাহা বিকশিত হইয়া উঠে নাই। অনেকগুলি কবিতারি আরম্ভ ভাল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার মাধুর্য্য রক্ষিত হয় নাই। "ছেলের দল" নামক একটি ছোট কবিতা বেশ হইয়াছে আমরা তুলিয়া দিলাম।

বিষ্টি পড়ে ঝুপ্ ঝাপ্ ফুলবাগানের ঘাটে
সোণার্ বরণ্ রাঙা তপন্ বস্‌ল গিয়ে পাটে।
রোদ হচ্চে, বিষ্টি পড়ছে, শিব্‌ঠাকুরের বিয়ে,
আয়না সবাই নাচিবে ভাই! করতালি দিয়ে।

সূর্য্যি মামা! রাগ ক'রোনা কথা শুনে যাও!
তোমার মা ত কাট্‌না কাটে,—একটু সুতো দাও!
যাওনা চ'লে, দেব ব'লে মামীর কাছে গিয়ে,
আজবাদে কাল হ'বে নাকি মামীর মার বিয়ে?
মেঘ দাদা! মজার কথা হাস্‌ছ শুনে তাই।
হবে যেতে ফলার খেতে সবাই মিলে ভাই!
রূপের ছটা, রঙ্গের ঘটা, ঐ আকাশের গায়
উজল তনু রামের ধনু কেমন শোভা পায়!
মেঘের, গলে যেন দোলে অষ্ট ধাতুর মালা,
যাচ্চে সেথা, শালের পাতা পাবে যেথা মেলা
ঐ যে রবি! রাঙ্গা ছবি, মুখ ঢেকেছে লাজে,
রামের ধনু মিলিয়ে গেল নীলআকাশের মাঝে!
আহা কেমন লাগছে পবন ধীরি, ধীরি, গায়!
ফুলের্ সুবাস্ উড়িয়ে বাতাস্ ঘুরিয়ে চলে যায়!
জল ধরেছে আপদ্ গেছে বেড়াই চল পাড়ে,
বিষ্টির জলে, নোলক দোলে, সেঁউতি গাছের ঝাড়ে!
উঠ্‌ল তারা, মনোহরা, ফুট্‌ল ফুলের কুঁড়ি,
ঐ যে চাঁদা! নজর বাঁধা, উঠ্‌ছে গুড়ি, গুড়ি।
ডুবলো চাকী আর্ কি বাকি? ঘরে চল যাই,
কাল্ সকালে, সবাই মিলে, খেল্‌ব আবার ভাই!

বিকাশ। শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তক খানি ৪৭টি মাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। হইলে কি হয় সূর্য্য কিরণের ইহা সাহিত্য জগতে আলোক বিতরণ করিতে প্রকাশিত। অনেক দিন পরে আমরা সম্মুখে নব কবির অভ্যুদয় দেখিতেছি। ইহার এই কবিতাগুলিতে ভাব ও ভাষায় সংমিশ্রণ অতি সুমধুর। আশা করি কবির লেখনী এইখানেই বিরাম লাভ না করিয়া উত্তরোত্তর নব ভাবের বিকাশ সাধন করিবে। এইখানে আমরা একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সেই আনন্দের ধাম
কোটী বিশ্বব্যাপী এক সত্তা বর্ত্তমান
আনন্দ তাহার নাম,
একদিকে ইহলোক তার

মাঝখানে মৃত্যু পারাবার
আর দিকে জ্যোতির্ম্ময় আলয় মহান্
সেই আনন্দের ধাম!
জীবন উজল রবি হেরি অস্তমান
যবে অবসন্ন প্রাণ,
হৃদয়ের অযুত দুয়ারে
অযুত আহবান ঘুরে মরে,
যে আবাস হতে আসে সে সব আহ্বান
সেই আনন্দের ধাম!
উল্লাসে পূজার আশে ভেদিয়া বিমান,
শত জীবন্মুক্ত প্রাণ
দেবতার মহান চরণে
আহুতি লইয়া দিয়া মনে
সঘনে ছুটিয়া যথা করিছে প্রয়াণ
সেই আনন্দের ধাম!
থাকুক যেমতি নর অজ্ঞান সজ্ঞান
সেই এক লক্ষ্যস্থান,
দুদিনের খেলা শেষ হলে
নিয়তির সনে যাবে চলে,
লভিবে দেবের শান্তি, অনন্ত আরাম
সেই আনন্দের ধাম!

ঊষা চিন্তা। শ্রীমতী স্বর্ণময়ী গুপ্তা প্রণীত।

নাম দেখিয়া মনে হয় বুঝি এখানি কবিতা পুস্তক, তাহা নহে, আধুনিক আর্য্য মহিলাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত। প্রবন্ধগুলিতে লেখিকা তাঁহার চিন্তাশীলতা, ও ন্যায় যুক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এমার্সন সন্দর্ভ। অর্থাৎ আমেরিকার ভূত পূর্ব্ব পণ্ডিতবর মিঃ র‍্যাল্‌ফ্ অবালডো এমার্সনের রচনাবলী হইতে অনুবাদ। কোন পল্লীবাসী কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। অনুবাদক সে জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তবে যেরূপ কঠিন ভাষায় এই সন্দর্ভ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার অর্থবোধ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে, অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল হওয়া উচিত ছিল।

অপচয় ও উন্নতি। শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র প্রণীত।

মানব কি উপায়ে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অপচয় নিবারণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে এই পুস্তকে তাহারি উপদেশ প্রদত্ত। উপদেশগুলি যাহারা পালনে সমর্থ হইবেন তাঁহারা অচিরে উপকার প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। যাঁহারা পালন করিতে নাও পারিবেন, তাঁহাদেরও বইখানি পড়িতে ক্ষতি নাই। উপদেশ স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বড় লোকদের যে সকল জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পড়িয়া তাঁহারা প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন।

পাতঞ্জল যোগসূত্র। মূল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের পাতঞ্জল যোগসূত্রের ন্যায় ইহা বিস্তৃত ব্যাখ্যা না হইলেও অল্পের মধ্যে ইহা সুবোধ্য হইয়াছে। অনুবাদ প্রশংসনীয়।

পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদিগের অন্তর্বিবাদ এবং আমাদের জাতীয় মহাসমিতি।

ইদার বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট জাতীয় মহাসমিতি ভারতবাসীর জন্য যে প্রার্থনা করিতেছে তাহা যে অসঙ্গত নহে এবং সুদীর্ঘ কালের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা ভারতবাসীর প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া যে একান্ত সম্ভবপর তাহা পাঠক মহাশয়গণকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যে নির্ব্বোধ, স্বদেশদ্রোহী ভারতের সন্তান ইংরাজ জাতির প্রকৃত মহিমা না বুঝিয়া, সময়-স্রোতের অনন্তশক্তির বিষয় চিন্তা না করিয়া স্বজাতির দুঃখ রজনীর চিরান্ধকারের, স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের চিরশোক দারিদ্র্যের বিষম ভীতিময় বিভীষিকা সর্ব্বদা কল্পনার চক্ষে দেখিয়া স্বয় বহুদর্শিতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করে, ভরসা করি তাহারা কিছু মাত্রও বুঝিতে পারিবে যে ভারতবাসী ইংলণ্ডের অধীন হইলেও তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য যে চিরকালই সমান রহিবে এমন নহে, ভারত স্বাধীন না হইলেও ভারতবাসীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ অসম্ভব নহে; জাতীয় মহাসমিতি রাজদ্রোহী নহে, ইদার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিয়া আমরা যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারি—তাহারই জন্য জাতীয় মহাসমিতি সচেষ্ট। রাজ-শক্তি পরিচালিত করিতে যাইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের যে সকল ত্রুটী লক্ষিত হয় সেই ত্রুটী-সংশোধন করিয়া দিবার জন্যই জাতীয় মহাসমিতির জন্ম। রাজ-শক্তির সহিত একত্রে কাজ করিতেই এই প্রজাশক্তির সম্মিলন, রাজশক্তি বিলুপ্ত করিতে নহে। এই যে সম্মিলিত প্রজাশক্তির বিকাশ ইহাও কি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ ও উদারতা প্রসূত নহে? যাঁহারা ইংরেজ রাজের এই উদারতায় সন্দেহ করিয়া ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নিরাশ হন তাঁহারাই রাজদ্রোহী পদ বাচ্য।

ইতিহাসে দেখিতে পাই যাহা একবার ঘটিয়াছে পুনর্ব্বার তাহা ঘটিয়া থাকে। ভারতের যে উত্তর পশ্চিম গিরিবর্ত্ম দ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত মহম্মদ গজনভী ভারতে আসিয়া স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষকে সপ্ত দশবার লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন, সুদীর্ঘ সপ্তশত বৎসর পরে মুসলমান গৌরব-সূর্য্য চির অন্ধকার সাগরে নিমজ্জিত হইলে সেই গিরিবর্ত্ম দিয়াই নির্ম্মমতার অবতার দস্যুশ্রেষ্ঠ নাদির সাহ ভারতে প্রবেশ পূর্ব্বক ভারতবাসীর ধন মান, মোগলের রত্ন-সিংহাসন লুণ্ঠিত করিয়া 'নাদির রাজার রাজা শাসিবে সকলে' এই গর্ব্বময় বাক্য বিঘোষিত করেন। যে পাণিপথক্ষেত্রে পাঠানের উন্নত রাজ-পতাকা আকবর সাহের পদদলিত হয়, সেই পাণিপথ ক্ষেত্রেই আবার মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়গণের

সম্মিলিত বীর্য্যবহ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়, তাই বলিতেছি ইতিহাসে এক ঘটনার পুনরাভিনয় বিচিত্র নহে।

আমরা রোমীয় ইতিহাসের একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে যত্নশীল হইতেছি। এখনও রোমের রাজনৈতিক জীবনের বাল্যকাল, ভবিষ্যৎ উন্নতির, যে উন্নতিতে রোম পৃথিবীর শিরোভূষণ হইয়াছিল—সে উন্নতির এখনও সূত্রপাত হয় নাই। প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী টারকুইনবংশ রাজ-সিংহাসন হইতে দূরীভূত হইয়াছে, সাধারণ তন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র, এই সাধারণ তন্ত্র লইয়াই অন্তর্বিবাদ—এই অন্তর্বিবাদের ফল রোমের অভূত-পূর্ব্ব উন্নতি। এই অন্তর্বিবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

টারকুইন-রাজবংশ রোম হইতে বিদূরীত হইলে, রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা পেট্রিসিয়ানদিগের করায়ত্ত হয়। পেট্রিসিয়ানগণ রোমের সম্ভ্রান্ত সন্তান, রোমের উচ্চপদ সমস্তই তাঁহাদের অধিকৃত; অন্য পক্ষে প্লেবিয়ানগণ অতি দরিদ্র সন্তান, তাহারা প্রায় কৃষি কর্ম্ম দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে অনেককেও আবার পেট্রিসিয়ান পরিবারে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। প্রাচীন ভারতে দ্বিজ ও শুদ্র যে স্থান অধিকার করিতেন, প্রাচীন রোমে পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানগণ সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পেট্রিসিয়ানগণ রোমের রাজ-স্থানীয় (ruling class) প্লেবিয়ানগণ প্রজাস্থানীয় (subject class) ছিলেন; শুদ্ধ তাহাই নহে পেট্রিসিয়ানগণ যে প্লেবিয়ান হইতে ভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন তাহা নহে, পেট্রিসিয়ানগণ আপনাদিগকে ভিন্ন জাতীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কোন প্লেবিয়ান পেট্রিসিয়ান পরিবারে কিম্বা কোন পেট্রিসিয়ান প্লেবিয়ান পরিবারে বিবাহ করিতে পারিতেন না, যদি কোন পেট্রিসিয়ান পরিবার কোন প্লেবিয়ান পরিবারের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন—তাহা হইলে ঐ বিবাহ শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সেই দম্পতির পুত্র কন্যাগণ অবৈধপরিণয়োৎপন্ন (illegitimate) বলিয়া সকলের ঘৃণাভাজন হইত। দেবদেবীর উপাসনাতেও পেট্রিসিয়ানদিগের রীতি নীতি অবলম্বন করিবার প্লেবিয়ানদিগের কোনও অধিকার ছিল না।

এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদিগের মধ্যে কি ভয়ানক ব্যবধান ছিল। কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিতে পারেন যে এই ব্যবধান ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা অপেক্ষা অল্প বা তাহার সমান? আমরা ইংরেজ কর্ত্তৃক বিজীত বটে কিন্তু আমরা কি সেই খৃষ্ট-শিষ্যগণের প্রশস্ত মহানুভাবকতার নিচে আমাদের সংকীর্ণতা রাখিয়া কখন ভাবিয়া দেখি নাই আমরা কত ক্ষুদ্র? আমাদের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত, ইংরেজ কি তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি করেন না? উপযুক্ত ও শিক্ষিত ভারতবাসী ইংরেজের—ইংরেজ জাতির নিকট

সমাদরের পাত্র, তবে সকল বিষয়েই 'বিশেষত্ব' আছে, সম্প্রদায় বিশেষকে না ধরিয়া ইংরেজ সাধারণ ধারলেই তাহাদের মধ্যে আমরা প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণ দেখিতে পাই।

কিন্তু প্লেবিয়ানগণ পেট্রিসিয়ানদিগের বিজীত জাতি না হইয়াও তাঁহাদের দ্বারা প্রবল রূপে ঘৃণিত, উৎপীড়িত, পদদলিত। প্লেবিয়ানদিগের গুণ নিচয়ও যেন তাঁহাদের ঘৃণার বস্তু ছিল। তথাপি নিঃসহায় প্লেবিয়ানগণ ন্যায়ের বলে, সত্য ও ধর্ম্মের বলে কালে পেট্রিসিয়ানদিগের করায়ত্ব রাজ্যভার, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রচুর পরিমানে লাভ করিয়াছিল; যাহারা জেতা ইংরেজের নিকট হইতে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ অসম্ভব স্থির করিয়া অযুক্তি ও কুতর্কের বৃথা আস্ফালনে গগন বিদীর্ণ করেন তাঁহারা স্থির চিত্তে কখনই এবিষয় চিন্তা করেন নাই—ইতিহাসের জাজ্বল্যমান প্রমাণ তাঁহারা স্বস্ব বিকৃত অভিজ্ঞতার পদতলে সন্তুষ্টচিত্তে লুণ্ঠিত করেন।

প্লেবিয়ানদিগকে পেট্রিসিয়ানগণের নিকট আরও অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। এই সময় রোমে উত্তমর্ণেরা আইনের সাহার্য্যেই অধমর্ণগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে উত্তমর্ণ তাহাদিগকে ধরিয়া দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত করিতেন, সময় সময় তাহাদিগকে নিহত করিয়া তবে ক্ষান্ত হইতেন, এমন কি যদি একাধিক উত্তমর্ণের একজন অধমর্ণ থাকিত তবে তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ঋণ অনুসারে তাহা বিভক্ত হইত। অনেকে হয়ত মনে করিবেন প্লেবিয়ানেরা ইচ্ছা করিলে ঋণ না গ্রহণ করিলেও ত পারিত, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম; তাহাদিগকে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইত। প্লেবিয়ানগণকে সাধারণতঃ সামান্য কৃষি কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত কিন্তু রোমের নিয়ম অনুসারে, কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগকে বিনাবেতনে যুদ্ধ করিতে হইত; সুতরাং যুদ্ধে যাওয়ায় তাহাদের কোনও লভ্য ছিল না, যুদ্ধশেষে দেশে ফিরিয়া পুনর্ব্বার ভূমি কর্ষণ ও বীজ ক্রয়াদি প্রয়োজনীয় ঋণ দায় হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িত।

প্লেবিয়ানদিগকে আরও একটী ঘোর অন্যায় সহ্য করিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের হস্তে 'সাধারণ ভূসম্পত্তি' (Public land) নামক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ছিল, এই ভূমিখণ্ড পূর্ব্বে রোমের রাজার নিজ সম্পত্তি ছিল কিন্তু রাজ-নির্ব্বাসনের পর হইতে ইহা গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়াছিল এবং অনেকের অধিকার হরণ করিয়া ক্রমে ইহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু রোমের শাসন-প্রণালী তখন সর্ব্বতোভাবে পেট্রিসিয়ানদিগের হস্তে, তাঁহারাই সেই বিস্তৃত ভূসম্পত্তি আপনাদিগের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন।

প্লেবিয়ানেরা যে চিরকালই এই সমস্ত অন্যায় সহ্য করিয়া আসিবে ইহা কখনই

সম্ভবপর নহে, যখন তাহারা দেখিল যে অত্যাচারের সীমা চরমে দাঁড়াইয়াছে, যখন তাহারা দেখিল কারাগারের কঠোর যন্ত্রণা তাহাদের পেষিত করিতেছে, স্নেহ মমতা প্রীতি ও পবিত্রতার আধার স্ত্রী কন্যাগণের পেট্রিসিয়ান হস্তে ঘোর অবমাননা হইতেছে, তখন অন্যায় ও অত্যাচারের নিদারুণ প্রতিশোধ-স্পৃহা,—মৃত্যুর কঠোরতা অপেক্ষাও কঠোরতর—তাহাদিগকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে উত্তেজিত করিল, আপনাদিগের শাসনভার নিজহস্তে লইতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিল, পেট্রিসিয়ানদিগের প্রবল ক্ষমতা, তাঁহাদের আয়ত্তীকৃত রাজশক্তি সেই সন্ধুক্ষিত প্লেবিয়ান উৎসাহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইল না।

যাহাহউক ৪৯৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে অত্যাচারী টারকুইন-বংশের সহিত রোমের রাজতন্ত্র বিলোপের ১৬ বৎসর পরে প্লেবিয়ানগণ লেসিয়ানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল, কিন্তু এই যুদ্ধাবসানে তাহারা রোমে না ফিরিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতের অধিত্যকায় নূতন নগর স্থাপন করিবার সংকল্প করিল। প্লেবিয়ানদিগের এই সংকল্পে পেট্রিসিয়ানগণ বড়ই ভীত হইয়া উঠেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে প্লেবিয়ানদের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। মেনিনিয়াস্ এগরিপা নামক এক জন বৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য আশা ভরসা দিয়া অনেক সাধ্যসাধনার পর তাহাদিগকে রোমে ফিরাইয়া আনেন।

এই ঘটনাই প্লেবিয়ানদিগের দুঃখ-নিশা অবসানের সূত্রপাত। উত্তমর্ণগণের ঋণ হইতে তাহারা মুক্ত হইল, যাহারা ঋণ দায়ে উত্তমর্ণদিগের দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল তাহারা সকলেই স্বাধীনতা লাভ করিল। শুদ্ধ ইহাই নহে, ভবিষ্যতে অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্লেবিয়ানেরা ট্রিবিউন (Tribunes of the plebes) নামক একটি পদের সৃষ্টি করিলেন। এই পদস্থ কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন পেট্রিসিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট কোন প্লেবিয়ানের উপর অন্যায় ব্যবহার করিলে ট্রিবিউনগণ তাহার প্রতিবিধান করিতেন, ইহাঁরা কখনও নগর ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না, এবং ইহাদের গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। এই পদে প্রথমে দুইজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু ক্রমে প্লেবিয়ানদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত ট্রিবিউনদিগের সংখ্যা ৫ জন ও কিছু দিন পরে দশজনও হইয়াছিল।

প্লেবিয়ানগণ এই কৃতকার্য্যতায় উৎসাহিত হইয়া পবলিক ল্যাণ্ডের অংশ পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহারা একজন উদার-প্রকৃতি হিতৈষী পেট্রিসিয়ান বন্ধু লাভ করিল, যাঁহারা আমাদের জাতীয় মহাসমিতিতে হৃদয়বান মহান প্রকৃতির ইংরেজ বন্ধুর সহানুভূতি ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তাঁহাদের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ সংকীর্ণ হৃদয়ের অনুরূপ প্রেতের ভীষণ বিভীষিকা কল্পনা করিয়া লন তাঁহাদের বোঝা উচিত যে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর মধ্যেও মিত্র থাকিতে পারে। সততা,

ন্যায়পরতা, উদারতা মানবের সৎগুণ মাত্র, অসহায়ের প্রতি, উৎপীড়িত, দুর্ব্বলের প্রতি মানবের সহানুভূতি স্বাভাবিক; এই সহানুভূতির অনুরোধে, ন্যায়ের অনুরোধে দুর্ব্বলের জন্য পরিশ্রম করা, উৎপীড়িতের জন্য প্রাণ দেওয়া কি এতই অস্বাভাবিক? জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলা মানবীয় ধর্ম্ম; সততা ও ন্যায়ের অনুরোধে জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করা দেবত্ব, মানব জাতীর ইতিহাসে এ দেবত্ব দুর্ল্লভ নহে।

প্লেবিয়ানদিগের এই পেট্রিসিয়ান মিত্রের নাম মহামতি কেসিয়াস্। তাঁহারই যত্নে প্লেবিয়ানগণ পবলিক ল্যাণ্ডে স্বাধিকার লাভ করিল। কিন্তু পেট্রিসিয়ানগণ তাঁহাদের চিরায়ত্ত অধিকার এইরূপে হস্তান্তরিত হইতেছে দেখিয়া যেরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অবশেষে তাঁহাদের উন্মত্ততা পরোপকারী কেসিয়াসের হৃদয়-শোণিতে কথঞ্চিত শান্তি লাভ করিল, পুণ্য-হৃদয় কেসিয়াস ন্যায়ের জন্য, পরোপকারের নিমিত্ত প্রফুল্লচিত্তে, নির্ভিক অন্তরে শাণিত কুঠারের নিম্নে আপন মস্তক পাতিয়া দিলেন। তাঁহার প্রাসাদোপম বাসগৃহ পেট্রিসিয়ানদিগের দ্বারা শ্মশানে পরিণত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রস্ফুটিত জীবনকুসুমও ধুলায় মিসাইয়া গেল।

পরবর্ত্তী ত্রিংশ বৎসর ধরিয়া পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদিগের বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পেট্রিসিয়ানগণ প্লেবিয়ানদিগকে বিন্দুমাত্রও রাজনৈতিক ক্ষমতা দানে কাতর, আবার প্লেবিয়ানেরাও ছাড়িবার পাত্র নহে, যতবার তাহারা অকৃতকার্য্য হয়,ততবারই অধিকতর উৎসাহের সহিত অভিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অত্যাচার-ভিন্ন কোন নিদ্রিত জাতিই জাগিয়া উঠে না, অপমান ভিন্ন কাহারও প্রতিশোধস্পৃহা জন্মে না, অভাব না হইলে আবিষ্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, এই সময় প্লেবিয়ানদিগের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার সাহায্যে তাহারা আপনাদিগকে নূতন এক উন্নতির সোপানে উন্নীত দেখিতে পাইল।

ভারজিনিয়াস্ নামক একজন সাহসী প্লেবিয়ান সৈনিকের ভারজিনিয়া নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। ইসিনিয়াস্ নামক কোন প্লেবিয়ান যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে এমন সময় এনিয়াস্ ক্লডিয়াস্ নামীয় একজন পেট্রিসিয়ান ডিসেম্ভার (এক শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, এই ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সংখ্যা দশজন থাকিত বলিয়া ইহাঁরা এই নামে অভিহিত হইতেন) ভারজিনিয়ার রূপে বিমোহিত হইয়া নানা প্রকার প্রলোভনে তাহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অভদ্রোচিত বল প্রয়োগে উদ্যত হইলেন। একদিন প্রভাতে ভারজিনিয়া যখন ধাত্রীর সহিত স্কুলে যাইতেছিল সেই সময় মার্কাশ ক্লডিয়াস্ নামক এপিয়াসের কোন আত্মীয় তাহাকে বল পূর্ব্বক গৃহে লইয়া যান, ধাত্রীর কাতর চিৎকারে সেখানে বিস্তর লোক জড় হইল। তাহাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হওয়ায় মার্কাশ তাহাদিগকে বলিল "ভারজিনিয়া এপিয়াসের ক্রীতদাসী কন্যা, তাহার বয়স যখন অতি অল্প সেই

সময়ে তাহাকে পুত্রকন্যাহীনা ভারজিনিয়াসের স্ত্রীর হস্তে লালন পালনের জন্য সমর্পণ করা হয়," তিনি আরও বলিলেন "আমি শীঘ্রই এই ঘটনা আপনাদিগের নিকট প্রমাণীত করিব, কিন্তু এখন ভারজিনিয়াকে আমার রক্ষণাবেক্ষণেই থাকিতে হইবে।" পর দিন প্রভাতে ভারজিনিয়াস্ যদিও কন্যার মুক্তির জন্য সমাগত নাগরীকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল এবং সরলা ভারজিনিয়ার কাতর রোদনে সকলেই ব্যথিত হইয়া উঠিল, তথাপি পেট্রিসিয়ানদিগের দ্বারা আনীত ক্লাটিয়াল-বর্গের ভয়ে তাহারা একটি কথাও কহিতে সাহসী হইল না। দুরাত্মা এপিয়াস্ স্বার্থ সাধনে অন্ধ হইয়া লক্টিয়ালদিগকে জনতা দূর করিতে বলিল। ভারজিনিয়াস ও তাঁহার কন্যা ভিন্ন সকলেই সেস্থান হইতে চলিয়া গেল, নিষ্ঠুরতার অত্যাচারের শেষ সীমা দেখিতেই যেন তাহারা বিচারক নামধারী অবিচারকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আর কেহই সাহায্য করিতে নাই, ভারজিনিয়াস একবার কাতর নিরাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সকলেই চলিয়া গিয়াছে, প্রীতি ও পবিত্রতার আধার, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, ফুল্লকুমুদরূপিনী কন্যার মুখের দিকে একবার স্থির দৃষ্টিতে চাহিল, উভয়ের চক্ষুই অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তবে কি সত্যই দেবপ্রতিমা ভারজিনিয়া নারকী এপিয়াসের করাল-গ্রাসে নিপতিত হইয়া চির নৈরাশ্যময় অপবিত্র জীবন বহন করিবে? পিতা ও কন্যা উভয়েই কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, অবশেষে ভারজিনিয়াস্ একখানি শানিত ছুরিকা হস্তে কন্যার দিকে ছুটিয়া আসিলেন—প্রভাত সূর্য্য-তাহার উপরে প্রতিবিম্বিত হইল; এপিয়াস্ স্তম্ভিত হইলেন, তিনি কঠোর ভাষায় ভারজিনিয়াস্কে অগ্রসর হইতে বারণ করিলেন, তাঁহার অধীনস্থ লাঠিয়ালদিগকে ছুরিকা কাড়িয়া লইতে আজ্ঞা করিলেন কিন্তু ভারজিনিয়াসের ভীম কান্তি দেখিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হইল না। ভারজিনিয়াস কন্যাকে হৃদয়ে টানিয়া লইল—উভয়েরই উচ্ছাসিত অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ভাসাইয়া বক্ষে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল কিন্তু তখন আর কাঁদিবার সময় নহে, সহসা ভারজেনিয়াস কন্যার হৃদয়ে সবলে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "মা, ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তোর রক্ষায় আমি অসমর্থ"—তীরবেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল, সেই রক্ত স্রোতে পাষণ্ড এপিয়াসের ভীষণ পাশব তৃষ্ণা নিবারিত হইল। সরল বালিকা জীবনের কার্য্যশেষ করিয়া চিরদিনের জন্য নয়ন, যুগল মুদিত করিল।

এইবার প্লেবিয়ানেরা হুঙ্কার করিয়া উঠিল। অত্যাচারের জীবন্ত মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভারজিনিয়াসের সহচরেরা প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল তাহাদের পেট্রিসিয়ান নেতা-(Commanders)-দিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যান্য সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য দলে দলে তাহারা রোমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে উপস্থিত হইয়া সকলেই প্রচার করিয়া দিল যে তাহারা রোম ছাড়িয়া রোমের বাহিরে

নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবে, অত্যাচার পাপ ও কলঙ্কপূর্ণ নগরে বাস করিতে তাহাদের আর তিলমাত্র ইচ্ছা নাই।

এইবার পেট্রিসিয়ানদিগের প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইল, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অত্যাচারী ডিসেম্ভারদিগকে দূর করিয়া তাঁহাদের পরিবর্ত্তে 'কন্সল' নামধারী নূতন কর্ম্মচারীনিযুক্ত করিলেন, ট্রিবিউনের সংখ্যা পাঁচজনের পরিবর্ত্তে দশজন নির্দ্দিষ্ট হইল, এবং ভারজিনিয়াস্ ট্রিবিউন পদে অভিষিক্ত হইলেন; এতদ্ভিন্ন প্লেবিয়ানগণ রোমের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে আবেদন করিবার ক্ষমতা লাভ করিল। ইতিপূর্ব্বে প্লিবিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সময়ে সময়ে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইতেন, এই সময় নিয়ম করা হইল যে যাহারা ট্রিবিউন, ইডিলস্ প্রভৃতি প্লেবিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের উপর কোনও অত্যাচার করিবে তাহারা ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে।

কিন্তু এখনও পেট্রিসিয়ানেরা রোমের সর্ব্বেসর্ব্বা। প্লেবিয়ানদিগের অবস্থাগত অনেক উন্নতি হইলেও এখনও প্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতা পেট্রিসিয়ানদিগের হস্তে। যাহা হউক নিরুৎসাহ না হইয়া প্লেবিয়ানেরা অধিকতর যত্ন ও উৎসাহের সহিত অভিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এখন দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্লেবিয়ানের আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১ম, পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলন, ২য়, প্লেবিয়ানদিগের 'কন্সল' নিযুক্ত হইবার অধিকার। অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা প্রথম বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিল, কিন্তু কিছু দীর্ঘকাল-ব্যাপীযত্ন ও উদ্যমের পর ৩৭৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে লিসিনিয়াস্ ষ্টোলো এবং লুসিয়াস্ সেক্টাস্ নামক দুইজন ক্ষমতাশালী প্লিবী ট্রিবিউন প্লিবিয়ানদিগকে পেট্রিসিয়ানদিগের সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা করিয়া যান, ইহার নাম "লিসিনিয়ান ব্যবস্থা" (Licinian law)। ইহার বিষয়গুলি—

(১) দরিদ্রদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য ধনীগণ সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।

(২) দরিদ্রগণ ঋণমুক্ত হইলে তাহাদিগকে সাধারণ ভূসম্পত্তির (Public land) অংশ দিতে হইবে, অর্থশালী ব্যক্তিগণ কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে চাষ কিম্বা পশুপালনাদি করিতে পারিবেনা।

(৩) অন্ততঃ একজন "কন্সল"ও প্লেবিয়ানদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

পেট্রিসিয়ানগণ প্লেবিয়ানদিগের সহিত অবিশ্রান্ত ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রজাশক্তি সম্পূর্ণ অদমনীয় রহিল; আরও কয়েক বৎসর পরে ৩৬৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে সেকটিয়াস্ প্রথম কন্সল নিযুক্ত হইলেন। যেমন একটি ক্ষুদ্র নির্ঝারণী-উদ্ভূত জল-প্রবাহ সম্মুখস্থিত কোন উপলখণ্ডে বাধা পাইয়া অগ্রসর হইতে পারে না

কিন্তু ক্রমে অধিক জল সঞ্চিত হইয়া অবশেষে তাহাকে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে যাহা পায় তাহাই প্রবলবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ যখন একীভূত প্লেবিয়ানশক্তি পেট্রিসিয়ানদিগের নিকট হইতে একটি প্রধান ক্ষমতা লাভ করিলেন তখন তাহাদিগের অভিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে বাধা দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। ৩৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে কেইয়াস্ মারসিয়াস্ রটিলাস্ প্রথম প্লেবিয়ান ডিক্টেটর নিযুক্ত হন, তাহার ৫ বৎসর পরে তিনিই প্রথম প্লেবিয়ান 'সেনসর' পদে বরিত হন। ৩৩৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাহারা 'প্রিটার' হইবার অধিকার লাভ করে, ক্রমে ৩০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রোমের সমুদয় রাজ কার্য্যেই প্লেবিয়ানদিগের প্রবেশাধিকার জন্মিল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভৃত রূপে তাঁহাদের হস্তগত হইল। ৪৯৪ পূঃ খৃঃ হইতে ৩০০ পূঃ খৃঃ এই প্রায় দুই শত বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় প্লেবিয়ানেরা বিজয়ী হইল। কিন্তু প্লেবিয়ানদের এই দুই শত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ভিতর আমরা ভগবানের মঙ্গল হস্ত দেখিতে পাই। যিনি ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের অদ্বিতীয় এবং মহান্ আকর, তিনি অন্যায়ের ভিতর দিয়া ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করিতে, সত্য ও ধর্ম্মের জন্য দুর্নীতি ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবল পরিশ্রম করিতে প্লেবিয়ানদিগের মস্তকের উপর তিতীক্ষা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে অতি কঠোরতার মধ্যেও আশা ও উৎসাহপূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতীব বিস্ময়কর; পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানেরা সর্ব্বদাই এক নগরে বাস করিত, পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রায় সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ছিল, কিন্তু কেহও কাহাকে শত্রুর ন্যায় দেখিতেন না, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনতা কিম্বা রক্তপাতের নাম গন্ধও ছিল না, প্রবল প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইয়া একদিনের জন্যও তাঁহারা স্ব স্ব ধৈর্য্য কিম্বা প্রশান্ত ভাব হইতে বিচ্যুত হন নাই, কারণ উভয় পক্ষই জানিত এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ন্যায় ও ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। হয়ত অনেকে মনে করিবেন প্লেবিয়ানের পেট্রিসিয়ানদিগের ব্যবস্থা অমান্য করিত কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে, পেট্রিসিয়ান-কৃত আইনের অমর্য্যাদা করা দূরে থাকুক তাহারা অক্ষরে অক্ষরে সেই আইনানুযায়ী কার্য্য করিত, এবং কোন প্রচলিত আইন পরিবর্ত্তিত করিবার সংকল্প করিলে তদনুসারে কার্য্য করিতে করিতেই পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইত, তাহারা বিশেষ বুঝিয়াছিল যে কোন গুরুতর কার্য্যই অচিরে সম্পাদিত হইবার নহে এবং দীর্ঘকালের যত্ন ও উদ্যমে কিছুই অসম্পন্ন থাকে না। যাঁহারা বলেন রাজ-ক্ষনতার বিরুদ্ধাচারী না হইলে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ অসম্ভব তাঁহাদিগকে আমরা রোমের পুরাবৃত্ত পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদিগের ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের জাতীয় মহাসমিতির জীবন ৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে মাত্র। যাঁহারা এই ছয় বৎসরে কিছু মাত্রও ফল লাভের আশা করেন তাঁহারা বাতুল। জাতীয় মহাসমিতি

ভগবানের অনন্ত শক্তির অতি সামান্য অংশের একটি কলিকা মাত্র, এই কলিকা বিকশিত হইতে কত বৎসর লাগিবে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা তাঁহারই কৃপা ও মঙ্গলেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে আমাদের দুর্ব্বলতা ও রাজনৈতিক গগনের গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইব, যদি চলিতে চলিতে পড়িয়া যাই তাহাতেই বা ক্ষতি কি আবার উঠিয়া চলিব, এজগতে কতবার পতন হয়, পতন ভিন্ন কে কোন্ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে? আর পতন হওয়াই বা কি লজ্জার বিষয়? যে পতনের ফল উত্থান সে পতনের অর্থ বীরত্ব, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা। আমরা ভগবানের কৃপায় এক সুদীর্ঘ কালের পর কৃতকার্য্য হইতে পারি। কিন্তু দীর্ঘ চেষ্টায় অবসন্ন হইলে চলিবে না, রোম মহানগরী এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই, কোন কার্য্যই এক দিনের সামান্য উদ্যোগে সুসম্পন্ন হওয়ার আশা অবৈধ, বাধা না পাইলে কোন বিষয়ই কৃতকার্য্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি আশ্রয় করিতে পারে না। কার্য্যময় সংসারে আসিয়া সুখের অভাবে পরিশ্রমের ভারে, প্রতিপদে বাধার জটিল বন্ধনে মৃয়মান হইয়া পড়িবে কেন? 'খাটিতে এসেছি খাটিয়া মরিব' এই ভাবটি মনে রাখিয়া অক্লান্ত ভাবে বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিব, ভগবানের পবিত্র নামে সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে, বর্ত্তমানের অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর অবসানে ভবিষ্যতের এমন মধুর আলোকপূর্ণ, কুসুম-সুরভি-পরিব্যাপ্ত মলয়ানিল পরিসেবিত পাপিয়া-কোকিল কূজিত মনোরম বসন্ত উষা আসিবে যাহার ক্রোড়ে বসিয়া আমরা বর্ত্তমানের কঠোর পরিশ্রমের পর, শান্তিপূর্ণ, প্রীতিপ্রদ বিরাম লাভ করিব।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কার্থেজের মহাশক্তি।

জগতের ইতিহাসে দুইবার দুইজন মহাবীর দুইটি পরাক্রমশালী জাতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন এবং দুইবারই জাতির নিকটে ব্যক্তিকে শেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কার্থেজের মহাশক্তি মহামতি হানিবল প্রাচীন জগতের অধিশ্বর রোমের সহিত সপ্তদশ বৎসর কাল যুদ্ধ করেন। আর ফ্রান্সের মহাশক্তি মহাবীর নেপোলিয়ান্ আধুনিক জগতের অধিশ্বরী ব্রিটেনিয়ার সহিত ষোড়শবর্ষ ধরিয়া যুদ্ধ করেন। একের অসাধারণ স্বদেশাহৈষিতা ও অলৌকিক উদ্যম জামা ক্ষেত্রে ও অপরের ধরাগ্রাসী উচ্চাভিলাষ ও জলন্ত উৎসাহ ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে অবসিত হয়।

এ প্রবন্ধে হ্যানিবলের একটী সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু

হানিবলের অমানুষী-প্রতিভা, অদম্য সাহস, অসাধারণ বীরত্ব, অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ ও জলন্ত দেশহিতৈষিতাপূর্ণ জীবনের বিষয় কিছু বলিতে হইলে তাঁহার জন্মভূমির ও স্ববংশের বিবরণ প্রথমে বলা আবশ্যক। আমরা এ বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। হানিবল্ কার্থেজে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে প্রাচীন সমৃদ্ধশালিনী নগরী টায়ারের * অধঃপতনের সময় তদধিবাসী ফিনিসীয়রা আফ্রিকাদেশের উত্তরস্থ ভূমধ্য সাগরের উপকূলে খৃষ্টের জন্মের ৮১৪ বৎসর পূর্ব্বে এই নগরী সংস্থাপিত করে। সুতরাং হিব্রুদের ন্যায় ইহার অধিবাসীগণও সেমিটিক্ জাতির একটি শাখা। ক্রমে কাল-সহকারে বাণিজ্যের প্রভাবে প্রাচীন জগতে ইহা একটি বিশেষ পরাক্রম ও সমৃদ্ধশালিনী নগরী বলিয়া খ্যাত হয়। ইহার অধুনাতন স্থান যে কোথায় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা বাণিজ্যের দ্বারা প্রাচীন জগতে বিশেষ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এমন কি ক্ষুদ্র কার্থেজ নগরী আফ্রিকার সমস্ত উত্তরদিকে আপনার আধিপত্য বিস্তৃত করে। কার্থেজ অধীন জাতিদের উপর বিশেষ পীড়ন করিত; সুতরাং তাহারাও সুযোগ পাইলে কার্থেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ছাড়িত না।

কার্থেজের শাসন-কার্য্য নিজ ভদ্রবংশীয় ধনী অধিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই প্রকার শাসন প্রণালীকে ইংরাজীতে "Oligarchy" কহে। প্রতি বৎসর কার্থেজে এইরূপে দুইজন ভদ্রবংশীয় ধনী ব্যক্তি প্রধান শাসনকর্ত্তার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। কার্থেজবাসীরা ইহাদের নাম সফেটিস্ রাখিয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে আরও দুইটী রাজ্যশাসন সমিতি ছিল। প্রথমটীতে তিনশতাবধি, দ্বিতীয়টিতে শতাবধি সভ্য ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই সকল শাসনকর্ত্তারা ধনী ও সদ্বংশীয় ছিলেন, ইঁহারা নিজের মধ্যে সর্ব্বদাই ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন কেবল নিরীহ দরিদ্র সাধারণ প্রজাদিগের পীড়নে তাঁহারা সকলে একমত ছিলেন।

কার্থেজের সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিয়া এক্ষণে আমরা রোমের সহিত ইহাদের কি সম্পর্ক, কেনই বা ইহারা পরস্পরে যুদ্ধ করিয়াছিল এ সকল কথা বুঝাইতে প্রয়াস পাইব। বিদেশীয়দের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে বেতনভোগী বিদেশীয় সৈন্যই কার্থেজের প্রধান ভরসাস্থল ছিল। ইংরাজীতে এরূপ সেনাগণকে mercenery troops'

* টায়ার—Syrian দেশের এই বন্দর প্রাচীন জগতে একটি প্রধান নগরী বলিয়া খ্যাত ছিল। ব্যবসায়ের দ্বারা বাণিজ্যে এই নগরী এক সময়ে বিশেষ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য-শালিনী হইয়াছিল। পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্রও এখন বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল পুরাতন স্মৃতির জন্যই ইহার বর্ত্তমান প্রসিদ্ধি।

ও আমাদের শাস্ত্রে ইহাদিগকে 'ভূত' বা 'ভৃত্যবল' বলে *। এই সৈন্যসমূহ কার্থেজের প্রভূত অর্থবলে বশীভূত হইয়া স্পেন্, ইতালী, গ্রীস্ ও লিবিয়া † হইতে আনীত হইত। সার্ডিনিয়া, কর্সিকা ও সিসিলি প্রভৃতি দ্বীপ-সমূহের বিরুদ্ধে কার্থেজের প্রথম যুদ্ধোদ্যম হইয়াছিল। প্রাচীন টায়ারের গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার সময় কার্থেজ আসিয়া সিসিলিদ্বীপ অধিকার করিল। বলা বাহুল্য যে সিসিলি-দ্বীপে টায়ারের উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, কার্থেজ সিসিলি দ্বীপ অধিকার করিয়া তদধিবাসী ফিনিসিয়ান্দিগকে স্ববশে আনিল। এইখানে তাহার প্রতাপ বদ্ধমূল করিয়া সমীপস্থ গ্রীকনগর সমূহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এইস্থানে রোম ও কার্থেজ পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এপর্য্যন্ত রোম ও কার্থেজ পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং তৎপরে দুইতিন বার সেই বন্ধন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু রোম তাহার দক্ষিণদিগবর্ত্তী সুন্দর দ্বীপটিরদিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি পাত করিতেছিল। সকলেরই বোধ হইল যে উভয়ের মধ্যে, নিদাঘ শেষের দিগন্তব্যাপী প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় একটি তুমুল সংগ্রাম বাধিবার আর বড় বিলম্ব নাই। উভয়ের মধ্যে এই অবস্থা দেখিয়া রোম হইতে হতাশ হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ইপাইরাসাধিপতি পাইরাস ‡ বলিয়াছিলেন "হায়, রোম ও কার্থেজের জন্যই কি যুদ্ধ ক্ষেত্র রাখিয়া যাইতেছি!"

কার্থেজের সহিত রোমের যে তিনটি প্রধান হত্যাসঙ্কুল সংগ্রাম হয়, সে তিনটি যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই সংখ্যাতীত সেনানাশ, অজস্র ধন-ক্ষয় ও বর্ষাকালের চাঞ্চল্যে কুল-প্লাবিনী নদীর ন্যায় উভয় পক্ষীয় সৈন্যের শোণিত পাতে রণক্ষেত্র প্লাবিত হয়—তাহার মধ্যে প্রথম যুদ্ধটির সহিত আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কোনও সম্পর্ক নাই। একেত প্রবন্ধলেখক দুর্ব্বল বঙ্গবাসী, সংগ্রামের করাল বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে সহজেই পশ্চাৎপদ তাহাতে আবার হানিবলের জীবনীর সহিত প্রথম যুদ্ধে অত্যল্পই সম্পর্ক আছে সুতরাং আমরা প্রথম যুদ্ধের আদৌ উল্লেখ করিব না। হানিবলের অসা-

* "মৌলং ভৃত্যাঃ সুহৃদ্‌শ্রেণী দ্বিষদাটবিকং বলং" ইত্যমরঃ। 'ভূতং' অথবা 'ভূতবলং' রাজ্ঞো বৃত্তিভোগি সৈন্যং' ইতি বৃত্তিকারঃ। যথাহ কামন্দকঃ "বৃত্তেশ্চ সাম্যাধীনত্বাশ ভূতঃ শ্রেণীবলাদ্ গুরু। তুল্য সংহর্ষণামর্ষাৎ সিদ্ধালাভাৎ তুথৈব চ॥"

† ইজিপ্তের পুরাতণ নাম "লিবিয়া"। cf. 'We drank the Libyan sun to sleep' Tennyson.

‡ Pyrrhus ইপাইরাস নামক গ্রীসদেশের অধিপতি ও স্বয়ং একজন বিখ্যাত যোদ্ধ-পুরুষ। ইনি Tarentines নামক ইতালীর দক্ষিণদিকদেশবাসী জাতির সাহায্যে রোমজয় মানসে আইসেন; কিন্তু দুই একটি যুদ্ধে বিশেষ সেনাক্ষয় হওয়ায় বিজয় আশে হতাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ধারণ বীর্য্য ও সাহস দেখাইতে গেলে আমাদের কেবল মাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ বর্ণনা করিলেই যথেষ্ঠ হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হানিবলের সৈনিক জীবন প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় পিউনিক্ * সংগ্রাম হইতেই আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বীর-শ্রেষ্ঠ পিতা হামিল্কারের নিকট অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল, নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতা এবং রোমের উপর দারুণ ঘৃণা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে প্রথম পিউনিক যুদ্ধের উদ্যোগের নিমিত্ত স্পেনে যাইবার পূর্ব্বে হামিল্কার নবমবয়স্ক হানিবল্‌কে কার্থেজের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার মন্দিরের সম্মুখস্থিত পবিত্র বেদী স্পর্শ করাইয়া এই শপথ করাইয়া লন যে তিনি যেন আজীবন রোমের উপর শত্রুতা ও নিদারুণ ঘৃণা পোষণ করেন। হানিবলের সমস্ত জীবন সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে এই গল্পটিরই যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়। সে যাহা হউক, প্রথম যুদ্ধে হামিল্কারের ও তদীয় জামাতা হাস্‌ড্রুবলের রণক্ষেত্রে ক্রীতদাস হস্তে মৃত্যু হওয়াতে হানিবলের উপর যুদ্ধের সমস্ত ভার পড়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের মধ্যে ২২ বৎসর ব্যবধান। ইহার ভিতর কেহ মনে করে নাই যে উভয় জাতির মধ্যে আবার একটি ভীষণ সংগ্রাম এত সন্নিকট। কেহ মনে করে নাই যে দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ব্বে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ইতালীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে অনল আবার সহজে উদ্দীপিত হইবে। কেহ মনে করে নাই যে সেই ভীষণ অশনিনাদ যাহাতে দ্বাবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছিল তাহা আবার সহসা শুনা যাইবে। যদি আমরা এই স্থলে নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের অনুসরণ করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে হানিবলই এই দ্বিতীয় যুদ্ধের উদ্রেকের প্রধান কারণ। অনুক্ষণ তাঁহার পিতৃসমক্ষে পূর্ব্বশপথের কথা মনে পড়িত এবং ঐ পবিত্র শপথই যেন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠিত করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই মানস চক্ষে তৎকৃত রোমরাজ্যের অধঃপতনের চিত্র মনে মনে চিত্রিত করিয়া কতই না সুখী হইতেন। তাঁহার বীরশ্রেষ্ঠ পিতা ও ভগিনীপতি যে কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই তিনি তাহা উদ্‌যাপিত করিতে প্রাণপণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাঁহার পিতা ও তৎপরে তাঁহার ভগিনীপতি স্পেনদেশে আপনাদের প্রতাপ বদ্ধমূল করিবার

* রোমের সহিত কার্থেজের যে যুদ্ধ হইয়াছিল রোমীয়েরা ঘৃণাসহকারে তাহার নাম দিয়াছিলেন Punic সংগ্রাম। Punic শব্দের অর্থ অবিশ্বাসী (false)। ইংরাজীতে Punic faith একটি প্রবচন।

জন্য "নূতন কার্থেজ" (New Carthage, the modern Cartagena) নামক নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সদাচার ও সদ্ব্যবহারে চতুস্পার্শস্থ অধিবাসীদিগকে বশীভূত করেন। কালক্রমে উভয়েরই মৃত্যু হওয়াতে (তাঁহাদের মৃত্যুর বিবরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) যুদ্ধোদ্যম প্রভৃতির ভার বড়বিংশ বয়স্ক যুবক হানিবলের উপরেই ন্যস্ত হয়। তিনি আপন অধীনস্থ সেনাবর্গের উপর এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে তাহারা সকলে একবাক্যে তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করে। বলা বাহুল্য যে হানিবল্ এখন স্পেনে। এ সংবাদ কার্থেজে গিয়া পৌঁছিল। কার্থেজের শাসন কর্ত্তারা একার্য্যে সম্মত হইলেন। হানিবল্ সেনাপতি পদে বৃত হইয়া স্পেনে স্বীয় প্রতাপ আরও দৃঢ়তর করিতে প্রয়াসী হইলেন। দুই বৎসরের মধ্যে তিনি দুই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ইহাতে আইবিরস্ (Iberus, modern Ebro) নদীর দক্ষিণদিকের সমস্ত দেশ তাঁহার অধিকারে আসে। তৃতীয় বৎসরে তিনি সেগাণ্টাম্ নগরী আক্রমণ করিলেন।

এই নগরীর আক্রমণেই রোমানদের সহিত কার্থেজের দ্বিতীয় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কার্থেজের কোন মিত্র স্পেনীয় জাতিকে সেগাণ্টামের কর্ত্তৃপক্ষগণ উৎপীড়িত করিয়াছে এই ছলনায় হানিবল্ উক্ত নগরীকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কোন কৌশলেই এই যুদ্ধে বাধা দিতে পারিতেন না, কারণ এই নগরীর ধ্বংশের সঙ্কল্প হানিবল পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ইহার সহিত বিবাদে রোমের সহিত যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে (কারণ ইহা একটি রোমের আশ্রিত নগরী) ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রথম দুই বৎসরের যুদ্ধের ন্যায় তিনি এই নগরীকে সহজে জয় করিতে পারিলেন না। সেগাণ্টাম্ নগরী যদিও আদিম স্পেনীয় জাতির আবাসভূমি ছিল না, তথাপি ইহা তাহাদিগের নিকট যুদ্ধে জলন্ত উৎসাহ ও শত্রুর আক্রমণ হইতে নগররক্ষণে অদম্য অধ্যবসায় শিখিয়াছিল। ৮মাস ধরিয়া এই যুদ্ধটি চলিয়াছিল। ইহার পর যখন জয়ের আর কোন আশা রহিল না তখন নগরবাসীরা ও প্রধানেরা প্রাচীন রাজপুত-জাতির ন্যায়, প্রকাশ্য বিপনির স্থানে এক ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া স্ব স্ব বহু মূল্য মণিমাণিক্যাদি নানাশিল্প-কার্য্য-খচিত বস্ত্রাদি ও আর আর সমস্ত সুন্দর ও অমূল্য দ্রব্যাদি সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে সুন্দরী প্রিয়তমাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সকলে অকাতরে অগ্নিকুণ্ডে সকলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। যখন হানিবল নগরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন জীবন্ত জন-মানবও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল চারিদিকে অগ্নিশিখা ও ভস্মরাশিতে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন। বিখ্যাত গ্রীক্ ঐতিহাসিক পোলীবিয়াস্ এই নগরের ধ্বংশের একটি উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সে যাহা হউক এই ভগ্নাবশিষ্ট নগরী হইতেও হানিবল বিপুল ধন ও অনেকানেক উৎকৃষ্ট চারু কারুকার্য্যের দ্রব্যাদি ও অনেকানেক বন্দী সংগ্রহ করিলেন। বন্দীগুলিকে নিজ সেনাদের মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং যে প্রচুর ধন রাশি

পাইয়াছিলেন তাহা যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত রক্ষিত হইল। চারু শিল্পজাত দ্রব্যাদি সকল কার্থেজের দেবদেবীগণের মন্দিরের শোভা পরিবর্দ্ধনার্থে প্রেরিত হইল।

ক্রমে সেগাণ্টামের জয়ের সংবাদ রোমে পৌছিল। এ সংবাদ পাইবামাত্রই রোম হইতে কার্থেজে দূত প্রেরিত হইল। বিডটিও যিনি ২০ বৎসর পূর্ব্বে কন্সাল * হইয়াছিলেন, তিনি এবং লিসিনিয়াস্ ভেরাসকয় আর ট্যামফিলাস্, এই কয়জন দূত-স্বরূপে প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ ছিল যে তাঁহারা স্পেন সেগাণ্টামের উপর কার্থেজের অযথা অক্রমণের কথা কার্থেজের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। আরও যেন তাঁহাদের বুঝাইয়া বলেন যে উক্ত নগরীর আক্রমণে রোমের সহিত কার্থেজের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার চুক্তিভঙ্গ হইয়াছে। একথায় যদি তাঁহারা কর্ণপাত না করেন তবে যেন কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। রোমীয় রাজদূতগণ কার্থেজে পৌছিয়াই কার্থেজের রাজ্যশাসনসমিতির সমক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলাতে তাঁহারা প্রথমে সেগাণ্টাম নগরীর আক্রমণ সন্ধিবিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, এই কথা লইয়াই তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু রোমীয় দূতেরা এ আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে, অনেক বচসার পর পূর্ব্বোক্ত রোমীয় দূত বিউটিও তাঁহার টোগার (রাজ কর্ম্মচারীর উত্তরীয় বস্ত্র-বিশেষ) কোন দ্রব্য বাঁধা আছে এমন ভাবে উঠাইয়া বলিলেন 'এই বস্ত্রে আমার 'যুদ্ধ' ও 'সন্ধি' বাঁধা আছে, ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন।' এই কথা শুনিয়া জনেক কার্থেজের বিচার-কর্ত্তা (সফেটী) বলিলেন 'যাহা ইচ্ছা হয় আপনিই প্রদান করুন।' ফেবিয়াস্-বিউটিও টোগা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন "তবে আমরা 'যুদ্ধ' দিতেছি"। এই কথায় সমিতির অনেক সভ্য একস্বরে বলিয়া উঠিল "আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিলাম।" অতঃপর রোমীয় রাজদূতেরা রোমে ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপে দ্বিতীয় পিউনিক সংগ্রামের আরম্ভ হইল। এই ভয়াবহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রোমকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল ইহা আমরা পরে দেখিব। এই যুদ্ধ পরে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া প্রথম কয়েক বৎসর, প্রাচীন জগতের অদ্বিতীয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যশালিনী রোমনগরীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই যুদ্ধ ঘটনার ১৭৩ বৎসর পূর্ব্বে গল্‌জাতির দ্বারা রোম ভস্মীভূত হয়। সে দারুণ অত্যাচারের চিহ্ন সমূহ এ যুদ্ধের সময় পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নাই। এপর্য্যন্তও রোম রাজধানীর সঙ্কীর্ণ রাজমার্গে, সত্বর ও অযত্ন নির্ম্মিত প্রাসাদ সমূহে, গল্-কৃত পূর্ব্ব অত্যা-

* কন্সাল—ক্ষমতাশালী রোমের শাসনকর্ত্তা প্রতি বৎসরে ইহাঁরা নিজ কার্য্যগুণে নির্ব্বাচিত হইতেন। রাজ্যের ও সৈন্যের উপর ইঁহাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিত, এবং ইহারাই রোমের রাজ্যশাসন সমিতি গঠিত করিতেন। রোম রাজ্যশাসনে ইঁহাদের সর্ব্বোচ্চ পদ। বিপদ্কের সময় ইঁহারাই Dictator পদে নিয়োজিত হইতেন।

চারের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। চঞ্চলা বিজয়লক্ষ্মী প্রথম কয়েক বৎসর বিপক্ষ সেনাদলকে আশ্রয় করাতে অনেকে ভীতিসঙ্কুলচিত্তে গল-কৃত অত্যাচারে রোমের দুর্দ্দশার কথা ভাবিতেছিলেন। প্রথম কয় বৎসরের যুদ্ধের ফল দেখিয়া অনেক রোমীয় পণ্ডিতকেশ ও জ্ঞানবৃদ্ধ রাজ-কর্ম্মচারীরা ভবিষ্য-অন্ধকারের ভীষণ করাল ছায়া দেখিয়া ও রোমের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। এই মহাভীতির কারণ বিপক্ষপক্ষের বিজয়ী সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ হানিবল্। বস্তুতঃ, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ অসাধারণ শৌর্য্য, সাহস ও যুদ্ধ-কৌশল দেখাইয়াছিলেন তাহা জগতে অতুল্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে আমাদের কেবল হানিবল্-রূপী উজ্জ্বল তারকার প্রখর জ্যোতির প্রতিই দৃষ্টি পড়ে। এই ঘোর ঘনঘটায় কেবল হানিবলরূপ বিদ্যুতের আলোকে পথিকের নয়ন ধাঁধিয়া যায়। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

পালিতা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবু তাঁহার পাঠ-গৃহে অস্থিরচিত্তে পদচারণ করিতেছিলেন, চারু আসিয়া কহিল—"আপনি ডাকিয়াছেন?" জগৎ বাবু সচকিতে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার রুষ্ট, ভ্রুকুটী কুটীল, যন্ত্রণা-বিবর্ণ অন্ধকার মুখ দেখিয়া চারুর হৃৎকম্পিত হইল, আর একদিন সে তাঁহার এইরূপ ভীম মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, কবে কোথায় মনে পড়িল না; মনে করিবার সময়ও ইহা নহে; সংশয়ে, ঔৎসুক্যে তাহার অন্য চিন্তার ক্ষমতা পর্য্যন্ত এখন নাই। অধিকক্ষণ কিন্তু তাহাকে এ সংশয়ের মধ্যে থাকিতে হইল না, জগৎ বাবু সম্মুখের চৌকিতে চারুকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজে আর একখানিতে উপবিষ্ট হইয়াই বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"চারু তুমি আমাকে মিথ্যা বলিয়াছিলে? স্নেহকে তুমিই তাড়াইয়াছ?"

এতদিনের পর সহসা আবার এই প্রশ্ন! আবার কি হইয়াছে! নির্ব্বাক, বিস্মিত, ত্রস্ত, স্তম্ভিত হইয়া সে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল, জগৎ বাবু আবার বলিলেন—

"তোমার এই জঘন্য অধর্ম্মাচরণ দেখিবার জন্যই কি আমি বাঁচিয়া ছিলাম? ভগবান!

কি অপরাধে এমন কুলাঙ্গার আমার সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিল! পাষণ্ড, সে অবলা পুণ্যাত্মা, দেবী প্রতিমা, তাহার প্রতি অত্যাচার—"

জগৎ বাবু আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না, অতিরিক্ত কণ্ঠাবেগে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু চারুর মুখ ফুটিল, এরূপ অপবাদ তাহার অসহ্য, কেন না ইহা অন্যায়, মিথ্যা। সে বলিল, আমি তাহাকে অধর্ম্মের পথে লইয়া যাই নাই, আমি তাহার প্রতি অত্যাচার করি নাই, আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম।"

জগৎ বাবু তীব্র স্বরে বলিলেন—"হ্যাঁ ভাল বাসিয়াছিলে, তাই ভালবাসার দায়ে তাহাকে পথের ভিকারী হইতে হইয়াছে! বলিতে লজ্জাও করে না!"

চারু। সে সাধ করিয়া গিয়াছে আমার দোষ নাই, আমি তাহাকে বিবাহ পর্য্যন্ত করিতে চাহিয়াছিলাম।

জগৎ-বাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিলেন—"চুপ চুপ, এরূপ আত্মরক্ষা না করিয়া গলায় দড়ি দিতে তো পারিতিস। আজীবন যাহাকে বোন বলিয়া আসিয়াছিস তাহাকে বিবাহ! এরূপ জঘন্য, ঘৃণ্য, পাপময় নারকী প্রস্তাব তোর মুখেই শোভনীয়, কিন্তু অন্যে এ কথা শুনিলেও তার মহা পাতক!"

চারু চুপ করিয়া রহিল, জগৎ বাবু দম লইয়া কিছু পরে বলিলেন, "এখন বুঝিয়াছিস, স্নেহলতা কেন বাড়ী ছাড়া হইয়াছে, এখন বুঝিয়াছিস, ইচ্ছা করিয়া কেন সে আগুণে ঝাঁপ দিয়াছে?

চারু কোন উত্তর করিল না, কেন না সে তাহা বুঝে নাই।

জগৎ বাবু বলিলেন, "যদি নিজের অন্যায় বুঝিয়া থাকিস ত প্রায়শ্চিত্ত কর, আর যদি বুঝিয়াও না বুঝিতে চাস, ত এই অন্যায়ের প্রতিবিধান আমি করিব।"

চারু। অজ্ঞাতসারে, অনাভপ্রায়ে তাহার প্রতি যদি অন্যায় করিয়া থাকি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি বিমুখ নহি। যদি আমা হইতে এখনো তাহার কোন উপকার হইতে পারে, তাহার সুখ ফিরিতে পারে—আমি করিতে প্রস্তুত। কি করিব—বলুন।

জগৎ। বিশেষ কিছুই না। আমি তাহাকে আমার বিষয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক লিখিয়া দিতেছি, তুমি সাক্ষী হইয়া নাম সই কর।

চারু সহসা যেন বজ্রাহত হইল, যদিই বা চারু স্নেহের প্রতি কিছু অন্যায় করিয়া থাকে সে অন্যায় বিষয় দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করার মত নহে! চারু আত্মস্থ হইতে সময় লইয়া বলিল, "কিন্তু বিষয় পাইয়া তাহার কি লাভ! একলা মানুষের পক্ষে মাসহারাই ত যথেষ্ট। অতটা বিষয় হাতছাড়া হইলে আমাদেরই কেবল লোকসান।

জগৎ। এই না তোমার ভালবাসার তুমি অহঙ্কার করিতেছিলে? এই না তুমি তাহার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলে? আর এখন তাহাকে অর্দ্ধেক বিষয়

দিতে দেখিয়া এত দুঃখ! যে বিষয় সম্ভবতঃ সে নিজে ভবিষ্যতে তোমাদেরি দিয়া যাইত।

চারু। জীবনকেও দিতে পারে।

জগৎ। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিক্, আমার বিষয়ের অর্দ্ধেক তাহার।

জগৎ বাবু কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। চারুর হৃদয়ে ছুরিকার আঘাত করিতে করিতে লেখনী দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হইয়া বাড়ী, ঘর, জমীদারী, একে একে অর্দ্ধেক নামান্তরিত করিতে লাগিল, আহত হীনবীর্য্য সর্পের ন্যায় চারু এই মর্ম্মান্তিক আঘাত সহ্য করিয়াও অক্ষম নিরুপায় ভাবে নীরব হইয়া রহিল।

দান-পত্র লেখা হইলে জগৎ বাবু তাহাকে বলিলেন,—"শোন্, শুনিয়া সই কর্।"

চারু আর পারিল না; অনেকক্ষণ ধরিয়া সে চুপ করিয়া শুনিয়াছে, তাহার উষ্ণ উত্তপ্ত, বিদীর্ণশীল মস্তিষ্ককে আর সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"শুনিব, আগে আপনি শুনুন, আপনি কি মনে করেন আমারি সমস্ত দোষ; তার কোন দোষ ছিল না?"

জগৎ। চুপ কর্, বিষয়ের লোভে তাহাকে দোষী করিস নে। নরাধম, তুই আমার ত্যাজ্যপুত্র, অর্দ্ধেক বিষয় তাহাকে দিতেছিলাম, এখন সমস্তই তাহার।

চারু। বিষয় দিতে হয় দিন, কিন্তু জানিয়া রাখুন, সে যে নিতান্তই দেবী তুল্য—আর আমি জঘন্য নরকের কীট, সত্য তা নয়।

জগৎ। পাপিষ্ঠ, চুপকর, দেবতা আসিয়া সহস্র জিহ্বায় তাহার দোষ কীর্ত্তন করিলেও আমি সে কথায় বিশ্বাস করি না।

চারু। দেবতার কথায় বিশ্বাস না করুন তাহার নিজের কথায় ত করিবেন? এই দেখুন স্নেহের নিজের হাতের চিঠি।

চারু পকেট হইতে স্নেহের পত্রখানি বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল, জগৎবাবুর মুখ শবের মত বিবর্ণ হইয়া পড়িল। পত্র উঠাইয়া লইতে ইচ্ছা নাই, ক্ষমতা নাই, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—অথচ না দেখিলেও ভীরুতা প্রকাশ পায়, সত্যাসত্য বিচার করা যায় না, তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মাথা ধরিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, পরে আবার পত্রের দিকে মুগ্ধের মত চাহিয়া চাহিয়া কিছু পরে তাহা হাতে উঠাইয়া লইলেন, কয়েকবার পত্রখানির এ পিঠ ও পিঠ ওলট পালট করিয়া আবার তাহা রাখিয়া দিলেন। চারুর আর ধৈর্য্য রহিল না; তাহার অধীরতাসূচক কণ্ঠ শব্দে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জগৎ বাবু পত্রখানি চোখের উপর উঠাইলেন, অক্ষরগুলিতে চোখ বুলাইয়া গেলেন, একবার নহে দুইবার নহে, বারবার চোখ বুলাইতে লাগিলেন তবুও সমস্ত পত্র পড়া হইল না; সমস্ত

হৃদয়ঙ্গম হইল না, ছাড়া ছাড়া দুই একটি ছত্রে মাত্র মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় বার বার তাঁহার নয়ন রক্ষিত হইতে লাগিল।

"আমার হৃদয় যন্ত্রণায় পুড়িতেছে,"

"তুমি অভাগিনীর প্রাণ হইতেও প্রিয়তম"

"তুমি আমার সর্ব্বস্ব"

"তোমা হইতে দূরে বাস করা আর নরকে বাস করা, দু-ই আমার সমান"

সত্যই কি তবে স্নেহলতা চারুকে অনুরাগ দেখাইয়া বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল!—হায়! মানুষ কি চপল লঘুচেতা! এই না জগৎ বাবু একটু পূর্ব্বে বলিতেছিলেন, দেবতা আসিয়া বলিলেও স্নেহের দোষ তাঁহার অবিশ্বাস্য!

কিন্তু মুহূর্ত্তের এই সংশয়েতেও দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, তিনি তখনি বলিয়া উঠিলেন—"না না, মিথ্যা কথা—সেই ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা, শান্ত সংযত বিধবা, এইরূপে পর পুরুষের নিকট আপন অনুরাগ প্রকাশ করিবে! মিথ্যা কথা, জাল চিঠি।"

পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার প্রতিধ্বনির মত বলিল,

"মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, এ পত্র তাহারি লেখা, সে পাপীয়সী, সমস্ত তাহারি দোষ।"

জগৎ বাবু চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন—স্নেহলতা। তাহার মূর্ত্তি বিবর্ণ, বিবশ, বেত্র-লতার মত কম্পমান। জগৎ বাবু চৌকী হইতে উঠিয়া না দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্ন-লতার মত সে ভূমিশায়ী হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এ কি সত্য না মিথ্যা ভ্রম! সত্যই কি স্নেহলতা আবার সুখের রাজ্যে আলোকের ধামে আনন্দের নিকেতনে অগ্রসর হইতেছে? তাহার বহুদিনের বিরহতপ্ত, শূন্য-মরুময়, মৃত জীবন সেই আজন্ম-আকাঙ্ক্ষিত সঞ্জীবনী, অমৃত-দৃষ্টি সংস্পর্শে সত্যই কি এখনি আবার, সুধা-শীতল, জীবন্ত হইয়া উঠিবে, না সমস্তই শূন্য কল্পনা, আশার মরীচিকা, মোহ স্বপ্ন?

আশায় সংশয়যুক্ত, আনন্দে উদ্বেলিত, সুখে ম্রিয়মান হইয়া স্নেহলতা যখন জগৎ বাবুর ত্রিতল গৃহে ধীরে ধীরে বিকম্পিত চরণ রক্ষা করিল, তখন সহসা অপূর্ব্ব বিদ্যুৎ প্রবাহে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত স্তম্ভিত হইয়া গেল, এক পুরাতন, পরিচিত, বীণা হইতে সুমধুর, অনুপম আনন্দময় স্বর তাহার কর্ণে বাজিয়া উঠিল! এ কাহার স্বর তাহা সে বুঝিতে পারিল না; চারুর আকুল আগ্রহময় স্বর যেন মোহনের বহু-দিন-বিস্মৃত কামল সুমধুর কণ্ঠে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব্বমিলনতানে পরিপূর্ণ সমাদরে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। আর সংশয় নাই, তর্ক নাই, আবেগ নাই,

উৎকণ্ঠা নাই, কি এক পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে স্নেহলতা আত্ম-হারা। যে মুহূর্ত্তে শরীরী কালাতীত সীমাতীত হইয়া অশরীরী আত্মাময় জীবন্মুক্তি অনুভব করে, সুখ-দুঃখ-ভোগী জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া পরমানন্দরূপ প্রাপ্ত হয়, যোগী ঋষিগণ বহু সাধনায় যে মুহূর্ত্তকে চিরায়ত্ত করিতে পারেন না—এবং সংসারী বহু পুণ্য-ফলে কদাচিৎ যাহার দর্শন পায়;—সেই দেব দুর্ল্লভ, পুণ্যময়, আনন্দময় মুহূর্ত্তের মধ্যে স্নেহলতা সহসা সমাধি-মগ্ন। শোক দুঃখ, বিষাদ অবসাদ, বাসনা কামনা তাহার চতুঃসীমা হইতে তিরোহিত। চরাচর প্রসারিত, পুণ্য লহরী হিল্লোলিত এক অদ্বিতীয় পুলক মহাসমুদ্রে ব্যাপ্যমান, অবগাহিত হইয়া নির্লিপ্ত, নিস্তরঙ্গ, স্থির, নিশ্চল, আত্মারূপ নিরাকার স্নেহলতা সাকারে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া।

এ মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তে অপহৃত হইল, স্নেহলতার সমাধি ভঙ্গ হইল, চারুর স্বর আর তাহার কর্ণ পথে নাই, তাহার আনন্দের বিহ্বলতা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে জগৎ বাবুর রুষ্ট স্বরে সে চমকিয়া উঠিয়া বজ্র-ধ্বনিতে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় দুরু দুরু হৃদয়ে সেই দিকে মনোনিবেশ করিল। "এ কি ব্যাপার! কাহাকে জগৎ বাবু বিষয় দান করিবেন? চারু কাহার নিন্দা করিতেছে?" স্নেহলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারু যখন বলিল "দেবতার কথায় বিশ্বাস না করুন। তার নিজের কথায় ত করিবেন এই দেখুন স্নেহের নিজের হাতের চিঠি"—তখন স্নেহের আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না, সে জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়াছে, কিন্তু সহিষ্ণুতারও ত একটা সীমা আছে? যে জ্বলন্ত কষ্টে সিজার "অ্যাঁ, তুমি-ও ব্রুটাশ!" বলিয়া শত্রু ছুরিকায় বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন, সেই ভীষণ যন্ত্রণায় স্নেহলতা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হৃদয়ে অসীম যন্ত্রণা, প্রচণ্ড অগ্নিদাহ; অগ্নি অতি ভীষণ, চরাচর-নাশী, বিপুল শিখা, কিন্তু জ্বলন্ত জ্যোতি নহে, ধূম-জমাট অন্ধকারময়। সেই মহাভীম বিরাট কৃষ্ণাগ্নিরাশি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মস্তিষ্ক শতধা ভেদ করিয়া প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক প্রলয়ান্ধকারে নিমজ্জিত করিল। আবার সেই পুরাতন দৃশ্য! ভীমান্ধকারে স্নেহলতার সেই প্রখর, সুতীক্ষ্ণ, দিব্য দৃষ্টি; এবং সেই দৃষ্টির সম্মুখে জমাট অন্ধকার বিরাট বেশে মূর্ত্তিমান। কিন্তু এ মূর্ত্তি সে শ্মশান মূর্ত্তি নহে, শব মণ্ডলীর ভীষণ নৃত্য ইহাতে নাই, এক মহাকায়া মহাছায়া ভীমরূপা স্ত্রী-মূর্ত্তি তাহার নয়ন পথ পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান। মৃত্যু-দেবতা প্রলয়াধিশ্বরী মহাকালিকা মহামায়া কি করুণা করিয়া স্নেহলতাকে দর্শন দিলেন? কিন্তু কোথায় তাঁহার লোলজিহ্বা, নরমালা, শাণিত কৃপাণ?

রমণীর বিরাট কায়া ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া এক কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তর-মূর্ত্তি রূপ ধারণ করিল, স্নেহলতা তাহাকে চিনিতে পারিল, বহুদিন পূর্ব্বে বাল্যকালে বড় যন্ত্রণার

সময় তাহাকে আর একবার সে দেখিয়াছিল। সে দিন তাহার মুখ কঠোর উপহাসময় ভাবে পূর্ণ ছিল, আজ করুণাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে, মমতা-বিষণ্ণ সুগম্ভীর মুখে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া সে স্নেহকে নিকটে আহ্বান করিল। স্নেহলতা মুগ্ধের ন্যায় নিকটে আসিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে কহিল, "দেবি, বড় জ্বালা,—বিষ,—মৃত্যু, এ যন্ত্রণা আর সয় না।"

সে দয়ার্দ্র স্বরে কহিল—"বিষ নহে সুধা দিব, মৃত্যু নহে জীবন দিব, এখনি তোমার সমস্ত যন্ত্রণা ঘুচিবে; মুখ খোল!"

স্নেহলতা তৃষ্ণা পূরিয়া তাহার হাত হইতে অমৃত পান করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহাকে নমস্কার করিবা মাত্র যাদুকরী অট্টহাস্য করিয়া অন্তর্ধ্যান হইল, অমনি মোহনিদ্রা-ভঙ্গে ক্ষণিক উন্মত্ততা ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্নেহলতা চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই, সে একাকী সেই ঘরে পশ্চিমের দেয়ালের ঔষধ-সজ্জিত কাষ্ঠ-স্তরের সম্মুখে এক খালি শিশি হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাত পা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে মাথা ঘুরিতেছে। বলা বাহুল্য সে তাহার মোহাবস্থায় এই শিশি হইতে বিষ ঢালিয়া পান করিয়াছে। ঔষধের শিশি তাড়াতাড়ি থাকে রাখিয়া স্নেহলতা অন্তর-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল, এই সময় আবার শুনিল, জগৎ বাবু বলিতেছেন—"মিথ্যা মিথ্যা, তুমি জাল করিয়াছ, এরূপ চিঠি সে লিখিবে না", স্নেহলতার পূর্ব্ব ঘটনা আবার সমস্ত মনে পড়িল, সে পশ্চাতে আসিয়া কহিল "মিথ্যা নয়, এ পত্র তাহারি লেখা, সে পাপীয়সী, সমস্ত তাহারি দোষ!"

কথা কহিতে কহিতে স্নেহলতা অজ্ঞান হইয়া ভূমিশায়ী হইল, জগৎ বাবু তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া কহিলেন—"মা উঠ উঠ, দোষ করিয়াছ, কে না করে—এত কষ্টে কে না করে? তাহাতে লজ্জা কি মা, ওঠ ওঠ, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, ঘর পূর্ণ করিয়া থাক, এ বৃদ্ধকে আর ফেলিয়া যাইও না, মা!"

স্নেহলতা নীরব, সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল, মুখ কালিময় হইয়া পড়িল, জগৎ বাবু ব্যস্ত হইয়া নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন, নাড়ি পাইলেন না, বুঝিলেন, সে বিষপান করিয়াছে; আর আশা নাই। কষ্টে অধীর হইয়া কাঁদিয়া কহিলেন "নিষ্ঠুর এই জন্য একবার দেখা দিতে আসিয়াছিলি!" তাঁহার অশ্রু-সিক্ত কাতর মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহলতা প্রাণ ত্যাগ করিল।

চারু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপসংহার।

স্নেহলতা আর নাই, কিন্তু সংসার তবুও চলিতেছে, সুখে চলিতেছে। এমন কত স্নেহলতা দিন দিন মরিতেছে, তবু সংসারের মুখে চিরহাসি। জগৎ বাবু মনে করিয়াছিলেন স্নেহের মত আর কাহাকেও ভাল বাসিবেন না, কিন্তু চারুর এখন পুত্র কন্যা হইয়াছে, পৌত্রীকে তিনি স্নেহলতার মতই ভাল বাসেন—সুবালার হাসিটি তাঁহার ঠিক স্নেহের মত মনে হয়, সুবালাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার হৃদয় তেমনি আনন্দ পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাকে পাইয়া তিনি আবার পূর্ব্বের জগৎ বাবুই হইয়াছেন। এক বিষয়ে কেবল তিনি সম্পূর্ণ বদল, তিনি আর সমাজ সংস্কারের কথা সহ্য করিতে পারেন না, তিনি এখন পূর্ণ মাত্রায় রক্ষণশীল হিন্দু। তাঁহার মনে হয় স্নেহকে লেখা-পড়া না শিখাইলে সে বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার অদৃষ্ট বহন করিতে পারিত, আপনার অধঃপতন, মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিত না। জগৎ বাবুর বিশ্বাস,লজ্জায় ও অনুতাপেই স্নেহ আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং জগৎ বাবু কালস্রোত রুদ্ধ রাখিতে আজ কাল প্রাণপণে সচেষ্ট।

প্রেম।

আমরা কাহাকেও যখন ভালবাসি, তখনি যে আমাদের ভালবাসার উদয় তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিবার বহু পূর্ব্বেই আমরা ভালবাসি। কথাটা শুনিতে কিছু অদ্ভুত কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত অমূলক নয়। ভাল বাসিবার আগে ভালবাসার প্রসর অসীম, কোন বস্তুর কাঠাম নির্ম্মিত হইলেই তাহার ছায়াময় অনন্ত পরিসর চলিয়া যায়, তাহা সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, সুতরাং ব্যক্তি বিশেষকে ভাল বাসিলে, ভালবাসার আয়তন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহারি পরিচয় প্রদান করে। তাহার পূর্ব্বে, স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রত্যেক সুদৃশ্য শোভা, প্রত্যেক সঙ্গীত সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রসারিত কল্পনা-তরঙ্গ, লতাপাতা গাছ ফুল, চন্দ্র সূর্য্য সকলেই তখন তাহার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার অসংখ্য প্রেমরূপ বিকাশ, বিশ্বের আকাশ তখন তাহার যৌবন স্বপ্ন পরিব্যাপ্ত সুতরাং

স্বপ্নই তখন তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব। স্বপ্ন জগতের এই কাল্পনিক মূর্ত্তি তখন আমরা জাগ্রত জীবনে ধরিতে পারি না, তাহারা গোলাপ নহে তাহার রং মাত্র, তাহারা দীপ নহে, শুধু আলোক মাত্র, তাহারা মূর্ত্তি নহে, কেবল ভাব মাত্র। কেহ কেহ বলেন ইহাই জীবনের চরম সুখের অবস্থা।

২

কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? পরিণতি ভিন্ন সংযতি ভিন্ন প্রকৃত সুখ সম্ভবে না। যখন আমরা ব্যক্তি বিশেষকে বা উদ্দেশ্য বিশেষকে ভালবাসি, তখনই আমাদের ভালবাসার কেন্দ্র গঠিত হয়, তখনি আমাদের বিশৃঙ্খল, অসংযত, ছায়াময় ভালবাসা জমাট বাঁধিয়া জ্যোতির্ম্ময়, মূর্ত্তিময়, সজ্ঞান, পরিস্ফুটাকারে উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্ম্মণ্য হইয়া জগতের কার্য্য সাধিত করে। তখন প্রেমের আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায় বটে, তাহার আকাঙ্ক্ষা সংযত হইয়া আসে বটে, কিন্তু তাহার জ্যোতি আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একজনকে ভাল বাসিলে আমরা জগতকে ভুলিয়া যাই না, বরঞ্চ কেন্দ্রাবলম্বী সংযত প্রেমে জগৎকে পর্য্যন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় জ্যোতিদানে সমর্থ হই। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, যেমন বাষ্পাবস্থা হইতে জমাট সৌরজগৎ এবং তাহা হইতে আবার তাহার বাষ্প-প্রবণতা, সেইরূপ আমাদের ভালবাসাও ছায়াময় হইতে মূর্ত্তিমান, এবং মূর্ত্তিমান হইতে আবার বিশ্বব্যাপী। ইহাতেই ভালবাসার মহত্ত্ব। তবে কেন্দ্র অবলম্বন স্বরূপ না হইয়া তাহার মধ্যেই যে ভালবাসার পর্য্যাবসান সে ভালবাসা নিজের পাশেই নিজে আবদ্ধ, বদ্ধ নদীর ন্যায় তাহা নিজের পক্ষে এবং জগতের পক্ষে সমান অপকারক, তাহাতে কাহারো সুখ নাই, সুতরাং মঙ্গল নাই।

৩

ভালবাসা, অর্থাৎ ভাল বাসনা করা। আমাদের প্রিয়জনের আমরা মঙ্গল বাসনা করি তাই বলি ভালবাসি। কিন্তু মূলে কথাটা যাহা হইতেই আসুক, এখন ভালবাসা বলিলে যাহা বুঝায়—তাহা উহার উপর আরো কিছু। আমি অনেকেরই ভাল ইচ্ছা করিতে পারি—অনেকেরি সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হইতে পারি, কিন্তু ভালবাসিতে পারি একজনকে মাত্র। সুতরাং সহানুভূতি, কিম্বা শুভ কামনা করাই ভালবাসা নয়, এ সকল ভালবাসা হইতে কিছু কম। ভালবাসাতে এ সকলি আছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান, এইখানেই ভালবাসা ও সহানুভূতির মর্ম্মগত প্রভেদ।

সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের যে এত আকর্ষণ, তাহার অর্থ আমরা সৌন্দর্য্যকে পাইতে চাই, তাহার সহিত মিলিত হইয়া নিজে সুন্দর হইতে চাই, সুতরাং তাহা ভালবাসা,

সহানুভূতি নহে। কিন্তু ভালবাসিয়া আমরা যে পাইতে চাই--কি পাইতে চাই? তাহা আমরা নিজেই ঠিক জানি না। আমরা বলি প্রতিদান চাই, হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় চাই, তাহার অর্থ কি? তাহার অর্থ কিছু নাই, কেন না বাস্তবিক কে কাহাকে পাইতে পারে? এ কেবল অপূর্ণ হৃদয়ের অদৃশ্য অগোচর কল্পনাময় পরিপূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা,—The desire of the moth for the star। যে আকাঙ্ক্ষা সম্যক পূর্ণ হইবার আমাদের কখনো আশা ভরসা নাই, যাহার অস্পষ্ট, ছায়াময় ছবি ধরিতে পারিলেই আমরা সুখী। ভালবাসার সঙ্গে সন্ধ্যার সঙ্গে, জ্যোৎস্নার সঙ্গে যে আমরা সাদৃশ্য দেখি তাহার কারণ ইহাদের সৌন্দর্য্য ছায়াময়, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার মত ইহাদের ধরা ছুঁয়া যায় না। যে কবিতা—যে কল্পনা যত উচ্চ তাহাই তত এইরূপ ছায়াময় আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপক।

যোগী ঋষিগণ বলিবেন আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই দুঃখদায়ক সুতরাং ভালবাসা ত্যাগ কর, অথবা নিষ্কাম ভাবে ভালবাস। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাতে সুখের অংশ আনন্দের অংশ এত অধিক, যে ইহার সংমিশ্রণে দুঃখও নিতান্ত কোমল সহনীয় উপভোগ্য ভাব ধারণ করে। লংফেলো তাই বলিয়াছেন—

A feeling of sadness and longing
That is not akin to pain,—
And resembles sorrow only,
As the mist resembles rain.

মিলনের স্পৃহা যত যেখানে অধিক; সেইখানে ভালবাসাও তত গভীর। লোকে বলিবে, সে ভাল বাসা তত স্বার্থপর, মলিন। তাহা নহে, আমরা ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া তাঁহাকেও পাইতে চাহি, সুতরাং প্রেমের মলিনতা আকাঙ্ক্ষায় নহে, নিষ্কাম প্রেমই আদর্শ প্রেম নহে, সেই প্রেমই স্বার্থপর, যাহাতে আত্ম ত্যাগ নাই। মিলন-আকাঙ্ক্ষা ভালবাসার একটি অবশ্যম্ভাবী উপাদান মাত্র।

বুদ্ধিবিকাশ।

পরিণতিবাদ একটী সুবিশাল বৈজ্ঞানিক প্রকল্পনা (Hypothesis)। ইহা এই অস্থির, সচঞ্চল, অনন্ত, মায়াপ্রপঞ্চের ব্যাখ্যা। মহাত্মা ডার্বিণ বিপুল জীবস্রোতের অবিরাম গতিতে পরিণতির-রেখা চিন্তায় উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানসংসার

ডার্বিণময়—তাঁহার চিন্তা প্রবাহের অনুবর্ত্তী। তাঁহার মতে সামান্য সামুদ্রিক কীট বিশেষ (Monera) হইতে ক্রমবিকাশ সহকারে মনুষ্যের উৎপত্তি। হক্‌সেলী তাঁহার পদাঙ্ক অনুগমন করিয়া আরও নিম্নে যাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন কোন জড়প্রায় জৈবনী পদার্থই (Protoplasm) সকল প্রাণীর মূল। টমসন্, স্পেন্‌সর, হেকেল, প্রভৃতি আমানুষ অখিল সংসার কোন সূক্ষ্ম জড়প্রকৃতি হইতে স্ফূরিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। ফলে পরিণতিবাদে জগতের যতদূর একাত্মভাব সংসাধিত হইয়াছে এমন আর পূর্ব্বতন কোন মতেই হয় নাই। ইহাতে বিশ্বের সশরীরী মূর্ত্তির সুন্দর ধ্যান আছে। কিন্তু ইহাতে সত্যের পূর্ণাবয়বী, বিশালাক্ষি, সরল, সর্ব্বপরিচিত ভাব নাই। ইহাতে আংশিক সত্য থাকিতে পারে—সত্যের পূর্ণ মূর্ত্তি নাই। বিজ্ঞান সেই পূর্ণত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য আজ ব্যতিব্যস্ত।

অনেকে পরিণতিবাদে বিশ্বরহস্য ভেদ হইয়াছে মনে করেন। সেটী আদৌ ভ্রম। ইহাতে যুক্তি আছে, তত্ত্ব আছে, মীমাংসা আছে, ভাব আছে, জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে, গবেষণা আছে, প্রতিভার অপরিমেয় প্রভা আছে। কিন্তু তত্রাচ ইহা পূর্ণ সত্য নহে। ইহাতে সত্যের আভাস থাকিতে পারে ভাস্তির মনোমোহিনী প্রকৃতি নাই। বিশ্বের আদিকাণ্ড তো ইহাতে একেবারে স্পর্শই করা হয় নাই; আর কেমন করিয়াই বা হইবে? বিজ্ঞান আদি কারণে আরোহণ করিতে অক্ষম। ইহার সকল শক্তি আছে, কেবল আদিতে ও অন্তে যাইবার শক্তি নাই। তাই পৃথিবীতে ধর্ম্মস্রোত এত প্রবল। বিজ্ঞানের সর্ব্ব-বিষয়ণী প্রতিভায় এই একটী দারুণ অভিসম্পাৎ আছে। নতুবা বিজ্ঞান এতদিনে ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিত। পরিণতিবাদ একটী সুন্দর বৈজ্ঞানিক অনুমান। নিশ্চয়াত্মিক ভাব পরিণতিতে নাই। ইহা সত্যও হইতে পারে, অসত্যও হইতে পারে; তবে বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থায় ইহার ন্যায় সুন্দর ব্যাখ্যা আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে জ্ঞানের সীমা সবিশেষ পরিসর করিয়াছে। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে হয় ইহা সপ্রমাণিত হইবে নতুবা কোন অভিনব বিশ্বোদর ব্যাখ্যায় ইহাকে বিজ্ঞানের সিংহাসন হইতে পদচ্যুত করিবে। তবে এখন ইহাকে অতিক্রম করে এমন কোন মতই নাই। ফলে ইহাতে আদি বা উৎপত্তির ব্যাখ্যা নাই। কোন অসাড়, নির্গুণ প্রায়, অবয়ব-শূন্য, আকারশূন্য, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিশেষ প্রকৃতি হইতে জগৎ সংসার এই অবয়বী, সাকার, সবিশেষ, সগুণ, অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ফলে সেই পূর্ব্ব ভাব বা অবস্থা-স্বীকৃত তত্ত্ব মাত্র। তাহার ব্যাখ্যা কই? বস্তুতঃ ইহাতে আদি বা মূল তত্ত্ব নাই। সুতরাং সৃজন, স্বোদ্ভাবন, প্রভৃতি সকলি অনাক্রান্ত রহিল। কিছু-না হইতে সগুণ ব্যাপারের উদ্ভাবন হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং পরিণতিবাদে বস্তুবিশেষ, অবস্থা বিশেষ, সময় বিশেষ, প্রভৃতি স্বীকৃত। ফলে সাধারণে পরিণতিবাদে জগতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। এতদ্‌ব্যতীত পরিণতিবাদের অন্তরালে উচ্চনিয়তি, শক্তির

অবিচ্ছিন্ন ভাব, ধারাবাহিক গতির অপচয়, গতির সঙ্গীত ও উচ্ছ্বাস প্রভৃতি নানা বিষয় উঁকি মারিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পরিণতিবাদ একটী মহান্ কল্পনা। পরিণতিও প্রণালীমাত্র। কাহার ও কিসের পরিণতি? ইহার কারণই বা কি? একথার মীমাংসা আবশ্যক। হার্বাট স্পেন্‌সর তজ্জন্য নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে জড়প্রকৃতির অবিনশ্বর ভাবই ইহার মূল। কই তাহাতেই বা পরিণতির সম্ভাবনা কোথায়? সত্য জড়ের ধ্বংস নাই—নাশ নাই—ব্যয় নাই—ক্ষয় নাই; স্থানান্তর, ভাবান্তর, রূপান্তর মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেই বা পরিণতির ব্যাখ্যা কই? রূপান্তর, ভাবান্তর হইবার কারণ কি? সে কারণ পৃথক বা তন্নিহিত? স্পেন্‌সরের মতে কোন নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ, অননুভূত সত্তা বিশেষ হইতে সাকার, সগুণ, অনুভূত ব্যাপারের উৎপত্তি এবং পুনশ্চ তাহাতেই বিলীন হওয়ার নাম পরিণতি। ইহা আর্য্য তত্ত্ব—আমাদের প্রাচীন সম্পত্তি। কিন্তু তাঁহার সে নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ প্রকৃতি সাম্বন্ধিক—স্বতঃসিদ্ধ নহে। তিনি ট্রিপ্রকটী প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অংশ। তিনি প্রভৃতি যে সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার, বালা, [illegible] বার্দ্ধকা আছে। ভাল, আমাদের ধারণায় নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ সত্ত্ব। এক[illegible]পায় না। কিন্তু তাঁহার এ নির্গুণ, নির্ব্বিশেষের ধারণাই বা কোথা? তবে ন্যূনাধিক্য ভাব ধারণায় আইসে বটে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বের কি হইল? আকাশ ও সময় চিন্তা প্রণবে গাঁথা। তথাচ তাহাদের পরিণতি হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে সগুণকে নির্গুণ বলিয়া তত্ত্ব ছড়াইবার ফল কি? স্পেন্‌সর ঘোর শাক্ত, তাঁহার প্রাণের ভিতর আদ্যাশক্তির বিরাট ছায়া উঁকি মারিয়া থাকে, তাই নির্গুণ-সগুণ, নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, সাকার-নিরাকার সত্তা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইবার এত চেষ্টা। তিনি পৌত্তলিক নহেন—নিরাকার-বাদীও নহেন। এতদুভয়ের মধ্যে কি-জানি-কি অবলম্বন করিয়াছেন। যাহা হউক যত সূক্ষ্ম প্রকৃতিই হউক না কেন, নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বলিয়া তাহা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। প্রত্যুত উক্ত সত্তা স্বীকার করিলেও আর একটী বিষম সমস্যা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। সে সূক্ষ্ম প্রকৃতি এমন স্থূল প্রকৃতি হইবার কারণ কি? আমাদের গীতার ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ, তাঁহার ইচ্ছায় স্পন্দন প্রভৃতি হইয়া এই মায়াময় মহান্ ব্যাপার হইলেও বরং হইতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাশূন্য জড় প্রকৃতিতে পরিণতি সম্ভব কোথায়? স্পেন্‌সরে "প্রকৃতি পুরুষের" ছায়া আছে। তবে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ্য। তিনি শক্তি সংস্থান (Persistence of Force) অবলম্বনে এ বিশাল বিশ্বরহস্য বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অনেক গোল আছে। মনুষ্য মনে শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা নাই; আমাদের জড়শক্তি-সমন্বিত জ্ঞান, পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। ধর, শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাহাতেই বা কি হইল? এই শক্তি-সংস্থান তাঁহার মতে প্রকৃত মৌলিক সত্য। শক্তি সংস্থানের তাৎপর্য্য এই যে জগতে

শক্তির পরিমাণ চিরকালই সমান, স্থির ও নির্দ্দিষ্ট—ইহার হ্রাস, বৃদ্ধি নাই। এই মৌলিক সত্যের উপর পরিণতি-বাদের ভিত্তি। এতদ্ব্যতীত সমস্তই মায়া, অসৎ ও অনিত্য। এক্ষণে মহামতি স্পেন্সরের নিত্য বস্তু দেখা যাক্। শক্তি-সংস্থান (Persistence of Force) তিনিই ভিন্ন স্থানে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। কোথাও উল্লিখিত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কোথাও জাগতিক শক্তির সমষ্টি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। স্থানান্তরে ইহাকে সকল শক্তির অন্তস্তল এবং সকল শক্তিই ইহার মায়া বা কার্য্য ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যখন বৃহদক্ষরে লেখেন তখন ইহাতে ঈশ্বর সদৃশ ভাব বুঝায়। অন্যত্র ক্ষুদ্রাক্ষরে লিখিত। আবার এই অর্থের গোলযোগের সঙ্গে তাঁহার "কারণ" কথার গোল আছে। যখন শক্তি-সংস্থান "কারণ" পদবাচ্য তখন ইহা প্রকৃত পূর্ব্বাবস্থা; যেমন আজিকার ঘটনায় গত কল্যের ঘটনা আছে। কিন্তু যখন তিনি বলেন অদ্যকার ঘটনা কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কারণপ্রসূত, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অন্তস্তলে আছে, তখন ইহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। প্রত্যেক ঘটনার কি তবে দুইটী কারণ আছে—একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অপরটী কস্ত তত্রাচি ২. ইহা নিতান্ত অযুক্তির কথা। আবার তিনি বলেন, কোঁতির মনোমোহিনী প্রকৃতি নাই। বিশ্বের ও সংরক্ষিত। * কিন্তু জাগতিক শক্তি সমূহকে স্থির, সমান, ক্রিয়াই বা হইবে অনন্তের বাত্যায় জন্মে। তাহার তখন পরিমাণ হইল। তাঁহার মতে শক্তি বিজ্ঞানের ভিত্তি, অথচ তাহা বিজ্ঞানের জানিবার শক্তি নাই—তাহা বিশ্বাসের সামগ্রী। কিন্তু শক্তি সংস্থান লইয়া আজ বিজ্ঞানসমাজে মহা আন্দোলন। তাহা শুদ্ধ জ্ঞেয় নহে—এক প্রকার প্রত্যক্ষীভূত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর যদি বিশ্বাসের সামগ্রীই হয়, তবে প্রাচীন আবহমানকাল প্রচলিত বিশ্বাসমার্গের অপরাধ কি?

এ জগতে চক্রাকারে কার্য্য চলিতেছে; বরং লতাস্তম্ভের ন্যায় বলিলে ভাল হয়। চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়তই অনন্ত পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ঘটনা বা দৃশ্যের পর পর ধারাবাহিক সোপানাবলি আছে। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনেও অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এই মহান্ প্রকল্পনা ঐ ক্ষুদ্রাকার অভিজ্ঞানের ব্যাপ্তি বা বর্দ্ধিত মূর্ত্তি মাত্র। রৌদ্রতাপে জল বাষ্প হইয়া শূন্যে অদৃশ্য ভাবে উঠিতেছে; তাপের ন্যূনতায় সেই বাষ্প মেঘে পরিণত হই-

---

* "An Infinite and eternal energy by which all things are created and sustained ... ..."

To this an ultimate analysis brings us down; and on this a rational synthesis must build up.

This being the ulmate truth which transcends experience by underlying it." Herbert Spencer.

তেছে; মেঘে বৃষ্টি, বৃষ্টিতে নদী, নদী পুনশ্চ সমুদ্রে বিলীন হইতেছে। জীবজগতে শৈশব, বাল্য, যৌবন বার্দ্ধক্য, মৃত্যু দেখা যায়। আবার ভ্রূণের ঐরূপ ক্রমবিকাশ আছে। ভূতত্ত্ব পর পর পৃথিবীর স্তর স্তর বিশ্লেষ করিয়া দেখায়; পদার্থবিদ্যায় পরিবর্ত্তন বিধি স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করে; রসায়ন সংশ্লেষ বিশ্লেষ লইয়া পরিবর্ত্তন সমুদ্র মন্থন করিতেছে; মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতির পরিবর্ত্তন-ব্যবসায় বলিলেও বলা যায়। এইরূপ সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন আমাদের নয়নপথে পড়িয়া থাকে। যাহা দেখি, তাহাই পূর্ব্বে ভিন্নাকারে ছিল এবং ক্রমে আরও ভিন্নরূপ হইতেছে। এমন কি, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলই অবস্থান্তর, রূপান্তর এবং ভাবান্তর হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। এরূপ পরিবর্ত্তনসমুদ্রে থাকিয়া, কে না পরিবর্ত্তন স্বীকার করিবেন? পরিণতিবাদ এই সকল পরিবর্ত্তন বিশেষের সামান্য মূর্ত্তি—সাধারণ ভাব। তবে ইহার আর মতান্তর কেন? আমরা বস্তু বিশেষের পরিবর্ত্তন দেখি, এবং তাহাও নির্দ্দিষ্ট, বিশিষ্ট, সীমাভুক্ত। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রন্থি যে একটী প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অংশ, তাহা অদ্যাবধি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় নাই। জীবের শৈশব, বাল্য, যৌবন বার্দ্ধক্য আছে; কিন্তু তদতিরিক্ত কিছুই দেখিও না—জানিও না। এক্ষণে সমস্যা এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একাত্মিক বা সম্বন্ধবিশিষ্ট বিবিধাত্মিক ব্যাপার? ইহা এক নিয়মের অধীন কি বিভিন্ন? আর যদি এক নিয়মের অধীনই হয়, তবে পরিণতি ঐ নিয়ম কি না? এ প্রগাঢ় তত্ত্বের মীমাংসা শুদ্ধ কল্পনায় আছে। পৃথিবীর গতিতে দিন, রাত, পক্ষ, মাস ও বর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু যে গতিতে দিন রাত হয়, সেই গতিতে কি বর্ষ নির্ভর করে? গতি একই কথা; কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপার স্বতন্ত্র।

পরিণতিবাদে জড়ের সমন্বয় ও শক্তির অপচয় স্বীকৃত। শুদ্ধ তাহা নয়। সকল প্রকার অস্তিত্বেই জড় সঞ্চয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং শক্তির তদনুরূপ অপচয় বা হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। সাদৃশ্য হইতে বিসদৃশে গতি। এস্থলে জড়শক্তির পার্থক্য অপরিহার্য্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা আমাদের ধারণায় নাই। আমরা এস্থলে জড়ের সমন্বয় ও শক্তির অপচয়ও বুঝিলাম না। জড় সমন্বিত হইলে শক্তির সমন্বয়ও অপরিহার্য্য—তবে তাহার বিকাশ স্বতন্ত্র হইতে পারে। আবার শক্তি সংস্থানে শক্তির অপচয় নাই বলিয়া থাকে; তবে ইহার মীমাংসা কি হইবে? আর যখন সঞ্চয় বলা যায় তখন ন্যূনাধিক্য বুঝায় মাত্র। কিন্তু যথায় একটী সমসদৃশ, নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিলাম তখন শক্তির অপচয় সম্ভবে কি প্রকারে? জগতে যদি একটী উত্তপ্ত বস্তু থাকিত তাহা হইলে তাহা চিরকালই উত্তপ্ত থাকিত, তাহার আর ঐরূপ তাপের হ্রাস হইত না; কেন না তাপ বস্ত্বন্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। গতিরও সেই ভাব। তবে সমভাবাপন্ন, সদৃশ কোন একটী পদার্থ-বিশেষের শক্তির অপচয় কোথায়? আবার নির্গুণ বস্তুরও আমাদের ধারণা নাই; সমভাবাপন্ন, সমতল, সমাকার, সমাবয়ব জড়রাশি কোথাও

থাকিতে পারে না। তাহারও ন্যূনাধিক্য হইবে। সেই ন্যূনাধিক্যে গুণেরও ন্যূনাধিক্য সম্ভব। জল একই পদার্থ কিন্তু তাহারও স্থান বিশেষে, অবস্থা বিশেষে, কার্য্য স্বতন্ত্র। ছাদের উপর এক-টব জল থাকিলে ফোয়ারা ছুটিতে পারে, নিম্নতলস্থ জলে তাহার সম্ভাবনা নাই। ফলে শক্তির অপচয় নাই; যাহাকে আমরা অপচয় বলি তাহা বস্তুন্তরে তাপ, তড়িৎ, গতি, প্রভৃতিতে প্রস্ফুটিত হয়। শক্তির অপচয় নাই বলায় জড়শক্তির অপচয় নাই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ একটী পদার্থে রূপান্তর সম্ভব নহে। জড় যেমন সঞ্চয় হইতে থাকিল শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পুনশ্চ সাদৃশ্য হইতে বিসদৃশ সম্ভাবনা কোথায় যদি শক্তির বিসদৃশ ভাব না থাকে। পিণ্ড বিশেষ বিকীর্ণ জড়সঞ্চয়ে হইয়া থাকে এবং বিকীর্ণ শক্তি ও তৎসঙ্গে কেন্দ্রীভূত হইয়া রূপান্তর হয়। জল বাষ্প হইলে দ্ব্যনুকের গতি বাড়িল, আবার বাষ্প জল হইলে পিণ্ড শক্তি প্রাপ্ত হইল। হাবার্ট স্পেনসর স্বয়ংই পরিণতিবাদের মৌলিকত্ব বিষয়ে স্থির নহেন। *

স্পেন্সর বলেন সাদৃশ্য সচঞ্চল। জগতের এই একটী প্রধান নিয়ম। পরিণতি সাপেক্ষ। কোন পদার্থই একরূপ থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তনের মূলে বিসদৃশ-ভাব বর্ত্তমান। কিন্তু আমরা যে নিয়ত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহার কারণ এই যে কোন পদার্থই জগতে একা নাই—সকলেই নানা পদার্থ ও নানা শক্তি দ্বারায় পরিবেষ্টিত। তাই পরিবর্ত্তন। নতুবা তাহার সম্ভাবনা কোথায়? পরিণতিবাদে যখন একটী পদার্থ মাত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তাহাও নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ তখন তাহার পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না। স্পেন্সর বলেন কোন একটি সামগ্রী ভূমে ছড়াইয়া ফেল, তাহা নানারূপে পড়িবে। সত্য; কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র। বায়ু, মধ্যাকর্ষণ, ছড়াইবার শক্তির মাত্রা, প্রভৃতির দ্বারাই এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি জগতে শুদ্ধ জল অনুমান করা যায়, আর অপর কোন পদার্থ না থাকে, তাহাকে সম বলে ছড়াইলে ভিন্নরূপ হইবার সম্ভাবনা মনে আইসে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরিবর্ত্তন জগতের প্রধান নিয়ম। কিন্তু পরিণতিবাদে যে একের পরিবর্ত্তনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে বলিয়া থাকে, তাহা এখনও বিশেষ সপ্রমাণ হয় নাই। একটী পদার্থেরও পরিবর্ত্তন অসম্ভব। জড়প্রকৃতি এক প্রকার হইলে পরি-

* Is the Law of Evolution ultimate or derivative? Must we remain satisfied with the conclusion that throughout all classes of concrete phenomena such is the course of transformation? Or we should ask why is it so? Is there any all-pervading principle which underlies this all-pervading process? Can the induction be reduced to deduction? Manifestly this community of result implies community of cause.

বর্ত্তন হইত কি না সন্দেহ। রসায়নিক ক্রিয়া এক পদার্থে সম্ভবে না। দুই বা তদধিক বস্তু না থাকিলে রসায়নিক ক্রিয়াই নাই। পঞ্চভূত রসায়নের সূত্রপাত। তাই বলি, পরিণতির প্রারম্ভে অদ্বৈত প্রকৃতির সামঞ্জস্য হয় না। পরিণতিবাদে বলিবে সপ্ততি ভূত যে ঠিক একথা কে বলিল? আমরা আর বিশ্লেষ করিতে পারি নাই মাত্র। তাহারা যে সকলই রূঢ় পদার্থ আর বিশ্লেষ হইবে না, একথা কে বলিতে পারে? জল এককালে মৌলিক পদার্থ বলিয়া প্রচলিত ছিল—আজ জ্ঞান সহকারে তাহা দ্বিবিধ বায়বীয় পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। আশা করি পরে সকলই তেমনি বিশ্লিষ্ট হইয়া একত্বে দাঁড়াইতে পারে, লকইয়ারের পদার্থ বিকার (Allotropy) সেই দিকেই যাইতেছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে পঞ্চভূত হইতে সপ্ততিতে আসিয়াছে, তখন কোন্ ভরসায় একত্বের আশা করা যায়। একত্বের আশয়ে রসায়নের জন্ম। পূর্ব্বে ইতর ধাতু ও স্বর্ণ রূপান্তর বলিয়া জ্ঞান ছিল। সুতরাং এখন কোন্ সাহসে একত্বের প্রত্যাশা করি? বিজ্ঞান এখনও ভরসা দেয় নাই। অণুর বিভিন্ন সজ্জায় যে পদার্থের পার্থক্য হয় ইহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক; শুদ্ধ আলোক বিশ্লেষ (Spectral analysis) প্রভৃতিতে সপ্রমাণ হয় না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পরিণতি নিয়মে এমন কি আছে যাহাতে বর্ব্বরতা, দ্বেষ, হিংসা, যুদ্ধ, রক্তপিপাসা, লাম্পট্য, স্বার্থপরতা, প্রভৃতি হইতে সভ্যতা, সহানুভূতি, দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, নীতি, স্বার্থ-শূন্যতার উদয় হইতে পারে? বরং তদ্বিপরীতই প্রত্যাশা করা যায়। উহাই স্বাভাবিক। নিদারুণ জীবন-সংগ্রাম হইতে কেমন করিয়া পরের শুভ চিন্তা আইসে? অত্যাচার হইতে স্বাধীনতা, দাসত্ব হইতে স্বাবলম্বন, বাহুবল হইতে সুবিচার, ভয় হইতে ভক্তি, কাম হইতে প্রেমের কি প্রকারে স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে? এ নিয়মে কি তাহা অবশ্যম্ভাবী? জ্ঞানে, তর্কে, অনুমানে বরং অন্য দিক্‌ই নির্ণয় করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

বংশক্রম।

সকলেরই একরূপ বিশ্বাস আছে যে পিতামাতার গুণ সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। এ ক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে পিতামাতার কোন্ গুণগুলি সন্তান প্রাপ্ত হইয়া থাকে? পিতামাতা যে সকল গুণ পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে উত্তরাধিকার করিয়াছেন

কেবল মাত্র সেইগুলি, না তাঁহারা যে সকল গুণ স্ব স্ব জীবনে লাভ করিয়াছেন সে গুলিও সন্তানে পৌঁছায়? এই প্রশ্ন লইয়া ইয়োরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে এক মহা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। জার্ম্মাণি দেশের বাইস্‌মান নামক এক পণ্ডিত এই তর্কের মূল; তিনি ফরাসি দেশের লামার্ক ও ইংলণ্ডের ডারউইন্ ও স্পেন্সরের মত খণ্ডন করিয়া স্বকীয় এক মত প্রচার করেন তাহার মর্ম্ম এই যে, সন্তান পিতামাতার স্ব স্ব জীবনে উপার্জ্জিত গুণ গুলি অধিকার করে না কেবলমাত্র পূর্ব্বপুরুষ হইতে আগত গুণ গুলি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে আমাদিগের ভাষায় অদ্যাবধি কিছুই লেখা হয় নাই এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গীয় পাঠক উল্লিখিত প্রশ্নের গূঢ় মর্ম্ম প্রথমে বুঝিতে না পারাই সম্ভব; অতএব আমরা এ স্থলে প্রথমতঃ ডারউইন প্রবর্ত্তিত মতের স্থূল বর্ণনা করিয়া তাহার পর বাইস্‌মানের নূতন মত প্রকটিত করিব।

জগতে আমরা নানা জাতির উদ্ভিদ ও জন্তু দেখিতে পাই, যেমন আম্র, জাম, ও কাঁঠাল, এবং গো, অশ্ব, ও মনুষ্য। এই সকল জাতি পৃথক পৃথক রূপে সৃষ্ট হইয়াছে, না ইহারা সকলে কালক্রমে একই মূল জীব হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে। এ বিষয়ে ডারউইন শেষোক্ত প্রকার মতের প্রচার করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বতন্ত্র ভাগে সৃষ্ট হয় নাই; ফলতঃ উহারা এক আদিম জীব হইতে কালক্রমে একে একে আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহার মতকে ইংরেজীতে ইবোলিইশন বা উদ্ভবন (ক্রমঃবিকাশ) কহিয়া থাকে। যাহারা গো অশ্ব প্রভৃতি পুষিয়া বিক্রয় করে তাহারা যদি কোন উৎকৃষ্ট গাভী কিম্বা ঘোটক প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে যত্নের সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করে ও তাহাদিগের বৎস জন্মিলে ঐ বৎস যাহাতে হৃষ্টপুষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করে। সেইরূপ আবার যাহারা ফল মূলের ব্যবসায় করে, তাহারা কোন উৎকৃষ্ট জাতির উদ্ভিদ পাইলে যত্নের সহিত তাহা বর্দ্ধিত করিয়া উত্তরোত্তর তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে মানুষ কতকগুলি উদ্ভিদ্ ও জন্তুদিগকে মনোনীত করিয়া তাহাদিগের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন করে।

ডারউইনের মতে প্রকৃতিও ঐরূপ কতকগুলি জীবকে বাছিয়া লইয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করে। মনে কর কোন একটী জীব হইতে দুই কিম্বা তাহার অধিক জীব জন্মিল; ইহাদিগের মধ্যে একটীতে এমন কতকগুলি গুণ দেখা দিল যাহাতে সে প্রকৃতির প্রিয়পাত্র হইল এবং তাহার স্বীয় জীবন রক্ষা হইল ও বংশ পরম্পরায় তাহার অস্তিত্ব তিষ্ঠিয়া গেল। আর তাহার সোদর অপর জীবগুলির সেরূপ গুণ না থাকায় তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মবশে লয় প্রাপ্ত হইল। এইরূপে কোন এক জীব হইতে যে জীব উৎপন্ন হয় তাহাতে নূতন কতকগুলি গুণ দেখা দিতে পারে আর

প্রকৃতি তাহাকে রক্ষা করিলে পরে তাহার বংশে আবার কতকগুলি নূতন গুণ দেখা দিতে পারে; অবশেষে এমন অনেক গুলি গুণ দেখা দিতে পারে যাহাতে এই সকল গুণবিশিষ্ট জীব প্রথমোক্ত জীব হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়ে, এমন কি নূতন এক জাতি হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি কিরূপে কোন এক জীব হইতে প্রাকৃতিক নিয়ম গুণে নূতন এক জাতীয় জীব উদ্‌ভূত হইতে পারে। এইরূপ জাতি-উদ্ভবনের নিমিত্ত এই কয়টী বিষয়ের প্রয়োজন:—(১) জীবদিগের পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে নূতন নূতন গুণের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক; (২) কোন পুরুষে নূতন গুণের আবির্ভাব হইলে তাহা পর পুরুষে বর্ত্তিত হওয়ার প্রয়োজন; আর (৩) প্রকৃতি কতক প্রকার জীবকে জীবিত রাখিবে ও অবশিষ্ট গুলির লোপ সাধন করিবে, অর্থাৎ যে সকল প্রকার জীব প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের সহিত স্বকীয় জীবনের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিবে কেবল তাহারাই এই সংসারে তিষ্ঠিতে পারিবে—এই তৃতীয় সূত্রের নাম "যোগ্যতম জীবের অবশিষ্যমাণতা" অর্থাৎ যে জীব প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকিবার পক্ষে যোগ্যতম সেই অবশিষ্ট থাকে আর তাহার সোদর অন্য জীবগণ লোপ প্রাপ্ত হয়। এই তিন সূত্রের সাহায্যে জীবতত্ত্ববিৎগণ মূলে এক অতি সামান্য জীব হইতে জগতের নানা জাতি উদ্ভিদ্ ও জন্তুর উদ্ভবন ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আদিতে অতি ক্ষুদ্র বৃত্তের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক জীব ছিল, তাহা উদ্ভিদও নহে জন্তুও নহে, অথচ তাহা উভয়েরই মূল। তাহার মূল কাণ্ড শাখা পত্র ফুল ফল কিম্বা হস্ত পদ মুখ যকৃৎ পাকস্থলী ইত্যাদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই; অথচ তাহার সেই অতি ক্ষুদ্র শরীরে জীবনের সমুদয় প্রধান কার্য্যই ঘটিতেছে, যেমন ভোজন, বর্দ্ধন ও বংশ সংরক্ষণ। অতঃপর মনে কর কালক্রমে এই জীব হইতে উহা অপেক্ষা উচ্চতর আর একটী জীব, তাহা হইতে আবার তদপেক্ষা উচ্চতর আর একটী জীব ইত্যাদি ক্রমে সংসারের যাবতীয় তরুলতাগুল্মাদি ও পশু পক্ষী মানবাদি জন্মগ্রহণ করিল। ইহাতে যে বিশ্বকর্ত্তার সৃষ্টিগৌরব কিয়ৎপরিমাণেও হ্রাস হইল এরূপ মনে করা উচিত নহে; পরন্তু জগদীশ্বর যে এক অতি সামান্য মূল হইতে অদ্‌ভুত নানা প্রকার জাতি উদ্‌ভাবিত করিয়াছেন ইহা তাঁহার অতুল সৃষ্টি কৌশলেরই পরিচায়ক। আবার কেহ কেহ এরূপও কহিয়া থাকেন যে উদ্‌ভবন সূত্র সত্য হইলে মানুষ নিকৃষ্ট জন্তু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে মানুষ ও জন্তুতে পার্থক্য রহিল কি? আর মানুষের যে আত্মা আছে তাহাই বা কেমন করিয়া বলিবে? ইহার সদুত্তর এই দেওয়া যাইতে পারে যে, পরমেশ্বর যদি মানুষকে মৃত্তিকা হইতে গঠন করিয়া পরে তাহাকে আত্মা দান করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মানুষকে মর্কট হইতে গঠন করিয়াই কেন আত্মাদান করিতে না পারেন।

এক্ষণে আমরা উল্লিখিত তিনটী সূত্রের স্থূল বৃত্তান্ত দিতেছি। প্রথমতঃ জীবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া আবশ্যক। জীব যদি পরিবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে উহা বরাবরই একরূপ থাকিয়া যাইবে; উহাতে নূতন কোন গুণ দেখা দিবে না; অতএব উহা হইতে নূতন কোন জাতিও উদ্‌ভূত হইবে না। এক্ষণে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে জীব পরিবর্ত্তিত হইবে কেন অর্থাৎ কি কারণে উহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে? এই প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর হইতে পারে (১) জীবের দেহে যে বস্তু আছে তাহার প্রকৃতি এইরূপ যে উহা স্বতঃ পরিবর্ত্তিত হয়; (২) জীবদেহে প্রাকৃতিক কারণ সমূহ (জল বায়ু উত্তাপ ইত্যাদি) কার্য্য করিলে উহার পরিবর্ত্তন ঘটে; (৩) জীবদেহ কতক স্বতঃ আর কতক প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথম সূত্র অনুসারে জীব দেহে পরিবর্ত্তন ঘটিলে উহা দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে অর্থাৎ বংশ ক্রম গুণে এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে বর্ত্তিবে। আমরা এস্থলে যে প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি তাহা এই দ্বিতীয় সূত্র সম্বন্ধে; আমরা শীঘ্রই ইহার সবিস্তার বর্ণনা করিতেছি। এক্ষণে আমরা ইহা ধরিয়া লইব যে জীবের কতকগুলি গুণ এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে বর্ত্তিয়া থাকে। অতঃপর যদি জীবের এই সকল গুণ এরূপ হয় যাহাতে সে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ হইতে উপকার পাইতে পারে কিম্বা তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে (যেমন যেস্থল শীতপ্রধান সেখানে পশুদিগের গাত্রে লোম উপকারী) তাহা হইলে ঐ জীব রক্ষা পাইবে ও উহার বংশ এই সংসারে তিষ্ঠিয়া যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক বংশক্রমবশতঃ জীবের কোন্ কোন্ গুণগুলি এক পুরুষ হইতে পরপুরুষে উপনীত হয়। লামার্ক এ বিষয়ে একটী নিয়ম প্রকটিত করিয়া যান, তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন জীব ব্যবহারের প্রাচুর্য্য দ্বারা যদি কোন অঙ্গের উন্নতি সাধন করিতে পারে তবে তাহার সন্তান ঐ উন্নতির উত্তরাধিকারী হইবে, আর অপর পক্ষে ব্যবহারের অভাব বশতঃ যদি উহার কোন অঙ্গ অবনতি প্রাপ্ত হয় তবে উহার সন্তানেও ঐ অবনতির ফল দর্শাইবে। মনে কর কোন ব্যক্তি ক্রমাগত সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া স্বকীয় শ্রুতি-যন্ত্রের কিম্বা হস্তের অঙ্গুলি-সমূহের ঔৎকর্ষ্য সাধন করিল; লামার্কের মতে উহার সন্তানের শ্রুতি কিম্বা অঙ্গুলি উৎকৃষ্ট হইবে। আবার মনে কর কোন ব্যক্তি ক্রমাগত গৃহে বসিয়া থাকে বলিয়া উহার হস্ত পদের শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; উল্লিখিত নিয়ম মতে উহার সন্তানের হস্ত পদও নিস্তেজ হইবে। ডারউইন্ ও স্পেন্সর ইংলণ্ডের দুই মনীষী ফরাসি দেশের উক্ত পণ্ডিতের মত গ্রহণ করেন ও উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। পিতা স্বকীয় জীবনে যে যে গুণ উপার্জ্জন করেন সে সকল পুত্র অধিকার করে; কি রূপে? ইহার ডারউইন এক উত্তর দিয়াছেন, আর স্পেন্সর অন্য এক উত্তর দিয়াছেন। ডারউইনের মতকে ইংরেজীতে প্যান-

জেনেসিস্ বা সর্ব্ব জন্ম কহে। এই মত অনুসারে শরীরে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অঙ্গ আছে তাহাদিগের প্রত্যেক হইতে এক ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়; এই এক একটী কণা এক একটী অঙ্গের প্রতিকৃতি স্বরূপ অর্থাৎ বীজে যেরূপ বৃক্ষ বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ ঐ কণাতেও অঙ্গ বর্ত্তমান থাকে; বীজ হইতে যেরূপ বৃক্ষ জন্মিতে পারে কণা হইতেও সেই রূপ অঙ্গ উৎপাদন হইতে পারে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কণা শরীরে ইতস্ততঃ সঞ্চারিত ও অবশেষে শরীরের বিশেষ এক স্থলে সমাগত ও তথায় স্ত্রী পক্ষে অণ্ড ও পুরুষের পক্ষে পুংবীজে পরিণত হয়। যেহেতু এই অণ্ড কিম্বা পুংবীজে সকল প্রকার কণাই বিদ্যমান আছে, অতএব ঐ অণ্ড কিংম্বা পুংবীজ হইতে যে জীব জন্মিবে সে জীব উক্ত স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সমুদয় গুণই প্রাপ্ত হইবে। তবে কি না নূতন জীবে উক্ত সমুদয় কণাগুলিই যে পুষ্টি লাভ করিবে এরূপ নহে; সুতরাং সমুদয় গুণ গুলি স্পষ্ট দেখা দিতে না পারে। এই ত গেল ডারউইনের মত। অতঃপর হার্বার্ট স্পেন্সরের মত বর্ণনা করা যাইতেছে। তিনি বলেন যে, জীব যে বীজ হইতে জন্মে তাহার সমুদয় অংশ উহার দেহে পরিণত হয় না, কতক অংশ দেহের মধ্যে অবশিষ্ট রহিয়া যায়। অর্থাৎ মনে কর একটী বীজ হইতে ধান্য বৃক্ষ জন্মিল; বীজের অধিকাংশ ভাগ অবশ্য বৃদ্ধি পাইয়া ধান্যের বৃক্ষে পরিণত হইল, আর অল্প কতক অংশ ঐ বৃক্ষের মধ্যে অবস্থিত রহিল। এই অংশ এরূপ প্রকৃতির যে ধান্যের দেহে যেখানে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটুক না কেন, তাহার ফল উহাতে উপনীত হইবে। ধান্য বৃক্ষ স্বকীয় জীবনে যে যে গুণ উপার্জ্জন করিবে তাহাদিগের একরূপ প্রতিকৃতি উল্লিখিত অংশে থাকিয়া যাইবে। এক্ষণে যখন আবার ধান্য হইতে বীজ উৎপন্ন হইবে, তখন উহা ঐ অংশ হইতে গঠিত হইবে। এইরূপে ধান্যের সমুদয় গুণ গুলিই বীজে অবস্থান করিবে।

লামার্কের প্রচারিত মত ডারউইন ও স্পেন্সর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া এতদিন বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কিছু দিন হইল বাইস্‌মান উক্ত মতের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; আর তাহার পর রে ল্যাঙ্কেষ্টর, রোমানিস প্রভৃতি ইংলণ্ডের কয়েক জন প্রধান জীবতত্ত্ববিৎ বাইসমানের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লামার্ক যে মত প্রকটিত করেন তাহার কোন প্রমাণ নাই; এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই যেখানে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে পিতা কিম্বা মাতা স্বজীবনে যে কোন গুণ উপার্জ্জন করিয়াছেন সন্তান পিতামাতার রক্তের সহিত তাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছে। এমন কি ডারউইনের ন্যায় ব্যক্তি যে যে দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে দেখাইয়াছেন, সে গুলি সব অন্য কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যেমন, কোন অঙ্গ পিতৃদেহে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, অতঃপর উহা সন্তানেও অকর্ম্মণ্য হইয়া জন্মিয়াছে। লামার্কের মতে ইহার কারণ এই যে সন্তান পিতার গুণ জন্মবশতঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাইসমান প্রমুখ পণ্ডিতগণ উহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিবেন; তাঁহারা

বলেন যে কোন অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ইহার অর্থ এই যে তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই (যেমন পালিত কুক্কুটের ডানার প্রয়োজন নাই)। এরূপ স্থলে প্রকৃতি ঐ অঙ্গ আর রক্ষা করিতে চেষ্টা পায় না; অতঃপর উহা নানা প্রকার আকৃতি ধারণ করিতে পারে অর্থাৎ দেখিতে বৃহৎ হইতে পারে কিম্বা ক্ষুদ্র হইতে পারে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত উহার প্রতি প্রকৃতির দৃষ্টি ছিল ততদিন উহা এক বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু এ দিকে আবার প্রকৃতি কোন অনাবশ্যকীয় অঙ্গের জন্য অধিক মাল-মসলা খরচ করিতে প্রস্তুত নহে; সুতরাং উহার যে সে আকার প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও উহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র হয়— কারণ উহা যত ক্ষুদ্র হইবে প্রকৃতির উহার নিমিত্ত তত কম ব্যয় হইবে।

বাইসমান বলেন, পিতামাতার স্বোপার্জ্জিত গুণ পুত্রে বর্ত্তায় না। ইহার কারণ এই যে শরীরের যে অংশ হইতে স্ত্রীর পক্ষে অণ্ড ও পুরুষের পক্ষে পুংবীজ জন্মে তাহার সহিত শরীরের অপর সমুদয় অংশের কোন সম্বন্ধ নাই—সুতরাং এই সমুদয় অংশে যে গুণ দেখা দেয় তাহার ফল উক্ত অণ্ড ও পুংবীজে পৌঁছায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে পিতামাতার যে গুণ গুলি অণ্ড ও পুংবীজে বিদ্যমান থাকে, সন্তান কেবল সেইগুলি অধিকার করে। এই সকল গুণ হইতেছে বংশের গুণ, অর্থাৎ এই সকল পিতামাতা তাঁহাদিগের পিতামাতা, ইহাঁরা আবার তাঁহাদিগের পিতামাতা ইত্যাদি সোপানে পূর্ব্বপুরুষ হইতে লাভ করিয়াছেন। 'ক'য়ের সন্তান তাহা হইলে 'ক'য়ের স্বকীয় কোন গুণ পায় না, কেবল মাত্র পূর্ব্বপুরুষ হইতে আগত গুণ গুলি প্রাপ্ত হয়। গুণের পক্ষে যাহা বলা হইল বাইসমান আবার অণ্ড ও পুংবীজের পক্ষে তাহাই বলিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কোন পুরুষে যে অণ্ড কিম্বা পুংবীজ দেখা যাইতেছে তাহা পরম্পরাক্রমে অতি পূর্ব্বপুরুষের দেহ হইতে ধারাবাহিক ক্রমে চলিয়া আসিয়াছে ও ভবিষ্যতেও চলিবে। ফলতঃ যে অণ্ড হইতে একটী জীব জন্মগ্রহণ করে তাহার কতক অংশ উহার দেহে পরিণত হয় আর বাকী অংশ হইতে আবার উহার অণ্ড কিম্বা পুংবীজ গঠিত হয়। এখন বুঝিতে পারা যাইবে যে কোন পুরুষে যে অণ্ড কিম্বা পুংবীজ জন্মে তাহা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের অণ্ড কিম্বা পুংবীজের অংশ মাত্র, তাহা আবার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের, ইত্যাদি।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বর্ত্তমান পুরুষে যে বীজ জন্মিল তাহা যদি অতি পূর্ব্বতন পুরুষের বীজের অংশমাত্র হয়, তবে বর্ত্তমান পুরুষ ঐ পূর্ব্বতন পুরুষ হইতে পৃথক্ গুণবিশিষ্ট হইল কি প্রকারে? অর্থাৎ বীজ যদি বংশ পরম্পরায় বরাবর একই রহিল তবে গুণগুলি বরাবর একই রহিল না কেন? পরিবর্ত্তন ঘটিল কি প্রকারে? এক সামান্য জীব হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব কি প্রকারে জন্মিল? বাইসমান ইহার এখনও সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে

বীজ কালক্রমে প্রাকৃতিক কারণ গুণে কিম্বা আপনা হইতেই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নূতন গুণ ধারণ করিবে; মনে কর এইরূপে কোন একটী স্ত্রীতে কতকগুলি নূতন গুণ-বিশিষ্ট অণ্ড দেখা দিল আর কোন একটী পুরুষে অপর কতকগুলি নূতন গুণবিশিষ্ট পুংবীজ জন্মিল। এক্ষণে এই দুই হইতে যে বীজ জন্মিবে তাহাতে ঐ উভয় প্রকার গুণ গুলি মিশ্রিত থাকিবে। এই মিশ্রণটী যদি প্রকৃতি মনোনীত করিয়া লয় তবে উহা রক্ষিত হইবে ও এইরূপে নূতন একটী জাতির ভিত্তি স্থাপন হইবে। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অণ্ড ও পুংবীজ স্বতঃ পরিবর্ত্তিত হয় আর তাহাদিগের মিশ্রণে নূতন কতকগুলি গুণবিশিষ্ট জীব জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী পুরুষ হইতে ভিন্ন গুণ বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রিত হয়; পরে এই সকল মিশ্রণের মধ্যে কতকগুলি প্রকৃতি কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হয়। এই ত গেল বংশক্রম সম্বন্ধে বাইসমানের মত। ইহা ভিন্ন তিনি আরও কতক-গুলি মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্ত্রী পুরুষ বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তু নহে; অর্থাৎ বীজ জন্মিবার পক্ষে এমন বুঝিবে না যে অণ্ডে যে সকল গুণ নাই তাহা পুংবীজে আছে আর পুংবীজের সাহায্য ব্যতীত অণ্ড ফলবান্ হইতে পারে না। বাইসমান কতক-গুলি পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে নিম্নশ্রেণীর জীবে শুদ্ধ অণ্ড হইতে কিম্বা শুদ্ধ পুংবীজ হইতে ফল জন্মিয়া সন্তান হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে স্ত্রী ও পুরুষ একই শ্রেণীর বস্তু। নিম্নশ্রেণীর জীবে স্ত্রী ব্যতীত শুদ্ধ পুরুষ হইতে আর পুরুষ ব্যতীত শুদ্ধ স্ত্রী হইতে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যখন অণ্ড ও পুংবীজ উভয়ের মিশ্রণে সন্তান জন্মে তখন উহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই গুণ সমূহ অধি-কার করে। অতএব বাইসমানের মতে পিতামাতাকে দুইটী পিতা কিম্বা দুইটী মাতা গণনা করা যাইতে পারে; পিতা ও মাতা এই দুই শব্দ দ্বারা গুণের যে প্রকৃতিভেদ বুঝায় তাহা কেবল কাল্পনিক মাত্র। পিতার গুণ মাতার গুণ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু দুইটী মাতার মধ্যে কিম্বা দুইটী পিতার মধ্যে গুণের যেরূপ বিভেদ পিতা ও মাতার মধ্যেও সেইরূপ।

বলা বাহুল্য বাইসমানের মত নূতন প্রচারিত হইয়াছে; উহার নানাদিক হইতে সমালোচনা হইতেছে; কেহবা উহার সমর্থন করিতেছেন, কেহবা উহার খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ফলে কি দাঁড়াইবে তাহা এখনও অবশ্য নিশ্চয় বলা যায় না!

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বন্দনা।

সাবিত্রী।

(সম্প্রতি আমার দেব প্রতিম পিতাঠাকুর মহাশয়ের পার্থিবজীবন সমাপ্ত হওয়ায়, এই কবিতাটি আমার মাতাঠাকুরাণীর পাদপদ্মে উপহার স্বরূপ অর্পিত হইল।)

গেল রাত্রি, এল দিবা ; কি বিচিত্র বিভা
(অন্ধ আমি) মম চক্ষে ধীরে এল নামি !
——হে সাবিত্রি, তব নাম বঙ্গের বিধবা,
হে বিধবা, সত্যবান তোমারই স্বামী !
রাশ নাম ডাক নাম দ্বিনাম ধারিণী
হে সাবিত্রি পৌরাণিক, হে বঙ্গ বিধবা,
হেরি তোমা, (অরণ্যেও তুমি রাজরাণী)
বৈভবের পদসেবা ইচ্ছা করে কেবা ?
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি ! নির্ম্মম অরাতি
কাল-ফণি, সত্যবানে করিল দংশন—
হে মৃত্যু, কোর না স্পর্শ—ওকি সুধু স্মৃতি ?
ওকি সুধু একাদশী ব্রত উদ্যাপন ?
হে কৃতান্ত, সরে যাও—সাবিত্রী সুন্দরী
স্বামী দেহ বক্ষে করি জাগিছে শর্ব্বরী !

মৌমাছি।*

(কবিতা লিখিয়া Oberon খুড়াকে শুনাইলাম। তিনি বলিলেন ভ্রমরের অধ্যবসায়ের বর্ণনাটা অতি উত্তম হইয়াছে।

"How doth the little busy bee
Improve each shinning hour."

* সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার চক্ষে কিছু ধাঁধাঁ লাগিয়া গিয়াছিল। সেই উড্ডিয়মান পতঙ্গটি মৌমাছি ছিল কি কাল-কোলো ভৃঙ্গ ছিল ঠিক্ ঠাওরাইতে পারি নাই। এই জন্য কিছু গোল হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা অনুগ্রহ করিয়া লইও ইতি।

শ্রীPuck

এইরূপ কত কি আওড়াইলেন। আমি মহাখুসি, এমন সময়ে আমার চিরশত্রু শ্রীমান Ariel (হায়! ঘরে সমালোচক থাকা কি বিড়ম্বনা!) আসিয়া অম্ল মধুস্বরে বলিলেন "বঙ্কিম বাবুকে মৌমাছির সহিত তুলনা করা মন্দ হয় নাই। সমস্ত দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি করিয়া তাহার পর এতগুলা সুন্দর গ্রন্থ অবিশ্রান্ত লেখা কম ক্ষমতার কাজ নহে। বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের তিনি Napolean Bonaparte আর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটির শুষ্ক নীরস কাজটা আকন্দ ও ধুতূরার সহিত তুলনা করা অতি সুন্দর হইয়াছে, এই'ত গেল মধু, তাহার পর অম্ল যথা—ইহাতে true sonnet এর একটিও characteristic নাই। দাদা, তুমি "ফটক" ও "বাবু" কথা দুইটা ব্যবহার করিয়া ludicrous element আনিয়া ফেলিয়াছ)

সেই ফটকের পাশে ভৃঙ্গেরে সম্ভাষি,
কহিনু "হে ভৃঙ্গ, তব বিচিত্র পরাণ
জানে না কি শ্রান্তি ? হায় সারা দিনমান
পুষ্প কুঞ্জে ছুটাছুটি !—তোমারে সাবাসি !
সাবাসি, হে মধুপ্রিয়, আইল তামসী,
এখনো যুথীর গৃহে করিছ সন্ধান !
এখনো নাচিছে তব সতৃষ্ণ নয়ান
সেফালির কুঁড়ি হেরি ?—হাসিছে অতসি !
সারাটি দুপুর তুমি বরটির সাথে
করি দ্বন্দ, মকরন্দ ভখিয়াছ সুখে
তীব্র-হলাহল-পূর্ণ আকন্দের পাতে !"
(শুনিয়াছি গুণপনা ধুতূরার মুখে)।
কোথায় মৌমাছি ?—মোর ভাঙ্গিল চটক ;
বঙ্কিম বাবুর এ যে গৃহের ফটক !

শ্রীPuck

কোকিল।

(কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিন হইতে মৌনব্রতী আছেন। এই অনুযোগ পূর্ণ কবিতাটি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিরচিত হইল)

বসন্ত উৎসব আজি ; মুকুলে মুকুলে
মদনের প্রিয়তরু হ'ল ভরপূর ;

ভ্রমরের গুঞ্জরণ বকুলে বকুলে,
উর্ব্বশী ধরেছে যেন বিরহের সুর!
বাসন্তীর লাল নীল দুকুলে দুকুলে
"গুল" বসায়েছে কোন্ শিল্পী সুচতুর?
হর্ষে ভরা বিশ্ব যেন হেরিছে নিখিলে
প্রথম প্রেমের মরি স্বপন মধুর!
* শ্যামা শিসে, প্রাণ আনি ওষ্ঠের আগায়;
পাপিয়া ঝঙ্কারে, পুষ্প নেশায় বিভোর;
দোয়েল নবীন ছন্দে নব গীতি গায়;
হে কোকিল, তব প্রাণে কেন ঘুম ঘোর?
জাগ, জাগ; শুক, সারী—আকাশ বাউল
শুনিতে বাসন্ত গীতি হয়েছে ব্যাকুল!

শ্রীআসমানের বাউল।

সধবা।

(এই কবিতাটি শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর করকমলে উপহার স্বরূপ অর্পিত হইল)।

বিধবা সে; আমি তারে ভাল করে চিনি;—
সবে করে উলুধ্বনি, ছাল্না তলায়,
"এয়ো" সবে দীপ হস্তে কৌতুকে দাঁড়ায়;
উৎসব ছাড়িয়া, গৃহে চলিল রমণী!

পথে যেতে যেতে, এক অশোকের তলে,
চমকি থমকি বালা দাঁড়াইল ত্রাসে!
"হে সধবা, কোথা যাও"? কে যেন রে বলে
জ্যোৎস্নার আবছায়ে, মধুর সম্ভাষে!

জ্যোৎস্না কহিল রঙ্গে শ্রীঅঙ্গ জড়ায়ে,
"চল্ আলি, আমি তোর বারাণসী চেলি;"

---

* "শিসে" অর্থাৎ শিস্ দেয়। ভাই, বাউলের কথায় কেহ রাগ করিও না।

আঁধার কহিল যত্নে, চরণে লুটায়ে,
"আমি ওই চেলির অঞ্চল ঝিলিমিলি!"
অশোক পড়িল ঝরি সীমন্ত-উপরি!
বাসর জাগিতে হর্ষে ফিরিল সুন্দরী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

প্রতিশোধ।

শীতের সন্ধ্যা, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক কালীপ্রসাদ গঙ্গাতীরের এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত দিন উপবাস পীড়িত, বহু-পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত, সম্মুখে সুদীর্ঘ অন্ধকার রজনী, কোথায় যাইবে, তাহার আশ্রয় কোথা? সুদূরে চিতা জ্বলিতেছে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে, প্রতিশোধ-স্পৃহায় তাহার হৃদয় চিতার মতই দপ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। পিতার প্রতিদিনের কষ্ট, তাঁহার অর্দ্ধ অনসন, তাঁহার অকাল মৃত্যু, এবং মৃত্যুকালের প্রত্যেক কথা তাহার মনে পড়িতেছে, আর ক্ষুধা তৃষ্ণায় জ্বালা ভুলিয়া 'প্রতিশোধ প্রতিশোধ' বলিয়া সে ভূমে পদাঘাত করিতেছে।

মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, চিতাগ্নি ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া নিভিয়া নিভিয়া জ্বলিতে লাগিল, বালক বৃষ্টিতে আর্দ্র, শীতে কম্পমান হইয়া দ্বিগুণ ক্রোধ-প্রজ্বলিত হৃদয়ে শপথ করিতে লাগিল, প্রতিশোধ প্রতিশোধ, আমাদের এ দশা যে করিয়াছে ভগবান তাহার প্রতিশোধ।"

ভিজিতে ভিজিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, শপথ করিতে করিতে বালক উঠিল, অদূরের এক দীপালোক লক্ষ্য করিয়া সেই পথে চলিতে লাগিল, দীপালোক এক রুদ্ধ মন্দিরের ছিদ্র পথে প্রকাশিত হইয়াছিল, বালক তাহার প্রাঙ্গণে আসিয়া মন্দির-সংলগ্ন আচ্ছাদনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে নিদ্রা মগ্ন হইল। স্বপ্নে দেখিল, পিতা সৌম্য মূর্ত্তিতে প্রসন্নভাবে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন—"বৎস—উঠ, অসহায়ের সহায় অন্যায়ের বিচারক স্বয়ং ভগবান, তোমার কোন ভয় নাই।" বালক প্রতিশোধ প্রতিশোধ বলিয়া জাগিয়া উঠিল, উঠিয়া দেখিল, তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া সত্যই কে তাহার দিকে চাহিয়া। বালক চমকিয়া উঠিয়া বসিল, সত্যই কি তাহার পিতা আসিয়াছেন না কি? তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, অপরিচিত ব্যক্তি বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, দীপালোকে হঠাৎ যেন সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট স্নেহময় মুখই তাহার নয়নে পড়িল। সে উঠিয়া বসিতেই অপরিচিত জিজ্ঞাসা করিল "বৎস, তুমি কে?"

"আমি ব্রাহ্মণ কুমার—"

"একাকী এখানে ?

"আমার কেহ নাই—আমি অনাথ"

সম্প্রতি অপরিচিতের একটি পুত্র মরিয়াছে, সে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—'বৎস, তোমার নাম কি ?'

"কালীপ্রসাদ"

"কালীপ্রসাদ! বৎস, কালী এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার প্রসাদ তোমার উপর বর্ষিত হইয়াছে, তুমি আজ হইতে আমাকে পিতা বলিয়া জানিও।"

২

কালীপ্রসাদের আর দুঃখ কষ্ট নাই, মন্দিরাধিপতি দেবীপ্রসন্নের মৃত পুত্রের স্থান সে অধিকার করিয়াছে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসেন।

দেবীপ্রসন্নের যে দুইটি পুত্র কন্যা জীবিত তাহারাও যুবকের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহশীল, কন্যা মেঘমালা দেবীপ্রসাদের বাগ্‌দত্তা।

কালীপ্রসাদের এমন কতকগুলি গুণ আছে যাহাতে সহজেই লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করে। তাহার একটি প্রধান গুণ, সে করুণহৃদয়। দীন দুঃখী অনাথ আতুরের কষ্ট নিবারণ করিতে সে সর্ব্বদাই সচেষ্ট, তাহার করুণায় ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগের দিনও নিরাশ্রয় পথিকের জন্য মন্দির দ্বার উন্মুক্ত।

এই সহৃদয়তায় পাড়া প্রতিবাসী পরিচিত অপরিচিত সকলেই তাহার প্রতি প্রসন্ন, সে সর্ব্ব সুখে সুখী। কিন্তু এই সুখের অবস্থাতেও তাহার পূর্ব্ব শপথ সে বিস্মৃত হয় নাই, প্রতিশোধ স্পৃহা তীব্রভাবে এখনো তাহার মনে জাগ্রত। প্রতিদিন সে নিস্তব্ধ নিশায় একাকী মন্দিরে গিয়া কালী বন্দনা করে এবং প্রতিশোধ ভিক্ষা মাগে। মনুষ্য-স্বভাব কি বিচিত্র বিরোধীভাবাপন্ন, অন্যের প্রতি একদিকে যে করুণাশীল, ন্যায়গত অধিকার দানে যে আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত, প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের জন্য সে বজ্র কঠোর।

সম্প্রতি দেবীপ্রসন্নের বালক পুত্র রোগ-শয্যায় শয়ান, পিতামাতার কষ্টের সীমা নাই, অনেকগুলি পুত্র কন্যার মধ্যে সবে মাত্র নীলমণি এই দুইটি পুত্র কন্যা মাত্র তাঁহাদের বর্ত্তমান, সুতরাং দুশ্চিন্তায়, ঔৎসুক্যে তাঁহারা মুমূর্ষুবৎ। তাঁহাদের বিশ্বাস কালীপ্রসাদ কালীদেবীর বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন, সুতরাং বালকের মঙ্গল উদ্দেশে দেবীকে প্রসন্ন করিবার ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে।

কালীপ্রসাদ হোম করিতেছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিতেছে। অগ্নি ব্যোমভেদী শব্দে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া শত মূর্ত্তিতে ঊর্দ্ধগামী

হইল, বালক সেই অগ্নিময় মূর্ত্তি-রাশির দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেল যে হোম করিতেছে কেন ? উদ্দীপ্ত হৃদয়ে সেই শত মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! শত মূর্ত্তি একত্রে তথাস্তু বলিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল।

৩

বালক মৃত, পিতা শোকোন্মত্ত, মাতার আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক বিদারিত, কালীপ্রসাদের হৃদয় অনুতাপ-যন্ত্রনায় ক্ষত বিক্ষত ; সে ভাবিতেছে, পূর্ণহৃদয়ে সে দেবীর নিকট এই বালকের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে নাই তাহার এই ফল।

চারিদিকের এই শোক বিষাদের মধ্যে বালিকা মেঘমালার হাসিও বিলুপ্ত, একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে সেও শয্যাশায়ী।

বড় দুর্যোগ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে, ঘন ঘন মেঘ-শব্দে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। কালীপ্রসাদ মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া করযোড়ে আকুল-প্রার্থনা করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে চমকিয়া মন্দির সংলগ্ন অদূরস্থিত রুগ্ন কক্ষের দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে।

একবার সহসা যেন আর্ত্তনাদী ক্রন্দন শুনিতে পাইল, সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, মন্দিরাধিপতি এই ঝড় বৃষ্টিতে, গৃহত্যাগ করিয়া উন্মত্তবেশে ছুটিয়াছেন, কালীপ্রসাদ তীরবেগে নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিল, "মেঘমালা" ?

দেবীপ্রসন্ন হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন "ছাড়িয়া দাও, স্বপ্ন হইয়াছে।"

যুবক দেখিল তিনি উন্মাদ, সবলে হাত ধরিয়া কহিল "কি স্বপ্ন" ?

তিনি আবার বলিলেন "ছাড়িয়া দাও, খুঁজিতে যাই"

"কাহাকে ?"

"যাহাদিগের দুর্দ্দশা করিয়াছি"

"কাহাদিগের ? কি দুর্দ্দশা করিয়াছেন ?"

"যাহারা এই মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী, মিথ্যা কৌশলে যাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাড়াইয়াছি তাহাদিগকে খুঁজিতে যাই! হায় হায়! স্বামী স্ত্রীতে শিশু সন্তানটি লইয়া অসহায় নিঃসম্বল এক রাত্রে কোথায় যে পলাইয়া গেল, আর দেখি নাই! ছাড়িয়া দাও—"

"এখন তাহাদিগকে কোথায় পাইবেন ?"

"হায় হায়! সেই পাপে আমার সমস্ত ছারখার। সব গিয়াছে, কেহ নাই, এক মাত্র মেঘা,—আমাকে ছাড়িয়া দাও খুঁজিয়া আনি—"

"তাঁহাদের কোথায় পাইবেন ? তাঁহারা মরিয়াছেন"

"মরে নাই, দেবীর আদেশ, তাহাকে—সেই শিশু সন্তানকে খুঁজিয়া আনিব, তাহার শাপ ঘুচিলে আমার মেঘা বাঁচিবে,"

সবলে হাত ছাড়াইয়া মন্দির-স্বামী ধাবমান হইলেন,

যুবক আবার তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতেই দেবী-প্রসন্ন থমকিয়া বলিলেন "তুমি কে ?"

উত্তর হইল "আমিই সেই শিশু, আর খুঁজিতে যাইবেন না"

"তুমিই সেই ! তোমার শাপে আমার সমস্ত ছারখার !" দেবীপ্রসন্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বালক বিদীর্ণ হৃদয়ে বলিল "দেবি রক্ষা কর, কি করিলে যাহা ছিল ফিরিবে ? আমার জীবন গ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব্ব প্রার্থনা বিফল কর।"

অদূরে আর্ত্তনাদ উঠিল, "মেঘমালা আর নাই !"

যুবক ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্যুৎবেগে মন্দিরে কালীর সম্মুখীন হইয়া তাহার হস্তের শাণিত কৃপাণ সজোরে খুলিয়া লইয়া তাহাকে ছিন্নমস্তা করিয়া বলিল ; পাষাণি, রক্ত পিপাসি, আজ হইতে পৃথিবীর প্রতিশোধ-স্পৃহা, তাহার রক্ত পিপাসা নিবৃত্ত হউক." বলিয়া সেই শাণিত কৃপাণ আমূল নিজ বক্ষে সঞ্চালিত করিয়া বালক দেবী পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

আত্মরক্তে তাহার প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ, নির্ব্বাপিত হইল।

শিব।

কিন্তু শক্তি চাহি—হৃদয়ে গভীর প্রেম এবং বাহুতে দুর্জ্জয় বল। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের রমণীয় কোমলতা মাত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে, বলের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পই। কিন্তু প্রেমে এবং বলে একীকৃত না হইলে মানব-চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করে না। প্রেম বল দেয়, বল প্রেমকে দৃঢ় করে। এবং এইরূপে পরস্পরের নিত্য সহায়তায় মানব-জীবন সংসারের জটিল সমস্যার মধ্য দিয়া প্রতিদিন আপনাকে নিঃশব্দে বিকশিত করিয়া তুলে। বল হইতে বিচ্ছিন্ন প্রেম নিরুদ্যম বেগ এবং অলস রমণীয়তা লইয়া উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন বল অন্তরে আশ্রয় না পাইয়া প্রচণ্ড কাপুরুষ দাপটে পর্য্যবসিত হয়। প্রেমের আশ্রয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে বলের কথঞ্চিৎ বিকাশ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে বল এত মৃদু যে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। বৈষ্ণব সাহিত্য রমণীর কোমলতা দিয়া গঠিত। মধুর তরল ভাব বৈ বৈষ্ণব হৃদয়ে ত স্থান পায় না। কোমল প্রেমে কঠিন বল সেখানে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে বৈষ্ণব কাব্যে সমুন্নত দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের অনেক স্থলে কেমন অভাব বোধ হয়। বল বৈষ্ণব কাব্যে স্ফূর্ত্তি বড় পায় না।

কংসবধ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের বলের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, এবং এই ব্যাপার বৈষ্ণব সাহিত্যেরই অন্তর্গত, কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণব কাব্যে কংসবধে ত আর কৃষ্ণের চরিত্র বিকাশ হয় নাই। বৈষ্ণব কবিগণের রচনায় দায়ে পড়িয়া উক্ত ঘটনার মধ্যে মধ্যে কদাচ উল্লেখ দেখা যায় মাত্র। কিন্তু রাধিকারঞ্জনের কুসুম-সুকুমার ললিত বর্ণনা পড়িয়া ত বীরভাব কাহারও মনে আসে না। মোহন-চূড়া, কমল-নয়ন, ভ্রমর-ভাবে স্বভাবতই স্তম্ভিত না হইয়া মন কিছু আল্‌গা হইয়া পড়ে। গাম্ভীর্য্যে বলের প্রতিষ্ঠা। সৌন্দর্য্য এবং শক্তি এখানে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া কোনও উদ্দেশ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের এ গাম্ভীর্য্য নাই। নানা কারণে, ইচ্ছায় হৌক অনিচ্ছায় হৌক, তিনি কতকটা রমণীকৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যে রমণীতেই প্রেমের আলোচনা। অন্ততঃ রমণীর ভাব সেখানে যেরূপ ফুটিয়াছে, পুরুষের ভাব তেমন ফুটে নাই—হয়ত ফুটাইবার আবশ্যকও হয় নাই। বৈষ্ণব স্ত্রী-চরিত্রগুলি যেমনই হৌক্ যতখানি স্ত্রী, পুরুষ-চরিত্রগুলি কিছুতেই সেই পরিমাণে পুরুষ নহে। প্রেমে পুরুষ-হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করিয়া রমণী পরিতৃপ্ত, কিন্তু আশ্রয়-দানে পুরুষ-হৃদয়ের চরিতার্থতার ভাব বৈষ্ণব কাব্যে বিরল। বলিতে গেলে, পুরুষ-চরিত্র বৈষ্ণব কাব্যে অসম্পূর্ণ।

কিন্তু আদর্শ সম্পূর্ণ চরিত্রগঠন বৈষ্ণব কবির কোথাও উদ্দেশ্যও নহে। আর বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবির নিকট ইহা আশা করাও তেমন যায় না। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের পুরুষেরা কোমলাঙ্গীরই একটুকু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। সুতরাং পৌরুষের অভাবে বলে বীর্য্যে সম্পূর্ণ পুরুষ-চরিত্র গঠন বৈষ্ণব কবির পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কিন্তু কোমলতা আমাদের যথেষ্ট আছে। এই জন্য এ দেশের রমণী যতদূর রমণী হইবার। কোমলতায় স্নেহে প্রেমে আমাদের গৃহিণীদের পার্শ্বে কেহই স্থান পায় না। আর ইহার মধ্যে কোথাও ভাণ নাই। ইংরাজ রূপসী ফুলের ঘায়ে কাতর হইয়া পড়েন, কেতাবের আইনানুযায়ী যথাসময়ে মূর্চ্ছা অবলম্বন করেন, শীকারে স্বামীর সুনিপুণা সহধর্ম্মিণী হইয়া লোকসমাজে শোণিতের উল্লেখমাত্রে সযত্নে শিহরিয়া উঠেন, অর্থাৎ অবসর এবং সুবিধা পাইলেই রমণীজনোচিত আত্যন্তিক কোমলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। আমাদের সুন্দরীদের কোমল ভাবে সলজ্জ সহিষ্ণুতা। দেখাইবার চেষ্টা কোথাও নাই। এই স্বাভাবিক কোমলতায় আমাদের কাব্যে কোমল ভাবের এত প্রধান্য। এবং এই কোমল ভালবাসায় আমাদের উত্তমার্দ্ধের যাহা কিছু বল।

অপরার্দ্ধও আমাদের কোমল-হৃদয়। কেবলমাত্র কোমল-হৃদয় নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোমলাঙ্গও বটে। সেই জন্য অঙ্গে আঘাত পড়িলে হৃদয় আমাদের অনেকটা দমিয়া যায়। এবং নিতান্ত পূর্ব্বজন্মের দায়ে না ঠেকিলে অন্তরাত্মা এ ক্ষণভঙ্গুর কারা-

দেহ হইতে নির্ব্বিবাদে মুক্তি লাভ করতঃ অবিলম্বে লোকান্তরের অবস্থা-স্বচ্ছলতা সম্পাদনার্থে যত্নবান হয়! বৈষ্ণব কাব্যে তাই দেহ নিরাপদ—বলের সংস্পর্শ যথাসাধ্য দূরীকৃত। বাঙ্গালার বাহিরে তবু বল প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এখানে মুগ্ধা গোপিনী কুল রঞ্জনে বলের বড় আবশ্যক হয় নাই। সমতল বৈষ্ণব রাজ্যে কোমলতায় যথেষ্ট ফল হয়। বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, তোড়ও সুতরাং নাই। অবাধে হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিয়া কোমল প্রেম-স্রোত বহিয়া গিয়াছে। চারিদিকে ফলে ফুলে ধনে ধান্যে হৃদয় উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

কিন্তু বলের অন্তঃপুরে কোমলতা যেরূপ সুরক্ষিতা আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে তেমন নিরাপদ নয়। রসের সহিত কোমলতার উপমা খাটে। সরসতার তরুহৃদয় সবল এবং বলে তাহার সরসতা। শুষ্ক কাঠিন্যে অস্ত্র ভেদ করে না বটে, কিন্তু এ জড়তা বলের পরিচয় নহে। জীর্ণ দেহেও রস শুকাইয়া আসে, দুর্ব্বল বার্দ্ধক্য কোমল নহে। বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে কোমলতা বলে পরিপুষ্ট হয় নাই। এই জন্য আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদনে এত বিলম্ব। বল নহিলে কোমলতা প্রয়োগ করিবে কে? আমাদের প্রেম যতই গভীর হৌক্ বলের অভাবে অলস এবং নিস্তেজ। নহিলে, হৃদয়ই ত বাহুতে বল দেয়। বাঙ্গালার চৈতন্যই ত হৃদয়ের বলে দশদিক্ জয় করিয়াছিলেন। আশ্রয়দানে প্রেমের বল প্রকাশ পায়। রমণীর কোমলতায় নির্ভরের ভাব স্বাভাবিক। এবং রমণীর এই নির্ভর-ভাবই পুরুষের প্রেমে আশ্রয়-বল প্রদান কিন্তু নারীর রমণীয় কোমলতা পুরুষের প্রেমে অশোভন। পুরুষের প্রেমে হৃদয়ে বল চাহি এবং বাহুতে তাহার বিকাশ।

রমণীর কোমলতায় কি বল নাই? কিন্তু সে বল স্বতন্ত্র। যে বলে লতা দীর্ঘ ছায়া-তরুকে জড়াইয়া উঠে, যে বলে নারী রৌদ্রতপ্ত অবসন্নকে আপন স্নিগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দান করেন। পুরুষের বল বাহিরের ঝটিকা হইতে রক্ষা করিয়া রমণীকে এই ছায়াময় নিভৃত শান্তিকুঞ্জ রচনার অবসর দেয়। বৈষ্ণব কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ এ বল হইতে বঞ্চিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ-বিলাসে তাঁহার সমস্ত চরিত্রে একটা অশোভন দুর্ব্বল কোমলতার ছায়া পড়িয়াছে। বাহুতে বল থাকিলেও হৃদয়ের অসংযত লঘুতায় তাহা ব্যর্থ। সক্ষম ক্ষমা এবং সংযত মনুষ্যত্বে বলের পরিচয়। পৌরুষ ত কেবল মাত্র মুষ্টিযোগে নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ড মুষ্টি অনুভব করিতে পারিলেও আমরা ধন্য হইতাম। বৈষ্ণব কাব্যে বিলাস-কোমলতায় দ্রবীভূত হইয়া কৃষ্ণের চরিত্র নামিয়া গিয়াছে।

আদর্শ পুরুষ-চরিত্র শিব। প্রেমে বলে, ক্ষমায় ক্ষমতায়, গার্হস্থ্যে বৈরাগ্যে তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ। সমস্ত ভাবে তাঁহার প্রেম এবং বল প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমে বলে কোথাও বিযুক্ত হয় নাই। তাই শিবের চরিত্রে সৃষ্টি প্রলয়ের সহিত চির-বন্ধনে বদ্ধ।

প্রেম হলাহল পান করিয়া প্রলয়কে কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছে, বল বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও মৃত্যুকে দমনে রাখিয়াছে। শৈব সাহিত্যে প্রেমে এবং বলে মহত্ত্বের অনুশীলন। বৈষ্ণব সাহিত্যের শিথিলতা এখানে নাই। শৈব দেবমন্দিরের সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্যে ভয়ে বিস্ময়ে স্তিমিত অন্তর-রুদ্ধ আনন্দে হৃদয় নত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব হৃদয় নদীতীরে, তরুতলে, প্রকৃতির ছায়াসুপ্ত বিজন শ্যামলতায়, মাতৃস্নেহে, বন্ধুর প্রীতিতে, সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত মধুর মিলনে নীরবে বর্দ্ধিত হয়। শৈব হৃদয় যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব বেষ্টিত পর্ব্বতের কঠিন সৌন্দর্য্যে, পিতার রুদ্র-স্নেহে, ত্রিশূলের প্রবল আশ্রয়ে দুর্জ্জয় বল সঞ্চয় করে। এই জন্য সমাজ সংগঠনে শৈবের প্রভাব। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সামাজিক অপেক্ষা পারিবারিক।

তাই বাঙ্গালা দেশে শিব অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রভাব অধিক। শিথিলতার মধ্যেই আমরা থাকি ভাল। পরিবারে ত আর সঙ্কোচ নাই—হাত পা ছড়াইয়া বেশ নির্ভাবনায় থাকা যায়। শুধু এই কারণে নহে, শিবের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য আমাদের লঘু হৃদয়ে হয়ত গুরুভার বলিয়া বোধ হয়, আমরা এ সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া কৃষ্ণের তরল কোমলতায় ঢলিয়া পড়ি। আমাদের জাতীয় চরিত্র শৈব ভাবের বড় অনুকূল নহে। বরঞ্চ পাশ্চাত্য চরিত্রে শৈব ভাব ঈষৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু দানব-অধৈর্য্যে প্রশান্ত সবলতা পাশ্চাত্য চরিত্রে স্থান পায় না। শিবে বল আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ সংযত। উদ্ধত দাপট গর্ব্ব-গঞ্জন ভোলানাথের অন্তরে থাকিবে কিরূপে? ঔদ্ধত্য ত প্রেমের সহিত নিত্য অবস্থান করিতে পারে না। শিবের বল মুহূর্ত্তেক প্রেমহীন নহে।

শৈব ভাবের অনুশীলন আমাদের চরিত্র গঠনে এখন বোধ করি বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। কারণ ইহাতে নূতন ভাবের সংস্পর্শে আমাদের অনেকগুলি প্রসুপ্ত মনোবৃত্তি নাড়াচাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণব প্রেমে শৈব বল মিশিতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। নহিলে, এ কোমলতা চিরদিন নব বল দিয়া আমাদিগকে সজীব রাখিতে অক্ষম। যশোদার স্নেহে, রাধিকার প্রণয়ে, সুবল সুদামের সখ্যে হৃদয় যতই কেন প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না, আপন অন্তরের মধ্যে আপন দুর্জ্জয় বলে একবার প্রতিষ্ঠা অনুভব না করিলে সকলই নিষ্ফল। কেবলি পাষাণ পশু-বলের কথা বলিতেছি না, কিন্তু যে বল পশুবলকে পরাজিত করিয়া দুর্জ্জয়, যে বল বাহুতে বল সঞ্চার করিয়া প্রবল, যে বল মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অমর।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গে বলের চর্চ্চা এ দেশে একবার আসিয়াছিল। এরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াই থাকে। কিন্তু পৌরুষিক গাম্ভীর্য্য এবং রমণীর কোমলতা উভয়-বর্জ্জিত হইয়া এ বল অনেকাংশে নিষ্ফল। কোমলতায় তখন আর বাঙ্গালীর মন উঠে না, অবস্থায় পড়িয়া শক্তির জন্য তাহাকে দেবতার দুয়ারে উপস্থিত হইতে হইল। প্রবলের পাশব অত্যাচার কোমলতার উপরেই সমধিক বল প্রয়োগ করে। সুতরাং

বহুদিন নীরবে সহিয়া নিতান্ত যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, কোমল-হৃদয় বঙ্গসন্তান প্রেম ছাড়িয়া অস্ত্রধারণে উদ্যত হইল। বলিতে গেলে, মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে শাক্ত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। কিন্তু হইলে কি হইবে? বৈষ্ণব কোমলতা আমাদের হাড়ে হাড়ে এমনি বিঁধিয়াছে যে, শক্তি আমাদিগকে সহজে গড়িয়া তুলিতে পারে না। বৈষ্ণব ধর্ম্মে কোমলতার মধ্যেই একরূপ বল ছিল। প্রেমের বলে আমরা বিশ্বসংসারকে অন্তরে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে সে প্রেম যখন শিথিল হইয়া আসিল, অক্ষম হিংসা এবং দারুণ তৃষা লইয়া অন্তরে আমরা প্রথম দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম। দুর্ব্বল সন্তান স্বভাবতই মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইতে ছুটে। কিন্তু প্রেমে আর আমাদের তেমন নির্ভর নাই, জননীর স্নেহে আর আমরা হৃদয়ে বল অনুভব করি না, তাড়াতাড়ি মায়ের হস্তে গোটাকতক প্রাচীন পুঁথিরক্ষিত ধাতব অস্ত্র গুঁজিয়া দিয়া অসম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইলাম। জননীর শারীরিক বলেই আমাদের যাহা কিছু আশা ভরসা। কাপুরুষ-হৃদয় জননীর স্নেহে সাহস পাইল না, কোমলাঙ্গিনী রমণীর মৃণাল ভুজে অস্ত্র দিয়া অঞ্চলের আড়াল অবলম্বন করিয়া রহিল।

ইহাই শক্তিপূজা। এবং এই জন্যই শক্তির প্রভাবে আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় নাই। নির্ম্মম রক্ত-দৃশ্যে হৃদয়ের কোমলতা হানি হয় মাত্র; জীব বলিতে, ঢাকের বাদ্যে, উন্মত্ত প্রচণ্ড তাণ্ডবে, অর্থাৎ যথাসম্ভব আসুরিক ব্যবহারে সবল চরিত্র গঠন হয় না। রমণী লক্ষ্মীরূপিণী অন্নপূর্ণা জননী। এই ভাবেই তাঁহার বল। প্রেম বিতরণ করিয়া, শান্তি বিতরণ করিয়া, অন্ন বিতরণ করিয়া তিনি শক্তিমতী। অস্ত্র ধারণ করিয়া নহে, শোণিত পান করিয়া নহে, রণরঙ্গে সংহারিণী প্রলয়-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নহে। বলে অসুরজয় রমণীর পক্ষে কেমন অস্বাভাবিক এবং অনাবশ্যক ঠেকে। বিশেষতঃ শিব বর্ত্তমানে পার্ব্বতীকে দিয়া এ কার্য্য সাধনের প্রয়োজন কি? কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ইহার জন্য দায়ী নহে। সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই চণ্ডীর অবতারণা। চণ্ডী যদি কোথাও দুষ্প্রাপ্যা হয়েন ত এই বঙ্গদেশে।

তাই বোধ করি শক্তি এখানে জমিল না। যেটুকু বা জমিয়াছে তাহাতে বীররসের প্রাবল্য কি অন্য কোনও বিদ্রূপাত্মক রসের প্রাধান্য নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৈষ্ণব প্রেমে আমাদের জন্ম, রমণীর কোমল করকমলে তৃষিত তরবারি সহিবে কেন? কিন্তু সামঞ্জস্য করিতে না পারায় আমাদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটে। শাক্ত ভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিসদৃশ অসামঞ্জস্য অনুভব করা যায়। তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাহা বুঝান দুঃসাধ্য। কিন্তু সবশুদ্ধ প্রকৃতি অপেক্ষা বিকৃতিরই সেখানে যেন কিছু প্রভাব। শিবের চরিত্রে এই বিকৃতি অভাবে সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ। শক্তি আছে, কঠোরতা আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং একান্ত আবশ্যক। মত্ততা শিবে নাই। তাঁহার চরিত্র বিশ্বের রহস্য মন্থন করিয়া নিঃশব্দে গঠিত হইয়াছে—পর্ব্বতের মত অটল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর।

কিন্তু শিব ত আমাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। কেবল, কুমারীরা গৌরীর অনুকরণে পতিপ্রার্থনায় শিবপূজা করিয়া থাকেন মাত্র। তাহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, শিবের উদার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম নহি। এবং আমাদের রমণীদের মধ্যে স্বামীর আদর্শ এখনও সহৃদয় সবল পুরুষ—নিতান্ত সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পুরুষবেশী নারীচরিত্র নহে। কিন্তু ইহা হইতে শিবের প্রভাব সামান্যই প্রতিপন্ন হয়। আমাদের জাতিগঠনে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভিন্ন আর কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। সেই জন্য বাঙ্গালার একমাত্র গৌরবের সাহিত্য বৈষ্ণব কাব্য। শৈব সাহিত্য আমাদের আদরেই নাই। এবং শাক্ত সাহিত্য যাহা আছে তেমন উচ্চ অঙ্গের নহে।

কিন্তু শক্তিপূজা আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত। তখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই। এবং বোধ করি বাঙ্গালী জাতিগঠনও তখন বিশেষ অসম্পূর্ণ। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার কারাগৃহ রচনা করিয়া হিংসার পদতলে দাঁড়াইয়া তন্ত্র তখন করালবদনে শত ব্যাখ্যানে আপনার নিদারুণ তিমির-মহিমা প্রচার করিতেছে—পৈশাচিক সন্দেহ অবিশ্বাস এবং নির্ম্মমতায় বঙ্গগৃহের প্রতিষ্ঠা প্রতিদিন টলমল। এমন সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আসিয়া স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রথম আমাদের জাতিগঠন। প্রেমে এবং কোমলতায় আমরা পরস্পরকে অন্তরে অনুভব করিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মে আমাদের অন্তর বাহিরে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সুতরাং সাহিত্য জন্মাইবার এই প্রশস্ত অবসর। শক্তি আমাদের অন্তরে স্থান পায় নাই। তাই অজ্ঞান এবং অন্ধকারের মধ্যে তাহা নিষ্ফল।

তাই বলিয়া একেবারে ব্যর্থ নহে। সেই জন্যই বৈষ্ণব যুগের পরে তাহার পুনরুত্থান। এবং সাহিত্যেও অল্পবিস্তর প্রভাব। মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্য রচনা করিলেন, রামপ্রসাদ সঙ্গীতে এবং কাব্যে শক্তির গান গাহিলেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও শক্তির প্রভাব বড় সামান্য নহে। কিন্তু এ সাহিত্য আমাদের গভীর হৃদয়ে পরিপুষ্ট হয় নাই—বাহিরের পৌরাণিক উত্তাপে ইহার জন্ম। তথাপি ক্রমে ক্রমে শাক্ত সাহিত্যেও বৈষ্ণব প্রভাব পড়িয়াছে। আগমনী সঙ্গীত প্রভৃতিতে কোমল প্রেমচর্চ্চা বাদ যায় নাই। কোমলতা আমাদের প্রকৃতি। শক্তি পূজারই ভাণ করি আর যাহাই বলি কোমল ভাব নহিলে আমরা থাকিতে পারি না। কোমলতায় ভিন্ন আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতি চরিতার্থতা লাভ করে না।

বাঙ্গালার শাক্ত কাব্যে শক্তির মহিমা প্রচারিত হইলেও যথার্থ বীর রসের সম্বন্ধ অল্পই। কোমল বর্ণনাগুলি আমাদের আসে ভাল। সুতরাং শক্তির মধ্যেও কোমল রসেই আমাদের হৃদয় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এমন কি, অনেক স্থলে এই জন্য রসের যথাযথ বিকাশ অভাবে কাব্যের হানিও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই কোমল

রসের কল্যাণেই বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবের নাম উল্লেখ দেখা যায়। পার্ব্বতীর সহিত সম্বন্ধে তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। গৌরীর কথা বলিতে গেলে শিবের উল্লেখ না করিয়া ত থাকিবার যো নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্র শিবের চরিত্র যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে যে পরিমাণে লঘুতা প্রকাশ পাইয়াছে গাম্ভীর্য্য তাহার ধার দিয়াও যায় না। ভারতবন্দ্রের শিব আধুনিক ভণ্ড সন্ন্যাসীদলের একজন প্রতাপশালী দলপতি। কোনও প্রকারে যেন কতকগুলি অমানুষিক শক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন মাত্র। দেবভাব ত দূরের কথা, সমুন্নত মনুষ্যত্ব দেখিলেও আমরা পরিতৃপ্ত হইতাম।

বাস্তবিক, দেবত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্বে আমাদের সহানুভূতি অধিক। একেবারে সুখদুঃখবিবর্জ্জিত নিষ্কলঙ্ক দেব-চরিত্রে হৃদয় টানে না। আমরা অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণতার নীরব বিকাশ অনুভব করিতে চাহি। চেষ্টায় আমাদের অর্দ্ধেক আনন্দ। অক্ষম মানব প্রাণপণ চেষ্টায় শতবার স্খলিতপদ হইয়া দেবত্বের পথে যতটুকু অগ্রসর হয়, আমরা হৃদয়ে সেই পরিমাণে আনন্দ অনুভব করি। মানব নহিলে সকল হৃদয়ে আমরা যেন তাহাকে ভাল বাসিতে পারি না। সেই জন্যই আমাদের রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হইয়াও অজ্ঞান। মানবের মত তাঁহার সুখ আছে, দুঃখ আছে, ভয় আছে, ভ্রান্তি আছে, তিনি বিপদে পড়েন এবং দুর্ব্বল মানবেরই মত বহু কষ্টে বন্ধুবর্গের সহায়তায় নানা কৌশলে বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। সীতা রামচন্দ্রের লক্ষ্মী-দেবী। কিন্তু তাঁহার চরিত্র একেবারে সম্পূর্ণ নহে। রমণীজনসুলভ সকল সুখ দুঃখই তাঁহার আছে। ব্যথা পাইলে তিনি কাঁদেন, স্বজন বিরহে অধীর হইয়া পড়েন, গন্ধদ্রব্যে আনন্দ উপভোগ করেন, সেবায় সুখী হয়েন, এমন কি, দেবর লক্ষ্মণ ভাল ভাবিয়া তাঁহার আদেশ পালনে একটুকু ইতস্ততঃ করিলে সময় সময় মনের আবেগে রূঢ় ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অসম্ভব নির্ব্বিকার মহত্ত্ব সীতাকে আমাদিগের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সীতায় আমরা এই মর্ত্ত্য ভাবের মধ্যে মহত্ত্ব, প্রেম, নিষ্ঠা দেখিয়াই মুগ্ধ। কেবলই রাম সীতা বলিয়া নহে, সর্ব্বত্রই অসম্পূর্ণতার মধ্যে, পদস্খলনের মধ্যে, সহস্র ত্রুটি এবং অক্ষমতার মধ্যে মহত্ত্বের সংযম-চেষ্টা অনুভব করিয়া আমরা তৃপ্ত হই।

শিবকেও আমরা মানব-ভাবে দেখিয়াই তাঁহার মহত্ত্ব উপভোগ করি। মানব-ভাবে না দেখিলে কাব্যে তাঁহার প্রতিপত্তি হইত না, কেবলই স্তবে, বন্দনায় এবং ধ্যান-মন্ত্রের বিশেষ রকম কাব্যের মধ্যে শিব দেবাধিদেব হইয়া বিরাজ করিতেন। কাব্যে শিব নিরাকারও নহেন, নির্ব্বিকারও নহেন, তিনি কখনও যোগী, কখনও গৃহস্থ, কখনও বা গৃহী বৈরাগী। তবে কাব্যেও তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে শক্তি যেন ঈশ্বরের প্রসাদ মাত্র, শিবকে সে শক্তিতে ঈশ্বর বোধ

না। শিব যাহাই হৌন্, কাব্যে মানবীকৃত হইয়াছেন। মানবীয় অসম্পূর্ণতা তাঁহার চরিত্রেও লক্ষিত হয়। এবং ইহাতেই শিবের চরিত্র যতদূর সম্পূর্ণ। আমাদেরও শিবের প্রতি অনুরাগের কারণ এইখানে। যখন দেখি যে, তাঁহার উপরেও মদনের প্রভাব, তাঁহারও চিত্ত চঞ্চল হয়, যোগ ভঙ্গ হয়, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, অতিহিংসা শত্রু দমন করে, তপস্যা বিনা সহজে চিত্ত সংযত হয় না, উন্নতির জন্য, শান্তির জন্য আপনাকে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইতে হয়, তখনই আমরা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই শিবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। নহিলে, সুখদুঃখহীন নির্হৃদয় দেব-চরিত্রের নির্ব্বিকার মহত্বে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আশা করা যায় কিরূপে?

সতী হিমালয়ের গৃহে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—পূর্ব্বজন্মে দক্ষকন্যারূপে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ ছিলেন, এবারেও শিবের সহধর্ম্মিণী হইবার জন্যই তাঁহার জন্মগ্রহণ। শিব সর্ব্বদা যোগাসনে আসীন—সতীর দেহত্যাগ অবধি গৃহধর্ম্মে তাঁহার আর বড় মন নাই। সুতরাং তাঁহাকে সংসারী করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। দেবতাদেরও স্বকার্য্য উদ্ধারার্থে শিবকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। শিবের সন্তান নহিলে তাঁহাদের শত্রু-দমন হয় না। দেবতারা নগেন্দ্রনন্দিনীকে শিবের হৃদয়হরণে তাই সহায়তা করিবেন স্থির করিয়াছেন। মধুসখা কন্দর্প ফুলধনু লইয়া নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকিবেন, পার্ব্বতী নিয়মিত শিবপূজা করিতে আসিলে পুষ্পশরে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিবেন। পার্ব্বতী এ ব্যাপার কিছুই জানেন না। প্রতিদিন যথাসময়ে আসিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শিবের সেবা করেন, যথাসময়ে চলিয়া যান। শিবের যোগ ভাঙ্গে না।

কিন্তু যোগ না ভাঙ্গিলে নয়। মন না টলিলে ত এত রূপ এত সেবা এ সকলই ব্যর্থ। রতিপতি সময় বুঝিয়া বসন্তের সহিত এক দিন শিবের আবাসস্থানে নামিয়া আসিলেন। অসময়ে চতুর্দ্দিকে সহসা বসন্তের আবির্ভাব হইল—গাছে পালায়, মেঘে রৌদ্রে, জলে স্থলে বসন্তের কনক-বিকাশ। মানব-হৃদয়েও বসন্ত যথারীতি প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করিল না—বিশেষতঃ শিবের হৃদয়ে। সম্মুখে অর্দ্ধোন্মুক্তযৌবনা গৌরী শিবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিতেছেন। ত্রিলোচন যেমন সেই পুষ্পাঞ্জলি প্রতিগ্রহণ করিতে যাইবেন, কন্দর্পের নিদারুণ সম্মোহন-বাণে ব্যথিত হইলেন। চন্দ্রোদয়ে সাগর-হৃদয়ের মত শিবের সেই অগাধস্তম্ভিত হৃদয়ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। উমামুখে তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি নিপতিত হইল। কিন্তু চঞ্চল মন শিবকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিল না। অটল দৃঢ়তার সহিত সংযমী আপনাকে দমন করিয়া রাখিলেন। মদনের চাতুরী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ক্রোধে ভোলানাথের নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। তীব্র দৃষ্টিতে তিনি মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। আপনিও আর এক

মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না, পাছে চিত্ত সংযমে অক্ষম হয়েন এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতী সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কালিদাস সংযমে শিবের চরিত্র বজায় রাখিলেন।

ভারতচন্দ্রের শিব কিন্তু এ প্রকৃতির নহেন। সিদ্ধি এবং গঞ্জিকায় তাঁহার অর্দ্ধে শিবত্ব। সুতরাং চরিত্রও তদনুরূপ। বাণবিদ্ধ হইয়া তিনি মদনকে ভস্ম করিলেন বটে কিন্তু আপনাকে সংযত করিলেন না। অপ্সরী কিন্নরীদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বঙ্গীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এবং এই অশিব ব্যবহারে অতি রসজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠককুলের তাম্বুলরক্ত চর্ব্বণ-যন্ত্রে হাস্যসঞ্চারে খিটিমিটি খিটিমিটি ক্রম শব্দের এক প্রকার গতিবিধিও অনুভব হইতে লাগিল।

কুমারসম্ভবে শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ। কালিদাস মহান্ সৌন্দর্য্যের কবি, গভীর ভাবের কবি, সরস মধুরতার কবি। শিবের কোমল-কঠোর চরিত্র-সৌন্দর্য্য তিনি ধরিতে পারেন। তাই তাঁহার কাব্যে কোথাও চরিত্র-ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। তাঁহার শিবের চরিত্র সংলগ্ন এবং সঙ্গত। প্রেমে সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মাদের মত সমস্ত পৃথিবী যিনি ভ্রমণ করিতে পারেন, সতীর সহিত গার্হস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যায় দীর্ঘ যৌবন যাপন করেন, মদনের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে না পারিলেও মুহূর্ত্তে আত্মহারা হইবার মত চরিত্র তাঁহার নহে। কালিদাসের শিব টলমল মনকে সংযত করিয়া সামলাইয়া লয়েন।

কিন্তু পার্ব্বতীতে শিবের মন টানিয়াছে। যতই সংযম-চেষ্টা করুন আর যাহাই করুন, নগেন্দ্রনন্দিনীর রূপ তাঁহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এখনও চাই কি শিব যোগে ফিরিতে পারেন। পার্ব্বতী অহরহ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য ধ্রুব, সঙ্কল্প স্থির, চিত্ত একাগ্র। শিবের সহধর্ম্মিণী না হইলে তাঁহার জীবনে আর কোনও সুখ নাই। তিনি সহধর্ম্মিণীরূপে চিরদিন শিবের সেবা করিবার অধিকার চাহেন। তাই এই কঠোর সাধনা।

শিবের মন গলিল। ব্রাহ্মণবেশে তিনি একদিন তপস্বিনীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শিবের যে একটু আধটু নিন্দাও না করিলেন এমন বলা যায় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, শিব শ্মশানচারী, ভস্ম মাখিয়া থাকে, খেয়াল অনুসারে চলে, এমন রূপসীর পাণিগ্রহণের যোগ্য নহে। গৌরীর এ কথাগুলি তেমন ভাল লাগিল না। একটু তীব্র ভাষায় বেশ গুছাইয়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। কালিদাস উমার মুখ দিয়া শিবের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শিব-চরিত্রের কৈফিয়ৎ অনেকটা দেওয়া হইয়াছে। আর ঐশ্বরিক ভাবের সহিত মানব ভাবের সম্মিশ্রণে শিব ফুটিয়াছেনও ভাল। উমা বলিলেন,

"বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
নিষেব্যতে ভূমি সমুৎসুকেন বা।

জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনলম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্ ॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা
করোতি [illegible]গম্য মৌলিনা
বিনিদ্রমন্দাররজোহরুণাঙ্গুলী ॥"

শিবের এ সকল আবশ্যক কি? তিনি সকল অবস্থাতেই শিব। শ্মশানবাসী দরিদ্র হইয়াও তিনি ত্রিলোকনাথ, ভীমরূপ হইয়াও সৌম্যমূর্ত্তি, সাজ সজ্জা করুন্ বা না করুন্ তাঁহার শিবত্বের এক তিল ব্যতিক্রম ঘটে না। দেবতারা তাঁহার অঙ্গচ্যুত চিতাভস্ম স্পর্শে সম্মানিত জ্ঞান করেন, ইন্দ্রও দূর হইতে বৃষারূঢ়কে দেখিলে ঐরাবত হইতে অবতরণ করিয়া চরণে শিরস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

উমার মুখে শিবের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া শিব সবিশেষ প্রীত হইলেন। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। কালিদাস এই অবস্থায় সলজ্জ সম্ভ্রমে উমার কোমলতা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতি কোথাও ঝাঁঝাল নহে।

ইহার পর শিবের বিবাহ। গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে নহে; যথারীতি হিমালয় কন্যা সম্পদান করিলেন, দেব ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ সভায় উপস্থিত, অনুষ্ঠানের কিছু ত্রুটি নাই। শিবের বেশ ভূষা শিবেরই মত—চিতাভস্ম, বাঘছাল, ফণাজাল সকলই আছে। কিন্তু কালিদাস ভারতচন্দ্রের মত শিবকে অসংযতবসন অতিরিক্ত বাহ্যজ্ঞান শূন্য করিয়া হাস্যরসাবতরণচেষ্টায় মাটি করেন নাই। গাম্ভীর্য্যে শিবচরিত্র অটল

অচল। শ্লীলতা ভঙ্গ করিয়া শিবের বর্ণনায় লঘু হাস্য আকর্ষণ চেষ্টা নিতান্তই কবি অযোগ্য।

বিবাহেই কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য সমাপ্ত—এ গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং শিব-চরিত্র কালিদাসের রচনা হইতে সম্পূর্ণ বুঝা যায় না কিন্তু তাহার তেমন আবশ্যকও নাই। পুরাণাদি হইতে শিব সম্বন্ধে আমাদের যথে জ্ঞান আছে। তবে অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র তাঁহাকে যেখানে মারিয়াছেন, কালিদা সেইখানেই কিরূপে মহত্ত্বে গাম্ভীর্য্যে সংযমে শিবের সমুন্নত আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন ই দেখাইবার জন্যই কুমারসম্ভবের শিবের উল্লেখ আবশ্যক। আর মানব-ভাবে শিবে প্রতি সহানুভূতিও আমাদের অধিক এইখানে।

এখন হরগৌরীর মিলনে

প্রেম আছে, স্নেহ
... নাই। পারিং
শৈব সাহিত্যে বৈরাগ্যের ... গাহ
মধ্যেও শিথিলতা। তাই হয়ত সম্বন্ধ গ
এবং ঘনিষ্ঠ। শিব-সহধর্ম্মিণী শি ... তে মাতৃভা
বিকশিত হইয়া তাঁহার মধ্যে গার্হস্থ্য স ... হৃদয়ের বিক
এরূপভাবে দেখান হয় নাই। স্বতন্ত্র চরিত্রে স্বতন্ত্র ...ব-মাধুরীটুকু যথাসাধ্য ব্যক্ত ক হইয়াছে। এই কারণে বৈষ্ণব সাহিত্য গীতিকাব্যপ্রধান। শৈব ভাবে গীতিকা অপেক্ষা মহাকাব্য রচনার যেন সুবিধা অধিক।

বৈষ্ণব গার্হস্থ্যে কেবলই মাধুরী কিনা। মাধুরী লইয়াই বৈষ্ণব কাব্য। কি গার্হস্থ্যের একদিকে ক্ষমতারও আভাস পাওয়া যায়। শৈব গার্হস্থ্যে ইহা কতক থাকিলেও থাকিতে পারে। শিবেরই ত অন্নপূর্ণা। বৈষ্ণব ভাব কিছু তরল। শৈ ভাবে বন্ধন দৃঢ়। ইহাতে সমাজ-সংশ্রব আছে। কিন্তু শক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে এ সমাজ-সংশ্রব টিঁকে না। শক্তির সহিত শিবের সম্বন্ধ সকল অবস্থায় না হইলে অনেক অবস্থায় এমনি জড়িত যে, উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না তথাপি শাক্ত এবং শৈব ভাবে অনেক প্রভেদও আছে। কিন্তু তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এখন বৈষ্ণব স্বাধীনতায় শৈব সংযম, বৈষ্ণব প্রেমে শৈব বল, বৈষ্ণব মাধুরীতে শৈব গাম্ভীর্য্য মিশিতে পারিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভালবাসা।

হৃদয়ের হাসি তুই,
সাঁঝের ফুটন্ত জুঁই,
জলের উপরে তুই
সাঁঝের বাতাস টুকু।
তোরে নিয়ে, ভালবাসা,
কল্পনার যত আশা,
কবির সকল ভাষা,
তোরি তরে সুখ দুঃখু।
উদাস কবির ভাবে
ভালবাসা অশ্রু হবে,
প্রিয়ার কটাক্ষে এবে
দেয় মধু পরিমল।
স্বপ্নময়ী ভালবাসা
লইয়া নীরব আশা
হৃদয়ের সুখ আশা
বাড়াইছে অবিরল।
এই জগতটা তোর
ল'য়েছে বিশাল কোল,
ইহারে মাতায়ে তোল
মধুময় তোর গানে।
শত শত সূর্য্যমুখী
হৃদয়ে মারিবে উঁকি,
অবশ হৃদয় দুখী
জাগিয়া উঠিবে গানে।
জ্যোছনার উপবনে
ভালবাসা তোরি গানে
মধু প্রতিধ্বনি শুনে
হৃদয় উদাসী হয়।

তারকার রাজ্য যেন
তোরি শুভ্র পদচিহ্ন,
আকাশ ঘিরিয়া হেন
তোরিত কাহিনী কয়।
সুমধুর গীত মাখা
ললিত লাবণ্যে লেখা
অরুণ মেঘের পাখা
তোরি কি স্বপ্ন-কানন ?
নীল শূন্য সীমা হ'তে
রঙিল কিরণ স্রোতে
সাঁঝের স্বপন সাথে
আসে তোর সমীরণ ?
বসন্ত কুসুমগুলি
স্বর্গ পানে আঁখি তুলি
হৃদয়ের কোলাকুলি
করিছে কি তোরি সাথে ?
তোরি তরে হুহু করে
তাদের হৃদয় পরে,
তাই কি আনন্দ ভরে
ডাকে দূর স্বর্গ হ'তে ?
শূন্য এ কালের কোলে
এত এত কোলাহলে,
সকল প্রলয় পরে
প্রেম দেছে আবরণ।
অনন্তপ্রেমের ঠাঁই
শোক নাই, মৃত্যু নাই,
মধুর সঙ্গীতময়,
মৃত্যু হ'য়েছে মরণ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

তৃষ্ণাযুক্ত ঠগ-সন্ন্যাসিদিগকে গৃহস্থ ব্যক্তিরা সঙ্গে করিয়া গ্রামের মধ্যে একটী মুদীর দোকানে বসাইয়া বলিল যে, আপনারা শয়ন করুন আমরা গ্রামের মধ্যে হইতে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনি। আর এদিকে আসিয়া পুলীষের ফাঁড়িতে খবর দিল। পুলীষ আসিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল এবং শাসন করিয়া বলিল, বল তোরা কে? উহারা স্বীকার করিল যে, আমরা বেদিয়া, আমরা এইরূপ করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকি। এই কথা শুনিয়া পুলীষ তাহাদিগকে হাতকড়া দিয়া চালান করিয়া দিল।

ইহার পর শিবনারায়ণ বোম্বাইসহরে সমুদ্রের ধারে বালকেশর নামক স্থানে আসিয়া চারি দিবস বিশ্রাম করিলেন এবং পুনরায় সেইখান হইতে দ্রাবীড় সেতুবন্ধ রামেশ্বর অভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন জহরমল, শিবনারায়ণ ও যমুনা দাস নামে তিন মহাজন তাঁহার পদব্রজে যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া দ্রাবীড় পর্য্যন্ত টিকিট করিয়া দিয়া বলিল, মহারাজ আপনি সাধুর মত কোন ভেক চিহ্ন রাখেন না এই জন্য আপনাকে কেহ চিনিতে পারে না। আপনি দ্রাবীড় দেশে যাইতেছেন উহারা আপনাকে চিনিতে পারিবে না, আপনার সেবাও করিবে না, থাকিবার কষ্ট হইবে। আমরা আপনার নিকট কিছু টাকা দিব।

শিবনারায়ণ দেবের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও জহরমল মহাজন নূতন একটী কোর্ত্তা প্রস্তুত করাইয়া কৌশলে তাহার এক পকেটে পাঁচ ও দশ টাকার কয়েক কেতা নোট (সর্ব্ব সমেত চল্লিশ টাকা) এবং অপর পকেটে কতকগুলি সিকি দুআনি আধুলী উত্তম রূপে সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ যখন রেল গাড়ীতে উঠিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে ঐ কোর্ত্তা এইরূপ ভাবে পরাইয়া দিলেন যে যেন তিনি টাকার বিষয় টের না পান। সেই সময় বোম্বাই হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রায় দশ বারো হাজার টাকার অলঙ্কার সমেত একটী মহাজনের কন্যাকে লইয়া পলাইয়াছিল। মহাজন দরখাস্ত দিয়া হুলিয়া করিয়া দেয়। এবং তার যোগে চারি দিকে খবর দেওয়া হয়। শিবনারায়ণ যে গাড়ীতে চড়িয়াছিলেন তাহা যখন বোম্বাই হইতে প্রায় ষাইট ক্রোশ দূরে এক ইষ্টেশনে আসিয়া থামিল তখন হুলিয়ার সরকারী সিপাহী সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে খুঁজিতে শিবনারায়ণের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে, গৃহস্থ না সাধু, তোমার নাম কি? শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নাম শিবনারায়ণ লোকেরা কল্পনা করিয়াছে। আমি মনুষ্য এবং গৃহস্থ কি সাধু তুমি চেন।

এখন, যে সন্ন্যাসী বোম্বাই হইতে মহাজনের কন্যাকে লইয়া পালাইয়াছিল তাহারও নাম শিবনারায়ণ। কাজেই সিপাহী শিবনারায়ণকে সন্দেহ করিয়া রেলগাড়ী হইতে নীচে নামিতে বলিল, ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, চল নীচে নামিয়া যাই—এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, আমাকে যে স্থানে লইয়া যাও না কেন তাহাতে আমার কি? এই স্থানে বসিয়াছিলাম না হয় ঐস্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিব। উহারাও নিজ নিজ সব ভ্রম মিটাইয়া লউক।

যখন শিবনারায়ণ গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন তখন বিস্তর লোক চারি দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং ইনেস্পেক্টার সাহেব প্রভৃতি সকলে বলিল যে এই লইয়া পালাইয়াছে। কিন্তু রেলের গার্ড সাহেব আসিয়া বলিল যে এই ব্যক্তিকে বোম্বাই ইষ্টেশনে বড় বড় বাবুরা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ কথা শুনিয়াও উহারা বিশ্বাস করিল না। এবং যে ব্যক্তি বোম্বাই হইতে পালাইয়াছিল, তাহার চেহারার (ফটোগ্রাফের) সহিত শিবনারায়ণের চেহারা মিলাইতে লাগিল। শিবনারায়ণের চেহারা বেঁটে এবং যাহার নামে নালিশ হইয়াছিল তাহার চেহারা লম্বা হওয়াতে মিল খাইল না। যখন রেলগাড়ী চলিয়া যায় তখন গার্ড শিবনারায়ণকে বলিল, সত্বর গাড়ীতে উঠ। পুলিষের লোকেও শিবনারায়ণকে ছাড়িয়া দিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

কতক দূর যাইয়া শিবনারায়ণ এক ইষ্টেশনে নামিলেন। ঐ ইষ্টেশন হইতে প্রায় চার ক্রোশ দূরে নদীর ধারে একটী তীর্থ আছে সেই তীর্থে মন্দিরের মধ্যে যে পাথরের ঠাকুর আছেন তাহার নাম বিঠ্ঠল ভগবান। বিঠ্ঠল ভগবান মানে কুকুর ভগবান। সেই বিঠ্ঠল ভগবানের মাখন মিছরির ভোগ হয়। শিবনারায়ণ দেখিলেন যে ঐ মন্দিরে ঢুকিবার চারিটা ফটক। প্রত্যেক ফটকে পাণ্ডারা দাঁড়াইয়া থাকে। দুই চারি আনা দিলে তাহারা যাত্রিদিগকে ছাড়িয়া দেয়। যাত্রিরা প্রথম ফটক পার হইয়া দেখে যে ভিতরে আবার চারি ফটক। সেই খানেও দুই চারি আনা দিতে হয়, ইহার পর ঠাকুর দর্শন হইয়া থাকে। এখানে পাণ্ডাদের মধ্যেও এমন ঠগ আছে যে তাহারা যদ্যপি বুঝিতে পারে যে কোন যাত্রির কোমরে টাকা আছে তাহা হইলে ঐ যাত্রিকে ছোট ঘরে ঠাকুর দর্শন করাইবার সময় এমন কৌশলে কাঁচি দিয়া গাঁট কাটিয়া টাকা পয়সা বাহির করিয়া লয় যে যাত্রিরা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে না। যখন যাত্রিরা ঠাকুর দর্শন করিয়া বাজারে আসে তখন কোমরে টাকা দেখিতে না পাইয়া হায় হায় করিয়া মরে। তখন যাত্রিরা পাণ্ডাদিগকে বলে, মহাশয় একি হইল? পাণ্ডারা বলেন যে তোমাদের পাপ ছিল তাই টাকা হারাইয়া গিয়াছে। পুনরায় তোমরা দশ বিশ টাকা খরচ কর, তাহা হইলে তোমাদের পাপ মোচন হইবে। এক একজন যাত্রি ইহার উত্তর করে হে মহারাজ, এই তীর্থ এবং বিঠ্ঠল ভগবান দর্শন করিয়া যখন পাপ মোচন হইল না—তখন টাকা দিলে কি পাপ

মোচন হইবে? দর্শনের কি ফল হইল? পাণ্ডা আর কি বলিবেন! এদিকে যাত্রিকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে খাইতে দেশে ফিরিতে হয়।

এই সব চরিত্র দেখিয়া শিবনারায়ণ সেখান হইতে দক্ষিণে নবাবের হায়দ্রাবাদ সহরে গেলেন। দেখিলেন যে কোন রাজার রাজ্যে প্রজা সুখী নয়। কষ্ট নিবারণ করিয়া প্রজাকে সর্ব্বদা সুখে রাখিবার পূর্ণ ইচ্ছা কোন রাজা বা নবাবের মনে দেখিলেন না। বরঞ্চ এইরূপ মনের ভাবই দেখা গেল যে, প্রজারা মরুক বা বাঁচুক আমাদের কর পাইয়া হাতী ঘোড়া হইলেই হইল। কিম্বা আমাকে হজুর ধর্ম্মাবতার বলিলেই হইল। শিবনারায়ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা প্রজা উভয়ে কি উপায়ে কি যুক্তিতে সুখে থাকিবে—ইহাই সর্ব্বদা বিচার করা রাজাদিগের ধর্ম্ম।

হায়দ্রাবাদে নবাবের একজন সুপারিটেন্‌ডেন্ট শিবনারায়ণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন আপনি হিন্দু ফকির না মুসলমান ফকির। শিবনারায়ণ বলিলেন "হিন্দু ফকির ও মুসলমান ফকির কাহাকে বলে? ফকিরী কি হিন্দু মুসলমানের খরিদ করা থাকে?

সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বলিলেন, খরিদ করা ত থাকে না কিন্তু হিন্দু বংশে জন্মিয়া যে ফকির হয় তাহাকে হিন্দু ফকির বলে; আর মুসলমান ঘরে জন্মিয়া যে ফকির হয় তাহাকে মুসলমান ফকির বলে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে, কিন্তু যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া পরে মুসলমান হয় তাহাকে হিন্দুর মুসলমান কেন না বলে? যাহার নাম ফকির তাহার কোন বিষয়ে ফিকির নাই—কেবল থাকিবার পরব্রহ্ম আছে। যদ্যপি এইরূপ ভাব ফকিরের হয় যে আমি মুসলমানের ফকির কিম্বা হিন্দুর ফকির তাহা হইলে সে ফকিরও নয় মহাত্মাও নয়।

এই কথা শুনিয়া সুপারিনটেনডেণ্ট বলিলেন, যখন আপনি এই কথা বলিতেছেন তখন বিচার করুন। আমি তো মুসলমান আমরা গোমাংস আহার করি। কিন্তু আপনি কি ঐ গো মাংস আহার করিতে পারিবেন? ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, গো মাংস আহার করিলে পর উহাতে কি বাহাদুরি আছে আর আহার না করিলেই বা উহাতে বাহাদুরি কি? যদ্যপি আহার করিলে কোন বাহাদুরি থাকে তাহা হইলে মৃত গোমাংস শৃগাল কুক্কুর ত আহার করিতেছে উহাদের বাহাদুরির সীমা নাই। যাহার যে আহার সে তাহাই ভক্ষণ করিতেছে।

সুপারিনটেনডেণ্ট উত্তর করিলেন, উহাতে কোন বাহাদুরি নাই। কিন্তু তোমাদের হিন্দুর মধ্যে কেহই খায়না সকলেই ঘৃণা করে। শিবনারায়ণই বলিলেন, তোমরা মুসলমান লোক তো শূকর খাওনা, বরং ঘৃণা কর—উহাতে কি লাভ হয়? সকল পশুকেই খোদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম একই বস্তুতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন শূকরের হাড়মাংস রক্ত, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে গাভীদিগেরও সেইরূপ হাড়মাংস রক্ত, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে—দুইটাই তো খোদার সমান জীব! তবে একটীকে খাইতে হইবে, আর একটীকে খাইলে দোষ দিতে হইবে—ইহার মানে কি? সুপারিনটেনডেণ্ট বলিলেন, আমাদের সামাজিক নিয়মে শূকরকে খাইতে কশম আছে, উহার নাম হইলেই সকলে—তোবা, তোবা—বলে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, ঐরূপ সকল সমাজেই এক এক বস্তুকে এক এক দোষ দিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। এবং এক সমাজে যে বস্তুকে দোষ দিয়া পরিত্যাগ করিতেছে তাহাকেই আবার অপর সমাজে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। আপন আপন সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই এই সব।

ইহাতে মুসলমান সুপারিনটেনডেণ্ট বলিলেন, মহারাজ, ইহা ঠিক, সকল জীবের জীবনই সমান—সকল হাড়মাংস শরীর সমান। তবে কি কারণে আমাদের সামাজিক নিয়মে শূকর খাইতে নিষেধ আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দোষ কাহাতেও নাই এবং দোষ যদি ধরা যায় তাহা হইলে সকলেতেই দোষ হয়। কেন না জীব সকলই সমান। গলা কাটিতে গেলে সকলেরই সমান কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু কি করি, মহারাজ, আমাদের এইরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

পরে সুপারিনটেনডেণ্ট শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ আপনি কোথায় যাইবেন? শিবনারায়ণ সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে সেই সুদূর পথ পদব্রজে যাইতে নিষেধ করিয়া রেল ভাড়া লইতে এবং ফিরিবার সময় পুনর্দর্শন দিতে অনুনয় করিলেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার নিকট রেলের ভাড়া আছে, তোমায় টাকা দিতে হইবে না। তখন সুপারিনটেনডেণ্ট [illegible] ওয়ালার দোকানে লইয়া গিয়া উত্তমরূপ আহার করাইলেন এবং সিপাহী সঙ্গে দিয়া ইষ্টেসনে রেলে উঠাইয়া দিলেন। সুপারিনটেনডেণ্টের বাটী দিল্লীতে।

শিবনারায়ণ বালাজীতে গেলেন। বালাজী পাহাড়ের উপরে অতি বৃহৎ এক মন্দির আছে। মন্দিরে পাথরের বালাজী ঠাকুর স্থাপিত। সেইখানে অনেক শ্রীবিষ্ণু বৈরাগী সাধু আছেন। বালাজীতীর্থের সমস্ত লীলা দেখিয়া শিবনারায়ণ রংজীতে গেলেন। রংজী ঠাকুরের মন্দির অতি বৃহৎ এবং সেই মন্দিরে পাথরের রংজী ঠাকুর ও অন্যান্য ধাতু-নির্ম্মিত ঠাকুর আছে। রংজী ঠাকুরের মাথায় রূপার মুকুট। যখন যাত্রিরা দর্শন করিতে যায় সেই সময় পাণ্ডারা ঠাকুরের মাথার মুকুট খুলিয়া যাত্রিদিগের মাথায় দেয় এবং বলে, তোমাদের কপাল ভাল রংজী ঠাকুরের মুকুট পরিয়াছ; এখন তোমরা টাকা পয়সা শীঘ্র কিছু দান কর। এই কথা শুনিয়া যাত্রিরাও দান করে। শিবনারায়ণ পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়সা না দেওয়াতে উহাঁর মাথাতে রংজী ঠাকুরের মুকুট দিল না। ক্রমশঃ।

পত্র।

লক্ষ্ণৌ।

এ সুখের অলসতা, গাত্রে চাপা লেপ কাঁথা,
ভাবিতেছি কত কথা, পড়ে গৃহ-কোণে ;
তোমাদের চিঠি পাই, বড় সুখে পড়ি ভাই,
লিখিব ভাবিলে হাই ;—গড়াই শয়নে।
মনে হয় থাক আজ, কালে কত কাল ব্যাজ?
পত্র লেখা শক্ত কাজ কেন মানুষের ?
চিঠি আসে ভাল সেটী, লেখা শক্ত এটীসেটী,
যথা 'ইউনিভার্সিটী' যম ছেলেদের !
এইরূপ হেলা ফেলা, সাঙ্গ হয় ভব লীলা ;
তোমাদের রুচি ভ্যালা মনে ভাবি তাই।

এমন গেঁতোর প্রেমে মজিয়াছ কোন ভ্রমে,
আমি হলে ক্রমে ক্রমে ছাড়াছাড়ি চাই !
ভালবাসা ঘোর চাষা, চেনে না কাঞ্চন কাঁশা
কি দেখেই নেছে বাসা ! ভেবে হাসি পায়!
চোখেতে আঙ্গুল দিয়ে কত দেব দেখাইয়ে
জ্ঞানের সঞ্চার হলে, ঘোচে যত দায় !
যেথা সেথা একি জ্বালা ! প্রাণ নিয়ে ঝালা পালা !
রশা রশী কষা পালা বাঁধে হাড়ে হাড়ে !
দেখে শুনে শুষ্ক মুখ কে চায় বন্দীর সুখ ?
যে চায় মিলুক তায়, আমি আড়ে আড়ে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

একখানি ছবির প্রতি।

দেখা শোনা হয় নাই—দূর হতে কাছে ;
আমার আকুল হিয়া—তুমি হে কোথায় ?
কার স্নেহ নির্ঝরিণী কোন দূরে আছে ?
বাসনা হারায়ে দিশা তারি পানে ধায় !
আমি যে পথিক শ্রান্ত তৃষিত কাতর,
নিদাঘ মধ্যাহ্নে কোথা বরষার বারি ?
বালুকা সৈকত এযে বিশাল প্রান্তর
বিন্দু জল কণা নেই মাঝ খানে তারি !
অলক্ষ্যে রহিয়া এই কার ছবি খানি,
দেখায় আপন হিয়া স্নেহের নির্ঝর,
দূর হতে কাছে কেন আনিতেছে টানি,
একি আলেয়ার ছায়া শ্মশানের পর ?
না না, এযে মূর্ত্তিমতী করুণার রাণী,
আঁধার হৃদয়ে মোহ-মাখা রবি-কর !

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কি বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা, আমাদের আহ্লাদ প্রকাশ করিব ! সম্প্রতি ন্যাশন্যাল-ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদিকা শ্রীমতী মিশ ম্যানিং সখিসমিতির সাহায্যার্থে ৩০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, মাঝে মাঝে এইরূপ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। দরিদ্র বঙ্গ রমণীর জন্য সেই দূর দেশ ইংলণ্ডের নিকট হইতে এই নিঃস্বার্থ করুণার নিদর্শন পাইয়া আমাদের হৃদয় সবল, আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা দুর্ব্বল জাতি, বাধা বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোন সৎকর্ম্মে অগ্রসর হইতেও আমাদের ক্ষমতা নাই, এ অবস্থায় সহৃদয় দয়ার্দ্রগণের সাহায্য, সহানুভূতিই আমাদের একমাত্র বল, উৎসাহ, আশাভরষা। মিশ ম্যানিংয়ের এই সহায়তার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমরা এই সঙ্গে নিম্নে সমিতির আয় ব্যয়ের একটি মোটামুটি নিয়মিত মাসিক হিসাব প্রদান করিলাম।

সখি সমিতির মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

আয়।

চাঁদা খাতে

মাসিক	...	৩০৲
মূলধন ৫০০০৲		

তাহার মধ্যে ২০০০ হাজারের শতকরা বাৎসরিক ১২ টাকা হিসাবে, এবং ৩০০০ হাজারের শতকরা বাৎসরিক ৯ টাকা হিসাবে

মাসিক সুধ	...	৪২৷৷০
মোট		৭২৷৷০

ব্যয়।

চাঁদা আদায়ের দরোয়ানের মাহিয়ানা ...	৭৲
কাগজ, কলম, খাতা ও ডাকমাশুল ইত্যাদি ...	২৲
খাতা লেখার জন্য ...	৫৲
খুজরা দান	৪৲
শশিপদ বাবুর স্কুলে দেওয়া দুইটি বালিকার মধ্যে একটির জন্য মাসিক ব্যয় ১০৷৷০ ও অপরটির ১০৲ মোট ...	২০৷৷০
ঐ বালিকাদিগের ঔষধ খরচ গড়ে ...	১৲
বেথুন স্কুলে দেওয়া দুইটি বালিকার ১টীর বোর্ডিং ফি, মাহিয়ানা, কাপড়, পুস্তকাদি মোট ...	১৮৲
অপরটির (Day Scholar) স্কুলের মাহিয়ানা, কাপড়, পুস্তকাদি মোট	৬৲
অনিয়মিত ব্যয়, অর্থাৎ Pamphlet ইত্যাদি ছাপান, বরাহনগর স্কুলের বালিকাদের আসা যাওয়া গাড়ীভাড়া ইত্যাদি ...	২৲
মোট	৬৪৷৷০
মোট আয়	৭২৷৷০
ব্যয়	৬৫৷৷০
বাকী	৭

আর দুইটি বালিকা আছেন, সমিতির অর্থাভাব বশতঃ একটিকে একজন মহিলা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে স্থান দান করিয়াছেন, অপরটি সমিতির আয় অল্প বৃদ্ধি হইলেই গৃহীত হইবে।

ইহা দেখিয়া আশা করি করুণ-হৃদয় ব্যক্তিগণ সমিতির আনুকূল্যে যৎকিঞ্চিৎ করিয়া দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

কাশিয়াবাগান বাগান বাটী, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা।

দর্শন ও সুখ।

সুখই মনুষ্য জীবনের সর্ব্বে সর্ব্বা। ধন রত্ন, জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্ম কর্ম্ম, প্রীতি ভক্তি, জপ জপ, সকলেরি উদ্দেশ্য সুখলাভ। কেবল মনের প্রবণতা, রুচি ও শিক্ষাভেদে ভিন্ন লোকে ভিন্ন উপায়ে ইহা লাভ করিতে সচেষ্ট, তাই কেহবা পরের জন্য আত্মত্যাগ দ্বারা কেহ বা পরপীড়ন করিয়া সুখ সাধনায় রত।

সুখের জন্য সর্ব্ব জনের এই যে মর্ম্মান্তিক তৃষ্ণা, প্রাণপণ অনুধাবনা, ইহার ফলে সংসারে অথচ সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরি প্রাধান্য দেখা যায়,—ইহার কারণ কি? সুখান্বেষীগণ বিপথে ছুটিয়াছেন; প্রকৃত পথ তাঁহাদের নজরে নাই। প্রকৃত পথ নির্ণয়ের উপায় কি? বিশ্বসংসার যে ধারা অনুসারে চলিতেছে, তাহা আয়ত্ত করিয়া তাহার সহিত জীবন গতির সমন্বয় পূর্ব্বক আমাদের শারীরিক অভাব ও ইন্দ্রিয়গত আকাঙ্ক্ষাকে তদনুযায়ী রূপে সংযত করিয়া চলা। যে শাস্ত্র উক্ত সম্বন্ধ সমন্বয়ে সচেষ্ট হইয়া মানুষকে তাহার জীবন গতির তত্ত্বজ্ঞান দান করিতে চাহে—তাহাই দর্শন শাস্ত্র। কিন্তু দর্শন-কার ব্যতীত আর কেহ যে দার্শনিক নহেন এমনো নহে, বস্তুতঃ ব্যবহার ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ-দার্শনিক এ সংসারের সকলেই। তবে কেহ বা ব্যক্তভাবে কেহ বা অব্যক্ত ভাবে, কেহ বা জ্ঞাতসারে, কেহ বা অজ্ঞাতসারে; কেহ বা কুদার্শনিক, কেহ বা সুদার্শনিক। সকলেই আমরা সুখের প্রয়াসী হইয়া সাধ্যমত প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ করিয়া সেই উদ্ভেদ্য রহস্য অবলম্বনে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া তদ্দর্শিত পথে ধাবিত হই। কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইতে হইতে কণ্টকাকীর্ণ পথে ক্ষত বিক্ষত, শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া নূতন অভিজ্ঞতা-দীক্ষিত পথে ফিরি। এইরূপে নিত্য নিয়ত আমাদের পুরাতন মত বিশ্বাসের মৃত্যু এবং নূতন অভিজ্ঞতার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাঙ্কিত মানচিত্রের ক্রমান্বয় সংশোধন ও পরিবর্ত্তন চলিয়া থাকে। সৃষ্টিতে পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ সুখ অসম্ভব; সুতরাং পরিবর্ত্তন-সম্ভাবনারহিত অমর চিত্র অঙ্কিত করিয়া অমর হইবার আশা মনুষ্যের ভাগ্যে নাই; এই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াই মানব জাতির জীবন ক্ষয় হইবে, তবে উহারি মধ্যে কাল সহকারে যে মানচিত্রের যত কম পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহারি তত গৌরব, তাহাই সাধারণের পথ-প্রদর্শক-শ্রেষ্ঠ দর্শন।

বস্তুতঃ সুখকে দর্শনের কষ্টিপাথর স্বরূপ বলা যাইতে পারে। সংসারে সকল সিদ্ধান্তই প্রমাণ সাপেক্ষ, ফলের দ্বারাই তাহাদের সত্যাসত্য নির্ণীত হয়। মাধ্যাকর্ষণ সত্য কেন না এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে যেরূপ ফল হইবার কথা তাহা হইতেছে। সেইরূপ, সুখ দর্শনের কষ্টিপাথর, কেন না সত্যজ্ঞানই প্রকৃত সুখের উপায়, সুতরাং যে

দর্শন যত সুখী করিতে পারে তাহা তত সত্য তত খাঁটি; বিশ্ব সংসারের নিয়ম, জীবনের তত্ত্ব তত সে অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছে।

স্থূলতঃ দেখিতে গেলে দর্শন দুই ভাগে বিভক্ত, সুখবাদ ও দুঃখবাদ। যেমন বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যেও মূলগত একটি সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি সর্ব্ব দেশের ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের মধ্যে মূলগত বিভাগ এই দুইটি। তবে পাশ্চাত্য দর্শন বিশেষ রূপে উক্ত দুইটি ভিন্ন পক্ষ অবলম্বনে মনুষ্য জীবনের স্বতন্ত্র দুইটি দিক দেখাইয়া একেবারে সম্পূর্ণ দুইটি তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। সেই দুই তত্ত্বের মধ্যে কোনটিতে সমধিক সত্য বিদ্যমান কোন তত্ত্বটির অনুসরণ করিয়া আমরা অধিক সুখলাভ করিতে পারি তাহা এইবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

দর্শনের ইতিহাস খুঁজিলে ভারতবর্ষীয় এবং গ্রীকদিগকে আধুনিক পাশ্চাত্য সুখবাদ ও দুঃখবাদ উভয় বাদেরই আদি পুরুষ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ষপেনহর যিনি আধুনিক দুঃখবাদের প্রধান প্রবর্ত্তক তিনি বলিতেছেন উপনিষদ হইতে তিনি ইহার সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আমাদের বিশ্বাস তিনি উপনিষদকে ভুল বুঝিয়াছেন। ষপেনহরের পরবর্ত্তী শিষ্যগণের মধ্যে এডওয়ার্ড ভন হার্টমান গুরুরোপিত চারাবৃক্ষে বৌদ্ধ দর্শনের জলসেক করিয়া ইহা পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সুখবাদ ও দুঃখবাদের মর্ম্মগত প্রভেদ,—একটি প্রধানতঃ বিশ্বাস মূলক, অন্যটি বাহ্য অভিজ্ঞতা-উদ্ভূত যুক্তি মূলক।

সুখবাদ বলে, ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলেই সুখ: জ্ঞান চক্ষু দিয়া দেখিলে প্রতি দুঃখই মঙ্গলের নিদান স্বরূপ। যিশু, মহম্মদ, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংসারে তাঁহার এই মঙ্গল উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মানস দৃষ্টির অসম্পূর্ণতাবশতই তাঁহার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি না। দুঃখ কষ্টই আমাদিগের ঈশ্বরে নির্ভর আনয়ন করে, নহিলে সংসার সুখে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া উচ্চ চরম সুখের আস্বাদে বঞ্চিত হইতাম, আমাদের আত্মার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না।

দুঃখবাদ বলে,—ঈশ্বর আছেন এবং তিনি মঙ্গলময় এ সিদ্ধান্ত ধরিয়া লইব কেন? সংসারের চারিদিক দেখিলে আমরা তাহার বিপরীতই দেখিতে পাই। জীবন সুখময় কি দুঃখময়? সংসারে দুঃখের ভাগই অধিক, সুখের ভাগ, অতি অল্প। আমরা দুঃখময় জীবন পথ দিয়া মৃত্যুর মুখে ধাবিত হইতেছি মাঝে মাঝে সুখের আলেয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে মাত্র। সংসারের দুঃখ যেমন আমাদের সহিয়া আসিতেছে যন্ত্রণা-অসাড় হইয়া তীব্র পিপাসার কষ্ট অনুভবের শক্তি যখন আমাদের শমিত হইয়া আসিতেছে, তখন সহসা সুখের বারি কণিকা আমাদের মুখে পতিত হইয়া আবার পূর্ণমাত্রায় ভবিষ্যতের যন্ত্রণা ফিরাইয়া আনিতেছে। ইহাতে সংসারের মঙ্গল

উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না করাইয়া দুঃখময় উদ্দেশ্যই সমর্থন করে কি না? সংসারে দুই চারি জন ব্যক্তি যদি সাধারণ হইতে অধিক পরিমাণে সুখভোগ করেন তাহাতে কি আসে যায়? দুই চারি জনের সুখে কিছু আর সমগ্র মানবজাতির সুখ হয় না। তবে সাধারণে কি উপায়ে এই দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে? জীবনের মমতা ত্যাগ করা ব্যতীত ইহার আর অন্য উপায় নাই। জীবনের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে হইলে দুইটি শিক্ষার প্রয়োজন। প্রথম পরোপকারের জন্য কার্য্য করা, কেন না তাহাতে নিজের সুখ দুঃখ ভাবিতে অবকাশ থাকে না; এবং শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে চেষ্টা করিলে জীবনের প্রতি মমতা আপনা হইতে হ্রাস হইয়া আসে।

দ্বিতীয়ত, জীবনের মমতা ত্যাগ করিতে হইলে মৃত্যুর চিন্তা করা আবশ্যক। মৃত্যুর চিন্তা হইতেই আমরা মৃত্যুকে জয় করিতে শিখি। মৃত্যুই জীবনের প্রতি অযথা অনুরাগ হ্রাস করিয়া, জীবনের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করে। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত জীবগণের মধ্যে কেবল মনুষ্যেই মৃত্যুজ্ঞান বিশিষ্ট, এই জ্ঞান বশতঃই আমরা পশুবৎ ভাব সকলের এবং আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি নীচ ভাব সমূহের হাত হইতে অব্যাহতি পাই। সুতরাং মৃত্যুকেই জীবনের শাসনকর্ত্তা রূপে দেখা কর্ত্তব্য।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, দুঃখবাদ ও সুখবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন মত হইলেও এই উপদেশ সম্বন্ধে উভয়েই এক মত। এ পর্য্যন্ত জগতে যত ধর্ম্মমত অভ্যুত্থিত হইয়াছে সকলেই এই উপদেশ প্রচার করে। যোগী ঋষি, পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মাত্মা সকলেই পরোপকার ব্রত করেন, শারীরিক কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করেন না, এবং মৃত্যুর চিন্তা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিতে চেষ্টা করেন—সকল ধর্ম্মের মূলেই এই ভাব। সুতরাং ইহাই দুঃখ জয় ও সুখ লাভের প্রকৃত উপায় তাহার সংশয় নাই, তবে ধর্ম্মবাদীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস হইতে এই সত্যে উপনীত হন, আর দুঃখবাদী কেবল মাত্র বাহ্যিক অভিজ্ঞতার জ্ঞান হইতে এই শিক্ষা প্রদান করেন, সুখবাদী বা ধর্ম্মবাদীরা বলেন, এই জীবনেই আমাদের শেষ জীবন নহে, এখানকার দুঃখ সুখই আমাদের চরম দুঃখ সুখ নহে, এ জীবন আমাদের পরীক্ষা স্থল, কর্ম্মের ফল অনন্তগামী, ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম অনন্ত কালব্যাপী, সুতরাং এ জগতের ক্ষণিক দুঃখ তাচ্ছিল্য করিয়া—পুন্য জীবন বহন করিয়া চির জীবনের সুখলাভে অগ্রসর হও।

দুঃখবাদ বলে, মৃত্যুর পর আমরা ধ্বংশগ্রস্ত হইব, কিম্বা অধিকতর দুঃখময় জীবনলাভ করিব—তাহা কে বলিতে পারে? যে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই তাহার ভাবনা না ভাবিয়া এ জীবনের দুঃখ প্রতিকার অভিপ্রায়েই কেন সেই সকল উপদেশ পালন করা হউক না; মৃত্যুর পর জীবন লাভের আশায় মৃত্যু চিন্তা না করিয়া মৃত্যুর জন্যই কেন মৃত্যু চিন্তা করা হউক না, কেননা মৃত্যুই এ সংসারে

দুঃখ কষ্টের এক মাত্র মহৌষধ। এমন কি হার্টমান এই মতের চূড়ান্ত সীমায় আসিয়া এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—যে, আত্মহত্যাই মানুষের দুঃখ এড়াইবার প্রকৃষ্ট উপায়, কেবল আত্মহত্যা কেন কোনরূপ হত্যাই পাপ নহে, ইহা দ্বারা মনুষ্যের উপকার করা হয়, তাহাকে কষ্ট হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়, সুতরাং পৃথিবী শুদ্ধ মনুষ্যকে একদিনে যদি হত্যা করিতে পারা যায় ত তাহা মহামঙ্গল।

এইত আমরা সংক্ষেপে পাশ্চাত্য সুখবাদ ও দুঃখবাদের মর্ম্মগত প্রভেদ দেখিলাম, দুঃখবাদ অভিজ্ঞতা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুখবাদ ধর্ম্ম বিশ্বাস মূলক। কেহ কেহ বলিবেন, অন্ধ বিশ্বাস মূলক; আমাদের অভিজ্ঞতা জ্ঞানের কোন ধারই ইহা ধারে না। অবশ্য আমরা একথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। সুখবাদ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন আমরা স্বীকার করি কেন না পৃথিবীতে আমরা পূর্ণ মঙ্গল দেখিতে পাই না। সুখবাদী বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণ মঙ্গলময় এবং তাঁহার অনুকরণে এই বিশ্ব পূর্ণমঙ্গলময়-রূপে সৃষ্ট। যে সকল অমঙ্গল আমরা দেখিতে পাই তাহা আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অভাবেই হউক আর যে কারণেই হউক যতক্ষণ আমরা এই অমঙ্গল দুঃখতাপ অনুভব করিতেছি—ততক্ষণ বিশ্বকে পূর্ণ মঙ্গলময় বলি কিরূপে? তবে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানত্বের খর্ব্বতা সপ্রমাণ হয় না। সেই শক্তি যখন নিজেতেই ওতপ্রোত তাঁহার অস্তিত্বের জন্য যখন অন্য কিছু আবশ্যক নাই, তখন তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান ইহা নিশ্চয়। তবে যে কেন সৃষ্টি এইরূপ সুখ দুঃখময় তাহা আমরা জানি না, আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে তাহা আয়ত্তাসাধ্য। তবুও আমরা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না গিয়া থাকিতে পারি না, আমাদের বুদ্ধির সহিত জ্ঞানের সহিত ধারণার সহিত সেই বুদ্ধির অগম্যকে ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া আমরা তাঁহার স্থলে যে বিশ্বাসকে স্বপ্রকাশিত দেখি, তাহাই সত্য বলিয়া প্রচার করি, বস্তুতঃ আমাদের মত অপূর্ণ জীবের সত্য লাভের উপায় ইহা ছাড়া কোথায়? ইহাই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি। বাহ্য অভিজ্ঞতা যেমন বাহ্যদৃষ্টি বাহ্যজ্ঞান হইতে প্রসূত, তেমনি আমাদের ভক্তি বিশ্বাস অন্তর্জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টিমূলক, সুতরাং বাহ্য জ্ঞানের সহায়তা ছাড়া অন্য উপায়ে সত্য লাভ করিলেই যে আমরা তাহা অভিজ্ঞতা বিরুদ্ধ বলি, ইহা নিতান্তই যুক্তি সঙ্গত নহে। বাহ্য অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্তরাভিজ্ঞতাও যে আছে যত মহাত্মা পুণ্যাত্মা সাধু জীবন ত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে! এবং আমরাও যে জীবনে একেবারেই তাহার প্রমাণ পাই না এমনো নহে।

তবে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গত প্রমাণ না পাইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে না চান, তাঁহাদের নিকট সুখবাদের মূল্য অতি অল্প ইহা নিঃসন্দেহ। তাহা হইলেও দুঃখবাদী ইহাকে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ মসী দিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাও অভি-

ক্তা বিরোধী। বাস্তবিক সংসার নিতান্তই দুঃখ বা সুখময় নহে—জগৎ সুখ দুঃখের সংমিশ্রণ। মানুষ এতদুঃখ পাইয়াও যে বাঁচিতে চাহে ইহাই তাহার প্রমাণ; নহিলে হার্টমানের উপদেশের অপেক্ষা না করিয়াই সকলে আত্মহত্যা করিত।

প্রকৃত পক্ষে পাশ্চাত্য দুঃখবাদ সুখকে বহির্বস্তুরূপে ধরিয়াই এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বাহ্যসুখমূলক বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। তাই পাশ্চাত্য দেশে বাহ্যসুখ-বিরহিত অবস্থাই অসুখের অবস্থা বলিয়া মনে হয়। তাই সে দেশে দুঃখবাদের এত আদর। কিন্তু বাস্তবিক সুখ কি? দুঃখবিহীনতা ও আনন্দ ভাব, অন্য কথায় মনের একরূপ অবস্থা মাত্র। সুতরাং ইহা এমন বস্তু নহে যাহা জোর করিয়া গলাধঃকরণ করিলেই সকল ল্যাটা মিটিয়া যায়। তবে বহির্বিষয় অনেক সময় সুখদুঃখের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে তাহা অমান্য করিলে চলে না।

দুঃখের মূল কারণ প্রধানত তিন--

১। নিষ্ফল বাসনা।

২। স্বকর্ম্মের নৈতিক দায়ীত্ব।

৩। মৃত্যুভয়, এবং মৃত্যুর পরে কি আছে এই অন্ধকার সংশয়।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরে নির্ভর-পরায়ণতা সর্ব্বপ্রকার দুঃখেরই মহৌষধ।

প্রথমত, সুখ যখন আমাদের মনের অবস্থা মাত্র, এবং বাসনা পরিতৃপ্তি আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তখন "তোমার ইচ্ছা হউকপূর্ণ" এই ভাবিয়া ফল কামনা বিহীন চিত্তে আমরা যদি কার্য্য করিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে আমাদের অনেক দুঃখের লাঘব হয়।

দ্বিতীয়ত, কর্ম্মের দায়িত্ব ভারে আমরা জর্জ্জরিত, প্রতি কর্ম্মের পাপ পুণ্য শাস্তি পুরস্কার আমাদের জীবন সূত্রকে বজ্রগন্থিময় করিয়া নিয়ত আমাদিগকে মোহ পরায়ণ করিতেছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির বিকাশে আমার যদি বিশ্বাস জন্মে——

জানামিধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তি—

তয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি—

তাহা হইলে কর্ম্মের অযথা দায়ীত্ব ভার হ্রাস হইয়া আসে, এবং তখনই নিষ্কাম হইবার প্রকৃত পথ উন্মুক্ত হয়।

তৃতীয়, মৃত্যু এবং পরলোক ভয়। ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে বিশ্বাস জন্মিলে এ সকল ভয় যে আর থাকে না তাহা বলা বাহুল্য। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরে বিশ্বাসই আমাদের প্রকৃত সুখ। দুঃখবাদের উপদেশ পালন করিয়া আমাদের দুঃখ কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, কিন্তু তাহা বেলেস্তারা দিয়া যন্ত্রণা ভুলাইবার মত কিছুক্ষণের বিস্মৃতি মাত্র, তাহাতে রোগ আরোগ্য হইবার নহে।

তুমি শুধু করিবে মার্জ্জনা।

চলিতে তোমার পথে, কত প্রাণপণ করি,
নিমেষে সকল ভেসে যায়।
আশার আলোক আর, দেখিতে পাইনা চোখে,
হৃদি ভেঙ্গে গেছে নিরাশায়।
শত অপরাধ পিতা মার্জ্জনা করিয়া যদি,
একবার মুখ তুলে চাও।
মৃত অবসন্ন প্রাণে, দিতে গো জীবনদান
কাছে আসি বারেক দাঁড়াও।
কেমনে মলিন মুখে, উচ্চারিব তব নাম,
ভাবিতে যে ভয়ে সারা হই।
পূজার আসনে গিয়া, বসিব কেমনে হায়,
পূজিবার যোগ্য আমি নই।
গভীর কলঙ্কে দেব! হৃদয় ভরিয়া গেছে,
এ কালিমা মুছিবে না আর।
এইরূপে চিরদিন, কাঁদিয়া বেড়াতে হবে,
ঘুচিবে না প্রাণের আঁধার।
যাইতে তোমার কাছে, যারা পথ বলে দিলে,
আজ তারা গেল গো কোথায়।
বুঝি দুরবল বলে, পথে তারা ফেলে গেল,
সাথে করে নিলে না আমায়।
তাদের মুখের জ্যোতি, দেখিতে পাইনে আর,
চারিদিক ঘিরেছে আঁধারে।
এ ঘোর পরীক্ষা মাঝে, দিলে না আশ্বাস কেহ,
তুমিওকি ত্যজিবে আমারে।
দয়াময় কোথা তুমি, কোথা তুমি বল না হে,
কাছে ডেকে লও একবার।
উঠিতে শকতি নাই, কেমন করিয়া প্রভু,
যাব আমি কাছেতে তোমার।
তোমার মুখের পানে, চাহিতে পারিনে লাজে,
কি বলিয়ে করিব প্রার্থনা।
জানি কিন্তু তুমি ছাড়া, দাঁড়াবার স্থান নাই,
তুমি শুধু করিবে মার্জ্জনা।

শ্রীমতী উমাশশী দেবী।

বুদ্ধগয়া।

গয়াধাম যেমন হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান; সেইরূপ বুদ্ধগয়াও ব্রহ্ম, চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণের একটি প্রধান তীর্থ স্থান। কৌতূহল চরিতার্থ বাসনাতেই হউক বা দেশ ভ্রমণ মানসেই হউক এস্থানে সময়ে সময়ে অনেক লোকের সমাগম হইয়া হইয়া থাকে। গয়া হইতে বুদ্ধগয়া তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অশ্ব-শকটে গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় যাইবার বেশ সুবিধা আছে।

এক দিন প্রত্যূষে, চা পান করিয়া আমরা কয়েক জনে গয়া হইতে শকটারোহণে বুদ্ধগয়াভিমুখে যাত্রা করিলাম। দেখিতে দেখিতে শকটখানি আম্রকানন সমূহ অতিক্রম করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যদিয়া দক্ষিণাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। দক্ষিণপার্শ্বে শস্যক্ষেত্র সমূহ সুবৃহৎ শ্যামল চন্দ্রাতপের আকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোলা, গম, কলাই প্রভৃতির বৃক্ষগুলি মাটির সহিত মিশিয়া আছে। স্থানে স্থানে হরিণগণ কচি কচি ছোলার গাছ ভক্ষণ করিতেছে; কোনও স্থানে বা বসিয়া রোমন্থন করিতেছে। আমা-দিগের শকটের শব্দ শুনিয়া ত্রস্তভাবে গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিল।

আমরা কিছুক্ষণ পরেই খিরিয়াঁওয়ায় পঁহুছিলাম। এখানে প্রত্যহ একটি হাট বসিয়া থাকে। সকল প্রকার তরকারী দ্রব্য এইখানে বিক্রয় হয়, গয়া সহরের আহ্নিক ব্যয়ের ফল মূল শাক সবজি সমস্তই এই হাট হইতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই হাটটি বুদ্ধগয়ার মোহান্তের। এখান হইতে বুদ্ধগয়া ১॥ ক্রোশ অন্তরে। অর্দ্ধ ক্রোশ পথ দক্ষিণে সরস্বতী নামক স্থানে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক হইতে মোহানে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ্ হইতে লীলাজন নামক দুই নদী আসিয়া মিশ্রিত হইয়া ফল্গু নাম প্রাপ্ত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। লীলাজন নদীর দক্ষিণপার্শ্বেই বুদ্ধগয়া অবস্থিত। ললিত বিস্তরে বুদ্ধগয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প সময় পরেই, আম্রকানন ও মনোহর উদ্যান সকল অতিক্রম করিয়া আমরা বুদ্ধগয়ায় পঁহুছিলাম। মঠের দুই

একটি চেলা আমাদিগের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সহিত মন্দির ও তৎসংলগ্ন দর্শন-যোগ্য স্থান পরিদর্শন করাইতে প্রস্তুত হইল। আমরাও তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মন্দিরটি দর্শনযোগ্য বটে ও দৃশ্যটি বস্তুতই মনোমুগ্ধকর। মন্দিরটি এক সময় মাটির অভ্যন্তরে প্রোথিত ছিল। ১৮৮৩—১৭৮৫ সালের মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উহাকে মাটি হইতে উদ্ধার করাইয়া পুনঃ সংস্কার করাইয়াছেন। পুরাতন কার্য্য ইহাতে প্রায় কিছুই নাই কেবল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রাচীন শিল্পীগণের ২। ৪টি কারু কার্য্য শোভা পাইতেছে। দেবালয়ের অন্যান্য চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের মৃত্তিকা ফুল তদনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে।

মন্দিরটির সম্মুখেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মদেশবাসী ও চীন সম্রাট প্রদত্ত দুইটা বড় বড় ঘণ্টা (gong) আছে। উহাদিগের উপরে ব্রহ্ম ও চীন ভাষার অক্ষর খোদিত থাকায় আমরা উহাতে কি লেখা আছে তাহা অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হইলাম না। উহার পার্শ্বেই এক ছোট ব্রহ্মমন্দির (Burmese pagoda*) মন্দিরটির উপরের কার্নিশের চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ঝুলিতেছে। ঐ গুলি মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে দুলিয়া এক মনোহর শব্দ উৎপাদন করিতেছে। ইহার বামপার্শ্বেই একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি। প্রবাদ আছে ইঁহারা বনবাস কালীন এ স্থলে কিছুকাল কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তৎসমক্ষেই প্রসিদ্ধ বুদ্ধগয়ার মন্দির। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপমন্দির সমূহের ভগ্নাবশেষ এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন যোগের আসনোপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই লুন কর্ণ, ছিন্ন নাসা ও বাহু বা পদহীন। বহুকাল মাটীর অভ্যন্তরে প্রোথিত থাকা প্রযুক্ত উহাদিগের স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা ব্রাহ্মণগণ কোন সদুপায়ে আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিবার উপায় না দেখিয়া পরিশেষে অত্যাচার প্রভৃতি অযথা নীচ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বুদ্ধমূর্ত্তি সমূহের হস্ত পদাদি লুন করিয়া শ্রীহীন করিয়া দিয়াছে। মন্দির ও তৎসংলগ্ন সমতল ভূমিতে নামিতে হইলে প্রায় ৫০ ফিট নিম্নে অবতরণ করিতে হয়। সেই সমতল ভূমি হইতে মন্দিরটি ঊর্দ্ধে প্রায় ৩৫০ ফিট্ উচ্চ। বেহার অঞ্চলে এরূপ উচ্চ মন্দির আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরাভ্যন্তরের প্রবেশ দ্বার পূর্ব্ব মুখ। উপরে আরোহণ করিবার সোপানাবলি দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সোনালিপাতে মূর্ত্তিটী আপাদ্‌মস্তক মোড়া এবং বুদ্ধদেব পদ্মাসনে অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন। স্থানটী প্রকৃতই নিস্তব্ধ ও চিন্তাকরণোপযোগী। এস্থানে অল্পক্ষণ থাকিলে বস্তুতই মন নির্ম্মল ও স্থির হয়! এমন কি বৈরাগ্যও উপস্থিত হইতে পারে।

বুদ্ধদেব এই মন্দিরে বসিয়া স্তব ও ঈশ্বরার্চ্চনা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি বোধিদ্রুমের অধঃস্থলে বসিয়াও চিন্তা করিতেন ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই সকলেই তিনি মায়া কর্ত্তৃক অভিভূত হন এবং স্বীয় ঐশ্বরীক তেজে তাহাকে পরাভূত করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই জন্যই বোধিদ্রুম এত আদরের সামগ্রী, এত যত্নে রক্ষিত ও দেশ দেশান্তর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ ইহাকে দেখিতে আসিয়া থাকেন। পুরাতন বোধিদ্রুম ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যেটিকে লোকে বোধিদ্রুম বলিয়া উল্লেখ করে ও যাহার নিম্নে বসিয়া হিন্দুগণ পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এল্, এল্, ডি, ডাঃ ডব্লু ডব্লু, হণ্টার এল্, এল্, ডিঃ, প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এস্থানে আসিয়া খোদিত পালিভাষা ব্যাখ্যা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে উক্ত মন্দির মহারাজাধিরাজ অশোকের রাজত্ব কালীন নির্ম্মিত হইয়াছিল অর্থাৎ ২১৫২ বৎসর পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত হয়।

বৌদ্ধগণের প্রাদুর্ভাব কালীন এ সকল প্রদেশে পালিভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের পর, ঐ জীবন্ত রাজভাষাকে কেবল বেহার হইতে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপে নির্ব্বাসিত করেন। তথায়ও উহা এখন মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ভগ্নাবশেষ শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন কোনটিতে চরণ চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়। ঐগুলি বুদ্ধদেবের চরণানুরূপ খোদিত এইরূপ প্রবাদ আছে। গয়াধামের মন্দিরাভ্যন্তরে যে বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন খোদিত আছে তাহাও এইরূপ। ইহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অপমান ও আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করণাভিলাষে বুদ্ধগয়া হইতে বুদ্ধদেবের চরণাঙ্কিত শিলাখণ্ড এইস্থানে আনয়ন করেন এবং তাহা মন্দির মধ্যে রাখিয়া প্রচারিত করেন যে "ইহা বিষ্ণুর চরণচিহ্ন, গয়াসুরের বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।" এস্থলে বোধ হইতেছে যে গয়াসুর ব্রাহ্মণদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। গয়াসুরের মস্তক ১০ যোজন, হস্ত পদাদি তদনুরূপ বিস্তৃত। ইহার অর্থ মস্তকটি বুদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল; হস্ত,পদাদি বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা প্রশাখা (Different Schisms e. g. followers of the Northern School of Asoka, of the Southern School of Kaniksha &c.) এবং যাহা দূরদেশের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক অনুসরিত হইত। দেশগুলির দূরত্ব অনুমান করিয়া বোধ হয় হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য স্থির করা হইয়াছে।

মন্দিরের প্রায় ৫০ হস্ত দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে ইহা লীলাজনের জলে প্লাবিত হইয়া থাকে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র পথ আছে সেই পথে মোহান্তদিগের সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়। পাদুকা বহির্দ্বারে ত্যাগ করিয়া

ঐ সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। সমাধিক্ষেত্রে কতকগুলি বড় বড় মন্দির আছে। এই গুলি মঠের পূর্ব্বতন মোহান্তগণের সমাধি মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত উপমন্দির আছে তাহার সংখ্যা নাই। এইগুলি মঠের চেলা ও তৎসংক্রান্ত লোক সমূহের সমাধি স্থল। এবং প্রত্যেক সমাধি মন্দিরের নিকট এক একটি বেল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। একটি ক্ষুদ্র গুম্বজের ভিতর এক রাশি ভস্ম যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। প্রবাদ যে এই ভস্মরাশি বুদ্ধদেবের ধুনির (অগ্নিকুণ্ডের) ভস্মীভূত কাষ্ঠাবশেষ। এই গুলি প্রায় অর্দ্ধ প্রস্তর ভাবাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা ভগ্নপ্রবণ। আমরা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে খানিকটা ভস্ম তুলিয়া লইলাম। সমাধিক্ষেত্র হইতে আমরা মোহান্তের বাটীর সীমানায় প্রবেশ করিলাম। ইহার প্রবেশ দ্বার পশ্চিম মুখে। বামপার্শ্বে সারি সারি মঠের গোশালা। দক্ষিণ পার্শ্বে বরাবর প্রাচীর। প্রায় ২০০ ফিট্ ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি বেশ বড় বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইল। ঐটি মোহন্তের "বারদ্বারি"। ছোট লাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ এখানে আসিলে এই স্থানে সম্ভাষিত হইয়া থাকেন। বাটীটি ত্রিতল। বেশ সুসজ্জিত। আমরা উহা পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। এই বাটীটির সম্মুখে একটি বেশ বড় কূপ আছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র। বাটীটির পশ্চাৎভাগ দিয়া লীলাজন নদীতে গমন করিবার পথ আছে। আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোহান্তের বাটীর সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে পাল পাল গাভি, বলদ, অশ্ব, উষ্ট্র ও হস্তি বাঁধা রহিয়াছে।

পাঠক পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে বুদ্ধ গয়ার মোহান্ত সামান্য লোক, জটাধারী, ভস্মাচ্ছাদিতদেহ, ভিক্ষাই ইঁহার জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। ইঁহাকে একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গয়াজেলার মধ্যে টিকারীর মহারাজাই জমিদার ও সামন্তদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইঁহার অব্যবহিত নিম্নেই বুদ্ধগয়ার মোহান্তকে পরিগণিত করিতে হয়। ইঁহার সুবিস্তৃত জমিদারী আছে। সমগ্র জমীদারির আয় প্রায় তিন লক্ষ কি সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হইবেক। মঠের ও তৎসংক্রান্ত জমি জমার তসিল আদায় ও জমিদারীর কার্য্য কলাপ সমুদয় মঠের চেলাদিগের দ্বারা সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আমরা মোহান্তের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই একটি সুসজ্জিত শয্যা দেখিতে পাইলাম। ইহা মোহান্তের গদি। আমরা উহাকে প্রণাম করিয়া পার্শ্বেই উপবিষ্ট হইয়া অন্যান্য চেলাদিগের সহিত মঠ সংক্রান্ত নানা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। এস্থলে বোধ হয়, চেলার সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লেখ করা অসংলগ্ন হইবে না।

অতি শৈশবাবস্থা হইতে দুই চারি জন শ্রেষ্ঠ জাতীয় ব্রাহ্মণতনয় এই সম্প্রদায়ের

অন্তর্গত ৺কাশীধামস্থিত মঠে লালিত হইয়া বিদ্যোপার্জ্জনে রত থাকেন। বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলে প্রায়ই যৌবনাবস্থাতেই ইঁহাদিগকে বুদ্ধগয়ার মঠে আনয়ন করা হয়। সভা করিয়া মঠের সকল চেলা, এবং গুরুভাই প্রভৃতি মঠ সংক্রান্ত লোক আপন আপন প্রিয় ব্রাহ্মণতনয়কে প্রধান চেলার পদে ভোট দ্বারা মনোনীত করেন।

শেষ ভোট মোহান্তের এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান; যাঁহার ভোট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় তিনি প্রধান চেলার পদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। প্রধান চেলার ভাবী মোহান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। মোহান্ত মহাশয় উপযুক্ত বিবেচনা করিলে স্বহস্তে মস্তক মুণ্ডন ও স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রধান চেলার পদ প্রদান করেন। প্রধান চেলার হস্তে সমগ্র মঠের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধারণ ভার অর্পিত হইয়া থাকে। আতিথ্য সংকার, অভ্যাগত লোক জনের সমাদর ও খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির সঞ্চয় ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত থাকে। মোহান্তের নিম্নে তাঁহাকে মঠের একরূপ কর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মরণকালীন মোহান্ত মহাশয় প্রায়ই তাঁহাকে নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান। যদি দৈববশতঃ তাহা না করেন তাহা হইলে চেলারা মনোনীত করিয়া যাঁহাকে মোহান্ত পদে অভিষিক্ত করিবেন তিনিই প্রকৃত মোহান্ত বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত হইয়া থাকেন। এরূপ স্থলেও প্রায় সচরাচর প্রধান চেলাই ঐ পদে মনোনীত হইয়া থাকেন। তিনি দুষ্ট, অসচ্চরিত্র লোক হইলে কিম্বা অন্য কোন কারণবশতঃ অপারগ হইলে ঐ পদ ৺কাশীধাম প্রত্যাগত সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী যুবা ব্রাহ্মণতনয়গণের মধ্যে অন্য কোন এক জনকে ভোটাধিক্যানুসারে অর্পিত হইয়া থাকে। মঠস্থ মোহান্ত ও চেলাগণের সংসার আশ্রম এককালীন নিষিদ্ধ। প্রধান চেলা মহাশয় পূজাদি পারমার্থিক ক্রিয়া মোহান্তের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। এই মঠে একটি বিখ্যাত পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। উপযুক্ত বিবেচনা করিলে মোহান্ত জ্যেষ্ঠ চেলাকে এইস্থলে ক্রিয়াদি করান এবং তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রধান চেলার নিকট আমরা আবেদন করাতে তিনিই আমাদিগকে শ্রীযুক্ত হেমগিরি মহাশয়ের সদনে লইয়া গেলেন। এই মঠের সকলেই শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। মোহান্ত মহাশয় ত্রিতলের উপরে একটি ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট ছাদে অধিকাংশ সময় উপবিষ্ট থাকিয়া নিম্নস্থ সকল কার্য্যের পর্য্যাবেক্ষণ ও জপ তপাদি করিয়া থাকেন। ইনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া আহ্নিকাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর জমীদারি কার্য্যাদি সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইনি সচ্চরিত্র, বিদ্বান, শান্ত, উদার এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাশয় ব্যক্তি। ইহাঁর পূর্ব্বে ছয়টি মোহান্ত তিরোহিত হইয়াছেন। ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত বিস্তর ধন এই মঠের মধ্যস্থিত কোষাগার সমূহে প্রোথিত আছে। মঠের সীমার মধ্যে প্রায় ১২। ১৩টি কোষাগার

আছে। শুনা যায় যে, এক একটি গুম্বজ নির্ম্মাণ করাইয়া তদ্‌নিম্নে ঐ সকল সঞ্চিত ধন সমূহ প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছে। বোধ হয় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মধ্যে এরূপ ধনশালী মঠ আর কুত্রাপি নাই। মঠটি অন্যূন এক শত বিঘা জমি ব্যাপিয়া আছে। মঠে অপর্য্যাপ্ত শস্য সঞ্চিত আছে। ৫।৭ বৎসর অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ হইলে এই মঠের সঞ্চিত শস্য হইতে ব্যয় করিলেও বড় ক্ষতি হয় না। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই গয়া জেলায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, বুদ্ধগয়ার মোহান্ত মহাশয় দরিদ্র লোক জনের প্রাণরক্ষার জন্য অন্নচ্ছত্র দেন। ইহাতে তাঁহার যশ ও সুখ্যাতি বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পরিশ্রান্ত পথিক পরিব্রাজকগণের সুবিধার জন্য এখানে প্রত্যহই সদাব্রত ভিক্ষা ব্যবস্থা আছে। পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত খাদ্য সামগ্রী তাঁহারা মোহান্তের পক্ষ হইতে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অভ্যাগত অতিথি মঠের চেলা ও ইতরেতর লোকের ব্যয়ার্থ প্রায় দিবারাত্রি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোহান্ত মহাশয় আমাদিগের সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে কথোপকথন এবং পরিশেষে বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিলেন। আমরা তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। উপর হইতে অবতরণ করিয়া আমরা তাঁহার উদ্যান পরিদর্শনাভিলাষে মোহান্তদিগের ৫। ৬টি সমাধি মন্দির অতিক্রম করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। উদ্যানটির চতুষ্পার্শ্ব পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উদ্যান রক্ষকগণ সকল স্থান যত্নে পরিদর্শন করাইতে লাগিল। আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত মঠস্থ চেলা দ্বারদেশে বসিয়া গঞ্জিকা সেবনে রত হইলেন। আমাদিগের পরিদর্শন ভার উদ্যান রক্ষকগণের হস্তে কাজে কাজেই ন্যস্ত হইল। উদ্যানটি সুবৃহৎ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পথগুলি বিশেষ যত্নে প্রস্তুত, মার্জ্জিত এবং আধুনিক ফ্যাশানের। সুমিষ্ট ফল ও পুষ্পাদির বৃক্ষ এই উদ্যানের শোভা সতত পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।

বুদ্ধগয়ার মন্দির প্রকৃত দর্শনোপযোগী। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার সুপ্রশস্ত। প্রথম খিলানটি সুবৃহৎ। ইংরাজ-রাজ মন্দির সংস্কারকালীন ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে খিলানটি বাঁকা ও একপার্শ্বে হেলিয়া পড়িয়াছে। তবে সহজে এ দোষ অনুমিত হয় না।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, বি, এ।

হিমালয়ে একটি নীহার-বাহুর পাশে।

হিমালয়ে উঠিতে উঠিতে প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়! সমতল বঙ্গভূমির পরিবর্ত্তে, এখানে গভীর উপত্যকাময় পার্ব্বত্য প্রদেশ। একদিকে, উপত্যকায় ছয় সাত হাজার ফুট নীচে কল্লোলিনী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে, অন্য দিকে ছয় সাত হাজার ফুট উচ্চ হইতে জল প্রপাত বা তুষারপাত হইতেছে। বঙ্গে যেমন গরম এখানে তেমনি শীত। বঙ্গে যা আছে, এখানে তা নাই। এখানে যা আছে বঙ্গে তা নাই! বঙ্গের মাল্লকা, মালতী, যুথী এখানে ফুটে না। এখানকার কুসুম সুন্দরীদিগের নাম বাঙ্গলা ভাষায় পাই না, ইংরাজি নামে ডাকিতে হয়। এখানকার ফল ফুল ইউরোপীয়—অথচ বঙ্গদেশ এখান হইতে প্রায় দেখা যায় বলা যাইতে পারে।

হিমালয়ের ভিতর উচ্চতার প্রভেদে, উদ্ভিদ্ সংস্থানের আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি গাছ দেখিয়া কত উচ্চে উঠিয়াছি আন্দাজ করা যায়। হিমালয়ের পদতলে শাল বন। দার্জ্জিলিংয়ের নিকট ওক, চেসনট, প্রভৃতি বড় বড় গাছ। আরও উচ্চে রডোডেন্ড্রন, ফার প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। তার চেয়ে উচুতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগন্ধি রডোডেণ্ড্রন প্রভৃতি গাছ! এখানে ঘাস এবং অতিশয় ক্ষুদ্র ২।৪ রকমের ফুল ব্যতীত আর কিছুই জন্মে না। ইহার উপর সব বরফ, সেখানে জীবনের লেশমাত্র নাই। যে যেখানকার যোগ্য তাহাকে সেইখানে দেখা যায়! অথবা যাহাকে যেখানে দেখা যায়, সে সেখানকার উপযুক্ত না হইলে, সেখানে তিষ্ঠিতে পারিত না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য নির্ব্বাচনী শক্তির এখানে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ফারকে শালের স্থানে রোপণ কর মরিয়া যাইবে, শালকে ফারের স্থানে রোপণ কর মরিয়া যাইবে।

পাশে একটি নীহারাবাহু বা বরফের নদী। বর্ষাকালে পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্র যেরূপ প্রশস্ত হয়, সেইরূপ প্রশস্ত একটি নদী মনে করিয়া লও। নদীর জলের পরিবর্ত্তে বরফ—পাথরের মত শক্ত বরফ মনে কর, তাহা হইলে এই বরফনদী বা নীহার বাহু কি কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উহা ছোট বড় বিবিধ প্রস্তরখণ্ড বক্ষে করিয়া অতি মন্দগতি চলিতেছে—এত আস্তে যে দেখিলে উহা যে চলিতেছে তাহা বোধ হয় না। ঐ অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে যে তুষার পড়ে তাহা জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়, সেই বরফরাশি নদীর আকারে নিম্নস্থানে নামিয়া থাকে। নহিলে, বৎসরের পর বৎসর তুষার জমিয়া ঐ শৃঙ্গ যে কত উচ্চ হইত বলা যায় না; এবং ঐ তুষার রাশি কোনই কাজ করিত না।

প্রকৃতির রাজ্যে অপচয় নাই; জড়ই বল আর প্রাণীই বল কোন পদার্থ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণারও জীবন ব্যর্থ নয়। উহারা একত্র হইয়া আট, নয় হাজার ফুট উপর হইতে বরফ নদীর আকারে এখানে নামিয়াছে। বরফ নদী আর কিছুদূর নীচে গিয়া একটি বেগবতী স্রোতস্বতীকে জন্ম দিয়াছে।

কল্লোলিনী হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিতেছে। চারিদিক হইতে আরও কত ভগিনী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিল। সকলে মিলিয়া, একত্রে হইয়া, হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া, উচ্চতানে গান গাহিয়া চলিতেছে। গুঁড়ি পাথর ইত্যাদি সম্মুখে যা কিছু বাধা প্রতিবন্ধক পড়িতেছে, তাহা সগর্ব্বে ঠেলিয়া ফেলিতেছে, চূর্ণ করিতেছে। কি তেজ, কি বীর্য্য, কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ! দৃশ্য অতি মনোহর! জীবনের প্রারম্ভে এইরূপই হইয়া থাকে। নদি! আরও কিছুদূর যাও, বয়স একটু বাড়ুক, এত লাফা-লাফি এত তেজ রহিবে না, এত উচ্চে হাসিবে না, এত উচ্চে গাহিবে না। কিন্তু তখন তোমার আর একমূর্ত্তি দেখিতে পাই। সে মূর্ত্তিও কি সুন্দর। সে মূর্ত্তি, ধীর, গভীর, প্রশান্ত। এখন তুমি উগ্রা করালিনী! তখন তুমি প্রেমময়ী লক্ষ্মী। তোমার এই উগ্রমূর্ত্তিও সৌন্দর্য্যশালী; কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে ভালবাসার উদ্রেক হয় না, বরং ভয় হয়। বয়োধিক্যের সহিত তোমার যে মূর্ত্তি তাহা দেখিলে কেমন যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, কারণ, তখন তুমি পরোপকারে ব্রতী! এখন তোমার কাছে কোন জীব তিষ্ঠিতে পারে না। তখন, তুমি কত জীবকে ক্রোড়ে স্থান দিবে, লালন পালন করিবে, কত জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবে। এখন তুমি কেবল ধ্বংশ করিতেছ, বড় বড় পাথরকে ছোট ছোট নুড়ি করিতেছ, ছোট ছোট পাথরকে মৃত্তিকাকণায় পরিণত করিতেছ। তখন তুমি কৃষকের ক্ষেত্রে পলি দিবে, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবে, কৃষিকার্য্যের সুসার করিবে। তখন কত লোকের জীবন তোমার উপর নির্ভর করিবে। তখন লোকের আবাসযোগ্য কত নূতন নূতন জমি প্রস্তুত করিবে। এখন তুমি পৃষ্ঠে যদি কোন বোঝা বহ ত তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য। তখন তুমি পৃষ্ঠে কত বোঝা বহিয়া বাণিজ্যের সহায়তা করিবে। এক কথায়, এখন তুমি নিতান্ত স্বার্থপর, তখন পরের হিতই তোমার ব্রত হইবে।

অসংখ্য জীবের অশেষ হিত করিয়া পরে তুমি অনন্ত সাগরে মিশিবে। তখন দৃশ্যতঃ তোমার জীবনের শেষ হইল বটে, নদীর নদীত্ব গেল বটে কিন্তু তখনও বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইল না, মহাসমুদ্রে বিলীন হইলে মাত্র। মহাসমুদ্র তোমার জন্মদাতা। তিনি আপনার শরীর হইতে জলীয়বাষ্প হিমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ জলীয়বাষ্প উচ্চশৃঙ্গে তুষাররূপে সংহত হইয়াছে। তুষাররাশি এই বরফনদীর আকারে

নামিয়াছে। এই বরফ হইতে তোমার জন্ম। তোমার জীবনের শেষ হইলে জন্মদাতার ক্রোড়ে লুকাইলে।

নদি! তোমার জীবন আদর্শ জীবন, মানব জীবনের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তোমার জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যেরূপ স্বচক্ষে দেখিতে পাই, মানব জীবনের আদি অন্ত সেরূপ দেখিতে পাই না। মানবজীবনেরও কি বাস্তবিক ক্ষয় হয় না? তোমার মত কোন অনন্ত সাগরে মিশিয়া যায়? ক্ষুদ্র মানবাত্মা অনন্তাত্মায় বিলীন হয়? তোমার জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ আমরা দেখিতে পাই, সেইরূপ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ জীব কি মানব জীবনের আদি অন্ত দেখিতেছে?

কবিবর কালিদাস হিমালয়কে দেবতাত্মা বলিয়াছেন। দেবতার বাঞ্ছনীয় স্থান বটে। হিমালয়ের মত দৃশ্য বোধ হয় যেন আর কোথাও নাই। এখানকার দৃশ্য নানারূপ। কোথাও নিবিড়ারণ্য—বড় বড় বৃদ্ধ শৈবালাবৃত বৃক্ষ; তাহাকে প্রণয়িণী-লতা জড়াইয়া রহিয়াছে, যেন তাহার সঙ্গে একাত্মা হইয়াছে, মৃত্যু হইলে এক সঙ্গে মরিবে, তার আগে ছাড়িবে না। ছোট, বড়, সরু, মোটা, লম্বা চৌড়া কতরকমের ফার্ণ শোভা পাইতেছে। কতরকমের ফুল হাসিতেছে। কতরকমের পাখী গাহিতেছে। কোথাও পাৎলা জঙ্গল; ছোট ছোট বাঁশ, তার অতি সরু সরু পাতা; রডোডেন্ড্রনের লালফুলে লালে লাল হইয়াছে। কোথাও সুগভীর উপত্যকা, যেন অতলস্পর্শ বলিয়া বোধ হয়, তাহার ভিতর রজতহারের ন্যায় একটি নদী। কোথায় বেগবতী স্রোতস্বতী ভীষণবেগে ছুটিতেছে। কোথাও তুষারাবৃত শুভ্রশির উচ্চশৃঙ্গ গগণভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সূর্য্যোদয়ে, বা সূর্য্যাস্তে, বা চন্দ্রালোকে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খেলা!

এখানকার এই নীহারবাহুর পাশের দৃশ্য ও অতি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য এবং মহত্ব মিশ্রিত। এখানকার সকলই মহৎ। শত বজ্রধ্বনির শব্দে সহস্র সহস্র ফুট উচ্চ হইতে ভীষণবেগে তুষারপাত হইতেছে। তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সমূহ গগণ-ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। সেখান হইতে বিশাল নীহার বাহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড বক্ষে করিয়া নামিতেছে। অদূরে, কল্লোলিনী ভীষণবেগে, ভীষণ গর্জ্জনে ছুটিতেছে। এখানকার সকলই মহৎ, ক্ষুদ্র কেবল একটি মানুষ, যাহার স্থান এখানে নহে।

এ স্থান দেবতার স্থান। একবার যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল এ স্থান স্বর্গ, সশরীরে স্বর্গে আসিলাম! অচিরে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। কে যেন বলিল, মানুষ, স্বর্গ কি উচ্চে, না সুন্দর দৃশ্যে? স্বর্গ যে ভূমণ্ডলব্যাপী। সশরীরে স্বর্গলাভ করা যায়, অন্ততঃ স্বর্গ-

লাভ করিতে চেষ্টা করা যায়, যেখানে সেখানে। স্বর্গ কোথায়? মনের ভিতর। এস্থান সুন্দর, পবিত্র, মহৎ। কিন্তু কথায় বলে "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" যার মন দেবতুল্য হয় নাই, সে স্বর্গতুল্য স্থানে গেলেও দেবতা হয় না, যেমন তেমনি থাকে। যার মন দেবসদৃশ, সে নরকে গেলেও সেখানে স্বর্গ সুখভোগ করে। বাহ্যদৃশ্যের সহিত মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সত্য। এখানে যেরূপ সৌন্দর্য্যের, মহত্বের ছড়াছড়ি, তাহাতে কার মন না অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য সুন্দর, মহৎ দেববৎ হয়। কিন্তু কত-ক্ষণের জন্য? আবার যে সেই। কয়েক দিন উপরি উপরি দেখ, এমন যে সুন্দর দৃশ্য, যাহা দেখিয়া, অনুপম, অবর্ণনীয়, ইত্যাদি কত বিশেষণ মুখে আসিতেছে, তাও যেন পুরাতন বোধ হইবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া যেন সৌন্দর্য্য হারাইবে। বাস্তবিক কি উহার সৌন্দর্য্য অনেকটা নূতনত্বে নয়? হিমালয়ের রডডেণ্ড্রন এবং ফার-বন, সুগভীর উপত্যকা, বেগবতী কল্লোলিনী, তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৃঙ্গ সমূহ ছাড়িয়া একবার সমতল বঙ্গে যাও। সেখানে, সন্ধ্যার পর একটি দীঘির পাশে, বড় বড় অশ্বত্থ গাছের ছায়া চন্দ্রালোকে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। অসংখ্য জোনাকিপোকা উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘুরিতেছে—সে দৃশ্য কি মনোহর নয়? প্রথম, কি অনেক দিন পরে দেখিলে, সেখানেও মনে অনির্ব্বচনীয় সুখ হয় না? সেখানেও কি সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় না? যায়—সুখ মনে, স্বর্গ মনে। সুখের জন্য মানুষ লালায়িত, পাগল, চারিদিকে ছুটিতেছে। কেহ সুখ খুঁজিতেছে যশে, কেহ টাকায়, কেহ আরও কত কিসে। কিন্তু সুখ কোথায়? আবার বলি, মনে। ইহা পুরাতন কথা। কথাটা বলিলে পুরাতন বলিয়া কোথায় কতবার যেন শুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তবু ত মনে থাকে না! মনোজগতে এখন নূতন সত্য নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত শত বৎসর পূর্ব্বে, গৌতম, খ্রীষ্ট প্রভৃতি মহাত্মারা যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, আজও সেই সকল সত্যই প্রচারিত হইতেছে। অনেক পুরাণ কথা আছে, যা হাজার বলিলেও পুরাণ হয় না।

স্বর্গের কথা বলিতে বলিতে সুখের কথা আসিয়া পড়িল। স্বর্গ এবং সুখ কি তবে একই জিনিস? তাহাতে সন্দেহ কি? প্রকৃত সুখ, স্থায়ী সুখ, যে সুখ পৃথিবীর বিপদ আপদে, শোকতাপে, দুঃখ ক্লেশে হারাইবে না, তাহা স্বর্গলাভ না করিলে, দেবতুল্য না হইলে, পাওয়া যায় না। বাহ্যিক কিছুতেই সে সুখ বাড়াইতেও পারে না কমাইতেও পারে না। যে সুখ অন্বেষণ করে, সে স্বর্গলাভ করিতে চেষ্টা করুক। স্বর্গলাভ করাই তাহার স্বার্থ। যে বাস্তবিক স্বার্থ বুঝে, যে প্রকৃত স্বার্থপর, সে দেবতুল্য হইতে চেষ্টা করিবে—যাহাতে মন বিকৃত হইতে পারে, যাহাতে পরিতাপ হইতে পারে, সেরূপ কাজ, সেরূপ চিন্তা হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা করিবে।

যাহা আছে তাহার মূল্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না, অনেক সময়ে তাহা অবহেলা কর, কখন নয়ন তুচ্ছ কর, পা দিয়া ঠেলিয়া ফেল। যাহার জন্য ছুটিলে, যাহাতে কতদিন ভুলিয়া, কত সুখের আশা করিতেছিলে, যাহার জন্য জাগিয়া জাগিয়া কত স্বপ্ন দেখিতেছিলে, তাহা পাইলে। মন কি পরিতৃপ্ত হইল? কই, তাহাতে আশানুযায়ী সুখ কই? যে কিছু সুখ পাইলে, তাও আবার রহিল কতক্ষণ? আশার ন্যায় চিত্রকর দেখি নাই, বড় মন ভুলান ছবি আঁকিতে পারে। কিন্তু সে ছবি মরীচিকার ন্যায়, কাছে যাও পাইবে না। যাহা হারাইলে স্মৃতির সাহায্যে আশা তাহার একটি মনোরম চিত্র আঁকিয়া সম্মুখে ধরিল, তাহার জন্য প্রাণ কাঁদিল, আবার তাহার দিকে ধাবমান হইলে। ছুটাছুটি, ক্রমাগত ছুটাছুটি। এইরূপ ছুটাছুটি করিয়া কত লোকের জীবন কাটিতেছে। এরূপ ছুটাছুটিতেও একপ্রকার সুখ আছে, সত্য। কিন্তু সে সুখে তৃপ্তি সুখ না, তাহাতে শান্তি নাই। সে সুখ জ্বরগ্রস্ত লোকের পক্ষে জলের ন্যায়, পিপাসা মিটে না, বরং যতই পান করে, ততই যেন পিপাসা বাড়ে। যে স্বর্গ পাইতে চেষ্টা করে তাহার সুখ শান্তিময়!

এই উচ্চ হিমালয় শিখরে হউক, বা নিম্ন বঙ্গদেশে হউক, দরিদ্রের কুটিরে হউক, বা রাজপ্রাসাদে হউক, সকল স্থানেই, স্বর্গ, সুখ, শান্তি পাওয়া, বা অন্ততঃ পাইতে চেষ্টা করা যায়। বাস্তবিক কোন মানুষ সশরীরে স্বর্গ পাইয়াছে কি না জানি না। শুনিয়াছি, যুধিষ্ঠির পাইয়াছিলেন, গৌতম প্রভৃতি আরও কোন কোন মহাত্মাও পাইয়া থাকিবেন। স্বর্গ পাও না পাও, স্বর্গের রাস্তাতেও চলিতে সুখ। কেহ কেহ বলিবেন, স্বর্গে যাইবার এক অপেক্ষাকৃত সহজ পথ আছে—এই জনশূন্য স্থানে আজীবন থাকা। কিন্তু, সে এক প্রকার আত্মহত্যা করা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সেরূপ করিয়া স্বর্গ পাওয়াকে, সশরীরে স্বর্গ পাওয়া বলা যায় না। আর বাস্তবিক স্বর্গের উপযুক্ত হইতেছ কি না, সংসারে না মিশিলে বুঝা যায় না। এখানে হয় ত মন খুব উন্নত, দেবতুল্য হইল। কিন্তু সংসারের প্রলোভনে পদস্খলন হইয়া স্বর্গ হইতে নরকে পড়িবে না, কে বলিতে পারে?

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

পরমহংস শিবনারায়ণ দেবের জীবন চরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

শিবনারায়ণ সেখান হইতে কাঞ্চি হইয়া মান্দ্রাজ গেলেন। জহরমল মহাজন যে নোট দিয়াছিলেন শিবনারায়ণ তাহা মান্দ্রাজে ও অপর স্থানে গরীবদুঃখিদিগকে বিতরণ করিলেন। মান্দ্রাজ হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর চলিয়া গেলেন। সেখানে দেখিলেন যে অতি বৃহৎ মন্দির। চারিদিকে পাথরের এবং অষ্টধাতুর প্রতিমা—রামচন্দ্র সীতা এবং শিবালঙ্গ ও অপর অনেক মূর্ত্তি আছে। যে মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে সেখানে অন্ধকার। যাত্রিদিগকে পাণ্ডাগণ প্রদীপ জ্বালাইয়া দূর হইতে দর্শন করায়। কাহাকেও না স্পর্শ করিতে না নিকটে যাইতে দেয়। কারণ, যদ্যপি কোন যাত্রী প্রতিমা ধাতুনির্ম্মিত ইহা জানিতে পারে তাহা হইলে পাণ্ডাদেরা রোজগারের পথ বন্ধ হইবে।

ধনী যাত্রী যদি লুকাইয়া পাণ্ডাদিগকে টাকা দেয় তাহা হইলে তাহারা রাত্রিতে চুপে চুপে তাহাদিগকে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গিয়া বস্ত্রাবৃত লিঙ্গকে খুলিয়া দর্শন করায়, কিন্তু কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না। কোন যাত্রী জল লইয়া গেলে তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া পাণ্ডারা নিজে শিবলিঙ্গের উপরে সেই জল ঢালিয়া দেয়; যাত্রীরা যদি দরিদ্র হইলেও তাহার নিকট হইতে পাঁচ সিকা না পাইলে তাহারা জল ঢালে না। যে গরিব বেচারা সহস্র ক্রোশ পদব্রজে ভিক্ষা করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়া আসিয়াছে; সে এখান হইতে সহস্র ক্রোশ কি আহার করিয়া যাইবে ইহা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের মনে আসে না। শিবনারায়ণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে প্রত্যক্ষ চেতন জীব যাহার নাম শিব বলিয়া কল্পিত—সেই জীব যদি কোন বাটীতে পিপাসাতুর হইয়া যায়, তাহাকে প্রীতি পূর্ব্বক জল দিতে ইহারা কুণ্ঠিত কিম্বা প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ শিব সূর্য্যনারায়ণ তাঁহাকে প্রীতি ভক্তিরূপ জল প্রদান করিতে ইহাদের আলস্য—আর জড় পাথর কাষ্ঠের উপর জল ঢালিয়াই ইহাদের পুণ্য লাভ।

সেই সময়ে জগন্নাথ পাণ্ডা নামে একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি আসিয়া শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—মহারাজ আপনি কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন?

শিবনারায়ণ বলিলেন যে, ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং ধর্ম্মের স্বরূপ কি? তখন জগন্নাথ পাণ্ডা বলিলেন,—মহারাজ সত্যধর্ম্ম শব্দ মাত্র, সত্য যিনি তিনিই ধর্ম্ম, তাঁহাকে ধারণ করা এবং সত্য যে বাক্য তাহা বলা এই ধর্ম্মের স্বরূপ।

শিবনারায়ণ বলিলেন,—যদি তোমরা এই কথা বুঝিয়া থাক তবে তোমরা এই যে অষ্টধাতু এবং পাথর ও মৃত্তিকার ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া ইনি রাম ইনি শিব

এইরূপ কল্পিত নাম দিয়া পূজা করিতেছ ইহার কারণ কি? রাম এবং শিব এখানে কোন স্থানে আছেন? এই পাথর শিব না অষ্টধাতু শিব না মৃত্তিকা শিব? যদি এই সকল পদার্থ শিব হন তাহা হইলে সকল স্থানেইত পাথর, অষ্টধাতু, মৃত্তিকা আছে, সকলেই শিব এবং রাম হইতে পারেন। এবং পাথর অষ্টধাতু মৃত্তিকা হইতে শ্রেষ্ঠ চেতন পদার্থ যে মনুষ্য ইহাঁরাই তাহা হইলে শিব রাম কেন না হইতে পারেন? জড় পদার্থকে নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার তাহা হইলে আবশ্যকই বা কি? মনুষ্য চেতন পদার্থকে অর্থাৎ আপনাকে পূজা করিলে ত তাঁহাকে পূজা করা হয়—তিনি ত সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী সকলই জানিতে পান।

জগন্নাথ পাণ্ডা বলিলেন যে,—ইহা ঠিক কথা মহারাজ, ইহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু জগতে সত্যকে মানে না এবং বিশ্বাস করে না। মিথ্যা প্রপঞ্চ করিলে লোকে বিশ্বাস করে এবং মানে। দেখুন যদি আমি কোন বড় লোককে বলি আমার পুত্র কন্যা অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইতেছেন আমাকে দশ টাকা দিন তিনি কখনই কোন মতে তাহা দিবেন না। যদ্যপি কোন কারণবশত একবার দেন তাহা হইলে সুদ সমেত ফিরিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু দেখুন এই ঠাকুর এবং ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মনুষ্য অনর্থক ব্যয় করিয়া থাকে এবং সহস্র সহস্র ক্রোশ পদব্রজে কত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়া এই প্রতিমাকে ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে এবং টাকা পয়সা শাল বনাত এবং উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি ইহার উপরে চড়াইয়া দেয়। কিন্তু সেই টাকা পয়সা পাথরের ঠাকুর খান না তাহাতে আমরা আমাদের পুত্র কন্যাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকি এবং ঐ শাল রুমাল বনাত প্রভৃতি আমরাই গাত্রে দিয়া থাকি। ধনীর অর্থে দরিদ্র আমাদের পালন করিবার জন্যই ঋষি মুনিরা বিচার করিয়া নানা প্রকার তীর্থ এবং প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। নতুবা আমাদের মিথ্যা প্রপঞ্চ করিবার প্রয়োজন কি?

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জগন্নাথ পাণ্ডা শিবনারায়ণকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিয়া চাকরদিগকে বলিয়া দিলেন যে,—ইনি মহাত্মা; যে স্থানে থাকিতে চান সেই স্থান তোমরা দেখিয়া আইস। যে কয়েক দিবস ইনি এখানে কৃপা করিয়া থাকেন তত দিন পর্য্যন্ত আমি ইহাঁর সেবা করিব।

সেতুবন্ধরামেশ্বর মন্দির স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে সমুদ্রধারের জঙ্গলে চারিদিক খোলা একটী দুই মহল রাম ঝরোখা বলিয়া বাড়ী আছে সেইখানে যাইয়া শিবনারায়ণ চারি দিবস বাস করিলেন, সেই বাটীর নিকটে একটী পথ আছে। সেই পথের ধারে একজন মৌনী সাধু বসিয়া থাকিতেন। তিনি দিবসে অন্ন জল আহার বা মল মূত্র ত্যাগ করিতেন না কিন্তু রাত্রি আন্দাজ বারটার সময় যখন সেখানে মনুষ্যের গতায়াত থাকে না সেই সময়ে তিনি কৌশল করিয়া চুপে চুপে মল মূত্র ত্যাগ এবং

স্নান করিয়া চুলিতে রুটী প্রস্তুত করেন; ঐ রুটী অর্দ্ধেক উত্তম রূপে আহার করিয়া বাকী রুটীগুলি একটী ঘটীর মধ্যে রাখিয়া মুখটা উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া নিজে যেখানে বসিয়া থাকেন সেই মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া রাখেন এবং রাত্রিকালে ঐ রুটী তুলিয়া আহার করেন। শিবনারায়ণ ঐ রামঝড়খা হইতে বসিয়া বসিয়া এই সকল তামাসা দেখিতেন। ঐখানে মৌনী বাবার বড়ই মাহাত্ম্য ছিল। সেতুবন্ধরামেশ্বরে সকল লোকেই বলিত যে ইনি সিদ্ধ পুরুষ; ইনি দিবারাত্রি অনাহারে থাকেন, এবং মল মূত্র ত্যাগ করেন না, ইনি ঈশ্বর তুল্য। যত যাত্রী রামঝড়খা দর্শন করিতে আসিত তাহারা সকলেই মৌনী বাবাকে দর্শন এবং টাকা পয়সা দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত এবং সমস্ত দিন যত টাকা পয়সা পড়িত মৌনী বাবা চুপ করিয়া পাথরের মতন বসিয়া থাকিতেন। যখন যাত্রীদিগের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যাইত তখনি তিনি উঠিয়া সকল টাকা পয়সাগুলি টানিয়া উত্তম রূপে আপনার নিকট মাটিতে পুতিয়া রাখিতেন এবং দুই চারিখানা পয়সা সেইখানে ছড়াইয়া রাখিয়া দিতেন যাহাতে মনুষ্যগণ পয়সা ছড়ান দেখিয়া আবার দান করে। একজন পাণ্ডার মৌনী বাবার সঙ্গে যোগ ছিল। সে কিছু কিছু ভাগ পাইয়া খাদ্য দ্রব্য খরিদ করিয়া রাত্রিকালে মৌনী বাবার নিকট দিয়া আসিত। ঐ পাণ্ডা অনেক লোকের নিকটে বলিয়া দিত যে ইনি বড় মহাত্মা ইহার নিকটে টাকা পয়সা দিলে বড়ই ফল আছে। এক রাত্রিতে মৌনী বাবা স্নান করিয়া আসিয়া যেমন রুটী মৃত্তিকা হইতে বাহির করিয়া আহার করিবেন সেই সময় শিবনারায়ণ কাশিলেন। মৌনী বাবা শুনিতে পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে যদি এই বেটা আমাকে খাইতে দেখিয়া এ কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করে তাহা হইলে আমার এত মান প্রতিষ্ঠা ভঙ্গ হইবে এবং যা দশ টাকা প্রত্যহ পাইতেছিলাম তাহারও হানি হইবে। এই ভাবিয়া মৌনিবাবা শিবনারায়ণের নিকটে আসিয়া অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বলিলেন যে,—কিছু খাবে ত এস আমার নিকট আহার প্রস্তুত আছে।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে,—আমি দিবসে আহার করিয়াছি আমি এক সন্ধ্যা আহার করিয়া থাকি এক্ষণে আহার করিব না, যাও তুমি আহার কর গে।

মৌনী বাবা কোন মতে ছাড়েন না পাছে কাহাকেও বলিয়া দেয়। ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, —যে তুমি কোন চিন্তা করিও না আমি কাহারও নিকটে বলিব না, কিন্তু তুমি যে মৌন অবলম্বন করিয়াছ ইহাতে ইসারা করিয়া কষ্টেশ্রষ্টে অন্যকে মনের ভাব বুঝাইতে হয়, গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য এ ব্রত করিয়াছ কর—কিন্তু আমার সহিত কথা কহিলে তোমার হানি কি?

তখন মৌনী বাবা বলিলেন যে মহারাজ আপনাদের মহাত্মার নিকটে কথা বলিবার বাধা নাই কিন্তু গৃহস্থ লোক বড় বাক্যব্যয় করে। এই জন্য মৌনভাবে থাকি

এবং ঐ সকল লোকের সম্মুখে আহার এবং মল মূত্র ত্যাগ করি না; এইরূপ না করিলে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে মহাত্মা বলিয়া মানে না।

শিবনারায়ণ বলিলেন,—তাহা ঠিক বটে কিন্তু শরীর ধারণ করিলে যাবৎকাল শরীর মধ্যে থাকা যাইবে তাবৎকাল পানাহার করিতে হইবেই—ঈশ্বর, গড, আল্লা, খোদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বয়ং শরীর ধারণ করিলেও তাঁহাকে অন্ন জল পান আহার করিতে হইবে। এই স্থূল শরীর অন্ন জলের পুতুলা এবং কেহ ডাল ভাত কেহ বা রুটী কেহ বা দুগ্ধ ঘৃত কেহ বা কন্দমূল কেহ বা একতোলা জল আহার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর কারণেতে মিশিয়া যাইলে সেই অবস্থাতে খাওয়া দাওয়া নাই অর্থাৎ সাকার রূপ হইলে খাওয়া আছে কিন্তু নিরাকার হইলে খাওয়া নাই। যেরূপ অগ্নি জ্যোতিঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাকার জ্যোতিঃ থাকিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল বাতীর প্রয়োজন থাকিবে এবং দিতে হইবে যখন অগ্নি জ্যোতিঃ নির্ব্বাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যাইবেন তখন কোটী মন তৈল ঘৃত পড়িয়া থাকুক অগ্নির কোন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব শব্দ চেতন শরীরের মধ্যে থাকিবে তিনি গৃহস্থ কিম্বা সাধু মহাত্মা যাহাই হউন ততক্ষণ প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আহার করিতে হইবে। তাহাতে লজ্জা সরম কি আছে যে তাহা গোপন করিয়া আহার করিবে? ইহাতে হানি বা লাভ কি? তুমি যাও আহার কর তোমার কোন চিন্তা নাই।

মৌনী বাবা বলিলেন যে,—মহারাজ হানি লাভ নাই কিন্তু আহার করিলে পর অবোধ লোক সকল দেখিলে নিন্দা করে এবং বলে যে এই বেটা মহাত্মা নহে কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি সকল ভাব জানেন তাহারা নিন্দা করেন না।

ইহার পর মৌনি বাবা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন এবং শিবনারায়ণকেও কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ পর দিবসে যেখানে রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া কথিত সেইখানে যাইয়া দেখিলেন যে ছোট বড় অনেক পাথর সেখানে যত্রতত্র পড়িয়া আছে। কিন্তু সেতু বাঁধিবার কোন চিহ্ন নাই। কিন্তু সেইখানকার কয়েক জন মনুষ্য বলে এই শৈল খণ্ডই সেতুর ভগ্নাবশেষ; কেহ বলে সমুদ্র মধ্যে যে স্থানে চর পড়িয়াছে তাহাই সেতুর চিহ্ন।

রামচন্দ্র যে একটী সমুদ্র বাঁধিয়া পার হইয়াছিলেন ইহা যে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এমন যদিও নহে; বিচার করিয়া দেখ যে পরব্রহ্ম কত ব্রহ্মাণ্ড এবং পৃথিবী শূন্য-আকাশেতে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহার কোন সীমা নাই। শূন্য আকাশেতে ব্রহ্মশক্তির দ্বারা মেঘ জন্মিয়া থাকে পুনরায় সেই ব্রহ্ম শক্তি দ্বারা মেঘ খণ্ড খণ্ড হইতেছে। যদ্যপি পরব্রহ্ম কোন কারণ বশতঃ লীলার নিমিত্ত শরীর ধারণ করিয়া এক কিম্বা দশটা সমুদ্র বরফের মতন জমাইয়া সেতু বাঁধিয়া দেন ইহাতেই বা তাহা হইলে

আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? প্রত্যক্ষ দেখিতেছ সেই ব্রহ্মের শক্তির দ্বারা মনুষ্য হইয়া কত সেতু এবং কলের জাহাজ ও রেলগাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া চালাইতেছে। কিন্তু সে কথা না ভাবিয়া তোমরা রাজা প্রজাগণ মন রূপী সমুদ্রকে জ্ঞানরূপী ধৈর্য্য এবং সন্তোষ রূপী শুরকী চুন ইত্যাদি দ্বারা সেতু বাঁধ এবং অজ্ঞান অহঙ্কার রূপী রাবণকে শ্রুতি স্মৃতি রূপ বাণ দ্বারা বধ কর এবং সত্য রূপী যে সীতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে হৃদয়েতে ধারণ কর যাহাতে সর্ব্বদা আনন্দরূপ নির্ভয় থাক।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে শিবনারায়ণ সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন; যদ্যাপি সেতুবন্ধ রামেশ্বর কেহ পার হইয়া যায় অথবা পার হইয়া আসে ত তাহাকে এক দিকে তিন ক্রোশ আর অন্য দিকে চার ক্রোশ জাহাজে পার হইয়া যাতায়াত করিতে হয়। সমুদ্রের চরের উপর সামান্য একটী রাস্তা আছে ইহাই সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকে। এখান হইতে শিবনারায়ণ দ্রাবিড়াভিমুখে গিয়া জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে মন্দির কিম্বা যাহার বাটীতে অভ্যাগত হইয়া অন্ন চাহিতেন শিবনারায়ণের ধূলামাখা শরীর এবং জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া সকলেই ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিত। শিবনারায়ণ সকল স্থান বেড়াইয়া রাম রাজার রাজ্য দেখিতে মান্দ্রাজে আসিলেন। মান্দ্রাজ হইতে ত্রৈলাঙ্গ দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—সেখানে পণ্ডিতদিগের বাড়ী যাত্রা করিলে তাহারা পূর্ব্ববৎ ঘৃণা সহকারে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। কোন কোন পণ্ডিত লোক জিজ্ঞাসা করিত যে আইয়া উরু এবং আইয়া একড়েঞ্চে স্থাউ তুমি কোথা থেকে আসিলে? কোথায় যাইতেছ? তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? শিবনারায়ণ বলিতেন যে সেতুবন্ধ হইতে আসিয়াছি জগন্নাথ যাইব, তোমার নিকটে আসিয়াছি চারটী অন্নের জন্য। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে তুমি কি জাতি? শিবনারায়ণ কোন বিষয়ে পরিচয় দিতেন না, বলিবার মধ্যে কাহাকেও বলিতেন, আমি বড়ই ভ্রষ্টলোক।

দ্রাবিড় ত্রৈলঙ্গদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, অনেক বিষয়ে ইহাঁরা আচার করিয়া থাকেন কিন্তু তত বিচার পূর্ব্বক নহে। ইহাঁরা দিবা রাত্র শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার ও স্নান করিয়া থাকেন। একের ঘাটে অপর লোককে স্নান করিতে দেন না। দৈবাৎ ইহার অন্যথা হইলে ঘাট অশুদ্ধ হইয়া যায় এবং বাটী হইতে ঘাট পর্য্যন্ত গোময় ছড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহারা আপনার শরীরকে ও আপনাকে বড় মহাত্মা ও শুদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এবং উঁহাদের মতন যাহারা আচার পালন না করে অর্থাৎ দিন রাত্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন বারংবার সকল বিষয়ে স্নান কিম্বা গৃহে, বস্ত্রে, শরীরে যাহারা সর্ব্বদা গঙ্গাজল ছড়া না দেয় তাহাদিগকে নীচ শূদ্র জাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ।

কবিতা।

খুকির চুমো খাওয়া।

"দাও রাণি, চুমো দাও"——দুবাহু জড়ায়ে
মার গলে, রাণী গিয়া করিল চুম্বন।
উষার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে,
পড়িল রে প্রজাপতি অপূর্ব্ব বরণ!
শুক্র তারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে,
হেরি যেন হিমাংশুর পাণ্ডুর বদন!
কনক চম্পক যেন পড়িল গড়ায়ে,
ভূমি চম্পকের শাখে; মরি কি মিলন!
মরি মরি কি মিলন!—কত ভাগ্য ফলে,
দুঃখী মোরা—পাইয়াছি তোমারে গো রাণি!
ধন গেছে, সুখ গেছে, আশা গেছে চলে,
তবু ফল ফুলে ভরা দাবদগ্ধ প্রাণী!
আয় রাণি, বুকে আয়—থাকুক্ কবিতা—
চুমো খাই—ভুলে যাই বিশ্বের বারতা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নিরাশা।

ব্যথিত পরাণ লয়ে যার কাছে যাই
সে পলায় দূরে,
ভুলে যদি দেখা হয় সে যায় চলিয়া,
আমি মরি ঘুরে!

চাই যার অশ্রু জল, মুখ পানে চেয়ে
শুষ্ক হাসি হাসে,
শান্তিহীন এ জীবন যায় গো চলিয়া
অশ্রু, দীর্ঘশ্বাসে!

সকলেই চলে যায় আলেয়ার মত
সরে দূরে দূরে,
সংসার-সাগর-বুকে ঘোর ঘূর্ণিপাকে
আমি মরি ঘুরে!

কঠিন ধরণী তলে দুদণ্ডের তরে
মিছে কান্না, হাসা,
স্বার্থ-পূর্ণ এ জগৎ কেহ নহে কার,
শূন্য ভালবাসা!

আপনার দেখ পথ—পথের সম্বল;—
জীবন-তরণী বাহ;
অনন্ত কালের মুখে দাও ভাসাইয়া
বিদায় সঙ্গীত গাহ!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

তার!

কি ভেবে আসিত চোখে জল—কে জানে?
কেন বেধে পড়িত নিঃশ্বাস—বয়ানে!
কত ব্যথা ভরা ছিল প্রাণে—তাহারি,
হায়, খুলে না বলিল আমরি!
সে কেন, আপনা হইয়া পাশে আসিল?
কেন আননে চাহিয়া—মৃদু সরিল!
হায়! কেন আঁখি তারা তার জ্বলিল?
কেন মায়া ডোরে বেঁধে সরিল!
হায়! কেন হোল ক্ষণ পরিচিত রে,—
যদি সাধে মিশাবে দূরাতীত রে!
কেন গেল দুখ নদী একা বাহিয়া!
হায়! কেন না দেখিল সুখ চাহিয়া!
কেন নবীন মুকুরে চির দাগিল!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

এইখানে।

কেমন স্বপন পারা, থেকে থেকে মনে হয়,
এই খানে হৃদিতলে কার,
বহিত রে কবে যেন, কবিতার কল্পনার
মদির জোয়ার!

২

এমনি মাধবী রাতে, মধুর জোছনালোকে
তরু তলে কে বাজাত বেণু,
পুলকেতে সমীরণ বরষিত হৃদে কার
কুসুমের রেণু!

৩

মধুর স্বপনাবেশে মেলিয়া কুহক পাখা
উড়ে যেত সূক্ষ্মদেহ কার,
নন্দন নিকুঞ্জ বনে শুনিতে সঙ্গীত ধ্বনি
অপ্সর বালার!

৪

স্তবধ ঘুমন্ত রাতে, পাপিয়ার মৃদু বোলে
কে বুঝিত অভাগার ব্যথা,
আপন মরম ঢেলে কে শুনাতো জগতেরে
সে করুণ কথা!

৫

এইখানে উচ্ছ্বসিত প্রেমের নিঝর কা'র,
গীতি মাঝে পড়িতরে ঝরে,
সে অতৃপ্তি আকুলতা দেখিয়া হৃদয় যেত
বিষাতেতে ভরে।

৬

বরষার নদীকূলে নবীন মেঘের ছায়ে,
রাধিকার বিরহ-স্বপন
জাগিত মানসে কা'র, দেখিত কে বিধুরার
সজল নয়ন।

৭

আজি সে গিয়াছে কোথা? ওই যে কুটীর তা
শূন্য হৃদে দাঁড়ায়ে নীরবে,
গণিতেছে প্রতিপল, শুনিতে চরণ ধ্বনি,
আসিবে সে কবে?

৮

আসিবে না সে কি আর? ঘুচিবে না এ
আঁধার?
হাসিবে না আর ও ভবন?
স্মৃতি শুধু ব্যথা দেবে মনে করে এইখানে
কে ছিল কখন!

শ্রীবিনয়কুমারী বসু।

ভালবাসা।

কাছা কাছি থেকে তবু অচেনা দুজনে,
বুঝি নাই কেহ কারো হৃদয়ের ভাষা।
একদিন ঘুম ঘোরে নয়নে নয়নে
মুহূর্ত্তের পরিচয়, মিলন সহসা।
তারপর তুই সখি কি জানি কি মোহে
ভুলালি এ হিয়া মোর, সবি গেনু ভুলে,
আয় তবে এক সাথে ডুবি আজ দোঁহে,
ভীষণ জীবন স্রোত ভাসিয়ে অকূলে।
প্রেম হলাহল সখি উথলে হেথায়,
তিয়াষা মিটায়ে আয় দোঁহে করি পান।
দুজনার মাঝখানে আজিকে গো হায়,
আত্মহত্যা করিবে গো দুইটি পরাণ!
জ্বলিয়া মরিব সখি কিবা ক্ষতি তায়?
প্রেমের মন্দিরে সে যে মধুর শয়ান!

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

শ্বাশুড়ি-বৌ।

মাতৃস্থানীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দল একালের বধূদের উপর বড়ই উষ্ম। অপরাধ,—বৌ ঘরে এলেই ছেলে পর হয়, সুতরাং সে দোষ বধূর। আরও কি চাই—"যাহাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিলাম, ঝড়ে, জলে, বৃষ্টিতে এত কষ্ট করিয়া মানুষ করিলাম, আজ সে পর হইল! কোথাকার একটা হতভাগিনীর মেয়ে আসিয়া আমার সোণার ধনকে কিনা বুক থেকে কেড়ে নিলে! ওমা কি হবে—যাব কোথা—কি কলিকাল!"

সচরাচর ঘরে ঘরে এই কথা, এই কাব্য, এই কবিতা চলিতেছে। কোন শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী হাত মুখ নাড়িয়া অনবরত দৃষ্টান্ত দিয়া কুটুম্ব কুটুম্বিনী, আত্মীয় আত্মীয়ানী বন্ধু বর্গ যে যেখানে আছেন সকলকেই ঐ কথা বুঝাইতেছেন। কেহ অতি গম্ভীর ভাবে কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন যে কি রূপে ছেলের আর একটী বিয়ে দেওয়া যায় ও ছোট লোকের মেয়ে নিয়ে কি ক'রে ঘর করি। কেহ বা অত্যন্ত টিপিয়া টিপিয়া পাড়া প্রতিবাসিনীর সঙ্গে বধূ ও পুত্র সম্বন্ধে দু এক কথা কহিতেছেন। কেহ বা বধূর সঙ্গে ঝকড়া ঝাঁটী করিয়া ছেলের সঙ্গে একটা মাসহারার বন্দোবস্ত করিতেছেন, কেন না বধূর সংস্রবে থাকা অপমানের কথা। আর বৌ আসিয়া কি সর্ব্বনাশ করিল তাহা বিধিমত প্রকারে কীর্ত্তন করিয়া গৃহস্থালীকে অরণ্যে পরিণত করিতেছেন।

সত্য বটে—যাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে কোলে করিয়া বুকে করিয়া জলে ঝড়ে দুর্দ্দিনে সুদিনে সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি—যে মা ভিন্ন জানিত না, আজ সে বৌএর খোঁজ নেয়—আজ সে প্রশ্ন করে—"মা কি হোয়েছে গা, এত কান্না কাটী কেন?" "এত বড় স্পর্দ্ধা! "কাঁদে কেন"—"আমি কি জানি" "একটা তুচ্ছ কথা হোয়েছিল বটে"—"বড় মানুষের মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে নিতে এসেছিল বটে—তা আমি পাঠাই নাই—তার আবার কথা কি—এত কান্নাকাটীই বা কিসের—এত নাগানাগিই বা কিসের—আর এত জিজ্ঞেস বাদই বা কিসের!" আজিকার রাত্রির মত কথা বার্ত্তায় ইতি। পরদিন শ্বাশুড়ির মুখ ভার, বধূ কথা কহে না, ছেলে ম্লান—সংসারে আগুণ লাগিল। শাশুড়ির কান্নাকাটী "ছেলে বৌএর বশ, আমায় মানে না" আর "এ কালের বৌ তাই এমন।" "আমরা কেমন লক্ষ্মী ছিলাম"—"সে কালে এমন ছিল না।" এ কথা অশীতী বর্ষীয়া হইতে চল্লিশ বর্ষীয়া সকল শ্বাশুড়ির মুখেই শোনা যায়। তাঁহারাও যে এক সময়ে বধূ ছিলেন এবং এই নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন ইহা তাঁহাদের মনে থাকে না।

তা বলিয়া সকল শ্বাশুড়িই যে বধূ নির্য্যাতন করেন তাহা নহে। মাতার ন্যায় শ্বাশুড়ি

অতি বিরল। সচরাচার শাশুড়ি বধূর সম্বন্ধ এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে শ্বশ্রূ যদি বধূকে নিজ কন্যার মত ভাবেন এবং যত্ন স্নেহ করেন তাহা হইলে সেই বালিকা কখনই তাঁহার অবাধ্য হইতে পারে না। "আমার লক্ষ্মী ঘরে এলেন, এস মা এস," শুনিতে মধুর না ডাক ছাড়িয়া, "ও মা কি পোড়া কপাল, কি অদৃষ্ট, কেবল ঠকালে, কি হবে—ওটা ছোট লোকের মেয়ে—আমি তখনি জানি, বলেছিলুম কর্ত্তাকে যে ওঘরে কোরো না—তা শুনলেন যো এখন ভোগ ভোগে কে?"—বধূ ঘরে না আসিতে আসিতেই যে কিসের এত ভোগাভোগ তা তো ভেবে পাওয়া সুকঠিন। তবে প্রায়ই অনেক স্থলে শাশুড়ি ঠাকুরাণীকে প্রথমেই নিরাশার ভোগ ভুগিতে হয় বটে। কারণ দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র হইতেই পিতা মাতার মনে বড়ই আশার সঞ্চার হয় যে, "বেটা ছেলেটী হোয়েচে আর ভাবনা কি"—"ছেলের বিয়ে দিয়ে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা ঘরে আনিব।" "কপালে কি আছে কি জানি অতও যদি না হয় তবু সওদাগরের কন্যা, আর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া তো হবে?" আশা কল্পনার সাহায্যে বহুদূর ছোটে—কিন্তু প্রকৃত ঘটনার তো দৌড়িবার শক্তি নাই। যখন সত্য সত্যই এক জীবন্ত বৌ বাউটি দিবার কথায় শুধু পৈঁচা হাতে দিয়া দাঁড়ায়, বা চুড়ি দিবার বন্দোবস্তে, ছাল্‌নাতলা পার করা হাল্‌কা খাড়ু হাতে দুদে আলতায় হাজীর হয়, তখন বুকটা কি রকম যে ধড়াস করিয়া উঠে তা তো কেহ বোঝেন না। গহনা লইয়া কান্নাকাটীর পর বধূর রূপের দিকে নজর পড়ে। হাজার সুন্দরী হইলেও এই দুধে আলতার বরণের সময় কোন সুন্দরীই 'পাশ্' হইতে পারেন না। নিখুঁতেরও খুঁৎ বাহির হইবেই হইবে।—নিদেন "বড় রোগা"—"তা হবে হবে, এর পর হবে ভাল"। "বাপের বাড়ি অযত্নে বেড়ায়"—"এখানে আমার কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে পুরবে।" কেহ বলেন—"একবার চেয়ে দেখ' দেখি"—কেহ বলেন "একটু হাস' দেখি" কেহ বলেন "দাড়ির দিক চাপা" কেহ বলে "কপালখানা বড় ছোট"—আহা তখন সত্যই কি সেই বালিকার মনে হয় না—

ফুলের মালা গাছি
বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবে মাত্র সে তাহার জননীর স্নেহমাখা করুণ অশ্রুময় মুখ দেখিয়া আসিতেছে—সবে মাত্র এই তাঁহার স্নেহময় হাত হইতে অপরিচিত হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। "এতদিন আমার ছিল, আজ তোমায় দিলাম" বলিতে বলিতে মাতার বুক ফাটিয়া যে ক্রন্দন উথলিয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনও মনে তীব্রভাবে জাগিয়া রহিয়াছে—"তবে কি সত্যই

আমি পর হইয়া গেলাম" —"তবে বিবাহটা কি উৎসবের নয়," —"তবে মা কি আমায় বনবাস দিলেন," "এমন জানিলে আমি তো বিবাহ করিতাম না!"

আহা, চেলির কাপড় মোড়া, মাথায় ধাণের বোঝা, হাতে জীবন্ত লেঠা মাছ, কক্ষে ঘট, পদতলে দুধ আলতা মিশ্রিত পিচ্ছল থালা, সদ্য পিতা মাতা হইতে উৎসর্গিত ক্ষুদ্র বালিকা যখন আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলিত, তখন তাহার উপর ঝঙ্কার ঝাড়িলে তাহার প্রাণ যে কি চাহে তাহা কি কোন শাশুড়ি কখনো ভাবেন। কিন্তু সকল শাশুড়ি ঠাকুরাণীদেরই যে একদিন এইরূপ বধূবেশে দাঁড়াইতে হইয়াছিল এবং এখনো তাঁহাদের প্রাণাধিকা দুহিতাদেরও যে মাঝে মাঝে ঐ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তাহা কেন যে তাঁহার বিস্মৃত হন ইহার রহস্য আজিও বুঝিতে পারা গেল না। সকলের মুখেই শোনা যায় বটে—"তুমিও যেমন, কুটুমের ধনে আবার কে কোথা বড় মানুষ হোয়ে থাকে!" "বৌটী ভাল হবে, ভদ্র ঘরের মেয়ে হবে, ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে তা হইলেই হোল" কন্যা দেখা আরম্ভ হইল, এ কন্যা ও কন্যা সে কন্যা—কন্যার রূপ আর মনে ধরে না, কিন্তু মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলে দেখা যায় যে রূপায় সন্তুষ্ট হইতেছেন না তাই রূপের দোহাই দিতেছেন! বিশ পঞ্চাশটা দেখিতে দেখিতে, রূপহীনা রূপায় মণ্ডিতা কন্যা, চক্ষে ধূলি প্রদান করিল। তখন ধূয়া ফিরিল—"তুমিও যেমন, গেরস্থ ঘরের বৌ অতরূপে কাজ কি, এত পট নয় যে ঘর সাজান হবে, রূপ কদিন থাকে।" কিন্তু রূপা যে রূপের চেয়েও কম দিন থাকে তাহা মনে নাই—এই বিবাহ উপলক্ষেই যে প্রাপ্ত রূপার অধিকাংশই হস্তান্তরিত হইবে, সে ভাবনা কে ভাবে—ছেলের শ্বশুর বাড়ি থেকে যিনি যত আদায় করিতে পারেন তাঁহার ততই গৌরব বৃদ্ধি হয়, যিনি না পারেন তিনি নিজেকে ধিক্কার ও বধূকে নির্য্যাতন করিয়া তাহার পরিশোধ লন। জানিয়া শুনিয়া কুরূপা বধূ যখন আনা হইল, তখন আবার তাহার নিন্দা করা কেন—কেন তাহাকে হতাদর করা। গহনা পত্র দান সজ্জায় কখনো কখনো কম পড়ে বটে। হয় তো গহনা স্যাকরা দেয় নাই, হয় তো পিতা যথা সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া ওই মেয়েটীর বিবাহ দিয়াছেন—কালিকার খাবার সংস্থান নাই তা আর কন্যাকে দিতে কোথা পাইবেন—মেয়েকে দিতে কি তাঁহার অসাধ, কি করিবেন নিরুপায়। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়া না দিতে পারায়, বালিকা-নববধূর উপর দিয়া শাশুড়ি ঠাকুরাণী নিজ ক্ষমতানুসারে প্রতিশোধ লন। বধূকে নিজ সন্তানের মত মনে করাই কর্ত্তব্য, সুন্দর কুৎসিত সন্তান মায়ের নিকট যেমন সমান আদরের, তেমনি কুৎসিতা বধূকেও আদর করিয়া লইলে ভবিষ্যতে শ্বশ্রূ ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারেন। বরং দুহিতা পর হইয়া যায়, বধূই গৃহলক্ষ্মী নামে অভিহিত হন। কিন্তু কয়জন শাশুড়ি বধূকে গৃহলক্ষ্মী ভাবে গ্রহণ করেন? পরকে আপন করা গৃহিণীর কার্য্য, ক্ষুদ্র বালিকা আপন পর কি জানে, সে যখন মায়ের কাছে যাব' ব'লে কান্নাকাটি

করে তখন "আমি যে তোমার একটী মা, আমায় ফেলে তুমি যেতে চাও!—এস' কোলে করি" বলিয়া যে লক্ষ্মীরূপা শ্বাশুড়ি তাহাকে মিষ্ট কথা বলেন, সে বধূ কি কখনো তাঁহার মমতাময় কথা ভুলিতে পারে, না তাঁহার অবাধ্য হইতে পারে। প্রচলিত কথাই আছে যে বালক বালিকাকে মিষ্ট কথায় বশীভূত করা যায়, তাড়না করিলে কথা শোনে না। আমাদের দেশে ৮ হইতে ১২ বৎসরের বালিকাদেরই বিবাহিত হইতে দেখা যায়। এই সকল ক্ষুদ্র বালিকা মিষ্ট কথায় সহজেই বশীভূত হইতে পারে। তারপর পুত্র যাহাতে বধূকে ভাল বাসেন সেই চেষ্টা সেই ইচ্ছা করাই শ্বাশুড়ির উচিত, কিন্তু অনেক স্থলে তাহার ব্যতিক্রমই দেখা যায়। পুত্র, বধূকে আপনার মনে করে বা স্নেহ দেখায়, কি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায় ইহা অনেক শ্বাশুড়ির চক্ষুশূল। তাঁদের বোধ হয় ছেলে "পর হইল" "ছেলে পর হইল" এই কথাই অনবরত মনে জাগে। অনেক স্থলে বরং নাতবৌএর সহিত দিদিশ্বাশুড়ির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাশুড়ির অজানিত ভাবে দিদিশ্বাশুড়ি নাতি ও নাতবৌএর মিলন করাইয়া দেন। তাঁর ছেলে তো পর হোয়েই গেছে—সে তো যেমন অদৃষ্ট তার ফল ফোলেই গেছে—তা ও কচি বৌটো কেন কষ্ট পায়—আহা এই তো ওর আমোদ আহ্লাদের বয়স! নাতবৌয়ের সঙ্গে বনে মন্দ নহে।

সকলেই জানেন যে নব বিবাহিতদের ঘরে আড়িপাতা একটা চলিত প্রথা। ঠাট্টার সম্পর্কীয়ারাই আড়ি পাতিয়া থাকেন। আর মেয়ের মাও আড়ি পাতিতে পারেন এবং পাতিয়াও থাকেন। কিন্তু পুত্রের মাতাকে পুত্রের ঘরে আড়ি পাতিতে নাই। তাহাতে পুত্রের অকল্যাণ হয়, এবং পুত্র অল্পায়ু হয়। দুহিতা-জামাতায় প্রণয় হয়, জামাতা দুহিতাকে ভালবাসে ইহা সকল মাতারই বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা মেয়ে জামাইকে একত্র দেখিতে অত্যন্ত সুখানুভব করেন, সেই জন্য তাঁহাদের আড়ি পাতায় নিষেধ নাই। কিন্তু বোধ হয় পুত্র-পুত্রবধূর মিলন মাতার প্রীতিজনক নহে, তাহাদের প্রেমালাপ ভাল লাগে না—তাই পুত্রের ঘরে আড়ি পাতা মাতার পক্ষে বিশেষরূপে নিষেধ। কোন নিষেধ যদি না মানা হয় তাই একেবারে পুত্রের পরমায়ুর দোহাই দিয়া রাখা হইয়াছে। অনেক বধূর মুখে শোনা যায় "আমার বৌ হোলে আমি তাকে মেয়ের মত যত্ন করিব।" কিন্তু সে কথা গুলা প্রায়ই বধূ অবস্থায় শোনা যায়—শ্বাশুড়ি শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেই কথা গুলা অন্য রকম হইয়া যায়।—"আমি এত যত্ন করি, কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, বৌ ভাল হোল না।" অবিশ্যি শ্বাশুড়ি যখন নিজে বৌকে ভাত খাওয়াইয়া দেন তখন যত্ন করেন না তো কি—তিনি যখন ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া বড় বড় গ্রাস করিয়া বৌকে খাওয়াইয়া দিতে গেলেন আর সে অত্যল্প খাইয়াই আর খাইতে চায় না—এটা তার দোষ নয় তো কি? কিন্তু ঠাকুরাণী তুমি রাগ করিও না—নববধূ যদি সমস্ত ভাতগুলি তাড়াতাড়ি করিয়া চপলা বালিকার মত খাইয়া ফেলে, তাহহলে তুমিই নাক সিঁটকাইয়া "ওমা রাক্ষুসে ঘরের

মেয়ে" বলিতে ছাড় ? অথবা সে কেন ভাত খাইতেছে না তাহার কি খবর নাও? হয়তো সে ঝাল খায় না, তাহার মা যে তাহার রুচি অনুযায়ী আলাদা খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া তাহাকে দিতেন,তবে সে খাইত। হয়ত সে তাড়াতাড়ি খাইতে পারে না,সে হয় তো আসনের উপর পা ছড়াইয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া আনমনে হুঁহুঁ করিয়া গান করিতে করিতে, নয়তো এলোমেলো ছাইপাঁশ বকিতে বকিতে ভাত খাইত। সে হয় ত "ভোজনীর সঙ্গে বসিত রাধুনীর সঙ্গে উঠিত"—তাহার ভাত খাওয়ায় যে একটী মধুর দৃশ্য, তাহা কেহ যে কত স্নেহময় দৃষ্টিতে দেখিত তা কি তুমি জান, না জানিতে চেষ্টা কর? যখন তার পাশে বসিয়া বাপের বাড়ির দাসী ভয়ে ভয়ে তোমাকে বলিতেছে—"ও বড় মিরি-কুচিরে মা, ও সব সামগ্রী খায় না ও বেশি খেতে পারে না।" তখন পুত্রবধূর মায়ের উপর দোষারোপ করিয়া তুমি কি বল না "ও যেন ছেলেমানুষ, বেয়ান তো জানেন যে মেয়ে মানুষ হোয়ে যখন জন্মেছে, তখন শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। সব রকম খাও-য়াতে শেখাতে হয়, গেরস্থ ঘরের বৌ ঝি, বারমাস পোলোয়া কালিয়া জুটবে কোথা থেকে।" বালিকা-সুলভ চাপল্যে যদি বধূ বলিয়া ফেলে যে আমি তো রোজ পোলাও কালিয়া খাই না, আমি দুদ ভাত খাই—তবেই সকলে অবাক—কি বেহায়া মেয়ে—স্বচ্ছন্দে বের কোনে চোঁপা করিল। এই রকম ভাত খাওয়ার ব্যাপারে সে ভাত খাইবে কি, একে নূতন স্থান,তাহাতে হয়ত রুচির সহিত মেলে নাই, তাহার উপর মায়ের প্রতি দোষারোপ, সে কি অপরাধ বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ সকলের কথায় নিজে কে অপরাধিনী ভাবিয়া হতভম্বা হইয়া পড়ে—মাতার করুণ স্নেহপূর্ণ মুখখানি, স্নেহময় ভাব, আদর-যত্ন মনে পড়িয়া তাহাকে আরও আকুল করিয়া তোলে, তাহার কান্না আসে, কবে মা কি আদর করিয়াছেন, কবে মা কি খাওয়াইয়াছেন, কবে আবার মা তেমনি কোরে খাইয়ে দেবেন, এই সকল যত মনে হয় ততই হুহু করিয়া চক্ষে জল পড়িতে থাকে। কত কথাই মনে পড়ে, একদিন সেই "ছেলেবেলা" (পাঁচ বৎসরের ক্ষুদ্র শিশুও মায়ের গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে "মা আমি ছেলে বেলা কি করিতাম বল্ না") তাহার নিজের ছোট্ট থালাখানি করিয়া ভাত খাইতে বসিয়া যখন ভাতের মধ্যে ছোট একটি আঙ্গুল দিয়া ভাত গরম আছে কি না পরখ করিয়া দেখিল যে ভাত গরম নাই অমনি অভিমানে তাহার বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া গেল। তাহার মা কান্নার কারণ জানিতে পারিয়া কত আগ্রহ সহকারে কত আদর করিয়া গরম ভাত আনিয়া দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কেমন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া তিনি মেয়ের একটা মস্ত কীর্ত্তির মত তাহার বাবার কাছে ঐ গল্প করিয়াছিলেন—বাবা শুনিয়া স্নেহে আপ্লুত হইয়া "এস মা আমার কোলে এস' বলিয়া" কত চুমি খাইয়াছিলেন—এই সকল যত মনে পড়ে, ততই সেই বাবা ও মা আমায় কেন পর ক'রে দিলেন এই

প্রশ্ন মনে উদয় হইয়া অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে,—তখন "ওমা ভাত কোল্লে কোরে কাঁদতে নেই, অকল্যাণ হবে। না খাও না খাবে, দুপুর বেলা কাঁদতে হবে না—শ্বশুর ঘর সবাই করে—তুমি আজ কেবল আসনি।" এই সকল সান্তনায় কান্না বাড়ে কি কমে—তাহা হে বধূ তোমরাই বলিতে পার।

এই নববধূ অবস্থায় বর একটু বধূকে যত্ন করেন। অনর্থক ছোট মেয়েটী কাঁদিতেছে, তাহাকে জবরদস্তি আটকাইয়া রাখিবার আবশ্যকতা কি। বিশেষ, বিবাহের রাত্রে শ্বাশুড়ির আদর যত্নে এবং "আজ আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পাইয়াছি" কথায় একটু টানও পড়ে। বর-কন্যা বিদায়ের সময় শ্বশুর-শ্বাশুড়ির কান্নায় বরের মনেও করুণ ভাব উদিত হয়। প্রায়ই দেখা যায় হাতে হাতে সমর্পণের সময় বরও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন না। আরো কনেকেও আপনার জন, আপনার জন বলিয়া মনে হওয়াতে বর একটু কনের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাহার কান্না-কাটিতে "আচ্ছা তোমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বোল্‌বো" বলিয়া আশ্বাস দিয়া ঘুম পাড়ান্। তখন তাহার প্রতি প্রেমের উদ্রেক তো হয় না, মমতার উদ্রেক হয়। আর ভবিষ্যতে প্রেমের সম্বন্ধেও বরকে নিজ বাটিতে একটু ভয়ে ভয়ে একটু লজ্জায় থাকিতে হয়, কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে অনায়াসেই দিবা রাত্র যখন ইচ্ছা স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান। সেখানে ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে হয় না পাছে কেহ আড়ি পাতিয়া শোনে। সেখানে অবাধে ইচ্ছামত প্রণয়োপহার দেওয়া চলে। অনেক মাতা পুত্রকে নিতান্ত লাজুক ভাবিয়া এবং পুত্রবধূ হইতে পৃথক শয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন। "আমার এমন সোণার ছেলে যে বো এরদিকে ফিরে দেখে না—ঘরে শুতে যেতে চায় না। আমরা জোর কোরে দি। তা ভাবিনী আড়িপেতে দেখেছে বাছা একটি কথাও কয় না। বৌটো বেহায়া, ঘরে যেতে বল্লেই যায়।" কিন্তু তিনি তো জানেন না, যে তাঁর স্নেহাস্পদ কি রকম জুয়াচোর—যতক্ষণ না তাঁহারা নিদ্রা যান ততক্ষণই তিনি চুপচাপ থাকেন। তিনি তো জানেন না যে ঐ লাজুক বেচারি শ্বশুর বাড়ি গিয়া কেমন সারারাত ধরিয়া গল্প করেন এবং বেল ফুলের মালা লইয়া সাদরে প্রণয়িনীর মাথায় জড়াইয়া দেন। বধূর শ্বশুর বাড়ি যাইতে হইলে মহা ভাবনা উপস্থিত হয় কিন্তু সকলেই জানেন যে বরের শ্বশুর বাড়ি না যাওয়া হইলে কত কষ্ট হয়। যত্নই যে ইহার মূল সে বিষয়ে সন্দেহ কি। শ্বাশুড়ি বধূকে দাসী ভাবে দেখেন, জামাতাকে শ্বাশুড়ি প্রাণাধিক বোধ করেন। এক পক্ষের ভার বেঁচে থাক কত বৌ হবে—অপর পক্ষে "জামাই সুখে থাকলে তবে মেয়ের সুখ!" জামাই আদরে যত্নে শ্বাশুড়িকে মা বলিয়া মনে করেন, বধূ লাঞ্ছনা খাইয়া শ্বাশুড়িকে বাঘিনী মনে করেন।

যাহা হউক যত্নে যে পরকে আপন করা যায়, ইহা কিছু নূতন নহে। ভালবাসার জনই আপনার হয়। যাহাকে স্নেহ করা যায় সকলের অপেক্ষা সেইই আপনার হয়।

স্বামী স্ত্রীতে যতটা নিকট সম্বন্ধ এত কাহারও সহিত যে হয় না ইহা সকলই জানেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমাদের দেশে কোন প্রকার রক্তের সংশ্রব নাই।

শ্বাশুড়ি-বধূর সম্বন্ধ এই যে শ্বাশুড়ি বধূকে যত্ন স্নেহ করিবেন, বধূ ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু যত্ন স্নেহ না পাইলে ক্ষুদ্র বালিকার মনে ভক্তির সঞ্চার কি রূপে হইবে? প্রথমে শ্বাশুড়িরই যত্ন করা কর্ত্তব্য—যত্ন করা কিছু কঠিন নহে—যত্ন যাহাকে তাহাকে করা যায়—কিন্তু ভক্তির ভাব না আসিলে ভক্তি করা বড় কঠিন। শ্বাশুড়ির মনে প্রথমে স্নেহের উদ্রেক না হইতে পারে কিন্তু যত্ন করিতে তো পারেন—পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা কহিলে, তিনি তাহাতে রসান না দিয়া, তাঁহাদের থামাইতে পারেন। যত্ন করিতে করিতে তিনিও যত্ন পান—ক্রমে তাঁহারও স্নেহের সঞ্চার হয় বধূও ভক্তি শ্রদ্ধা, সেবা শুশ্রূষা করে। সে বাপের বাড়ি যাবার জন্য ব্যাকুল হয় না। সে হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া, "আমার শ্বাশুড়ি আমায় কত ভালবাসেন" বলিয়া মাতার ভয় দূর করিয়া মাতাকে সুখী করিতে পারে। শ্বশুর বাড়ির লোক দেখিলে ভয়ে প্রাণ শুখাইয়া যায় না, পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসেনা, সে হাসিতে হাসিতে "মা কি কচ্ছেন" জিজ্ঞাসা করে,—জিজ্ঞাসা করে, আমায় বুঝিতে নিতে এসেছিস্।" নহে তো বলে "মাকে বলিস্ আমায় নিয়ে যেতে, খোকার এখানে বড় কষ্ট হ'চ্ছে।"

নবীন যৌবনে বোধ হয় সকলেরি স্বামীর কাছাকাছি থাকিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু শ্বাশুড়ির বাক্যযন্ত্রণায় সে সাধ মনেই বিলীন হইয়া যায়। স্বামীর সঙ্গে যে রাত্রে দেখা হইবে, তাহাও অনিশ্চিত। সমস্ত দিন ঝালাপালা হইয়া রাত্রে যে একটু শান্তি পাইবে তাহারি বা স্থিরতা কি। হয় তো পুত্র বাড়িতে পদার্পণ মাত্রেই, মাতা বধূর নানাবিধ দোষ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে দোষের হয় তো কতক সত্য, কতক ভুল, কতক বাড়াইয়া বলা হইল। প্রভুও অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া রহিলেন। গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে যাইতে না যাইতে স্বামী মহা-রাগত ভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, সে কাঁদিয়া ফেলিল, প্রতিবাদ করিবে হয়ত ভাবিয়া আসিয়াছিল—বক্তৃতার চোটে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই বলা হইল না। কিন্তু এ অভিমান তো ঘোর অভিমান নহে যে মনের কথা মনেই থাকিবে। অভিমান ভঙ্গে সে যদি নিজ দোষ কাটাইতে পারে বা শ্বাশুড়ির ভুল বা দোষ দেখাইতে পারে, তাহা হইলে সুতরাং স্বামী তাহারই পক্ষপাতী হয়েন। নিজে না জানিয়া শুনিয়া অনর্থক রাগ করিয়াছেন ধমকাইয়াছেন, মনে করিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পড়েন। মাতাকেই এই সকল গোলোযোগের মূল মনে করিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাঁহার মাতা কতক কতক বুঝিতে পারিয়া আরও জ্বলিয়া উঠেন—ছেলেকে কিছু বলিতে না পারিয়া বধূকে আরও যন্ত্রণা দেন। কাজেই স্বামীর কাছে থাকা অপেক্ষা বাপের বাড়ী যাওয়া সহস্র গুণে ভাল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাপের বাড়ি যাওয়া সুকঠিন—শ্বাশুড়ি সহজে স্বত্ব

ছাড়েন না– লোকের উপর লোক, অনেক সই সুপারিষে তবে ৮ দিনের কড়ারে যদি পাঠালেন তো যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইল।

"দেখো গো বড় মানুষের মেয়ে যেন আট দিন সওয়ায় নয় দিন হয় না, তা হোলে এ জন্মে আর হরি ঘোষের বাড়িমুখো হ'তে দেবো না।" বিদায়ের প্রণামের আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে এই সরোষ আদেশে তাহার বাপের বাড়ি যাবার আনন্দ কমিয়া যায়। আট দিন তো বিদ্যুতের মত অতি শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। এখনো তো মাকে কোন কথাই বলা হয় নাই। মামার সঙ্গে দেখা হইল না। মাসীমার বাড়ি যাওয়া হইল না—কই কিছুই তো হইল না।—নয় দিনের দিন সকালেই শ্বশুর বাড়ির দাসী আসিয়া হাজির। আর দেরি সহে না। দাসীরই বা গর্ব্ব কত!! মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোক বলিয়া এ বাড়িতে তাহার আদরই বা কত! এস' এস' শ্যামা যে, বস' বস'—বেয়াই কি করছেন, বেয়ান কেমন আছেন, ছেলেপুলেরা সব ভাল তো। পুঁটুকে নিতে এসেছ তা বেশ তো, সেই ঘরই জন্ম জন্ম করুক, তা নয়, আর দুদিন রাখ্‌লে হোত। তা এ বেলা না খাইয়ে দাইয়ে কেমন কোরে পাঠাই—ও বেলা নিয়ে যেও।" আর কোথা আছে –শ্যামা অমনি তিরিবিরি করিয়া উঠিল—আমি ব'সতে না গো "আমার এখন সব কর্ম্ম পোড়ে রয়েছে—আমি বল্লুম যে তোমার বেনের সেই ধারা জানতো, মাঠাকরুণ, এ বেলা পাঠালে অতক্ষণ, সেই যার নাম রাত দশটা– তবু আমার কথা শুন্‌লেন না"———বলিতে বলিতে প্রস্থান—পরে পুনঃ প্রবেশ– ওগো আমি আস্‌তো নারবো, বিকেলে আপনারা রেখে এস—যেন সেবারের মত রাত টাত হয় না" এই আজ্ঞা করিয়া হাত দুলাইয়া বকিতে বকিতে এবার নিঃসন্দেহ প্রস্থান। যদি ধনীর বধূ হন্ তবে এক দাসী এক চাকর, এক দরওয়ান ও এক ঘেরাটোপ মোড়া পাল্কি হৈ হৈ করিয়া আসিয়া হাজীর। "ঐরে তোকে বুঝি এ বেলাই নিতে এল।" যমের দূত ফিরানো যায়, এ পাল্কি ফিরায় মা বাপের সাধ্য নাই। কচি মেয়ের কান্নাকাটীতে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ আর দু চারি দিন সময় চাহিয়া বিনীতভাবে পাল্কি ফিরাইয়া দেন তাহা হইলে তাহার ফলে এই হয় যে কতক গুলা কটুক্তি শুনিয়া সেই দিনই মেয়েটীকে জবরদস্তি ধরিয়া বাঁধিয়া শ্বশুরালয়ে দিয়া আসিতে হয়। আর বালিকার লাঞ্ছনা আরও বাড়ে। কিন্তু শাশুড়ি বধূতে স্নেহের সম্বন্ধ থাকিলে শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় চির প্রচলিত রোদনের পরিবর্ত্তে সকলেই হাসিতে হাসিতে যাইতে পারে। শাশুড়ি ঠাকুরাণী যদি বধূ বরণের সময় বধূর কর্ণে মধু না দিয়া নিজে মধুর বাণী বলেন তো বধূর চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। হায়! কেন সকলে কুন্তীর ন্যায় শাশুড়ি হন না? মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহের পর "মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলীপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলে" কুন্তী আশীর্ব্বাদ করিলেন—বৎসে ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি,

স্বাহা বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতি বশিষ্ঠের প্রতি, এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী প্রণয়বতী হইয়াছেন তুমিও ভর্ত্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও—হে ভদ্রে, তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামী সহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎসে তুমি অতিথি, গৃহাগত সাধু, বালক বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত হইয়া কাল যাপন করিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজা অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বামীদিগের বল-বিক্রমার্জ্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কাল যাপন করিবে। হে বৎসে অদ্য তোমাকে যেমন অভিবাদন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্ব্বার এইরূপে অভিবাদন করিব।" কুন্তী পুত্রও পুত্রবধূর মিলন বাঞ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহার পুত্রেরা বধূতে অনুরাগী হন এমন সকল উপদেশ তিনি বধূকে দিলেন। বধূকে যত্ন স্নেহ করা যেমন কর্ত্তব্য—শিক্ষা দেওয়াও তেমনি কর্ত্তব্য; বালিকা বধূ কার্য্যাক্ষম হইলে "তুমি কেমন ঘরের মেয়ে মা—কিছু জান' না—আর তোমার মাই বা কেমন যে কাজ কর্ম্ম কিছু শেখাননি।" শাশুড়িদের মুখে এই কথাই শোনা যায়—বধূকে শিক্ষা দেওয়া যেন তাঁহার কাজ নহে। বধূ বাপের বাড়ি হইতে সকল শিখিয়া আসিয়া তাঁহার ঘরে দাসীর মত যদি খাটে তবে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন।

কুন্তী দুই চারি কথায় বধূর কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন, নিজ স্নেহ জানাইলেন—তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুন্তী দ্রৌপদীকে এত ভালবাসিতেন যে পাণ্ডবেরা দুঃখ ভোগ করিতে আরম্ভ করিলে দ্রৌপদীর জন্য তাঁহার যত কষ্ট হইয়াছিল, এত কষ্ট নিজ পুত্রদের জন্য হয় নাই। উদ্যোগ পর্ব্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন "হে বাসুদেব ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা দ্রুপদনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় সভামধ্যে আনীত হইয়া বিবিধ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া আমি যাদৃশ দুঃখিত হইয়াছি, দ্যূতে পরাজয়, রাজ্য হরণ ও পুত্রগণের নির্ব্বাসনের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখিত হই নাই।" বনগমনের সময় কুন্তী কহিতেছেন—

"হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে—
কৃষ্ণা, তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবে কেমনে।"

দ্রৌপদী যেমন শ্বশ্রূর স্নেহ পাইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও ভক্তি করিতেন। দ্রৌপদী যে কতদূর তেজস্বিনী গর্ব্বিতা মহিলা ছিলেন তাহা তাঁহার নিজ মুখেই মহাভারতকার ব্যক্ত করাইয়াছেন—উদ্যোগ পর্ব্বে দ্রৌপদী যুদ্ধের নিমিত্তে কৃষ্ণকে কহিতেছেন "হে মাধব এই ভূমণ্ডল মধ্যে আমার তুল্য কামিনী আর কে আছে? আমি দ্রুপদ রাজার যজ্ঞ সম্ভূতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী আজমীঢ়কুল-সম্ভূত পাণ্ডু রাজার স্নুষা ও ইন্দ্রসম তেজস্বী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী ইত্যাদি" এই তেজস্বিনী দ্রৌপদীও শ্বশ্রূর

জন্য চন্দন পেষণ করিতেন। কীচক বধে ভীমকে উত্তেজনা করিবার সময় দ্রৌপদী কহিতেছেন "আর এই একটী দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে আমি আর্য্যা কুন্তী ব্যতিরেকে কদাচ কাহারও গাত্র-বিলেপন পেষণ করি নাই।" ইত্যাদি আরও কহিতেছেন "আমি আর্য্যা কুন্তী ও তোমাদিগকে কখনো ভয় করি নাই" শাশুড়িকে ভয় করি না কথাটা নূতন বটে—কিন্তু কেমন মধুর! শ্বশ্রূ-বধূতে মাতৃ-ভাব কুন্তী দ্রৌপদীতে জাজ্বল্যমান।

বুদ্ধিবিকাশ।

পরিণতিবাদে সৃষ্টি বা স্রষ্টার আবশ্যক আছেও নাইও। যখন কোন বস্তু বিশেষ, অবস্থা বিশেষ সময় বিশেষ প্রভৃতি স্বীকৃত তখন সৃষ্টির আবশ্যকতা একবারেই যাইতেছে না। যাহার পরিণতিতে এই বিপুল বিশ্বসংসার দেখিতেছি, তাহার উৎপত্তির মীমাংসায় সৃষ্টি প্রভৃতি আসিতে পারে। পরিণতিবাদীর মধ্যে যাঁহারা সেশ্বর তাঁহারা এই রূপই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর এই নিয়মেই জগতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। পরিণতি নিয়মই তাঁহার সৃষ্টি প্রকরণ। তিনি সেই নির্গুণপ্রায় নিরাকারপ্রায় সত্তার সৃষ্টি করিয়া পরিণতি প্রণালীতে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। পরিণতিতে সময় একটী সমবায় কারণ। সিন্ধুকীট হইতে আজ অন্য উচ্চতর প্রাণী হয় না কেন? উত্তর সে সিন্ধুকীট নাই—সে সময়ও নাই। কিন্তু পরিণতিবাদকে আবার নিরীশ্বরও বলা যায়--যাহাতে একটী মাত্র বস্তু জগতের আদিতে স্বীকৃত তথায় ঈশ্বর কোথায়? সে বস্তু ঈশ্বর নহে। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত না হইলে ঈশ্বরত্ব নাই। স্পেন্সরের শক্তি ঈশ্বর, কিন্তু অনেকেই মধ্যাকর্ষণ প্রভৃতির ন্যায় ব্যাপারকে ঈশ্বর পদবাচ্য করিতে চাহেন না। প্রফেসর ম্যান্সেল অন্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন পরিণতিবাদে তাহা প্রয়োগ করা যায়।

"His God (so far as he acknowledges one at all) is not the first principle and cause of all things, but the aggregate of the whole—an universal substance underlying the world of phenomena, or an universal process carried on in and by the changes of things. Hence, as Aristotle said of the Eleatics, that, by asserting all things to be one, they annihilated causation which is the production of one thing from another ....."

Philosophy of the Conditioned.

স্পেন্সর ঈশ্বর ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ছায়া ধরিয়াছেন। তাঁহার শক্তি বেদান্তের ব্রহ্মের অপভ্রংশ। সাদৃশ্য অস্থির ও আস্থায়ী—তাহাকে বিসদৃশ হইতেই হইবে। কেন? পরিণতিতে নানা জীবদেহের ব্যাখ্যা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি তাহাদের আকার, অবয়ব ও গঠনের মীমাংসা আছে? মাধ্যাকর্ষণে কি গ্রহনক্ষত্রের আকার, প্রকার ও দূরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? মনে কর মানুষ কীট বিশেষ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু মানুষের আকার নানা অবস্থাগত কাণ্ড। * পুনশ্চ জীবদেহ বিশুদ্ধ জড়-প্রকৃতিপ্রসূত ব্যাপারের সহিত বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। জড়পদার্থের কার্য্য সর্ব্বত্র সমান—ভূতত্ত্বের সমস্ত বিশাল কালই সমান; কিন্তু প্রাণী সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে বিভিন্ন। এ প্রকার দ্বিবিধ প্রণালীর ঘটনায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে জীবদেহ স্বতঃ পরিবর্ত্তনীয়; কিন্তু বিশিষ্ট জড় কারণের বিশিষ্ট কার্য্য অপরিহার্য্য। জৈবনী পদার্থ বিশেষ (Protoplasm) রসায়নে সদৃশ বস্তু বলিয়া থাকে, কিন্তু যদি কোন ডিম্বিকায় মানুষ হয় এবং অপরে মৎস্য, তাহা হইলে ডিম্বিকাদ্বয় স্বতন্ত্র প্রকৃতির অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা এতাদৃশ পার্থক্যের কারণ নাই। পরিণতিবাদে যত সমস্যা পূর্ণ হইয়াছে মনে করা যায়, তদপেক্ষা বহু সংখ্যক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে কোন জীব বিশেষের ব্যাখ্যা নাই। জগতের সাধারণ নিয়ম হইয়াও ইহা অসংখ্য কারণ ও অবস্থার জটিল ভাব আবির্ভাব করিয়াছে। ডার্বিণ ও স্পেন্সরের গ্রন্থে অনেক অস্থিত পঞ্চ আছে। মনেকর লতাবিশেষের জনন ক্রিয়া মক্ষিকা দ্বারায় সংসাধিত হয়; কিন্তু কেন এরূপ হয় তাহার ব্যাখ্যা কোথায়? সে লতারই বা অন্য লতার মত জনন প্রক্রিয়া না হইল কেন? পতঙ্গের জন্যই বা তাহার এ অবস্থা কেন? পদার্থ বিশেষ ঐরূপ হইল কেন? ভিন্ন রূপ তো পরিণতির আভরণ—তাহা না হইবার কারণ কি? অসংখ্য রূপ অসংখ্য কারণ সাপেক্ষ; তবে এক কারণে অসংখ্য অবস্থায় অসংখ্য রূপের ব্যাখ্যাও হইতে পারে। কিন্তু যাহাকে অবস্থা বলা যায় তাহাও এস্থলে কারণ পদবাচ্য। সুতরাং সেই অবস্থার নিরাকরণ না হইলে কারণ বুঝিলাম না। তাই বলি জগতের উৎপত্তি-কারণ জগতের অন্তস্তলে চিরতিমিরে আবৃত আছে ও থাকিবে। উহার মীমাংসা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য।

অসংখ্য অনুভূতি, চিন্তা, প্রবৃত্তি, প্রভৃতির সমন্বিত ভাবের নাম অহং। সেই অহং জ্ঞানই সকল একত্বের মূল। মানুষ আপনার মত বিশ্বসংসারকে ভাবিয়া থাকে ও ভাবিতে যায়। সুতরাং একাত্মিক ব্যাখ্যা নহিলে তাহার মনের তৃপ্তি হয় না। তাহার

---

* From the same cause acting according to the same laws, the same results will follow; but from different causes acting according to the same laws, different results will follow."—Prof. Jevons.

আমিত্বের দোসর পায় না। দর্শন সেই একাত্মিক জ্ঞানের জন্য লালায়িত। পাইবার প্রত্যাশা ও বিশ্বাস আছে। না পাইলেও পাইয়াছি মনে করিয়া যোড়তাড় দিয়া আবশ্যক-মত একটা গড়িয়া লয়।

প্রত্যেক অস্তিত্ব রাজ্যে ক্ষুদ্রাকারে পরিণতি আছে। চিত্তের সন্তোষ জন্য বিজ্ঞান দর্শন পশ্চাৎ ফেলিয়া সকল অস্তিত্বকে আমরা এক বিশাল সাম্রাজ্যে সন্নিবেশিত করিয়া থাকি। বুদ্ধদেব তাই প্রেমে বিহ্বল হইয়া জন্ম জন্মান্তরেও কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। জগতের উন্নতিও পরিণতির একটী শাখা। কিন্তু পরিণতি নিয়মে তাহার কোন নিদর্শন বা বন্ধন নাই। এ নিয়মে এমন কি আছে যে আমাদের আশা ভরসা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে বলিতে পারি? যাহা হউক পরিণতিবাদে আদিপ্রকরণ একেবারেই মিটিতেছে না। ইহাতে সৃষ্টি, স্রষ্টা, প্রভৃতির অনাবশ্যকতা আদৌ বুঝায় না। যখন প্রারম্ভ স্বীকৃত তখন সৃষ্টির বা আদিকাণ্ডের আবশ্যক একবারেই যাইতেছে না। সুতরাং পরিণতিবাদকে কোন প্রকারেই বিশ্বের আদি ব্যাখ্যা বলা যায় না।

বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন নানা বিসংবাদিত মত আছে, অথচ সত্য নিরাকরণের পক্ষে কেহই বিশেষ সমর্থ নহে, বিশ্বের প্রকৃতি লইয়াও সেই প্রকার নানা মত প্রচলিত আছে। আবার নূতন সমস্যা—নূতন রহস্য। কেহ বলেন বিশ্ব জড়ময়; শক্তি, জীবন, চৈতন্য, প্রভৃতি তাহার গুণ মাত্র। কেহ বলেন বিশ্ব চৈতন্যময়, মনোময়, শক্তিময়; প্রতি মুহূর্ত্ত জড়ের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অনন্ত লীলা করিয়া থাকে। কেহ বলেন বিশ্ব কিছুই নহে—মায়ামাত্র—সকলি অনিত্য—অযথা—অসৎ—স্বপন—আকাশকুসুম; ইহার সার তত্ত্ব কিছুই নাই। শুভ্রদৃষ্টি স্থিরমতি লোকে ইহার অবিচ্ছিন্ন জড়শক্তিময়, শরীরচৈতন্যময় ভাব লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন আমরা সার, সত্তা, স্বরূপ, তন্মাত্রের কিছুই জানিতে পারি না। আমরা প্রত্যক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ—আমাদের সে প্রয়াস পাওয়া ধৃষ্ঠতা মাত্র। আমরা যেমন যেমন দেখি, বিশ্বকে সেই রূপই ভাবিয়া থাকি। প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই নির্ভর করে। জগতের দৃশ্য, রূপ বা মায়া (phenomena) লইয়া আমাদের ব্যবসায়; সুতরাং অসতের নিয়মই আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রাণ; সৎ, স্বরূপ, তন্মাত্র আমাদের জ্ঞানাতীত, মনাতীত ও ধ্যানাতীত বিষয়। আর্য্যদর্শনে এই জন্য প্রকৃতি পুরুষের তন্ময় ভাবকে পরিদৃশ্যমান জগৎ বলে। সকল বিশাল তত্ত্বই সেই জড়শক্তিময় ভাবেরই সংশ্লেষ বিশ্লেষ মাত্র। এ বিষয়ও আমরা অবসর মত আলোচনা করিব। তবে এক্ষণে দুই একটী কথা মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। জড়ময় বিশ্ব শক্তি পার্থক্যে আমাদের উপলব্ধি নাই। জড়ের আমরা যাহা কিছু জানি সমস্তই শক্তি ব্যঞ্জক। সম্মুখস্থ বৃক্ষে দৃষ্টি পড়িল, স্পর্শে প্রতিরোধ অনুভূত হইল; বলে হস্ত প্রসারণ করিলাম, তবু প্রতিরোধ—সেই প্রতিরোধে জড়ের জ্ঞান হইল। প্রতিরোধ মন হইতে

অপসৃত কর, আর কিছুই নাই। আবার যাঁহারা শক্তিময় বলেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। আচার্য্য স্পেন্সর ইহার আধুনিক নেতা। যেখানে নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—ব্যবধান নাই—ব্যাপ্তি নাই—সেখানে প্রতিরোধ থাকে কই? যাহার অবস্থান নাই তাহার প্রতিরোধ কই? যেখানে বৃক্ষ আমার হস্ত প্রতিরোধ করিল সেইখানে সে সকলেরই সকল সময় প্রতিরূপ করিবে। আকাশে বা শূন্যে শক্তি প্রকাশ বা সঞ্চালন আমাদের ধারণায় আইসে না, তাই নিউটনের ইথর কল্পনা করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। সূর্য্য কিরণ অনন্ত আকাশ বিচরণ করিয়া ধরায় সেই ইথর সাহায্যে অনায়াসেই আইসে বলিয়া উপলব্ধি হইল। আমাদের ধারণায় জড় ব্যতীত শক্তি প্রবাহ নাই বলিয়াই এই কল্পনার আবশ্যক। সুতরাং জড়শক্তিময় দ্বৈত ভাবই আমাদিগের চিন্তনীয়।

জড়জগতে ও জীবজগতে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। জড়-জগৎ অপসৃত করিলে জীব জগৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবজগতের অস্তিত্ব জড়জগৎ সাপেক্ষ। কিন্তু জড়জগৎ জীবজগৎ সাপেক্ষ নহে। সুতরাং পরস্পর সমবায় সম্বন্ধেও আবদ্ধ নহে। অপিচ জীব জগৎ জড়জগতের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনও নহে। জীব-জগৎ ব্যতীত জড়জগতের বিদ্যমানতা আমাদের ধারণায় আইসে; কিন্তু জীবজগতের বিদ্যমানতা জড়জগৎ ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। এই অবধি বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ফলে জড়জগৎ ভিত্তি বা মূল; জীবজগৎ অট্টালিকা বা বৃক্ষ। যেমন ভিত্তি না থাকিলে অট্টালিকা থাকিতে পারে না, মূল না থাকিলে বৃক্ষ থাকে না; তেমনি জড়-প্রকৃতি ব্যতীত জীবলীলা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু অট্টালিকা নাই ভিত্তি আছে, তেমনি জীব নাই জড়শক্তি আছে এরূপ চিন্তা অসম্ভব নহে।

কেহ বলিতে পারেন জড়জগৎ বলিলেই জীবজগৎ স্বতঃই আসিয়া পড়ে। বিষয়ী না থাকিলে বিষয় থাকে কই? জ্ঞান মাত্রই জ্ঞানীর আবশ্যক। যথায় জ্ঞান নাই, তথায় আবার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব কি? জড়জগৎ বলিলেই জীবজগৎ ধারণায় অপরিহার্য্য; সম্বন্ধসূত্রে অনিবার্য্য। জীব সম্বন্ধে জড়, জড় সম্বন্ধে জীব। নতুবা ধারণা কোথায়? ধারণা মাত্রই ধৃতবান্ সাপেক্ষ। সুতরাং জড়জগৎ ও জীবজগৎ সমবায় সম্বন্ধে গাঁথা। অপিচ সম্মুখস্থ পর্ব্বত, গাত্রস্থ বস্ত্র, হস্তস্থিত কুসুম, প্রভৃতির অস্তিত্ব আমার প্রত্যক্ষের সহিত গাঁথা, তাহাদের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব আমার অনুভূতি সংশ্লিষ্ট; নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা ধারণায় নাই আর আইসেও না।

অস্তিত্ব ও অস্তিত্ব-জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক সামগ্রী। যাহাকে কখন দেখি নাই বা জানি নাই, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। যাহা কেহ কখনও দেখেন নাই, জানেন নাই বলিয়া তাহাও "নাই" বলা মূঢ়ের কর্ম্ম। বিচক্ষণে দেখি নাই বা জানি নাই বলিবেন। নতুবা সত্যের ব্যাঘাত জন্মে। "দেখি নাই" বা "জানি নাই" কে একবারে

"নাই" বলিবার অধিকার নাই। যাহাকে দেখি নাই তাহাকে দেখি নাই বলা
ন্যায্য। তবে অন্য কারণ থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র। আকাশ কুসুম কেহ কখ
দেখেন নাই; সুতরাং আকাশকুসুম দেখি নাই বলিলাম। প্রত্যুত আকাশ-কুসু
কবির কল্পনা—নাস্তিত্বের উপমান, সুতরাং নাই বলিলে ক্ষতি নাই। সেইরূপ নাস্তি-
ত্বের কারণ না থাকিলে "নাই" বলা যায় না। দেখি নাই, শুনি নাই, জানি নাই,
নাস্তিত্ববাচক নহে।

সম্মুখস্থ আলেখ্য দেখিতেছি। আমি চক্ষু মুদিলাম, আলেখ্য রহিল। পুনশ্চ চক্ষু
চাহিলাম, আলেখ্য তদ্রূপ ও তদবস্থায় দেখিলাম। আমি চলিয়া গেলাম, আলেখ্য
তেমনি রহিল। আর আর যিনি তথায় আসিলেন বা আসিয়াছিলেন সকলেরই তদ্রূপ
আলেখ্য প্রত্যক্ষ হইল। এস্থলে আমাদের প্রত্যক্ষ ব্যতীত আলেখ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব
অনুমানসিদ্ধ। আমরা সকলেই চলিয়া গেলাম, তাহাতে আলেখ্যের ব্যত্যয় হইল
না—হইবেও না। সুতরাং তাহার অস্তিত্ব-বিশেষ মনে ধারণা করা যায়। অপিচ
মায়াবাদী ব্যতীত সকলেই আলেখ্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অবসর
মত একথার আলোচনা করিব।

এক্ষণে জীবজগৎ জড়জগৎ সাপেক্ষ এবং জড়জগৎ জীবজগৎ সাপেক্ষ নহে, ইহার
কতক বুঝা গেল। মরুভূমে কোন জীব নাই, বৃক্ষাদি নাই,—একথা ধারণায় আইসে; কিন্তু
জীব আছে অথচ জল নাই, বায়ু নাই, মৃত্তিকা নাই, সূর্য্য নাই, ইহা কল্পনায় আইসে না।
কোম্‌ত বলেন জাগতিক জ্ঞানে মনুষ্য পূর্ব্বসিদ্ধ; নতুবা জ্ঞান কাহার? কিন্তু জগৎ মনুষ্য
সাপেক্ষ নহে, মনুষ্য ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের ব্যত্যয় হয় না। অনেক নক্ষত্র আছে যাহা
আদৌ মনুষ্যেরই বাসোপযোগী নহে। আবার মনুষ্য জগৎ সাপেক্ষ বটে; অর্থাৎ মনুষ্যের
অস্তিত্ব জগতের অস্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; কিন্তু তত্রাপি মনুষ্য জগতের
অবশ্যম্ভাবী ফল নহে। জৈবনিক শক্তির বিশিষ্টপ্রকৃতি ও স্বতন্ত্র ভাব পরিহার করি-
বার জন্য জড়বাদীরা জীবদেহের উপর জড়শক্তির যে প্রকার আতিশয্য দেখাইয়াছেন,
তাহাতে তত্ত্বের বিশেষ দুর্দ্দশা হইয়াছে। এ প্রকার কল্পনা তাঁহার মতে নিতান্ত
বাচালতা মাত্র—বিজ্ঞানোপযোগী নহে।

যাহা হউক, এই জড়জগতের ও জীবজগতের সম্বন্ধ নিরাকরণ জন্য আবহমান কাল
নানা প্রকার মত ও যুক্তি চলিয়া আসিতেছে। উক্ত নানা প্রকার মতের মধ্যে পরিণতি
বাদটী সুন্দর। উহাতে যুক্তির ছটা বিজ্ঞানালোকে অনেকটা বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী হই-
য়াছে। অবশ্য সকল মত গুলিতেই সময়োচিত, অবস্থা সঙ্গত, বিজ্ঞানানুমোদিত গবেষণা
আছে। উনবিংশতি শতাব্দীর বিজ্ঞানসূর্য্য ডার্বিণ কালপুষ্ট পরিণতিবাদকে যে প্রকার
আলোকময় করিয়াছেন,তাহা আলোচনা করিলে চিত্ত বিমোচিত হইয়া যায়। কিন্তু তত্রাচ
জীবজগতের ও জড়জগতের একতা সম্পাদনে কেহ কখন কৃতকার্য্য হন নাই এবং

হইবেনও না। জড়ের পরিণামে কখন ও কেহ জীবন লক্ষণ দেখিতে পান নাই। দেখা
দূরের কথা, অনুমানেও আইসে না। হতদর্প কল্পনা এই মহান্ সমস্যা পূরণে নিতান্ত
অক্ষম। বিজ্ঞানমদে বিহ্বল হইয়া অনেকে জড়শক্তিতে জীবনীশক্তির উদ্ভাবন করিতে
গিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হয়েন নাই, বলা বাহুল্য। মহামতি টমসন্ পরিণতির অনন্ত
চক্র পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে জীবজগতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং স্বপ্নোত্থিতের
ন্যায় গগনমার্গে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন 'জীবাণু' অবশ্যই স্বর্গ হইতে আসিয়াছে।
রাশিচক্রে রাশি রাশি সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, নক্ষত্র, প্রভৃতি প্রলয় বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা
সহসা চক্ষে দেখিতে না পাইয়া পরস্পর বজ্রনিনাদে মাথা ঠুকিয়া কপাল ভাঙ্গিয়া ফেলি-
য়াছিল, সেই ভগ্নাংশের কণামাত্র পৃথিবীতলে আসিয়া পড়িল। তাহাতে নিশ্চয়ই
জীবাণু ছিল। সেই জীবাণু হইতেই আজ জগতে এই অসংখ্য আমানুষ জীব লীলার
উৎপত্তি। অমনি সাবাস! সাবাস! বলিয়া ইয়ুরোপময় করতালি পড়িয়া গেল। জীব-
রহস্য ভেদ হইল! প্রাগল্‌ভতা আর কত দূর যাইতে পারে? পণ্ডিত লোকে নানা যুক্তি
দ্বারায় স্বর্গ হইতে রপ্তানী বুঝিলেন; অবোধ লোকে আবার স্বর্গের আমদানী লইয়া
মহা গোলযোগ করিবে। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় মহমতি টমসন্ ও মিভার্ট উভয়েই
সমান। একজন কোন উচ্চতম চৈতন্য মূর্ত্তিকে নাসারন্ধ্রে চৈতন্য ফুঁকিতে দেখিতেছেন;
অপরে জীবপ্রবাহের তরঙ্গরঙ্গে বিহ্বল হইয়া জৈবনী পদার্থকে কল্পনা বলে নক্ষত্র হইতে
আমদানী করিতেছেন। উভয়েই কারণের জন্য লালায়িত; জ্ঞানাতীত জানিয়াও
কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিয়া অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়র অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে
নিরুপায় দেখিয়া যাহা তাহা ধরিয়া, অজ্ঞেয়র ব্যাখ্যা করিলেন।

পরিণতিবাদে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্তমূর্ত্তিকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে।
কিন্তু সেই একাত্মিক প্রকৃতির অদ্যাবধি কয়েকটী সামান্য গ্রন্থিও বিশদ হয় নাই; এবং হই-
বার সম্ভাবনাও অতিস্বল্প। এমন কি,নাই বলিলে ও বলা যায়। খনিজ ও উদ্ভিদের মধ্যে একটী
প্রশস্ত খাত আছে,তাহা উলঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য। উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে যে ব্যবধান তাহাও
সংলগ্ন করা সহজ কথা নহে। ইতর প্রাণীতে ও মনুষ্যে যে ব্যবধান তাহাও পূরণ করা
দুরূহ ব্যাপার। পরিণতিবাদ যাঁহাদের বেদ তাঁহারা মনুষ্য ও বানরের মধ্যবর্ত্তী গ্রন্থি হারা-
নিধির মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, যেন সকল হারণ গ্রন্থিই পাওয়া গিয়াছে,এইটীই বাকী
আছে। বলি খনিজের দানা (crystal) বাঁধিবার প্রণালীতে কি উদ্ভিদ্ দেহের প্রক্রিয়া
বিশদ হইল? উদ্ভিদ্ প্রকৃতি বিশেষে কি ইতর প্রাণীর প্রকৃতি ব্যাখ্যা হইল? লজ্জাবতী
ও মক্ষিভোজী লতায় কি চৈতন্যের আশয় মিটিল? রজতে কি স্বর্ণ হয়? লৌহ কি তাম্রে
পরিণত হয়? অম্লজান কি জলজান হইয়া থাকে? পারদ কি গন্ধক হইতে পারে? যদি
এপ্রকার পরিবর্ত্তন সময় ও অবস্থা সাপেক্ষ, তবে আমাদের বুঝিবার এখনও অনেক
ব্যাঘাত আছে। যে অবস্থায়, যে সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন সে অবস্থা বা সে সময়

সমালোচনা করেন। তাঁহাকে নীরব কবি বলিলে বলিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি লিখিলে লিখিতে পারিতেন অনেক, কিন্তু কে লেখে? পরিশ্রম জিনিষটাকে তিনি নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও লজ্জাকর ব্যাপার মনে করেন। ভালবাসা, দেশহিতৈষীতা সমাজ সংস্কার পোলিটিক্যাল আবেগ আর পাঁচজন ভদ্রলোকের সহিত আলাপসালাপ এ সকলি বড় ক্লান্তিজনক সুতরাং তাঁহার অযোগ্য। তিনি তাঁহার উচ্চ বুদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে চড়িয়া অলসভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে আপন আপন কার্য্যে ব্রতী টলমল চরণ পৃথিবীর ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানব জীবের প্রতি অতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন। তবে যে আমাদের প্রেমিক সভায় যোগ দিয়াছেন এ নিতান্ত দায়ে পড়িয়া। কি করেন লোকে যেরূপ নাছোড়বান্দা। তিনি কত বিনয় সহকারে বুঝাইয়াছেন তাঁর প্রেমশাস্ত্রে কোন অভিজ্ঞতা নাই, তবুও লোকে বোঝেনা, বলে তাঁহার চেহারা দেখিলেই কেমন সন্দেহ হয় যেন কত প্রেমার্ত্তা তাঁর পদতলে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছে, যেন তিনি তাহাদের জন্য নিতান্ত দুঃখিত কিন্তু আলস্য বশত প্রতিদানে অক্ষম। অবস্থা যখন এইরূপ তখন অবশ্য প্রেমিক সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসনে ইহাঁরই অধিকার। তবে সভাপতি ও সম্পাদকের আসন পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত বলিয়া ইহাঁকে তাঁহাদের নীচেই আসন দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার কোন খেতাব না থাকিলেও আমাদের পূরোপূরি ষোলআনা সম্মান তাঁহারই

আমাদের সভার [illegible] সভ্যগণের সহিত [illegible] আপনাদের পরিচয় করিয়া দিলাম। মাদৃশ নগণ্য সভ্যের সংখ্যা প্রতুল। তাঁহাদের পরিচয়ে আর বৃথা কালক্ষেপ করিব না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনার পাঠক শ্রেণীভুক্ত। এতক্ষণে এই সভা সম্বন্ধে আপনাদের একরূপ মোটামুটি ধারণা হইয়াছে আশা করি। আগামী বারে ইহার কার্য্য বিবরণী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে যদি আপনার কোন সুযোগ্য পাঠক প্রেমিক সভার অনুমতি ক্রমে সে ভারটী গ্রহণ করেন তবে আমি আপত্তি করিব না। আপাততঃ আমাদের নিবেদন এই যে আগামী পয়লা আষাঢ় তারিখ হইতে আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইবে। ভোর বর্ষা এ উৎসব চলিবে। মহাশয় সপাঠকবর্গে উপস্থিত থাকিয়া, উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের প্রীতি বর্দ্ধন করিবেন।

বিনয়াবনত রিপোর্টার

শ্রীঅলীকপ্রকাশ শর্ম্মণ।

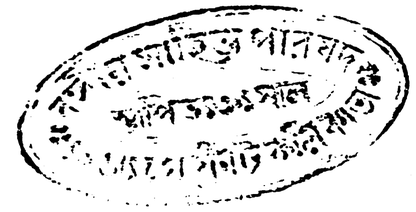

গাজিপুর।

এবে, গোলাপে গোলাপে, ছাইয়ে ফেলেছে, তাই, গোলাপি গাথায়, গাঁথি তব নাম,
এ, মধু কানন দেশ! গাহিব গোলাপি সুরে,

সখি, তুমিও আইস, • গোলাপি অধরে, হেরি, সমীর লহরি, ঝুরু ঝুরু করি,
ধরিয়া গোলাপি বেশ! আনিছে গোলাপি বাস;

বঁধু, গোলাপের ক্ষেত্, গোলাপি বিহানে আয়, দুই বাহু তোর, গলে জড়াইয়া,
হেরি হারাইবে জ্ঞান; পরি লো গোলাপি ফাঁশ!

হেথা, ফুল কি ফুটিছে? ফুটিছে ফোয়ারা তোর, দুই বাহু যুগে, গোলাপি কাঁকণ
ভেদিয়া বিশ্বের প্রাণ! সোহাগে পরায়ে দিব;

এবে, আম্র কুরুবক, বকুল চামেলি, আর, গোলাপে গোলাপে, করায়ে আলাপ,
সকলি দিয়াছে ফেলি! "গোলাপ" পাতায়ে নিব!

সখি, পঞ্চবাণে যুড়ি গোলাপ কেবলি, প্রাণে, মধুর সুরভি, গোলাপ সলিল,
মদনের রঙ্গকেলি! নাহাইব সখি তায়,

বঁধু, ছাদে ও আঁগনে, অলিগলি সব, তাহা, "লাখ লাখ যুগে" কভু নাহি ছুটে,
গোলাপেতে ভরপূর! হৃদয়ে মাখিয়ে যায়!

আর, প্রাণবাতায়নে, ভাবগুলি সব, সেই গোলাপের বাসে, গোলাপি সম্ভাষে,
গোলাপি নেশায় চূর! লাগিবে ঘুমের ঘোর,

সখি, ফুলকবি আমি, থাকি চিরদিন, আর সারাটি রজনী, করিস্ স্বজনি
গোলাপের সুর পুরে; গোলাপি স্বপনে ভোর!

কেন?

সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ? কোলে সোনার পুতলী বৎস, কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ির কন্যার অধিক স্নেহ যত্ন;—তবুও মনের আগুণ নেভে না। মা ত ছেলের দেখা পাইলেই বৌয়ের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝান, ইনাইয়া বিনাইয়া আমার প্রতি তাঁহার করুণার উদ্রেকে সচেষ্ট হন, আবার সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিতেও ছাড়েন না। কিন্তু ইহাতে যে বড় সুফল দর্শে তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময় বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এমনিতে তবু দিনান্তে একবার

করিয়া প্রায় বাড়ী আসেন, কিন্তু শ্বাশুড়ি বকাবকি করিলে দুচার দিন একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। স্বামী যে ভালবাসেন না পোড়া প্রাণে তাহাও সয়, কিন্তু তাঁহার এই অদর্শন সহে না। নিয়মিত সময়ে তাঁহার যে দিন দেখা না পাই, সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মনে হয় স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পাদুকাঘাত করেন ত ইহার তুলনায় তাহাও সুখ। নেশা গো নেশা! সময়ে অহিফেন বা সুরা না পাইলে নেশাখোরের যে দুর্দ্দশা ইহাও সেইরূপ এক প্রকার নেশা। সমস্ত বুঝি, তবু এ নেশা তাড়াইতে পারি না। কাজেই শ্বাশুড়ির শুভ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া মনে মনে তাঁহার অদূরদর্শিতার নিন্দাবাদ করি।

দিন ১৫র প্রায় হইল এবার উনি ঘরে আসেন নাই। 'সেখানে' লোকের উপর লোক যায়, ফিরিয়া আসিয়া বলে, 'বাড়ী বন্ধ গো, বাবু বাগানে গেছেন'। শ্বাশুড়ি ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির, আর আমার আহার নিদ্রা ত একরূপ বন্ধ বলিলেই হয়। খোকার মুখের দিকে চাহিয়া আর ভগবানকে প্রাণ মনে ডাকিয়া কোন রূপে দিনটা কাটিয়া যায় মাত্র। একদিন সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ রাতে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি স্বপ্নে দেখিলাম, আকাশ ফাটিয়া চারি দিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, সেই জ্যোতির মধ্যে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা এক দেবীরূপা রমণী আমাকে একটি জবাফুল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে মাথায় পর, স্বামী ভাল বাসিবে।" আমি ফুলটি ধরিলাম। অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

তখনো ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই, আমি তাড়া তাড়ি উঠিয়া শ্বাশুড়িকে জাগাইয়া আমার স্বপ্নটি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন" জবাটি পাইয়াছ ? আমি বলিলাম 'না'। তিনি বলিলেন—"বাছা কালীঘাট যাও, কালী তোমাকে ঐ অপরূপ বেশে দেখা দিয়াছেন, সেখানে গিয়া তাঁহার ফুল পরিয়া এস"।

২

আমাদের বাড়ী ভবানীপুর, কালীঘাট নিকটেই। আগেও অনেকবার কালীঘাটে আসিয়াছি, দেবীদর্শন করিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইয়াছি, কিন্তু আজ প্রাতঃকালে তাঁহার দ্বারে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম, বলি রক্ত-স্রোতের পার্শ্ব-দিয়া লোলজিহ্ব, কৃপাণ হস্তা, নৃমুণ্ডধারিণী ভীমরূপা কালীর সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন কেমন মাথা ঘুরিয়া উঠিল। স্বপ্নের সেই করুণারূপিনী, প্রসন্না, হাস্যময়ী অনুপমা, অপরূপা প্রাণ-মোহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত ইহাঁকে এক ভাবিতে পারিলাম না। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ আশাযুক্ত সুশীতল হইয়া উঠিয়াছিল, ইঁহাকে দেখিয়া ভয়-শিহরিত, নিরাশ-কম্পিত হইয়া উঠিয়া দ্বারদেশেই বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গে উমি দাসী ছিল, সে ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা বৌমার আমাদের কি হোল গা!" সেখানকার একজন পূজারি তিনি আমাদের চিনিতেন, তিনি তাড়াতাড়ি কালীর কোষাকুষি হইতে খানিকটা

জল আমার মাথায় দিয়া উমীকে বলিলেন, "এখানে লোকজন আসছে, বৌমাকে ধরে ঐ গাছতলায় নিয়ে বসাও।" আমি উমিকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে একটি নির্জ্জন গাছতলায় আসিয়া বসিলাম। গাছ তলায় আর একজন রমণী বসিয়াছিল,—উমি তাহার সহিত গল্প ফাঁদিয়া বসিল। বলিল—"বৌঠাকরুণকে নিয়ে আথান্তরে পড়েছিলুম, ভিরমি গো ভিরমি, হ্যাঁগা তুমি কোথায় থাক গা ?

রমণী বলিল—"আমি অনেক দূরে থাকি গো, আমায় চিনবেনা, তোমরা কোথা থেকে আসছ ?

দাসী। আমরা এই ভবানীপুরেরি লোক, প্রাণনাথ বাবুর নাম শুনে থাকবে কি ? এককালে ছিল ভাল, এখন ভেঙ্গে পড়েছে—"

রমণী। উনি তাঁর কে হন ?

দাসী। স্ত্রী গো স্ত্রী। তা বলব কি দুঃখের কথা, ত্যজা হলেন কমলিনী, কুজ' এখন পাটরাণী। একবার মুখপানে চেয়ে দেখে না গো, মনোদুঃখে শরীরটা পাত করছে- একবার বেটীকে পাইত দেখিয়ে দিই, ডাইনি বেটি একটু মায়া দয়া নেই! এমন লক্ষ্মীর এই দশা করলি ? তবু শুনতে পাই নাকি ভদ্র ঘরের মেয়ে ছিল, পোড়াকপাল অমন——"

আমি তখন ভাল হইয়া উঠিয়াছি, আমি বলিলাম—"উমি, তাকে গাল দিস কেন ? আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লেখেন কি, তার কি দোষ ?"

ইহার পর অপরিচিতা নিকটে আসিয়া বলিল—"সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন স্ত্রীকে স্বামী নেয় না!"

দাসী বলিল—"শুধু নেয় না। দেখনা গায়ে একখানা গহনা পর্য্যন্ত রাখেনি। এদিকেত বাবু বাড়ী থাকেন না, কেবল যখন গহনার দরকার হয় তখন রাতবাস করতে আসেন! আমরা এত করে বলি বৌমা দিওনা গো, স্বামী গেছে যাক গহনাগুলো দিওনা। তা যখন দুটো মিষ্টি কথা বলে বাবু বিপদ জানায়—তখন ওর কি আর বুদ্ধি সুদ্ধি থাকে ? মা সে দিন গহনার জন্য বাবুকে এমন ত গঞ্জনা দেয় নি, বলে ছাড়িয়ে আনতেই হবে, সেই অবধি আর বাবুর দেখা নাই। আর দেখ না, বৌমা ভেবে খুন হচ্ছে!" আমি বলিলাম—"কি বকিস উমি চুপকর!" রমণী বলিল—"তা ত সত্যি কথা! আমরা হলে অমন স্বামীর মুখ দেখিনে। দিদি তোমার ভাল হবে, এমন লোকের দুঃখ চিরকাল থাকে না।" রমণীর নয়নে করুণা জ্যোতি বিভাসিত হইল, সে আমার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া বিকম্পিত স্বরে বলিল, "এ পুণ্যবতীকে যে আদর করিতে জানে না, তাহার নিতান্তই দুর্ভাগ্য। দিদি তোর দুঃখ আমাকে দে, মাকালী যেন তোকে সুখী করেন।"

তাহার সমস্ত মূর্ত্তিতে এক অমানুষী সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত হইল, আমার স্বপ্নের দেবীকে মনে পড়িল।

৩

সেই দিন দুপুর বেলা একজন অপরিচিতা বৃদ্ধা আসিয়া হাঁকিল—"ওগো মাঠাক রুগরা এই গহনা নেও গো, বাবু আমার ঠাঁই বাঁধা রেখেছিল, টাকা দিয়ে বল্লে বাড়ী দিয়ে এস, বুঝে সুঝে সব নেও।"

মা (শ্বাশুড়ি) ত আহ্লাদে নির্ব্বাক! উমি বলিল, মা-কালী বাবুর এই সুমতি দিয়েছেন! বৌমা এদিকে এসগো—"

মা গহনা দেখিয়া লইতে লাগিলেন, আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে টাকা দিয়েছেন?" জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কবে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে, আর এক জন তাহাকে দেখিয়াছে শুনিলেও মনটা ঠাণ্ডা হয়।

বৃদ্ধা বলিল, "এই আজকেরি—মরুগকে এই কদিন হোল দিয়েছে, তা কাজে কর্ম্মে আসতে পারিনি।"

মা বলিলেন—"ছেলে কবে বাড়ী আসবে তা কি কিছু জান?"

বৃদ্ধা রাগিয়া বলিল—"তা বাছা আমি কি করে জানব? এখন ত গহনা পেলে আমি চন্নু।" আমার ইচ্ছা করিতেছিল বৃদ্ধাকে বসাইয়া ভাল করিয়া দু এক কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা হইল না, বৃদ্ধা এমন হঠাৎ চলিয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যা বেলা স্বামীও বাড়ী আসিলেন, বাড়ীর সকলেরি মহানন্দ। মা তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিয়া বলিলেন "বাছা, গহনা সব পেয়েছি, কিন্তু বিধাতা যে তোর সুমতি দিয়েছেন তাহাতেই আমার বেশী আহ্লাদ!"

স্বামী আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি গহনা?"

"কেন বৌয়ের গহনা যাকে বাঁধা দিয়েছিলি সেই বুড়ি মাগী আজ দিয়ে গেল, বল্লে তুই টাকা দিয়েছিস।"

স্বামী একটু খানি দম লইয়া বলিলেন—"ওঃ।"

আহারান্তে তিনি ঘরে আসিয়া আমাকে বলিলেন—"গহনা দিয়ে গেছে? কই দেখি?" আমি তাঁহাকে আনিয়া দিলাম, তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন তাঁহার মুখ আজ পূর্ব্ব হইতেই বিষণ্ণ; গহনাগুলি দেখিবার পর আরো ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া গেল, আমি বলিলাম, "তোমার কি গহনার আর দরকার আছে? থাকে ত নেওনা।"

স্বামী কষ্টের স্বরে বলিলেন—"না।" কিছু পরে তিনি অন্য দিনের মত চলিয়া গেলেন, আমি তাঁহার সেই বিষন্ন মুখ খানি ভাবিতে ভাবিতে খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া গেলাম। অনেক রাত্রি এমন গভীর নিদ্রা হয় নাই। সকাল বেলা খোকা উঠিয়া বা বাঁ করিয়া হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছে, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,

জাগিয়া মনে করিলাম, একি এখনো স্বপ্ন দেখিতেছি! বিস্ময়ে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া আবার চাহিলাম, দেখিলাম স্বপ্ন নহে, সত্যই স্বামী পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছেন, তাহার মুখ বিষাদ-গম্ভীর, হৃদয়ে যেন মহা বিপ্লব। আমি চমকিয়া বলিলাম—"তুমি! কি হইয়াছে"? স্বামী কথা না কহিয়া শয্যায় বসিলেন, খোকা—বা—বা করিয়া হাসিয়া উঠিল, তিনি তাহাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন, তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি কাতর হইয়া বলিলাম,"স্বামি, প্রভু, সর্ব্বস্ব তোমার কি হইয়াছে? আমাকে খুলিয়া বল, আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব"।

স্বামী খোকাকে বিছানায় রাখিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে? আমার আর কিছু চাহিবার নাই?"

অশ্রুতে আমার নয়ন ভাসিয়া গেল, আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ আমার জীবনে কখনো হয় নাই, পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে, আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে সেই দিন আমি জানিয়াছিলাম।

* * * *

সেই দিন হইতে স্বামী একেবারে পরিবর্ত্তিত, স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনি এখন গৃহবাসী। কিন্তু সহসা এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এ কৌতূহল আমার কখনো মিটিল না। স্বামী এ কথার উত্তর দিতে চাহেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়—তিনি কষ্টের স্বরে বলিয়াছিলেন "ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, আমার এই অনুরোধটি রাখিও।" সেই অবধি তাঁহার কাছে আর একথা তুলিনা, আপন মনেই সদা সর্ব্বদা এই প্রশ্ন করি—'কেন?' কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন একটা স্থির মীমাংসাতে আসিতে পারি নাই, তাই আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বলিতে পার—কেন?

মেঘদূত।

স্বকার্য্যে প্রমাদ গণি প্রভু দিলা ক্রোধে গুরুশাপ,
"বর্ষেক ভুঞ্জিবি তুই কান্তা ছাড়ি প্রবাসের তাপ;"
নিবসে বিরহী যক্ষ রামগিরি আশ্রমে অধীর,
স্নিগ্ধ ছায়াতরু যথা, জানকীর স্নানে পুণ্য নীর॥ ১

বিরহ-বিশীর্ণ তনু, খসি পড়ে হস্তের বলয়,
চিত্রকূটে কোনরূপে কাটাইয়া মাস কতিপয়,

আষাঢ় প্রথম দিনে, সম্মুখে ছাইয়া শৈলভূমি,
ক্রীড়ামত্ত গজপ্রায়, মেঘ ভায়, নিরখে সে কামী ॥ ২

দেখিতে দেখিতে ঘন, নানা ভাব—তরঙ্গিত মন,
কষ্টেতে সম্বরি অশ্রু যক্ষরাজ ধেয়ানে মগন ;
সুখীও চঞ্চল চিত্ত, মেঘদৃষ্টে প্রেয়সীর পাশে,
না জানি কি দশা তার, প্রিয়জন যার পরবাসে ॥ ৩

আসন্ন শ্রাবণ মাস, দয়িতায় জীবনদায়িনী
পাঠাবার অভিলাষে মেঘমুখে কুশলকাহিনী,
মল্লিকা কুসুম তুলি, বিরচিয়ে পূজা উপচার,
পুলকিত, প্রিয়ভাষে করে তার অতিথি সৎকার ॥৪

ধূম জ্যোতি জল বায়ু সন্নিপাতে জনমে যে ঘন
তাহাতে সম্ভবে কি না প্রাণী-কার্য্য, সম্বাদ বহন,
ঔৎসুক্যে না গণি তাহা ভিক্ষা মাগে তার সন্নিধানে,
কামান্ধ এমনি অন্ধ, অচেতনে সচেতন মানে॥ ৫

প্রখ্যাত পুষ্কর কুলে জন্ম তব জানিহে তোমায়,
মহেন্দ্রের অনুচর, কামরূপী নাম ধর তায়,
বিধিবশে বন্ধুহারা এসেছি তোমার দ্বারে প্রভু,
মহতে বিফল যাচ্ঞা, সেও ভাল, অধমে না কভু ॥ ৬

প্রভু-শাপে বনবাসী, বিপন্নের তুমি হে শরণ,
বিরহ-বারতা মোর নিয়ে যাও প্রিয়ার সদন,
যেতে হবে অলকার যক্ষপুরে উদ্যান বাহিরে,
আলো করি হর্ম্ম্য রাজি শোভে যথা শশী হর-শিরে ॥ ৭

তোমা হেরি, জলধর, যবে তুমি সঞ্চর আকাশে,
অবলা আশ্বস্ত হিয়া, প্রণয়ী যাহার পরবাসে।
বিরহিনী জায়া ফেলে, তুমি এলে, দূরে বিচরণ
করে কেবা, নহে যেবা পরাধীন আমার মতন ॥ ৮

চলেছে তোমার সাথে মন্দ মন্দ অনুকূল বায়,
পুলকে চাতক তথা বামে তব মধুগীত গায়।

অভ্র যোগে গর্ভাধান, সেই তব শুভ পরিচয়,
গগণে বলাকাকুল, হর্ষাকুল ভেটিবে নিশ্চয় ॥ ৯

দেখিবি অবশ্য তায়ে দিবস গণিছে নিশিভোর,
এখনো বাঁচিয়ে আছে একপত্নী ভ্রাতৃজায়া তোর,
বিরহে নারীর হিয়া কুসুম-সদৃশ-সুকোমল
আশা-বৃন্তে করি ভর কোন মতে রহে সে সবল ॥ ১০

যার গুণে শিলীন্ধ্র * ফুটে ওঠে ধরণী ছাইয়া
মধুর গর্জ্জন তব শুনিলেই, উচ্ছ্বসিত হিয়া,
কৈলাস অবধি লয়ে মৃণালাদি পাথেয় বিস্তর,
মরাল মানস-যাত্রী হবে তব পথের দোসর ॥ ১১

ওই তুঙ্গ শৈলরাজ † রঘুপতি পদচিহ্ন ভালে,
ব'লে ক'য়ে যেয়ো তারে, সখা তব, বিদায়ের কালে।
বরিষায় হয় যবে দুজনার শুভ সম্মিলন,
চির বিরহজ অশ্রু, স্নেহ ভরে ফেলে সে তখন ॥ ১২

প্রথমে প্রয়াণ পথ শুন তব, বলি পর পর,
তৎপরে সম্বাদ মোর, শুনিবে হে শ্রুতি সুখকর।
শ্রান্ত ক্লান্ত হবে যবে বিশ্রামিবে গিরি শৃঙ্গোপরি,
তৃষা ক্লেশ নিবারিবে স্রোতো জল পান করি করি ॥ ১৩

‡ "এ কি এ পর্ব্বত শৃঙ্গ হরে বুঝি প্রমত্ত পবন !"
সিদ্ধাঙ্গনা চায় যবে ঊর্দ্ধমুখী চকিত-নয়ন,
সরস বেতস এই গিরি হতে উত্তরে উত্তরি
আকাশে উড়িয়া যেয়ো দিগ্‌গজের গর্ব্ব খর্ব্ব করি ॥ ১৪

রঞ্জিত বিচিত্র বর্ণে রত্নরাজি-সম প্রভাময়
বল্মীকাগ্র হতে ওই ইন্দ্র ধনু সম্মুখে উদয়।

---

* শিলীন্ধ্র, ভূ-কদলী, ব্যাঙ্গের ছাতা !
† চিত্রকূট।
‡ টীকাকার বলেন, দিঙ্‌নাগ নামক কালীদাসের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া এই শ্লোকটী রচিত।

মিলনে শ্যামাঙ্গ তব ধরিবে হে কান্তি মনোহারী,
শিখি-পুচ্ছ ধরি যথা গোপ বেশে সাজেন শ্রীহরি ॥ ১৫

বর্ষাগমে কৃষিফল প্রত্যাশিনী কুল-বধূগণ,
ভ্রূভঙ্গী জানে না তারা, পিবে তোমা তৃষিত লোচন ;
করষণ সুরভিত মালক্ষেত্র আরোহিয়ে পরে,
পাছু হটি লঘুগতি পুনর্ব্বার চলিবে উত্তরে ॥ ১৬

বরষিয়ে শান্তি-জল শান্ত কর বন উপপ্লবে,
পথ শ্রান্ত এলে তাই, আম্রকূট বুকে তুলে লবে।
পূর্ব্ব উপকার স্মরি, ক্ষুদ্র সেও বিমুখ না হয়
সুহৃদে আশ্রয় দানে, কিবা যারা উদার হৃদয় ॥ ১৭

পাকা পাকা ফলে ভরা গিরিপ্রান্তে আম্রের কানন,
চড়িলে শিখরে তুমি স্নিগ্ধ শ্যাম বেণীর বরণ,
অমর-মিথুনে চেয়ে দেখিবে সে শোভা অতুলন,
শ্যাম-মধ্য কাঞ্চনাভে শোভে যেন ধরণীর স্তন ॥ ১৮

বনবালাদের সেই ক্রীড়া-কুঞ্জে তিষ্ঠি ক্ষণতর,
জল বর্ষি দ্রুতগতি উত্তরিবে পথ তার পর,
বিন্ধ্যাচলে পাবে রেবা, শিলাভঙ্গে রঙ্গে ব'হে যায়,
বিভূতি রচনা যেন, রেখাময়, কুঞ্জরের গায় ॥ ১৯

* বমনে হইয়ে লঘু, গজমদ তিক্ত সুবিমল,
জম্বুকুঞ্জ প্রতিঘাতে কষায়িত পিয়ে স্রোতোজল,
অন্তঃসার হলে, ঘন, পরাভব মানিবে পবন,
রিক্ত মাত্রে হতাদর, পূর্ণতাই গৌরব কারণ ॥ ২০

হরিত কপিশ হেরি আধ্ ফোটা কদম্ব কেশর,
তটে তটে মুকুলিত কদলী চর্ব্বিয়া রুচিকর,
বনে বনে পেয়ে আর বসুধার সুরভি আঘ্রাণ,
সারঙ্গ, জলদ, তব জলপথ পাইবে সন্ধান ॥ ২১

* বৈদ্য-শাস্ত্রে বলে, প্রথমে বমন শোধিত হইয়া পরে শ্লেষ্মা নিবারণ জন্য যিনি লঘু তিক্ত কষায় জল পান করেন তাঁহার বাত প্রকম্প দূর হয়।

জল-বিন্দু-পান রত চাতকে কৌতুকে কভু হেরে,
গগণে বলাকা-শ্রেণী কভু গুণে এক এক করে।
তোমার ভৈরব রবে সিন্ধ যুবা পুলকিত হিয়া,
প্রেয়সী তরাসে কাঁপি যবে তারে ধরে আঁকড়িয়া। ২২

যদিও সখীর কাছে দূত হয়ে যাবে দ্রুত-গতি,
নানান্ কারণে শঙ্কি বিলম্ব ঘটিবে পথি পথি ;
পাহাড়ে পাহাড়ে ফুটি ফুলে ফুলে সৌরভ ছড়ায়,
সজল-নয়ন শিখী কেকারবে তোষে গো তোমায়।
এসব কাটায়ে মায়া পারিবে কি লইতে বিদায় ?
রাখিও মিনতি সখা, কোন মতে ছাড়িও ত্বরায় ॥ ২৩

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

যোগনাথ। একটি চিত্র।

ইহাতে লেখকের নাম নাই। চিত্র বলিতে যাহা বুঝায় বইখানি ঠিক তাহা নহে। ইহাকে উপন্যাসও বলা যায় না, জীবনী ও বলা যায় না। একটি কল্পিত মহচ্চরিত্রের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও প্রেমসম্বন্ধীয় মতামতই ইহার প্রধান বিষয়। মতগুলির অধিকাংশই সারবান, লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, বিশেষতঃ হিন্দু মায়াবাদের ব্যাখ্যাংশ। ইহার মধ্যে একটি স্থল কেবল আমাদের বিরোধী ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হইল। লেখক বলিতেছেন—

"সচরাচর মায়াবাদ বলিতে লোকে বুঝে যে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, সে সমস্তই মিথ্যা, স্বপ্ন দৃষ্ট প্রহেলিকা মাত্র। মায়াবাদ সে কথা বলে না। দর্শন শাস্ত্রে স্বপ্নের সহিত জগতের যে তুলনা করা হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র। জীব ও জগৎ একত্রেই সৃষ্ট, সুতরাং জীবের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। যখন ইহাকে স্বপ্ন বলা হয় তখন জীবের স্বপ্ন বুঝিতে হইবে না, মূল বা আদ্যাশক্তির স্বপ্ন বুঝিতে হইবে। হিন্দু দর্শন মতে জীবত্ব বোধই ভ্রান্তি প্রসূত। সুতরাং যখন সে ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায় তখনি জীবের মুক্তি হয়, তখনি সে জীবের পক্ষে সৃষ্টি বিলোপ হয়—জীব আপন সীমা ঘুচাইয়া অনন্তত্ব লাভ করে। ইহার নামই নির্ব্বাণ মুক্তি। এই সৃষ্টি বিলোপ প্রকরণই যোগ সাধন।"

অতি সুন্দর ব্যাখ্যা! কিন্তু ইহার কিছু পরে--

... ...

"এখানে আসিলে (যোগে সৃষ্টি বিলোপের অবস্থায় আসিলে) জীব ঈশ্বরত্ব লাভ করে। কিন্তু ইহাও মায়ার রাজ্য। সাধন বলে কেহ মায়ার অতীত রাজ্যে যাইতে পারে না। মায়ার রাজ্য হইতে মায়াতীত বা তুরীয় রাজ্যে যাইবার কোন পন্থা জ্ঞান মার্গ প্রদর্শন করে না। ভক্তি সাহায্যেই এই দুস্তর সাগর পার হইতে হইবে, ত্রিগুণের বৈষম্য দূর করিয়া পরা চৈতন্য লাভ করিতে হইবে, এই জন্যই ভক্তি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা শ্রীকৃষ্ণকে ত্রিভঙ্গ বলে।

"এ দর্শন শাস্ত্র একদেশদর্শী চিন্তার ফল। ইহাতে সমস্তই একই প্রাণহীন সমতাতে পরিণত হয়। তুমি সাধু কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ বা জ্ঞানালোচনায় ও সত্যের অন্বেষণে জীবনকে নিয়োজিত করিয়াছ—তাহাতে কি হইবে? যে স্বার্থ সাধনে তৎপর রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় সুখে আপনাকে পশুত্বে নিয়োজিত করিয়াছে, এ দর্শন শাস্ত্রের নিকট তাহারো যে অবস্থা তোমারো তাহাই। সেও অষ্টবন্ধনে বদ্ধ, তবে তাহার না হয় লৌহ শৃঙ্খল, তোমার না হয় স্বর্ণ শৃঙ্খল। মুক্তি প্রার্থীর নিকট পাপ পুণ্য উভয়েরই মূল্য এক। তুমি জ্ঞানের উন্নতি দেখাইবে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি দেখাইবে, কিন্তু এ সমস্তই মায়ার বন্ধন, অবিদ্যার অন্ধকার তোমাকে আরো কঠোর রূপে আপন কারাগারে বদ্ধ করিতেছে। তোমার প্রাণ প্রেমে মাতিয়াছে? সাবধান! এ মায়ার বন্ধন। ইহা তোমাকে গভীরতর মায়ার কূপে ডুবাইতেছে। একদিন ভাই এ সমস্তেতেই বিশ্বাস করিয়াছি—কিন্তু আজ কাল আর বিশ্বাস হয় না।" কিন্তু আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি, পাপ পুণ্য যাহার নিকট এক, যাহার জীবত্ব জ্ঞান দূর হইয়াছে, যে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কি এ জ্ঞান হয় নাই, যে পরিপূর্ণ জ্ঞানেতেই (absolute) পাপ নাই পুণ্য নাই মঙ্গল অমঙ্গল নাই, সমস্ত এক, কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে, জীব সম্বন্ধে, অর্থাৎ যেখানেই আপেক্ষিকতা বর্ত্তমান, সেইখানেই পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি থাকিবেই, সুতরাং জ্ঞানের উন্নতি, প্রেমের উন্মত্ততা, মায়ার বন্ধন! অতএব সাবধান! এ কথা তাঁহারা বলেন কিরূপে? কেননা ইহাতেই সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং পুণ্যে, শুভ কার্য্যে, উন্নতিতে সৃষ্টির মঙ্গল। আর পাপ পুণ্য, যদি না থাকে কার্য্য অকার্য্য যদি না থাকে, তবে তোমাকে বাঁধিবে বা কিসে? সে জ্ঞান যাঁহার হইল তাঁহার নিকট অবিদ্যার প্রভাব মায়ার অস্তিত্বই বা তাহা হইলে কোথায়? সুতরাং এই মায়া বন্ধনের অর্থ ইহা নহে, যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবে না, কাহাকেও ভাল বাসিবে না—ইত্যাদি। ইহার অর্থ আমরা ত এইরূপ বুঝি যে, কাজ যাহাই কর, ভগবানকে ভুলিয়া কোন কাজ করিও না, তোমার কার্য্য মনে করিয়া কোন কাজ করিও না, অর্থাৎ তাঁহাতে আপনাতে অভেদ জ্ঞান করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করিও। এই জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞান পরাজ্ঞান নহে, অন্য উন্নতি শ্রেষ্ঠ উন্নতি নহে, অন্য সুখ চরম সুখ নহে ইহাই হিন্দু মায়াবাদের সার মর্ম্ম।

বুদ্ধিবিকাশ।

জড়প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। পিণ্ডপরিবর্ত্তন (Physical change) ও রসায়নিক পরিবর্ত্তন (Chemical change)। কিন্তু স্বতঃই এতদুভয় পরিবর্ত্তনের কোনটীই হইতে পারে না। মনে কর একটী লৌহপিণ্ড সম্মুখে আছে। উহা যথায় আছে তথায়ই চিরকাল থাকিবে। কোন বহিরঙ্গা শক্তি ব্যতীত উহার স্থানান্তর বা ভাবান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলে শক্তিরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সুতরাং হয় কোন জীবের, না হয়,কোন বেগবান্ জড়পিণ্ডের সংস্পর্শ ব্যতীত ইহা স্থানান্তরিত হইতে পারে না। গতির কথাতো এই। অবয়ব, গঠন, প্রভৃতির পরিবর্ত্তনেও সেই কথা। লৌহ তাপে দ্রব হয়, এমন কি, ভীষণ তাপে বাষ্পও হইয়া যায়; কিন্তু তাপের তাৎপর্য্য কোন উত্তপ্ত পদার্থের সংস্পর্শ বা সান্নিকট্য বই আর কি হইতে পারে? রসায়নিক পরিবর্ত্তনেও সেই কথা। দ্বিতীয় বস্তুর সংস্পর্শে না আসিলে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং পরিণতির মূলে অন্ততঃ দুইটী মৌলিক পদার্থের আবশ্যক। স্পেন্সর্ বলেন রসায়নে এখন মৌলিক তত্ত্বের নিরাকরণ হয় নাই। অদ্যাবধি আমরা যতদূর বিশ্লেষে কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহাতে চিন্তার সুবিধার জন্য তন্নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী মৌলিক তত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। অবশ্য কোন বিজ্ঞানই এখন চরমাবস্থায় আসে নাই এবং কখন আসিবেও না। সকলই উত্তর উত্তর জ্ঞান সহকারে, অনুশীলন সহকারে, গবেষণা সহকারে বিশদ হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রত্যাশার বশীভূত হইয়া আমরা বিজ্ঞানের অবমাননা করিতে পারি না। সত্যও আপেক্ষিক ব্যাপার। আজ যাহা সত্য, কাল তাহা হয়ত সত্য ছিল না; কিন্তু অগামী কাল তাহা থাকিবে না, একথা আজ বলা সঙ্গত নহে। তিনি বলেন রসায়নে যাহাদের মৌলিক পদার্থ বলে,তাহা আদৌ মৌলিক নহে। কে বলিল মৌলিক নহে? শুদ্ধ কথার কথায় তাহা কে স্বীকার করিবে? "আশয়, চাই কি তৎসমুদায়ই কোন বিশিষ্ট তত্ত্বে বিশ্লেষ করিতে পারিব।" তিনি কেমন করিয়া জানিলেন যে পারিবেন? এ বিশ্বাসের কারণ কি? বিশ্লেষ হইবে এ কথা কে বলিল ও বলিতে পারে? এ প্রশ্নে কেহই "হাঁ" বা "না" বলিতে পারেন না। এতদুভয়ই যুক্তিবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা। স্পেন্সরের মতে বরং "হাঁ" বলাই সঙ্গত। কেন? জল পূর্ব্বে মৌলিক তত্ত্ব ছিল, আজ মিশ্রণ মধ্যে গণ্য। সুতরাং অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলিও বিশ্লেষ হইবার প্রত্যাশা আছে। ভাল তাঁহারই প্রণালীতে তর্ক করিয়া দেখা যাউক্। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যখন একটী মৌলিক তত্ত্ব হইতে পাঁচটি হয় এবং তৎপরে সপ্ততিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন প্রত্যাশা কোন্ দিকে ধাবিত হয়—একত্বে না বহুত্বে? তিনি বলেন আজকাল

কোন কোন রসায়নবিৎ অদ্বৈত তত্ত্বের অনুসরণ করিতেছেন। অবশ্য আশয় আছে নতুবা করেন কেন? সত্য; কিন্তু এ প্রত্যাশা তো চিরকালই আছে—আজ নূতন নহে? এই প্রত্যাশাতেই তো রসায়নের জন্ম। অধিকন্তু এ অদ্বৈত প্রকৃতিতে পূর্ব্বে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল; আজও আছে। ফলে রসায়ন দিন দিন তাহাই খর্ব্ব করিয়া আনিতেছে। সৃষ্টি প্রকরণে নানা দেশে নানা গ্রন্থে এইরূপ নানা প্রকার অদ্বৈত তত্ত্ব আছে। কেহ জল, কেহ বায়ু, কেহ আকাশ, কেহ অগ্নি হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিছু-না হইতেও অনেকে জগতের সৃষ্টি অনুমান করেন। রসায়ন না পরপর তাহাই অপসৃত করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে পদার্থের সৃষ্টি ও ধ্বংস ছিল; রসায়নে তাহা নিরাকরণ করিয়াছে। যদি কেহ বলেন রসায়নে এখনও পদার্থের ধ্বংস সংসাধিত হয় নাই—কাল সহকারে হইবে; তাহা হইলে কেমন দেখায়? অদ্বৈত তত্ত্ব ও জড় শক্তিসংস্থানের দশা কি হয়?

স্পেন্‌সর্ বলেন আজ কাল বিজ্ঞানের অদ্বৈতবাদে মতি। আলোকবিশ্লেষ (spectrum analysis) রাসায়নিক মৌলিক তত্ত্বে বিষম বিভ্রাট ঘটাইয়াছে। প্রত্যেকটীর বর্ণছত্রে (spectrum) দুই হইতে অশীতি বা তদধিক বর্ণরেখা পাওয়া যায় এবং সেই প্রত্যেক বর্ণরেখায় অন্য শ্রেণীর ইথরের কম্পনস্রোত অবরোধ হইতেছে বুঝিতে হইবে নতুবা বিভিন্ন হয় কেন? সুতরাং সেই মৌলিক পদার্থের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা ইথরের কম্পনপ্রবাহের সমরূপ কম্পিত হইয়া গতি অবরোধ করে। *

যদ্যপি লৌহ প্রকৃত মৌলিক পদার্থই হয়, তাহা হইলে ইহার অণুতে অশীতি প্রকার ইথরের কম্পন কি প্রকারে অবরোধ করে, বুঝিতে পারি না। অর্থাৎ, একজাতীয়

* Spectrum analysis yields results wholly irreconcilable with the assumption that the conventionally-named simple substances are really simple. Each yields a spectrum having lines varying in number from two to eighty or more, every one of which implies the intercepting of ethereal undulations of a certain order by something oscillating in unison or in harmony with them. Were iron absolutely elementary, it is not conceivable that its atom could intercept ethereal undulations of eighty different orders: though it does not follow that its molecule contains as many separate atoms as there are lines in its specturm, it must clearly be a complex molecule. Still more clearly is this general implication confirmed by facts furnished by nitrogen; the spectrum of which has two quite different sets of lines, and changes from one set to the other as the temperature is varied. The evidence thus gained points to the conclusion that out of some primordial units, the so-called elements arise by compounding and recompounding; just as by the compounding and recompounding of so-called elements there arise oxides and acids, and salts.

H. Spencer.

অণুতে একজাতীয় ইথরের কম্পনই অবরোধ হইবে, এমন নানা প্রকার কম্পন অবরোধের কারণ কি? আবার লৌহের বর্ণছত্রে যত গুলি বর্ণরেখা পাওয়া যায় তাহার অণুতে ততগুলি পরমাণু আছে, একথাও বলা যায় না। সুতরাং ইহা যে মৌলিক পদার্থ নহে বরং একথাই সঙ্গত। কোন বিশেষ মৌলিক পদার্থের অণুর জটিলমিশ্রণে যে ইহার উৎপত্তি তাহার আর সন্দেহ নাই। অপিচ নাইট্রোজনে এসিদ্ধান্ত আরও প্রবল হইতেছে। ইহার বর্ণছত্রে দ্বিবিধ গ্রুপ (set) বর্ণরেখা দৃষ্ট হয়। তাপের ন্যূনাধিক্যে ঐরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে কোন এক প্রকার আদিম পদার্থ হইতে অধুনাতন মৌলিকতত্ত্ববাচ্য পদার্থ সমূহের উৎপত্তি। তাহারই বিবিধ মিশ্রণে বিবিধ বস্তুর প্রকাশ।

হার্বার্ট স্পেন্‌সরের এ মহান্ সমস্যা আলোকবিশ্লেষে বিশেষ পূর্ণ হইতেছে না। কারণ আলোকবিজ্ঞানের মূলে ইথর একটী অপসিদ্ধান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এ প্রকার সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরাকরণ করা কতদূর প্রমাণ্য, তাহা বলা যায় না। কোম্ত বলেন ইথরের প্রকল্পনা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। এই ইথরের প্রতিবাদ করিয়া তিনি এককালে বৈজ্ঞানিকদিগের ভয়ানক লাঞ্ছনা ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ শুভ্রদৃষ্টি লোক মাত্রেই ইথর অনুমোদন করেন না। ইথর লইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অধুনাতন মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। *

মনে কর ইথর কল্পনার সামগ্রী নহে। তাহাতেই বা কি সপ্রমাণ হইতেছে। এক জাতীয় অণুর বিভিন্ন সজ্জায়, মিশ্রণে, বা অবস্থায়, যদি বর্ণের বিভিন্নতা জন্মে, তাহাতেই বা কি হইল? শুদ্ধ বর্ণের পার্থক্যে কি পদার্থের পার্থক্য বুঝায়? ন্যায়শাস্ত্রে বর্ণকে উপধর্ম্ম (accident) বলে; সুতরাং বর্ণের পার্থক্যে পদার্থের পার্থক্য সিদ্ধ নহে। কৃষ্ণবর্ণ কাক ও কাক, আর শ্বেতবর্ণ কাক ও কাক। মেঘের যে অংশে রামধনু প্রতিফলিত হয় তাহাও মেঘ, আর যে অংশে না হয়, তাহাও মেঘ; সুতরাং বর্ণরেখায় এ বিষয়ে কোন বিশিষ্ট জ্ঞান হইতেছে না। পুনশ্চ যে প্রণালীতে পুস্তক সাজাইলাম সেই প্রণালীতে ইষ্টকও সাজান যাইতে পারে; এবং যদি অণুর সজ্জায় আলোকের বিভিন্নতা হয় তাহাতে পদার্থের পার্থক্য যায় কই? এক পদার্থের বিভিন্ন ভাঁজে বিভিন্ন বস্তুই বা পাই কই? কাষ্ঠছিদ্রে যে আলোকপ্রবাহ যায়, তদ্বৎ লৌহছিদ্রেও সেই আলোকপ্রবাহ যাইবে; কিন্তু আলোক দেখিয়া লৌহ ও কাষ্ঠ একই পদার্থের ভিন্ন মিশ্রণ বলা যুক্তি-

* The prevailing hypothesis of a lumiferous ether I can not but consider with M. Comte, to be tainted with the same vice. It can never be brought to the test of observation, because the ether is supposed wanting in all the properties by means of which our senses take congnizance of external phenomena.

J. S. Mill.

সিদ্ধ নহে। তবে এক লৌহে নানা বর্ণ দেখায় কেন? তাহার অণুর সজ্জাই ঐরূপ জটিল বা বিসদৃশ। কে বলিল যে প্রত্যেক মৌলিক তত্ত্বের অণুর সজ্জা পিণ্ডে (mass) সর্ব্বত্র সমান? এই প্রকার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে। সর্ব্ব অণুতে আমাদের তাপ সমান ভাবে দিবার সামর্থ্য নাই, অথবা নানাশক্তিব্যঞ্জক জগৎ মধ্যে উহা একেবারেই অসাধ্য। নাইট্রোজনে তাপের ন্যূনাধিক্যে বর্ণরেখার পার্থক্য দেখা যায়, তাহার মীমাংসা করিতে গেলেও অণুর বিভিন্নাবস্থা বলিতে হইবে। তদাবস্থায় অণুর গতি ঐরূপ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং ইথরের নানা জাতীয় কম্পনস্রোত অবরোধের সম্ভাবনা, অপিচ আলোক বিশ্লেষে (spectrum analysis) স্বতন্ত্র মৌলিক পদার্থই প্রতিপন্ন করে। যদি সকলেই এক পদার্থের ভিন্ন সজ্জায় হইত, তাহা হইলে স্বতন্ত্র পদার্থের স্বতন্ত্র অথচ নির্দ্দিষ্ট বর্ণ-ছত্র হইবে কেন? বরং এক বস্তুর নানাবস্থায় নানা প্রকার বর্ণছত্র হইত। প্রতিনিয়তই বর্ণছত্রের ব্যতিক্রম দেখা যাইত। ইহাতে একত্বের প্রমাণ কই? *

আমরা নাইট্রোজনের কথায় কি পাইতেছি? তাপের ন্যূনাধিক্যে দুই প্রকার বর্ণছত্র হইয়া থাকে। তদধিক হয় না কেন? তাপের ন্যূনাধিক্যের কি দুইটি সীমা? তাহা হইলেও তন্মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। কই তাহাতে বর্ণছত্রের প্রভিন্নতা হয় না কেন? আমরা নাট্রোজনে যেন দ্বিবিধ বর্ণছত্র পাইলাম। সত্য; কিন্তু তাপে কি তাহা দ্বিবিধ পদার্থ হইল? কই তাপের ন্যূনাধিক্যে আরও নানা প্রকার হইল না কেন? তাপের কি দ্বিবিধ মাত্রা? না তাপে অণুর এ প্রকার দ্বিবিধ সজ্জা বা অবস্থা-মাত্রই হইতে পারে? ফলে তাহা হইলেও অণুর সজ্জায় অতি সামান্য পার্থক্যই জন্মে, এমন কি, নাই বলিলেও বলা যায়। তাহাতে পদার্থের রসায়নিক বা প্রাকৃতিক কোন ব্যত্যয় জন্মে না। তাপের ন্যূনাধিক্যে বর্ণরেখার পার্থক্যের প্রমাণ পাইলাম, পদার্থ পার্থক্যের প্রমাণ পাইলাম না। ইহাতে আরও বলা যায় যে তাপের ন্যূনাধিক্যে পদার্থের অণুর অবস্থা বা গতি ভিন্ন হওয়ায় বর্ণরেখার বিভিন্নতা হইয়া থাকে। অপিচ আবার যে স্থলে এমন পদার্থ পাওয়া যায় যে তাহার বর্ণছত্রে এক প্রকার বর্ণরেখাই দেখা যায়, অথচ উক্ত পদার্থ মিশ্রণ বলিয়া প্রতিপন্ন, তাহার মীমাংসা কি হইবে? সেই মিশ্রণ মধ্যে এক জাতীয় ইথরের কম্পনপ্রবাহ পরিচালিত হইবার ব্যাখ্যা কি?

স্পেন্সর বলেন যদি এক প্রকার পদার্থ তাপের ন্যূনাধিক্য হেতু ভিন্ন বর্ণছত্র প্রকাশ করে, তখন এক মৌলিক পদার্থের কোন প্রকার মিশ্রণে বা সজ্জায় ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে, এমন চিন্তা অসঙ্গত নহে। এখন যতদূর দেখা যায়, তাহাতে

* We may occasionally meet with a body whose spectrum consists only of one colour. The petals of some kinds of convolvulus, give a specturm consisting only of blue, and the petals of nasturtium give only red.—A. Privat Deschanel. P. 1060.

এ প্রকার মীমাংসা অপ্রশস্ত। যদি তাপের ন্যূনাধিক্যে কিম্বা অন্য কোন কারণে এক বস্তুর বর্ণছত্র নানা প্রকার হইত তাহা হইলেও বরং কথা ছিল। কিন্তু তাহাতে যখন কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট প্রকার বর্ণছত্র হইতেছে তখন একথা স্বীকার করা যায় না। যদি নাইট্রোজনের ছত্র হাইড্রোজন বা অপর কোন পদার্থের মত হইত বা কোন প্রকারে করা যাইত তাহা হইলে এরূপ অনুমান সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন নাইট্রোজনের বর্ণছত্রে তাপের ন্যূনাধিক্যে সামান্য রূপ পৃথক হইলেও যাহা পাই তাহা নাইট্রোজনেই পাই,আর কিছুতেই পাই না,তখন নাইট্রোজনের অণুর সজ্জায় হাইড্রোজন বা তদুভয়ই কোন মৌলিক তত্ত্বের ভাঁজের বিশিষ্ট ভাব বা সজ্জা অনুমান করা যায় না। * বরং আলোকবিশ্লেষে (spectrum analysis) ভিন্নাত্মিক পদার্থের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে; এমন কি,যে কোন পদার্থ যত সূক্ষ্ম মাত্রায় থাক না কেন তাহা নিশ্চিত জানা যায়। অপিচ এক পদার্থ বিকারে সমস্ত বস্তু সমুৎপন্ন হইলে আলোকবিশ্লেষে তাহাদের পার্থক্য জানিবার বরং ব্যাঘাতই জন্মিত। আলোকবিশ্লেষে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে একত্বের কথা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। আর বস্তুতঃ নাইট্রোজনে তাপের ন্যূনাধিক্যে অণুর গতি বা অবস্থার সামান্য পার্থক্য হইতেছে। নতুবা উত্তপ্ত নাইট্রোজন ও শীতল নাইট্রোজন দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলা যাইত। এক পদার্থের ভাঁজে বা সজ্জায় নানা বস্তুর উৎপত্তি ধারণায় আইসে না। মনে কর শুদ্ধ বালুকাকণা লইয়া নানা প্রকারে সাজাইলে কি স্বর্ণ হইতে পারে ধারণায় আইসে? হাইড্রোজনকে নানা অবস্থায় সংকীর্ণ, বিকীর্ণ করিলে কি নাইট্রোজন হয়? আর শুদ্ধ আলোকবিশ্লেষে কেন, এক পদার্থতো নানা বর্ণের দেখা যায়; সুতরাং শুদ্ধ বর্ণে পদার্থের জাতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, পদার্থের বাহ্যিক বর্ণে যেমন পার্থক্য নহে বিশ্লেষেও সেইরূপ না থাকারই সম্ভাবনা। যখন বর্ণ দেখিয়া আমরা পদার্থের সাদৃশ্য বা পার্থক্য স্বীকার করি না, সেইরূপ আলোকবিশ্লেষের বর্ণরেখায়ও করা সুসঙ্গত নহে। কাচ একই পদার্থ; কিন্তু ঝাড়ের কলমের মধ্য দিয়া আলোক চালিত হইলে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সকল বর্ণের সমান বাঁকিবার শক্তি (refrangibility) নাই; ফলে সেই শক্তির উপরই আলোকবিশ্লেষ নির্ভর করে। এস্থলে এইমাত্র বলাই সঙ্গত যে সকল বর্ণের বাঁকিবার সমান শক্তি নাই এবং তাপে কোন বস্তু যে সকল বর্ণ রেখা প্রকাশ করে হ্রস্বতাপে তাহাদের সংখ্যা ও অবস্থান পৃথক হয়; এবং যাহার যেরূপ

* As the spectrum exhibited by a compound substance when subjected to the action of heat, is frequently found to be identical with the spectrum of one of its constituents, or to consist of the spectra of its constituents superimposed, the spectroscope affords an exceedingly ready method of performing qualitative analysis.—A. Privat Deschanel.

হইয়া থাকে তাহার সেইরূপই হইতে দেখা যায়; অন্যের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে না। অপিচ মিশ্র পদার্থের ভাব যেরূপ তাহাতে বর্ণবিশ্লেষে পদার্থের স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। * ইহাতে পার্থক্য ভাবই প্রবল। প্রফেসর সোয়ান বলেন যে এক গ্রেণ সোডার পঁচিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ কোন আলোকে থাকিলে বিশ্লেষ কাচে বুঝা যায়। এ অবস্থায় স্বতন্ত্র মৌলিক তত্ত্ব স্বীকার না করি কিসে? কই তাপ প্রভৃতিতে মিশ্রণ মধ্যে এত সূক্ষ্ম অংশও স্বতন্ত্র ভাব ধারণ করিল না? তবে এক পদার্থের বর্ণ রেখার পার্থক্যের অন্য কারণ থাকিতে পারে।

কে জানে, চাই কি লৌহের অণুতে অশিতি পরমাণু এবং নাইট্রোজনের অণুতে দুইটী পরমাণু থাকিতে পারে। কিম্বা স্পেন্সর্ তাঁহার মৌলিক তত্ত্বের অণুর যে সজ্জায় লৌহের উৎপত্তি স্থির করিতেছেন, কে বলিতে পারে যে লৌহ মৌলিক হইলে তাহার অণুর সেই প্রকার সজ্জা হইবার সম্ভাবনা নাই। মনে কর যে যে মৌলিক পদার্থে যতপ্রকার বর্ণ-রেখা অবরোধ করে সেই সেই মৌলিক তত্ত্বের নিজের অণুর তত প্রকার সজ্জা। যাহাকে লৌহ বলি তাহাতে যে তাহার সকল অণুর এক জাতীয় সজ্জা, ইহা কে বলিল? লৌহপিণ্ডের সজ্জা ও বাষ্পের সজ্জা কখনই সমান নহে; ফলে যত দিন বিশ্লেষে না পাই ততদিন তাহার অণুর রূঢ় কল্পনাই বিধেয়। লৌহের ভিন্ন অবস্থায় তাহার অণুর ভিন্ন সজ্জাই সম্ভব। কিন্তু তাহাতে অণুর মৌলিকতায় সংশয় আইসে না। আবার পদার্থের আপেক্ষিক ঘনতায়ও বর্ণের পার্থক্য হয়। তাপে অণুর গতি বিভিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু এত বিভিন্ন হয় না যাহাতে তাহাকে অপর পদার্থে পরিণত করিতে পারে এবং তাপে যে সেরূপ পারে তাহাও কিছু জানিনাও বলিতে পারি না।

স্পেন্সর বলেন বস্তুবিকার (Allotropy) একত্বের দিকেই যাইতেছে। অনেক পদার্থ

---

* When the electric light was developed in a mixture of two gases, the spectrum thus obtained exhibited simultaneously the peculiar spectrum belonging to the two gases of which the mixture consisted. When the experiment was made in gaseous compounds capable of being decompsed by the eletric current, this decomposition was indicated by the spectra of the separated constituents becoming perceptible. H. WATT.

1. There is, however,one weak point in this arrangement,for we cannot be sure that our lenses and train of prisms do not absorb some rays more than others, so that after all we do not learn by means of the spectroscope and pile the true proportion in which the various rays appear in the light which we are examining, for we may suppose that some of the rays are altogether stopped by the lenses and prisms, while others are allowed to pass.
BALFOUR STEWART.

এমন আছে যে তাহাদের আমরা আপাততঃ রূঢ় বলিয়াই জানি; কিন্তু তাহারা নানা অবস্থায় নানারূপে প্রকাশ পায় এবং গুণেরও পার্থক্য দেখায়। ফস্ফরাস্ ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। ইহা অর্দ্ধস্বচ্ছ, বর্ণহীন, সাতিশয় কার্য্যকর (active) দ্রব্য। কিন্তু তাপে ইহাকে এতদূর পরিবর্ত্তন করে যে ইহার স্বচ্ছত্ব থাকে না; ঘোর লাল বা কৃষ্ণবর্ণ এবং কার্য্যহীন (inert) হইয়া পড়ে। অম্লযানের মত অনেক বায়ুও এইরূপ স্বতন্ত্র গুণসম্পন্ন হইয়া পড়ে। অণুর বিভিন্ন সজ্জা বই আর ইহার অপর কি ব্যাখ্যা হইতে পারে? যখন কয়েকটী বস্তুর অণুর ভিন্ন সজ্জায় এ প্রকার ভিন্ন গুণ দেখা যায়; তখন অসংখ্য পদার্থ এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন কল্পনায় বিশেষ কোনই দোষ আসিতে পারে না। সুতরাং লোকে অজ্ঞান বশতঃ এখন যাহাদের মৌলিক পদার্থ বলে, হয়ত তাহারা মৌলিক না হইলেও হইতে পারে। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় স্পেন্সরের কথায় বিশেষ যুক্তি দেখি না। বস্তুতঃ ফস্ফরাস তাপে ঘোর লাল বা কাল হয়; কিন্তু জৈবনি পদার্থ মাত্র এত জটিল যে সামান্য পরিবর্ত্তনে তাহাদের ভয়ানক বিসদৃশ করিয়া ফেলে। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্তটি বিশেষ সুখজনক নহে। চিনি এবং ষ্টার্চ বিশ্লেষ করিলে সমান ভাগে কয়েকটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের প্রভেদ দেখ। সুতরাং জৈবনি পদার্থের দৃষ্টান্তে এত দূর প্রগাঢ় তত্ত্বের কোন মীমাংসাই করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা সিলিকার কথায় স্পেন্সরকে বরং প্রবল করিয়া দেখি, তাহাতেই বা তাঁহার মতের কতদূর সপ্রমাণ হয়। অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে ইহাও সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থের ন্যায় হইয়া পড়ে। স্পেন্সর বলিবেন যখন এমন সামান্য পদার্থ এতদূর চিরবিভিন্ন ভাব ধারণ করিতে পারে, অথচ তাহাতে কিছুরই মিশ্রণ হয় নাই, তখন এক জাতীয় পরমাণুর বিভিন্ন সজ্জায় নানা প্রকার বস্তু হইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? তাপে সিলিকার কিসের ব্যত্যয় হইল? অবশ্য অণুর পার্থক্য সজ্জা; নতুবা তাপে আর কি হইতে পারে? এস্থলে ইহার দুইটি উত্তর সম্ভাবিত। প্রথম, যে কয়েকটী পদার্থ এইরূপ হয়, তাহাদের মৌলিকত্বে সন্দেহ আছে, তাহারা মৌলিক না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যাহা পাইয়াছি তাহা বলাই উচিত। তাহাদের দোহাই দিয়া সকল গুলির মৌলিক সত্ব অপহরণ করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। ইহাতে অতিরেক কল্পনা আসিতেছে। দ্বিতীয়, আর যদি সিলিকা, ফস্ফরাস প্রভৃতিকে উক্ত ভিন্নাবস্থায় সিলিকা ও ফস্ফরাস্ প্রভৃতি বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রাকৃতিক গুণের বৈলক্ষণ্য হয় নাই, উপধর্ম্মের বা উপগুণের হইয়াছে বলিতে হইবে। যদি সিলিকা বা ফস্ফরাস তাপে ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ হইত এবং তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মের কোন বিশেষ পরিচয়ই পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে এরূপ কল্পনা যুক্তিসঙ্গত বলা যাইত, এবং তাহাও শুদ্ধ সিলিকা ও ফস্ফরাস্ সম্বন্ধে, অন্যের সম্বন্ধে নহে। ফলে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া কল্পনাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা বিধেয় নহে।

মহামতি কৌন্ত বহুদিন পূর্ব্বে সাময়ান্তরে ও বিষয়ান্তরে যাহা বলিয়াছেন আজ তাহা বিজ্ঞানপ্রবর স্পেন্সরের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রযুক্ত। * কৌন্তের যে স্পেন্সরের অপেক্ষা বিশদ দৃষ্টি ছিল, তাহা তাঁহার কথাতেই ব্যক্ত হইতেছে। তিনি যে সকল কথায় বিচার-সঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন; আজ স্পেন্সর সেই সকল তত্ত্ব লইয়াই কল্পনা-সমুদ্রে ভাসিতেছেন। তিনি যেখানে যতটুকু পাইয়াছেন, সেই খানে ততটুকু বলিয়াছেন; তদতিরিক্ত কল্পনা করেন নাই। বিজ্ঞানবিতের মনের এইরূপ সাম্যই অনুকরণীয়।

এক্ষণে জীব আর অজীবের মধ্যে যে ভয়ানক ব্যবধান আছে, স্পেন্সর্ তাহা এইরূপ মিটাইতে চাহেন। তিনি বলেন অজ্ঞানবশতঃ আমরা এ সকলকে এখনও মিটাইতে পারি নাই। কিন্তু অজ্ঞানকে জ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মীমাংসা করা চলে না। অজীব কি প্রকারে সজীব হইল আমরা জানি না। সত্য; কিন্তু অজীব যে সজীব হয় নাই, ইহা তাহার প্রমাণ নহে। উহাতে অজীব যে সজীব হইয়াছে তাহারাই বা প্রমাণ কৈ? স্পেন্সর্ বলেন প্রত্যেক জীবের উৎপত্তি জানি নাই বলায় আর তাহাদের স্বতন্ত্র উৎপত্তি বলায় বিশেষ প্রভেদ আছে।

এ কথা সত্য। তাই ন্যায়বান্ লোকে তাহার কোন দিকেই সিদ্ধান্ত করেন না। তাঁহার মতে বিজ্ঞান সেই ফাঁক ক্রমে বুজাইয়া আনিতেছে। অনতিপূর্ব্বে জানা ছিল যে জৈবনি মিশ্রণ (organice compound) মানুষে প্রস্তুত করিতে পারে না। আজ প্রায় সহস্র প্রকার জৈবনি মিশ্রণ প্রস্তুত হইয়াছে। পরে আরও উচ্চে উঠিবার সম্ভাবনা। হাঁ! জীব সৃষ্টি করিলেও করিতে পারিবে! এ কথার বিশেষ উত্তর আবশ্যক করে না। জৈবনি মিশ্রণে (organic compound) আর জীবে যে কত প্রভেদ তাহা বলা যায় না।

---

* Among the elements we know a considerable number which, without entering into any combination, present an entirely different appearance, in consequence of but a slight difference in the circumstances under which they are placed. For example, phosphorus becomes black when heated and then suddenly cooled, and by means of a red heat silica is so modified, that the substance, after and before the application of such heat, might be taken for two differnt substances, it we looked to its properties only. The interesting experiments recently made by Berzelius as to the allotropic character of phosphorus, have opened a new path for scientific investigations. If the simple substances can assume the permanent apperance of unlike bodies without forming any combination, their compounds can do so much more.—Comte's Philosophy of the Sciences.—By G. H. Lewes.

আর সেই জৈবনি মিশ্রণই বা কি হইয়াছে। এস্থলে কৌন্তের নিরপেক্ষ কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। *

আইসোমেরিজম লইয়া আজ কাল যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, স্পেন্সর্ বলেন, তাহাতে জীবজগতের কতক ব্যাখ্যা আছে। † অনেকে মনে করেন যে আইসোমেরিজম্ অণুর বিভিন্ন সজ্জার উপর নির্ভর করে। একথা অলীক। ইহা সংশ্লেষ পার্থক্যে প্রতিপন্ন। বস্তুতঃ অণুর ভিন্ন সজ্জায় বস্তুর ভিন্ন রূপ হইতে পারে; কিন্তু রূপ ভিন্নে পদার্থের ভিন্নতা হয় না। অইসোমেরিক বস্তুর সংজ্ঞা করিতে গেলে এইরূপ বলিতে হইবে যে, যে সকল পদার্থের মূলে কয়েকটী একজাতীয় মৌলিক তত্ত্ব আছে, এবং তাহাদের মাত্রাও সমান অথচ সমন্বয় কালে সহসা ভিন্নাত্মিক মিশ্রণ হইয়া পড়ে এমন কি, ঐ মিশ্রণ পুনশ্চ আর কোন পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মিশ্রণ হইয়া যায়, এবং বিশ্লেষ করিলে বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাদিগকে আইসোমেরিক পদার্থ বলে। স্পেন্সর ইহাদিগকেই জীবজগতের ব্যাখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দেখা উচিত যে আইসোমেরিক পদার্থ সমুদয়ই জৈবনি পদার্থ হইতে উৎপন্ন। বরং জীবজগতে উহাদের ব্যাখ্যা আছে বলাই সঙ্গত। ‡

পরিণতি জীবজগতে যেমন কতকটা স্পষ্টাক্ষরে দেখা যায়; জড়জগতে তেমন নহে। বস্তুতঃ পরিণতিবাদ সেই বিশাল জীবজগৎ হইতেই উৎপন্ন। মহাত্মা ডার্বিণ তাহার বাহিরে যাইতে প্রয়াস পান নাই। অপিচ পরিণতি (Evolution) কথার উৎপত্তি ও তাৎপর্য্যও তাহাই। মার্টিনিও এই কথা বলেন। ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হওয়ার নামই পরিণতি। বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়। ভ্রূণ পর পর পুষ্ট হইয়া পশু, পক্ষী ও মানুষের পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়। জীবের জন্ম হইতে মৃত্যুর ইতিহাসের নাম পরিণতি। অধিকন্তু নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম জীবের উৎপত্তি, ইহারই বিস্তৃত প্রকল্পনা। কিন্তু সেই জীবজগতের সাধারণ মূর্ত্তি অজীবে প্রয়োগ করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে বলা যায় না। বীজ

---

* It is to be further noted that all these isomeric bodies are bodies having an organic origin; many of them are actually organic, *i. e.*, they are formed of several proximate principles. Comte's Philosophy of the Sciences: By G. H. Lewes.

† Moreover, the phenomena attending isomeric change give a clue to those movements which are the only indications we have of life in its lowest form. H. Spencer.

‡ It is well-known that although we can create certain organic compounds, we can only do so by the degradation of some previously-existing organic substance. Comte's Philosophy of the Sciences:—By G. H. Lewes.

অবশ্য বৃক্ষ নহে; বীজেও বৃক্ষ নাই। তবে বীজ কোন বিশিষ্ট কারণ বা অবস্থা সহকারে বৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু বীজের বৃক্ষে পরিণত হইবার (বিশেষ অবস্থা সংযোগে) সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাতেই পরিণতির ব্যাখ্যা আছে। * স্পেন্সর বলেন এরূপ চিন্তা সুসঙ্গত নহে। মনে কর অণ্ডলাল; ইহাতে কি জীবন বা মন আছে? অনন্ত প্রকরণের পর অনন্ত পারম্পার্য্য অবলম্বন করিয়া ইহা মন ও জীবন প্রাপ্ত হয়। কখন তাহার বোধ হইল, কখন প্রতিষেক কার্য্য প্রথম উপস্থিত হইল, কখন শিশু মন পাইল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। আমরাও সেই কথা বলিতেছি। জানি-নাকে জানি না বলাই ভাল। কিন্তু কিছুই জানি না বলিয়া অণ্ডলালকে অজীব বলিয়া ধরা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাও জানি না বলা ন্যায্য। অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি বুদ্ধিতে আইসে না। অপর অজীব পদার্থ হইতে যে অণ্ডলাল পৃথক তাহার আর সন্দেহ নাই। নতুবা তাহারা উক্ত অবস্থায় জীব না হয় কেন? এমন কি যাহাকে অণ্ডলাল বলা যায় তাহারও পরস্পর ভয়ানক পৃথক। বিজ্ঞানের চক্ষে ও পরীক্ষার এক হইতে পারে; কিন্তু যখন এক অবস্থায় সেই অণ্ডলাল ভিন্ন পক্ষীতে পরিণত হয়, তখন সেই পার্থক্যেরও কোন বিশেষ কারণ সেই লালেই আছে; নতুবা তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

স্পেন্সর উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতে সবিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান না। তিনি বলেন উদ্ভিদ্ ও জীব প্রকৃতির বিশিষ্ট সংজ্ঞা করা যায় না। জীব দেহে ও উদ্ভিদ্ দেহে রাসায়নিক পার্থক্য নাই, গঠনের পার্থক্য নাই, কার্য্যের পার্থক্য নাই, অস্তিত্ব ভাবের (modes of existence) পার্থক্য নাই। অনেক সামান্য সরল গঠনের জীবপুঞ্জের উদ্ভিদপত্রের সবুজ পদার্থ (chlorophyl) আছে, যদ্দ্বারায় উদ্ভিদের ন্যায় তাহারাও আলোক আঙ্গারিক (carbonic acid) সংগ্রহ বিশ্লেষ করিয়া থাকে। এদিকে অনেক সামান্য উদ্ভিদের (Diatoma) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর ন্যায় গতি আছে। স্পেন্সর এখানে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছেন। ফলে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তিনি সেই সামান্য জীবের ন্যায় উদ্ভিদকে উদ্ভিদ্ বলেন কেন; এবং সেই উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণীকে উদ্ভিদ্ না বলেনই বা কেন? যদি কোন ভিন্নতাই না থাকে তবে উক্ত ভিন্ন জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? আর যদি কোন ভিন্ন লক্ষণ থাকে, তাহা হইলেই তাহাদের ভিন্নাত্মক ভাব প্রকাশিত হইতেছে।

স্পেন্সর সেইরূপে জীবন হইতে মনের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু উদ্ভিদে মনের লক্ষণ নাই; তাঁহার লজ্জাবতী লতায় মনের কিছুই পাই না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন তবে জীবের মনের প্রকাশ কোথায়? একথার তাঁহারই উত্তর দেওয়া আবশ্যক। যেহেতু

* And what is the seed but a casket of pre-arranged futurities, with its whole contents prospective, settled to be what they are by reference to ends still in the distance?—MARTINEAU.

তিনিই তাহার প্রথমোৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতেছেন। অন্তে শুদ্ধ জানি না বলিলেই যথেষ্ট। জীবজগতের উত্তেজনা (irritability) আর উদ্ভিদের উত্তেজনা সমান। একথারও তিনি কোন বিশেষ প্রমাণ দর্শান নাই।

পরিশেষে স্পেন্সরের অদ্বৈত প্রকৃতি (One primordial matter) তাঁহার কথাতেই বিশেষ দাঁড়াইতেছে না। তাঁহার মতে আকাশ ও সময়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। "As Space and Time cannot be either nonentities nor the attributes of entities, we have no choice but to consider them as entities." তাঁহার শক্তি সংস্থানও ঈশ্বরের প্রতিনিধি; সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করা আবশ্যক। তাঁহার জড়প্রকৃতি আবার শক্তিসম্ভূত অনুমান বা মানসিক জ্ঞান। "We can think of Matter only in terms of Mind." শক্তিই আমাদের উপলব্ধি; সুতরাং সেই শক্তিই আদিম প্রকৃতি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বস্তু ব্যতীত আমাদের শক্তির ধারণা নাই।

পরিণতিবাদ ঈশ্বর-দ্রোহী ও ধর্ম্ম-নাশক বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা করেন। ফলে এ কথাও মিথ্যা। ইহাতে জগতের আদি অন্ত নাই। মধ্যস্থলের ব্যাখ্যা আছে মাত্র। তবে আর ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইল কই? আর বিশেষতঃ জগতের আদি অন্ত আমাদিগের জানিবারও শক্তি নাই। যাহা প্রত্যহ দেখি তাহাই কয় সময় বুঝিতে পারি? তবে আর জগতের আদি অন্ত বলিব কি? যাহা হউক আজ কাল পরিণতিবাদের আদর সমধিক। বিজ্ঞানমণ্ডলীর আজ ঐ একমাত্র জপতপ হইয়া উঠিয়াছে। মহামতি ডার্বিণ উহার এতদূর প্রাদুর্ভাব বাড়াইয়াছেন। ফলে পরিণতিবাদ আধুনিক সম্পত্তি নহে। উহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ডার্বিণের পূর্ব্বপুরুষেরা ইহাকে এতদূর প্রগাঢ় ব্যাপার করিতে পারেন নাই। ভারতের অদ্বিতীয় রবি, জগতের প্রকৃষ্ট গুরু শাক্যসিংহের কর্ম্মসূত্রও এই। বেদে, ষড়দর্শনে, উপনিষদে, গীতায়ও ইহার প্রকৃষ্ট আভাস আছে।

সকল জ্ঞানেরই পর পর সোপান দেখা যায়। প্রথমতঃ পৃথিবীর আকার, অবয়ব, গঠন, গতি, ভার, প্রভৃতি জানা গেল। সৌরজগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ ক্রমে বিকাশ পাইল। অনন্ত জগতে ইহা যে অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার তাহা ক্রমশঃ বিশদ হইল। পরে ভূতত্ত্বে পৃথিবীর স্তরপারম্পার্য্য, বয়স প্রভৃতি জানা গেল। মনুষ্যের ইতিহাস তৎপরবর্ত্তী ঘটনা রসায়ন তৎপরে বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি খুলিয়া দিল। চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদের সংশ্লেষ বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের সাধারণ অবয়ব ও গঠন নিরাকৃত করিল। অতঃপর প্রাণিতত্ত্ব আসিয়া সকল প্রাণীর সাধারণ প্রকৃতি বহিষ্কার করিল।

জগতে কিছুই সৎ ও নিত্য নহে; সকলই অসৎ ও অনিত্য। পরিবর্ত্তন, অনন্ত পরিবর্ত্তন সকলের মাথায় লেখা; সকলই পরিবর্ত্তনের দাস। তবে সম্বন্ধ বিশেষ অপরিবর্ত্তনীয়। নিয়ম অপরিহার্য্য ও নিত্য। জ্যোতিষে জড়প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সামান্য জলজানরাশি হইতে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্যের আবির্ভাব অনুমিত। প্রতিমুহূর্ত্তেই

সকলে অবস্থা ও স্থল পরিবর্ত্তন করিতেছে। জগতে কিছুই নূতন নহে এবং আকস্মিকও হয় না। সকলেরই পূর্ব্বাপর অবস্থা আছে। আর যাহা একবার হইয়াছে তাহা আর বারান্তর তদবস্থায়ও ঠিক তাহা হইতে পারে না। শক্তি-সংস্থান ব্যাপারেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে।

জীবসংসারে উঠিলেও সেইরূপ লক্ষিত হয়। নিম্নতম উদ্ভিদ্ দেহে ত্বকের দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার জৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আবার প্রাণীতত্ত্বে আসিলে দেখিতে পাই প্রাণী বিশেষের সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়া ত্বক দ্বারা সংসাধিত হয়। উহা দেখিতে ক্ষুদ্র থলীর মত; ভিতরটী উল্টাইয়া বাহির দিকে দিলে পাকস্থলী গাত্র হয় এবং গাত্র পাকস্থলীর কার্য্য করে। উচ্চজীবে ও উদ্ভিদে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতেও এক যন্ত্রের প্রক্রিয়া অন্য যন্ত্রে কতকটা করিতে দেখা যায়।

জীবজগতে মনেরা সর্ব্বনিম্নতম সোপান এবং ইহা হইতেই সমস্ত উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ হইাছে বলিয়া অনুমিত। হেকেল বলেন মনেরা আপনিই জন্মে। ইহা জীব জগতের অতি সরল দেহ। ফলে ইহা বৈজ্ঞানিক কল্পনা মাত্র। ইহা যে নিম্নতম জীব তাহা কে বলিতে পারে? ইহা আপনি জন্মায় বলা নিতান্ত অসার কল্পনা; মনেরা যখন বিভক্ত হইয়া জন্মে তখন উহাই তাহার উৎপাদন-ক্রিয়া (reproduction) বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন সমুদ্র তলস্থ কর্দ্দম বিশেষ জড় ও জীবের মধ্যস্থল। উহা অর্দ্ধশরীরী বলিলেও বলা যায়। তবে কি জীব দেহ জগতের কাল বিশেষের ফল? পরিণতিবাদে তাহাই বলে বটে। কিন্তু এক্ষণে সে কথার মীমাংসা হইতে পারে না; আমাদেরও এক্ষণে সে কথার আবশ্যক নাই। তবে জড় হইতে জীবদেহ প্রত্যহ হইতেছে বা একবার হইয়াছে তাহা বলা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলে জড় হইতে যে জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে বলাও কল্পনা মাত্র।

জড়ের আদি, জীবের আদি, নিয়মের আদি আমাদের জ্ঞানাতীত, চিন্তাতীত ব্যাপার। তবে যত প্রকার কল্পনা হয় তাহা করা যাইতে পারে এবং যাহা যুক্তি বিবেচনা হয় তাহাও বলিবার আপত্তি নাই। ফলে তদ্বিষয়ে আমরা নির্দ্ধারিত কিছুই জানি না এবং জানিতে পারিবও না। কোন্তও একথার অনুমোদন করেন। ঐ কথা ডার্বিণেরও মতগত। আর্য্য ঋষিগণ এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং জীব ও জড়ের আদি অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত বলিয়াছেন। বর্হিজগৎ ও অন্তর্জগৎ প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এ কথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। পরিণতিবাদ আর কি?

হার্বাট স্পেন্সর বলেন যে জীবদেহের ক্ষতিপূরণ ও দানাবাঁধা এক প্রণালীর। একটি দানার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যাহার দানা সে পদার্থ প্রচুর পরিমাণে জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে রাখিলে আপনি পূর্ব্বের পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয়। ইহা আত্মপ্রকৃতিস্থ পদার্থ চতুষ্পার্শ্ব হইতে সংগ্রহ করা মাত্র। তবে জীবদেহে চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থ সংগ্রহ করিয়া বিশেষ রাসায়নিক যৌগিক পদার্থে প্রথম পরিণত করিয়া আত্মপুষ্টি সাধন করে। দানার তাহা নহে।

স্পেন্সরের সংজ্ঞায় জীবন আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ সমূহকে বাহ্যিক সম্বন্ধ সমুদায়ের একাধিক্রমে সজ্জিত ও নিয়োজিত করা মাত্র। প্রথমতঃ ইহা আহারীয় সামগ্রী হইতে উৎপন্ন শক্তি এতাধিক সংগ্রহ করে যে তাহার ব্যয় তত হয় না; সুতরাং পুষ্টি হইতে থাকে। পরে আয় ব্যয় সমান হইয়া থাকে; ক্রমে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয়, সুতরাং যান্ত্রিক কার্য্য ন্যূন হইয়া আইসে। পরিশেষে তাহা লোপ প্রাপ্ত হয়। জীবনে জীর্ণ সংস্কার আছে। জড়জগতে তাহা নাই। প্রস্তর গড়াইয়া পড়িলে ঘর্ষণে তাহার যে হ্রাস হয় তাহার আর ক্ষতিপূরণ হয় না। কিন্তু যতক্ষণ চারিধারে সংগ্রহ চলিবে জীবদেহ অবস্থা বিশেষে ততক্ষণ সংগ্রহ করিবে।

তবে জড়সমুদ্রে ভাসিতেছে বলিয়া কি জীবদেহের কার্য্যকারিতা? বায়ু থাকায় কি আমরা নিশ্বাস ফেলি; জল আছে বলিয়া কি পান করি? ইহারা কি দৈহিক কার্য্যের প্রতিকারণ? না উহারা দেহের প্রাপ্তিসুলভে আবশ্যক এবং সংগ্রহীত। যদি তাহা হইত তবে যত দিন জড়শক্তি থাকিত জীবদেহ ততদিন থাকিত। জীবদেহের আপন নিয়ম আছে বলিয়াই মৃত্যু হয়। জীবদেহের কোন শক্তিই জড়শক্তি বা তৎপ্রতিপোষক (Correlation) শক্তি নহে। জীবদেহ অজাত নহে—ইহার জন্ম আছে এবং তাহাও তদনুরূপ জীবদেহ হইতে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা জীবদেহকে যন্ত্র বিশেষ বলেন তাঁহারা অন্ধকারে আছেন। জড়শক্তিকে আত্মসাৎ করা বা নিজ প্রকৃতিস্থ করাই জীবধর্ম্ম। পুষ্টি, বৃদ্ধি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্ফূর্ত্তি সঙ্গম, জনন, ইত্যাদি ইহার প্রধান ধর্ম্ম। ইহার আর একটী লক্ষণ আছে। সচরাচর লোকে মনে করে যে জীবদেহ মৃত্যুর পর জড় প্রকৃতিতে একবারে বিলুপ্ত হয়। একথা অপ্রমাণ্য। উহা একবারে জড়পদার্থে পরিণত হয় না। ধাত্বাদি জল বায়ু, তাপ প্রভৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয়। জীবদেহ লতা (fungi) ব্যতীত জড়ে পরিণত হয় না। ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে জীবদেহ উদ্ভিদ্ ভিন্ন জড় পদার্থে পরিণত করিতে পারে না; এবং উদ্ভিদ্ ভিন্ন পুনশ্চ সেই জড় পদার্থকে উচ্চতম জীবদেহের উপযোগী করিতে পারে না। এইরূপ চক্রবৎ জীবনের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। *

ইহা হইলে ঐ মাইক্রবই জীব ও জড়জগতের মধ্যে সোপান। কোন জীবদেহই জড়-

* This is at once the beginning of the termination of the endless chain which sustains the equilibrium of nature, in which there is no creation, no destruction. Plants draw their nutriment from the soil and the air in the form of mineral solution, and are devoured by animals or by other parasites; animals are in their turn devoured by microscopic plants or microbes, and return by means of putrefaction to the condition of mineral salts, which are distributed in the soil, and serve anew for the nutrition of plants.

E. L. TROVESSART.

পদার্থে পরিণত হইতে পারে না যতক্ষণ না উহা মাইক্রবে পরিণত হয়। এক্ষণে দেখা গেল জীবন জীবন হইতে উৎপন্ন এবং জড়কে সচেতন করিবার কল। অম্লজান ব্যতীত কোন মৌলিক পদার্থ অযুক্ত না হইয়া দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। আবার উচ্চজীব-দেহ উদ্ভিদ্ না দিয়া জড়ে পরিণত হইতে পারে না।

টমসন যেমন জীবনকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনিয়াছেন; কল্পনা আবার স্বর্গের আম-দানীর জন্য পূর্ব্ববৎ ব্যগ্র হইবে। পরিণতি সুশৃঙ্খল করিবার জন্য তাহারও আবশ্যক। সোরার দানা ভাঙ্গিলে সোরার জলে রাখিলে পুনশ্চ পূর্ব্ব গঠন পায়। ম্যাক্স্ ওএল বলেন যখন কোন বাহ্যবস্তুর বিষয় বলি আমরা তখন তাহার আকার ও গঠনের পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি ও তাহার গতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ইহাতেই তাহার অবস্থান্তরিত ব্যাপারের পূর্ণ ব্যাখ্যা হইল। জীবদেহ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিলে না হয় কেন? "When a physical phenomenon can be completely described as a change in the configuration and motion of a material system, then the dynamical explanation of that phenomenon is said to be complete. We cannot conceive any further explanation to be either necessary, desirable, or possible; for as soon as we know what is meant by the words Configuration, Mass, and Force, we see that the ideas which they represent are so elementary that they cannot be explained by means of any thing else." দানা বাঁধার মত জীবন বলিতে পারিব না।

প্রফেসর হাক্সলী বলেন, অম্লজান ও জলযানের মিশ্রণে জল হয়। কিন্তু তাহাতে তাড়িত প্রবাহের আবশ্যক। বাষ্প অদৃশ্য হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে জল দেখা যায়। তাহার ভারও দুই বাষ্পের ভারের সমষ্টি। কিন্তু বাষ্পের গুণে ও জলের গুণে কত প্রভেদ? যে তাপে (৩২°) বাষ্প অণু মহাবেগে পরস্পর হইতে পৃথক্ হইবে, সেই তাপে জলের অণু ঘন হইয়া জমাট বাঁধিয়া বরফ হইবে। আমরা ইহা জলের গুণ বলি এবং সেই গুণ ঐ বাষ্পের কোন প্রকার যৌগিক গুণ সমুদ্ভূত। কিন্তু এস্থলে আমরা জলত্ব বা জলাত্মা জীবাত্মার মত আনিয়া জোড়তাড় দিই না। বলিনা যে কোনরূপে জলাত্মা ঐ বাষ্পাচ্ছাদনে প্রবেশ করিয়া এইরূপ ভ্রূকুটি করিতেছে। তবে অঙ্গারক জল ও এমনিয়া বিলুপ্ত হইয়া তাহাদের প্রাদুর্ভাবে ও পূর্ব্ব সংস্থিত প্রটপ্লাজমের (Protoplasm) বলে ততটুকু জৈবনি পদার্থ বা জীবন পাইলে গোল করি কেন? এ যৌগিকেও তো মৌলিক গুণের সমতা রহিল না। পূর্ব্বত প্রটপ্লাজামের কার্য্য বুঝিতে পারিলাম না সত্য; কিন্তু তাড়িত স্ফুলিঙ্গের কার্য্যে বায়ুদ্বয় কি হইল তাহাই বা কে জানে? তবে জড়ে জীবাত্মার কল্পনা আইসে কেন এবং জলাত্মার কথাই বা আইসে না কেন? যদি জলের মায়া জলের গুণ হয় তবে প্রটপ্লাজমের মায়া তাহার গুণ নহে কেন? যদি জলের গুণ তাহার দ্ব্যণুকের প্রকৃতি ও সাজানর উপর নির্ভর করে তবে প্রটপ্লাজমের তাহা না হইবে কেন? এ স্থলে হক্সলির

জিজ্ঞাসাতেই তাঁহার উত্তর আছে। তিনি বলেন কেন করি? ইহার উত্তর তিনি দিবেন, না অপরে? অবশ্য এ ব্যাখ্যায় মনের তৃপ্তি হয় না। জীবের ব্যাখ্যা জড়ে পাই না, নতুবা কেন অস্বীকার করিব? ইহাতে ইচ্ছা নাই, ছল নাই, না করিব তবে কেন? ব্যাখ্যা পাই না, তাই করি। মনুষ্য মনে ইহার কারণ আছে—ব্যাখ্যায় নহে।

দানার ব্যাখ্যায় জীবনের ব্যাখ্যা নাই। জীবন চতুর্সীমাস্থ পদার্থ আহরণোপ-যোগী থাকিলেও জীবের মৃত্যু হয় কেন? দানা দানাই থাকে। দানার বৃদ্ধি জীবের বৃদ্ধি নহে। দানার নাশ জীবনাশ নহে। দানার বাল্য, যুবা, প্রৌঢ়াবস্থা নাই, একই অবস্থা। দানা বাঁধিবার সময় পূর্ণাপূর্ণ ভাব আছে; কিন্তু পূর্ণায়তনে কোন ভেদাভেদই নাই।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

রবার্ট ব্রুসের গল্প।

(সুবিখ্যাত সার ওয়াল্টার স্কটের উপাখ্যান হইতে)

ইতিহাসজ্ঞ সকলেই স্কটলণ্ডের চিরকীর্ত্তি, স্বদেশ-প্রেমিক রবার্ট ব্রুসের কথা জানেন, ব্যানকবর্ণের অদ্ভুদ যুদ্ধ-কৌশলও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। ব্যানকবর্ণের যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে স্কট্লণ্ডের তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে নদীকূলে এবং নদীতীর হইতে শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্যে সামান্য তস্করের ন্যায় বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কখনো কখনো সমস্ত দিন বৃক্ষশিরে আরোহণ করিয়া কাটাইতে হইয়াছে, কখন বা সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত পর্ব্বত-শৃঙ্গে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, হিম যামিনীর তুহিনধারাপাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হন নাই। গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহাকে যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইতে হই-য়াছে কোন ঔপন্যাসিক বিপদই তাহা অপেক্ষা ভয়ানক হইতে পারে না। 'History is stranger than fiction' একথা তাঁহার জীবনের প্রতি ছত্রে প্রমাণিত হয়।

তখনও ব্রুস্ একান্ত নিঃসহায় হন নাই, এখন পর্য্যন্ত কয়েকজন প্রভুভক্ত সৈনিক তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। প্রভুকে স্কট্লণ্ডের—স্বদেশের গৌরবময় সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সুখী হওয়া কিম্বা বিপন্নিমগ্ন প্রভুর জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত-ভাবে যুদ্ধ করা ভিন্ন তাহাদের অপর অভিলাষ ছিল না। এইসময় ব্রুস্ স্কট্লণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে গ্যালওয়ে (Galloway) নামক স্থানে লুকাইয়া বাস করিতেছিলেন, পেম্-

ব্রোকের আর্ল এবং জন্ অব্ লর্ণ তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় এই সংবাদ পাইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রুস্ তাঁহার অন্যত প্রতিদ্বন্দ্বী জনের আত্মীয় কমিন(Comyn)কে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিশো স্পৃহায় জন উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্যালোয়ে সৈন্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যদি সম্ভব হইত এই সেনাপতিদ্বয়ের সমবেত সৈন্যের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে ব্রুস্ হৃদয়-শোণিত অকাতরে দান করিতে পারিতেন, কিন্তু এই বিশাল সৈন্য স্রোতের সহিত তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যের যুদ্ধ বাতুলতা মাত্র, সুতরাং পলায়ন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তদন্তর তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন মুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন, এবং নিজে তাহারই একদলের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। বৃথা তিনি ভাবিয়াছিলেন শত্রুদল তাঁহার অনুসরণে অক্ষম হইবে! ব্রুসের একটি কুক্কুর ছিল, তিনি স্বহস্তে তাহাকে আহার করাইতেন, এবং সে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিত। দুর্দ্দিনে কুক্কুর শত্রু হস্তগত হয়, জন বুঝিয়াছিলেন তাহার প্রভু যেখানেই থাকুন সারমেয় তাঁহার অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবেই, এখন এই কুক্কুর সাহায্যেই তিনি সসৈন্যে যে সৈন্যদলে ছিলেন, সেই দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ব্রুস্ দেখিলেন এক বৃহৎ সৈন্যদল তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে, পলায়নের অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিলে শীঘ্রই শত্রু-হস্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে, সুতরাং তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে বিভিন্ন দিকে পাঠাইয়া একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর ধাত্রীপুত্রের সহিত একদিকে পলায়ন করিলেন, ভাবিলেন এবার নিশ্চয়ই শত্রুকুল তাহার সন্ধান না পাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া যাইবে।

যেখানে আসিয়া ব্রুসের অনুচরবর্গ বিভিন্নমুখে যাত্রা করিয়াছিল, জন সেইখানে কুক্কুর-টিকে আনিয়া উপস্থিত করিলে সে কিয়ৎকাল সেইস্থানে চতুষ্পার্শ আঘ্রাণ করিতে লাগিল, তাহার পর অন্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া যে পথে ব্রুস্ ও তাঁহার ধাত্রীপুত্র গিয়াছিলেন সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, জন বুঝিতে পারিলেন অগ্রগামী যুবকদ্বয়ের অন্যতর নিশ্চয়ই ব্রুস্। কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার পাঁচ জন পদাতিক সৈন্যের প্রতি ব্রুসকে জীবন্ত বন্ধন অথবা বধ করিবার আদেশ দিয়া তাঁহা-দের পশ্চাৎধাবিত হইলেন। সেই পঞ্চবীর শীঘ্রই ব্রুস্ ও তাঁহার অনুচরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল, দুইজনের বিপক্ষে পাঁচজন সশস্ত্র হাইল্যাণ্ডার, (Highlander) অতি ভয়ানক কথা! আর সময় নাই, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা ব্রুসের উপর আসিয়া পড়িবে হয়ত এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত শেষ করিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা ব্রুসের জীবনে নূতন বিপদ নহে, এরূপ অনেক বিপদ তিনি নিশ্চিন্তভাবে অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি আর পলায়ন বিধেয় বিবেচনা করিলেন না, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ যথারীতি পরিধানপূর্ব্বক ধাত্রীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি তাঁহার জন্য কি প্রকার

সাহায্য করিতে প্রস্তুত? বিশ্বস্ত ধাত্রীপুত্র অকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "প্রভুর জন্য আমি অম্লানভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, প্রভুর উপকারের জন্য আমার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু সানন্দ-চিত্তে অর্পণ করা ভিন্ন দাসের অন্য কামনা নাই, আসুন আমরা দুইজনে ঐ পঞ্চ নরাধমের প্রাণবিনাশ করি।" তাহাই হইল, জন-প্রেরিত পঞ্চজন অস্ত্র-ধারীই একে একে ভূতলশায়ী হইল; উভয়ে অভিষ্টপথে চলিলেন।

ব্রুস্ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি একটু বসিয়া বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, কি জানি যদি অতর্কিতভাবে শত্রুগণ নিকটে আসিয়া পড়ে! অধিকন্তু যখনই তাঁহারা দুই এক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইতেন—পশ্চাতে সেই কুক্কুরের চীৎকার শুনিতে পাইতেন সুতরাং বুঝিতে পারিতেন শত্রুগণ তাঁহার অনুসরণে বিরত হয় নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন তাহার ভিতর দিয়া একটী স্বচ্ছ-সলিলা তটিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, দেখিয়া ব্রুস্ তাঁহার সহচরকে কহিলেন "চল, আমরা নদী জলে পা রাখিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া যাই, তাহা হইলে হতভাগ্য কুক্কুর আর ঘ্রাণে পদচিহ্নের অনুগমন করিতে পারিবে না, যদি কোন প্রকারে আমরা তাহার হাত এড়াইতে পারি তাহা হইলেই নিরাপদ হইলাম বুঝিতে পারিব।" তাঁহারা সেইরূপই করি-লেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে জন কুক্কুর লইয়া নদীর তীরে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু ঘ্রাণ না পাওয়ায় কুক্কুর কোন দিকে না যাইয়া সেই স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; কুক্কুরের এই অবস্থা দেখিয়া জন অনন্যোপায় হইয়া সেই স্থান হইতে অনুসরণে বিরত হইয়া অবিলম্বে পেমব্রোকের আর্লের সহিত মিলিত হইলেন।

এই স্থানেই রবার্ট ব্রুসের বিপদের শেষ হইল একথা কেহ মনে করিবেন না; তাঁহারা জঙ্গলে বিশ্রাম করিতে বসিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় ও গুরুতর পরিশ্রম হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; যাহা হউক কোন লোকালয় পাইবার আশায় তাঁহারা পুনর্ব্বার ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিয়ৎকাল পরে সেই জঙ্গলের ভিতর তাঁহারা তিন জন লোক দেখিতে পাইলেন, দেখিবামাত্র তাঁহারা বুঝিলেন যে ইহারা চোর অথবা দুষ্ট লোক। তাহারা সকলেই অস্ত্রধারী, তাহাদের মধ্যে একজনের পৃষ্ঠদেশে একটী মেষ, সেটী যে তাহারা কোথাও হইতে চুরি করিয়াছে তাহা তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক তাহারা ব্রুস্কে দেখিয়া সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া অভ্যর্থনা করিল, ব্রুস্ও প্রতি নমস্কার পূর্ব্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা কোথায় যাইতেছে। তাহারা উত্তর করিল, "রবার্ট ব্রুসের অনুসন্ধানে আমরা বনে বনে ফিরিতেছি, তাঁহার সহিত যোগ দেওয়াই আমাদের বাসনা।" রাজা উত্তর করিলেন "যদি তোমরা আমার সহিত যাও তাহা হইলে তোমাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি।" যে অভ্যাগত ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে ব্রুসের সহিত কথা কহিতেছিল সে সহসা মুখ

ফিরাইল—তখন রাজার মনে হইল যে হয়ত তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তিনি আরও সন্দেহ করিলেন যে, এই নরাধমেরা হয়ত শত্রুগণের নিকট পুরস্কার-লোভে তাঁহার প্রাণ-বিনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "বন্ধুগণ, যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট সুপরিচিত নহি, তখন তোমাদের উচিত অগ্রবর্ত্তী হওয়া, আমরা তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আমাদের দ্বারা অপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।" ক্রুস্ উত্তর করিলেন "আমারও সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু এইরূপ নিয়মে ভ্রমণ করাই আমার প্রকৃতি-সিদ্ধ।"

আর কোন আপত্তি না করিয়া তাহারা তাঁহার কথামত অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, কিছু ক্ষণের মধ্যে তাহারা একখানি ভগ্ন, পরিত্যক্ত কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল; সেই স্থানে তাহারা সেই মেষটী বন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আহারের কথা শুনিয়া রাজার মনে কিঞ্চিৎ হর্ষোদয় হইল, তিনি ও তাঁহার ধাত্রীপুত্র সেই গৃহের এক কোণে একটী স্বতন্ত্র চুল্লিতে আপনাদের জন্য মাংস পাক করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সিদ্ধ মাংস অন্য মসলা দূরের কথা তাহাতে লবণ পর্য্যন্ত নাই, রাজা তাহাই সানন্দ-চিত্তে ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবারণ করিলেন।

এতক্ষণ পরে প্রবল নিদ্রা আসিয়া ক্রুস্‌কে কাতর করিয়া ফেলিল, নিদ্রাভরে চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল, কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাইবার জন্য এতই উৎসুক হইয়া পড়িলেন যে নব-পরিচিতগণের প্রতি বিশেষ সন্দেহ জন্মানসত্ত্বেও তাঁহার সহচরকে বলিলেন 'আমি খানিক ক্ষণ ঘুমাইয়া লই তুমি সে পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে চেষ্টা কর।' তাঁহার সহচরও তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তিনিও ক্রুসের ন্যায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় আবরণ করিয়া ফেলিল, তিনি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভুর পার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সেই পিশাচ-ত্রয় ক্রুস্ ও তাঁহার সহচরকে এই প্রকারে নিদ্রামগ্ন দেখিয়া পরস্পরের প্রতি একবার চাহিল, পাশব-হাস্যে তাহাদের মুখমণ্ডল বীভৎস ভাব ধারণ করিল; বিলম্ব করিলে মনোরথ সিদ্ধির পক্ষে বাধা জন্মিতে পারে ভাবিয়া পাপিষ্ঠগণ সশস্ত্র হইয়া দ্রুত অথচ ধীর পদ-বিক্ষেপে নিদ্রিত বীরদ্বয়ের নিকটে আসিতে লাগিল। এখনও তাঁহারা নিদ্রামগ্ন, এ ঘোর বিপদের কথা তাঁহারা জানিতে পারিতেছেন না, এই নিদ্রা হয়ত তাঁহাদের ইহ জীবনের শেষ নিদ্রা, হয়ত মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়ের হৃদয়-শোণিতে এই পিশাচদিগের তরবারি রঞ্জিত হইবে, হয়ত এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই মূল্যবান জীবনদ্বয়—যাহা শত আহবে শত্রু সৈন্যের সুলক্ষিত অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, আজ এই নির্ব্বাসিত ভগ্ন কুটীর প্রাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকের ছুরিকাঘাতে বিনষ্ট হইবে, কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে? কিন্তু ক্রুসের ইহা নূতন নহে, এ প্রকার বিপদ

তাঁহার জীবনে অনেকবার ঘটিয়াছে, বিশ্বাসঘাতকদিগের ধীর পদক্ষেপেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মহারা না হইয়া বিদ্যুদ্বেগে কটীদেশ হইতে বিশাল তরবারী আকর্ষণ করিয়া বীরদর্পে শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন। ক্রুস সহসা দেখিলেন পার্শ্বদেশে প্রভু-ভক্ত সহচর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, ডাকিয়া উঠাইবার আর সময় নাই, পদাঘাতে তাঁহাকে জাগরিত করাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং প্রচণ্ড বেগে তিনজনকেই আক্রমণ করিলেন, তাহারা দেখিল তাঁহার একের বীর্য্যই অসীম, ইহার উপর যদি প্রভুভক্ত সহচর তাঁহার রক্ষায় অগ্রসর হয় তবে দুই জনের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তড়িৎ গতিতে একজন ধাত্রীপুত্রের নিকট আসিয়া পড়িল। তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়াছেন মাত্র, তখনও চক্ষু হইতে নিদ্রার ঘোর অপনীত হয় নাই সহসা শত্রুর তীক্ষ্ণ তরবারীতে তাঁহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত হইয়া পড়িল।

তিন জনের বিরুদ্ধে একের যুদ্ধ সহজ ব্যাপার নহে, কিন্তু সহজ না হইলেও ক্রুসের পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে, এরূপ বিপদে পড়িয়া অনেকবার তিনি রক্ষা পাইয়াছেন এবারও পাইলেন,—তাঁহার অতি-মানবিক দেহ-বল, তাঁহার অদ্ভুৎ বর্ম্ম, বিশাল তরবারী এবং আশ্চর্য্য যুদ্ধ-কৌশল ঘোর বিপদ হইতে আর একবার তাঁহাকে রক্ষা করিল, তিন জন শত্রুকেই তিনি পরাস্থ ও নিহত করিলেন।

প্রভুভক্ত অনুচরের মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ধীরে ধীরে সেই কুটীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি আপনার অন্যান্য অনুচরের সন্ধানে চলিলেন। একটী ক্ষুদ্র গোলাবাড়ীতে অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইবার কথা ছিল, অতি সাবধানে সেইদিকে চলিলেন কিন্তু পদে পদে পথভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন, নিকটে লোকালয় মাত্র নাই, চতুর্দ্দিকে নির্জ্জন অরণ্য ও প্রান্তর আর সেই বিজন অরণ্য ও প্রান্তর-প্রবাহিত নৈশ বায়ু হুহুশব্দে চতুর্দ্দিকে পৈশাচিক হাস্যের প্রতিধ্বনি তুলিতেছে এবং তাঁহার শ্রান্ত, কাতর অবসন্ন তুষারার্দ্র দেহে মর্ম্মে মর্ম্মে শৈত্য বিঁধাইয়া দিতেছে। অতি ধীরে, অতি সাবধানতার সহিত চলিয়া গভীর নিশীথে তিনি সেই গোলাবাড়ীর সম্মুখীন হইলেন সাহসে ভর করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সম্মুখেই একজন বৃদ্ধা একাকী উপবিষ্টা। ক্রুস্ তাঁহাকে গৃহ-স্বামিনী বলিয়া অনুমান করিয়া লইলেন। বৃদ্ধাও এত গভীর রাত্রে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, কি উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ক্রুস্ উত্তর করিলেন "আমি একজন পরিব্রাজক, সম্প্রতি এই দেশে পরিভ্রমণ করিতেছি।"

সরল-হৃদয়া বৃদ্ধা উত্তর করিলেন "আমার কোন উপাস্য দেবতার মঙ্গলার্থ অমি এখানে অতিথী-সৎকার-ব্রত আরম্ভ করিয়াছি, মানস করিয়াছি যতদিন ব্রত উদ্যাপিত না হয় সকল পথিককে সাদরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে অভ্যর্থনা করিব।"

কম্পিত হৃদয়ে, উদ্বেগ-পূর্ণ স্বরে ক্রস্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার মঙ্গলার্থ আপনি এই সদ্‌ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

বৃদ্ধা মধুর স্বরে উত্তর করিলেন "আমাদের ন্যায়বান্ অধীশ্বর রবার্ট ক্রস্—তিনিই আমাদের দেশের প্রকৃত রাজা, স্কটলণ্ডের সিংহাসন তাঁহারই, যদিও তিনি এখন শত্রুগণ কর্ত্তৃক বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিতাড়িত হইতেছেন তথাপি আমার বিশ্বাস তিনি শীঘ্রই স্কটলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন, সেই দিন আমার এ ব্রত সাঙ্গ হইবে; আমি যে এত বৃদ্ধ হইয়াছি তথাপি সেই সুখের দিন দেখিবার আশা করিয়াই বাঁচিয়া আছি।" কুটীরের সামান্য আলোকে ক্রস্ দেখিলেন বৃদ্ধার চক্ষুপ্রান্তে একবিন্দু জল।

আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইল, হর্ষে কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল,আবেগের সহিত বলিলেন "যে রাজা প্রজার এতদূর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র, গৃহহীন শত্রুতাড়িত, অরণ্য-প্রবাসী হইলেও তিনি কত সুখী! বৎসে, তুমি আমাকে বড়ই সুখী করিলে, তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমার চিরদিন মনে থাকিবে, আমিই তোমাদের হতভাগ্য রাজা রবার্ট ক্রস্।"

উচ্ছ্বসিত অশ্রু বৃদ্ধার ক্ষীণ, মলিন গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, যুগপৎ ভয়,আহ্লাদ ও বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে নতজানু হইয়া বৃদ্ধা রাজ্যেশ্বরের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ANIMAL MAGNETISM:

বা

জান্তব চুম্বক-শক্তি।

আমাদিগের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য উপরের লিখিত বস্তুশক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করেন। কিছুদিন হইল আমার একটী বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত ঐ বিষয়ে কথা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিজে অবিশ্বাস প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন যে, উল্লিখিত বস্তুশক্তির অস্তিত্ব এক্ষণে সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু যৎকালে ঐ শক্তির প্রথম আবিষ্ক্রিয়া হয়, তখন উহার বিষয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা হইয়াছিল, সেই পরীক্ষার ফল কি হইল, তাহা প্রতিপাদন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

মেস্‌মার্ নামক জর্ম্মন পণ্ডিত ঐ বস্তুশক্তির আবিষ্ক্রিয়া-কর্ত্তা। একারণ উহাকে মেস্‌মরিস্‌ম্‌ও কহে। তিনি কহেন যে, যেমন তাড়িত নামক একটী বস্তুশক্তি আছে, অথবা তাপ অথবা আলোক, তদ্রূপ জান্তব চুম্বক-শক্তি নামক এক পদার্থ আছে। ইহার

আকার অতি সূক্ষ্ম তরল দ্রব্য। ইহার অনেক বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে। ঐ পদার্থ সর্ব্বত্র সূক্ষ্মভাবে বিস্তারিত আছে। যেরূপ বায়ু সর্ব্বত্র বিস্তারিত আছে, তদ্রূপ উহাও সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তাড়িত নামক পদার্থ যেরূপ আলোক ও উত্তাপের দ্বারা আপনার বিদ্যমানতা প্রকাশ করে, জান্তব চুম্বকশক্তি তাহা করে না। জান্তব চুম্বকশক্তির কার্য্যকারিতা জন্তুদিগের স্নায়ুর উপর প্রকাশ পায়। যদি তুমি আর একজন ব্যক্তির চক্ষের সম্মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত তোমার নিজের করতল মন্দ মন্দ সঞ্চালিত কর তাহা হইলে সেই ব্যক্তি গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইবে, ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে,এত অচৈতন্য যে তাহার হস্তপদাদি ছেদন করিলেও সে জানিতে পারিবে না। ইহা উল্লিখিত শক্তির কার্য্য। জান্তব চুম্বকবাদীরা এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, পূর্ব্বোক্ত বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম তরল বস্তু আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদিকে পরস্পর সংযোজিত করিতেছে; ইহার প্রবাহ প্রতি-প্রবাহ আছে অর্থাৎ কখন একদিকে প্রবাহিত হয় পুনর্ব্বার প্রতিকূলদিকে ফিরিয়া যায়; ইহাকে জন্তুদিগের স্নায়ুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তদ্দ্বারা ব্যারাম আরাম হইতে পারে অন্যান্য উপকারও হইতে পারে। মেস্‌মার্ আরো কহিতেন যে, ঐ তরল বস্তুকে অন্য কোন দ্রব্যের সহকারিতা ব্যতিরেকে স্থান বিশেষে পুঞ্জীভূত করা যাইতে পারে, একস্থানে ঘনীভূত করা যাইতে পারে, স্থানান্তরে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। ইহা আলোকের ন্যায় প্রতিফলিত হয়, এবং সুমধুর সংগীত ধ্বনি দ্বারা উহা সঞ্চালিত হয়। যদিচ তরল বস্তুটি বিশ্বব্যাপী, তথাপি উহা সকল শরীরে সমভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ শরীর বিশেষের এমন কোন গুণ থাকিতে পারে যে, তাহাতে উহার প্রবেশ করিতে বিলম্ব হয়, অথবা আদৌ প্রবেশ হয় না। কোন কোন শরীর আবার এ প্রকার আছে, যে তাহাদিগের নিকট ঐ বস্তু আদৌ কোন কার্য্যকারিতা প্রকাশ করিতে পারে না, এমন কি সেই সন্নিধান বশতঃ অন্যান্য বস্তুতে পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যকারিতা খাটে না। মেস্‌মারের মতে ঐ তরল বস্তুর প্রয়োগ দ্বারা স্নায়ুগত যাবতীয় রোগ আরাম করা যাইতে পারে; এবং স্নায়ুর উপর কার্য্যকারিতা প্রকাশ করিয়া উহা স্নায়ু ভিন্ন অন্য অন্য অবয়বের রোগও আরাম করিতে পারে। ইহার সাহায্যে অনেক উৎকট ব্যাধি কি কারণে উৎপন্ন হইয়া কিরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা নিরূপিত হইতে পারে। ফলতঃ মেস্‌মারের মতে জান্তব চুম্বক নামক পদার্থ রোগনির্ণয় ও রোগচিকিৎসা বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী হইতে পারে। ইহা দ্বারা নরজাতির দেহ রক্ষাকার্য্য অতি সুন্দররূপে সাধিত হইতে পারে।

মেস্‌মার্ বিয়েনা নগরে এই সমস্ত মত সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন। তাঁহার মত সমূহ ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট প্রচারিত হইয়াছিল। পারিস্ নগরের বিজ্ঞান-সমাজ এবং লণ্ডনের রয়াল সোসাইটী নামক পণ্ডিত সমাজ তদীয় মত

সমূহের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। বার্লিনের পণ্ডিতগণ উহা আলোচনা পূর্ব্বক মেস্‌মারকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার মতসমূহ নিতান্ত ভ্রমাত্মক। মেস্‌মার পারিসে আসিয়া পুনর্ব্বার বিজ্ঞান-সমাজের সহিত নিজ মতের বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রস্তাব করেন। সমাজ কহিয়াছিলেন, কেবল মুখে বাদানুবাদ করা অপেক্ষা কতকগুলি ব্যক্তির উপর ঐ চুম্বক-শক্তির কার্য্যকারিতা কি প্রকার হয়, তাহা পরীক্ষা করা যাউক। তাহাতে মেস্‌মার উত্তর করেন যে, তাদৃশ পরীক্ষা কেবল 'ছেলে খেলা' মাত্র। পারিসে রাজপ্রতিষ্ঠিত এক চিকিৎসা-সমাজ আছে। জনরব উঠিয়াছিল যে মেস্‌মার্ চুম্বক-শক্তির দ্বারা অনেক রোগ আরাম করিতেছেন। চিকিৎসা সমাজের সভ্যদিগকে যখন বলা হইল যে, ঐ সমস্ত আরাম প্রকৃত কি মিথ্যা, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, তখন সভ্যেরা কহিলেন, যে আরোগ্যের পূর্ব্বে আমরা রোগীদিগের অবস্থা দেখিতে চাই। মেস্‌মার্ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, আমি যাঁহাদিগকে আরাম করিতেছি, তাঁহারা ভদ্রলোক তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস করা উচিত। পণ্ডিতমণ্ডলী যদিও এইরূপে অবিশ্বাস-পরতন্ত্র হইয়া রহিলেন, মেস্‌মার্ কিন্তু ফ্রান্সে আপামর সাধারণের নিকট অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তৎকালীন রাজমন্ত্রী মেসমারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 'আপনি যদি তিনটি বিদ্বান্ ব্যক্তিকে আপনার কার্য্য-প্রণালী দেখিতে দেন, তবে আপনাকে বার্ষিক দশহাজার টাকা করিয়া রাজকোষ হইতে দেওয়া যাইবেক।' মেসমার্ কহিলেন, 'যদি আমাকে পারিসের সন্নিহিত একটি জমীদারী লিখিয়া দেন, তাহা হইলে আমি সম্মত হই।' ফ্রান্সের রাজার নিকট সমাদর না পাওয়াতে মেস্‌মার্ ক্রোধভরে ফ্রান্স ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েক জন শিষ্য ঐ দেশে চুম্বক শক্তির ক্রিয়াপ্রণালী দেখাইতে লাগিল। পরিশেষে বিজ্ঞান সমাজ হইতে পাঁচ জন প্রধান পণ্ডিত সেই ক্রিয়া-প্রণালী দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদিগের নাম ভুবন-বিখ্যাত। সেই পাঁচজনের নাম এই, লেরোয়া, বোরী, লাভোশিয়র, ফ্রাঙ্‌ক্‌লিন্ ও বেলী। তন্মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইল যে, পরীক্ষা দ্বারা যাহা স্থির হয়, তদ্বিষয়ের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিবেন। তাঁহার প্রণীত বিজ্ঞাপনী ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত হয়। মেস্‌মারের একজন শিষ্য, নাম ডেল্‌সেঁ, তাঁহার কৃত কার্য্য-প্রণালী দর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত স্থির করেন। প্রধান জিজ্ঞাস্য এই ছিল, জান্তব চুম্বক-শক্তি নামক কোন বস্তু সত্যই আছে কিনা, এবং উহা দ্বারা রোগ আরাম হয় কি না। তাড়িত নামক কোন বস্তু আছে কি না, ইহা লোককে সহজে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, যেহেতু উহা দ্বারা আলোক জন্মে, উত্তাপও নির্গত হয়। কিন্তু জান্তব চুম্বক-শক্তিদ্বারা আলোক জন্মে না, উত্তাপও নির্গত হয় না; অতএব জান্তব শক্তির অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। তবে রোগ আরোগ্য করিয়া উহার ক্রিয়াশক্তি প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। মেস্‌মারের শিষ্যেরা একটী দণ্ড

রোগীর নিকটে সঞ্চালন করিয়া রোগ আরামের চেষ্টা করেন; তাঁহাদিগের দ্বিতীয় উপায় জল-পড়া খাইতে দেওয়া। বেলীর প্রণীত 'জান্তব চুম্বক-শক্তি'-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনীতে যাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপনী লেখক কহেন, "জান্তব চুম্বক-শক্তি নামক বস্তু আছে কিনা, তাহা ব্যাধির উপশম দেখিয়া নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। অনেক ব্যাধি আপনা হইতেই উপশম হয়। সুতরাং বিস্তর উপশমের দৃষ্টান্ত না দেখিলে স্থির করা যায় না। অতএব ঐ শক্তি দ্বারা তখনি তখনি যে যে কার্য্যকারিতা প্রদর্শিত হয়, তাহা দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে। মেস্‌মার্ মতাবলম্বীরা কহেন, ঐ বস্তু কাহারো শরীরে চালিত করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার এক অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাকে উহারা 'অত্যারূঢ়ি' বা 'অতি-বিকার' (crisis) এই সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। সেই সময়ে ঐ ব্যক্তি হাত পা খেঁচিতে থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই ঐ অবস্থা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেস্‌মার্-শিষ্যেরা যাহার শরীরে ঐ শক্তি সঞ্চালিত করেন, যদি হঠাৎ সেই ব্যক্তির কোন স্থানে উত্তাপ অনুভব হয়, অথবা অন্য কোন বিশেষ অনুভব হয়, তাহারা উহা চুম্বক-শক্তির কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাহা সংগত নহে। কিন্তু যিনি যতই সুস্থ শরীর হউন না কেন, যদি নিস্তব্ধ চিত্তে কেহ আপনার শরীরের মধ্যে কি হইতেছে কিয়ৎক্ষণ প্রণিধান করিয়া দেখেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের মধ্যে নানাবিধ অনুভব সর্ব্বদাই চলিতেছে। কোথাও কিঞ্চিৎ তাপ উপলব্ধি হয়, কোথাও বা সামান্যরূপ কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভূত হয়, কোথাও যেন কিছু নড়িতেছে, কোথাও যেন ভাবান্তর হইতেছে। ইত্যাদি। যদি জান্তব চুম্বক-শক্তি একটী যথার্থ বস্তু হয়, তবে ঐ সমস্ত অন্য ভাবের দ্বারা উহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবেক না। এমন কোন গুরুতর বা উৎকট উপলব্ধি হওয়া চাই যে, জোর করিয়া চিত্রকে আকর্ষণ করিতে পারে। সে দিকে মন থাকুক আর না থাকুক, অবশ্যই তাহা টের পাইতে হইবে। কিন্তু পঞ্চ পরীক্ষকের উপর যখন প্রক্রিয়া করা হইল, তখন তাঁহারা কিছুই টের পাইলেন না। প্রথমে সুস্থ ব্যক্তিদিগের উপর প্রক্রিয়া করা হইল। পরে চৌদ্দ জন রোগীর উপর প্রক্রিয়া হইল। তন্মধ্যে নয় জন কিছুই টের পাইলেন না, পাঁচ জন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টের পাইলেন। যদি কেহ বিশ্বাস না করে তাহার উপর কোন কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয় না। বালকদিগের উপরও ঐ প্রক্রিয়ার কোন ফল দর্শে না। পক্ষান্তরে, কোন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া মিছা মিছা প্রক্রিয়া করিলেও চুম্বক-শক্তির ন্যায় কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। অপিচ, যদি চক্ষু বাঁধিয়া কাহারো শরীরে চুম্বক-শক্তি প্রয়োগ কর, তবে শরীরের যে অংশে শক্তি প্রয়োজিত হইতেছে, হয়ত সে ব্যক্তি মনে করিবে যে, অন্য এক অবয়বে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। কখন চক্ষু-বাঁধা ব্যক্তির প্রক্রিয়া না করিলেও সে ভাবে, প্রক্রিয়া চলিতেছে। কখন প্রক্রিয়া করিলেও সে কিছুই

টের পায় না। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, কল্পনা শক্তির প্রভাবেও অনেক সময় এরূপ অনুভব ঘটিয়া থাকে। একদা একটী সুশিক্ষিত ডাক্তার ভাবিলেন যে, তাঁহাকে দশ মিনিট ধরিয়া চুম্বক-শক্তির দ্বারা সমাকুলিত করা হইয়াছে, অথচ বাস্তবিক কিছুই করা হয় নাই। তিনি কিন্তু কহিলেন যে, তাঁহার কোমরের মধ্যে যেন জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় অনুভব হইতেছে। একদা ফ্রাঙ্কলিনের উদ্যান মধ্যে এক ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়া বলা হইল যে, একটী বৃক্ষে চুম্বকশক্তি পরিপূরিত করিয়া রাখা হইয়াছে। সে তাহা শুনিয়া উদ্যানের একটী বৃক্ষ আলিঙ্গন পূর্ব্বক হাত পা খেঁচিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে বৃক্ষ চুম্বকশক্তি যুক্ত করা হইয়াছিল, সেটী নহে। তাহার অনেক দূরবর্ত্তী আর একটী বৃক্ষ ধরিয়া সে ঐ রূপ করিতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে কাহার না প্রত্যয় হইবে, যে চুম্বক-শক্তির কার্য্য বলিয়া যাহা প্রতিপন্ন করা হয়, তাহা কেবল কল্পনা শক্তির কার্য্য। যদি বল কল্পনা শক্তির এতাদৃশ কার্য্যকারিতা শরীরের উপর খাটে না, তাহা হইলে উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কখন কখন তবে এক রাত্রের মধ্যে চুল পাকিয়া যায়, শোকে লোকের পীত রোগ (যাবা) উপস্থিত হয়; ঘরে আগুণ লাগিয়া কখন কখন বহুকালের পক্ষাঘাত রোগগ্রস্থ ব্যক্তির হাত পা খুলিয়া যায়; কোন বিষয়ে দৃঢ়রূপে অভিনিবেশ করিতে পারিলে হিক্কা সারিয়া যায়। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনীতে আরো লিখিত আছে যে, বহুতর ব্যক্তিকে এক সঙ্গে প্রক্রিয়াধীন করিলে উহার কার্য্যকারিতা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যদি অনেক দর্শক উপস্থিত থাকে, যদি আবার তাহারা মধ্যে মধ্যে বাহক দেয়,তাহা হইলে প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তির উপর কোনই ফল দর্শে না। আমাদিগের দেশে অনেকে মেস্‌মর্‌ উদ্ভাবিত প্রাকৃতিক শক্তি বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য কারণভার বিষয়ে তত দূর মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন যে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নিকটে হস্তপদাদি অথবা চুম্বকীকৃত দণ্ড সঞ্চালন পূর্ব্বক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইতে পারেন। তাঁহারা ভাবেন, উহা দ্বারা অচৈতন্য সম্পাদিত হইতে পারে, রোগ আরাম হইতে পারে, পরোক্ষ বস্তু দর্শন হইতে পারে, দূরস্থিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন হইতে পারে,অপ্রত্যক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ইত্যাদি। তাঁহারা আরো বিশ্বাস করেন, যে উপদেষ্টার নিকট শিক্ষালাভ পূর্ব্বক অভ্যাস করিতে পারিলে ক্রমে চুম্বক-শক্তি পরিচালিত করিবার অসামান্য ক্ষমতা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা কোন কোন অলৌকিক ও দেব তুল্য শক্তির অধিকারী হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মেস্‌মার্‌ নিজে অতদূর বলিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি কেবল জান্তব চুম্বক-শক্তি নামক সূক্ষ্ম তরল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কত গুলি আশ্চর্য্য ঘটনার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই আশ্চর্য্য ঘটনা বিনা ঔষধ প্রয়োগে উৎকট উৎকট পীড়া আরাম হওয়া এবং প্রগাঢ় অচৈতন্য হওয়া এবং মৃগী রোগের মত অনিচ্ছাকৃত হস্তপদাদি সঞ্চালন হওয়া। পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ফরাশি পণ্ডিত

কেবল তদ্বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনুসন্ধানের পর তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল যে, জান্তব চুম্বক নামক বস্তু বিশেষ কল্পনা করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই; যে যে আশ্চর্য্য ঘটনার কারণ নির্ণয়ের জন্য উহার কল্পনা করা হয় সেই সেই ঘটনার কারণ অন্য অন্য আছে। প্রধানতঃ তাঁহারা ভাবনা-শক্তিকে (Imagination) অনেক ঘটনার কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। মনে মনে চিন্তা করিয়া যে সময় বিশেষে রোগ আরাম হয়, ইহার বৃত্তান্ত অনেকেই বোধ হয় জানেন। বিশেষতঃ একটী গল্প অনেকের মুখে শুনা যায়। সেটী এই, এক ব্যক্তির একদিন অন্তর পালা জ্বর হইত, জ্বর আসিবার সময় বেলা একটা নির্দ্ধারিত ছিল। এই জ্বরে সে অনেক দিন ভুগিয়াছিল, কোন ঔষধে কোন চিকিৎসাতেই কিছু হয় নাই। পরিশেষে তাহার এক বুদ্ধিমান্‌ আত্মীয় জ্বর আসিবার দিবসে একদা ঘড়ির কাঁটা সরাইয়া রাখিল, অর্থাৎ ১২টার সময় ২টা বেলা করিয়া রাখিল। সে দেখিল দুইটা বাজিয়াছে, অথচ জ্বর আসে নাই। ইহাতে তাহার ভরসা হইল, তবে, বুঝি বা জ্বর আরাম হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই অবধি তাহার জ্বর এককালে বন্ধ হইয়া গেল। গল্পটী সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। যদি তাহা হয়, তবে পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, ভাবনা-শক্তির কি মহীয়সী ক্ষমতা! অতএব জান্তব চুম্বকশক্তি (Animal Magnetism) কল্পনা করিবার পূর্ব্বে ভাবনা-শক্তির কার্য্যকারিতা বিষয়ে নিগূঢ় অনুসন্ধান আবশ্যক।*

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

"হেস না হেস না অত হাসি ভাল নয়"

আমি যখন পুস্তকখানি হস্তে লইয়া গৃহে প্রবেশ করি, তখন ধরণী কনক রৌদ্রে প্রদীপ্ত, আকাশে স্তূপীকৃত স্তর-বিন্যস্ত শুভ্র বারিদপুঞ্জ স্বর্ণ-কিরণে রঞ্জিত হইয়া কাঞ্চন শৃঙ্গ সৃজন করিয়াছে; দেখিয়া শয়ন করিলাম, কতক্ষণ পড়িয়াছি জানিনা যখন আবার বাতায়নে দৃষ্টি পতিত হইল, তখন দেখিলাম পৃথিবী অন্ধকার, ঘন ঘোর কৃষ্ণ মেঘমালায়

* তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তবে ইংলণ্ডের পণ্ডিতবর্গ অধুনা এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া যেরূপ ফললাভ করিয়াছেন আমাদের মনে হইতেছে মাননীয় লেখক মহাশয় তাহা না দেখিয়াই এরূপ বলিয়াছেন। এই পরীক্ষার ফলে মানবের চিন্তা-শক্তির আশ্চর্য্য কার্য্য-কারিতা সপ্রমাণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু লেখক মহাশয় তাহা যে হিসাবে দেখিয়াছেন ঠিক সে হিসাবে নহে। চিন্তাশক্তির প্রয়োগে যে জান্তব চুম্বক-শক্তি আয়ত্ত করা যায়, এবং এইরূপ আয়ত্তীকৃত চুম্বক-শক্তির যে মহা প্রভাব তাহা বিজ্ঞান জগতে অধুনা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত। অন্ততঃ সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির (Psychical Research Society) প্রোসিডিংগুলি দেখিলে ত ইহাই মনে হয়। ভাং সং।

আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং গুর গুর স্নিগ্ধ মেদুর গম্ভীর ধ্বনি হইতেছে, ছাদে চাক-রাণীরা কাপড় লইয়া ছুটিতেছে, এলোচুলে বৌ ঠাকুরাণীরা হাসিতে হাসিতে 'বড়ির' থালা হস্তে লইয়া পলাইতেছেন, চিলগুলা আসন্ন বিপদ ভয়ে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে, কেবল কয়েকটা ক্রীড়াশীল কপোত স্বীয় শুভ্রকান্তি আরও শুভ্র করিয়া যেন দেখাইবার মানসেই সেই কালো মেঘের কোলে উড়িয়া উড়িয়া ডিগবাজী খাইতেছিল! আর বিশ্বস্তহৃদয় কয়েকটী ক্ষুদ্র চাতকপক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা মেঘের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া উড়িতেছিল! দেখিয়া কেন জানিনা মনে হইল, যদি বর্ষণ না হইয়া বজ্র-পতন হয়! দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ চমকিল, অনল-স্রোত প্রবাহিত হইল, আকাশের কোমল চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া কঠোর কর্কশ রবে বজ্র-পতন হইল, চাতক মরিল, দু এক ফোঁটা জল পড়িল! একি আনন্দাশ্রু না শোকাশ্রু? ঐ স্নিগ্ধ নীল কোমল হৃদয় মধ্যে এত অগ্নি লুকায়িত! এই জড়ে চেতনের প্রেম জগত-বিদিত, চাতক জন্মাবধিই ত ঐ স্নেহ-নীরে তৃপ্ত, অভিষিক্ত! তবে মেঘের আজি এ বিশ্বাস-ঘাতকতা কেন?

ঐ দেখ গৃহে গৃহে বিশ্বস্ত-হৃদয়া কত চাতকিনী অমনই স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, প্রিয়তমের মৃদু মধুর গম্ভীর প্রেমপূর্ণ বচনে আশ্বাসিত হইয়া ভাবিতেছে, এখনিই যদি আমি মরিয়া যাই তাহা হইলে ইঁহার এই আনন্দ-প্রফুল্ল মুখখানি আমার জন্য একেবারে মলিন হইয়া যায়, আমার জন্য না জানি কতই ব্যাকুল হন, কতই কাঁদেন, যদি এমন হইত যে একবার মরিয়া আবার বাঁচিতে পারা যাইত তাহা হইলে একবার মরিয়া কাঁদাইতাম, আবার আসিতাম—সে কত আনন্দের হইত!

তার পর? তার পর কিছুদিন পরে মৃত্যুর নিকটে সাধ্বীর সাধ পৌছিল, সে আসিল, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বিশ্বস্ত-প্রফুল্ল হৃদয়ে সে মৃত্যু যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া চক্ষু মুদিল। কিসের আশায় অমাবস্যার গভীর অন্ধকার মধ্যে সে চিরান্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়াছে?

ঐ দেখ, সে আজ এক পক্ষ গিয়াছে,—আজ পূর্ণিমা, তাহার স্থান নূতনে পূর্ণ হইয়াছে মধুর অধরে মধুর হাসির রেখা ফুটিয়াছে! চাতকিনি! মরিতে সাধ করিয়াছিলে মরিয়াছ, আবার বাঁচিতে চাও কেন? ঐ দেখ তোমার প্রকৃত মৃত্যু!! তুমি যে ঘর বাঁধিয়া গিয়াছ, ভাব নাই যে তাহাতে আবার ঝটিকা বহিবে? তোমার পাকা গাঁথনি খসিবে! তোমাকে নিরাশ্রয় করিবে! হায়! তুমি মৃত, তোমার স্থান কোথায়,তুমি যাও। আর তুমি—তুমি কে গো যাদুকরি! তার অপেক্ষা তোমার কি অধিক আছে? যাহাতে তুমি এত বৎসর এক মুহূর্ত্তে অপসারিত করিয়াছ! স্বীকার করি তোমার ঐ চোখ দুটী কাঁচের চোখের মত সুন্দর! উহাতে বিলোল কটাক্ষ আছে, কিন্তু অশ্রু নাই! উজ্জ্বলতা আছে কিন্তু তীক্ষ্ণতা নাই! আহা অমনিই বিশ্বস্ত-চিত্তে অমনি মধুর হাসি সে একদিন হাসিয়াছিল! আজ তাহার স্থান তুমি অধিকার করিয়াছ! তোমাদের হাসির বজ্রে সে মরিয়াছে। তাই বলিতেছি সাবধান, অত হাসি ভাল নয়—পার ত, হাসির সঙ্গে সঙ্গে একটু কাঁদিও।

আর তুমি—হে ত্রিকালজ্ঞ! হে বিশ্বপতি! মানব-কীটের জন্য কেবল ভুলই নির্ম্মিত করিয়াছ! সূক্ষ্ম কি কিছুই নয়! তোমার জগতই সব, তুমি কি কেহই নও! বর্ত্তমান কি সব, অতীত কি কিছুই নয়!

অহংজ্ঞান।

আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি মানবের "অহংজ্ঞান" হইতেই আধ্যাত্মিক জগতে অশেষ অনর্থ ঘটে। কোন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে পাপের উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অতি গম্ভীরভাবে বলিবেন,"অহংজ্ঞান"। কোন সংস্কৃত শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোককে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও ঐরূপ বলিবেন, "অহংজ্ঞান"। "অহংজ্ঞান" এ বিষয়ে কতকটা Cantর মত হইয়াছে। ওটা যেন পাপের কথা উঠিলেই বলিতে হয়; কারণ থাক্ আর নাই থাক্, উহার সহিত পাপের এরূপ নিকট সম্পর্ক ও অবিচ্ছিন্ন যোগ যে, "অহংজ্ঞান"-শূন্য পাপ যেন নিতান্ত অসঙ্গত, যেন নিতান্ত কাল্পনিক জিনিষ। Cant দূরে রাখিয়া এখন নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে হইবে, বাস্তবিক "অহংজ্ঞান"ই সকল পাপের মূল কি না।

"অহংজ্ঞান" শব্দে কি বুঝায়? "অহং" অর্থে ত "আমি", তাহা হইলে "অহংজ্ঞান" শব্দে বুঝিতে হইবে "আমি-জ্ঞান" অথবা আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান। মায়াবিদ্ পণ্ডিতেরা ত এক ভগবানের পূর্ণ সত্তার বিশ্বাস করেন আর এই দিগন্তব্যাপী বিশ্বকে তাঁহারা উড়াইয়া দিতে চান। যাহা আমরা দেখিতে পাই উহা কেবল আমাদের মোহান্ধ মনের ভ্রমবিকাশ। এই বিশ্ব মধ্যে এক ভগবানের সত্তার অস্তিত্ব আছে অপর সকলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেবল একটা কথার কথা, কেবল মায়াকুহক। এই দার্শনিক মতকে পণ্ডিতেরা অদ্বৈতবাদ কহেন। ইহা হইতে একটা ভয়ানক তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই বিশ্বাস হইতেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কূট তর্ক জন্মিয়াছে। এখন আমাদের সে তর্কে যোগ দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে একটা সামান্য বিষয় লইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিব।

আমাদের যদি "অহংজ্ঞান" না থাকিত তাহা হইলে আমার মতে সংসার চলিত না, মনুষ্য সমাজ সংগঠিত হইত না। "আমি" বলিয়া যদি কেহ না থাকে তাহা হইলে কি করিয়া "আমিত্ব"ময় এ সংসার চলে? "আমি" যদি আমার নিকট পরিচিত না হই তাহা হইলে ত আমার পক্ষে এ বিশ্বের অস্তিত্ব নাই; আমার পক্ষে ভগবানের পূর্ণ সত্তারও অস্তিত্ব লোপ পায়। আমার "আমি" লোপ পাইলে সকলই ত লোপ পাইল। "আমি" ব্রহ্মাণ্ড হইতে বিলুপ্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ডও বিলুপ্ত হইল। "জ্ঞান" না থাকিলে বস্তু থাকা না

থাকা সমান। জ্ঞানেই বস্তুর অস্তিত্ব, জ্ঞানলোপেই বস্তুর লোপ। আর "জ্ঞান" কি "জ্ঞান" অর্থেত জানা, উপলব্ধি। প্রত্যেক "জ্ঞানে" কি কি উপকরণ থাকে? প্রথমত একটী সত্তার অস্তিত্ব চাই। সত্তা ব্যতীত "জ্ঞান" অসম্ভব। একটী বিশেষ আত্মার কোন একটী বিশেষ বিষয়ের উপলব্ধির নাম জ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞান সকল সময় একটী বিশেষ বিষয় সম্বন্ধেই হয়। তৃতীয়তঃ, আত্মা ও বিষয় এই দুইটা একটী বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, আর এই তিন উপকরণে জ্ঞানের উৎপত্তি। এ স্থলে "আত্মা", "অহং"ই প্রধান; "অহং" লোপ পাইলে জ্ঞানও লোপ পাইল, আর জ্ঞান লোপ পাইলে বিশ্ব লোপ পাইল। জ্ঞানবিচ্ছিন্ন "অহং" জ্ঞানবিচ্ছিন্ন সকল বস্তুর ন্যায় অসম্ভব। যে "অহং-ই" জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না সে "অহং" কিছুই নয়, একটা কেবল কথার কথা, একটা কাল্পনিক বস্তু (Chimerical nonsense)।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের প্রধান জ্ঞান "অহংজ্ঞান"; আর এই অহংজ্ঞান না থাকিলে অন্য জ্ঞান অসম্ভব হইত। বিশ্বের অস্তিত্ব-বিষয়ক জ্ঞান ও ভগবানের পূর্ণ সত্তার জ্ঞানও বিশ্বাস দ্বারা উপলব্ধি "অহংজ্ঞান" না থাকিলে হইতে পারে না; কারণ, উপরে প্রতিপাদিত হইয়াছে সকল জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ (Principal factor) "অহংজ্ঞান"। জ্ঞান-জগৎ হইতে "অহং" বিলুপ্ত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পায় ও ভগবানের সত্তাও লোপ পাইয়া যায়। অতএব যে দার্শনিক মতে "অহংজ্ঞান" সকল অনর্থের মূল বলিয়া ধর্ম্ম-জগৎ হইতে নিরাকৃত হওয়া উচিত প্রতিপন্ন হয়, তাহা ত ভয়ানক অধর্ম্মের কথা, ঘোর অবিশ্বাসের কথা!

বৌদ্ধধর্ম্ম "নির্ব্বাণ" মানবাত্মার চরমোৎকর্ষ ও মোক্ষ বলিয়া প্রচার করে। এখন দেখা যাউক এই বৌদ্ধধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট "নির্ব্বাণ" বাস্তবিক আমাদের আত্মার চরমোৎকর্ষ কি না। "নির্ব্বাণ" শব্দে লোপ, নাশ বুঝায়। প্রথমেই, দৃষ্টি মাত্রেই, একটু স্তম্ভিত হইতে হয়, আত্মার নাশ কি করিয়া তাহার চরমোৎকর্ষ হইতে পারে। যে মৃত্যুর বিভীষিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মেরই আশ্বাস (Consolation) যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত চিরকাল অধর্ম্মী হইয়া থাকা সুখপ্রদ! স্বাভাবিক মৃত্যুতে আমাদের জীবাত্মার নাশ হইল, এখন বাকী কেবল পরমাত্মা, সেটীও বৌদ্ধধর্ম্ম-মতে লোপ পাইল! আর এই "নির্ব্বাণের" জন্য আমাদিগকে যাবজ্জীবন পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে! তবে একটী কথা। বৌদ্ধধর্ম্মের "নির্ব্বাণ" প্রকাশ্য ভাবে মৃত্যু নয়। মানবাত্মার ভগবানের পূর্ণ আত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগ। অবিচ্ছিন্ন যোগ বলিলে Communion-ও বুঝায়, কিন্তু বৌদ্ধদের মতে আমাদের "নির্ব্বাণ"-মুক্ত আত্মার ভগবানের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ যোগ হইবে না। ভগবানের পূর্ণ আত্মার আমাদের "নির্ব্বাণ" মুক্ত আত্মার কেবল লোপ হইবে। সাগরজলে যদি এক কলসী জল নিক্ষেপ করা যায় যোগের পর তাহার যেমন কোন স্বাতন্ত্র্যভাব থাকে না, সেরূপ আমাদের "নির্ব্বাণ"মুক্ত আত্মার কোন স্বাতন্ত্র্যভাব

থাকিবে না। অন্য কথায় "নির্ব্বাণ" অর্থে বুঝিতে হইবে "অহংজ্ঞানে"র লোপ। পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে "অহংজ্ঞানের" লোপ হইলে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পাইল অথবা আত্মার মৃত্যু হইল। অতএব "নির্ব্বাণ" আমাদের পরমাত্মার মৃত্যু! আমরা ধর্ম্ম করি, পুণ্য করি মৃত্যুর পর ভগবানের পূর্ণ সত্তার সহিত সাক্ষাৎ সংযোগের পরম সুখ উপভোগ করিব বলিয়া, কিন্তু সে সুখ উপভোগ "অহংজ্ঞান" না থাকিলে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে "অহংজ্ঞান" সকল অনর্থের মূল না হইয়া বরং উহা সকল সুখের উপায় ও আকর! "অহংজ্ঞান" শুধু আমাদের এই আধি-ব্যাধি বিশিষ্ট সংসারের জন্য আবশ্যক নহে, আমাদের অমরত্বের, আমাদের অবিনশ্বর পূর্ণ সুখের জন্যও আবশ্যক!

ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল তাহা হইলে কি এমত বুঝিতে হইবে যে "অহংজ্ঞান সকল অনর্থের মূল" এই চলিত কথাটার কোন মূল নাই, উহা একেবারেই অমূলক? এ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটা কথা বলা আবশ্যক। চলিত কথা সম্বন্ধে একটা মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, উহা প্রায়ই অমূলক নহে; যখন কথাটা উঠিয়াছিল তখন তাহার অবশ্যই কোন অর্থ, কোন সার্থকতা ছিল, তবে কালক্রমে পাঁচমুখে ঘুরিতে ঘুরিতে এবং প্রত্যেকের কাছে কিছু রঞ্জিত হওয়ায় সেটা একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে অনেকটা তাহার মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "অহংজ্ঞান" প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক বিষয়ে নিন্দনীয় হইতে পারে না, বরং পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, "অহংজ্ঞান" (Knowledge of self or self-consciousness) সংসারের জন্যও পরমাত্মার মঙ্গলের জন্য আবশ্যক। কিন্তু "অহংজ্ঞান" সকল অনর্থের মূল" এ যুক্তির ভিতর "অহংজ্ঞান" পদটা এই আমার অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান (Self consciousness) অর্থে ব্যবহৃত হয় না! "অহংজ্ঞানের" অপর একটা অর্থ জুটিয়াছে। এই অর্থে "অহংজ্ঞান" শুধু আমার অস্তিত্ব-বিষয়ক জ্ঞান নহে; এই জ্ঞানের উপর আর একটী জ্ঞান আছে। "আমি" ত আছিই, আর আমার "অমিত্বের" জ্ঞানও আছে। আমাদের পাপাসক্ত মনে আমার "আমিত্ব"র জ্ঞানের সঙ্গে আমার "আমিত্ব"র গুরুত্ব (importance)র জ্ঞান প্রায়ই সংপৃষ্ট থাকে। "আমি আছি" জানিলে আমার নীচগামী মন সন্তুষ্ট হয় না। "আমি" এ জগতের একজন ভয়ানক কেষ্টা বেষ্টা, একটা মস্ত important factor। এটা আমাদের আত্মম্ভরিতা (Vanity) মাত্র। এই আত্মম্ভরিতা বশতঃ আমাদের গুরু লঘু জ্ঞান থাকে না, আমাদের পরিমাণের জ্ঞান (Sense of proportion) প্রায় বিলুপ্ত হয়। পরিশেষে আমার ক্ষুদ্রত্ব, আমার নীচত্ব, আমার কীটাণুকীটত্ব ভুলিয়া যাই, আমার গুরুত্বের আলোক প্রভাবে চমকিত হই ও এ বিশ্বকে "আমি"-ময় করিয়া তুলি। ম্যাজিক-লাঠান যেমন ক্ষুদ্র একখানি ফোটো হইতে একটা প্রকাণ্ডাকার ছবি দেখায়, তেমনি মোহকুহক আমাদের আত্মম্ভরিতায় lens

(লেন্স) লইয়া আমাদের ক্ষুদ্র সত্তাকে একটা ভ্রমোৎপাদক (Illusory) মহত্ব ও গুরুত্ব প্রদান করে।

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে চলিত "অহংজ্ঞান" দার্শনিক "অহংজ্ঞান" হইতে কত বিভিন্ন। দার্শনিক "অহংজ্ঞান" আমার সত্তার উপলব্ধি, চলিত "অহংজ্ঞান" পরব্রহ্মের পূর্ণসত্তা বিশেষরূপে উপলব্ধি না করিয়া আমার "আমিত্ব"র জ্ঞান। যাবৎ আমাদের "আমিত্ব"-বিষয়ক জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করে আর ভগবানের সত্তার জ্ঞানের Subordinate হইয়া থাকে, "অহংজ্ঞানে" দোষ ঘটিতে পারে না। যখনই অহংজ্ঞানে আমার "আমিত্ব" সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উপর আমার "আমিত্ব"র মহত্ব বা গুরুত্ব বিষয়ক জ্ঞান আসিয়া জুটিল, তখনই এই বিকৃত "অহংজ্ঞান" সকল অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এই শেষোক্ত "অহংজ্ঞান" প্রকৃত দার্শনিক "অহংজ্ঞানের" বিকৃতি, উহার প্রকৃতি নহে; এবং বিকৃতি হইতে প্রকৃতির বিচার হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে "অহংজ্ঞান" সকল অনর্থের মূল নহে, আমাদের প্রকৃতিগত আত্মম্ভরিতাই আমাদের ধর্ম্মজীবনের অন্তরায়। "অহংজ্ঞান" ও "আত্মম্ভরিতা" দুইটী একবস্তু নহে। একটী আমাদের প্রকৃতির স্বাভাবিক, অপরটী তাহার অস্বাভাবিক ভাব, বিকার।

অতএব ইহা হইতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে, "অহংজ্ঞান সকল অনর্থের মূল" এ কথায় মূল থাকিলেও অহংজ্ঞান অথবা অহংজ্ঞানের স্বাভাবিক ভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করা উচিত নহে। "অহংজ্ঞান" সকল সময় আবশ্যক ও অবিশ্বাসের কথা! rincipal factor); আত্মম্ভরিতা সর্ব্বথা অননুমোদনীয় সকল

বৌদ্ধধর্ম্ম "নির্ব্বাণ" মা

যাউক এই বৌদ্ধধর্ম্ম-নি

শ্রীগোপালচন্দ্র সোম।

---

* যেমন কোন সমতলস্থিত পরস্পরের উপর সরলভাবে লম্ববান দুইটি ঋজু রেখার সাহায্যে তন্মধ্যস্থিত সমস্ত বিন্দুর আবাস স্থান নিরূপিত হয়, সেইরূপ "অহং" এবং "নাহং"-ও সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল উপকরণ—ইহা "আমি" অথবা "আমার" উহা "আমি-না" অথবা "আমার-না", ইহাই মানব জ্ঞানের চরম বিশ্লেষ। কিন্তু সত্তা এক এবং তাহার দ্বিতীয় নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব্বকথিত বিধি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। সত্তা যাহা তাহা সত্তাই তাহা আমার অথবা অপরের বিশেষ সম্পত্তি নহে তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, আমি তুমি তাহাকে উপলব্ধি করিতে না থাকিলেও তাহার কিছুই আসে যায় না, সে যেমন তেমনি থাকে; কেবল মাত্র ব্যবহারিক ভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্যই তাহার বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ। এক কলস সমুদ্র-বারির বহিত বারিধির সত্তা সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই, তেমনি বিশ্বের এক মাত্র সত্তা বলিয়া "একমেবদ্বিতীয়ম্"-রূপে তাহাকে জানাই তাহার যথার্থ জ্ঞান। আত্মার পূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেই তবে মানুষ বিশ্বাত্মাকে জানিতে পারে, এক সত্তার দ্বারাই অপর সত্তার জ্ঞান উপলব্ধি হয়; সুতরাং "অহং"-এর পৃথগস্তিত্ব মায়ার কার্য্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তখন মৃত্যুর দ্বারা ব্যবহারিক পক্ষেও পৃথগস্তিত্ব লোপ পায়

মনুষ্যের প্রতি নদীর উক্তি।

কেহ প্রেম ডোরে বাঁধেনাক মোরে
বন্ধন সহিত নারি;
লয়ে পূর্ণ হিয়ে চলি বেগে ধেয়ে,
স্নান পান কর বারি।
বিপুল গগণ নেহারে আনন
আমার হৃদয় মাঝে,
শত শত তারা রূপ মনোহরা,
হের মোর হৃদে রাজে।
তীর তরু-ছায়া হেলে দোলে কায়া
খেলা করে মোর বুকে,
পূরণিমা নিশি রাশি রাশি হাসি
ঢেলে দেয় নানা সুখে।
সন্ধ্যায় আঁধার নিয়ে ব্যথা তার
এ হৃদয়ে পায় স্থান।
ধীরি ধীরি ধীরি চলে যায় তরি,
উপহার দিয়ে গান!

কত সুকোমল ফুল সুবিমল
আমাতে ভাসায়ে কায়,
মৃদু মৃদু হেসে কত ভাল বেসে
সাথে সাথে ভেসে যায়।
ধীরে ধীরে ধীরে মিশে মোর নীরে
কত পূত অশ্রুকণা।
প্রতিদিন-কার প্রেম-উপহার
পাই কত রত্ন নানা!
ঝটিকা উন্মাদ করিতে বিবাদ,
ছুটে ছুটে আসে পাশে,
নেহারি তরঙ্গ রণে দিয়া ভঙ্গ,
পলায় উরধ শ্বাসে।
কি জানি কি চায় কহেনা আমায়
বুঝি চায় প্রেমনিধি,
ছিন্ন ভিন্ন করে চাহে দেখিবারে
ঢুকিয়া রমণী-হৃদি!

বলিয়া তাহা আনন্দ ব্যতীত দুঃখের কারণস্বরূপ হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণও এই মতের বিরোধী নহে। পৃথগস্তিত্বজ্ঞান-রূপ ভ্রমের মৃত্যু, অসত্যের বিনাশ, জ্ঞানাগ্নিতে অজ্ঞানের ভস্মীকরণ ইহাই নির্ব্বাণ।

লেখক প্রাচ্য দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের চসমার ভিতর দিয়া দেখিতে গিয়াই এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন। কোন দার্শনিক পদ ভাষান্তরিত করার পক্ষে অনেক প্রত্যবায় আছে। "অহংজ্ঞান" শব্দকে ইংরাজী Self-consciousness পদের দ্বারা অনুবাদ করিলে তাহা যথার্থ ভাব-প্রকাশক হয় না। "অহংজ্ঞান" মানবের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞানকেই বোঝায়; কিন্তু ইংরাজী Self-consciousness পদটি তাহা নহে। উহা বৈজ্ঞানিক মতের (Theory) ন্যায় আনুমানিক সিদ্ধান্ত (Practical hypothesis)মাত্র। মানব জ্ঞানের আধার-স্বরূপ এক পদার্থের (Substance) সত্তা ধরিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে যে সকল গুণের কার্য্য দেখা যায় তাহাই সেই আধারের গুণ-স্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে মাত্র। হিয়ুম, মিল, বেণ প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা আত্মার সত্তায় বিশ্বাস করেন না—তাঁহাদের মতে Ego is the sum–total of sensations and impressions মাত্র; তথাপি তাঁহারা ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। হিন্দু দার্শনিকের "অহংজ্ঞান" পাশ্চাত্য দর্শনের Self-consciousness-এর ন্যায় সারবিহীন শব্দমাত্র নহে। ভাং সং।

কত সুকোমল তনু সুবিমল
আমাতে ভাসায় কায়া,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম অনুভব
যেন তারা মোর ছায়া।
মূঢ় পরবত আগুলিয়া পথ
মোর গতি দেয় বাধা ;
যে চিনে আমারে দেখে দেখে দূরে
শুনে মোর প্রেম-গাঁথা।
পেলে পরে হিয়া লই ভাসাইয়া
আমার স্রোতের নীরে,
এই মোর ধর্ম্ম, এই মোর কর্ম্ম,
কে পারে বাঁধিতে মোরে।
ইথে সুখ কত চির অনুগত
তোমরা বুঝিবেনা ত ;
স্বাধীন এ হিয়া আছে জয়ে জিয়া,
বন্ধনে তখনি হত !
তুমি কে গো বীর কি হেতু অধীর
বন্ধন করিতে মোরে ;
আমার এ প্রাণ শোভা বেগবান
বাঁধিলে যাইবে ম'রে !

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
স্থাপিতাব্দ ১২৮১ সাল

মেঘদূত।

ফুটন্ত কেতকে ঘেরা দশার্ণের রম্য উপবন
ধরিবে মোহন মূর্ত্তি হ'লে তব শুভ আগমন ;
রথ্যা তরু ডালে ডালে, রহে ঝুলে বায়স কুলায়,
জম্বুকুঞ্জ ফলপুঞ্জে ঝল ঝলে শ্যামল শোভায়,
বহু দিন পরে পেয়ে, জলধর, তব দরশন,
হংসগুলি, সব ভুলি, রহে তথা সুখেতে মগন ॥ ২৪

দিগন্তপ্রথিতা যেই রাজধানী বিদিশা লক্ষণা,
পশি সেথা অবিলম্বে কামুকের পুরাবে কামনা,
তীরে দাঁড়াইয়া গর্জ্জি, যত চাই পিয়ো অবিরল
আনন ভ্রুকুটিময়, বেত্রবতী স্বাদু স্রোতোজল ॥২৫

নীচ-গিরি শিখরেতে বিশ্রাম লভিয়ে ক্ষণকাল,
দরশনপুলকিত প্রফুল্লিত কদম্বের মাল,
নাগর নাগরী যথা শিলা-গৃহে রমে মাতোয়ারা,
রতি পরিমল ছুটি উদ্দাম যৌবন পড়ে ধরা ॥ ২৬

ঝরণার ধারে ধারে জনমে যে ঘুথিকা-নিকর
বনজল-কণে সিক্তি, চল পুন বিশ্রামের পর।
ঘর্ম্মক্লান্ত মালিনীর ঝরি পড়ে দেখ কর্ণোৎপল,
বদনকমল তার ছায়া দানে করিও শীতল ॥ ২৭

বক্র ঘুর পথ যদিও সে, চলে যেয়ো উত্তরের মুখ,
উজ্জয়িনী সৌধ ছাতে হয়ো না গো প্রণয়-বিমুখ।
স্ফুরিত বিদ্যুন্মালা, ভয়ে বালা চকিতনয়ন—
সে আঁখির সাথে যদি না রমিলে বৃথায় জীবন ॥ ২৮

স্রোতোপরি ভাসি যার হংসশ্রেণী রচে চন্দ্রহার,
ঘুরায় আবর্ত্ত নাভী নাচি নাচি, মরি কি বাহার !
নির্ব্বিন্ধ্যা-তটিনী সঙ্গে রসরঙ্গে হইও মগন ;
বিভ্রম বিলাসে ফোটে রমণীর প্রণয় বচন ॥ ২৯

গ্রীষ্মতাপে জর জর বেণী, প্রায় রেখাক্ষীণ কায়,
তটতরু জীর্ণপত্র ঝরি ঝরি পাণ্ডুমুখ তায় ;
তার যে বিরহদশা তোমায় সে ভাগ্য বলে গণি,
ঔষধ তোমারি হাতে কার্শ্য যাতে ছাড়ে অভাগিনী ॥ ৩০

অবন্তী যাইয়া শুনো উদয়ন রাজার কাহিনী *
গাঁয়ে গাঁয়ে বৃদ্ধমুখে, চল পরে যথা উজ্জয়িনী—
পুণ্যফল ফুরাইলে স্বর্গবাসী মরতে নামিয়া
যেন এক স্বর্গখণ্ড শেষ পুণ্যে এনেছে টানিয়া ॥ ৩১

সারসের মদকল কলরব করিয়া বিস্তার,
প্রত্যূষে বহিয়া আনি ফুল্ল পথ পরিমল সার,
রমণীর অঙ্গ-গ্লানি পরিহরে সিপ্রা-সমীরণ,
চাটুবাক্যে কামী যথা তোষে তার মানিনীর মন ॥ ৩২ ॥

* উজ্জয়িনীতে প্রদ্যোত নামক রাজা ছিলেন, বাসবদত্তা তাঁহার কন্যা। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন কর্ত্তৃক বাসবদত্তা হরণ উপন্যাস প্রচলিত। সোমদেব-কবি-কৃত "কথা সরিৎ সাগরে" বাসবদত্তার বিবাহের আর এক প্রকার বর্ণনা দেখা যায়।

কুন্তল সংস্কার ধূপ জালমার্গে বাহিরিয়া যায়,
তাহাতে মিশিয়া গিয়া, মেঘবর, পুষ্ট তব কায়।
বঁধু ভেবে, যেথা রবে পুচ্ছভার করিয়া বিস্তার,
উল্লাসে ভবনশিখী দিবে আসি নৃত্য উপহার—
পথশ্রান্তি ক'রো দূর কুসুম সুরভি সৌধ পরে,
প্রমদার পদরাগ রাঙ্গা দাগ হেরি ঘরে ঘরে ॥ ৩৩

চণ্ডীশ্বর পুণ্যধাম মহাকাল যাবে তুমি পরে,
নীলকণ্ঠ কণ্ঠছবিগণে * ভাবি দেখিবে সাদরে
গন্ধবতী নদী জলে, কেলি করে যুবতী যথায়,
কাঁপায়ে উদ্যানলতা বহে যবে পদ্মগন্ধ বায় ॥ ৩৪

সেই পুণ্য মহাকাল অন্য কালে গিয়ে পড় যদি,
তিষ্ঠি রহ, দিনমণি অস্ত নাহি যায় যে অবধি—
সন্ধ্যাপূজা হয় যবে ছাড়ি দিয়ে দুন্দুভি নিঃস্বন,
ধন্য হবে মেঘরাজ, সার্থক সে তোমার গর্জ্জন ॥ ৩৫

নূপুর ঝঞ্জনে সেথা তালে তালে চারু পা ফেলিয়ে,
নৃত্য করে গণিকারা রত্নদণ্ড চামর দুলায়ে,
নখপদে পেয়ে, আহা, বরিষার নব বারিধারা
সুদীর্ঘ স্নেহে দৃষ্টি তোমাপরে দিবে গো তাহারা ॥ ৩৬

মণ্ডল আকারে লীন উচ্চভুজ তরুবন পরি,
ঘননীল দেহে তব যবা-রক্ত সান্ধ্য তেজ ধরি,
† হরনৃত্যে হবে তাঁর রক্তমাখা নাগা-জিনখানি
স্তিমিত প্রসন্ন দৃষ্টি ভক্ত পরে দিবেন ভবানী ॥ ৩৭

রমন বসতি চলে রমণীরা, রজনী গভীর,
পথ ঘাট নিশি দিশি সূচিভেদ্য দুস্তর তিমির।
স্নিগ্ধ বিদ্যুতের আলো ঝিকিমিকি যেয়ো পথময়,
তর্জ্জন গর্জ্জন করি বালাদের দেখায়ো না ভয় ॥ ৩৮

* মহাদেবের ভূতগণ।
† মহাদেব শোণিতার্দ্র গজ-চর্ম্ম পরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করেন।

জন কোলাহল শূন্য গৃহচ্ছাদে করি রাত্রিবাস—
বিদ্যুৎ কলত্র খিন্ন জ্বলি জ্বলি বিনা অবকাশ—
উঠিয়া করিবে যাত্রা যেমনি হইবে সূর্য্যোদয়,
সুহৃদের কার্য্যে কভু সুহৃদের বিলম্ব কি সয় ? ৩৯

প্রণয়ী আসিয়া প্রাতে খণ্ডিতার মুছে অশ্রুজল—
রবিপথ আটকিয়া জলধর, থেকনা অচল।
ভানুও তখন মুছে শিশিরাশ্রু কমলবদনে—
প্রচণ্ড সে হবে কোপ ঢাক যদি তাহার কিরণে ॥ ৪০

স্বচ্ছ দরপণ সম গম্ভীরার প্রসন্ন সলিল,
পশিবে তাহাতে তব প্রতিবিম্ব, সুন্দর, সুনীল,
শফরী কটাক্ষবান হানিবে তোমায় সুলোচনা—
অনুরক্তা প্রিয়া সেই তারে সখা, করো না ছলনা ॥ ৪১

তার সঙ্গে রস-রঙ্গে মনসাধে মাতি কিছুক্ষণ,
বিদায়ের কালে লয়ে তটমুক্ত সলিলবসন,
পানতৃপ্ত অলসিত, শীঘ্র কি হে পারিবে ছাড়িতে ?
সে স্বাদ যে পায় সে কি সহজে তা পারে তেয়াগিতে ? ৪২

নবধারাসিক্ত ধরা—নিঃশ্বাস সুরভি সমীরণ,
নাসা ভরি করী যাহা হুঙ্কারিয়া পিয়ে ঘন ঘন,
যে অমল বায়ুগুণে আশু ফলে দুস্থর কানন,
* দেবগিরি যাত্রাকালে তোমারে সে করিবে ব্যজন ॥ ৪৩

জগবন্দ্য স্কন্দ তথা নিবসেন, মহাতীর্থ স্থান—
পুষ্পবৃষ্টি বরিষণে কার্ত্তিকেয়ে করাইও স্নান।
দেব-সৈন্য রক্ষা হেতু বহ্নিমুখে সঞ্চিত, অমর,
আদিত্য জিনিয়া তেজ, জেন তাঁরে হরমূর্ত্ত্যন্তর ॥ ৪৪

* উজ্জয়িনী ও চম্বল-নদীর মধ্যে কোন গিরির প্রাচীন নাম দেবগিরি। তথায় তখনকার কালে কার্ত্তিকের এক প্রসিদ্ধ মন্দির থাকা সম্ভব; পরের কয়েকটী শ্লোকে তাহার বর্ণনা আছে।

কুমার-বাহন ব'লে যার পুচ্ছ উজল বরণ,
ভবানী সস্নেহে অতি কর্ণমূলে করেন ধারণ—
হরশশী কর-ধৌত, শুক্লাপাঙ্গ, সেই সে ময়ূরে,
প্রতিধ্বনি দ্বিগুণিত গরজিতে নাচাইবে পরে ॥ ৪৫

বন্দি দেব কার্ত্তিকেয়ে ধাও পথি পূর্ণ মনোরথ,
বীণাতন্ত্রী ভেজে পাছে গন্ধর্ব্বে ছাড়িবে তব পথ—
মূর্ত্তিমতী রন্তিদেব-নৃপকীর্ত্তি * পাবে স্রোতঃস্বতী,
যজ্ঞধেনু চর্ম্মরক্তে জন্ম যার নাম চর্ম্মন্বতী ॥ ৪৬

নমি তুমি, কালমেঘ, কর যবে পার্ণীয় গ্রহণ,
সেই নদী দূর হতে হয় কিবা অপূর্ব্ব দর্শন !
সুদূর আকাশ হতে ব্যোমচারী দেখিবে কৌতুকে,
মাঝে ইন্দ্র নীল মণি মুক্তাহার ধরণীর বুকে ॥ ৪৭

দশপুর পুরনারী, বলিহারি নেত্রে কি মাধুরী !
কৃষ্ণসার-প্রভা তার, মরি কিবা ভুরুর চাতুরী !
চঞ্চল ভ্রমর-পারা, আঁখি-তারা উন্মেসি যখন
চাহিবে তোমার পানে, নিয়ো ভাই বিদায় তখন ॥ ৪৮

ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদ নিরাপদে অতিক্রমি ধীরে,
প্রখ্যাত সমর ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পশিবে তৎপরে—
ক্ষত্র সৈন্য ভগ্ন যেথা বাণে বাণে ধনঞ্জয় হাতে,
যেমতি কমলদল জর জর তব ধারাপাতে ॥ ৪৯

সমরবিমুখ বীর স্বজনের পক্ষপাত ভয়ে,
প্রিয়ামুখ-রস-ভরা, সাধের মদিরা তেয়াগিয়ে
সেবিলা † রেবতী-পতি সরস্বতী,—পিয়ে সেই পয়,
বর্ণমাত্রে কালো তুমি অন্তঃশুদ্ধ হবে গো নিশ্চয় ॥ ৫০

* রন্তিদেব যজ্ঞে যে সকল ধেনু বধ করেন তাহাদের রক্তে এই চর্ম্মন্বতী নদীর উৎপত্তি।

† বলরাম কুরু পাণ্ডব উভয়েরই আত্মীয়—স্বজন-পক্ষপাত-ভয়ে যুদ্ধে বিরত হইয়া সরস্বতী তীরে গিয়া বাস করেন। তিনি অত্যন্ত পানাসক্ত ছিলেন এইরূপ বর্ণনা আছে।

কনখল তীর্থ হয়ে যাবে যেথা জহ্নুর নন্দিনী *
সগর-তনয়গণ-স্বরগ-সোপান-পংক্তি যিনি—
সেই গঙ্গা ফেণ হাসে উপহাসি গৌরীর ভ্রুকুটি
ধরে গিয়া হরজটা, শিরে তাই ধরেন ধূর্জ্জটী ॥ ৫১

সুরগজ সম তুমি উচ্চ হতে ঝুঁকিয়া ভিতরে,
স্ফটিক বিশদ জল যাও যবে পান করিবারে,
ছায়া তব স্রোতোমাঝে ভাসি ভাসি করি সঞ্চরণ
গঙ্গা যমুনায় হবে সেই কালে অন্তর্যান-মিলন ॥ ৫২

পাইয়ে জনক তাঁর শৈলরাজ পুণ্য হিমাচল,
মৃগনাভী গন্ধে যেই সুবাসিত, তুষার-ধবল,
পথ শ্রান্তি বিনোদনে শৃঙ্গোপরি বসিবে যখন,
শুভ্র শম্ভু-বৃষ-শৃঙ্গে পঙ্ক ভ্রান্তি হইবে তখন ॥ ৫৩

দেবদারু সংঘটনে-সমুত্থিত ঘোর দাবানল,
দিগন্ত ব্যাপিয়া কায়া, বায়ুবলে ধরি ভীমবল,
কালরূপী সব গ্রাসে, মহাত্রাসে মৃগকুল ধায়—
এ বিপদে, জলধর, হ'য়ো তুমি অচল-সহায়—
বরষি মুষল ধারে সে অনল করো প্রশমন
সজ্জন সম্পদ ফল তাপিতের কষ্ট নিবারণ ॥ ৫৪

শরভ † প্রগল্‌ভ অতি ছুটাছুটি করে বনে বন,
লম্ফ ঝম্ফ দেয় যদি তোমারে করিতে উলঙ্ঘন,
ঘন ঘন শিলা বর্ষি তাহাদের করো ছারখার,
বৃথা কাজে মাতে যেই, তার ভাগ্যে থালি তিরস্কার ॥ ৫৫

পশুপতি-পদচিহ্ন রহে তথা ব্যক্ত শিলাপরে,
যোগীজন পূজ্য সেই, প্রদক্ষিণ করো ভক্তি ভরে—
পাপ তাপ যায় দূরে ভক্ত যবে পায় দরশন—
লোকান্তরে গিয়ে পরে মোক্ষপদ করয়ে সাধন ॥ ৫৬

* জাহ্নবী স্বর্গ হইতে নামিয়া সগরতনয়গণকে উদ্ধার করেন।

† এক জাতীয় হরিণ।

অনিলপূরিত বেণু বাজে যেথা মধুর নিঃস্বনে,
ত্রিপুর বিজয় গায় কিন্নরীরা মিলি তার সনে—
গিরির কন্দরে তাহে উঠে তব বাদ্য সুললিত
যত চাই হবে তত গিরীশের বিজয় সঙ্গীত ॥ ৫৭

* ক্রৌঞ্চের বিবর যাহা খনিলা বিশিখে ভৃগুপতি—
তাঁহারি সে যশঃপথ—মানস হংসের যাহে গতি—
তুমি ও সে পথ লয়ে ধরিবে হে রূপ অপরূপ,
বলির নিগ্রহে রত শ্যামপদ বিষ্ণুর স্বরূপ ॥ ৫৮

ঊর্দ্ধে উঠি অতঃপর কৈলাসের লইবে শরণ—
স্ফটিক নির্ম্মল কটি,—সুরবালা-মুখ-দরপণ—
দশমুখ-ভুজবল-উৎপাটিত সেই গিরিবর
আজি ও নিশান তার ধরে দেহে, ক্ষত জর জর ;
গগণ-বিতত কায়, কুমুদ-ধবল, সুমহান্,
রাশীকৃত অট্টহাস শঙ্করের যেন মূর্ত্তিমান্ ॥ ৫৯

দ্বিরদ দশন শুভ্র, কান্তিমান, শৈল কোলে যবে,
ভিন্না এজন সিন্ধ শ্যাম, কামরূপি, তুমি প্রবেশিবে —
অপূর্ব্ব সে শোভা সবে নিরখিবে স্তিমিত নয়ন—
হলধর গলে যেন পরিপাটী শ্যামল বসন ॥ ৬০

ভুজঙ্গ কঙ্কনশূন্য শঙ্করের হাতে হাত দিয়ে,
সেই ক্রীড়া শৈলে যদি গিরিসুতা বেড়ান বেড়িয়ে,
বিরচিয়ে স্বশরীরে সোপান পঙ্‌তি স্তরে স্তরে,
আগু দাঁড়াইবে গিয়া, মণিতট আরোহণ তরে ॥ ৬১

তব অঙ্গে সুরাঙ্গণা কোটি কোটি কঙ্কন প্রহারে,
যন্ত্রধারা গৃহ ভাবি কাড়িবে সলিল বারে বারে—

* পরশুরাম কৈলাসে মহাদেবের নিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষাকালে শরাঘাতে ক্রৌঞ্চ-গিরি ভেদ করিয়া বিবর নির্ম্মাণ করেন তাহার মধ্য দিয়া মানস হংসগণ গমনাগমন করে।

গ্রীষ্মেতে পাইয়া মনে ক্রীড়া লোলা সে সব ললনা—
নাহি যদি ছাড়ে তোরে ঘন গর্জ্জি করিবি তাড়না ॥ ৬২

বিকশিত-হেমপদ্ম-মানস-সলিল পিয়ে পিয়ে,
অভ্যাগত ঐরাবতে মুখবস্ত্র উপহার দিয়ে,
বায়ুভরে কল্পতরু পল্লব-বসন কাঁপাইয়ে
পশিবে নগেন্দ্র সেই লীলাখেলা নানান্ খেলিয়ে ॥ ৬৩

নেহারি অলকাপুরী চিনিবে না তুমি কি তাহায় ?
ছাড়িয়ে দুকূলগঙ্গা প্রণয়ীর কোলে সে ঘুমায়।
মহোচ্চ প্রাসাদ যার ঘনঘোর বরিষার কালে—
কামিনী অলক পারা মেঘমালা বহে সদা ভালে ॥ ৬৪

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইতি পূর্ব্ব মেঘ সমাপ্ত

শিবনারায়ণ দেবের জীবন-চরিত।

যিনি মন শুদ্ধ করেন না এবং আত্ম-বিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নহেন কেবল কর্ম্মতেই রত, তিনি কাশী রাজ্যের মহা পণ্ডিত হইলেও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা না থাকিলে বেদ বেদাঙ্গ উপনিষদাদি সমস্ত পাঠ করা বৃথা হয়। শিবনারায়ণ টেনাজার রাজবাটীর দেউড়ীতে উপস্থিত হইলে সেই স্থানের একজন রাজার মুসলমান সিপাহী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তুমি কি জন্য এই স্থানে আসিলে ? শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি চারিটি অন্নের জন্য আসিয়াছি। ইহাতে মুসলমান সিপাহী বলিল যে, দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, সকলের আহার শেষ হইয়াছে এক্ষণে তুমি কি প্রকারে অন্ন পাইবে, যদ্যপি তুমি বল তাহা হইলে আমি দুই পয়সার চিড়া আনাইয়া দিই, কিন্তু আমি মুসলমান ? শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি আনাইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ মুসলমান সিপাহী একটী হিন্দু-বালক দ্বারা দুই পয়সার চিড়া ও এক ঘটি জল আনাইয়া দিল। শিবনারায়ণ দেউড়ীর এক ধারে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন। দুই মহলের মধ্যস্থিত গবাক্ষ দ্বার দিয়া রাজা শিবনারায়ণকে আহার করিতে দেখিয়া একজন

চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন যে সিপাহীকে জিজ্ঞাসা কর দেউড়ীতে বসিয়া আহার করিতেছে ও ব্যক্তি কে? ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করায় মুসলমান সিপাহী বলিল যে, একজন ফকির সাধুর ক্ষুধা পাওয়াতে আমি দুই পয়সার চিড়া খাইতে দিয়াছি। এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা অত্যন্ত মনোক্ষোভ পাইয়া সত্বর থালী পায়ে একখানি বস্ত্র গাত্রে দিয়া শিবনারায়ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "মহারাজ! এই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখের দিনে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে এখন পর্য্যন্তও আপনার আহার হয় নাই!" শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, না: রাজা রাধুনি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, যাহা থাকে তাহা সত্বর বাটী হইতে আন। তৎকালে যাহা প্রস্তুত ছিল, তাহাই ব্রাহ্মণ আনিয়া দিল। শিবনারায়ণ তাহা আহার করিতে লাগিলেন, এবং রাজা সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। অন্য চাকর বাজার হইতে উত্তম জল পান আনিয়া দিল। রাজা শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহারাজ আপনার গাত্রে কাপড় নাই ও পায়েও আপনি জুতা পরেন নাই, এই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখের দিনে যে মৃত্তিকা তপ্ত হইয়াছে এই উত্তাপে অনাবৃত গাত্রে কেমন করিয়া বেড়ান?—আপনি এক্ষণে কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন? যদ্যপি আপনি পায়ে জুতা পরেন, তাহা হইলে গতকল্য আমার জন্য যে নূতন জুতা আসিয়াছে তাহা আপনাকে আনাইয়া দি—সে জুতা এখনও আমি পায়ে দিই নাই। শিবনারায়ণ বলিলেন, যে আমার কাপড়ের কোন প্রয়োজন নাই আবশ্যকীয় একখানি চাদর আছে ইহাই সর্ব্বদা থাকে এবং আমার জুতা পায়ে দিবার কোনও আবশ্যক নাই; তবে যদ্যপি দিই তাহাতেও কোন বিধি নিষেধ নাই। উত্তরাখণ্ড হইতে আমি আসিয়াছি। রাজা বলিলেন, মহারাজ, এই দূর পথ আপনি কেমন করিয়া হাঁটিয়া আসিলেন এবং যদ্যপি এক্ষণে কোন দেশে যাইতে চান আমায় অনুগ্রহ করিয়া বলিলে আমি আপনাকে রেল ভাড়া দিয়া দিই। শিবনারায়ণ বলিলেন, আমায় রেল ভাড়া দিতে হইবে না, আমি হাঁটিয়া হাঁটিয়া সকল দেশের অবস্থা দেখিয়া যাইব। ইহাতে রাজা বলিলেন, হে মহারাজ আমার বোধ হয় আপনি রাজা জনক হইবেন। আমার ধন্য ভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি আহার করিয়া বিশ্রাম করুন, তাহার পর কথাবার্ত্তা হইবে। এই কথা বলিয়া রাজা মুসলমান সিপাহীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে চিড়া দুই পয়সার আনাইয়া দিয়াছিলে পয়সা কোথায় পাইলে? সিপাহী উত্তর করিল "হুজুর আমার নিকট দুই পয়সা ছিল সেই পয়সা দ্বারা আনাইয়া দিয়াছিলাম—সেও তো হুজুরেরই পয়সা!" এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে বিচার করিয়া ভাবিলেন যে এই ভৃত্য বড়ই সৎ লোক। পাঁচ টাকার চাকরি করিয়া সে বিজাতীয় অতিথিকে সমাদর করিতে ত্রুটি করে নাই! রাজা তৎক্ষণাৎ সিপাহীর চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। শিবনারায়ণকে রাজা বলিলেন "আপনি একটু বিশ্রাম করুন এবং আমিও একটু বিশ্রাম করি।" রাজা দাসদাসীদিগকে

ডাকাইয়া উপরে উত্তম বিছানাতে উহাকে বিশ্রাম করাইতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। উহারা শিবনারায়ণকে উত্তম স্থানে বিশ্রাম করিতে দিল। একটু পরে শিবনারায়ণ চাকরদের বলিলেন যে আমি একটু বনে বেড়াইতে যাইতেছি তোমরা চুপ করিয়া থাক কাহারও সহিত কিছু বলিও না। এই বলিয়া শিবনারায়ণ বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং ত্রৈলঙ্গ হইতে সমুদ্র ও পাহাড়ের ধার দিয়া নরসিংহপুর হইয়া জগন্নাথে আসিলেন।

শিবনারায়ণ জগন্নাথের ফটকের নিকট আসিয়া দেখেন যে ফটক বাহির হইতে পাণ্ডারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে ছোট দরজা আছে সেইটি খুলিয়া রাখিয়াছে। অনেক যাত্রী ঐ ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া আছে, পাণ্ডারা তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না এবং যে যাত্রী দুই চারিটি পয়সা পাণ্ডাগণকে দিতেছে সেই যাত্রীকে তাহারা ঐ ছোট দরজা দিয়া ভিতরে দেব-দর্শন করিতে যাইতে দিতেছে এবং যে গরিব যাত্রী পয়সা দিতে অপারক তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিতেছে যে এখনও জগন্নাথের দরজা খুলে নাই—যখন খুলিবে তখন যাইতে পারিবি। শিবনারায়ণ খিড়কির দরজা দিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পাণ্ডা আটক করিয়া বলিল যে, জগন্নাথকে রিক্ত হস্তে দর্শন করিতে আসিয়াছিস, পয়সা দে তবে যাইতে পাইবি। শিবনারায়ণ এই কথা না শুনিয়া পাণ্ডাকে ধাক্কা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন, পাণ্ডা গালি দিতে দিতে শিবনারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল যে এক বেটা পাগ্‌লা ভিতরে আসিয়াছে। তখন শিবনারায়ণ মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই গোলমাল শুনিয়া অনেক পাণ্ডা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উহাদের মধ্যে একজন সুপাত্র জ্ঞানবান পাণ্ডা ধীর এবং মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তুমি কে? তোমার নাম কি? তোমার পিতার নাম কি? তুমি কি জাতি? তোমার বাটি কোথায়? তখন শিবনারায়ণ বলিলেন তুমি শান্ত এবং গম্ভীর ভাবে একাগ্রচিত্ত হইয়া শুন। প্রথমে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি কে? কিন্তু তুমি বিচার করিয়া দেখ যে যখন তোমার জন্ম হয় নাই তখন তুমি কি ছিলে, তোমার নিষ্ঠা হইয়াছে কি যে তুমি কে? তুমি এই বস্তু এই জাতি তাহা কি তুমি স্থির জানিয়াছ? জাতির স্বরূপ কি? তোমার নাম এবং তোমার রাজ্যের নামই বা কি ছিল, আর কোন্ গ্রাম বা জেলায় থাকিতে আমাকে বলিয়া বুঝাইয়া দাও। যখন তোমার জন্ম হয় নাই তখন তুমি কি জাতি ছিলে, তোমার নাম কি এবং তোমার পিতা কে ছিল তোমার পিতার নাম কি ছিল, কোন্ গ্রামে বা কোন্ জেলাতে বাস করিতে; এবং কিছুদিন পরে যখন তোমার প্রাণ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে তখন তুমি কি জাতি থাকিবে এবং কি নাম এবং তোমার পিতার নামই বা কি হইবে, আমাকে বলিতে পার কি? এই কথা শুনিয়া পাণ্ডা বলিল মহারাজ, আপনি সন্ন্যাসী পরমহংস; যদ্যপি আপনি সন্ন্যাসী বা পরমহংস হন

তাহা হইলে আমি সন্ন্যাসী পরমহংসের পাণ্ডা। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, পরমহংস সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? তাহা কোন্ অবস্থার নাম এবং যে অবস্থার নাম সন্ন্যাসী পরমহংস সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জগতে কি কেহ পাণ্ডা আছে? তখন পাণ্ডা বলিল,তাহা ঠিক বটে! মহারাজ,যাহার আত্মা পরমাত্মাতে লয় পাইয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসী পরমহংস; তিনি সর্ব্বক্ষণ পূর্ণভাবে দেখিতেছেন যে স্বয়ং আপনি আছি দ্বিতীয় আর কেহ নাই—এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরই সন্ন্যাসী পরমহংস নাম সংজ্ঞা কল্পিত আছে; এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জগতে পাণ্ডা কেহ নাই—আপনাদের মহাত্মাগণ হইতেই আমরা পালন হইতেছি। তাহার পর সেই পাণ্ডা শিবনারায়ণের নিকট হাত জোড় করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল, আমার ধন্য ভাগ্য যে আপনার দর্শন পাইয়াছি। আপনাদিগের দর্শন লাভ করা এবং চিনা বড়ই কঠিন—এই বলিয়া ঐ পাণ্ডা ওখান হইতে চলিয়া গেল এবং অপর একজন পাণ্ডা আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিল যে তুমি কি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়াছ? যদ্যপি না করিয়া থাক তবে দর্শনি টাকা পয়সা এবং আট্‌কা অর্থাৎ ভোগ জগন্নাথ দেবের উপরে চড়াও; এবং জগন্নাথ দেবের নামে যত টাকা পয়সা আনিয়াছ তাহা দান ধ্যান কর এবং বল কত টাকার ভোগ দিবে ও কত টাকা নগদ দিবে?—সত্বর চল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমার নিকটে একটী পয়সা কিম্বা এক কড়া কড়ী পর্য্যন্ত নাই—আমি কি দান করিব? তখন পাণ্ডা রাগ করিয়া বলিল, বেটা তুই রিক্ত হস্তে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস! যদি পয়সা দিস তবেই তোর ও এবং তোর পিতা পিতামহ প্রভৃতির নাম লেখা থাকিবে এবং জগন্নাথদেব তাহা জানিবেন যে আমার নিকট আসিয়াছিল এবং খাতাতেও তোমার নাম সর্ব্বদা থাকিবে। শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমার নিকট এই চাদর ভিন্ন আর কিছুই নাই। পাণ্ডা বলিল যে ইহাকে বিক্রয় করিয়া আন। শিবনারায়ণ বলিলেন, ইহার কত মূল্য হইবে? পাণ্ডা বলিল যে দুই চারি আনা যাহা হয়—তাহা লইয়া আসিয়া জগন্নাথদেবকে চড়াইয়া দাও তাহা হইলে তোমার নাম সর্ব্বদা খাতায় থাকিবে এবং জগন্নাথ দেবের সর্ব্বদা তোমার নাম মনে থাকিবে। শিবনারায়ণ বলিলেন, হে পাণ্ডা! যদি এখানে কোন দরিদ্র যাত্রী দর্শন করিতে আইসে তাহাদের উপর দয়া দৃষ্টিতে দেখ না। একেবারে তোমরা দয়াশূন্য হইয়া থাক! তোমরা জগন্নাথদেব কাহাকে বল? জগন্নাথ কি বস্তু ও কি ধাতু? তিনি নিরাকার না সাকার? যদ্যপি তোমরা বল যে কাষ্ঠের পুত্তলিকাই জগন্নাথ; তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ যে তোমরা বালকাবস্থা হইতে এই পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি তাঁহার পূজা পাঠ করিতেছ এবং দর্শন করিতেছ কিন্তু দেখ তোমাদিগের দুর্গতির শেষ নাই! সামান্য অর্থের জন্যে তৃষ্ণাতুর হইয়া লালাইত হইয়া বেড়াইতেছ। তোমাদের সুস্থিরচিত্তে কি ধারণা হইয়াছে যে, আমার স্বরূপ কি? জগন্নাথ কাহাকে বলে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ কি?—এ বিষয়ে তোমাদের কিছু মাত্র বোধ নাই! একেবারে জ্ঞানান্ধ

হইয়া ভ্রমে পতিত হইতেছ,—জানিতে পারিতেছ না যে জগন্নাথ তাহার নাম এবং কাহাকে বলে! যাঁহার নাম জগন্নাথ—তিনিই জগতের নাথ, তিনি সর্ব্বব্যাপি অন্তর্যামি সকল চরাচরেতে ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন তাঁহাকে বেদেতে বলে, সূত্রে মনিবানাইব ইতি শ্রুতি, অর্থাৎ ঐ জগন্নাথ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আপন আধারেতে এই সমস্ত জগৎকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন এবং এই মন্দির মধ্যে যে কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছ ইহা জগন্নাথ নহে; ইহা কাষ্ঠের পুত্তলিকা মাত্র অগ্নিতে দিলেই ভস্ম হইয়া যাইবে—যিনি প্রকৃত জগন্নাথ তিনি অগ্নিতে ভস্ম হইবেন না। তুমি বলিতেছ যে দুই চারি আনা চাদর বিক্রয় করিয়া আন তোমার নাম খাতায় লেখা থাকিবে এবং জগন্নাথদেব জানিবেন যে আমার নিকট আসিয়াছিল; তিনি কি অবোধ, তিনি কি আমাকে জানেন না! তিনি কি অন্তর্যামি নহেন? জগন্নাথদেবকে তুমি এবং আমি কি দিব সকলই ত তাঁহারি। তিনিত সকল জগৎ চরাচরকে দিতেছেন, তাঁহাকে আবার কে কি দিবে? তবে তুমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে তাহাকে দিতে হয় না, ঐ উপায় দ্বারা আমরা প্রতিপালন হইয়া থাকি এই মাত্র। পাণ্ডা বলিলেন, আপনি কি পরমহংস! আমি আপনাকে না চিনিয়া বিস্তর অনর্থক কথা বলিয়াছি আমার অপরাধ না লইয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। জগন্নাথ সমক্ষে যাহা আমার নিকটে বলিলেন এই সকল কথা যাত্রীদিগের নিকট বলিবেন না।

জগন্নাথ হইতে শিবনারায়ণ বরাবর তারকেশ্বরে আসিয়া মোহান্তের নিকটে গেলেন। মোহান্ত তখন চৌকীর উপর উপবিষ্ট আর দুই তিন জন পণ্ডিত নীচে বসিয়া আছে এমন সময়ে শিবনারায়ণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহান্ত শিবনারায়ণের উপর রাগ করিয়া বলিলেন, তুই কে? শিবনারায়ণ তাঁহাকে 'ওঁ নমো নারায়ণ' বলিয়া দণ্ডবৎ অথবা নমস্কার করেন নাই বলিয়া ক্রমান্বয়ে তিন বার এইরূপ রাগতভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। শিবনারায়ণের গাত্রে একখানি ছেঁড়া ময়লালাগা চাদর ছিল দেখিয়া মোহান্তের ঘৃণার উদ্রেক হইল। শিবনারায়ণ বলিলেন, যেই তুমি সেই আমি। তখন মোহান্ত আরো রাগত হইয়া বলিলেন যে তুই ও আমি এক কেমন করিয়া হইলাম—তুই গৃহস্থ না সাধু? যদ্যপি তুমি সাধু হও তাহা হইলে কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু—গিরি কি পুরি কি ভর্ত্তি?—ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে সম্প্রদায় কাহাকে বলে? সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি? গিরি, পুরি, ভর্ত্তি কাহাকে বলে?—ইহাদেরইবা স্বরূপ কি? ইহাতে মোহান্ত বলিলেন যে তুই দশ-নামি সন্ন্যাসী কাহাকে বলে জানিস না? তাহারি মধ্যে গিরি পুরি ঝুরি ভর্ত্তি ইত্যাদি। শিবনারায়ণ বলিলেন যে বিচার করিয়া দেখুন যে তিনি গৃহস্থ-ধর্ম্মে যখন ছিলেন তখন এক নামে ছিলেন কিন্তু এক্ষণে মাথা মুণ্ডন করিয়া দশ নামে পরিচিত হইলে তাহাতে লাভ কি? সন্ন্যাসী কাহাকে বলে এবং সন্ন্যাসীর স্বরূপ কি? লাল,কালো, নীল, হরিৎ, কিম্বা হাড় মাংস রক্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদির

নাম সন্ন্যাসী? তাহা হইলেত ইহা সকল পশুদেরেই আছে, ইহাতে উহাদিগকেত, সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে! শিবনারায়ণের নিকট এই কথা শুনিয়া তখন মোহান্ত বলিলেন যে আপনি কি পরমহংস? আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং আপনার নাম কি? আপনি এই স্থানে ভাল করিয়া বসুন; তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমি কোন কোন শাস্ত্র পড়িয়াছি কিনা তাহা আপনি জানেন, আমার যে কি নাম তাহা কেমন করিয়া বলিব—নাম কত যে আছে তাহার সংখ্যা নাই; পথে চলিতে চলিতে কেহ ডাকে "ও সাধু" তাহাকে আমি "ও বাবা" বলিয়া উত্তর দিয়া থাকি, কখন আমার সাধু নাম হয় কেহ বা সন্ন্যাসী বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা পরমহংস বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা ক্ষেপা বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা শালা বলিয়া ডাকে এবং কেহ বা মনুষ্য বলিয়া ডাকে কেহ বা উদাসীন বলিয়া ডাকে—এইরূপ কত জন যে কত প্রকার নাম কল্পনা করিয়া ডাকে তাহার সীমা নাই, যে যেরূপ নাম ধরিয়া ডাকে আমি তাহাকে সেইরূপেই উত্তর দিয়া থাকি। কোন্ নাম আমার মিথ্যা আর কোন্ নামইবা আমার সত্য যে সেই নামে আপনার নিকট পরিচয় দিব! এই কথা বলাতে পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আশুন বসিতে আজ্ঞা হয়। মোহান্ত বলিলেন যে আপনি কি তারকেশ্বরনাথকে দর্শন করিয়াছেন? শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন যে তারকেশ্বরনাথ কোথায় আছেন? তাঁহার স্বরূপ কি? তখন মোহান্ত বলিলেন, তারকেশ্বরনাথ মন্দির মধ্যে বসিয়া বিরাজ করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকগমন।

কাঁদ ঘরে ঘরে নর নারী সবে
মিলিয়া ভগিনী ভাই,
ধরার দেবতা শ্রীবিদ্যাসাগর
এ ধরায় আর নাই!
ভারতের হার মধ্যাহ্ন তপন
খসিয়া পড়িল আজ,
চিরদিন তরে ডুবিল ভারত
আঁধার সাগর মাঝ।
শত শত ওই দুঃখিনী বিধবা
হইল আশ্রয় হারা,

বল কেবা আর রহিল তাদের
মুছিতে নয়ন ধারা।
দীন দুঃখী যত অনাথ বালক
কাঁদিতেছে অধোমুখে,
পিতার অধিক যতন করিয়ে
কে লবে তাদের বুকে!
কত দীন হীন কাঁদিছে কুটীরে
পড়ি রোগ যাতনায়,
সুপথ্য ঔষধ কে দেবে তাদের
বাঁচাইতে শুশ্রূষায়!
ফিরে বসো ওগো দয়ার সাগর
ফেরা কি যায় না আর!
কার হাতে তুমি দিয়ে চলে গেলে
দীন দুঃখীদের ভার!
তুমি ছাড়া আর কে আছে তাদের
বল তারা কোথা যাবে?
অনাথ অনাথা আশ্রয় হীনের
মুখ পানে কেবা চাবে!
বাঁচাতে যদি গো পারিত তোমায়
আপন জীবন দিয়ে,
কত নর নারী আসিত ছুটিয়ে
পরমায়ু তার নিয়ে!
কোটি নর নারী দেয় যদি প্রাণ
ফিরিবে না তুমি আর!
তোমার অমূল্য জীবনের কাছে
কোটি কোটি প্রাণ ছার!

স্বর্গ-প্রবেশ।

অমরার ওই হেমময় দ্বার
খুলিয়া তোমার তরে,
দেব দূতগণ লয়ে সিংহাসন
দাঁড়ায়ে হরষ ভরে।

ফুল মালা করে সুরবালাগণ
আইলেন আশু সরি,
ধরার দেবতা দয়ার সাগরে
লইতে বরণ করি!
সুরপুর-বাসী মাতিয়ে উৎসবে
আনন্দে ভাসিছে আজ,
আসিছেন ওই শ্রীবিদ্যাসাগর
সাধিয়ে আপন কাজ।
দেব-অনুপম সে তনু সুন্দর
মুখে প্রেমময় দ্যুতি,
দেবগণে সবে মানিলা বিস্ময়
দেখি সে পবিত্র জ্যোতি!
পুণ্যের মুকুট শোভিত মস্তকে
গলে প্রেম মণি হার,
হল আলোকিত দেব সভাতল
অঙ্গের প্রভায় যাঁর।
সসম্ভ্রমে আসি দেবতা সকলে
প্রেম আলিঙ্গন দিলা,
কর ধরি তাঁর লইয়ে যতনে
শ্রীহরির কাছে গেলা।

মণিময় সিংহাসন পরে প্রেমময় দেব ভগবান
বসি যথা জগতের পতি, স্নেহে কত আশীষ করিলা।
আসি তথা শ্রীবিদ্যাসাগর বহু শ্রম করেছ ধরায়
চরণেতে করিলা প্রণতি। ক্লেশ বড় পেয়েছ শরীরে,
প্রেমভরে ধরি দুটি হাত এবে বৎস করহ বিশ্রাম
সযতনে কোলে বসাইলা, চিরদিন রহি স্বর্গ পুরে!

শ্রীউমাশশী দেবী।

ত্রিধারা। *

সকল সাহিত্যেরই প্রথম সৃষ্টি পদ্য; তাহার অনেক পরে জনসমাজে গদ্যের আবির্ভাব। তাই বলিয়া আপামর সাধারণের মধ্যে যে পদ্যেতেই কথাবার্ত্তা চলিত এমন নহে; তবে যাহা সাহিত্য যাহা মানবের বাহ্যিক, আন্তরিক, নৈসর্গিক আধ্যাত্মিক জ্ঞানপ্রসূত ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—তাহা কেবলমাত্র পদ্যের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই এবং হস্তলিপিরও প্রচলন ছিল না; সুতরাং শ্রুতিধারের স্মরণশক্তির উপরেই সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। এরূপ অবস্থায় ছন্দোবন্দের সাহায্যেই যে সাহিত্য সংসারে অবতীর্ণ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি। অদ্রিশিখরে তুষারগলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোতের একত্র সমাগমে নদের উৎপত্তি হইলেও সে যেমন ক্রমশঃ সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপন বিশাল কায়া ধারণ করে; তেমনি পদ্য হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি হইলেও সে ছন্দোবন্দের পুরাতন সীমানা অতিক্রম করিয়া সাহিত্যের প্রকৃত মহানভাব ধারণ করে। কাব্য-ধূম হইতে সাহিত্য-দৈত্য কালসহকারে ক্রমশঃ তাহার বিপুল অঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক ছন্দের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইল। পদ্য হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি হইলেও সাহিত্যের আত্মা পদ্য নহে; গদ্যই সাহিত্যের প্রাণ, পদ্য দৈহিক সৌন্দর্য্য মাত্র। নিরুপমা রূপসী হেলেনা অথবা ক্লিয়োপেট্রার সৌন্দর্য্য না থাকিলেও কোনও রমণীর প্রাণ অথবা আত্মার ত অভাব নাই! ভাব প্রকাশের ক্ষমতাই ভাষার প্রাণ, এবং সে ভাব গদ্যে যেমন বিবিধ বিষয়ক এবং বহু জাতীয় হয় এমন আর পদ্যে হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র মানসিক উৎকর্ষে জীবন রক্ষা হয় না—তাহার জন্য আহারীয়ের প্রয়োজন করে, এবং এমন কি মস্তিষ্কের পরিচালনাভাব সত্ত্বেও একমাত্র আহারীয়ের সাহায্যে জীবন ধারণ করা একান্ত অসম্ভব ব্যাপার নহে। কাব্য উচ্চ অঙ্গের সামগ্রী হইলেত তাহা অলঙ্কার মাত্র সজ্ঞান জীব নহে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, অপরাপর অনুকূল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী গদ্যের প্রাদুর্ভাব না হইলে ফরাসী ভাষার সহিত সংগ্রামে উহা সম্পূর্ণরূপে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। এমন কি সেক্ষপীয়ের মিলটন প্রভৃতি ইংরাজী সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকাগণের প্রতিভাসত্ত্বেও রাণী আনের রাজত্বকালীন ইংরাজী সাহিত্যের যে গরিমা, তাহার কারণ ইংরাজী পদ্যের সমধিক উন্নতি। আদিসন-প্রমুখ ক্ষুদ্র তারকাগণ ক্ষীণপ্রভ হইলেও ব্রিটিশ নভোমণ্ডল দিবালোকের ন্যায় আলোকিত করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যেও সেইরূপ গদ্য বিরচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দেখিলে আমরা পরিতুষ্ট হই; ভরসা হয় তবে কাংসময় ইংরাজীর পার্শ্বে মৃণ্ময় বাঙ্গালা ভাষা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। রামমোহন

* ত্রিধারা—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।

রায়ের ধর্ম্মালোচনা, অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান-ব্যাখ্যা, বিদ্যাসাগরের ভাষা-সরলতা, দীনবন্ধুর সরসতা, বঙ্কিম বাবুর অপূর্ব্ব কল্পনা-সৃষ্টি, দ্বিজেন্দ্র বাবুর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা, রামদাস সেন ও বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক গবেষণা অল্পে অল্পে বঙ্গ-সাহিত্যকে সবল করিতেছে সত্য, কিন্তু ইংরাজীর সহিত সমভাবে লড়িতে হইলে অধিক বলের প্রয়োজন। শক্তি সঞ্চারের একমাত্র উপায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের মহৎ ভাব চিন্তা ও বিকশিত সৌন্দর্য্যের বঙ্গীয় সাড়ির অন্তরালে ভূষিত করিয়া প্রচার করা ও পুরাতন মহান হিন্দুভাবের পুনরুদ্ধার—এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আমরা ইংরাজী পড়ি, ইংরাজী শুনি এবং পূজা করিতে ইংরাজেরই পূজা করি, ভারতের পুরাতন ধন রত্ন দেখি না, জানি না, চিনি না। সাহিত্য জাতির প্রতিকৃতি স্বরূপ—জাতি যেরূপ মহৎ ও বীর্য্যবান হইবে সাহিত্যও সেই অনুসারে উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইবে। তাই জনেক প্রতিভাশালী ইংরেজ ভাবুকবর বলিয়াছেন "উৎকৃষ্টতম ভাষার পরিচ্ছদিত মহত্তমভাবের নামই সাহিত্য"। এই সাহিত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথম জাতির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। কেবল মাত্র অনুকরণ ও গলাধঃকরণে তাহা সাধিত হইবার নহে। এই আনুকরণিক দলের বিফল প্রযত্নের প্রতি-ক্রিয়া স্বরূপ যে "আর্য্যিক' সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে তাঁহাদের দ্বারাও এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে। দুই দলেই দুই বিভিন্নদিকে ধাবিত কিন্তু কেহই স্বর্ণমণ্ডিত মধ্যপথগামী হইতে চাহেন না। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত কৃতবিদ্য মনীষীরা যদি তাঁহাদের বহুদেশাহরিত জ্ঞানভাণ্ডার দেশী ছাঁচে ঢালাই করিয়া দেন তবে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। সুদূরপ্রসারিত উচ্চ শিক্ষার বলে সমস্ত দেশী মন্দ ও বিলাতী ভাল অথবা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব যে যাহা কিছু "আর্য্য" তাহাই উৎকৃষ্ট ও যাহা কিছু অনার্য্য তাহাই নিকৃষ্ট—এইরূপ অমানুষোচিত গোঁড়ামি ভাব ত্যাগ করিয়া প্রশস্ত-হৃদয়ে দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে সত্য ও জ্ঞানের স্থাপনা এবং অসত্য ও অজ্ঞানের নির্ব্বাসনই মহত্ত্ব রাজ্যের একমাত্র সোপান। ইহাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য! অনন্য-কর্ম্মা হইয়া এ কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিলেই তবে জাতির মঙ্গল, ভাষার মঙ্গল, সাহিত্যের মঙ্গল! এই প্রবন্ধের শিরোনামিত পুস্তক পাঠেই আমাদের মনে এতগুলি কথা উঠিয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্য সমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইংরাজী শিক্ষার রস পান করিয়াও যে তাঁহার স্বদেশীয় সোমরসের উপর এতদূর আন্তরিক টান আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশিত মহাভারতের পুনর্মুদ্রাঙ্কন করিয়া বঙ্গ সমাজে প্রচার করিয়াছেন, শকুন্তলাতত্ত্ব রচনা দ্বারা প্রাচীন সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং স্কুলপাঠ্য নীতি পুস্তকাদি বিরচন দ্বারা বালকবালিকাদের সুশিক্ষার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; আর এই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য-বিধায়ক পুস্তকখানি প্রণয়ন দ্বারা শিক্ষিত সমাজেরও বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন!

পঞ্চদশটি রচনা তিন ধারায় বিভক্ত করিয়া লেখক গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন "ত্রিধারা।" প্রথম রচনা "অনন্ত মুহূর্ত্ত"। ঘোড়া দৌড়িতেছে, এমন সময় তাহার প্রতিকৃতি লইলে যে অবস্থায় তাহার ছবি উঠে তাহা অশ্বের দ্রুতগতিবশতঃ আমরা কখন চক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, তথাপি যেমন তাহার সেই ক্ষণ-স্থায়ী-ভাব ছবিতে নির্দ্দিষ্ট ভাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া যায়, তেমনি এই চির-পরিবর্ত্তনশীল সংসারে এমন এক একটি মুহূর্ত্ত আসে যাহা ক্ষণজীবী হইলেও মানব-হৃদয়ে সুগভীর অক্ষরে আপন চিত্র অঙ্কিত করিয়া যায়। সে ছবি দেশভেদেও অক্ষুণ্ণ-প্রভাব; সর্ব্বগ্রাসী কাল তাহার কিছুই করিতে পারে না; সে আজ যেমন প্রভাবশালী সত্য, কাল তেমনই ছিল আর আগামী কল্যও মনে হয় তেমনি রহিয়া যাইবে; যতদিন মানব প্রকৃতির ভাবান্তর না হয়, যতকাল মানব-হৃদয়ের শেষ অণুটি পর্য্যন্ত সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়া না যায়, তত দিন তাহার প্রভাব বিনষ্ট হইবার নহে;—তাই গ্রন্থকার সে মুহূর্ত্তের নাম দিয়াছেন, অনন্ত মুহূর্ত্ত। শকুন্তলা হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন তাহা এত সুন্দর হইয়াছে যে আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন।

"অত্যুচ্চ অভ্রভেদী হিমাচলের কোলে শান্ত শব্দহীন সৌন্দর্য্যময় বনপ্রদেশ। তথায় স্বচ্ছ শুভ্রসলিলা মালিনী নদী নিঃশব্দে প্রবাহিতা—মালিনীর পার্শ্বে পুণ্যবান্ ঋষির পবিত্র আশ্রম। আশ্রম নিস্তব্ধ—যেন যোগীর ন্যায় যোগমগ্ন। হঠাৎ বিদ্যুদ্বৎ বজ্রধ্বনি হইল—

অয়মহং ভোঃ

"হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু, পশু, পক্ষী, ঋষি, ঋষিকুমার, ঋষিকন্যা, সেই গভীর নিস্তব্ধতা—সকলই চমকিয়া উঠিল। কেবল চমকিল না—একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে একটি ক্ষুদ্র বালিকা!

"দেখিয়া বজ্রের ক্রোধ বাড়িল। বজ্র হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া গর্জ্জিতে লাগিল—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

"সব বিদীর্ণ হইল—হইল না কেবল সেই ক্ষুদ্র কুটীরে সেই ক্ষুদ্র বালিকা! বালিকা তখন ব্রহ্মাণ্ডান্তরে বিলীন। বজ্রও সে বিলীনতা বিদীর্ণ করিতে পারিল না। বালিকা যেমন তাহার ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন, বজ্রও তেমনি সেই বালিকার বিলীনতায় বিলীন হইয়া গেল!

"বল দেখি—বালিকার এই বিলীনতায় বজ্রের এই বিলীনতা দেখিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই

সংযুক্ত বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কি না—যে কাল কেবলই চলে, সেই কাল সেই বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কি না? বল দেখি—যে মুহূর্ত্তে বালিকার এই বিলীনতায় এই ভীষণ বজ্রকে বিলীন হইতে দেখি, সে মুহূর্ত্ত অনন্ত মুহূর্ত্ত হইয়া যায় কি না?"

"পাখিটি কোথায় গেল?"—গ্রন্থকার এই প্রবন্ধে বলিতেছেন যে প্রেমের বস্তু যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহাতে আপনাকে হারাইতে পারিলে অনন্ত লাভ হয়।

"আহা! আমার সে পাখী আর নাই! আজ চারিদিন হইল আমার সে পাখী মরিয়া গিয়াছে! মরিয়া কোথায় গিয়াছে? কে বলিবে কোথায় গিয়াছে? কিন্তু আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি যে সে মরিয়া অনন্ত হইয়াছে। আজ আমি যেখানে যে রঙ্ দেখি সেখানে সেই রঙে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে চোক্ দেখি সেখানে সেই চোকে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। যেখানে যে ঠোঁট দেখি সেখানে সেই ঠোঁটে আমার সেই পাখী দেখিতে পাই। আজ আমি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র অগ্নি বায়ু জল হিম তাপ পাহাড় পর্ব্বত ধূলা বালি বৃক্ষ লতা ফল ফুল পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ নর নারী সকলেতেই আমার সেই পাখী দেখিতেছি, হাড়ে হাড়ে আমার সেই পাখী অনুভব করিতেছি। আজ এ অনন্ত বিশ্বে আমার সেই পাখী ছাড়া আর কিছুই নাই। আজ আমিও আমার সেই পাখী-ময়, এই অনন্ত বিশ্বও সেই পাখী-ময়। তাই আমিও আজ কি মধুময়, আমার অনন্ত বিশ্বও কি মধুময়! আমার ক্ষুদ্র পাখী আজ অনন্ত কায়া ধারণ করিয়া অনন্তব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। আমার এক ফোঁটা পাখী আজ অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া অনন্ত বিশ্ব ভরিয়া রহিয়াছে। তাইতে অনন্ত বিশ্বও অপূর্ব্ব শ্রী এবং অনুপম সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যে সেই এক ফোঁটা পাখীতে মজিয়াছিলাম, তাইত আজ অনন্ত বিশ্ব দেখিলাম, অনন্ত বিশ্বে মজিলাম এবং অনন্ত বিশ্ব আমাতে মজিল। তাইত আজ অনন্ত হইলাম। তাইত আজ বুঝিলাম যে ফোঁটার ভিতরেই বিশ্ব ফোটে, ফোঁটা অনন্তেরও অনন্ত।"

"ছায়া"—এ রচনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই এ প্রবন্ধটী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন। ধর্ম্ম-প্রবণ হিন্দু-হৃদয়ে তাহার প্রভাব অখণ্ডনীয়। ইংরাজী শিক্ষা, ইংরাজী সভ্যতা সকলই Individualistic, হিমাচলের ন্যায় বন্ধুর উচ্চ-শৃঙ্গ উত্তোলন করাই তাহার আদর্শ ভাব; কিন্তু হিন্দু আদর্শ তাহা নহে। নিজত্বের ব্যক্তিত্বের লোপ ও সংসারের মায়ারচিত আবরণ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত সত্তার ভাব ও মর্ম্ম গ্রহণ, Form কাটিয়া Substance-এর বিকশনই হিন্দুদের ধর্ম্মের সার শিক্ষা। গ্রন্থকার হিন্দু ভাবটি অতি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পাঠক তাহার আভাষ পাইবেন।

"বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য বিবর্জ্জিত—বৃক্ষের সূক্ষ্ম, সুন্দর, শুদ্ধ, স্বপ্নবৎ বৃক্ষত্ব মাত্র। সে ছায়া সূর্য্যালোকে দেখিও, যত পার দেখিও, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ লাভ করিবে। কিন্তু স্থির বায়ুতে একবার জ্যোৎস্নালোকেও দেখিও। জ্যোৎস্নালোকে সে ছায়া দেখিলে পাগল হইয়া যাইবে—সে ছায়া জ্যোৎস্নালোকে এতই কল্পনারূপী, এতই ভাবরূপী, এতই আত্মারূপী। সে আলোকে সে ছায়াকে কোন-কিছুর ছায়া বলিয়া মনে হয় না—মনে হয় বুঝি সে ছায়া ইচ্ছাময়ের সাধের একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।"

"ছায়া আত্মত্যাগের ফল। গাছের ছায়ায় গাছের রঙ থাকে না, গাছের দেহের পুষ্টি ও স্থূলতা থাকে না, গাছের জ্যোতি ও লাবণ্য থাকে না, গাছের তেজ থাকে না, গাছের রস থাকে না, গাছের ফুলের সৌরভ থাকে না, গাছের ফলের শাঁস বা সুস্বাদ থাকে না। গাছ সব ত্যাগ করিলে তবে গাছের ছায়া হয়। সব ত্যাগ করিয়া গাছ ছায়ারূপী হইলে তবে আতপতাপিত পথিকের আশ্রয়স্থল হয়। স্ত্রী পুত্র জনক জননী ভাই ভগিনী দাস দাসী বন্ধু বান্ধব সুখ সম্পদ ভোগ বিলাস সব ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ছায়ারূপী হইলে পর তবে বুদ্ধ চৈতন্য অসংখ্য আতপতাপিত অনন্তপথের-পথিকের বিশ্রামস্থান হইয়াছিলেন। তুমি আমি ক্ষুদ্রলোক, বুদ্ধ চৈতন্য হইতে পারিব না। কিন্তু আমরা যেমন তেমনি ছায়ারূপী হইয়া তেমনি স্বল্প প্রাণীর আশ্রয়স্থান হইতে পারিত। কিন্তু সেইরূপ ছায়ারূপী হইতে হইলে আমাদিগকে আমাদের অনেক জিনিস পরিত্যাগ করিতে হইবে! বহু দিন হইল আমার একটি হিন্দু বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎ মাত্র তাহার উপর আমার স্নেহ জন্মে। বালিকা তিন চারি বৎসরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিল। তখন তাহার দেহ যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। পূর্ণ জোয়ারে সুন্দর স্রোতস্বিনী যেন কূলে কূলে পূরিয়া উঠিল, গাঙ্গ-ভরা জল যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। যুবতী শ্যামাঙ্গী—কিন্তু শ্যামাঙ্গে সৌন্দর্য্য যেন ধরে না—শ্যামাঙ্গীর সৌন্দর্য্যের ছটা যেন চাঁদের হাসির ন্যায় হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন যুবতীর পূর্ণ-প্রস্ফুটিত দেহে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত হইয়াছে। অত ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন বলিয়াই যুবতী যেন লজ্জায় অত কুণ্ঠিত। এই সময় কিছু দিন আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আবার যখন দেখিলাম, তখন আর তাঁহাকে দেখিলাম না, দেখিলাম তাঁহার একখানি ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ ছায়া বসিয়া রহিয়াছে! তাঁহার দেহের তত ঐশ্বর্য্য তাঁহার দেহে নাই—সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার ছায়ারূপী দেহে ছায়ারূপী অঙ্কস্থিত শত-দল-পদ্ম-সদৃশ একটি শিশুর দেহে অর্পিত হইয়াছে! ঐশ্বর্য্যরূপিণী যুবতী আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য সন্তানকে দিয়া আপনি ছায়ারূপিণী জননী হইয়াছেন! তখন মনে হইল এমন করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য পরকে দিতে বুঝি বুদ্ধ, চৈতন্যও পারেন না, পরের জন্য বুদ্ধ চৈতন্যও বুঝি এত ছায়ারূপী হইতে পারেন না। যুবতীকে জননী হইতে দেখিয়া বুঝিলাম যে জগতে ছায়া হইতে না পারিলে জগতে মানুষের জীবন বৃথা। আর বুঝিলাম যে যুবতী অপেক্ষা জননী সুন্দর এবং বৃক্ষ অপেক্ষা বৃক্ষের ছায়া সুন্দর, কেন

না জননী অন্যের জন্য যুবতীর সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপিণী হন এবং বৃক্ষের ছায়া অন্যের জন্য বৃক্ষের সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপ ধারণ করে। জগতে যদি সার্থক ও সুন্দর হইতে চাও তবে বৃক্ষ ও জননীর ন্যায় আপনার সব ত্যাগ করিয়া ছায়ারূপ ধারণ কর। ছায়াই পৃথিবীর সার পদার্থ। ছায়ার অর্থ বুঝিয়া ছায়া হইয়া পৃথিবীর সার পদার্থ হও।"

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে লেখক বলিতেছেন ;—"ফল কথা, ছায়া যদি কিছু না তবে বৃক্ষও কিছু নয়। তবে কিছু-নয় বলিয়া ছায়াকে এত অবজ্ঞা কর কেন ?" এরূপ গম্ভীর ভাবে ছায়ার সারবত্তার কথা বলা কেমন একটু অদ্ভুত শোনায় ! ঘুমের ঘোরে প্রাণের আবেগে মানুষের এরূপ বলা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারেগ্রাফে বটে ! বুদ্ধিতে যখন সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম না তখন এরূপ ভাবে থাবড়া মারিয়া কথা বলিলে কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া যাইতে হয় ! গ্রন্থকার গম্ভীর ভাবে সত্য শিক্ষা দিতেছেন কিম্বা গদ্যে কাব্য-সৌন্দর্য্য-ছটা বিকীরণ করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার হইয়া পড়ে। হইতে পারে ভবিষ্যতে দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহাই প্রকৃত হইয়া দাঁড়াইবে ! কিন্তু এখনও যখন সে সময় আসে নাই, এখনও যখন উহা সত্য বলিয়া সাধারণে পরিগৃহীত হয় নাই তখন গম্ভীর ভাবে যুক্তির সাহায্যে ঐ কথা প্রমাণ করিতে গিয়া আমার বোধ হয় গ্রন্থকারের রচনার মর্য্যাদা হ্রাস হইয়াছে—এরূপ না করিয়া গম্ভীর যুক্তি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ কাব্য ভাবে বর্ণনা করিলেই যেন ভাল হইত !

"বৌ কথা কও"—এটিও বড় মন্দ হয় নাই ।এ সম্বন্ধে বলিবার তেমন বিশেষ কিছু নাই—তবে উপসংহার টুকু ত্যাগ করিলে আমাদের বোধ হয় ভাল হইত—ইহা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না করিয়া বরং তাহার হ্রাস করিয়াছে। গ্রন্থকার আরম্ভেই বলিতেছেন, "বৌ কথা কয়, করে বিনয়, ভাঙছে বৌয়ের মান।' দীনবন্ধু প্রভাত বর্ণনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। কথাটি কিন্তু ঠিক নয় ; বৌ কথা কও সকল সময়েই, সকাল সন্ধ্যা সকল সময়েই বৌ কথা কও বলে—তথাপি দীনবন্ধুর কথাটি ঠিক নয়।" তাহার কারণ স্বরূপে বলিতেছেন, "বৌ কথা কও, ডাকে সকল সময়েই—প্রভাতেও ডাকে, কিন্তু বৌয়ের মান ভাঙ্গে কেবল দ্বিপ্রহরে। প্রভাতে পত্নীর মান হয়, বউয়ের মান হয় না। বৌ কথা কও শয়ন গৃহের পাখী নয়—সংসারাশ্রমীর সংসার ক্ষেত্রের পাখী।" বঙ্গগৃহে দাসীরা পর্য্যন্ত 'বৌমা' বলে, অতএব বউ কথা কও যে মাতৃ স্থানীয়া হইয়া বধূকে স্বামীর প্রতি মান ভঞ্জনের জন্য বিশেষ উপরোধ অনুরোধ করিতেছে এরূপ বলা কি দীনবন্ধুর নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে ? আমাদেরত তাহা মনে হয় না।

"দুইটি হিন্দু পত্নী"—ভ্রমর ও সূর্য্যমুখীর তুলনা করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, "বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখী আদর্শানুযায়ী হিন্দু পত্নী এবং তাঁহার ভ্রমর ঠিক আদর্শানুরূপ না হইলেও খাঁটি হিন্দু পত্নী বটে।" সূর্য্যমুখী বঙ্গকাননের ফুল হইলেও কোন দেশেই তাহার অনাদর হইবে না। বিষবৃক্ষ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া জন-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয় নাই

বটে কিন্তু তাহা গ্রন্থের অপেক্ষা অনুবাদেরই অসারবত্তার ফল। সূর্য্যমুখী আমাদের অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী বলিয়া আমাদের জাতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—হিন্দু পত্নীর এই মনোভাব বশতঃই বঙ্গ-পতিগণ অকাতরে সহস্রাধিক দুরাচরণ করিয়া হাস্য মুখে পত্নী সম্ভাষণ করিতে সাহসী হন ! ভ্রমর হিন্দুর আদর্শ হউক না বা নাই হউক সে যে সূর্য্যমুখী অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ-চরিত্র, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নাই। তিনি সূর্য্যমুখীর ন্যায় সাধারণ হিন্দু কন্যা নহেন, বঙ্গসাড়ির অন্তরালে মানবের মহত্তম আদর্শ মহিলা। বিষবৃক্ষের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইংরাজীতে অনুবাদিত হইলে তাহা ইউরোপীয় শিক্ষিত মণ্ডলীর নিকট বিশেষ সমাদৃত হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভ্রমর স্বামীকে ভালবাসেন ভক্তি করেন বটে, কিন্তু সে প্রেম সে ভক্তি পতির দুরাচরণে অক্ষুণ্ণ রহিবার নহে, তাহার সত্যের প্রতি মহত্বের প্রতি নিষ্ঠা আরো অধিক ! তিনি স্বয়ং স্বামীকে লিখিতেছেন :—"তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা —তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি ; যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই—বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।" ভ্রমরের নিভৃততম প্রদেশের স্বামী-আদর্শ ভাঙ্গিয়া গেল, সেই সঙ্গে তাহার কোমল জীবন লতিকাটিও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল ! ভ্রমরের স্বামীর প্রতি রাগ অভিমান নহে, তাহা মর্ম্মে-আঘাতজনিত গভীর আর্ত্তনাদ ! স্বামীর অপর রমণীতে আসক্তিতে তাহার শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যের অবমাননা বশতঃ তাহার Pride-এ আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া তাহার রাগ নহে,—তাহার অন্তরতম কক্ষের দেবমূর্ত্তির মৃত্যুর মর্ম্ম যন্ত্রণা, তাহার রাগ তাহার অভিমান ভক্তের ভগবানের চির সন্দর্শনের ক্ষণমাত্র অভাবজনিত ক্ষোভ !—তাই আমরা বলিয়াছি সূর্য্যমুখী সংসারে অনেক মিলিতে পারে কিন্তু ভ্রমর অধিক পাওয়া সুকঠিন। ভ্রমর বঙ্গ সাহিত্যের শিরোভূষণ।

"সুখের হাট ও সৌন্দর্য্যের মেলা"—এটি বড় ভাল হইয়াছে। "সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যে দর্শনে পরমার্থ লাভ হয় না, কিন্তু সুন্দর অসুন্দর নির্ব্বিশেষে সকল পদার্থের মধ্যে যে ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মপদার্থ মানস চক্ষে দেখ, তাহার আর কমবেশী ভাল মন্দ ইতর বিশেষ নাই, তাহার পরিমাণ অসীম, সৌন্দর্য্যও অসীম।" কথাটি ঠিক বটে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য Fine Art অথবা চিত্তরঞ্জিণী বিদ্যাকে যেরূপ তাচ্ছিল্য সহকারে বর্ণন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন সহকারে ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গবাসী যে বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হন, তাহা সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার সম্পূর্ণ দোষ ইংরাজী শিক্ষার স্কন্ধে চাপাইলে ন্যায্য হয় না। এইরূপ হওয়াই বরং স্বাভাবিক,নূতন কোন রসের আস্বাদ পাইলে লোকে তাহাকে তিক্ত না করিয়া ছাড়ে না। আমরা সুন্দরে অসুন্দরে কিছুতেই

ব্রহ্মশক্তির বিকাশ দেখিতাম না এখন তবু যে দৃশ্য সৌন্দর্য্যের মহিমা কিছু পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছি তাহা কি আনন্দের বিষয় নহে? তবে আমাদের শিক্ষা যে সম্পূর্ণ নহে তাহা কে অস্বীকার করিতেছে। আর সেই জন্যই ত আজ আমরা এত নিকৃষ্ট নির্জীব নিস্তেজ! গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে স্বয়ং অনেক স্থানে অনেক কথা বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা আছে কিন্তু তাহা যাহাতে সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক, শুধু ইংরাজী শিক্ষাকে অযথা গালি দিলে সে সুফল ফলিবে না; ইহার নিমিত্ত স্বদেশীয় ভাবের মর্ম্ম ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন! শুদ্ধ কালিদাস ভবভূতি পড়িলে চলিবে না সংস্কৃত দর্শন উপনিষদ অধ্যয়নেরও প্রয়োজন করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন আছে সত্য, কিন্তু প্রবেশিকা হইতে এম্‌এ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষাতেই কাব্য ব্যতীত দর্শন উপনিষদ পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে কি? জাতি কাব্যে গঠিত হয় না; ধর্ম্মে দর্শনে জাতির সংগঠন। কাব্যাদি সেই বীজাঙ্কুরে জলসেচন পূর্ব্বক পুষ্ট করিয়া তুলে মাত্র। য়ুরোপে Art-এর অপব্যবহার হয় নাই তাহা আমরা বলিতেছি না, সেখানেও সকলে যে Art-এর উচ্চ আদর্শ ও মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইবে এ কথাওতো আর বলা চলে না! চারুবিদ্যা-দেবী স্বর্গ মর্ত্তের সেতুস্বরূপ, এক চরণ স্বর্গে অপর চরণ মর্ত্তে রাখিয়া তিনি আমাদের উন্নতির জন্য আমাদের দেবত্ব প্রদানের জন্য সদা প্রয়াসী। যোগী দার্শনিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে তুচ্ছ করিতে পারেন কিন্তু ক্ষুদ্র ভক্ত-মানব তাঁহাকে ত্যাগ করিতে সক্ষম নহে। তিনিই তাহার একমাত্র সহায়।

"ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা"—এটি আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। "আত্মার উপযোগী জড়ত্ব ব্যতীত আত্মার বিকাশ হয় না। নির্জীব জড় চিরকাল সেই উপযোগিতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে সেই আত্মার উপযোগী-জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে Evolution বা ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতিতে সেই চেষ্টা এবং অগ্রবর্ত্তিতা ব্যক্ত হইতেছে। সেই উপযোগিতা লাভ করিতে চেষ্টা করার এবং সেই আমার উপযোগী জড়ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার নামই জড়ের আধ্যাত্মিকতা বা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা।... সমস্ত জড়জগতের যেমন মানব দেহেরও তেমনি আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা আছে। মনুষ্যের এমন একদিন গিয়াছে যখন তাহার হস্ত পদ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় কেবল দেহের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।.....ক্রমে সে দিন গিয়া মনুষ্যের অন্য দিন হয়। তখন আহার বিহার ছাড়া জ্ঞানোপার্জ্জন প্রভৃতি উন্নত বিষয়েও মনুষ্যের ইন্দ্রিয় নিযুক্ত হইয়াছিল।...এইরূপ মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক আসক্তিও বিকশিত হয়।...মানব মনের আধ্যাত্মিকতা যত বৃদ্ধি হয় মানবেন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিকতা এবং আধ্যাত্মিক আসক্তিও তত বৃদ্ধি হয়।" বাহুল্যভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না, পাঠক ইহা হইতেই দেখিবেন যে, এ ভাবটি আমাদের মর্ম্মগত পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষার

সহায় স্বরূপ—এই ভাবে জড়কে দেখিলে নীতি সম্বন্ধে, জীবনের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা যুক্তিমূলক ব্যাখ্যা পাওয়া চায়।

"কেতাব কীট"—এ রচনাটি বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ খাটে—আজকালকার বঙ্গ-সাহিত্য নিতান্ত নির্জীব নিস্তেজ, প্রাণহীন জড়পিণ্ড মাত্র। তাই কাল সহজে তাহাকে গ্রাস করিতে পারে কিন্তু আত্মাযুক্ত সাহিত্যের দেহ নশ্বর হইলেও তাহার আত্মার প্রভাব সংসারে অখণ্ডনীয় ভাবে রহিয়া যায়।

"ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা"—পাশ্চাত্য ইতিহাস বাজে কথা লইয়াই ব্যস্ত আসল কথার প্রতি তাহার ততদূর দৃষ্টি নাই; হিন্দুর পুরাণ প্রকৃত ঘটনা মূলক না হইলেও তাহাই প্রকৃত ইতিহাস, কেন না তাহার মূল সত্য। এ সম্বন্দে একটি কথা আছে। গ্রন্থকার ইতিহাসের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা প্রকৃত ইতিহাস নহে। ইতিহাস প্রকৃত ঘটনা-বলীর সংগ্রহও বটে এবং তাহাদের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ লইয়াও তাহার কার কারবার আছে। পুরাণ ও ইতিহাস, উভয়েরই সংসারে যথাযথ স্থান আছে, একটির অভাব অপরের পূরণ করা দুঃসাধ্য।

"জীবনের কথা"—গ্রন্থকার পূর্ব্বে ইতিহাসের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন এক্ষণে জীবন-চরিত সম্বন্ধেও তিনি সেই কথাই বলিতেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় গ্রন্থকার একটু এক দিকে ঘেসিয়া পড়িয়াছেন। কল্পনারঞ্জিত ইতিহাস অথবা জীবনচরিত এবং প্রকৃত-ঘটনা মূলক ইতিহাস ও জীবন চরিতের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে! কাল্পনিক ঘটনা অপেক্ষা জীবন্ত দৃষ্টান্তের প্রভাব সংসারে অনেক অধিক। ঈষপের গল্পাবলী ও কথামালা বিশেষ জ্ঞানগর্ভ হইলেও তাহাদের জ্ঞান প্রাণহীন, জীবন্তের সে ক্ষমতা সে শক্তি সে প্রভাব তাহাদের নাই। আমাদের জীবনের উপর মনের উপর হৃদয়ের উপর তাহার প্রভাব অনেক অধিক। কল্পনা-রঞ্জিত ইতিহাস অথবা জীবনচরিতকে সাধরণের প্রকৃত-ঘটনা-স্বরূপে গ্রহণ করিবার সম্ভা-বনা থাকে বলিয়া তাহাতে যথেষ্ট অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। আর তাই আজ আমাদের দেশে কুসংস্কারের প্রভাব এত অধিক, তাই আমাদের দেশে সত্যের সহিত এত অহিতকর মিথ্যার প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে। কুসংস্কারের প্রভাববশত সত্যের প্রতি বঙ্গবাসীর দৃঢ় ভক্তির অভাব লক্ষিত হয়; স্থায়ী সুদৃঢ় বিবেক-সংযুক্ত মত ত প্রায় দেখাই যায় না। যদি আমা-দের প্রতি সত্যের সেরূপ দৃঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিত তবে সত্যের জন্য মহত্বের জন্য অকাতরে প্রাণ মন বিসর্জ্জন দিতে আমরা এত কুণ্ঠিত হইতাম না!

"সিদ্ধিদাতা গণেশ"—"ধীরতা, সংযম ও শান্তি যাহার মূর্ত্তিতে ব্যক্ত, সে স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক লোকে কেবল তাহারই দর্শনের সহিত সিদ্ধির প্রত্যাশা সংযুক্ত করিয়া থাকে।" গণেশ সেই ভাবের পৌরাণিক আদর্শ তাই পুরাণকারেরা তাহার নাম দিয়াছেন সিদ্ধি-দাতা গণেশ। "সে মূর্ত্তি স্থৈর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সংযম সতর্কতা ও চিন্তাশীলতার মূর্ত্তি।" গ্রন্থকার তৎপরে বলিতেছেন "কার্য্য সিদ্ধির জন্য বিচার বিবেচনা ও যন্ত্রণা প্রথম হইতে

শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক। সে বিচার বিবেচনা বা মন্ত্রণার ত্রুটি হইলে অপরিমিত উৎসাহ উদ্যম ক্ষিপ্রকারিতা ইত্যাদি থাকিলেও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না।" কথাটি আংশিক সত্যমাত্র। নৈয়ায়িকের বিশ্লেষণে হয়ত এই গুণগুলিই কার্য্যসিদ্ধির কারণস্বরূপ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের কার্য্য ঠিক ঐরূপ ভাবে সম্পাদিত হয় না। সর্ব্ব বিষয়ের কারণের ন্যায় সংসারে কার্য্যসিদ্ধির কারণও রহস্যময়। স্থির ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করিলেই তোমার সকল সময় কাজটি ঠিক হয় না, অথবা তাহার সুফল ফলে না! অনেক সময়ে সতরঞ্চ খেলায় আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কি বড়ের মুখে মন্ত্রীটি বসাইয়া দিই না? তাই বলিয়া অবশ্য না ভাবিয়া চিন্তিয়া কি আর দাবা খেলা চলে! এ বিষয়ে দাবা খেলার সঙ্গে জীবন ক্রীড়ার অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। অনেক লোক আছেন যাহারা অনেক দিন হইতে দাবা খেলিতেছে বটে কিন্তু যেমন খেলোয়াড় দেখিলেই বুঝিতে পারে যে ইহা তাহার কাজ নহে! তথাপি বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে সে যেমন চলনসই খেলোয়াড় হইতে পারে, তেমনি আবার সংসারে কতকগুলি প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সংসার-সমরে জয়ী হইতেই আসিয়াছেন। প্রতিভা তো আর কিছু সকলকার নাই, আর সেইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক; তাহাদেরওত সংসারে তিষ্ঠিতে হইবে! তাহাদের জন্য সে প্রণালী খাটে, কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের পক্ষে নিয়ম স্বতন্ত্র। প্রতিভার বিধি নিয়ম সাধারণ বহির্বস্তুতে পাওয়া যায় না তাহার বিধি তাহার নিজেরই অন্তর্নিহিত।

"বাঙ্গালির প্রকৃত কাজ"—গ্রন্থকার বলেন, ঘরের সহস্র কাজ বাকি পড়িয়া রহিয়াছে, সে সমস্ত কাজ করিতে না গিয়া বাঙ্গালীর ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে চাওয়া কোন কাজের কথা নহে! ভারতকে সে পার্লেমেণ্ট বুঝিতে পারে না এবং পারিবেও না। বাঙ্গালির যে সামান্য শক্তি আছে তাহা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টস্থিত মিশ খাইবার নহে! একজন সেখানে গিয়া কি করিতে পারিবে? বাহুল্যভয়ে আমরা বিশেষ প্রলোভন সত্ত্বেও উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, পাঠক ৯৮-১৯১ পৃঃ দেখিবেন। চার্লস ব্র্যাড্‌ল একক কতদূর শ্রবজীবীদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন! এতদ্ব্যতীত ইহার বিশেষ একটি শুভফল আছে। বাঙ্গালি এমনই অসার যে সে তাহার স্বজাতীয় প্রতিভা চিনিতে পারে না বিলাতী ছাপ না পড়িলে কিছুতেই বঙ্গবাসীর মান ধরে না। ইংরাজ মণ্ডলীতে বাঙ্গালির প্রশংসা হইলেই তবে তাহার চক্ষু ফুটে! ইংরেজ বাঙ্গালি একত্রে মহাসভায় বসিলে উজ্জ্বলে মধুর সংমিশ্রণের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইবে।

"বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র"—বিলাতী মাপ কাটির দ্বারা ভারতবাসীর মাপ করা আর দেশী মাপ কাটির দ্বারা বিলাতী লোকের মাপ করা দুই সমান! তাহাতে প্রকৃত পক্ষে কিছুই লাভালাভ হয় না। তাহাদের অবস্থায় তাহাদের পক্ষে যাহা ভাল তাহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অশুভ-ফলপ্রদ হইতে পারে তো! যাহার যেরূপ প্রকৃতি যাহার যেরূপ অবস্থা তাহার সেইরূপ করাই শোভা পায়। লেখক বলিতেছেন "ইংরাজের জীবনের

এবং সমাজের ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত নয়, পার্থিবতার উপর স্থাপিত।" য়ুরোপীয় জীবন ও সমাজ ধর্ম্মের উপরেই স্থাপিত বটে, কিন্তু তাহার উপর সভ্যতার কারুকার্য্য ও লাল বনাত মারা রহিয়াছে বলিয়া হঠাৎ মনে হয় যেন তাহা পক্কা দেবদারুর তক্তার উপরেই স্থাপিত! সভ্যতার চাকচিক্যময় কারুকার্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহার ভিত্তি নিতান্ত নিস্তেজ নহে। মূলভিত্তি যেমন সুদৃঢ় তেমনই আছে; তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে ফেষিয়ান অনুসারে মাঝে মাঝে ভাঙ্গা গড়া হইতেছে মাত্র।

ইংলণ্ডের "বড় ছোটর" মধ্যে বহু প্রভেদ লক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতেই য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা, আর ভারতবাসীর average-এর উৎকৃষ্টতাতেই ভারতের হীনতা। নদীর দুই কূল দিয়া গুণ টানিলে তবে যেমন নৌকা সোজা পথে যায় তেমনি পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতা-রূপ দুই শক্তির সাহায্যে সংসার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। একদিকে অধিক টান পড়িলে সংসার কেন্নিথাওয়া ঘুড়ির মত এক বগ্‌গা হইয়াই চলে। ভারতে বর্ণভেদ আছে য়ুরোপেও আছে তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; আমাদের বর্ণভেদ এখন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু য়ুরোপীয় জাতিভেদে নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিবার সুযোগ আছে তাই তাহাতে প্রাণ আছে। সুবিধা হইলে বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা যাইবে।

"দেবধর্ম্মী মানব"—এটি আমাদের দেশের কতকগুলি মহৎভাবের চিত্র। সেগুলি পুরাতন হিন্দু-সমাজে ছিল কিন্তু এখন চলিয়া যাইতেছ অথচ তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের কিছু লভ্য হইতেছে না। রচনাটি পড়িলে পাঠক পুরাতন বাঙ্গালী মহত্ত্বের সুস্পষ্ট ছবি অঙ্কিত দেখিতে পাইবেন। কিন্তু নিরাশার কোন কারণ নাই—কালের যেরূপ সূচনা দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের নূতন জাতীয় জীবন গঠনের শীঘ্রই সূত্রপাত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখের স্থান ইহা নহে। অন্যত্র দেখা যাইবে।

"পাপ পুণ্য"—এটি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমাদের মতের সহিত বিশেষ কোনও অমিল নাই। তবে যে স্থলে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পাপ পুণ্যের যে অর্থ তাহা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মানুষ পাপ পুণ্যের নিমিত্ত জগদীশ্বরের নিকট দায়ী বা 'জবাব দিহি' করিতে বাধ্য নয়।" এ কথাটি প্রকৃত হইলেও একটু বিশদরূপে বিস্তারিত বর্ণনা করিলে যেন ভাল হইত!

গ্রন্থকারের সঙ্গে স্থানে স্থানে আমাদের যে মত ভেদ হইয়াছে তাহা গ্রন্থের কিছুমাত্র অমর্য্যাদার কথা নহে পাঠক স্মরণ রাখিবেন:—

"অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

শ্রীযোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষা।

নবীন মাধুরী ভরা এ বাদলে হায়,
কারে মনে পড়ে আর চোকে জল আসে,
কত কথা ফুটে উঠে আকুল হিয়ায়,
কার হাসি রাশি সেই, পরাণেতে ভাসে।
সেদিনো এমনি ছিল নিখিল ধরণী,
শ্যামল পল্লবে ঘেরা দুকুল বসন,
এমনি চকিতে ফুটে উঠিত দামিনী,
বাতায়নে মুগ্ধ-হৃদি চাহিয়া দুজন।
কাঁদিছে শ্রাবণ ধারা বিবশা কাতর,
উত্তপ্ত ধরণী বুকে ঝরিতেছে বারি,
দুরু দুরু কাঁপিতেছে মেঘের অন্তর,
আর্দ্র ফুল বৃক্ষতলে পড়িতেছে ঝরি।
আসার আপনাহারা পরাণের পর,
জাগিতেছে হাসিরাশি মুখখানি তারি!

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

যশ।

কোথা যশ? কোথা যশ? কোথা যশ? বলি,
আতিপাতি খুঁজিলাম বিপুল বিপণি;
অলি গলি ঘুরে ঘুরে, পথ গেনু ভুলি;
ঝিকিমিকি গোধূলি!—হোলনা বিকি কিনি!
বঞ্চক সমালোচক, তঞ্চক পশারি,
"যশ সোমরস" বলি দেয় ধেনো পানি;
রঙ্গিন আহ্বানে ভুলি, যত নর নারী,
ভক্ষিছে গরলরাশি, বাখানি বাখানি!
দ্বার খোল, দ্বার খোল; খাড়া হ'তে নারি—
ক্লান্ত, ঘূরে অবিশ্রান্ত, ভবের বাজারে;
হে মৃত্যু! হে নিখালিস্ যশের ব্যাপারি!
কেমনে জানিব তুমি আছ এক ধারে?
জীবনের দীর্ঘ দিবা হোল অবসান!
দাও সোম, করি পান;—লও মূল্য—প্রাণ।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত ১৩০১ সাল ৩১ গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা

কার্থেজের মহাশক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, দ্বিতীয় পিউনিক সংগ্রাম, অপরাপর ভীষণ যুদ্ধের ন্যায়, কেবল দুইটী পরাক্রমশালী জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহাতে এক পক্ষে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী রোমীয় জাতির একত্রিত বলবুদ্ধি ও অপর পক্ষে একা হ্যানিবল;—উভয়তঃ এইরূপেই যুদ্ধ চলিয়াছিল। যদি রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ হইত তাহা হইলে, তর্কের খাতিরে, একদিন স্বীকার করা যাইত যে উভয় পক্ষই সমকক্ষ। কিন্তু সমদর্শী ইতিহাসবেত্তাগণ ও ইতিহাসজ্ঞ পাঠকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, উভয়-জাতি সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, কার্থেজ অপেক্ষা রোম অনেকাংশে অধিক বলশালী ছিল। এক পক্ষে রণকুশল সেনাপতির অভাব ছিল না, অপর পক্ষে যোগ্য সেনাপতির মধ্যে কেবল মাত্র এক হ্যানিবল। এই কারণে সমস্ত সত্যপ্রিয় ও সহৃদয় ইতিহাসবেত্তাগণের নিকট হ্যানিবল শূরশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান পাইয়া আসিয়াছেন ও বীরেন্দ্র সমাজে বরণীয় হইয়াছেন।

ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে সমগ্র রোমীয় জাতি কার্থেজ কিম্বা "কার্থেজের মহাশক্তি" অপেক্ষা ক্ষমতায়, কি ঐশ্বর্য্যে, কোন অংশে হীনবল ছিল। একদিকে হ্যানিবলের শৌর্য্য ও রণপাণ্ডিত্যে আমরা চমকিত হই বটে; কিন্তু অপর দিকে রোমের মহত্ব দেখিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভ্যারো পরাজিত হইয়া রোমীয় কর্ত্তৃপক্ষগণকে লিখিয়াছিলেন যে "রোমীয় সাধারণ-তন্ত্রের মহত্বের বিষয়ে তিনি হতাশ্বাস নহেন" একবার যে রাজ্যশাসন-সমিতি তাঁহার পরাজয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত দণ্ড বিধান না করিয়া বিরোধী পক্ষীয় ভ্যারোকে অবলীলাক্রমে ক্ষমা করিতে পারে;—এই ঘোরতর বিপদের সময় দ্বাদশ সংখ্যক রোমাধীন উপনিবেশিত জাতি সৈন্য পাঠাইতে অস্বীকার করায় যে রাজ্যশাসন-তন্ত্র তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন বা মিনতি না করিয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারে; বলিতে কি বোধ হয় জ্যামা-বিজেতা অপেক্ষা সেই জাতিই সকলের নিকট অধিক সম্মানার্হ। একথা আমাদের বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য কেন না সংসারে প্রায়ই জাতিগত মহত্ব অপেক্ষা ব্যক্তিগত মহত্বেরই অধিক প্রশংসা দেখা যায়। কোন রোমীয় বীরপুরুষই একক হ্যানিবলের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। এই কারণে অথবা জ্যামা-ক্ষেত্রের শোচনীয় ফল দেখিয়া, দুর্ব্বল ও অযোগ্যের জয় হইল বিবেচনায় অনেকেই দুঃখিত হইতে পারেন। কিন্তু সহৃদয় ও সমদর্শী ইংরাজ ঐতিহাসিক আর্‌লন্ড্ সাহেবের মত এ বিষয়ে শুনা আবশ্যক। তিনি এ সম্বন্ধে বলেন, যে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধে কেবল জগদীশ্বরের অপূর্ব্ব মহিমারই আভাষ পাওয়া যায়। কারণ হ্যানিবলের

জয়ে পৃথিবীর ক্রমোন্নতি রোহিত হইত! কেবল এক প্রতিভাশালী ব্যক্তির দ্বারা—এমন কি সে লোক যদি হ্যানিবলের মত মহচ্চরিত্র হইলেও—তাঁহার দ্বারা সমাজ কখন একেবারে উন্নীত হইতে পারিত না। সমাজোন্নতি মহৎ ও প্রতিভাশালী মনুষ্যমণ্ডলীর সাহায্য সাপেক্ষ। যখন সমাজে একজন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয় তখন তাঁহার প্রতিভালোক যেন সমাজ বক্ষে ছড়াইয়া পড়ে—যেন তিনি মৃত সমাজকে কি এক অপূর্ব্ব মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র কুহকে জাগাইয়া তুলেন! আর তিনি যখন চলিয়া যান তখন সমাজ দেহ পূর্ব্ববৎ অসাড় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের দ্বারা এ সত্যের যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়। আর যিনি জ্যামা-ক্ষেত্রে হ্যানিবলের পরাজয় দেখিয়া দুঃখিত হন, তাঁহাকে আমরা ত্রিংশত বৎসরের পরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিতে বলি। তখন হ্যানিবলের নশ্বর জীবন অবশ্যই পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইত; কিন্তু এই দূরবস্থিত ফিনিসীয় কার্থেজ হইতে কি এমন একটী সমৃদ্ধিত, একত্রীভূত গ্রীক্‌জাতির সভ্যতালোকে আলোকিত এক মহাজাতির ও মহারাজ্যের সৃষ্টি হইতে পারিত! না, ক্রমে সেই রাজ্যের যখন বিলোপ হইতে পারিত! তখন সেই জাতি খ্রীষ্টীয় য়ুরোপের সাধারণ-তন্ত্ররূপী রাজ্যশাসন-প্রণালীর স্বাধীন প্রজা হইতে সক্ষম হইতে পারিত!

পূর্ব্বে আমরা দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সূত্রপাত যথাসাধ্য বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি! এক্ষণে তৎপরবর্ত্তী বর্ণনা বিবৃত হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রোমীয় দূতগণ কার্থেজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হ্যানিবল স্পেনে দূত-মুখে যুদ্ধ ঘোষণা শুনিবার নিমিত্ত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন না। তাঁহার মত সূক্ষ্মদর্শী সেনাপতির নিকট যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী একথা আর অজ্ঞাত ছিল না, কেননা তিনি যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে হইতেই ভাবী যুদ্ধের একরূপ আয়োজন করিতেছিলেন। এ সমস্ত যুদ্ধায়োজনে কার্থেজ শাসনকর্ত্তাদের সম্পূর্ণ অনভিমত সত্তেও কার্থেজের সমস্ত সৈন্যের উপর তাঁহার একাধিপত্য থাকা বশতঃ তাঁহার মনোমতই সমস্ত কার্য্য হইল। তাঁহারই পরামর্শে কার্থেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্পেনে তাঁহার ভ্রাতার অধীনে, নূতন সৈন্যসমূহ পাঠাইয়া দিলেন ও কার্থেজে স্পেনীয় সৈন্য প্রেরিত হইল। বিদেশে, বিজাতীয় লোক মধ্যে উভয় সৈন্যেরই বিদ্রোহ ভাব এইরূপে শমিত হইল। এদিকে হ্যানিবল আল্পস্ পর্ব্বতবাসী দুর্দ্দান্ত গলজাতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। রোম জয় করিতে হইলে অগ্রে এই সকল জাতিকে বিজিত অথবা বশীভূত করা আবশ্যক। কারণ, যেমন উত্তরদিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে হইলে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের গিরিসঙ্কটই একমাত্র সুগম পথ, ইতালী-প্রবেশের নিমিত্ত দুর্গম ও দুরারোহ আল্পসের গিরিসঙ্কটও তেমনি একমাত্র সুগম পথ। গলজাতি এই গিরিসঙ্কট-বাসী অসভ্য জাতি। ইহারা তস্কর ও প্রতারকের একশেষ। সুবিধা পাইলে বিজাতীয় কোন জাতিকে আক্রমণ করিতে কোন ক্রমে নিরস্ত থাকিত না। কার্থেজের চতুর

সেনাপতি ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন, এবং ইহা বুঝিয়াই যে প্রকারে পারেন উহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্যই দূত পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদিগকে বশ করিতে পারিলে দুইটী সুবিধা। প্রথমতঃ ইহারা রোমে যাইতে কোন বাধা বিপত্তি ঘটাইবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহারা আল্পসের অপেক্ষাকৃত প্রসর ও অপরিচিত গিরিবর্ত্ম গুলি দেখাইয়া লইয়া যাইবে! হ্যানিবল এই সমস্ত উদ্যোগে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় কার্থেজ হইতে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে এই সংবাদ লইয়া দূত প্রত্যাগমন করিল। আর গল-দেশে যে দূতগণকে পাঠান গিয়াছিল তাহারাও ফিরিয়া আসিল। তাহারা এই সংবাদ লইয়া আসিল যে, গলেরা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে সম্মত আছে। তাহারা বলে যে, আল্পস্ গিরি-সঙ্কট সমূহ দুর্গম বটে, কিন্তু একেবারে অনতিক্রম্য নহে। হ্যানিবল এই সকল সংবাদ শুনিয়া সমস্ত সেনাবর্গকে আপনার সমক্ষে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলেন "সৈন্যগণ! রোমীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে ও আমার অধীনস্থ প্রধান সৈনিকদিগকে বিদ্রোহী অপরাধে ধৃত করিবে বলিয়াছে। তোমরা কি এই দারুণ অপমান প্রশান্ত ভাবে সহ্য করিবে? তোমরা বীর-প্রসবিনীর সন্তান। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। ভাবিয়া দেখ যে দেশে তোমাদের লইয়া যাইতেছি সে দেশের ভূমি রত্নপ্রসূ। সে স্থানের নগর সমূহ অশেষ সমৃদ্ধি পূর্ণ। যে দেশের বিপণি সকল অশেষ বহুমূল্য শিল্পজাত দ্রব্যাদিতে ও কোষাগার অজস্র মণিমাণিক্যাদিতে পরিপূরিত। তোমাদের মত বীরপুরুষের সাহসের পুরস্কার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? গলেরা সাদরে আমাদের আহ্বান করিয়াছে। তাহারা সকল বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছে। চল, তাহাদের রোমের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করি। তোমরা এখন ইতালী যাইতে সম্মত আছ ত?" বীর সেনাপতির এই তেজঃপূর্ণ বক্তৃতায় সেনাসমূহের মধ্যে এক সম্মতিসূচক গভীর আনন্দ কল্লোল উত্থিত হইল। হ্যানিবল দেখিলেন তাহারা রোম জয় করিতে একান্ত উৎসুক। তাঁহার কথা সর্ব্ববাদী সম্মত দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন।

এতদিনে তাঁহার আজন্মপোষিত মনোরথ সফল হইতে চলিল! অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পবিত্র বেদীর সমক্ষে যে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উদ্‌যাপনের বুঝি এইবার সুবিধা ঘটিল! তিনি রোমের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সৈন্য সামন্ত ছাড়িয়া গেডীস্ (Gades) নামক নগরে গিয়া টায়ারের দেবতার মন্দিরে পূজা ও বলিদান * প্রদান করিলেন। যখন পূজা শেষ হইল তখন তিনি স্বকীয় সেনানিবেশে ফিরিয়া আসিয়া আইবিরাস্ নদীর অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

---

* প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক্ ও রোমীয়দের মত কার্থেজবাসীরাও বিপদের সময় দেবতার মন্দিরে গিয়া পূজা করিত। রোমে আবার কিন্তু বাড়াবাড়ি। ইহাঁদের আবার একজন

এ সময় সিলেনাস্ নামা জনেক সিসিলীয় গ্রীক হ্যানিবলের অভেদ্য সহচর ছিলেন, কি সূত্রে ইহার সহিত হ্যানিবলের সখ্য হইয়াছিল তাহা আমরা সবিশেষ অবগত নহি। কিন্তু সিলেনাস্ অনুক্ষণ হ্যানিবিলের পার্শ্বে থাকিতেন এবং উভয়ে একত্রে আহার করিতেন, এ কথা রেমের বিখ্যাত বাগ্মী সিসিরোর * মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। এই একই বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা হ্যানিবলের সম্বন্ধে একটী গল্পের বিষয় অবগত আছি। সিসিরো বলেন যে এ গল্পটী সিলেনাস্ বলিয়াছিলেন! গল্পটী এই :—একদা রাত্রে হ্যানিবল একটী স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে তিনি যেন দেবলোকে দেব-সভায় উপস্থিত, দেব-মণ্ডলীর সমক্ষে স্বদেশের প্রধান দেবতা তাঁহাকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইবেন এরূপ আশ্বাস ও তাঁহাকে দিলেন! তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত একজন দেবতাকে তাহাদের সঙ্গী করিয়া দিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি উক্ত দেবতা সঙ্গে সসৈন্যে রোমাভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। পথে তাঁহার পথ-প্রদর্শক দেবতা বলিলেন 'দেখ বৎস! পথে যাইতে তোমার পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিও না।' অনেক পথ এই রূপে অতিক্রম করিয়া গেলেন। কিন্তু কিয়ৎ দিবস অতিবাহিত হইলে পর অত্যন্ত কৌতূহলবশত পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন যে, সর্পজাল-বিভূষিত এক ভীষণ মূর্ত্তি! মূর্ত্তি যত অগ্রসর হইতেছে তৎসঙ্গে মন্দির নগর উপবন সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সঙ্গী দেবতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "পশ্চাতে যে ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিতেছ ইহা রোমের মূর্ত্তিমান ধ্বংশাবতার। অগ্রসর হও পশ্চাতে আর ফিরিয়া চাহিও না।" এই সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এ গল্পের সত্যাসত্য বিচার করা অসম্ভব। কিন্তু সত্য হওয়াও নিতান্ত আশ্চর্য্য নহে। কারণ, যখন কোন লোক অহোরাত্র একই চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন রাত্রের কথা থাকুক দিবাভাগেই সে স্বকীয় আশাসিদ্ধির স্বপ্ন দেখিতে পায়! এ ঘটনা ইতিহাসে বিরল নহে। ইহার পরবর্ত্তী সময়ের রোমীয় ইতিহাসে ও তদপেক্ষা অধুনাতন ফ্রান্সের ইতিহাসেও এইরূপ ঘটনার দুইটি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া

জেনাস্ (Janus)-নামা এক যুদ্ধ-দেবতা ছিলেন। ইঁহার উভয়দিকে মুখ থাকা প্রযুক্ত মন্দিরের দুই দিকে দুইটী দ্বার ছিল। যুদ্ধের সময় দ্বার দুইটী খোলা ও শান্তির সময় বন্ধ থাকিত।

* সিসিরো। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম মার্কাস্ টালিয়া সিসিরো। ইনি রোমের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও প্রধান বাগ্মী ছিলেন। ইনি ভদ্রবংশীয় ধনীর সন্তান। ২৬ বৎসর বয়সে ব্যবহার শাস্ত্র পড়িয়া উকীল হন ও নিজ অসাধারণ বক্তৃতা গুণে শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠেন। ইহার পর গ্রীসদেশে এটিকাস্ নামা জনেক বন্ধুর সহিত গ্রীসীয় বক্তৃতার চূড়ান্ত আদর্শ পুস্তক পড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসেন ও ক্যাটিলাইন নামক দুর্দ্দান্ত রোমের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইনি সিজারের বন্ধু ছিলেন। সিজারের মৃত্যুর পর এণ্টনির বিদ্বেষবুদ্ধির পরিতোষার্থে ইহার প্রাণ বিনাশ হয়।

যায়। একটী ব্রুটাশের * ও অপরটী (Joan of Arc) জোয়ান্ অব্ আর্কের †। শেষোক্ত বালিকাকে ডাকিনী অপরাধে হত্যা করিয়া তদানীন্তন ইংরাজ মহাপুরুষেরা যে ন্যায়পরতা দেখাইয়াছিলেন, আর জোয়ানের স্বদেশীয়েরা এই অমানুষী হত্যাকাণ্ডে সম্মতি প্রদান করিয়া যে সহৃদয়তার উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে মূলে তাহার একই কারণ বর্ত্তমান। যাহা হউক এ ঘটনার পর সপ্তবিংশ বয়স্ক হ্যানিবল উল্লসিত-হৃদয়ে সমস্ত গার্হস্থ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় দেবতার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

---

* মার্কাস্ জুনিয়াস্ ব্রুটাশ্ (Marcus Junius Brutus)। ইনি জুলিয়াস্ সিজারের সমকালিক রোমের একজন বিখ্যাত লোক। ফার্ষেলিয়ার যুদ্ধের পর শত্রু হইলেও সিজার ইঁহাকে শুধু ক্ষমা করেন এমত নহে, রাজ্যের একটী উচ্চপদও প্রদান করেন। কিন্তু ব্রুটশ্ এরূপ মহত্বের প্রতিদান করেন নাই। সিজার রাজা হইবেন এই আশঙ্কায় তিনি সিজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। এই ষড়যন্ত্রে সিজারের মৃত্যু হওয়াতে এণ্টনি (মার্কাস্ অ্যাণ্টোনিয়াস্) আক্টভিয়াস্ সিজারের ভাগিনেয়ের সহিত গ্রীসে পলায়িত ব্রুটাশের পশ্চাদ্ধাবন হয়েন। সেই স্থানেই ফিলিপি (Philippi) নামক প্রান্তরে ইঁহাদের একটা যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রে যখন সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় ব্রুটশ্ একটী লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিতে পান। সেটী মৃত জুলিয়াস্ সিজারের প্রেতমূর্ত্তি! ইহাদের উভয়ে যে কথোপকথন হইয়াছিল, মহাকবি সেক্ষপীয়র তাহার এরূপ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করার জন্য বোধ করি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না :—

(ENTER THE GHOST OF CÆSAR)

Brutus—How ill this taper burns! Ha! who comes here?
I think it is the weakness of mine eyes,
That shapes this monstrous apparition.
It comes upon me :—Art thou any thing?
Art thou some god, some angel, or some devil,
That makest my blood cold, and my hair to stare?
Speak to me what thou art?

Ghost—Thy evil sprit, Brutus.
Brutus—Why comest thou?
Ghost—To tell thee, thou shalt see me at Philippi.
Burtus—Well;
Then I shall see thee again?
Ghost—Ay, at Philippi. (Ghost vanishes).

Julius Cæsar Act IV. Sc. I.

† জোয়ান্ অব্ আর্ক। ইনি ফ্রান্সের অন্তঃপাতী লোরেন্ (Lorraine) প্রদেশে তোম্‌রেবি নগরে ১৪১০ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি Maid of Orleans নামে

এ দিকে হ্যানিবলের ইতালী অভিমুখে আগমনবার্ত্তা রোমে অপ্রকাশিত রহিল না। প্রতি বৎসর মার্চ্চ মাসের ১৫ই তারিখে দুইজন কন্সাল রোমের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, এবং এ বৎসরও যথারীতি কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। তাঁহারা মনে করিলেন যে হ্যানিবলের গতি বাধা দিতে অবশ্যই সৈন্য পাঠান কর্ত্তব্য, কিন্তু আইবিরাস্ নদীর ও (Pyrenees) পিরিনিস্ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্পেনীয় জাতি, আর ঐ পর্ব্বত ও (Rhone) রোন্ নদীর মধ্যবর্ত্তী গল্‌জাতিকে পরাজিত করিয়া রোমাভিমুখে আসিতে হ্যানিবলের অনেক বিলম্ব হইবে এই ভ্রান্ত আশ্বাসে তাঁহারা সেনা পাঠাইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কন্সাল দুইটির নাম কর্ণিলিয়াস্ সিপিও ও টাইবিরিয়াস্ লঙ্গাস। সিপিও ১৫৬০০ মিত্র সৈন্য, দুইটী রোমান লিজন্ (Legion) * ও ৬০টী রণতরী লইয়া স্পেন্ ও সিসিলির শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। লঙ্গাসের সৈন্য সংখ্যা কিছু অধিক ছিল ও তৎসহ উপরন্তু ১৬০টি রণতরী ছিল। লিলীবিয়াম (lilybœum) নামক সিসিলির বন্দরে, আর যদি সুবিধা হয় তবে ক্রমে আফ্রিকায় এই সৈন্য সমূহ লইয়া যাইতে তাঁহার আদেশ ছিল। জনেক রোমীয় কর্ম্মচারীর অধীনে দুইটী রোমান (লিজন্) ও একাদশ শত মিত্র সৈন্য দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী গলে স্থাপিত হইল। হ্যানিবল রোমাভিমুখে আসিতেছেন এই সংবাদ শুনিয়া গলেরা কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না,

খ্যাত হন। ইনি এক দরিদ্র ও নিরীহ কৃষকের সন্তান ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে ফ্রান্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেণ্ট্ মাইকেল তাঁহাকে (Orleans) অর্লিএন্স্ নগরী ইংরাজের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এ নগরী রক্ষা করিতে সক্ষম হন। ইহাতে তাঁহার পূর্ব্ব বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হয়। সে সময়ে ফ্রান্সের যুবরাজ (Dauphin) সপ্তম চার্লস রাইমস্ (Reims) নগরীতে যখন রাজ্যাভিষিক্ত হন, তখন জোয়ান্ তথায় উপস্থিত থাকিয়া সাহায্য প্রদান করেন। উক্ত রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বংশকে উচ্চ উপাধি ও জমিদারী প্রদান করেন। কম্পিএন্ (Compiegne) নগরীতে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন বন্দী হন তখন ফ্রান্সের অনুমত্যনুসারে রুঁয়া (Rouen) নগরীতে প্রকাশ্য বিপণি স্থানে তাঁহাকে দগ্ধ করা হয়। ফ্রান্সের যুবরাজকে যিনি সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন তাঁহার শত্রু হস্তে এইরূপে শোচনীয় মৃত্যু হইল, অথচ ফ্রান্সের ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু যুবরাজ সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্তেও একটী কথাও বলিলেন না! জোয়ানের মৃত্যু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের একটী দুরপনেয় কলঙ্ক, একথা ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই অস্বীকার করেন না। এই শোকপূর্ণ কাহিনী অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্স্ তাঁহার Child's History of England-এ ও বিখ্যাত জর্ম্মান্ কবি শিলার (Schiller) একটী ক্ষুদ্র কবিতাতে জোয়ানের দুঃখময় জীবনের জ্বলন্ত চিত্র প্রদান করিয়াছেন। আর ফ্রান্সের হতভাগ্য লেখক ভল্টেয়রও এক অশ্লীল বিদ্রূপাত্মক কাব্যে জোয়ানকে সংশ্লিষ্ট করিয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন।

* লিজন। রোমীয় সৈন্য বিশেষ। নির্দ্ধারিত সংখ্যা ছিল না। প্রথমে ৩০০০ পদাতিক, ক্রমে ৪২০০ হয়। পিউনিক যুদ্ধের সময় লিজনে ৫২০০ পর্য্যন্ত সৈন্য থাকিত।

একথা রোমীয় গভর্ণমেণ্ট স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার উপায়ও স্থির করিতে বিলম্ব করেন নাই। গলের বিদ্রোহভাব দমন রাখিবার জন্য এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পূর্ব্বেই হইতেছিল। এই বিপদের সময় সেই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইল। প্ল্যাসেণ্টিয়া (Placentia) ও ক্রিমোনা (Cremona) নামে গলদেশে দুইটী বড় নগরী ছিল। দ্বাদশ সহস্র রোমীয়কে সত্বর গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপনের আজ্ঞা প্রচার হইল। তিন জন কমিশনার এই লোক সমূহকে ভূমি ভাগ করিয়া দিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভল্সো নামক প্রিটরের (Prætor) * সৈন্য ও এই উপনিবেশিত দ্বাদশ সহস্র লোক গলকে দমনে রাখিতে পারিবে, রোমীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকল স্থানে সৈন্য প্রেরণ করার পর স্পেনে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। স্পেনে শত্রু হইতে ভয় অত্যল্প অথবা অন্য কোন বিশ্বাসে রোমীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এই কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই কার্য্যটী বিশেষ বিবেচনা সহকারে করা হয় নাই। ইহাতে যে ঘোরতর বিপদ হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। আপাততঃ গল হইতে খবর গেল যে বোহায়ান্ ও ইনসুব্রিয়ান্ গল-জাতি বিদ্রোহী হইয়া উক্ত ১২০০০ লোককে মিউটিন্ (Mutina) নামক নগরীতে তাড়াইয়া দিয়াছে এবং তিন জন কমিশনারকে ছল করিয়া বন্দী করিয়াছে, এবং (L. Manlius Vulso) ভল্‌সো গলের একটী নগরীতে আশ্রয় লওয়াতে সে স্থানে তাঁহাকে গিয়া আক্রমণ করিতেছে। সুতরাং সিপিও-র একটী লিজন্ আর ৫০০ মিত্র সৈন্য লইয়া সেরেনাস্ নামক প্রিটর গলদেশে প্রেরিত হইলেন; যে পর্য্যন্ত না নূতন সৈন্য পান সে পর্য্যন্ত সিপিওকে অগত্যাই বিলম্ব করিতে হইল। তিনি যখন রোন্ নদীর পূর্ব্ব শাখার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন হ্যানিবল পিরিনিস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন। এখনও তাঁহার গতি রোধ করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার ভরসা ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

* প্রিটর। রোমের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী বিশেষ। প্রথম যখন এই পদটী সৃষ্ট হয়, তখন কেবল এক জন প্রিটর নিযুক্ত হইতেন। ইঁহার বিচারকের কার্য্য ছিল। ২৪৬ খৃঃ পূর্ব্বে আর একজন প্রিটর নিযুক্ত হন। বিদেশীয় অপরাধীর বিচার কার্য্যের ভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। ক্রমে রোমের রাজ্য যখন ইতালীর বহির্ভাগে বিস্তৃত হইল তখন ইঁহারা ঐ সকল ইতালীর বহির্ভূত দেশ শাসনকার্য্যে প্রেরিত হইতেন। সুতরাং হ্যানিবলের সময় ইহাদিগকে এই কাজে প্রেরিত দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ম্য।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই আজকাল স্বীকার করেন যে ভারত মহিলারা জগতের সমস্ত নারী-যোগ্য কাজ হইতে একেবারে বঞ্চিত। তাঁহাদের অকর্ম্মণ্য জীবন ভাবিয়া বঙ্গপুরুষকে অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্তু এখনকার মাতা ও কন্যারা নিজেই আমাদের দুঃখময় অবস্থার জন্য যেরূপ কাতর ও হতাশ; আর ঐরূপ অলসভাবে জীবন যাপন করিতেও যেমন অনিচ্ছুক, তেমন আর কেহ নহে। সকলেই কাজ করিতে উদ্যত, শিখিতে মনোযোগী, অথচ কি কাজ করিবেন তাহা জানেন না। এ রকম সময়ে তাঁহাদিগকে কোন উপযুক্ত কাজের পথ দেখাইয়া দিলে তাঁহারা অভ্যাসবশতঃ উহা ধরিয়া আপনারাই নির্ভয়ে ও নিরাপদে চলিতে পারিবেন, এইরূপ ভরসা হয়।

আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি, কত শত প্রফুল্ল কর্ম্মিষ্ঠ বালিকা কাজের অভাবে বিমর্ষ ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের সম্পূর্ণ দোষ নাই। মেয়েদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়েরা তাহাদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বলিয়া দেন না, আর বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত তাহারা নিজেও কোন কাজ মনস্থ করিয়া আরম্ভ করিতে অপারগ। স্কুলে যত দিন থাকে, বালিকারা লেখাপড়ার জন্য রীতিমত পরিশ্রম করে ও খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিদ্যালয় ছাড়িবার পর তাহাদের জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না। তারা সমস্ত সকাল বেলা বিনাকাজে গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; স্নানাহারের পর হয়ত কোন জঘন্য নবেল পড়ায় ও নিদ্রাতে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া যায়। তাস খেলা সচরাচর বৈকালের সঙ্গী। এই রকমে কত দিন, কত মাস ও কত বৎসর বৃথায় কাটিয়া যায়, তাহার সংখ্যা কে করিবে!

অবশ্য এরূপে জীবন যাপন করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র যে উন্নত থাকিবে, আমরা কখনই এরূপ আশা করিতে পারি না। কাজে কাজেই তাহারা স্বার্থপর, ক্ষুদ্রমনা ও আত্মপ্রিয় হইয়া উঠে। পরের নিন্দায় তাহাদের বড় আনন্দ হয়, হিংসায় শরীর কর কর করে, আর আপন সুখ ও বেশভূষাতেই সমস্ত মন প্রাণ পড়িয়া থাকে। যত বুদ্ধিমান স্ত্রীলোক ও পুরুষ এ প্রকার নারীদিগকে ঘৃণা করে, আর সহৃদয় লোকমাত্রেই তাহাদের জন্য ব্যথিত হয়। সকলে বলে, তাহারা কিছুই করে না; বরং দিনরাত জগতের মহা অনিষ্টসাধনই করিতেছে। পূজিত নারী নামে তাহারা কলঙ্ক দেয়; আর যে স্ত্রীজাতি সংসারে মানুষকে মার্জ্জিত, পবিত্র ও মহৎ করিবার জন্য সৃষ্ট, সেই রমণীকুল পুরুষের দ্বারা ঘৃণিত ও পদদলিত হয়!

কথিত আছে, পূর্ব্বকালে লোকে 'পরশ পাথর' লাভের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও পরিশ্রম

স্বীকার করিত। কিন্তু আমরা যখন চতুর্দ্দিকস্থ কাজহীন লক্ষ্যহীন ভারত নারীদের ক্ষয়প্রাপ্ত জীবন দেখি, তখন আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ সহকারে খাটিয়া এমন কবচ অন্বেষণে ব্যাকুল হই, যাহার স্পর্শে সোণার অপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য আমাদের লাভ হইবে—উন্নত নারী-চরিত্র প্রতি গৃহের সেই অমূল্য রত্ন—আর ব্যগ্রভাবে নিঃস্বার্থ পরিশ্রম সেই পরেশ পাথর। উহার দ্বারাই নির্ব্বোধ চঞ্চলা বালিকা-দিগকে আমরা বুদ্ধিমতী ও বিশ্বাসী স্ত্রীলোকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। উহার বলেই আমরা মুখরাকে সুশীল ও অলস নারীকে কার্য্যপ্রিয় করিতে সক্ষম হই।

আমার এরূপ বোধ হয় না যে, কোন স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়াই আলস্যে জীবন কাটান, তবে বাল্যকালে ঐ অভ্যাসটী একবার মর্জ্জাগত হইয়া গেলে বড় বয়সে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলা মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়। কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ বা লক্ষ্যের অভাবেই একটু একটু করিয়া লোকে প্রথম অলস ও অবশেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আমরা যদি প্রতি অকর্ম্মণ্য স্ত্রীলোকের ইতিহাস খুঁজি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইব যে প্রথমে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না, পরে সে ঐ নিশ্চল জীবনে ক্লান্ত হইয়া নিজের আপাততঃ আমোদের জন্য দুএকটী বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, পরিশেষে এইরূপ আত্মসুখ তাহাকে স্বার্থপর, আত্মপ্রিয়, অলস ও ভাল কর্ম্মে সম্পূর্ণ অপারগ করিয়া তুলে।

সে জন্য সকলের আগে আমরা কি কাজ করিতে ইচ্ছা করি, ও কি বিষয়ের জন্য আমাদের বঙ্গমহিলা সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানা উচিত। নতুবা ঐ সকল অলস নারীদের ন্যায় আমাদের সমাজও অকর্ম্মণ্য হইয়া বিপদগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা।

কয়েক বৎসর ধরিয়া আধুনিক বঙ্গ-মহিলাদের প্রতি নানা দোষারোপ ও গালা-গালি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। প্রাচীনারা বঙ্গবালাকে "কলিকালের মেয়ে" বলিয়া উড়াইয়া দেন, আর নব্য পুরুষেরা তাহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিয়া ঘৃণা করেন! বাঙ্গালীর মেয়েকে উপদেশ দিয়া সুশিক্ষিত করিবার জন্য কত বই বাহির হইয়াছে! যে সকল যুব-কেরা নিজে উপদেশ গ্রহণ করিলে ভারতের মহা মঙ্গল হইত, তাঁহারা পর্য্যন্ত হিন্দু নারীকে লেক্‌চার দিতে বসিয়াছেন! ছেলে বেলায় একটা বড় মজার গল্প শুনিয়াছিলাম, কোন একজন ছেলে নাকি ভূমিষ্ট হইয়াই মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা! বাবা কোথা?' আর মার কাছে যখন শুনিল যে তার পিতা গরুরপাল লইয়া মাঠে গিয়াছে, সে অমনি বাপের খাবার মাথায় লইয়া মাঠে ছুটিল! স্ত্রীলোকদের প্রতি বঙ্গ যুবকদের উপদেশ দেওয়া দেখে কতকটা ঐরূপই মনে হয়। কোন বালকের ধর্ম্মজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতেই সে ভাবে,—এমন অকর্ম্মণ্য, অশিক্ষিতা বাঙ্গালীস্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিবার সময় তার যথেষ্ট হইয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ কাগজ হাতে লইয়া—হিন্দু মহিলার এটা করা উচিত, ওটা করা অনুচিত—বলিয়া চীৎকার করে। কিন্তু ওরকম করাতে তাহাদেরও সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারি না—

কেন না, বর্ত্তমান সাধারণ বঙ্গ-বালাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়ই বটে! বিশেষ, তাহাদের উদ্দেশ্য উত্তম, তবে নিজে জ্ঞানী না হইয়া অন্যকে জ্ঞানের কথা বলা যে অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার তাহা তাহাদের জানা আবশ্যক। আর আজকালকার বঙ্গ-পুরুষেরা বঙ্গ-নারীকে যেমন ঘৃণার চক্ষে দেখেন সৌভাগ্য ক্রমে তাহারা এখনও তেমন হীনাবস্থায় আসিয়া পড়ে নাই। তাঁহাদের মতে বাঙ্গালীর মেয়েরা একান্ত অশিক্ষিত, স্বার্থপর, কখন পরের কথা ভাবে না, সমস্ত দিন ঘুরিয়া বা পরনিন্দায় দিন কাটায়, হিংসাদ্বেষে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ, ধল কপটের একশেষ ইত্যাদি। এক কথায়, তাহারা অতি অচতুর বুদ্ধিহীন, তাহাদের মধ্যে উন্নত নারী চরিত্রের একটিও গুণ নাই, আবার আজকাল গৃহ কর্ম্মেও অপটু। সুতরাং তাহাদের মত অপদার্থ স্ত্রীলোক পৃথিবীতে আর মিলা ভার!

বঙ্গ-মহিলার এ রকম চিত্র ভয়ঙ্করই বটে! আর সত্যসত্যই যদি আমরা বঙ্গগৃহে এরূপ স্ত্রী দেখিতে পাই, তাহা ইহলে ঘৃণা করার পরিবর্ত্তে তাহাদের জন্য আমাদের বেদনা পাওয়ারই সম্ভব। কিন্তু সুখের বিষয়, ওরূপ পিশাচী নারী যদি কদাচ কখন বঙ্গ-সংসারে আবির্ভূত হয়, সে অতি বিরল, হাজারে একজনও নয়। আমার সমস্ত জীবনে আমি একান্ত পাপীয়সী স্ত্রী দেখিয়াছি বলিয়া কই তো মনে পড়ে না।

অবশ্য, বঙ্গ-সংসারে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা উপরোক্ত ঐ সকল দোষে কতক পরিমাণে আচ্ছন্ন, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু উহার জন্য ঐ সকল মানুষের অধিকার হইতে একেবারে বহিষ্কৃত ও কথায় কথায় ঘৃণিত ও পদদলিত হইবার উপযুক্ত নহে। বিশেষ, যে পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহারাই কি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ? উপযুক্ত সুবিধা ও শিক্ষা পাইলে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ যে বঙ্গ-নারীর মধ্যে হইতে তিরোহিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দু স্ত্রীকে উন্নত নারীপদে বসাইতে হইলে ও কলিকালের মেয়েকে পূর্ব্বকালের মহিলাদের ন্যায় পূজিত করিতে হইলে মৌখিক উপদেশের পরিবর্ত্তে তাহাদের কাজের সুবিধা করিয়া দেওয়াই যে প্রকৃত উন্নতির পথ তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

আজকাল প্রায় সকলেই প্রাচীনা ও নবীনা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ক্রমাগত তুলনা করিয়া থাকেন ও নব্যা নারীদিগকে অধিকতর হীন ভাবেন; কিন্তু সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে আমার মতে আধুনিক মহিলারা দুই একটি বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহারা সকল বিষয়েই নীচ নহেন, বরং দুই একটি বিষয়ে তাঁহারা প্রাচীনাদের অপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন। এখনকার বালিকারা শিক্ষা ও উন্নতি বলে আপনাদিগকে সংসারের আবশ্যকীয় সভ্য করিতে যেমন ব্যগ্র তেমন আর কখন দেখা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত আজকাল বালিকারা পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী বিদ্যাশিক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানের আস্বাদ পায়, আর তাহারা সাধ্যমত ঐ জ্ঞানকে নিজেদের ও সংসারের উপকারের জন্য খাটাইবার চেষ্টা করে। আমাদের মা দিদিমারা সুচারুরূপে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেন, সন্দেহ নাই। অন্যদিকে, তাঁহাদের মন ও

ভাব সকল যে অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক অপ্রশস্ত ছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তথাচ, এখন সেই পূজনীয়া প্রাচীনা মা দিদিমাদের কাজ কর্ম্মের বিচার করা আমাদের মুখে ভাল শুনায় না। কিন্তু ইহা সত্য, যে ত্রিশ বৎসর যদি আমরা তাঁহাদের ন্যায় পৃথিবীকে 'তিন কোণা' ভাবি তাহা হইলে নিশ্চয় স্বা[illegible] কাদের কাছে হাস্যাস্পদ হইব। আর আমাদের দিদিমাদের মত আমাদের কন্যারাও [illegible] না মোটা কাঁথা সেলাই করিতে তিন মাস কাটাইবে, ইহা কোন মায়েরই ইচ্ছামত হইবে না। কেননা, সূচিকর্ম্ম ও অন্যান্য শিল্প স্ত্রীজাতির কর্ম্ম বিশেষ, উহা তাঁহাদের জীবনের প্রধান কাজ নহে।

যাহা হউক, এখন বাজে কথা বাদ দিয়া আসল কাজের কথা পা[illegible]ব। স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্রই একটি বিষয়ে সকলেরই একমত দেখা যায়। [illegible] জগতের কাজের জন্যই জীবাত্মার সৃষ্টি করিয়াছেন; আমাদের প্রত্যেকের জীবনের [illegible] এক নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, সেই মনের মত কাজটি খুঁজিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। আর যতক্ষণ সেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজটি আমোদের অন্তর্গত না হয় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই উচিত নহে।

কোন এক জন য়ুরোপীয় শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কালে বলেন, প্রফুল্ল থাকা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ; পরিচ্ছন্ন থাকা দ্বিতীয়; আর রন্ধনকার্য্যে নিপুণ হওয়া তৃতীয়। বালিকারা উহার অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর করিলেন, সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিয়া আমোদ আহ্লাদ করা প্রতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য স্বরূপ; ফুটন্ত ফুলের ন্যায় হাসিয়া সংসারকে সুখ শান্তিময় রাখা নারীর সর্ব্ব প্রধান কার্য্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের অর্থ সাবান মাখিয়া কেবল বেশবিন্যাস করা নহে, শরীর ও বস্ত্র হইতে সমস্ত গৃহ সংসার একরূপ পরিষ্কার ধৌত ও সামান্য দ্রব্যে সুন্দর করিয়া সাজানই উহার উদ্দেশ্য। তৃতীয় গুণ, রন্ধন, মানে কেবল পলোয়া কালিয়া রান্না নয়। উহা দ্বারা প্রতি স্ত্রীর যত প্রকার তরিতরকারী, শাকসবজী, ফলফুলের বিষয় জানা উচিত, আর তা ছাড়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে সুন্দর ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা ও রাঁধা বাড়া দেখা শুনা গৃহিণীর একটি প্রধান কাজ।

প্রাচীন শিক্ষকের ঐ উপদেশটি য়ুরোপীয় মহিলাদের ন্যায় ভারতীয় নারীদের পক্ষেও অতি উপকারী। সকল স্থানেই স্ত্রীজাতির প্রধান কার্য্যক্ষেত্র গৃহ; প্রথম কর্ত্তব্য—গৃহকর্ম্ম। সে জন্য যাহাতে নিজ সংসারকে সুখময় করিতে পারা যায় ও আপনাকে গৃহকর্ম্মে পারদর্শী করা যায়, তাহার উপায় জানা প্রতি স্ত্রীর একান্ত আবশ্যক। বিশেষ ইহা সকল মহিলারই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে স্ত্রীলোকের নির্দ্দিষ্ট কাজে অবহেলা করিয়া অন্য কোন কাজে পারদর্শিনী হইলে উহাতে নারীদের চতুরতার প্রমাণ দেয় বটে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত উন্নতি হয় না। স্ত্রীজাতির স্বভাবের দ্বারা নির্ণীত কর্ত্তব্যে নিপুণ হইয়া উহার উপরে যদি আমরা আরো কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করি, তবেই উহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে। আমাদের মা দিদিমাদের লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নামের সঙ্গে সুশিক্ষিতা

মার্জ্জিতা পদের যোগ করাই প্রকৃত নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য—ইহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই!

আমার মতে নিজ গৃহকে কি[illegible]প উজ্জ্বল প্রফুল্ল ও সুশৃঙ্খল রাখিতে হয় তাহা প্রতি স্ত্রী ও গৃহিণীর জানা উচিত। [illegible] নিজ সংসারকে সর্ব্বদা শান্তিময় সুখপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিলে, উহাতেই নারী[illegible]তর জ্ঞানবুদ্ধি ও মহত্ব প্রকাশ পায়। কোন স্ত্রীলোক ঘরের কাজকে হীনকর্ম্ম ভাবে দেখিলে আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখ পাই। আমরা আজকাল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আচার ব্যবহার হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছি, আর আমরা যে পথ ধরি[illegible] চলিতেছি তাহা অধিকতর উন্নত ও সুখপ্রদ হইবে, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু [illegible]তন পথ যদি বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে অবহেলা করিতে শিখায়, তাহা হইলে [illegible] উন্নতির পরিবর্ত্তে আমাদিগকে অধোদিকেই লইয়া যাইবে।

আবার নারীজাতির শিক্ষারপথে গৃহকর্ম্মকে (শারীরিক শুদ্ধতা ও সুপরিচ্ছদ) উহার উপযুক্ত স্থানে দেখিবার ইচ্ছা করিলেও, কোন স্ত্রীলোকের সমস্ত সময় ও মন শুধু নিজ পরিবারের উপরই সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকে এ প্রকার শিক্ষা দেওয়া বা বুঝানও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা সকলেই সমস্ত মানব পরিবারের সভ্যস্বরূপ সে জন্য আমাদের গৃহস্থিত পুত্রকন্যা ভাই বোনদের ন্যায় পরিবারের বহিঃস্থিত ভ্রাতা ভগিনীদের কাছেও আমরা কতক পরিমাণে ঋণী। তাঁহাদের ঐ চিরঋণ পরিশোধের জন্য দাতব্যই একমাত্র উপায়। বিশেষ প্রতিগৃহে ও সকলেরই চারদিকে ঐ দানশক্তি চালনার জন্য অনেক নিরুপায় গরীবলোক অবস্থান করে। সুতরাং আমার মতে পরিবার ও প্রতিবাসীরাই নারীদের দাতব্যের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অনেকের মতে টাকা পয়সা বা অন্নবস্ত্র দান ব্যতীত আর কিছুই দাতব্য কাজ নহে। কিন্তু প্রকৃত দাতব্যের অর্থ উহা অপেক্ষা অধিকতর গভীর ও প্রশস্ত। উহার মানে—আমাদের যাহা আছে অন্যকে তাহাই দান করা; কেবল টাকা, কাপড় ও খাদ্য নহে—সহৃদয়তা, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও দয়া। প্রকৃত দান কখন নিজের গৌরব করে না, চাটুবাদে ফুলিয়া উঠে না, কখন সগর্ব্বে চলে না, প্রতিদান চাহে না, সহজে রাগ করে না, আর কখনও কাহাকে মন্দ ভাবে না। এরূপ দাতব্যই দান বলিয়া ধর্ত্তব্য, আর ঐরূপ নিঃস্বার্থ দানই নারীজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত!

কেহ কেহ সৌভাগ্যক্রমে নিজ সংসার, পরিবার বা প্রতিবাসীদের মধ্যেই সময় কাটাইবার উপযোগী যথেষ্ট কাজ পান; তাঁহারা সচরাচর আপনাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের প্রভূত উপকার করেন এবং আপনারাও সর্ব্বদা সুখী ও প্রফুল্ল থাকেন! কখন কখন এজন্য তাঁহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেও কাতর হন না। কিন্তু মানুষের জীবন লৌহের ন্যায়, উহা মরিচা পড়িয়া ক্ষয় হওয়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহারের দ্বারা ক্ষয় হওয়াই ভাল। এতদ্ব্যতীত

চালনা দ্বারা ঐ সকল পরিশ্রমী নারীদের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, আর সময়ে সময়ে বিপদ বিপত্তির কালে তাঁহারা অনেক মহৎ কাজ করিতে সক্ষম হন।

আবার প্রতি গৃহে এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে বা বুঝিতে অপারগ। তাঁহারা কোন না কোন কাজে মন দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কি প্রকারে উহা আরম্ভ করিতে হয় তাহা জানেন না। কাজের মহত্বের কথা তাঁহারা পুস্তকে পড়েন বা পিতা ভ্রাতাদির মুখে শুনেন, আর আপনারাও জগতের কিছু না কিছু হিতসাধন করিতে ব্যগ্র; কিন্তু কি কাজ করিবেন ও কি উপায়ে?

সাধারণ নারীদের এই সমস্যা পূরণের আশায় আমি 'স্ত্রীলোকের কাজ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করি, আর উহাতেই আমি নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি পরিষ্কার পথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সমুদায়ের বিবৃতি করা অসম্ভব। তবে তাহারই গুটিকয়েক বিষয় লইয়া সংক্ষেপে আপনাদিগকে জানাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া যদি আপনাদের মধ্যে একজনেরও প্রকৃত কাজে আসক্তি জন্মায় তাহা হইলে আশাতীত আনন্দলাভ করিব।

কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে ধাত্রী-বিদ্যা, ডাক্তারী প্রভৃতি কাজের পথ ভদ্র নারীদের জন্য খোলা হইয়াছে। গরীব ও গৃহস্থ স্ত্রীদের ভদ্র ও স্বতন্ত্র ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনই উহার উদ্দেশ্য মনে করিবেনকল বিষয়ে এ প্রবন্ধে লেখার কোন আবশ্যক নাই, কেননা, গৃহস্থ ও দরিদ্র বঙ্গে একত্র চালনার অভাবে আলস্যে জীবন যাপন করে না; তাহারা নিজে না রাঁধিলে যা অভ্যস্ত তাহারা খেতে না, না খাটিলে ছেলে মেয়েদের ভাতকাপড় জুটিবে না—এই ভাবনা তাহাদিগকে পরিবারের যে কোন কার্য্যে হউক সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখে।

কিন্তু যে বালিকা বা স্ত্রীলোকেরা সংসারের কোন কাজ করিতে বাধ্য নহেন, যাহাদের গৃহে পরিশ্রম করা অথবা বসিয়া থাকা দুইই সমান, যাহাদের জীবনে কোন লক্ষ্য নাই, কাজের কোন প্রয়োজন নাই,—এইরূপ ধনবান বা মধ্যবর্ত্তী মহিলাদের মধ্যেই আলস্য ও অপদার্থতার অধিকতর আশঙ্কা। তাহাদের যত গৃহকর্ম্ম, এমন কি সন্তান পালন পর্য্যন্ত দাসদাসীদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় তাহারা কখন কখন ঐ চিরবিশ্রামে বিরক্ত হইয়া নিজ মনে—সংসারে আমি কি কাজ করিব?—এ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত ভাবিয়া পায় না। কাজে কাজেই তাহারা আলস্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ স্থলে তাহারা যদি কাহারও দ্বারা আবশ্যকীয় কর্ম্মে দীক্ষিত ও পথদর্শিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে যে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজের দ্বারা তাহাদের চিরবিমর্ষ জীবন আনন্দময় হইবে, অনাস্থিত মন স্ফূর্ত্তিময় হইবে, আর হিন্দু সংসার অধিকতর বিশুদ্ধ ও সুখপূর্ণ হইবে, হৃদয় প্রশস্ত হইবে, ও মনোবৃত্তি সমূহ পুষ্টি পাইবে। তখন তাহারা নিজেকেও মান্য করিতে শিখিবে আর অপরের দ্বারায়ও সম্মানিত হইবে।

কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে নিয়মিত রূপে পরিশ্রম করিলে স্ত্রীলোকের কোমল

রূপ কর্কশ হইয়া যায়। এ প্রকার ভাবা অতি অবিবেকের কাজ। কেননা, দরিদ্র পল্লী ও কৃষকবালাদের স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য ও যৌবনের লাবণ্য কে না জানে? কোন নারীর অবয়বে যদি তাঁহার সদ্ভাবের ও সৎকার্য্যের প্রভা প্রতিভাত হয়, তবে সে সুন্দর মুখ যে আরও কত অধিক উজ্জ্বল হয় তাহা কে না দেখিয়াছেন? একজন অলস অকর্ম্মণ্য নারীর বিম্লান মুখের সঙ্গে একটি কর্ম্মক্ষম সতেজ বদন মিলাইয়া দেখিলে কোন্‌টি বেশী মনোহর দেখায়? আসিয়া ও য়ুরোপের ধনী মহিলাদের মধ্যে কি আমরা এই প্রভেদ সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না? আমাদের আসিয়িক ভগিনীরা য়ুরোপীয় ভগিনীদের তুলনায় রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যে কিছুমাত্র নীচে নহেন, কিন্তু য়ুরোপীয় নারীদের কর্ম্মিষ্ঠ মুখের জ্যোতির কাছে আসিয়িক মহিলাদের প্রভা গ্যাসের আলোকের পার্শ্বে বাতির আলোকের ন্যায় ক্ষীণপ্রভ বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, এক ভারতেই রাজপুত, মার্হাট্টী বা খোট্টা নারীদের সতেজ দীপ্তির নিকটে বঙ্গবালাদের সৌন্দর্য্যের শীতল কিরণ তত ভাল খেলে না। অন্যদিকে আবার কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন লোকের চোক তৎপর ও পরিশ্রমী লোকের চোকের তুলনায় প্রাণশূন্য দেখায়। দুজনেরই রূপ, লাবণ্য সবই আছে, কিন্তু কাজের অভাবে এক জনের চোক এত নিষ্প্রভ যে উহা শূন্যতায় অলস জীবন ও বিমর্ষ আত্মার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে; আর অন্য জনের নয়নের জেল্লায় তাহাকে কতই মনোহারী করিয়া তুলে; উহাতে তাহার জ্ঞানবুদ্ধির কতই না পরিচয় পাও[illegible]পরিবারের বহি[illegible]লোকের দ্বারা তোমার অন্তস্থ আত্মা তাহার আত্মার সঙ্গে কথা কহিতে[illegible]। তাঁহাদের ঐ [illegible]পকারী কাজ স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য কমানের পরিবর্ত্তে উহা আরও দশ[illegible]ও সকলে

আবার, ভাল কাজ যেমন মানুষের লাবণ্য বাড়া[illegible], কাজ তেমনি লোকের চেহারা খারাপ করিয়া দেয়। নিঃস্বার্থ পরোপকারই উহার সাধককে ঐরূপ সুন্দর করিতে পারে। যে কাজ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অপরের জন্য দেওয়া হয়, ও যাহা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আনন্দে গৃহীত হয়—সেই কাজই জীবনের প্রকৃত সাধনা! সমস্ত জগতে উহার প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। যাহারা সহৃদয় ও মুক্ত-হস্তে দান করে, তাহারা তেমনি অসংখ্য প্রকারে পুরস্কার পায়। যে অন্যের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করে, তাহার নিমিত্তও অপরে প্রাণ সমর্পণ করিতে উদ্যত হয়। নিঃসন্দেহ অনেক মহিলা নিজের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার জন্য কত পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে বেশ পরিপাটী হয়, আর লোকেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করে। কিন্তু নিজ সজ্জায় দুই ঘণ্টা না কাটাইয়া উহার অর্দ্ধেক সময়ও যদি তাঁহারা কোন মাতৃহীনা কন্যার গা ধোয়াইয়া দেন অথবা কোন দরিদ্র বালকের কাপড় সেলাই করিয়া দেন, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের বাহ্যিক পরিপাটীর সঙ্গে আন্তরিক মহত্বের পরিচয় দেয়। অনেক স্ত্রীলোকে জীবিকার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, অবশ্য ওরূপ মেহনতে তাহাদের যে কোন সদ্‌গুণ দেখা যায় না,তাহা নহে। ওরূপ নারীদিগকে দেখিলে সকলেই সুখ্যাতি করে, কিন্তু উহা তাহাদের মহচ্চরিত্রের কোন প্রমাণ দেয় না। কেবল,

আমরা যখন, 'এই কাজটা করিলে ওর ভাল হয়' বা 'এই বস্ত্রখানা পাইলে অন্যের উপকারে আসে'—এরূপ ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া কোন সৎকাজ করিতে অগ্রসর হই, সেই কাজ আমাদিগকে পৃথিবী হইতে তুলিয়া এক পদ স্বর্গের সিঁড়িতে অগ্রসর করে।

জীবনকে মহৎ করা যদি মানুষের প্রধান কাজ হইল, তবে অন্যের জন্য খাটিয়া ও অপরকে সুখী করিবার নিমিত্ত কিছু সময় কাটান প্রতি ব্যক্তিরই কর্ত্তব্যস্বরূপ। কিন্তু অন্য লোকের প্রতি আস্থা না থাকিলে ঐ আনন্দের উপায় কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে?—এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই করা যায়। আমরা যদি আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ লোকদিগকে সুখী করিবার আশায় প্রত্যহ আধ ঘণ্টাও কোন না কোন কাজ করি, তাহা হইলে আস্থা আপনা হতেই আসিবে! আমরা সর্ব্বদা নিজের জন্য খাটিলে উহা যেমন স্বার্থপরতার বৃদ্ধি করে, অপরের নিমিত্ত একবার কাজ করিতে আরম্ভ করিলে উহা তেমনি আমাদিগকে পর-প্রেম শিক্ষা দেয়। আমাদের প্রতি যাহারা দয়ালু ও স্নেহময় তাঁহাদের অপেক্ষা যাহাদের উপর আমরা দয়া বর্ষণ করি, তাহাদের প্রতি আমাদের স্নেহ প্রবল হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা—এ বাক্য আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হলেও মানব জীবনে উহা অনবরত ঘটিতেছে। পরের জন্য পরিশ্রম করা আমাদের জীবনে মহা ফবচের মত, উহা আমাদিগকে আলস্য ও স্বার্থপরতার গ্রাস হইতে রক্ষা করে।

অন্যদিকে ইহাও কেহ মনে করিবেন না যে প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্ম বা জীবিকা উপার্জ্জন নিঃস্বার্থ পরোপকারের সঙ্গে একত্র চালনা অসম্ভব। বরং উহার বদলে সর্ব্বত্র এইরূপ দেখা যায় যে যাহারা পরিশ্রমে অভ্যস্ত তাহারা কখন কাজে ভয় পায় না। আমি সহরে ও মফঃস্বলে এমন অনেক দরিদ্র পরিবার দেখিয়াছি, যাহারা নিজে সংসারের জন্য সমস্ত দিন [illegible] ভাঙ্গা, ময়দা পেষা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমে রত থাকে, তথাচ পাড়াপড়সীর কোন [illegible]দ বা অসুখ হইলে, তাহারাই সকলের অগ্রে সাহায্য করিতে দৌড়ায়! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত গরীবের স্ত্রী নিজের দুই তিনটী শিশু সন্তান লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তবুও সংসার-প্রপীড়িত প্রতিবাসিনীর ছেলেকে নাওয়াবার ও খাওয়াবার অবসর পায়।

এইরূপে সকলেরই সাধ্যমত ঘরে বাহিরে কাজ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কে কোন্ কাজটিতে নিপুণ বা কোন্‌টি সাধিতে ইচ্ছুক, তাহা নিজ নিজ রুচি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিবে। যে কেহ শিল্পকর্ম্মে পটু, শিল্পই তাঁহার প্রধান কাজ হওয়া উচিত। রন্ধনে যাঁহার আনন্দ, পাককার্য্যের ভার লওয়াই তাঁহার পক্ষে ভাল। পর-সেবায় যিনি মনোযোগী, পীড়িতের তত্ত্বাবধারণ করাই তাঁর উপযুক্ত কাজ। কিন্তু যদি কখন এরূপ ঘটে যে কোন বালিকা কিছুতেই আগ্রহ দেখায় না—শিল্প, রন্ধন, গৃহকর্ম্ম বা ঔষধ খাওয়ান—এ সমস্ত কার্য্যই তাহার কাছে এক প্রকার ভার স্বরূপ। তাহা হইলে প্রথমে তাহকে নিজের মনোগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পরের জন্য কোন না কোন সাধনে নিযুক্ত হওয়া উচিত। এ সংসারে কোন নারী যদি যথার্থ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তবে কেবল

আপন উদর পূরণ ও শরীর আচ্ছাদন করিলেই চলিবে না। ওরূপে স্বার্থপর হইয়া থাকা ইতর প্রাণীদেরই শোভা পায়, কিন্তু সর্ব্বত্র পূজিত নারীজাতির জীবনে উহা বড় লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। মানব চরিত্রকে নীচ ও মানুষের অবস্থাকে শোচনীয় করিবার নিমিত্ত আলস্যের মত অপকারী শত্রু আর নাই। উহা লৌহা মরিচার ন্যায়, ফলে পোকার ন্যায়, দেহে জরার ন্যায় মানুষকে একটু একটু করিয়া খাইয়া ফেলে।

কিছুদিন হইল, একজন বিধবার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ দয়ালু মুখ দেখিয়া আমি তাঁহার সহিত আলাপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, তিনি অতি সুশিক্ষিতা, একজন ধনী হিন্দু মহিলা, আর সর্ব্বদা দাতব্য কার্য্যে এত ব্যস্ত যে, প্রত্যহ তাঁহার এক দণ্ডও বিশ্রামের সময় থাকে না। আমি তাঁহার পরোপকারের জন্য ব্যগ্রতা ও নিষ্কাম জীবনে আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি কিরূপে ঐ সকল কাজের পথ আবিষ্কার করেন? কেহ কি আপনাকে এই সমস্ত কাজ দেখাইয়া দিয়াছিল?

তিনি উত্তর করিলেন—না, না, তা নয়, স্বামী শোকে পাগল হইয়া প্রায় দুই মাস যাবৎ আমি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু ঐ বিহ্বল জীবন আমার শোকের তীক্ষ্ণতা কমানের পরিবর্ত্তে উহা আমাকে এতদূর যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে, আমি হতাশ হইয়া একদিন বিছানা হইতে উঠিলাম ও আপনাকে ভুলিবার জন্য এই পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলাম। সেইদিন হইতে আমার জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর হইয়াছে আমার জীবন এখন আর সে জ্বলন্ত নিরাশায় পুড়িয়া মরে না, আমি উহা গরীব দুঃখীদের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি। নিষ্কর্ম্মা জীবনের ক্লেশ ও ব্যস্ত জীবনের আনন্দ আমি এখন সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতেছি।

আমার বোধ হয় ঐ উন্নত চরিত্র বিধবার মত হাজার হাজার শোকাতুরা স্ত্রীলোক আমাদের হিন্দু সংসারে আছেন, যাঁহারা আপনাকে ভুলিবার জন্য পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত। কিন্তু তাঁহারা ঐরূপ শিক্ষিত না হওয়ায় নিজেদের কাজ বাছিয়া লইতে অপারগ। সে কারণে আমি নিজের সাধ্যমত কার্য্যক্ষেত্রে মহিলাদের পথদর্শক হইতে মনস্থ করিয়াছি। সধবা, বিধবা, কে কোথায় বঙ্গমহিলা আছেন, আসুন, আমি আপনাদের হাত ধরিয়া খাটিতে চাই, আপনাদের স্নেহময় উৎসাহ চাই, জগতে আপনাদিগকে আবার পূজিত দেখিতে বাসনা করি। আপনাদের শোচনীয় অবস্থায় হতাশ হইবার কোন আবশ্যক নাই। এ বিশাল সংসার-ক্ষেত্রে ঈশ্বর কীট পতঙ্গেদেরও জীবনের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং আপনারা হাজার অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকুন, মানুষের যত ন্যায্য স্বত্ব হইতে বহিষ্কৃত হউন, জগদীশ্বর নারীজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও আমাদের কাজ অসীম করিয়াছেন। এখন আসুন যে যার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বাছিয়া সকলে এক মনে, এক সঙ্গে খাটিয়া চলি। দেখিব তখন কোন পুরুষ আমাদিগকে

অকর্ম্মণ্য বঙ্গবালা বলিয়া ঘৃণা করে! দেখিব কোন হিন্দু আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতে সাহসী হয়! আর দেখিব কোন্ আর্য্যসন্তান তখন আর্য্যমহিলাদিগকে বর্ত্তমান হীন অবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে!

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

আমার জীবন।

(১)

তোমরা শুনিলেই আর এক রকম ভাবিয়া বসিবে, কিন্তু আমি বেশ জানি সে সব কিছু নয়। দু একবার আমারো সন্দেহ হইয়াছে বটে;—কিন্তু তখনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি তাহা ভুল। একবার ভাল বাসিলে নাকি আবার ভাল বাসা যায়! তবে যে আমার মৃণালিনী দেবীকে দেখিতে ভাল লাগে—তাঁহার সহিত গল্প করিতে ভাল লাগে, ইহার সহজ কারণ তাঁহাকে আমি ভালবাসি কিন্তু নিতান্ত সাদাসিধে বন্ধুতার ভালবাসা মাত্র, অপর কিছুই হইতে পারে না। একবার ভাল বাসিলে নাকি আবার দুবার ভাল বাসা যায়!

কখন কখন তাহার স্বরে, তাহার হাসিতে নয়নের দৃষ্টিতে হাতের স্পর্শে (আমি ডাক্তার, চিকিৎসা করিতে আসিয়া তাঁহার সহিত আমার পরিচয়) আমার কেমন একটা মোহময় বিহ্বলতা জন্মে সত্য, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তাহার কারণ অন্য কিছু নহে; তাহা পুরাতন স্মৃতির আকস্মিক উদ্রেক মাত্র। কে জানে কেন, থাকিয়া থাকিয়া, এই নয়নের তারায় আমি যেন সেই নয়নের জ্যোতি দেখিতে পাই, এই স্পর্শে সেই স্পর্শ অনুভব করি, এই কণ্ঠে সেই কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাই,—তাই তাহার চোখে চোখ রাখিয়া, তাহার হাত হাতে ধরিয়া সময়ে সময়ে আমার এই তন্ময় ভাব, এই বিভ্রম, এই মোহ!

তুমি যে সুন্দরি হাসিয়া বলিতেছ—"হ্যাঁ হ্যাঁ দরকার মত সকল পুরুষেরই এইরূপ মতিভ্রম ঘটে বটে! মুড়ি খাইতে কোন কালেই তোমাদের ত্রুটি নাই, কেবল সুবিধা বুঝিয়া;—তাহা মুড়ি কি চাল ভাজা এইটা বুঝিতেই ভুলিয়া যাও!"

এ কথায় আমি নাচার! কিন্তু তুমি যাই বল, আমার বিশ্বাস আমি মুড়ি ও চাল ভাজার প্রভেদ বিলক্ষণ বুঝি,—আর বুঝিয়াই বলিতেছি, ইহা প্রেম নহে, বন্ধুতা মাত্র। সুকোমল, সুদৃঢ়, বহুপুণ্যজ, পরমুপাদেয়, বন্ধুতা—তবে স্ত্রী পুরুষেই এরূপ বন্ধুতা সম্ভবে। পুরুষে পুরুষে ঠিক এরূপ বন্ধুতা হয় না। অশ্রুজলের প্রত্যাশায় অশ্রুজল বিসর্জ্জন, মমতার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ের দুঃখময় দ্বার এমন কি জীবনের ঘৃণিত অংশও অসঙ্কোচ উদ্ঘাটন—ইহা পুরুষের মধ্যে হাস্যকর, স্ত্রী পুরুষের বন্ধুতাতেই স্বাভাবিক।

না বলিয়া কি থাকা যায়? আর যদি কেহ পারে আমি ত না! সন্ধ্যাকালে অস্পষ্ট আলোকময় নির্জ্জন গৃহে আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে যখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—"কি ভাবিতেছেন? আপনার মুখে সর্ব্বদাই যেন একটি কষ্টের ছায়া দেখিতে পাই, মনে হয় আপনার প্রাণের ভিতর যেন কি একটি গভীর দুঃখ জাগিতেছে।" তখন কি আর আমি আত্ম-সংবরণ করিতে পারি! আমি বলিলাম—"তেমন দুঃখ যেন ভগবান আর কাহারও জীবনে না লেখেন—" বলিতে বলিতে আমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল সেই অশ্রু বাষ্পের মধ্যে ছায়ার মত প্রতিবিম্বিত ক্ষীণ মূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কেবল যদি সেই প্রফুল্ল নবীন ভাবটুকু থাকিত! এই বিষণ্ণ নয়নের মধ্যে দিয়া কেবল যদি সেই সরল সহাস ভাবটুক্ ফুটিয়া বাহির হইত! এই ক্ষীণ কায়া, ক্ষীণ কপোল যদি আর একটু সুগোল, সুঠাম, পরিপুষ্ট এবং শৈশবকান্তি-যুক্ত হইত! তাহা হইলে কি সুন্দর দেখিতে হইত! তাহা হইলে কি আমি মনে করিতে পারিতাম না, এ মূর্ত্তি তাহারই মূর্ত্তি—তাহার অনুরূপ নাই!"

যুবতীর দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার চিন্তাভঙ্গ হইল,—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আমার কথায় আপনার কষ্ট হইল?"

যুবতী কোন কথা কহিলেন না;—সেই ক্ষীণালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মনে হইল যেন তাহার নয়ন সজল। আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম—"কি হইয়াছে?"

মৃণালিনী নিরুত্তর।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হইয়াছে? আপনার অসুখ করিতেছে না ত?"

যুবতী ধীরে ধীরে বলিল—"মনে করিতাম আপনি আমাকে নিতান্তই পর ভাবেন না—"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এই! তা এখন ভুল ভাঙ্গিল কিসে?

যুবতী বলিল—"আপনি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না!"

"বিশ্বাস করিতে পারি না! আপনার মত আমার বিশ্বাসী বন্ধু জগতে আর কে আছে!"

"তাহা হইলে আপনার দুঃখের ভাগ আমাকে দিতেন!"

আমি কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলাম—"ভগিনি, যদি কাহারো নিকট আমি মনের কথা বলিতে পারি জীবন খুলিয়া দেখাইতে পারি তবে সে তোমারি নিকট!—তুমি অন্যায় অবিশ্বাস করিতেছ। তবে যে বলি না তাহার কারণ—আমার এই কষ্টকর জীবন কাহিনী বলিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না।" মনের আবেগে সহসা এবং এই প্রথম তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন!

মৃণালিনী বলিল—"সে কি কেবলি কথার কথা! বন্ধুর অকৃত্রিম বিশ্বাসের সুখে কি সে কথাও উপভোগ্য নহে? জীবনে বিশ্বাসের মত সুখে কি কিছু আছে?"

"তাহা সত্য। ভগিনি, তোমরা হৃদয় দিয়া দেখ, তোমরা দিব্য দর্শক, আমরা বুদ্ধির ঘোর প্যাঁচ করিতে গিয়া কেবল সন্দেহের ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াই। যদি বিশ্বাস করিয়া এ জীবন এক দিন খুলিয়া দেখাইতে পারিতাম,—ত হয়ত এ সর্পের হাত হইতে উদ্ধার পাইতেও পারিতাম।" শোন ভগিনি, তুমিই শোন; যে ঘৃণ্যকথা তাহার নিকট লজ্জায় প্রকাশ করিতে পারি নাই তোমার নিকট বলিয়াই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করি,—যদি তাহার প্রায়শ্চিত্ত থাকে! শুনিয়া জান এই নরাধম তোমার স্নেহের কিরূপ অযোগ্য; কিন্তু কিরূপ প্রাণমনে তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছে!"

---

(২)

আমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া দেশে গিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত দেখা শুনা শেষ করিয়া আবার কলিকাতায় আসিয়াছি, কর্ম্মস্থলে যাইবার এখনো যে কয়দিন বিলম্ব আছে সেই কয় দিনের জন্য প্রাণকৃষ্ণ বাবুর অতিথি হইয়া আছি। প্রাণকৃষ্ণ বাবু আমার স্বদেশী স্বজাতি—কেবল তাহাই নহে আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে বহুকালের বন্ধুত্ব চলিয়া আসিতেছে। ইনি এখন কলিকাতাতেই বাস করেন, কলিকাতার একজন বড় উকীল পয়সা কড়ি বেশ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার ধন ভোগ করিতে আর কেহই নাই, এক মাত্র কন্যাই তাঁহার গৃহ-সর্ব্বস্ব—গৃহিণী অল্পদিন হইল স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

প্রাণকৃষ্ণ বাবু যদিও বিলাত যান নাই কিন্তু তিনি ইংরাজি মেজাজের লোক ইংরাজি চালেই চলেন। ইংরাজি পাড়ায় বাড়ী, ইংরাজি কেতায় থাকেন, মেয়েকে ইংরাজি লেখা পড়া বেশ শিখাইয়াছেন এবং এখনও তাহার বিবাহ দেন নাই।

আমি আসিয়া শুনিলাম কিছুদিন হইতে মায়াবিনী পীড়িত। পীড়া অদ্ভুত! নূতন ধরণের হিষ্টিরিয়া, পীড়ার সময় বল-প্রকাশ কি অন্য কোনরূপ উপদ্রব নাই কেবল একবার অজ্ঞান হইলে ২৪ ঘণ্টা কাল রোগীর আর চেতনা থাকে না। তাহাকে তখন দেখিলে মনে হয় সে গভীর নিদ্রামগ্ন অথচ পরে শুনিতে পাওয়া যায়, ভিতরে ভিতরে তাহার তখনো জ্ঞান ছিল তাহার নিকট কেহ কথা কহিলে সে শুনিতে পায় স্পর্শ অনুভব করিতে পারে, কেবল নয়ন মুদ্রিত থাকায় সে কাহাকেও দেখিতে পায় না। ২৪ ঘণ্টার পর তাহার অল্প অল্প জ্ঞান জন্মে, কিন্তু ইহার দিন তিন চার পরে তবে সে সবল হইয়া উঠে।

পীড়ার আর এক অপূর্ব্ব লক্ষণ তাহার পূর্ব্বলক্ষণ কিছুই বুঝা যায় না। কি কারণে যে তাহার আবির্ভাব তাহা রোগী নিজেই বলিতে পারে না বা বলে না; আমার যদিচ শেষ কথাই ঠিক বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

আমি যেদিন তাহাকে প্রথম দেখিলাম তাহার তিন চারি দিন পূর্ব্বে সে অজ্ঞান হইয়াছিল, সুতরাং এখনো সে শয্যাগত। প্রাণকৃষ্ণ বাবু যখন বলিলেন "চল মায়াকে দেখিবে

চল, দেখদেখি তুমি যদি রোগের কিছুই কারণ বাহির করিতে পার। তখন আলু থালু কুন্তল, অসজ্জিত কেশ, চঞ্চল নয়ন, চঞ্চল চরণ, সুভাষী, কৃশকায় ছোট একটি বালিকাকে আমার মনে পড়িল ; ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বিলাতে যাই তখন মায়া ১২ বৎসরের বালিকা মাত্র। আমি তাহাকেই দেখিব প্রত্যাশা করিয়া জগৎ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মায়ার শয়নকক্ষে পদার্পণ করিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। গৃহে এক খানি কৌচে এক জন যুবতী অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত, সুললিত বেশ-বিন্যাস, শুভ্র পরিচ্ছেদের চমৎকার পারিপাট্ট, শিথিল কবরী সুঠাম গ্রীবার শোভা সম্পাদন করিতেছে। কপালে কুঞ্চিত অলক, সহাস অধর সরল দৃষ্টি প্রফুল্ল অসঙ্কোচ ঢল ঢল ভাব শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে অতি মধুর সর্ব্বাঙ্গিন বিকাশ—আমি দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। ইনি কি রোগী নাকি? রোগের চিহ্নের মধ্যে এই প্রফুল্ল মুখ কোমল পাংশুবর্ণে আরো সুকোমল শোভাময়! আমি দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া দেখিলাম সুন্দরীর হাতে একটি সুন্দর গোলাপ, ফুলটিই সে আঘ্রাণ করিতেছিল আমাকে দেখিয়া হাত নীচু করিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আপনার ত কই কিছুই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না, তেমনিই ত আছেন, কেবল সাজসজ্জা কিছু বদল হইয়াছে মাত্র।

কথার ক্ষীণস্বরে তাহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য সহসা আরো যেন বর্দ্ধিত হইল। আমি কি উত্তর করিব ভাবিয়া পাইলাম না; আমার চক্ষে সমস্তই পরিবর্ত্তন! একি সত্যই মায়া! না আমি একটা মহা মায়ার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! প্রাণকৃষ্ণ বাবু একখানি চৌকি টানিয়া কৌচের নিকটে রাখিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন আমি নিস্তব্ধে বসিলাম ; তিনি জানালার নিকটের একখানি চৌকিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

বুঝিলাম আমি নিতান্ত জানোয়ার বনিতেছি কোন একটা কথা কহা নিতান্তই আবশ্যক ভাবিয়া আমি বলিলাম "আপনি এখনো নিতান্ত দুর্ব্বল আছেন মনে হইতেছে?"

সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল "ইহার মধ্যে 'আপনি' হইয়া পড়িয়াছি! বিলাতের গুণ ধরিয়াছে বই কি!"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "কতটুকু দেখিয়া গিয়াছিলাম! ভুলিয়া যাইতে হয় তুমিই সেই!"

"কই আমিত ভুলি নাই—ভোলাটা দেখিতেছি পুরুষেরি ধর্ম্ম!"

কথাটা মায়া নিতান্ত আস্তে আস্তে বলিল, জগৎবাবু যাহাতে না শুনিতে পান। স্বাভাবিক স্বরে বলিলেও যে তিনি শুনিতে পাইতেন তাহাও নহে এমনি একাগ্রচিত্তে তিনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

কথাটা আমার বুকে একটু বিঁধিল, তাই কিছু লাগিল ভাল! আমি বলিলাম "মায়া! তুমি এখনো তেমনি দুষ্টু আছ, কথায় তোমাকে পারা ভার, তবে এখন তোমার দুষ্টুমিটা আরো বাড়িয়াছে। আমি যে তোমাকে ভুলি নাই, চিনিতে না পারাতেই ত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ!"

মায়া বলিল—"শুনিয়া সুখী হইলাম—এখন আপনার বিলাতের গল্প করুন।"

"সে পরে—আগে তোমার ব্যারামের কথাটা শুনি। শুনিলাম অজ্ঞান হইবার আগে নাকি কিছুই কারণ বুঝিতে পার না?"

"না!"

"কিছু না? আহারের অনিয়মে কিম্বা বেশী কথা-বার্ত্তা কহিলে কিম্বা বেশী পড়া শুনা করিলে, কিম্বা কোনরূপ চিন্তায়—!"

মায়া আমার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "আপনি ডাক্তার মানুষ, সে সব আপনি আবিষ্কার করুন ; অত কিসে কি হয় বুঝিবার ক্ষমতা আমার নাই। ওসব বৃথা প্রশ্ন না করিয়া আপনার গল্প করুন, তাতে আমি থাকিব ভাল।"

তাহার কথায় আমার মনে হইল এ কথা সে এড়াইতে চায়, ভাবিলাম ক্রমে বাহির করিব, এখন তবে থাক। বলিলাম—"বিলাতের কথা! সে দেশ নন্দন ভুবন, একবার গেলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না।"

'তবুও ফিরিতে হ'ল'—কি মনস্তাপ! বোধ করি আধ খানা রাখিয়া আসিয়াছেন?"

"আধ খানা কেন সম্পূর্ণ রাখিয়া আসিতেও আমার আপত্তি ছিল না,—তবে কি, জান, এ বোঝা যে কেহ বইতে চাহে না!"

এতক্ষণ আমি একটানা এক নিশ্বাসে আমার জীবনের কথা বলিয়া যাইতেছিলাম, এই খানে থামিয়া পড়িলাম, মৃণালিনী সহসা বলিয়া উঠিল "উদার বটে!"

আশ্চর্য্য! ঠিক এই কথা সে দিন ইহার উত্তরে মায়াও বলিয়াছিল; আমি থতমত খাইয়া মৃণালিনীর মুখের দিকে চাহিলাম। মৃণালিনী বলিল "তারপর!"

আমি আর কি বলিব? আমি তখন সমস্ত কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়াছি—আমি বলিলাম, "তারপর আর কি? জগৎ বাবুর খবরের কাগজ পড়া শেষ হইলে আমরা বাহিরে আসিলাম।"

মৃণা। অবশ্য হৃদয়টি সেই ঘরের মধ্যে রাখিয়া?

আমি বলিলাম "আমি first sight-এ love বিশ্বাস করি না, নইলে বলিতাম হ্যাঁ।"

মৃণা। তবে সে জন্য যে নিতান্ত বহু দর্শনেরও আবশ্যক হইয়াছিল তাহাত বোধ হয় না।

'এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না! এখন বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে; কিন্তু তখন বিনা লজ্জায় এক সপ্তাহ পার না হইতেই আমি প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিকট মায়ার হস্ত প্রার্থনা করিয়া বসিলাম।" ওঃ সে দিন কি ভয়ঙ্কর দিন! সে দিনের সেঅ ভিসম্পাৎ লইয়া চিরজীবনে আমাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে। সেই দিন জানিলাম মায়া

আমার হইবে না; তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে! অসুখের জন্য কিছুদিন স্থগিত রহিয়াছে মাত্র! শুনিলাম—শুনিয়া নৈরাশ্যে অভিভূত হইলাম; কিন্তু সেই জন্যই কি আমার এ দগ্ধ যন্ত্রণা! না, এরূপ নৈরাশ্যের কষ্ট কেনা ভোগ করে, এবং কেই বা না আবার তাহা অতিক্রম করিয়া উঠে! আমার এই ভয়ঙ্কর দগ্ধ যন্ত্রণা সে জন্য নহে—"

আমি থামিয়া পড়িলাম। মৃণালিনী সস্নেহে আমার হাতখানি ধরিয়া সাশ্রুনয়ন অবনত করিল, বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল আমার হাতে পড়িতে লাগিল। আমি বলিলাম "এই পর্য্যন্ত থাক্ ভগিনি, তুমি আর শুনিতে পারিবে না!"

মৃণা কম্পিত অথচ ধীর স্বরে বলিল "পারিব বলুন! আমি দেখি আপনি আমাকে কতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন।"

"তবে তাহাই হউক! শোন। প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বাড়ী ইংরাজী ফ্যাসানের—মধ্যে একটি বড় ড্রইং রুম, উভয় দিকে দুইটি করিয়া কক্ষ। এক পাশের দুইটি কক্ষের একটিতে মায়া ও একটিতে জগৎ বাবু শয়ন করেন অন্য দিকের একটি আহার গৃহ; এবং অন্যটিতে আপাততঃ আমি থাকি। যে দিন আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল সেই দিন আর আমি মায়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাই নাই; বিকালে যাইব ভাবিতেছি; শুনিলাম সেখানে শশী বাবু আছেন, আর দেখা করিতে যাওয়া হইল না। শশি বাবুর সহিত যে মায়ার বিবাহ হইবে সবে মাত্র সেই দিনই আমি জানিয়াছি; তাহার আগে তাহাকে এখানে আসিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এ কথা জানিতাম না! সে দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা তিন জনে আহারে বসিলাম প্রাণকৃষ্ণ বাবু, শশী বাবু এবং আমি, মায়া কোন কোন দিন আমাদের সহিত এক টেবিলে খায়, কোন কোন দিন একাকী গৃহেও খায়, সুতরাং তাহাকে টেবিলে না দেখিয়া কেহই আশ্চর্য্য হইল না, বা কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। আহারের পর আমরা তিন জনে ড্রইং রুমে আসিয়া বসিলাম, প্রাণকৃষ্ণ বাবু একটি কৌচে হেলান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে অর্দ্ধ নিদ্রায় মগ্ন হইলেন, আমরা দুই জনে খানিকক্ষণ চুপ্‌চাপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম। শশি বাবুকেও আজ নিতান্ত বিষণ্ণ বলিয়া মনে হইল! আশ্চর্য্য! আমার তাঁহার মত সৌভাগ্য হইলে আজ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখা ভার হইত। খানিক পরে শশী বাবু উঠিয়া গৃহ-কোণ হইতে একটি বেহালা লইয়া কান টিপিতে লাগিলেন, আমি আস্তে আস্তে জানালার কাছে আসিয়া দাড়াইলাম। সুন্দর জ্যোৎস্না, শীতের অবসানে মৃদুমন্দ বসন্ত বাতাস বহিতেছে, ; সেই বসন্ত হিল্লোলে বাগানের গাছ পালা কাঁপিতেছে, ছায়া কাঁপিতেছে এবং জ্যোৎস্নালোকও যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেহালার কোমল সুর সেই কম্পিত রজনীর প্রাণ সহসা আরো কাঁপাইয়া তুলিল। বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতে লাগিল, তাহার গভীর দুঃখে নীরব রজনীকে আকুল করিয়া তুলিয়া কি এক প্রাণ-ফাটা সুর বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রাণকৃষ্ণ বাবু আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তখন আমি এত বিহ্বল এত

আত্মহারা হই নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তখন কেবল আমি স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন বেহালার প্রতি সুরে আমার হৃদয়ের শিরায় শিরায় নৈরাশ্যের তীব্র যন্ত্রণা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, সেই সুরে সুরে হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল—

"সে আমার নাই, সে আমার নাই! জীবন মরুময়, জীবন শূন্যময়, জীবন মৃত্যুময়!" আমি যেন পাগল হইয়া উঠিলাম! আর সেখানে দাঁড়াইয়া বেহালার সেই মর্ম্মস্পর্শী আকুল গান শুনিতে পারিলাম না! গৃহ পরিত্যাগ করিলাম সম্মুখে মায়ার গৃহ। গৃহদ্বার তখনও উন্মুক্ত সেই দুঃখের আবেগে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞানের মত তাহার গৃহে প্রবেশ করিলাম—দেখিলাম মায়া জানালার কাছে এক খানি কৌচে শুইয়া, আমি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চন্দ্রলোকে সেই সুষুপ্ত সুন্দর মুখখানি কি অনুপম সুন্দর দেখাইতেছিল! দেখিতে দেখিতে ক্রমে আর সকলই ভুলিলাম, সে আমার নহে আমি তার নহি মোহ-পরায়ণ হইয়া সেই সুপ্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া বার বার প্রাণ ভরিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিলাম।

মৃণালিনী সহসা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনি! চোরের মত—"

"হ্যাঁ—আমিই এই জঘন্য কার্য্য করিয়াছিলাম; ঘৃণা করিতেছেন করুন কিন্তু মনে রাখিবেন আমি মানুষ—সেই অবস্থায় পড়িলে এখনও হয়ত আমি ঠিক তাহাই করিতাম! কিন্তু এ পাপের শাস্তি যাহা পাইয়াছি তাহা শুনিলে পাষাণেরও করুণা সঞ্চার হইবে!"

মৃণালিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বলুন।"

"পরদিন প্রাতে প্রাণকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, 'মায়া কাল রাত হইতে আবার অজ্ঞান হইয়াছে।" আমি দেখিতে গেলাম, রাত্রের ব্যবহার মনে করিয়া লজ্জার অনুতাপে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু বৃথা লজ্জা! বৃথা অনুতাপ! একথা প্রকাশ করিয়া তাহারা মার্জ্জনা চাহিতে যে কখন সাহস হইবে না তাহা বুঝিলাম। তিন চার দিনে মায়া আরোগ্য লাভ করিল। ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিল। প্রাণকৃষ্ণ বাবু এক দিন আমাকে বলিলেন "এখন তুমি মায়াকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ" আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "কেন শশী বাবু!" তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "শশী বলিতেছে এতদিন সে পিতা মাতাকে এ বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করে নাই এখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে তাঁহাদের ইহাতে মত নাই, সুতরাং বিবাহ করিতে সে অনিচ্ছুক।"

বলা বাহুল্য সহসা আমি স্বর্গ হাতে পাইলাম। দুই চারি দিনের মধ্যেই আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

---

(৩)

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি নিশ্বাস লইতে থামিলাম মৃণালিনী বলিল "তার পর?"

"তারপর? তার পর জানিলাম কিছুতেই জীবনে সুখ নাই। যাহার জন্য এত

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যাহাকে পাইলে জীবনের সুখপূর্ণ হইবে ভাবিয়াছিলাম—তাহাকে পাইলাম কিন্তু সুখ পাইলাম না।

আমার কর্ম্মস্থলে যাইতে এখনও প্রায় সপ্তাহ কাল বাকী আছে বিবাহের পর সেই কয় দিনের জন্য আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণকৃষ্ণ বাবুর গঙ্গার ধারের একটি বাগানে বাস করিতেছিলাম। কিন্তু মনে সুখ থাকিলে তবেই প্রকৃতির শোভা সুখজনক। আমার এখন আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই, তেমন মন খুলিয়া সে আমার সহিত কথা কহে না, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। আমি আদর করিলে মুহূর্ত্তের জন্য সে ভাব চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পর অধিকতর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠে, আমার কাছ হইতে উঠিয়া সরিয়া বসে। আমাকে ইহাতে কাতর দেখিলে সে যেন কি বলিতে যায়, কিন্তু পারে না মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহে। আমি বুঝিলাম সে আমাকে ভাল বাসে না শশীকেই ভালবাসিত তাহার সহিত বিবাহ হয় নাই তাই তাহার এ ভাব! আমি মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলাম।

এক দিন দুজনে গঙ্গাতীরে বসিয়া আছি, তখন জ্যোৎস্না পক্ষ; আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান, জলে তাহার ছায়া নৃত্য করিতেছে, জ্যোস্নায় দিক্‌দিগন্ত ছায়াময় চিত্রপটের মত প্রতিভাত হইতেছে, জলে সহস্র রশ্মি ঝক্‌ঝক্ করিয়া তরঙ্গিত হইতেছে; পার্শ্বের ছায়ায় তাহাতে আরো ঘন ঘোর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের মনের অন্ধকারও এই সুন্দর দৃশ্যের সংস্পর্শে আরো গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা গঙ্গার উপর হইতে বেহালা সুর বাজিয়া উঠিল; মায়া চমকিয়া সেই দিকে চাহিল,—উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"সেই দিনও ঐ সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল,—ঐ বুঝি—ঐ সে—"

"কে?"

"শশীবাবু। ঐ সুরে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার দোষ নাই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম,—এই কথা বলিব বলিব করিয়া আমি বলিতে পারি না, আমাকে ক্ষমা কর—"

আমি বুঝিলাম, সে কি বলিতেছে অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া উঠিল—তবু বলিতে পারিলাম না যে সে ব্যক্তি শশীবাবু নহেন—আমি! লজ্জায় আমার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। সে আবার বলিল "সেই দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—তাঁহাকে আমি বিবাহ বিবাহ করিতে পারিব না আমি তোমাকে ভালবাসি। তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন, আমার বড় দুঃখ হইল, আপনাকে অভিসম্পাৎ করিতে করিতে আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাহার পর যখন ওঘর হইতে তাঁহার বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার হৃদয় প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া উঠিতে লাগিল; একটু পরেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। সেই সুর, সেই বিলাপ আমাকে অজ্ঞান

করিয়াছিল, আমি তাঁহার জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার বিনিময়ে, তাহার প্রতিশোধ-স্বরূপে দুরাত্মা অসহায় অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করিয়াছে! নাথ, ক্ষমা কর, আমার দোষ নাই। আমি তোমাকেই ভালবাসি।" আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল; আমি প্রাণপণে বল সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিতে যাইতেছি, "আমি সেই দুরাত্মা"—আর বলা হইল না! সহসা অজ্ঞান হইয়া মায়া সেই উচ্চ সোপান হইতে জলে পড়িয়া গেল, মুহূর্ত্ত-কাল আমি স্তম্ভিত বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম তাহার পর আমিও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। কিন্তু—"

মৃণালিনী এই সময় সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "নাথ, আমি মরি নাই বাঁচিয়া আছি, যদি কেবল একবার তখন আজিকার এই কথা বলিতে!"

"তুমি—মায়া!"

"হ্যাঁ আমিই মায়া, তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই, আমি তোমাকে দেখিবা মাত্র চিনিয়াছিলাম। শশিবাবুই আমাকে বাঁচাইয়াছেন। তোমাকে পাইবার আশাতেই এই পাঁচ বৎসর বাঁচিয়া আছি। ছিঃ! এত দিন পরে কি কলিকাতায় আসিতে হয়!"

আমরা দুজনে দুজনের বাহু পার্শ্বে আবদ্ধ হইলাম। মায়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "আহা, আজ যদি বাবা থাকিতেন!"

নক্সা।

মিষ্টার "বি" পার্লেমেণ্টের একজন নূতন মেম্বর—(মহা চিন্তাযুক্ত হইয়া)। কই মিষ্টার 'এ' যে বল্লেন আজ যেমন করে হোক একটা লোক পাঠিয়ে দেবেন তা কই এখনো ত কেউ এলো না? পার্লেমেণ্টের সব মেম্বরদেরই প্রাইভেট্ সেক্রেটারি রয়েছে আমারও শীঘ্র না রাখলে ত চলছে না—শেষ কালে পাড়াগাঁয়ে ভূত বলে ঠাট্টা খেতে হবে!

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। হুজুর সিষ্টার 'এ' একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মিষ্টার 'বি।' (স্বগত) আঃ বাঁচা গেল—এখন লোকটা মনের মত হলে হয় (ভৃত্যের প্রতি) আসতে বল।

সেক্রেটারীর প্রবেশ।

মিষ্টার 'বি'। (তাহার প্রতি) এই যে এসেছেন! দেরি দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলুম।

সেক্রে। হাঁ আমার একটু দেরী হয়েছে বটে, আপনি এত ব্যস্ত হয়েছেন জানলে যেমন করেই হোক এর চেয়ে শীঘ্র আসতুম।

মিষ্টার বি। না, তা যাক—তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আজ থেকেই তুমি সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হলে। এখন আমার আর বড় সময় নেই কাল আবার Trade Question সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে বক্তৃতা দিতে হবে।

সেক্রে। কাল? তা হলে দেখচি মোটে সময় নেই। যাহক আমি যেমন করে পারি এক রকম করে ফেলব এখন,—আপনার কোন পক্ষে মত?

বি। (স্বগতঃ) যেমন করে পারি করে ফেলব! এ কথার অর্থ কি? কিছুই ত বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অর্থটা জিজ্ঞাসা করাও ত হতে পারে না, এখনি, বোকা বনে যাব! (প্রকাশ্যে) free trade এর পক্ষেই আমার মত।

সেক্রে। এখন তবে আসি।

[প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। আজ্ঞে সেক্রেটারী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!

বি। আচ্ছা পাঠিয়ে দাও। (স্বগত) আবার না জানি কি বলে! এখন শীঘ্র গেলে হয়। একটু যে মনটা স্থির করে বক্তৃতাটা লিখে ফেলব, তাও হয়ে উঠছে না—শেষ-কালে পার্লেমেণ্টে অপ্রস্তুত না হতে হয়।

সেক্রেটারীর কাগজ হস্তে প্রবেশ ও মিষ্টার 'বি'কে তাহা প্রদান—

বি। এ কি!

সেক্রে। আজ্ঞে আপনার বক্তৃতা।

বি। আমার বক্তৃতা!

সেক্রে। হ্যাঁ আপনি free trade সম্বন্ধে যে বলবেন—তাই লিখে এনেছি।

বি। (মহা ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি কি বলব তুমি তাই আমাকে শেখাবে? তুমি আমার গুরুমহাশয়! তোমার হুকুম মতে আমি চলব! বেরাও এখান থেকে!

সেক্রেটারী। (আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) বড় লোকদের কখন যে কি মর্জ্জি বুঝে উঠা ভার! কাল বল্লেন free trade পক্ষে লিখতে হবে আজ মহা চোট—এর মন জুগিয়ে চলা ভার! (প্রকাশ্য) আজ্ঞে তবে আমি অন্য রকম লিখে আনছি।

বি। অন্য রকম! বেরোও—নইলে আমারও অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে।

সেক্রেটারীর ত্রাস্তভাবে প্রস্থান।

মেঘদূত। *

উত্তর মেঘ।

দামিনী গৃহিণী তব, অলকার ললিত বনিতা
ইন্দ্র ধনু তব সাজ, পুরীও সে তেমনি সজ্জিতা—
এদিকে মৃদঙ্গ বাদ্য, তোমার সে সুগভীর ধ্বনি—
জলগর্ত্ত তুমি যথা, রত্নখনি অলকা তেমনি—
গগণ বিহারী তুমি, অভ্রভেদী গিরি সে মহান্;—
উভয়েই সমতুল—নাহি দেখি কিছু অসমান॥ ১

† হাতে হাতে লীলা পদ্ম, বালকুন্দ অলকে গাঁথন,
লোধ্রের পরাগ রাগে সুরঞ্জিত পাণ্ডুর আনন—
নব কুরুবক কেশে, কর্ণে দোলে শিরীস রতন,
বর্ষার কদম্বফুল সীমন্তে ধারয়ে বধূগণ॥ ২

* অনবধানবশত গত বারের মেঘদূতে গুটিকয়েক ছাপার ভুল হইয়া গিয়াছে, পাঠকেরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪ শ্লোক	৬ পংক্তি	রহে	রবে
২৬ শ্লোক	৪ পংক্তি	মৌবন	যৌবন
২৮ শ্লোক	১ পংক্তি	'ঘূর' কথাটি উঠিয়া যাইবে।	
ঐ	ঐ	চলে যেয়ো	চল যবে
ঐ	৩ পংক্তি	বিদ্যুন্নালা	বিদ্যুন্মালা
৩০ শ্লোক	১ পংক্তি	বেণীরপর (,) উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে (-) হইবে	
ঐ	৩ পংক্তি	তোমায়	তোমার
৩২ শ্লোক	২পংক্তি	পথ	পদ্ম
৩৩ শ্লোক	৩ পংক্তি	যেথা	কেকা
৩৪ "	২ "	কণ্ঠছবিগণে	কণ্ঠছবি, গণে
৩৬ "	৪ "	স্নেহে	স্নেহের
৩৮ "	২ "	নিশি দিশি	দিশি দিশি
৪৩ "	১ "	ধরা—নিঃশ্বাস	ধরা নিঃশ্বাস
৬০ "	২ "	ভিন্নাএজন সিন্ধ	ভিন্নাঞ্জন স্নিগ্ধ
৬২ "	৩ "	মনে	ঘনে

ভাং সং।

† নানা ঋতুর নানা ফুল একত্রিত।

তরু নিত্য ধরে ফুল, ভ্রমর গুঞ্জরি মধু লুটে,
হংস শ্রেণী চন্দ্রহার—সরোবরে নিত্য পদ্ম ফুটে—
কেকা কণ্ঠী গৃহশিখী নিতি নিতি কলাপ ফুলায়,
নিত্য জ্যোৎস্না হাসে সেথা, প্রভাময় প্রদোষ প্রভায় ॥ ৩

আনন্দের অশ্রুজল অন্য হেতু না হয় পতন,
ফুলশরে জন্মে তাপ—প্রিয়জন মিলনে দমন,—
প্রণয় কলহ ছাড়া নাহি অন্য বিচ্ছেদ কারণ,
বয়স নাহিক অন্য যক্ষকুলে কেবলি যৌবন ॥ ৪

গিয়ে যক্ষপান-ভূমি দেখিবে হে শুভ্র মণিময়,
তারকার প্রতিবিম্বে ফুলে ফুলে যেন ছেয়ে রয় ,—
ললিতা যুবতী সনে পিয়ে মধু নাম "রতিফল" *
মৃদঙ্গের উঠে রব, গরজন তব অবিকল ॥ ৫

মন্দাকিনী কণযুত বহে যায় মৃদু মন্দ বায়,
অমর প্রার্থিতা কন্যা তট তরু মন্দার ছায়ায়
কনক বালুকা মাঝে মুষ্টিযোগে দেয় মণি ফেলি
হারাধন খুঁজি পুন, করে যেথা "গুপ্তমণি" † কেলি ॥ ৬

তোর মত মেঘ উড়ে বিমান চূড়ায় পড়ে ঝুঁকি,
বায়ু সাথে চোর সম গবাক্ষ হইতে দেয় উঁকি—
নবজল কণে শেষে চিত্রাবলি কলুষিত করি,
সভয়ে পালায় যেন বাষ্পময় ছদ্মবেশ ধরি ॥ ৭

ধনপতি যশোগান গাহিবারে মিলিত কিন্নরী
ভুবন মোহন তান ছাড়ে যবে—সঙ্গীত লহরী—
মিলিয়া অপ্সরা সনে ক্রোড়পতি যক্ষ যুবাগণ
দলে দলে সেবে আসি চৈত্ররথ বহিরুপবন ॥ ৮

অলক হইতে খসে, গতিবশে, মন্দার নিচয়—
কনক কমল চ্ছেদ কর্ণ হতে পড়ে পথময়—
শিরোভূষা মুক্তাজাল, ছিন্ন সূত্র কণ্ঠ আভরণ,
কামিনীর নৈশমার্গ সূর্য্যোদয়ে করয়ে জ্ঞাপন ॥ ৯

* রতিফল নামক সুরা।
† গুপ্তমণি নামক এক প্রকার দৈনিক ক্রীড়া।

ধনপতি সখা তথা বিরাজেন সাক্ষাৎ শঙ্কর—
রতিপতি ভয়ে তাই না ধরেন নিজ ফুলশর—
কামিনী ভ্রূকুটিময় হানে যবে কটাক্ষের বাণ—
কি ছার মদন বাণ—অব্যর্থ গো তার সে সন্ধান ॥ ১০

নয়ন বিভ্রমকারী মধু নব, বিচিত্র বসন,
ফুল কিশলয় আদি রত্নকান্তি বিবিধ ভূষণ,
চরণ কমল শোভা, মনোলোভা, লাক্ষারস চারু,
অবলামণ্ডন যত প্রসবে তা এক কল্পতরু ॥ ১১

সেথায় সে গেহ মোর ধনপতি গৃহের উত্তর
দূর হতে দেখা যায় ইন্দ্রধনু-তোরণ সুন্দর—
শোভিছে উপান্তে যার সুতসম প্রিয়ার পালিত
তরুণ মন্দার তরু, গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ভারে নত ॥ ১২

মরকত শিলা দিয়ে বাঁধান সোপান বাপী তার
সুস্নিগ্ধ বৈদূর্য্যনাল বিকশিত হেমপদ্ম ভার—
প্রসন্ন সলিলে যার বিচরয়ে সুখে হংস হংসী,
তোমারেও দেখে তারা স্মরিবে না মানস সরসী ॥ ১৩

তার তীরে ইন্দ্রনীল মণি দিয়ে রচিত শিখর—
কনক-কদলী-ঘেরা ক্রীড়া-শৈল, কান্তি মনোহর—
গৃহিণীর প্রিয় ব'লে, সখা ওহে, তব দরশনে,
প্রান্তে তড়িতের আলো, সেই শৈল জাগি উঠে মনে ॥ ১৪

মাধবী মণ্ডপ সেথা, সুগঠন, করবি বেষ্টন,
কাছে তার সুশোভন অশোক বকুল দুটী বোন—
একটী আমার মত চাহে বাম পদের তাড়না,
প্রিয়ার বদন সুধা অন্যটির দোহদ কামনা ॥ ১৫

কাঞ্চনের বাস যষ্টি স্ফটিক ফলকা তার মাঝে
মণি বাঁধা মূলে যার কটি রেণু সমরুচি সাজে
দিবসান্তে গিয়া বসে নীলকণ্ঠ প্রিয়সখা তোর—
বলয় ঝঞ্কনী তানে নাচায় তাহায় প্রিয়া মোর ॥ ১৬

আমি যা বর্ণিনু সখা মনে রেখো সে সব লক্ষণ,
দ্বার দেশে শঙ্খ পদ্ম আঁকা আর জেনো নিদর্শন—
আমার বিয়োগে এবে ম্লান কান্তি ভবন নিশ্চয়—
ভানু যবে অস্তাচলে, এ কমলে সে শোভা কি রয় ? ১৭

ত্বরিত সম্পাত হেতু ধরি করী শাবকের কায়া,
ওই সে সুরম্য-সানু-ক্রীড়া শৈলে আরামে বসিয়া,
খদ্যোত প্রকাশ পারা মিটিমিটি পরকাশি পরে,
বিদ্যুৎ চাহনি দিয়ো চকমকি ভবন অন্তরে ॥ ১৮

তন্বী শ্যামা, সুদশনা, ওষ্ঠাধরে বিম্ব রহে ফুটি,
ক্ষীণ মধ্যা নিম্ন নাভী, চকিত হরিণী লাঁখি দুটি—
শ্রোণী ভার-মন্দ গতি স্তন ভারে ঈষত আনতা,
প্রথমা প্রমদা যেন সযতনে সৃজিলা বিধাতা ॥ ১৯

জেন তারে মিতভাষী দ্বিতীয় জীবিত সে আমার,
চক্রবাকী একাকিনী, দূরে ভ্রমে সহচর তার—
বিরহ বেদনা ঘোর, প্রিয়া মোর সহে নিরন্তর—
শিশির মথিতা বালা পদ্মিনীর যেন রূপান্তর ॥ ২০

কাঁদি কাঁদি নিশি দিন নেত্র ধারা বহে নিরন্তর
দারুণ নিশ্বাস দাহে দেখিবে বিবর্ণ ওষ্ঠাধর
সদা হাত মুখ পরে, লম্বালকে ঢাকা সে বয়ান,
বিষণ্ণ মলিন কান্তি মেঘাচ্ছন্ন ইন্দুর সমান ॥ ২১

হয়ত দেখিবে গিয়া প্রেয়সী সে পূজা বিধি রত,
নহেত বিরহ শীর্ণ তনু মোর চিত্রে মনোমত—
অথবা আদরে পুছে পিঞ্জরের পোষা পাখিটিরে
"সে যে তোরে ভাল বাসে, প্রভু তোর, মনে পড়ে কিরে ?" ॥ ২২

কোলে রাখি বীণা যেই প্রিয়া সেই মলিন বসনা—
আমার নামের গীত গাহিবারে প্রমুখ রসনা—
অশ্রুজলে ভেজে তন্ত্রী, তাও যদি মুছিয়া সারায়,
নিজের রচিত পদ পাগলিনী ভুলে ভুলে যায় ॥ ২৩

বিরহের বাকি মাস ফুল রাখি দেউড়ী উপরি,
কবে ফুরাইবে তাই গণিতেছে এক এক করি—
কিম্বা সহবাস মোর ভুঞ্জে সুখে রচি কল্পনায়
বিরহিনী কামিনীর এই সব বিনোদ উপায় ॥ ২৪

গৃহকাজে ব্যস্ত থেকে সহিবে না দিবসে সে তত
বিরহ যাতনা ঘোর, নির্বিনোদ রাত্রিকালে যত,
আমার সম্বাদ লয়ে শয্যাগৃহে বাতায়নে বসি
ভূ-শয়ানা নিদ্রাহীনা নিশি মাঝে ভেটিবে প্রেয়সী ? ২৫

এক পার্শ্বে লীনা, ক্ষীণা, সঙ্গীহীনা বিরহ শয়নে—
উদয় গিরির প্রান্তে শশিকলা হেন লয় মনে—
রঙ্গরসে মম পাশে যেই রাত্রি ক্ষণে উড়ে যায়,
বিরহ কষ্টেতে সেই দীর্ঘ যামা যামিনী কাটায় ? ২৬

মধুর জোছনা যবে গবাক্ষ হইতে দেখা দেয়,
চির পরিচিত ব'লে দৃষ্টি দিয়ে অমনি ফিরায়—
অশ্রু জলে রুদ্ধ আঁখি, মনোহর যেন সুনয়নী
আধো সুপ্তা আধ ফোটা মেঘলায় স্থল-কমলিনী ॥ ২৭

রুক্ষ স্নানে শুষ্ক আহা ! লম্বমান অলক শিখায়
অধর-পল্লব-শোধী নিদারুণ নিশ্বাসে উড়ায় ;
অবিরত চক্ষুজলে চখে যার নাহি অবকাশ
স্বপ্ন সহবাস আশে সে নিদ্রার ধরি রহে আশ ॥ ২৮

মালা ফেলি প্রথমে যে বেণী বাঁধে বিরহ দিবসে
সে বেণী খুলিব আমি হরষে পরশি শাপ শেষে—
বিষম কঠিন হায় ! কপোলেতে আসিয়া লুটায়
পর্শে কষ্ট ! অকর্ত্তিত নখকরে তবু সে সরায় ॥ ২৯

আভরণ শূন্য বালা, সহে জ্বালা অবলা অধীর,
শয্যাপরে পাশ ফিরে দুখে দুখে জর্জর শরীর—
নবজল অশ্রু ফোঁটা দেখে তারে ফেলিবে নিশ্চিত
স্বভাব কোমল যারা হয় তারা করুণার্দ্রচিত ॥ ৩০

আমারে যে ভালবাসে সখী তব জানি নিঃসংশয়,
প্রথম বিরহে তার এই দশা যেন মনে লয়—
নিজ ভাগ্য বিশ্বাসেতে ভেবনা এ বাচাল জল্পনা—
প্রত্যক্ষ দেখিবে গিয়া কহিনু যা সত্য কি কল্পনা ॥ ৩১

আটকে অলকজালে মৃগাক্ষীর অপাঙ্গ বিকাশ,
মধুপান বরজনে অনভ্যস্ত ভুরুর বিলাস
নয়ন অঞ্জন শূন্য, তুমি এলে তার সে স্পন্দন
মীনক্ষোভে সচঞ্চল কুবলয়-কম্পন-তুলন ॥ ৩২

গিয়ে যদি, জলধর, দেখ তারে নিদ্রায় নিঝুম,
গর্জন থামায়ে থেক একদণ্ড ভেঙ্গনা সে ঘুম—
স্বপনে লভয়ে যেই প্রণয়ীর গাঢ় আলিঙ্গন
কণ্ঠচ্যুত নাহি হয় সদ্য যেন সে ভুজ বন্ধন ॥ ৩৩

নবজল কণা পেয়ে সমাশ্বস্ত মালতী যেমতি,
অতঃপর জাগাইয়ে সমাশ্বাসি প্রিয়ারে তেমতি—
স্তিমিত নয়নে যবে চাহিবে সে গবাক্ষের পানে
আরম্ভিবে কথা মোর ধীরে ধীরে স্তনিত বচনে ॥ ৩৪

"পতির পরম সখা, অবিধবে, আমি জলধর,
"তার শুভ বার্ত্তা লয়ে তোমা কাছে এসেছি সত্বর—
"পথশ্রান্ত প্রবাসীরা করে ত্বরা আমারি তাড়নে,
"সমুৎসুক শুনি ধ্বনি প্রিয়া বেণী বন্ধন মোচনে ॥"৩৫

জানকী উন্মুখী যথা, কহে কথা মারুতী যখন,
তোমার বচনে তথা, ভাবনায় বিচলিত মন
সে সব কাহিনী তব শুনিবে সে অবহিতা হয়ে—
বন্ধুমুখে কান্ত-বার্ত্তা কিছু কম মিলনের চেয়ে ॥ ৩৬

কহিবে আমার হয়ে মানি তথা আত্ম উপকার
"রামগিরি আশ্রমেতে করে বাস পতি সে তোমার,
"বেঁচে আছে এখনো সে দূর হতে জিজ্ঞাসে কুশল—
"প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, প্রাণীমাত্র বিপদ বিহ্বল ॥ ৩৭

"কৃশাঙ্গ সুতনু অঙ্গ, গাঢ়তপ্ত তাপিত সে জন—
"উৎকণ্ঠা উভয়ে দহে, অশ্রুজলে অশ্রুর মিলন—
"নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশে কল্পনায় হয় একাকার—
"যদিও বিধির পাকে ছাড়াছাড়ি সদা দুজনার ॥ ৩৮

"যে কথা সহজ ভাবে বলা যায় সখী বিদ্যমানে
"লোভি যে অধর সুধা কহিতে চাহিত কাণে কাণে,
"শ্রবণ পথের দূর নয়নের অতীত এখন
"উৎকণ্ঠা রচিত পদ মম মুখে করেছে প্রেরণ ॥" ৩৯

'লতিকায় অঙ্গ তব, হরিণী নয়নে দৃষ্টি ভাস,
'মুখকান্তি শশি পরে, শিখি পুচ্ছে তব কেশ পাশ
'সুতনু নদীর স্রোতে দেখি গিয়া তব ভ্রূবিলাস
'কিছুতে সাদৃশ্য নাই খুঁজে খুঁজে মরি হা হতাশ ! ৪০

'রচিয়ে তোমার ছবি ধাতুরাগে শিলায় চিত্রিত,
'আপনারে করি যেই মানিনীর চরণে পতিত—
'অমনি আসিয়ে অশ্রু করে মম দৃষ্টি আবরণ—
কৃতান্ত এমনি ক্রূর তাতেও সে না সহে মিলন ॥ ৪১

'বহু কষ্টে প্রিয়ে মোর পেয়ে তোর স্বপন দর্শন,
'আকাশে তুলেছি হাত দিতে গিয়ে গাঢ় আলিঙ্গন—
'দেখি তাই বল্ ভাই দয়াশীলা বন-দেবতারা
'ফেলিবে না কি কাতরা মুক্তাস্থূল অশ্রু বারিধারা ॥ ৪২

'এই যে শীতলস্পর্শ দেবদারু-রস গন্ধশীল—
'তরুলতা হেলাইয়ে বহিতেছে মলয় অনিল—
'তুষারার্দ্রি বায়ু এই ঘন ঘন করি আলিঙ্গন,
'এই দিকে আসে যদি ও মুখানি করিয়ে চুম্বন ॥ ৪৩

'সুদীর্ঘা প্রহরা রাত্রি কিসে কাটে পলকের প্রায়
'আতপের তাপ মন্দি দিনমণি কবে অস্ত যায়—
'এসব আমার সাধ, জানি বৃথা অরণ্যে রোদন—
'অঘোর বিরহানলে দহি শুধু হয়ে অশরণ ॥ ৪৪

'আপনি জীবন ধরি আপনায় করিয়ে নির্ভর্
'তুমি ও কল্যাণি, শোকে হয়ো না গো নিতান্ত কাতর—
'কেহ বা অত্যন্ত সুখী, কেহ দুঃখ সহে বা বিষম,
'কভু উচ্চে কভু নীচে ভাগ্য ফেরে চক্র-নেমী ক্রম ॥ ৪৫

'শাপ শেষ, শেষ শয্যা হতে যবে বিষ্ণুর উত্থান,
'কাটাও চারিটী মাস কোন মতে মিলিয়ে নয়ান—
'এত দিন মনে মনে গোণা গাঁথা যত অভিলাষ
'জ্যোছনায় দোঁহে মিলি বলি বলি মিটাইব আশ' ॥ ৪৬

"আরো কহে 'একদিন কণ্ঠলগ্ন শয়নে যখন
'সহসা জাগিয়া ওঠ নিদ্রামাঝে করিয়া ক্রন্দন—
'বার বার জিজ্ঞাসায় বল শেষে হাসি মনে মনে
'অন্য রমণীর প্রেমে বাঁধা তুমি দেখুনি স্বপনে' ॥ ৪৭

"কুশলার্থী আমি তব জেনো মোরে এই অভিজ্ঞানে,
"অবিশ্বাস করো না গো মোর কথা জনশ্রুতি শুনে—
"বিরহ স্নেহের শত্রু লোকে বলে—নহে তা বস্তুতঃ—
"বিরহে বাড়ায়ে তৃষা স্নেহ হয় প্রেমে উজলিত ॥" ৪৮

আশ্বাসি সখীরে হেন বিরহ ব্যথায় জর জর,
শঙ্কর-বৃষভ-ক্ষত শৈল হতে ফিরিয়া সত্বর—
কুশল বারতা তার নিয়ে এসে সহ অভিজ্ঞান,
প্রাতঃ কুন্দ সম খিন্ন রেখো মোর শিথিল পরাণ ॥ ৪৯

এই মম বন্ধু কৃত্য সাধিবে কি তোমারে সুধাই—
অনিচ্ছা ভাবিনা তাহে যদিও হে উত্তর না পাই,
নিঃশব্দ হয়েও তুমি চাতকেরে কর জল দান—
* সতের প্রতি বচন মুখে নহে কাজে সপ্রমাণ ॥ ৫০

---

* গর্জতি শরদি ন বর্ষতি বর্ষতি বর্ষাসু নিঃস্বনো মেঘঃ
নীচো বদতি ন কুরুতে ন বদতি সুজনঃ করোত্যেব।
শরতে গর্জন সার না করে বর্ষণ
বর্ষায় বরষে ঘন হইয়ে নিঃস্বন
মুখেই মুখর নীচ, কাজে কিছু নন,
মুখে নহে কাজে সব মহত যে জন।

সৌহার্দ্দ ভাবেই বল, রাখি কিম্বা কাতরে করুণা
সাধি কাজ প্রিয় মোর (অনুচিত এ মম প্রার্থনা)—
বর্ষায় ধরিয়া শোভা দেশে দেশে বিচর অখেদ
ক্ষণমাত্র তব সখা নাহি হোক দামিনী বিচ্ছেদ ॥ ৫১ *

ইতি উত্তর মেঘ সমাপ্ত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতি-মন্দিরে।

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ—প্রথম প্রহর বেলা—
ছোট ছোট ঢেউগুলি জাহ্নবীতে করে খেলা,
কোমল রবির কর, মৃদু বহে সমীরণ—
ধাইছে গঙ্গার স্নানে, নরনারী অগণন।
পবিত্র শ্মশান ক্ষেত্রে—পূত ভাগিরথী তীরে
জ্বলিল "সাগর"-চিতা, মন্দ মন্দ—ধীরে ধীরে;
চন্দন কাষ্ঠের গন্ধ দিগন্তে বহিয়ে যায়
সমাগত শতকণ্ঠে শব্দ শুধু "হায় হায়"!
ক্রমেতে উঠিল শিখা, ফেলিল, আকাশ ছেয়ে—
ওই ও চিতার মাঝে, কল্পনা গো! দেখ চেয়ে—

---

* বিগত শ্রাবণ মাসের মেঘদূতে আরো কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬ শ্লোক ১ চরণ	লভিয়ে	লভিবে
২৭ " ২ "	বনজল	নবজল
২৮ " ১ "	চলে যেয়ো	যাইবারে
৪১ " ১ "	পশিবে	পশিলে
" " ৩ "	শফরী কটাক্ষবান	শফরী-কটাক্ষবাণ
৪২ " ২ "	বিদায়ের কালে লয়ে	বিদায় সময়ে লয়ে
৪৮ " ৩ "	উন্মেসি	উন্মেষি

জ্বলন্ত অনল গর্ভে ঘনীভূত অগ্নি-প্রায়
"সাগরে" করিয়ে কোলে কে রমণী বোসে হায়!
পরিধানে পট্টসাড়ী শঙ্খ খাড়ু দুটী হাতে
সীমন্তে সিঁদূর রাশি (তরুণ-অরুণ-প্রাতে)
মহান্ প্রশান্ত মূর্ত্তি, আঁখিদুটী শুকতারা—
অতি ধীরে গণ্ড দিয়ে বহিতেছে অশ্রুধারা
কহিছেন মৃদুকণ্ঠে চুম্বিয়ে "সাগর"-মুখ—
"এরি মধ্যে, বৎস, তোর ফুরাল সংসার সুখ?
এখনো যে অন্নাভাবে দরিদ্র হোতেছে সারা
বঙ্গের বিধবা বালা অযত্নে যেতেছে মারা,
কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি এখনো চৌদিকে ওঠে
এখনো যে তপ্ত ধারা শত চক্ষু দিয়ে ছোটে
এখনো দয়ার ব্রত হয়নি তো উদ্‌যাপন
অকালে আহুতি তবে কেন দিলি এ জীবন!"
কহিতে কহিতে দেবী ছাড়িলেন দীর্ঘশ্বাস
মেদিনীর মজ্জা যেন হোলো তাহে ভস্মরাস!
ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাপিত হোয়ে আসে চিতানল
দ্বিগুণ উথলি পড়ে দিগঙ্গণা-অশ্রুজল।
সাগরের মর্ত্ত্যকায়া চিতাসাৎ হোলে পরে
প্রকাশিল সূক্ষ্মদেহ, গঠিত অরুণ-করে!
প্রশস্ত ললাট সেই—সেই হাসী মাখা মুখ
দয়াতে আপ্লুত আঁখি, সেই সে নিটোল বুক;
অথচ চেতনা নাই, শয়ান মায়ের কোলে,
দিগঙ্গনা আকুলিত "তোলো তোলো তোলো" বোলে,
"ধন্য দেবী ভগবতী, ধন্য তব সুসন্তান
সাগরে ত্রিদিবে এনে কর তাঁরে প্রাণদান।"

* * * * *

* * * *

কত শত গিরিরাজি—গিরি-শৃঙ্গ দূরে রাখি
কত গ্রহ, উপগ্রহ বিমল কিরণে ঢাকি
তারও ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে, যেথা হোতে দেখা যায়
নিম্ন শূন্যে শনৈশ্চর আলোক বিন্দুর প্রায়

তাও অতিক্রমি দেবী, গগণ-নিলীমা-পারে
পশিলা সন্তানে লোয়ে ত্রিদিবের সিংহদ্বারে।
সুখের স্বপন দিয়ে গঠিত এ সুরঃপুর
ঘুমো ঘুমো স্নিগ্ধ বায়ু বহে হেথা সুমধুর,
মোহময় জ্যোছনাতে পরিপ্লুত চারিধার
বিরহে-মিলন শ্বাসে পুষ্পিত-নিকুঞ্জ তার,
ঢল ঢল পারিজাত পরিমল করে দান
শৈশব স্মৃতির মত গুঞ্জিত অপ্সরা-গান,
এই সেই মোহময় স্বপ্নময়, কুঞ্জবনে
প্রবেশিলা ভগবতী আপন সন্তান সনে।
অদূরে অশোক মূলে নিরখিলা ভগবতী
শ্রীহীনা মলিনা অতি দাঁড়াইয়া স্বরস্বতী
অগ্রসরি বীণাপাণি কহিলা কাতর স্বরে—
"পদ্মাসন ছেড়ে আজি এসেছি সাগর-তরে;
উঠ তবে উঠ বৎস! শান্তি বারি দেই তোরে।
ছাড়ায়েছ মর্ত্ত্যসীমা—আরো কেন ঘুম ঘোরে?
বীরসিংহ গ্রামে যবে উজলিলি মাতৃকোল
শৈশব সাগর মাত্র-ফুটেনি মুখের বোল,
আপনি প্রকৃতি দেবী আদেশ করিলা মোরে
প্রতিভার অগ্নি জ্বালি আশীষ করিতে তোরে,
বিংশতি বরষ তোর তাই না হইতে পার
পুরাণ দর্শন কাব্যে পূর্ণ হোল অধিকার,
দীন হীন বঙ্গ ভাষা অনাদরে নিরাধারে
পরিত্যক্ত ভ্রূণ-সম পোড়েছিল পথ-ধারে
তুই তারে সযতনে পালিলি জনক-প্রায়
আজি তার কিবা স্ফূর্ত্তি যৌবনের সুষমায়,
গোলোক বৈকুণ্ঠে বৎস নহে তোর যোগ্যস্থান
তাপস তপস্যা-বলে হয় সেথা অধিষ্ঠান!
তাপস তো স্বার্থপর, নিজেরি মঙ্গল তরে
করে ধর্ম্ম, করে পূণ্য, সহে কষ্ট অকাতরে,
তুই যে রে স্বার্থ-শূন্য নিষ্কাম মহান্ প্রাণ
সদাব্রত ব্রতধারী অনাথা আশ্রয়স্থান।

আয় তবে আমা সাথে সেই সে চরম স্থান
শূন্যপরে মহাশূন্যে আছে যাহা বিদ্যমান,
পরমা প্রকৃতি যিনি—আদ্যাশক্তি নাম যাঁর
সেই সে শূন্যের কেন্দ্রে বিরাজে মন্দির তাঁর!

* * * * *

সাগরে লইয়া শূন্যে উঠিলেন বীণাপাণি
জ্বলন্ত উল্কার মত ঝলসিত দেহখানি
কোথা সৌর পরিবার—দূর নিম্নে মিশে যায়
সপ্তর্ষিমণ্ডল দূরে নিভ' নিভ' দীপপ্রায়
উদ্‌ভ্রান্ত ধূমকেতু দিগন্তে ছুটিয়া যায়
কোনটী বা এসে পড়ে লুটিয়ে দেবীর পায়।
সর্ব্বলোক অতিক্রমি, ঊর্দ্ধে গেলা সরস্বতী
যেথানে বিরাজমানা আপনি প্রকৃতি সতী।
আহা কি শান্তির রাজ্য—সমভাব সর্ব্ব ঠাঁই—
সুশুভ্র স্ফটিকময়, বর্ণের বৈচিত্র নাই,
নাহি হেথা ভেদাভেদ, গুণত্রয় একাকার
রবি শশী নাহি হেথা নাহি হেথা অন্ধকার,
আনন্দ জ্যোতিতে শুধু আলোকিত দিব্যস্থান
আনন্দে আনন্দময়ী হেথায় বিরাজমান!
"জাগো মহামায়া মা গো, করি পদে নমস্কার
সাগরে এনেছি দিতে শ্রীচরণে উপহার!"
কহিলেন সরস্বতী—সাগরের সূক্ষ্মকায়
ভেদিয়ে, চৈতন্য জ্যোতি চৌদিকে উছলি তায়
একটী আনন্দ-রশ্মি, প্রকৃতির পদ হোতে
প্রসারিত হোয়ে এল' সুদীপ্ত সাগরে লোতে,
আলো যথা আলো সঙ্গে মিশে যায় সম্মিলনে
মিশিল সাগর-তেজ প্রকৃতির তেজ-সনে
উঠিল ত্রিদিব হোতে কোলাহল ঘোর অতি
"ধন্য হে সাগর তুমি, ধন্য দেবী ভগবতি!"

বুদ্ধিবিকাশ।

"If we philosophise, we must philosophise; if we must not philosophise we must philosophise; in any case, therefore, we must philosophise."—Aristotle.

"Philosophy is inherent in man's nature. It is not a caprice, it is not a plaything,—it is a necessity; for our life is a mystery, surrounded with mysteries, we live encompassed by wonder. The myriad aspects of nature *without*, the strange fluctuations of feelings *within*, all demand from us an explanation. G. H. Lewes.

চৈতন্য (Consciousness) জীবধর্ম্ম। উদ্ভিদের কি জীবন নাই? বিজ্ঞানে কি বলে? আছে; সত্য। তবে তাহাদেরও কি চৈতন্য আছে? কেহ কেহ স্বীকার করেন বটে; কিন্তু অনেকেই স্বীকার করেন না। আপাততঃ ততদূর সূক্ষ্ম করিবার আবশ্যক নাই। ফলে, উচ্চতর জীব-ধর্ম্ম বলিলে আর দ্বন্দ্ব থাকে না। চৈতন্য সকল জ্ঞানেরই মূল। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য আমাদের উপলব্ধি নাই। ইহা জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত, চিন্তাতীত; সুতরাং অনুধাবন করা বৃথা। যাহার প্রত্যক্ষ নাই, অনুমান নাই, কল্পনা নাই, তাহার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া বাদানুবাদ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং চেতন পদার্থকে জীবতত্ত্বে মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করাই সঙ্গত। তাহার অন্তস্তলে যাইবার প্রয়াস পাওয়া দুরাশা মাত্র। জড়ধর্ম্মে চৈতন্য আরোপ করা যে প্রকার অপ্রশস্ত, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের পৃথক সত্তা কল্পনা করাও সেই প্রকার। অভেদ্যকে ভেদ করিবার প্রয়াস পাওয়া শ্রমের অপচয় মাত্র। সুতরাং জড়বাদী ও আত্মবাদী উভয়েই আকাশ কুসুমের অন্বেষণে বিব্রত। তাই শরীরী চৈতন্যে বিজ্ঞানদর্শনের ভিত্তি সংস্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দেহাতিরিক্ত চৈতন্য অস্বীকার করাও মূঢ়ের কর্ম্ম। মতিমান লোকে এ বিষয়ে 'হাঁ' বা 'না' বলিতে সাহস করেন না; এবং কি সঙ্গতিতেই বা সাহস করিবেন? তিনি বলিবেন 'আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, সামান্য শক্তিতে, সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে এবং অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে একথার মীমাংসা হইতে পারে না; ইহা আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। অপিচ চৈতন্য জড়ের গুণেই হউক, বা শরীরধর্ম্মই হউক, বা কোন দেহাতিরিক্ত স্বরূপ সত্তাই হউক, দেহভুক্ত চৈতন্য সর্ব্ববাদী সম্মত। ইহার আর বাদবিসম্বাদ নাই। চেতন পদার্থের চৈতন্য কে অস্বীকার করিবে? তাই চৈতন্যকে জীব-ধর্ম্ম বলিলাম।

চৈতন্যও উচ্চতম জীব-ধর্ম্ম নহে। ইহা উচ্চতর জীবের নিম্নতর ধর্ম্ম। কীটাণুকীটের চৈতন্য আছে, মনুষ্যেরও চৈতন্য আছে; কিন্তু মনুষ্যের যাহা আছে তাহা আর কোন জীবেরই নাই। সুতরাং চৈতন্য উচ্চতম জীব-ধর্ম্ম নহে। যখন মূর্চ্ছিত লোক ক্রমে সংজ্ঞা পাইতে থাকে, তাহার সেই বাহ্য অনুভূতি চৈতন্যের লক্ষণ। চৈতন্য আত্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী

নহে। শুদ্ধ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা তজ্জনিত অনুভূতাবস্থার নাম চেতনাবস্থা। মূর্চ্ছিত ব্যক্তির চৈতন্য হইতেছে; অর্থাৎ, তিনি ডাকিলে শুনিতেছেন, চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছেন, স্পর্শ করিলে অনুভব করিতেছেন; কিন্তু তখনও তাঁহার কতকটা অবসন্ন, আঁধার, অস্পষ্ট ভাব; তখনও তাঁহার পূর্ণ আত্মজ্ঞান হয় নাই। এইরূপ অসংলগ্ন অনুভূতির সমষ্টির নাম চৈতন্য। ইহা সকল জ্ঞানেরই মূল। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের এই উৎপত্তি ও অবধি। মনুষ্যের ধীশক্তি উচ্চতম ব্যাপার। ইহা প্রকৃত জ্ঞানের বিশিষ্ট সোপান ও চরম সীমা। ফলে চৈতন্য পরিপুষ্ট হইয়া বুদ্ধির আয়তন পাইয়াছে, কি না, বলিতে পারি না। অনেক তত্ত্ববিৎ লোকে একথা স্বীকার করেন বটে। বিশেষতঃ পরিণতিবাদে তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ততদূর যাইতে সাহস পাই না। ডার্বিণ, হেকল, হক্‌সলি, স্পেন্সর, রোমানিস্ প্রভৃতি তত্ত্ববিদেরা যে সকল প্রমাণ দর্শাইয়াছেন তাহা এখনও সম্পূর্ণ প্রতীতকর বা নিতান্ত স্বচ্ছ নহে। এখনও তাহা প্রকৃত সত্যতত্ত্বে উপনীত হয় নাই। তাই বলি চৈতন্যের পরিণাম বুদ্ধি, কি না, জানি না—বলিতে পারি না। ফলে বুদ্ধির অধস্তলে চৈতন্য আছে যে, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। নিম্নতম জীবের শুদ্ধ চৈতন্য আছে; বুদ্ধির প্রমাণ নাই। উচ্চতর জীবের চৈতন্য ও বুদ্ধি আছে। বোধ হয় ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত কথা। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের জ্ঞাত হইতে জ্ঞেয় ও অজ্ঞাত তত্ত্বে আরোহণ করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, বুদ্ধিবিকাশের অগ্রে চৈতন্য (Consciousness) সর্ব্ববাদী সম্মত তত্ত্ব। আপাততঃ একথা এখানে স্থগিত থাক। সময়ান্তরে বা স্থানান্তরে বিবৃত করিব। এক্ষণে এই অবধি সিদ্ধান্ত হইল যে বুদ্ধি যেখানে আছে, চৈতন্য সেখানে অবশ্যম্ভাবী এবং চৈতন্য যেখানে আছে বুদ্ধি সেখানে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয় না। চৈতন্য পৃথক দেখা যায়, বুদ্ধি পৃথক দেখা যায় না। এস্থলে এতদতিরক্ত কোন কথাই স্বীকার করা গেল না।

জীবন হইতে চৈতন্য ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আমরা সর্ব্ববাদী সম্মত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবিকাশের সোপানাবলি সাধ্যমত আলোচনা করিব। বুদ্ধি চৈতন্যের উচ্চমাত্রা কি না, তাহা বলিতে চাহি না; তবে বুদ্ধিজীবীর চৈতন্য অবশ্যম্ভাবী। কেহ কেহ বৃক্ষলতাদির ইচ্ছা ও চৈতন্য স্বীকার করেন। আমাদের এক্ষণে সে কথার প্রয়োজন নাই। আমরা মনুষ্য বুদ্ধির আলোচনা করিব। সুতরাং যেমন যেমন দেখি তেমন তেমন দেখিব। চৈতন্য (Consciousness) বা অনুভূতি আত্মজ্ঞান হইতে পৃথক। চৈতন্যে অহং নাহং এর স্ফূর্ত্তি নাই। আত্মজ্ঞান (Self-consciousness) দ্বিরাত্মক। ইহার দুইটী উপাদান আছে। দার্শনিকেরা তাহার একটীকে 'অহং', 'মন', 'বিষয়ী', 'অন্তর্জগৎ', ইত্যাদি বলিয়া ব্যক্ত করেন। অপরটীকে 'নাহং', 'জড়', 'বিষয়', বহির্জগৎ', প্রভৃতি বলিয়া থাকেন। চলিত কথায় ভিতর বাহির বলা যায়। আত্মজ্ঞান এ দুইটী জ্ঞানের মিশ্রণ। এই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের অনন্ত লীলার সমষ্টির নাম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ফলে উহা নিখিল সংসারের পূর্ণাবয়বী মূর্ত্তি নহে। কারণ জ্ঞানের অনন্তপ্রবাহ ক্রমে

পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সুতরাং উক্ত দ্বৈতমূর্ত্তি বিশ্বব্যাপারের আভাস বলিতে হইবে। অবস্থাভেদে, জ্ঞানভেদে উহার সীমা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, ইচ্ছা, লোভ, ক্ষোভ, চিন্তা, ভাবনা, প্রভৃতি অহংগত ব্যাপার; বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী, পর্ব্বত, মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, সমুদ্র, প্রভৃতি নাহংগত। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের কোন জ্ঞানই নাই। এই অহং নাহং এর সংঘর্ষণে সত্যের উৎপত্তি এবং স্ফূর্ত্তি। এতদুভয়ের সম্মিলনী রেখার নামই সত্য। সেই রেখাগুলির পূর্ণতায় সত্যের পূর্ণতা, বুদ্ধিতে সত্যের বৃদ্ধি, পারিপাট্যে সত্যের পারিপাট্য, প্রচ্ছন্নতায় সত্যের প্রচ্ছন্নতা, অবসাদে সত্যের অবসাদ হইয়া থাকে। এজন্য সত্যের প্রায়ই আংশিক প্রকাশ দেখা যায়; পূর্ণসত্য সংখ্যায় অতি সামান্য। জাগতিক অস্তিত্বের মত সত্যও আমাদিগের ধারণায় আপেক্ষিক ও সাম্বন্ধিক ব্যাপার। সত্যের স্বতন্ত্র, স্বাবলম্ব, স্বরূপ, সনাতন অদ্বৈত ভাব আমাদের মনে আইসে না।

এক্ষণে বিশ্বব্যাপারকে এরূপ অহং এবং নাহং-এ বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, কি না, দেখা আবশ্যক। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে দার্শনিকগণ এই বিভক্তির নিতান্ত সম্প্রীতি দেখাইয়াছেন। আর্য্যঋষিগণ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। যিনি এ প্রকার বিভাগের বিরোধী তিনিও অহং নাহং সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কারণ ভাগের দোষ থাকিলেও অহং নাহং দর্শনের প্রাণ। অহং, বিষয়ী, সত্ত্ববান্ চৈতন্য একই পদার্থ। নাহং উক্ত নির্দ্দিষ্ট সত্ত্ববান্ চৈতন্যের গোচর সম্বন্ধে কোন চেতন, অচেতন বা উদ্ভিদ্ বুঝায়। দৃষ্টবস্তু এবং দৃশ্যবান্ জীবই নাহং এবং অহং-এর পদবাচ্য। দুইজন মানুষ পরস্পর দুইজনের সম্মুখীন আছে; দুইজনই দুই জনকে নিরীক্ষণ করিতেছে; দুইজনই স্বত্ত্ববান চৈতন্য, এস্থলে দুইজনই দুইজন সম্বন্ধে অহং; দুই জনই দুই জনের গোচর সম্বন্ধে নাহং। যিনি যাঁহাকে অনুভব করিতেছেন, তিনি অনুভূত সম্বন্ধে অহং; যিনি যাঁহার অনুভূত হইতেছেন, তিনি গোচর সম্বন্ধে নাহং এইরূপে নাহং ও অহং-এর সঙ্গতি। অহংও অহং সম্বন্ধে নাহং হইতে পারে। আপনাকে আপনি চিন্তা করিলে অহং দ্বিধা হইয়া অহং এবং নাহং এই দুই ভাব বা পদবী অধিকার করে। তবে নাহং এবং অহং এই দ্বিবিধ জ্ঞানের প্রকৃত পার্থক্য কোথায়? যখন অহং এ নাহং সঙ্গত হইতে পারে তখন এ প্রকার জ্ঞানের বিভাগ নির্দ্দোষ হইতেছে না। দৃষ্ট মানুষ আর দেখিতেছে যে মানুষ, এতদুভয়ের অহং জ্ঞান স্বতন্ত্র; সত্য কিন্তু আমার আমি চিন্তায় নাহং হইতে পারে? স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতির সাহায্যে হইয়া থাকে। দৃষ্টমানুষ ও দৃশ্যবান্ মানুষ পৃথক্—স্বতন্ত্র—একাত্মিক নহে; দুইজনে সাদৃশ্য আছে, পার্থক্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যখন অহং বিষয় ও বিষয়ী দ্বিবিধ সত্ত্বায় সত্ত্ববান হইতেছে তখন জ্ঞানকে অহং নাহং-এ বিভক্ত করা প্রশস্ত নহে। আমার অহং অনুভূতি, তোমার অহং আমার সম্বন্ধে অনুমিতি, কেননা তাহা তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনুমান করা মাত্র; সুতরাং এস্থলে বিশেষ গোল

না হইতে পারে। কিন্তু অহং-এ দ্বিবিধ সত্তা কি প্রকারে সম্ভবে? মনুষ্য মনের সেই শক্তি আছে। মানুষ স্বচৈতন্য বা আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট। একথা পরে বিবৃত করিব। সুতরাং অহং এবং নাহং-এ জাগতিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত নহে।

আমাদিগের দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের উপলব্ধি নাই। জড়প্রকৃতিরও চৈতন্য দেখিতে পাই না। সুতরাং অশরীরী চৈতন্য অনুসরণ করা এবং জড়ের সংশ্লেষে চৈতন্যের অনুমান করা একজাতীয় চিন্তা। বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা এবং চৈতন্যের স্বরূপ, চিন্তায় ফল সমান। দেহাতিরিক্ত আত্মা, বস্তুর স্বরূপ, নির্গুণ সত্তা, জড়ের জীবন প্রভৃতির কল্পনা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা। ইহা আর বিশেষ যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই; আর আবশ্যক হইলেও এস্থলে কোন প্রয়োজন নাই। আমরা সর্ব্ববাদীসম্মত পথে সত্যের অনুসরণ করিব। বিশদবুদ্ধি মহাত্মা কোঁত প্রত্যক্ষ ভূধরে পদ রাখিয়া পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যাখ্যা করিতে জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আদি কারণের দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া দৃশ্যের (Phenomena) সাদৃশ্য, সমবায়ত্ব, পারম্পার্য্য, প্রভৃতি নানা প্রকার সম্বন্ধ লইয়া চিন্তা জ্যোৎস্নায় জগৎ ভাসাইয়াছেন। বস্তু মাত্রই যেমন প্রত্যক্ষ হইবে তাহার নির্গুণ সত্তাদি না ভাবিয়া অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। বস্তু যেমন প্রত্যক্ষ হইল তাহাকে তদনুরূপ ভাব আর নাই ভাব, তাহার নির্গুণ সত্তা থাক আর নাই থাক, তাহা তদনুরূপ হউক আর নাই হউক, জ্ঞান পক্ষে, বিজ্ঞান পক্ষে তাহার অপর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ এবং তাহার ঘটনা প্রণালীই আবশ্যক। চিন্তারাজ্যে এই সকল সম্বন্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাই বিধেয়। প্রত্যক্ষীভূত জল মায়া কি না, উহার স্বরূপ কি, উহা যেমন প্রত্যক্ষ হইতেছে তদনুরূপ কি না, উহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ অপসৃত করিলে কি থাকে, ইত্যাদি জানিবার আমাদের শক্তিও নাই ফলও নাই। সুতরাং উহা বিশ্লেষ করিলে কি পাই, সংশ্লেষ করিবার সময় কি চাই; উহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, উহাকে কসিয়া প্রায় সংকীর্ণ করা যায় না, তাপে উহা বাষ্প হয়, সেই বাষ্পের এতদূর শক্তি যে তাহাতে কৌশল ক্রমে লৌহ শকটে পরিচালিত হয়, উহাতে কতক পরিমাণে তাপ দেওয়া যায়, ইত্যাদি জ্ঞানই সম্ভব ও আবশ্যক। নতুবা বস্তুর নির্গুণ সত্তাও আত্মার উপকথা লইয়া বৃথা কালক্ষেপ করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অবস্তুর আলোচনায় অজস্র কথার ছটায় মস্তিষ্ক সঞ্চালনে বুদ্ধির অপচয় হয় বলিতে হইবে। যাহার জ্ঞান নাই, ধ্যান নাই, ইঙ্গিৎ নাই, আভাস নাই, ভাব নাই, কোন অপরিস্ফুট, চঞ্চল ছায়াবৎ কল্পনাও নাই; যাহা অনুসরণে ইন্দ্রিয়াবস্থাপন্নের কোন শক্তিই নাই, ক্ষীণবুদ্ধি ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অনুমানজীবী মনুষ্যের জানিবার উপায় নাই, তাহার আলোচনা শুদ্ধ কথার আলোচনা মাত্র। সে তর্ক কুতর্ক। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা আর সে অসাধ্য সাধনে প্রয়াস পান না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সে প্রকার তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালীকে নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তবে দেহাতিরিক্ত

চৈতন্য এবং বস্তুর অতীন্দ্র সত্তা লইয়া আবহমানকাল মহা আড়ম্বর ও বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে কেন? তত্ত্বমার্গে এ প্রকার চিন্তা অবস্থা-বিশেষে অপরিহার্য্য। বিজ্ঞানদর্শনের বাল্যাবস্থায় ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহা জ্ঞানোন্নতির একটী বিশিষ্ট সোপান। বুদ্ধিবিকাশের একটী প্রধান ক্রম।

অহং এবং নাহং-এর প্রাধান্য লইয়া আবহমানকাল মহা দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। জড়-বাদীরা নাহং-এর মৌলিকতা অঙ্গীকার করেন। আধ্যাত্মিকেরা অহংকে অগ্রসরে রাখিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বলেন অহংই বিশ্বসংসারের মূল এবং ইহাই সকল জ্ঞানের ও পদার্থের পূর্ব্বতন কারণ। অহং-এর সম্প্রসারণেই নাহং। কেহ কেহ অহং এবং নাহং-এর পার্থক্য স্বীকার করিয়াও সত্য ও জ্ঞানের মূল অহংজনিত স্বীকার করেন। যাহা হউক, দর্শন শাস্ত্র মাত্রই অহং ও নাহং-এর পক্ষপাতী। ফলে স্থূলতঃ তত্ত্বসমুদ্রে এই দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী মত আছে। মায়াবাদীরা আবার অহং-এর বেগে আত্মহারা হইয়া অহং-এর স্বপ্নে নাহং প্রতিপন্ন করেন। অদ্বৈতবাদীর ভ্রান্তি পদে পদে। বিজ্ঞান যেমন দেখে তেমনি বলে, সুতরাং প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদী। জগতের জড়শক্তিময় ভাবই যুক্তি। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য, বস্তুর অতীন্দ্র সত্তা, আত্মা, স্বরূপ, নির্গুণ বস্তু, অবস্তুর গুণ বা শক্তি বিজ্ঞানের মতে অনধিকার চর্চ্চা। যেমন যেমন প্রত্যক্ষ হইবে বস্তুকে তেমন তেমন চিন্তা করাই কর্ত্তব্য; তাহার সম্বন্ধ প্রভৃতি আলোচনা চিন্তারাজ্যে প্রশস্ত। দেহাতিরিক্ত মন, আত্মা, বস্তুর অতীন্দ্র সত্তা, শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব উপকথা মাত্র। যাহা জানিবার প্রভৃতি উপায় নাই তাহার জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা করা দুরাশা মাত্র।

প্রত্যক্ষ সকল জ্ঞান ও ধারণার মূল। সকল ধ্যানই প্রত্যক্ষজনিত। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ, আত্মা, মন প্রভৃতি অতীন্দ্র বিষয়ের আমাদের কোন ধারণা বা জ্ঞান নাই এবং হইতেও পারে না। প্রমাণ মাত্রই স্বতঃ পরতঃ প্রত্যক্ষমূলক; সুতরাং প্রত্যক্ষের বাহিরে কোন সত্তাই উপলব্ধি হইতে পারে না। যথায় প্রত্যক্ষ নাই তথায় কোন জ্ঞানই নাই। প্রত্যক্ষ মূল, জ্ঞান বৃক্ষ; সত্য ফল। অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক; ইহা জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতের দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টের আলোচনা মাত্র। অনুমান বিশ্লেষ করিলে ঘটনাবলি ও তাহাদের সম্বন্ধের ব্যাপ্তি পাওয়া যায়। বস্তুর অতীন্দ্র সত্তা বা দেহাতিরিক্ত চৈতন্য অনুমানসিদ্ধ নহে। তাহাদের অনুমান কথার অনুমান মাত্র। এ প্রকার অনুমান সঙ্গত নহে। নির্গুণ সত্তা ভাবিতে গেলে মনের এক প্রান্তে যেন কোন ধূমবৎ, বায়ুবৎ, ছায়াবৎ সগুণ পদার্থ আসিয়া উঁকি মারিতে থাকে। তদতিরিক্ত সূক্ষ্মে উঠিতে উঠিতে মন একবারে অসাড় হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের স্তর উন্মোচন করিতে করিতে মস্তিষ্ক জড়প্রায় হইয়া আইসে এবং পরিশেষে নির্গুণ সত্তা বা স্বরূপসত্তার পরিবর্ত্তে একটা কথাকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মপ্রাসাদ উপস্থিত হয়। যাহা প্রত্যক্ষ মূলক নহে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই!

জড়বাদীরা মন বা চৈতন্যকে জড়শক্তির অবস্থা বা গুণ-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এমন কি জড় হইতে জীবদেহের সৃষ্টির চেষ্টা সেদিন মাত্র হইয়াছিল। আজ সে কথা কেহই বলেন না। জীব হইতে জীবের উৎপত্তি ; ইহাই প্রমাণ্য। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত জড়শক্তির ভক্ত ন্যূন তাঁহারও প্রকারান্তরে জড় হইতে জীবের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন জড় হইতে অদ্যাই চেতন পদার্থের উৎপত্তি না হইতে পারে ; কিন্তু কালক্রমে জড় হইতেই ক্রমবিকাশে জীবেও মানসিক ব্যাপারের স্ফূর্ত্তি। কোন কোন জড়বাদী জীবনী শক্তিকে তড়িৎ, তাপ, রসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি বলিয়া স্বীকার করেন। বস্তুতঃ এপ্রকার মত নিতান্ত ভ্রান্ত। এরূপ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। এস্থলে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া নিতান্ত কপোলকল্পিত কথাকে সত্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বিনা প্রমাণে, বিনা পরীক্ষায় এপ্রকার সিদ্ধান্ত করা চপলতার কর্ম্ম। জৈবনি শক্তিকে তাপ, তাড়িৎ, রসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি বলায় অনুমানের বিশেষ দোষ হইতেছে। এস্থলে অনুমান প্রকৃত কল্পনা হইয়া দাঁড়াইতেছে। জীবদেহে তাপ, তাড়িৎ, রাসায়নিক সংশ্লেষ বিশ্লেষ অবিরাম ধারার সমবায় সম্বন্ধে লক্ষিত হয় বটে ; কিন্তু জৈবনিশক্তিকে উহার কোনটী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় প্রাণবিজ্ঞানের বিশেষ সম্প্রসারণ দোষ জন্মাইতেছে। শরীরে জল, অঙ্গার প্রভৃতি দেখা যায়, তাহা বলিয়া জীবনকে তাহার কোনটী বলিলে বিশেষ দোষ বর্ত্তে। আমরা এপ্রকার সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করি। প্রাণবিজ্ঞানের যতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহাতে এতদূর স্পর্দ্ধা করা অসঙ্গত। কখনও যে ঐরূপ প্রতিপন্ন হইবে তাহাও এখন মনে আইসে না। অপিচ আমরা আপাততঃ যে কয়েকটীকে জড়শক্তি বলি, জৈবনিশক্তি উহার একটিও নহে। তাহাদের সকল গুলির সংযত ক্রিয়াও নহে। শক্তি সংস্থান লইয়া আজ কাল যে মহা আন্দোলন হইতেছে, কৈ তাহাতেও জৈবনিশক্তির কোনও বিশিষ্ট সংস্থান সম্বন্ধ দেখা যায় না। কোন বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিশারদ তত্ত্ববিৎ এ প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন যে জীবদেহ হইতে ক্রমশঃ তাপ হরণ করিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। সুতরাং তাপই জীবনীশক্তি। এ প্রকার মীমাংসা নিতান্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। শুদ্ধ উক্ত পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এতদূর অনুমান করা ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে। ক্রমশঃ রক্ত মোক্ষণেও প্রাণনাশ হয়, তবে রক্ত কেন জীবন না হইতে পারে? শ্বাসরোধ করিলেও মৃত্যু হয় ; তবে বায়ু কেন প্রাণ না হইতে পারে? উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত ইহারও বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালীতে এ প্রকার মীমাংসাকে কখনই যথাবিহিত বলিবে না। তাড়িৎ, তাপ, প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের আজ কাল যতদূর জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে এ প্রকার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিতে হইবে। জৈবনিশক্তি যে উক্ত কয়েকটী জড়শক্তি হইতে পৃথক তাহার আর প্রমাণের আবশ্যক নাই। জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাতে যাওয়া সুচেষ্টা বটে, কিন্তু এ প্রকার লাফাইয়া যাওয়া ঔদ্ধত্য মাত্র। আমাদের

জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন কথাই বলিবার অধিকার নাই। মনে কর জৈবনিশক্তি যদি তাপ বা তাড়িৎ হয় ; কিন্তু এখনও তাহার এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে উক্ত প্রকার বলা সঙ্গত হইতে পারে। ইহা যে শুদ্ধ তাপ, তাড়িৎ, রাসায়নিক আকর্ষণ, প্রভৃতি কোনটীই নহে, তাহা নয়, ইহার সহিত উহাদের কোন সমসাম্বন্ধিক (Correlation) ব্যাপারও সপ্রমাণ হয় নাই। জড়শক্তির পরস্পরে যে প্রকার সম্বন্ধ দেখা যায়। ইহার সহিত তাহা দেখা যায় না। সুতরাং জৈবনিশক্তিকে তাপ, তাড়িৎ বলা দূরের কথা তাপ তাড়িতের সহিত উহার কোন সমসম্বন্ধ অদ্যাবধি মীমাংসা হয় নাই। প্রাণবিজ্ঞান এক্ষণে এ প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তাপ তাড়িতে পরিণত হয়, তাড়িতও তাপে পরিণত হয় ; রাসায়নিক ক্রিয়াতেও তাপতাড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং তাপতাড়িতেও রাসায়নিক ক্রিয়া উত্তেজিত করে। জড়শক্তির এপ্রকার সসম্বন্ধ (Correlation) দেখা যায় ; কিন্তু তত্রাপি এখনও বিজ্ঞান এই কয়েকটী শক্তিকে এক বা একাত্মিক বলিতে সাহস পায় না ; এবং বিনা কারণে সে সাহস পাওয়াও প্রাগল্‌ভ মাত্র। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এ প্রকার কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ না পাইয়াও জৈবনিশক্তিকে তাপতাড়িৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বরং ইহা উক্ত প্রত্যেক শক্তি হইতে আপাততঃ পৃথক ও বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হইতেছে। যাঁহারা আত্মার বা জৈবনিশক্তির দেহাতিরিক্ত সত্তা অনুমান করেন আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাও যতদূর ভ্রান্ত, আর যাঁহারা জৈবনিশক্তিকে তাপ তাড়িৎ প্রভৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারাও ততদূর। উভয়েই ব্যাখ্যার জন্য ব্যতিব্যস্ত ; সুতরাং একটা উপস্থিত যা তা সম্মুখে পাইয়াছেন তাহাকেই জোড়া তাড়া দিয়া ন্যায্য ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েই কল্পনার কুহকে পড়িয়া অন্ধের মত সম্মুখে যাহা পাইতেছেন, তাহাকেই স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া দৃঢ়তর ভাবে ধারণ করিতেছেন। এতদুভয়েরই মনের বিজ্ঞানোপযোগী স্থৈর্য্য নাই, ধৈর্য্য নাই, দর্শন নাই, সত্যে ভক্তি নাই, তত্ত্বে আস্থা নাই—আগ্রহ নাই, সততই অধীর ও ব্যাকুল ; ব্যস্ততা প্রযুক্ত সকল দিকে দৃষ্টি হারাইয়া কেবল যে কোন প্রকারে একটা মীমাংসা শেষ করিবার চেষ্টা ; বেগভরে প্রমত্ত অশ্বের মত দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া মন তত্ত্বমার্গে ছুটিতেছে, সুসিদ্ধ হউক আর নাই হউক। শিল্পীর ন্যায় সহস্রগুণ অধিক ধৈর্য্য তত্ত্ববিদের আবশ্যক। তত্ত্বে স্থৈর্য্য না থাকিলে ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। আমাদের বিবেচনায় এ প্রকার জড়বাদী ও আত্মবাদী উভয়েই প্রত্যক্ষের বাহিরে বিচরণ করিতেছেন। উভয়েই সমান ভ্রান্ত। যে প্রত্যক্ষের দোহাই দিয়া জড়বাদী অধ্যাত্মবাদীর মত হাসিয়া উড়াইয়া দেন এক্ষণে ভ্রমবশতঃ তিনিও সেই প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিতেছেন। তাড়িৎ, তাপ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতির সহিত জৈবনিশক্তির কোথায় কার ঐক্য বা সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইয়াছে? এবং যতদূর সমবায়িত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে তাহাতে কি সাদৃশ্য বলা যাইতে

পারে ? যে বিষয় যতটুকু জানি সে বিষয় ততটুকু বলাই যুক্তিসিদ্ধ। যত দিন তদতিরিক্ত জানা না যায় ততদিন তাড়া তাড়ি তদতিরিক্ত জানি বলিয়া ভাণ করায় সত্যের অবমাননা ও বিজ্ঞানের অমর্য্যাদা করা হয় মাত্র।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

শিবনারায়ণ দেবের জীবনচরিত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

মোহান্তকে শিবনারায়ণ বলিলেন, তারকেশ্বর যে মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—কিরূপে বিরাজ করিতেছেন, নিরাকার রূপে না সাকার রূপে ? যদ্যপি নিরাকাররূপে হন, তাহা হইলে সকল স্থানে আছেন দেখা যাইবেন না এবং যদ্যপি সাকাররূপ হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে, তিনি সাকার মধ্যে কোন ধাতু ? সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ এই বিরাজমান আছেন—পঞ্চতত্ত্ব শব্দ ব্রহ্ম এবং এক জ্যোতিঃ যিনি দিন রাত্রি প্রকাশমান থাকেন অর্থাৎ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব শব্দ ব্রহ্ম এই একমাত্র জ্যোতিঃ রাত্রি দিন প্রকাশমান থাকেন—দিবসে সূর্য্যনারায়ণ নাম ও রাত্রিতে চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ নাম কল্পিত আছে। সাকার ব্রহ্ম এইত চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, ইহা ছাড়া আর কোন সাকার হন নাই, হইবেন না ও হইতে পারিবেন না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহার মধ্যে কোন্‌টি তারকনাথ ? মাটি, পৃথিবী না মন্দির বা মন্দির মধ্যে যে পাথর আছে সেই তারকনাথ, কিম্বা পাথরের মধ্যে তারকনাথ আছেন ? পাথর, মন্দিরও মাটি যদি তারকনাথ হন, তাহা হইলে ত সকল স্থানেই পৃথিবী মাটি এবং মাটি হইতে কত ঘর মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে এবং কতই পাহাড় পর্ব্বত পড়িয়া আছে তাহা হইলে ত সকলেই তারকনাথ হইতে পারেন। যদি পাথরের মধ্যে তারকনাথ হন, তাহা হইলে সকল পাথর,—মন্দির ও মাটি পঞ্চতত্ত্ব সকল স্থানে পাওয়া যাইতেছে, যদি তিনি ইহার মধ্যে কোন তত্ত্ব হন তাহা হইলে তারকেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি ? এবং যাঁহার নাম তারকনাথ কল্পনা করা গিয়াছে তাঁহাকে যদ্যপি তোমরা চিন অথবা তাঁহাতে যদ্যপি তোমাদের নিষ্ঠা থাকে তাহা হইলে তোমাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটে কেন ?

মোহান্ত বলিলেন, যে আমাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং তারকেশ্বরের আপনি কি মাহাত্ম্য দেখিলেন ? এই তারকেশ্বরে কত রোগী আসিয়া হত্যা দিয়া থাকে, তারকনাথ তাহাদিগের রোগ ভাল করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে স্বপ্ন দেন ও তাহাদের হাতে নানা প্রকার ঔষধ দেন। এই স্থানের এমন মাহাত্ম্য যে এখানে যত যাত্রী আসে এমন আর কোথাও

আসে না—এ সকল হয় কেন ? শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা বটে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ কোন ব্যক্তি আপনার লাভের জন্যে নূতন হাট কিম্বা বাজার বসাইতে চাহিলে দোকানিদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আনে যে তোমরা সেই আমার হাটে আসিলে কোন বিষয়ে তোমাদের একটী পয়সাও খরচ হইবে না বরঞ্চ তোমাদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। তাহাতে হাটে অনেক লোক জমিয়া যায়। এবং বেদিয়ারা লাভের আশায় ঢোল বাজাইয়া বাজি দেখাইবার জন্য চারিদিক হইতে কত লোক আনিয়া জমা করে তাহার সীমা নাই। তবে কি মাহাত্ম্য আছে বলিয়া ঐ বেদিয়া কিম্বা ঐ স্থানকে পূজা করিতে হইবে ? যদি বলেন যে তারকনাথ রোগ ভাল করিয়া দেন সেই জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হইবে তাহা হইলে ত ডাক্তার কবিরাজ ও হাকিমগণ কত রকম রোগ ভাল করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাদিগকেও কি তারকনাথ বলিয়া পূজা করিলেই হইবে ? অধিকন্তু এই যে ইহারা প্রত্যক্ষ চেতনরূপে সকল কার্য্যই করিতেছেন। এবং যদি তারকনাথ স্বপ্ন দেখান এজন্য তাঁহার মাহাত্ম্য আছে বলিয়া পূজা করিতে হয় তাহা হইলে ত রাজা, প্রজা, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, বাটীতে বাটীতে কত রকমের স্বপ্ন দেখিতেছেন এবং কত প্রকার দ্রব্য লাভ করিতেছেন তাহার সীমা নাই। সে জন্য কি স্বপ্নের ফলকে মাহাত্ম্য বলিয়া পূজা করিতে হয় না যাহার বাটীতে যে স্বপ্ন দেখিবে সেই বাটীর মাহাত্ম্য বলিয়া বাটী বাটী ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় ! কত চেতন মনুষ্য কত রোগীকে জড়ীবুটী প্রত্যক্ষ উঠাইয়া দিতেছে আর উহাতে কত প্রকার রোগ আরোগ্য হইতেছে তাহার সীমা নাই। যে দ্রব্য যে রোগের নিমিত্তক সেই রোগে তাহা ব্যবহার করিলে অবশ্য রোগের আরোগ্য হইবে আর যে দ্রব্য যে রোগের নিমিত্তক নহে তাহার দ্বারা সেই রোগ কখনই আরোগ্য হইবে না। এবং যাহার বিনা ঔষধে আরোগ্য হইবার নিমিত্তক আছে তাহার ঐরূপ আরোগ্য হইবে, ইহা ত নিশ্চয়ই আছে। যে রোগ হউক, যেখানেই যাউক, কিম্বা বাটীতে বসিয়া থাকুক, যত দিন উহার রোগ ভোগ করিবার নিমিত্তক আছে ততদিন ভোগ করিয়া নিমিত্তক ক্ষয় হইলেই আপনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া যাইবে। ইহাতে তারকেশ্বর যায় অথবা না যায়। এবং যাহার রোগ অনেক দিন ভোগ করিবার নিমিত্তক আছে অথবা যাহার রোগ ভাল হইবার নিমিত্তক নাই অর্থাৎ যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত রোগ থাকিবার নিমিত্তক আছে—সে ব্যক্তি যদি তারকেশ্বরে মাথা খুঁড়িয়া মরে অথবা যেখানে যায় কখনই রোগ ভাল হইবে না। আপনি প্রত্যক্ষ দেখুন, আপনি মোহান্ত, রক্ষা পাইবার জন্য দিন রাত্র সর্ব্বদা মন্দিরে যাইয়া তারকনাথকে পূজা করিতেন এবং অপরের দ্বারাও করাইতেন, কিন্তু তিনি যদ্যপি মন্দিরের পাথর তারকনাথ হইতেন তবে যখন আপনার একটু দোষ-রোগ ঘটিয়াছিল তখন রক্ষা করিলেন না, আপনাকে ফাটকে যাইতে হইয়াছিল কেন ? যদি সত্য হইতেন তবে অবশ্য রক্ষা করিতেন

এবং আপনাদের জ্ঞানও প্রকাশ করিতেন। যেমন অগ্নিজ্যোতিঃ ঘরে থাকিলে অন্ধকারে থাকিতেই পারে না সেইরূপ সত্যের এই সকল যে গুণ তাহাও প্রকাশ হইবেই। আপনার ফাটকে যাইবার নিমিত্তক ছিল তাই আপনাকে ফাটকে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ আপনার মত জগন্নাথের রাজারও নিমিত্তক ছিল তাঁহাকেও ফাটকে যাইতে হইয়াছিল, কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। যদ্যপি যথার্থ আপনাদের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্টা ও ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিত তাহা হইলে তিনি কৃপা করিলে অবশ্যই সকল বিপদ ও রোগ হইতে মুক্ত করিতেন। শুধু মুখে ভক্তি আছে কিন্তু অন্তরে ভক্তি হয় না। প্রত্যক্ষ দেখুন যদি তারকেশ্বের থাকিলে তারকনাথ রোগ ভাল করেন তাহা হইলে কি তিনি বাড়ী বাড়ী রোগ ভাল করিতে পারেন না, তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তাঁহার কি ক্ষমতা নাই, তাঁহার কি পক্ষপাত আছে যে তিনি ভাবেন যে, আমার বাটীতে আসিয়া হত্যা না দিলে আমি তাহার রোগ ভাল করিব না? যদ্যপি তারকনাথ তারকেশ্বরে হত্যা দিলে রোগ ভাল করিতেন তাহা হইলে ডাক্তার কবিরাজের থাকিবার আবশ্যক থাকিত না। এবং যদি তারকেশ্বরে হত্যা দিলে তারকনাথ রোগ ভাল করিতেন তাহা হইলে এত লোক আসিয়া হত্যা দিয়া গিয়াছে অথচ তাহাদের রোগ ভাল হয় নাই কেন? তারকেশ্বরে আসিয়া যে দুই একজনের রোগ ভাল হইয়াছে তাহাদের নিমিত্তক ছিল বলিয়াই হইয়াছে। যাহার ভাল হইবার নিমিত্তক নাই তাহার ভাল হয় না। কিন্তু যদি রাজা প্রজা বাড়ীতে বসিয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি হয় তাহা হইতে তিনি কৃপা করিলে ঘরে বসিয়া থাকিলেও সকল রোগ এবং দুঃখ মোচন করিতে পারেন। কিন্তু উহাদের বাটী বসিয়া থাকিতে বিশ্বাস হয় না।

যাহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ আত্মা গুরুতে বিমুখ তাহারাই তীর্থে বিশ্বাস করেন, সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ এবং আপনাতে পরিপূর্ণ এরূপ বিশ্বাস করে না। তখন মোহান্ত বলিলেন, ইহা ঠিক, মহারাজ অন্তর্যামীর কৃপা বিনা বিশ্বাস হয় না, তাঁহার কৃপা হইলে সকল স্থানে পরিপূর্ণরূপ বিশ্বাস হয়। যাহা হউক এক্ষণে আপনার আহার বিষয়ে কি? আপনি আহার করিয়াছেন কি না? এবং শিবনারায়ণের আহার হয় নাই শুনিয়া মোহান্ত ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া শিবনারায়ণকে আহার করাইয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলেন যে, "বিশ্রাম করিবার জন্য ইঁহাকে আটচালা বাটীতে লইয়া যাও। যদি ইনি আহার করিবার জন্য অতিথিশালায় না যান তাহা হইলে নিজের ভাণ্ডারে লইয়া গিয়া আহার করাইয়া আনিও। যদ্যপি ঐ খানেও না যান তাহা হইলে উঁহার নিজের আসনের নিকট লইয়া যাইয়া আহার করাইবে।" এবং শিবনারায়ণকে বলিলেন, "আপনি বিশ্রাম করুন আপনার সহিত একান্তে গোপনীয় কথাবার্ত্তা হইবেক। শিবনারায়ণ বাটীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক নানাপ্রকার অলঙ্কার গাত্রে আছে এবং পায়ের মলের ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতেছে।

ঐ স্ত্রীলোক তারকেশ্বরকে এবং সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইতেছিল। সেইখানে একজন সিদ্ধ পুরুষ সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে অনেক লোক হাত জোড় করিয়া বলিতেছিল যে, আমাদিগকে রক্ষা করুন। ঐ স্ত্রীর মলের শব্দ ধ্বনি শুনিয়া ঐ সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ উহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন যে কোন জেলখানার কয়েদী আসিতেছে। সেই স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে আমায় ঠাট্টা করিতেছে। এই বুঝিয়া স্ত্রীলোকটী সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া বলিল, মহারাজ যে জেলখানাতে তুমি নয় দশ মাস বেড়ী লাগাইয়া কয়েদ ছিলে আমি সেই জেলখানায় কয়েদী অর্থাৎ তুমি যাহার উদরেতে নয় দশ মাস কয়েদী ছিলে সেই আমি; এখন পর্য্যন্ত তোমার ভ্রম ঘুচে নাই এবং তুমি মাথা মুণ্ডন করিয়া পাঁচ কড়ায় গেরিমাটি লইয়া সাদা কাপড়ে মিথ্যা রং দিয়া অহঙ্কার করিয়া বসিয়া আছ যে আমি সন্ন্যাসী, যখন তোমার জন্ম হয় নাই তখন তুমি কি ছিলে? মুখে এখন তুমি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছ যে আমি সন্ন্যাসী তোমার মুখে বলিতে লজ্জা হয় না? এখনও তুমি অহঙ্কাররূপী বেড়ীতে কয়েদী আছ। তাহাতে ঐ সন্ন্যাসী স্ত্রীলোককে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন যে, মা আমি তোমায় নমস্কার করি। তুমি ধন্য আমায় জ্ঞান দিলে, তুমি আমার গুরু। শিবনারায়ণ সেইখানে এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন বর্দ্ধমানের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া এদিক ওদিক বেড়াইয়া সব দেখিলেন যে রাজধানীর ঠাকুর বাড়ীর বাহিরে অনেক অভ্যাগত সাধু ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে। শিবনারায়ণ সেইখানে দাঁড়াইলেন। রাজার হুকুম আছে যে, ঠাকুর বাড়ীতে যে ভোগ হইবে তাহা সাধু, অভ্যাগত, এবং ব্রাহ্মণকে আহার করাইয়া দিতে হইবে। সেই সময়ে একজন ঠাকুর বাড়ীর দেউড়ীতে আসিয়া ডাকিল যে তোমরা আহার করিতে আইস। তাহাতে যত সাধু এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণ উঠিয়া দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি চেনা শুনা ব্রাহ্মণগুলিকে ভিতরে লইয়া গেল। এবং অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমরা ব্রাহ্মণ কি না? উহারা কহিল আমরা ব্রাহ্মণ—সে যজ্ঞোপবীত দেখিয়া ভিতরে যাইতে দিল। উহাদের মধ্যে শিবনারায়ণ দেখিলেন যে এক ব্যক্তি গলায় একটী যজ্ঞোপবীত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে সে জাতিতে কাহার, তাহার বাড়ী গাজিপুর জেলায় সে শিবনারায়ণকে রাস্তায় দুই চারি দিন সেবা করিয়াছিল। সে ব্যক্তি হাতে করিয়া যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া বলিল, আমিও ব্রাহ্মণ। তাহাতে তাহাকেও ভিতরে লইয়া যাইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া দিল। শিবনারায়ণ তাহাকে চিনিলেন কিন্তু সে শিবনারায়ণকে চিনিতে পরিল না। শিবনারায়ণ বাহিরে বসিয়া থাকিলেন। যখন উহারা আহার করিয়া বাহির হইল তখন তিনি সেই কাহারকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তুই এই কর্ম্ম করেছিস্ তুই ভাল করিস্ নাই, চিনিতে পারিলে উহারা তোকে মারিয়া ফেলিত। এখন যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দে খবরদার এমন কর্ম্ম আর করিস না। ইহাতে কাহার হাত জোড় করিয়া

শিবনারায়ণকে বলিল, "মহারাজ আমি বড় অপরাধ করিয়াছি। এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আর এমন কর্ম্ম করিব না এবং যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিব।" শিবনারায়ণ গোলাববাগে যাইয়া দেখিলেন যে ঐ ব্যক্তি পুনরায় যজ্ঞোপবীত গলায় দিয়া বেড়াইতেছে। শিবনারায়ণকে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া গলা হইতে যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিল। শিবনারায়ণ বলিল ইহার স্বভাবই এইরূপ। শাস্ত্রে যে লেখা আছে অভ্যাগতদিগকে সেবা করিতে হয় তাহা যথার্থ এবং রাজারও আজ্ঞা সেইরূপ ছিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিদিগের দোষ এই যে যথার্থ অভ্যাগত পরদেশী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন নিরিক্ষিত পুরুষ, (যাহার কোন বস্তুরই প্রয়োজন নাই কেবল প্রাণরক্ষার জন্য মাত্র অন্ন গ্রহণ করেন) সেই ব্যক্তিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের গলায় পইতা ছিল না এজন্য তাঁহাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল। তাহারা মুখে বলিল যে আমরা ক্ষত্রিয়ের ছেলে। কিন্তু কর্ম্মচারীরা বলিল দূর বেটা তোর গলায় পইতা কৈ? তোর গলায় যদি পইতা থাকিত তাহা হইলে খাইতে দিতাম। সেই অভ্যাগত সাধু বলিল, আমায় পুরি কচুরি খাইতে না দিলে তাহাতে ক্ষতি নাই চারিটী অন্ন দিলেই হইবে। তাহারা বলিল যে এখন অন্ন নাই ওখানে যাইয়া বস মিলিবার একটু দেরি আছে পরে মিলিবে। অভ্যাগতগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল তাহারা কেহ আর কোন খপর লইল না। ইহার মধ্য হইতে একজন সাধু উঠিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, এখন পর্য্যন্ত তোমরা আমাদিগকে আহার করাইলে না। আমরা আর থাকিব না আমরা ভ্রমণকারী। উহারা বলিল, এখন যা বেটা, খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেখা গেল যে উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য যাহার দাম আট আনা দশ আনা হইতে পারে এইরূপ দামী জিনিস সকল হাড়ী ডোমদিগকে দুই এক পয়সায় বিক্রয় করিতেছে কিন্তু সুপাত্র অভ্যাগতগণকে দিতে প্রবৃত্তি হইল না। সেই কর্ম্মচারির দোষে রাজার ধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং রাজারও বিনাশ হয় এবং রাজত্ব যায়। কর্ম্মচারিরা যদ্যপি সুপাত্র ও জ্ঞানবান হন, সকল বিষয়ে বুঝিয়া উত্তমরূপে রাজকর্ম্ম ও রাজাপ্রজার উভয়ের কার্য্য বুঝিয়া চালাইতে পারেন তাহা হইলে উত্তমরূপে সকল বিষয়ে নির্ব্বাহ হয় এবং রাজাপ্রজার উভয়েরই মঙ্গল হয়। এইরূপ মনে মনে বলিয়া শিবনারায়ণ নদিয়া শান্তিপুর চলিয়া গেলেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(১)

সংসারে বড় লোক ছোটদের বুকের উপর পা দিয়া দাঁড়ায়াই তবে বড় হইয়া উঠেন! জগতের স্থান নির্দ্দিষ্ট, তাহার সমস্ত অংশই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ রহিয়াছে; যখন কেহ উপরে উঠেন তখন তাঁহাকে উপরের পূর্ণ স্থান হইতে কাহাকেও না সরাইয়া দিলে তাহা সাধিত হইবার

নহে। ক্ষুদ্রের কঙ্কালে বৃহতের পুষ্টি! জীবন সংগ্রামে বড়লোক কত ক্ষুদ্রের প্রাণ লইয়া যে তবে বড় হন তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে! বড় লোকদিগকে আমরা পূজা করি, কিন্তু যাহাদের জীবন কাড়িয়া ইহারা বড়, তাহাদের অসংখ্য জীবনের প্রতি আমাদের মন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আকৃষ্ট হয় কি! Song of the Voiceless নামক কবিতাতে হোমস এই সুরেই গাহিয়াছেন।

(২)

সংসারে এ 'বড়' ও 'ছোট' এই কথা অহরহ শুনিয়া কাণ ঝালা পালা হইয়া যায়! কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত অর্থ ঠাওরাইয়া কথা কন না! কি মাপের দ্বারা তিনি স্থির করিয়াছেন যে তিনি বড় অপরে ছোট তিনি বুদ্ধিমান ও অপরে নির্ব্বোধ! বাহিরে বুক ফুলাইয়া সতেজে চলিয়া গেলেই লোকে বলে "এ একজন বড় লোক" "ও বড় বুদ্ধিমান" বেচারী জয় মিত্রই একলা ধরা পড়িয়া মারা যান! সংসারে দমক ভরে আপনার গলা জাহির করিতে পারিলেই বড় হইয়া দাঁড়ান যায়! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বড় কে?—আমি, না বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশু, নানক, মহম্মদ প্রভৃতি মহাত্মারা! ইঁহারা তো কখন আপনাদের বড় বলিয়া পরিচয় দেন নাই, তবে ইঁহারা কি জুয়োচোর! যে তাঁহারা মনে মনে আপনাদের বড় বলিয়া জানিতেন আর পাছে সাধারণে তাঁহাদের বিনয়ের অভাব ও আত্মম্ভরিতার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া তাহাদের প্রকৃত লঘুতা বুঝে—এই ভয়ে কি তাঁহারা অসত্যাচরণ করিতেন? মানুষ ঈশ্বরের নিকট হইতে কার্য্যোপযোগী ক্ষমতা লাভ করেন—এ কথা যদি সত্য হয় তবে জগতে সকলেরি আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, নচেৎ তাহাদের সৃষ্টি হইল কেন? তবে বিশ্বস্রষ্টার এই অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকলেই সংসারে আসিয়াছে তাহাদের দ্বারা তাঁহারই অনন্ত কার্য্য সাধিত করিতেছেন। এই বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন—তখন একের সহিত অপরের তুলনা চলিবে কি করিয়া? চাষার কাজ কিছু কবির সাধ্য নহে—কৃষক যদি কৃষিকার্য্য বন্ধ রাখে তবে কবি কোথায় থাকেন? জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজা, মন্ত্রিই বা কোথায় গিয়া দাঁড়ান!

(৩)

Ideal of Perfection কথাটা শুনিতে খুব বড় বটে, কিন্তু মানুষ কি কখন পূর্ণতা লাভ করিতে কিম্বা পূর্ণতার ভাব পূর্ণরূপে ধারণায় আনিতে পারে? যিশু খৃষ্ট, বুদ্ধদেব প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাগণকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া পূজা করি—প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের কি কোন রূপ অসম্পূর্ণতাই ছিল না? সংসারে যত কিছু সৎগুণ আছে সমস্তই কি তাঁহাদিগের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছিল? অবশ্য তাহা নহে! অসীম অনন্তেতেই সর্ব্বগুণের পূর্ণ বিকশন সম্ভব। বাস্তবিক সৃষ্টিতে কোথাও পূর্ণতা নাই, কেবল পূর্ণতার একটি ছায়া মাত্র আছে—সেই ছায়াকে ধরিয়া রাখিবার জন্যই মহাত্মারা

চিরতপস্যায় নিযুক্ত—আর সাধারণ মনুষ্যে ছায়া বাজির মত মুহূর্ত্তের জন্য তাহা হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত দেখিলেই জীবন সার্থক বিবেচনা করিতেছে। সংসারে যে যে উপায়ে এই ছায়া দেখিতে পায় তাহাই তাহার পরমারাধ্য। প্রেম এই ছায়া আমাদের অন্তরে প্রতিবিম্বিত করে বলিয়াই সংসারে তাহার এত মাহাত্ম্য!

(৪)

প্রাণীরাজ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধি আবিষ্কার করিয়া ডার্বিণ এই নশ্বর সংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। মানবের অন্তর্জগতেও সেই নিয়মের কার্য্য দেখা যায়। আম্র বীজ রোপণ করিলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনুকূল অবস্থার সাহায্যে তাহা যেমন আম্র-বৃক্ষে পরিণত হয়, এবং কাল সহকারে উহা ফলফুলে প্রকৃতির শোভাসম্পদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে; সেইরূপ বিশেষ মানবের আন্তরিক গুণ-বীজও কাল সহকারে বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই আত্মগত একটি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য বাহ্য অবস্থার আনুকূল্যে বিশেষাকারে বিকশিত হইয়া বুদ্ধিরাজ্য ও জ্ঞান রাষ্ট্রের শোভা সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই আভ্যন্তরিক বীজ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক এবং সাধারণ ভাষায় বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন আভ্যন্তরিক বীজ, দার্শনিক বলিবেন ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ এবং সাধারণে বলিবে মহত্ব অথবা বীরত্ব। উদ্ভিদও প্রাণী রাজ্যের মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি আছে, তেমনি মনুষ্যের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। যেমন আম, কাঁঠাল, জাম; ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল; তেমনি মানুষের মধ্যেও মহৎ মধ্যম ও অধম আছে। তবে মনুষ্যের জ্ঞান থাকা বশত উদ্ভিদ ও পশু জাতি অপেক্ষা মানব জাতির মধ্যে অধিক মাত্রায় বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এমন কি বলিলে বলা যাইতে পারে মানব জাতির প্রতিব্যক্তিই নিজে নিজে এক এক শ্রেণীভুক্ত। মানব সেই আত্মগত অন্তর্নিহিত (Potential) শক্তির বিকশনই তাহার কার্য্য—ইহা তাহার বিশেষ প্রকৃতিতে লক্ষিত হয়। ইহাই আমার প্রকৃত Ideal ইহাই মানবের অন্তর্মানব। বাহিরের Ideal এমন পূর্ণতা প্রাপ্ত অথবা জীবন্ত হয় না—অপরের একটি কিম্বা কয়েকটি গুণ আমার Ideal হওয়া সম্ভব কিন্তু অপর কোনও মানব আমার প্রকৃত জীবন্ত Ideal হইতে পারে না। বহিঃ Ideal-এর বহিঃ প্রকৃতির সহিত সর্ব্বক্ষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, যেখানে অনুকূল অবস্থা পায় সেই খানে সেই ভাবে আভ্যন্তরিক শক্তির বাহুল্য অনুসারে বিকশিত হইয়া উঠে। এই অন্তর্মানব যদি কালোপযোগী না হয় তবে অকালে লোপ পাইয়া যায়—আর কাল সহায় হইলে তাহা বংশ পরম্পরায় জীবিত থাকিয়া সংসারে একটি ছাঁচ (type) রাখিয়া যায়। যেমন বাঙ্গালা সাহিত্যে ভারত চন্দ্র একটি ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গবাসীর জীবনে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম একটি ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে—তাহা লুপ্ত হওয়া বহু কালস্বাপেক্ষ।

লণ্ডনে কংগ্রেস্।

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্য।

১। ভারতের জাতিগঠন।

২। ভারত শাসনকার্য্যে ভরতবাসীর অধিকার বিস্তার।

দুইটী উদ্দেশ্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। জাতিগঠন না হইলে রাজকার্য্যে আমরা যতই অধিকার লাভ করি না কেন, প্রকৃত পক্ষে আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচে না। এবং স্বহস্তে দেশের কার্য্য করিবার অধিকার যদি প্রাপ্ত না হই তবে জাতিগঠনের অবসর পাইব কি করিয়া?

গত ছয় বৎসরের কন্‌গ্রেসের একটা কাজ হইয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি এক হইবার চেষ্টা করিতেছে। যে সূত্রে ভারতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈন পারসী সকলকেই বাঁধা যাইতে পারে সেই ঐক্য-সূত্রটা যেন ধরিতে পারা গিয়াছে এইরূপ সকলে অনুভব করিতেছেন। ইহাকেই বলা যাইতে পারে জাতিগঠনের প্রথম সূত্রপাত।

কিন্তু ভারতবর্ষের কন্‌গ্রেস আপাততঃ ইহার অধিক যে কিছু করিতে পারিবে আমাদের এরূপ বিশ্বাস নহে। ফলের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে ভারতের কন্‌গ্রেস্ প্রধানতঃ আমাদের স্বজাতীয়দিগকে শিক্ষিত ও জাগ্রত করিবার জন্য। এইখানে বলা আবশ্যক জাতিনির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবর্ষীয়ই কন্‌গ্রেসের স্বজাতীয়।

কন্‌গ্রেসের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ভরত শাসনকার্য্যে উত্তরোত্তর কর্তৃত্ব লাভ, এ উদ্দেশ্য এ দেশে থাকিয়া যে সিদ্ধ হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না।

সুতরাং লণ্ডনে কংগ্রেসের অধিবেশন আবশ্যক। নহিলে, ইংরাজ জাতির হৃদয়ে কংগ্রেসের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভবে না। এবং তাহা না হইলেও ভারতশাসন-কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিবার অধিকার দুর্লভ। উদার-হৃদয় স্বাধীন জাতি আমাদের দুরবস্থা একবার সম্যক অনুভব করিলে এ অভাব মোচন প্রায় নিশ্চিত। স্বদেশে এবং বিদেশে যথাযোগ্য স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করিয়াই ইংলণ্ডের গৌরব।

কিন্তু এইখানে কথা উঠিতে পারে যে, এ ভিক্ষা-লব্ধ অধিকারে ফল কি? কিন্তু ভিক্ষুকের পক্ষ হইতেও বলিবার কথা আছে। ভিক্ষায় চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় না সত্য, কিন্তু সাধ করিয়া ত কেহ ভিক্ষা করে না। আমরা এখন নিরুপায়। নিরুপায় বলিয়াই ভিক্ষা মাগিয়া উপায় করিতে হইতেছে। ইংরাজের অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের পথ বন্ধ!

উদাহরণ দিয়া বুঝাই। অস্ত্র আইনে আমাদের অস্ত্র ধারণ বন্ধ করিয়াছে। এখন আমরা যদি অভিমান পূর্ব্বক বলি যে, "হে ইংরাজ, এ আইন রহিত করিও না, আমরা

অস্ত্রের ব্যবহার সম্যক শিখিয়া অস্ত্র ধরিব, তোমার অনুগ্রহ চাহি না", তাহা হইলে মনকে প্রবোধ দেওয়া হয় বটে। কিন্তু অস্ত্রধারণের অবসর বোধ করি কোনও কালে আসে না। সেইরূপ যদি বলি, "হে বৃটিশকেশরি, তোমার নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া কোনও অধিকার লাভ করিব না এবং তোমার নিকট কোনও শিক্ষা লাভ না করিয়া একবারে চাণক্য হইয়া তোমার বিদ্যা মারিয়া লইব," তাহা হইলেও কোনও অধিকার লাভের সম্ভাবনা অনেকটা হ্রাস হইয়া আসে।

সুতরাং ভিক্ষাই যদি চাহিতে হয় ইংলণ্ডে গিয়া মহতের দুয়ারে প্রার্থনাই শ্রেয়। সেখানে সফল হইবার সম্ভাবনা আছে। আর নিষ্ফল হইলেও "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা বহুকাল হইতে অপ্রতিহতপ্রভাবে আমাদের উপর একাধিপত্য খাটাইয়া আসিতেছেন। এক সময়ে এই আধিপত্য আমাদের পক্ষে হয়ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু তাঁহাদেরই প্রসাদে শিক্ষার সহিত আমাদের অবস্থার উত্তরোত্তর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অথচ আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নানা কারণে তাঁহারা এখন ক্ষীণদৃষ্টি। সুতরাং আমরা যখন শিক্ষা অনুসারে অধিকার লাভ করিতে চাহি এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভুগণ বহুকাল-প্রচলিত সনাতন প্রথানুসারে নিদ্রালসনয়নে সকরুণ অবিশ্বাসের সহিত আমাদের প্রতি ঘন ঘন অনুগ্রহ কটাক্ষপাত করিতে থাকেন। আমরা কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি।

বিদ্বেষ বশতঃই যে এংলো-ইণ্ডিয়ান দল আমাদিগকে কোনও বিষয়ে অধিকার প্রদান করিতে চাহেন না তাহা নাও হইতে পারে। যেমন কোন কোন অতিসাবধানী পিতা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে সংসারের বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কের মত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিয়া থাকেন, হয়ত এংলো ইণ্ডিয়ান দলও সেইরূপ আমাদেরই হিতসাধনের জন্য সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে নিরাপদ করিতে চাহেন!

আর অপ্রতিহত আধিপত্যও লোকে সহজে ছাড়িতে চাহে না। এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রকৃতিও ত সাধারণ মানবপ্রকৃতির বহির্ভূত নহে। সেই জন্য আমাদের প্রার্থনার অনুকূলতাপক্ষে এখানে আশা বড় নাই।

অগত্যা বিলাতে আন্দোলন অনিবার্য্য। একাধিপত্যের প্রভাবে বিলাতবাসীর চরিত্রে কলুষিত হয় নাই। তাঁহারা অপক্ষপাতিতার সহিত আমাদের যোগ্যতা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। সুতরাং যোগ্যতানুসারে সেখান হইতে কোনও অধিকার লাভের সম্ভাবনা তাদৃশ সুদূর পরাহত নহে।

আর যতদিন এ অধিকার লাভ না করি ততদিন আমরাও ছাড়িব না। তোমরা না চাহিতে আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছ এখন সে শিক্ষার অনিবার্য্য ফল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে এ কেমন কথা? তোমাদেরই যত্নে পরিপুষ্ট হইয়া আমরা এখন হামাগুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি। এখন অহর্নিশি আত্যন্তিক স্নেহ বশতঃ আমাদিগকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান দেখিতে তোমরা এত উৎসুক কেন? দুর্লভ চরণযুগল লাভ করিয়া পঙ্গুর ন্যায় কি কেহ বসিয়া থাকিতে পারে? আমরা বারবার তোমাদের নিকট আবেদন করিব। ফল শীঘ্র হয় ভাল, না হয় আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, দুই দিন পরেও অন্ততঃ আমরা ফললাভ করিব।

এখানেও ত আন্দোলন আবেদনের ত্রুটি নাই। কিন্তু ছয় বৎসরের অহর্নিশি ক্রন্দনে যে ফল হয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন বক্তার বিলাতে এ বিষয় উত্থাপনে তাহাপেক্ষা ফললাভ হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বোধ হয়, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত ডেলিগেট লইয়া বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে আমরা একেবারে নিষ্ফল হইব না।

আর আপাততঃ নিষ্ফল হইলেও বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে কোনও উপকার নাই এমন নহে। আর কিছু হউক না হউক, সে চির-নবীন উদ্যম এবং উৎসাহের মধ্যে আমাদের শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট আছে। কংগ্রেসের যে একশত জন ডেলিগেট্ বিলাতে আন্দোলন করিতে যাইবেন তাঁহারা যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সে বিষয়ে বড় সন্দেহ নাই। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্য দিয়া সেই পাশ্চাত্য প্রবল উদ্যম এদেশে খানিকটা আসিবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ এই উদ্যম সংস্পর্শে কংগ্রেসের জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহাও আমাদের পক্ষে সামান্য লাভ নহে।

কিন্তু ডেলিগেট যাইবে কে? একশত জন ডেলিগেটের মধ্যে যে আচারনিষ্ঠ হিন্দু মিলিবে না এমন বলা যায় না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে জাতিনাশের ভয় আছে। ইংলণ্ডে গিয়া জাতি হারাইতে লোকে সম্মত হইবে কেন? তথাপি বিগত কংগ্রেস্‌রিপোর্ট পাঠে বোধ হয়, দেশের জন্য সামাজিক নির্যাতন সহিতে প্রস্তুত এরূপ আচারনিষ্ঠ প্রকৃত হিন্দু এখনও অনেক আছেন।

আর বিলাতের কংগ্রেস অধিবেশন হইলে এ অশাস্ত্রীয় নির্যাতন বিধিরও বোধ করি সংস্কার হইতে পারে। এই ত সেদিন সম্মতি আইনের গোলযোগের সময় দুর্দ্দিনের দোহাই দিয়া বিলাতগমনে জাতি রক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতেছিল।

অতএব বৃথা অভিমান এবং মিছা তর্ক পরিহারপূর্ব্বক স্বদেশের হিতার্থে বিলাতে কংগ্রেস করিয়া ইংরাজ জাতির নিকট আমাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। শিক্ষার সহিত আমাদের অধিকারের দারুণ অসামঞ্জস্য ইংরাজের হৃদয়ঙ্গম করাইতে না পারিলে উত্তরোত্তর অসন্তোষ এবং অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়া উভয়েরই পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। তাই উঠ জাগো এবং বিনা আড়ম্বরে নিরভিমানে কাজ করিয়া যাও। শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার কখনও ব্যর্থ হয় না।

মায়াবিনী।

নিতান্ত তরল ছোট—
একটি সে মেঘবালা,—
সে এমন মায়াবিনী—
এত জানে প্রেম খেলা!
বুঝিনা তাহার ভাব,—
জানিনে সে চায় কিবা?
থেকে থেকে আচম্বিতে
মলিন হাসির বিভা।
সোনার বরণা এই—
গিরিশিরে দেয় উঁকি,—
সহসা কি অভিমানে
অশ্রুভারে পড়ে ঝুঁকি!
সমীরণে চাহে কি সে?
তাও ত বুঝিতে নারি!
বায়ু কাছে আসে যদি
পলায় যে তাড়াতাড়ি!
সরে যায় উড়ে যায়
দূর নভে যায় ভাসি,—
বিষণ্ণ অনিলে হেরি—
ঢলি পড়ে হাসি হাসি।

এ কি রঙ্গ—কি তামাসা!
কিছুই বুঝিতে নারি!
ভাল কি বাস না তারে?
এমনি বা বাসে নারী!
না—তারেই বাসে ভাল,—
সেই ভাল—আমি দেখি,—
অশ্রু ফোটা দিত যদি—
মরিতাম হৃদে রাখি।
মনে মনে এই কথা
কাতরে কহিনু আমি,—
দেখিনু বিষণ্ণ-মুখী
ধীরে আসিতেছে নামি।
শুনিল কি? জানিনা ত!
যেতে যেতে গেল চেয়ে;—
ফুলে ফুলে উলসিনু
সে যাদু-কটাক্ষ পেয়ে।
জীবনের পাতে পাতে
শীতলতা গেল মেখে,
লভিনু যৌবন-চির;
আমি সেই দিন থেকে!

সোহাগিনি, ইথে তোর এত অভিমান?

১

সোহাগিনি—ইথে তোর এত অভিমান?
ছ মাসের শিশুটিরে, বুকে করে, ধীরে ধীরে,
আমার কোলেতে দিতে হলি আগুয়ান;—
আমি কহিলাম তোরে "থাকুক্ তোমারি কোরে"
তোর কেন হ'ল তায় আকুল নয়ান?
জলে বিজুলিতে ভরা, একখানি মেঘ ত্বরা
ছাইয়ে ফেলিল তোর বিশাল বয়ান!
অকারণ তব রোষ, আমার নহেক দোষ;
সোহাগিনি, ইথে তোর এত অভিমান?

(২)

ফুলশিশু আঁখি খুলে, তরুশাখে দুলে দুলে,
দেখে যবে মুগ্ধদুখে উষার বয়ান,
ভুবন ফিরাতে নারে আপন নয়ান!
তরুকোল শূন্য করি, সে তরুদুলালে হরি,
আমি কি আনিতে পারি থাকিতে এ প্রাণ
সোহাগিনি, ইথে তোর কেন অভিমান?

(৩)

ঝক্ মক্ পাখা দুটি, উষার অলকে উঠি,
খোলে যবে প্রজাপতি রূপের দোকান,
ভুবন করে গো তার কতই বাখান!
সোণার পাখীরে ধরি, কনক কণিকা হরি,
কে চায় করিতে তার খেলা-অবসান!
সোহাগিনি, ইথে তোর কেন অভিমান?

(৪)

শাখা নাচে, ফুল দোলে, চারিধারে ফল ঝোলে,
পাপিয়া মগন প্রাণে ছাড়ে যবে তান;
অবাক অবনি শোনে হইয়ে অজ্ঞান!
সে মধুর নিকুঞ্জ হ'তে, টানি আনি পিঞ্জরেতে,
কে চায় শুনিতে বল বাউলের গান?
মিছামিছি তব রোষ, আমার নহেক দোষ!
সোহাগিনি, ইথে তোর এত অভিমান!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

জগন্নাথের মূর্ত্তি প্রকাশ। শ্রীল নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

লেখক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী,—এ পুস্তকে তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন,— ইহা প্রকৃতপক্ষে কোন হিন্দু দেবমূর্ত্তি নহে—জগন্নাথ খৃষ্টের ক্রুশের প্রতিরূপ মাত্র। হিন্দু পাঠক ইহা শুনিয়া অবশ্য হাসিবেন, কিন্তু ইহা সত্বেও আমাদের অনুরোধ তাঁহারা বইখানি একবার পড়িয়া দেখুন। লেখকের এ সম্বন্ধীয় প্রমাণ সকলের নিকট কতদূর গ্রাহ্য হইবে তাহা যদিও আমরা বিচারে অসমর্থ, তাহার বিচার করিবেন পুরাতত্ত্ববিদেরা; তবে আমরা ইহা বলিতে পারি, এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে লেখকের সংযোজনা শক্তি ও প্রমাণ কৌশলের আমরা বিস্তর প্রশংসা করিয়াছি। জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় প্রবাদ এবং তাঁহার পূজা পদ্ধতি, মূর্ত্তি, প্রভৃতি সমস্তের সহিত তিনি বাইবেল-কথিত ব্যাপারের আশ্চর্য্যরূপ মিল দেখাইয়াছেন।

হ্যারল্ড এণ্ড কোম্পানি।
"কলিকাতা মিউজিক্যাল ডিপো"
দেশীয় গৎ বাজাইবার মিউজিক্যাল বাক্স।

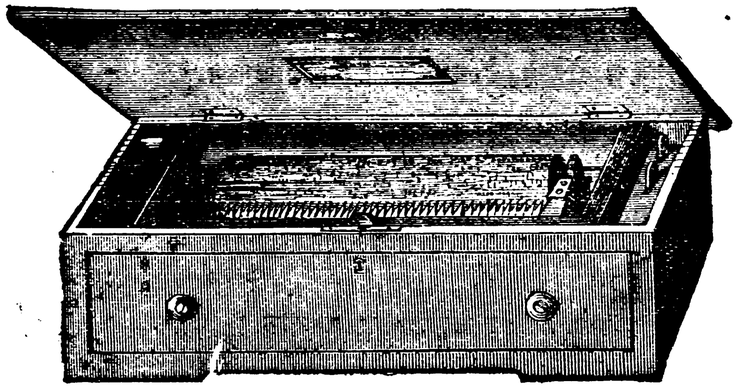

হ্যারল্ড এণ্ড কোং সম্প্রতি দেশীয় গৎ বাজাইবার বাদ্যযন্ত্রের যে নূতন আমদানি করিয়াছেন, তৎপ্রতি সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আহ্বান করিতেছেন এবং ইহা অপেক্ষা ভাল জিনিস ভারতবর্ষে যে আর কখনই বিক্রয়ার্থ আসে নাই—তাহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে তাঁহাদিগের কোন সঙ্কোচ নাই।

এই সকল যন্ত্রে যে যে গৎ বাজে, তাহা উৎকৃষ্ট সঙ্গীতপারদর্শী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছে, এবং তাঁহারা ইহাকে সম্পূর্ণরূপ নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করেন।

আমাদিগের মিউজিক্যাল বাক্সের বিশেষ তালিকা দখিলেই মূল্য ও অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। উক্ত তালিকা পত্র লিখিলেই বিনা খরচে প্রাপ্ত হইবেন।

হ্যারল্ড ফ্লুটস্				প্রত্যেকটা ১২৫৲	টাকা হইতে—
হারমনি ফ্লুটস্ (বাক্স হারমোনিয়ম)				„ ৪০৲	„ „
হারমোনিয়ম (ফুল সাইজ)				„ ১২০৲	„ „
ভায়োলিন	...	...	...	„ ১০৲	„ „
ক্লারিওনেট	...	...	...	„ ১৬৲	„ „

সর্ব্বপ্রকারের বাদ্য যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদা মজুত থাকে। পত্র লিখিলে মূল্যের তালিকা কোম্পানি ডাকমাশুল দিয়া পাঠাইয়া থাকেন।

হ্যারল্ড এণ্ড কোম্পানি।

বাদ্য-যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকাদি আমদানি-কারক

৩ নং ডেলহৌসী স্কয়ার—কলিকাতা।



বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

আগমনী।

জীর্ণ শীর্ণ তনু, অবসন্ন প্রাণ,
বিষাদ সলিলে ম্লান দুনয়ান,
অন্ন নাহি গৃহে, দেহে নাহি বাস,
আঁধারের মাঝে করিতেছে বাস।
কাতর হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে সবে
বলে সুধু, কবে মরণ গো হবে?
আজ তারা ওই, কি দেখে স্বপন
শুনিয়ে কাহার মধুর বচন,
রোদন ত্যজিয়ে পরি নব বাস
কার কাছে ধায়, কি পেয়ে আশ্বাস!
হাসি মুখে এসে কেঁদে চলে যায়
কেন হ'ল হেন—একি দুঃখ হায়!
শোক তাপ ভুলে বড় আশা ক'রে
এসেছিল ওরা মায়ের দুয়'রে,
মুছিল না অশ্রু, পুরিল না আশ,
মিটিল না ক্ষুধা, ঘুচিলনা শ্বাস,
এসেছিল সবে মা দেখিব বলে
শূন্য প্রাণে ওই ফিরে গেল চলে!
পাষাণ-তনয়া তুই কি পাষাণী?
নানা মা তুমি যে জগত-জননী!

দরিদ্র সন্তানে লও তুলে কোলে,
ব্যথা মুছে দাও আশা-কথা বোলে,
সিংহ-বিহারিণী দশভুজা সাজে,
কেন মা উদয় ভারতের মাঝে!
ক্ষুধিত কাতর দীন হীন অতি,
দেখিতেছ তব সন্তান-দুর্গতি,
হেথা কেন এলে পরি রণ-বাস
ব্যাকুল পরাণে জাগাইতে ত্রাস!
অন্নপূর্ণা-বেশে কর আগমন
দেখিয়ে হরষে গলে যাক্ মন!
দশভুজে তুমি অন্ন কর দান
কোলে লও তুলে ব্যথিত সন্তান!
ফেলে দাও দেবি, অস্ত্র-সজ্জা সব
শুধু আন তব জননী-গৌরব!
একদিন তরে দেখি মার মুখ
ভুলে যাই মোরা ক্ষুধা ব্যথা দুখ,
ভুলে যাই লাজ, ভুলি অপমান
মার কোল পেয়ে—সব অবসান।



লজ্জাবতী।

(১)

শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোট বেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল; কোন দোষ করিলে পিতা মাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন ত অমনি সে লজ্জাবতী-লতাটির মত সঙ্কুচিত জড় সড় হইয়া পড়িত, তাহার ছোট্ট, গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত তাহার ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার ইচ্ছায় হাসিতে চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। তাই তাহার বাপ মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—লজ্জাবতী।

লজ্জাবতীর পিতা মাতা এই মধুর কোমল অভিমানের মধ্যে হৃদয় মাধুর্য্য প্রকাশিত দেখিতেন, তাই তাঁহারা সাদরে ইহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু শ্বশুর গৃহে লজ্জাবতীর এই অকৃত্রিম বিনয় নম্রতা প্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জা মাধুরী কখনও আদৃত হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারে নীরবতার গীতি-মাহাত্ম্য সকলের প্রাণে পৌঁছে কি?

সে ত প্রশংসার কাজ করিয়া ঢ্যাঁড়রা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথার ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোন কথা না কহিয়া নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করে, সে জানে ইহাতেই তাহার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিবে। কিন্তু কঠোর সংসারে কোমল অশ্রুর সাক্ষ্য কয়জন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে? ইহাতে বরং তাহার দোষই সপ্রমাণিত হয়; সুতরাং যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতামাতার আদরের ছিল সেই স্বভাবের গুণেই শ্বশুর-গৃহে প্রতিপদে তাহাকে তাড়না সহ্য করিতে হয়।

শীতের প্রভাত, কিন্তু আজ কুয়াসা নাই, নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যের অগ্নি-গোলক জ্বলন্ত মহিমায় বিরাজিত হইয়া দিক বিদিক বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছে, লজ্জাবতী ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, তাহার ঘরের দেয়ালে সূর্য্যকিরণ ঝিক ঝিক করিতেছে; ভাবিল কত না জানি বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, একবার মাত্র আকাশের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে সূর্য্য প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া দ্রুতপদে রন্ধন-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার যা তখনো আসেন নাই; দাসী উনুন ধরাইয়া বাঁটনা বাটিতেছে; সে তখন নিশ্বাস ফেলিয়া সুস্থির ভাবে কুটনার আয়োজন করিয়া লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল। সে দিন তাহার রাঁধিবার পালা নহে, বড়বৌ রাঁধিবেন; সে যোগাড় দিবে মাত্র। তাহার কুটনা কুটা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই

সময় শাশুড়ি আসিয়া সহাস্য মুখে কোমল স্বরে বলিলেন—"বৌমা শুনেছ—?" দ্বাদশ বৎসর লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে—এমন সাদরে শাশুড়ি আর তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে নাই, সে শাশুড়ির পানে চাহিতে গিয়া খতমত খাইয়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল—শাশুড়ি বলিলেন—"শুনেছ ফুলকুমারী আসছে—?" লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইয়া ফেলিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশক স্বরে বলিল—"ঠাকুরঝি!" আশ্চর্য্য হইবারই কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়া অদ্যাবধি কখনো এ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই চতুর্দ্দশ বৎসর হইল ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে—বিবাহের পর একবারো সে বাপের বাড়ী আসে নাই, শ্বশুর ধনীলোক, পুত্রবধূকে এই গৃহস্থ ঘরে পাঠাইতে তিনি অপমান জ্ঞান করিতেন। শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে; তাই এত দিন পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিতেছে। শাশুড়ি আবার বলিলেন, "আজ কার রাঁধার পালা? বড় বৌয়ের বুঝি? তা দেখো বাছা, বড় মানুষের বৌ—এত দিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কমি না হয়।" শাশুড়ি চলিয়া গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে চুবাইয়া ধরিয়া লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল আজ এই সুপ্রভাত যে আনিয়াছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী উষাময়ী প্রতিমা? এই কঠোর অন্ধকার প্রান্তর এতদিনের পরে প্রেমের আলোকে আলোকিত দেখিব। এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(২)

একে কন্যা, তাহে ধনীর ঘরণী, গৃহে আসিয়াছে আবার অনেক দিনের পর;—চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুরে আজ পর্ব্বোৎসবের ধূম, কাহারো মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত, দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোটছোট ছেলে মেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া অনন্দে কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি আসছেন গো"।

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলেই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতাবেড়ি ফেলিয়া যাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বার দেশে আসিয়া উকি মারিল। রন্ধন গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত পালকি,—অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার বিভূষিতা দুই দাসী, এই উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জাবতীর স্ফীত হৃদয় সহসা দমিয়া গেল,—ধনীর নিকট দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা-সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পারে?

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাহার এ ভাবনা দূর হইল; এই আড়ম্বরের মধ্যে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লমুখী অসামান্যা রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহার হৃদয় আবার উত্তাল আনন্দ অরঙ্গে তরঙ্গিত

হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্না ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলুদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল, বড়বৌ রাগিয়া বলিলেন "ও আবার কি সোহাগীপণা"! সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়ের রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল; তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন "কাজের সময় ওসব ন্যাকরামি ভাল লাগে না—কি হাসিই পেয়েছ!" ছোট বৌ বুঝিল, কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, বড়বৌ আবার বলিলেন, "ভ্যালা আদুরেপণা শিখেছিলি! আদুরেগিরি ফলাতে হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ফলাস; আমাদের ওসব ভাল লাগে না"—এই কড়া কথায় তাহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, কিন্তু তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহার স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলকা ফিরিয়া আসিয়াছে।

* * * * * * * * * *

আর লুকাইয়া এক তরফা দেখা নহে—এবার চোখে চোখে মিলন। বধূরা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীর নবনী, দধি দুগ্ধ ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন স্থানে লইয়া আসিলেন। আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমারী বড়বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একি করেছিস্ লো, এত কেন! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি?" বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোম্‌টার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল "তা নইলে এতদিন পরে বাপের বাড়ী আসিস্? এখন বস, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকিলেই বুঝবে কচলো না।"

"মরে যাই আমি কি রাক্ষস নাকি? ও কে, বড়বৌ?"

মা তাহার উত্তর-স্বরূপ বলিলেন—"তা জানিসনে ফুলি, ও যে ছোট বৌ, কি করেই বা জান্‌বি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমের বিয়েতেও ত একবার পাঠালে না, এত করে বল্লুম—তা একবেলাও না। এমন জান্‌লে কি ওমন ঘরে বিয়ে দিই!"

ফুলকুমারী বলিল "ঐ ছোট বৌ!"

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল "এই ছোট বৌ! দেখি লো দেখি, মুখ খোল" বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোম্‌টা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। ফুল বলিল "ওমা বেশ বৌ হ'য়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!" ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এই কথা বলিল, ছোটবৌ হাসিয়া মুখ হেঁট করিয়া ঘিয়ের বাটী ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

(৩)

কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে, ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের সেই প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুর কথা,

সময় শাশুড়ি আসিয়া সহাস্য মুখে কোমল স্বরে বলিলেন—"বৌমা শুনেছ—?" দ্বাদশ বৎসর লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে—এমন সাদরে শাশুড়ি আর তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন বলিয়া তাহার মনে নাই, সে শাশুড়ির পানে চাহিতে গিয়া থতমত খাইয়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল—শাশুড়ি বলিলেন—"শুনেছ ফুলকুমারী আসছে—?" লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইয়া ফেলিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশক স্বরে বলিল—"ঠাকুরঝি!" আশ্চর্য্য হইবারই কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়া অবধি কখনো এ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই চতুর্দ্দশ বৎসর হইল ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে—বিবাহের পর একবারো সে বাপের বাড়ী আসে নাই, শ্বশুর ধনীলোক, পুত্রবধূকে এই গৃহই ঘরে পাঠাইতে তিনি অপমান জ্ঞান করিতেন। শশুরের মৃত্যু হইয়াছে; তাই এ দিন পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিতেছে। শাশুড়ি আবার বলিলেন, "আজ কার রাঁধার পালা? বড় বৌয়ের বুঝি? তা দেখো বাছা, বড় মানুষের বৌ—এত দিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কমি না হয়।" শাশুড়ি চলিয়া গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে চুবাইয়া ধরিয়া লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল আজ এই সুপ্রভাত যে আনিয়াছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী উষাময়ী প্রতিমা? এই কঠোর অন্ধকার প্রান্তর এতদিনের পরে প্রেমের আলোকে আলোকিত দেখিব। এক অপূর্ব্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(২)

একে কন্যা, তাহে ধনীর ঘরণী, গৃহে আসিয়াছে আবার অনেক দিনের পর;—চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুরে আজ পর্ব্বোৎসবের ধূম, কাহারো মুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত, দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোটছোট ছেলে মেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া অনন্দে কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি আসছেন গো"।

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলেই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন,—লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতাবেড়ি ফেলিয়া যাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বার দেশে আসিয়া উকি মারিল। রন্ধন গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত পালকি,—অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার বিভূষিতা দুই দাসী, এই উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জাবতীর স্ফীত হৃদয় সহসা দমিয়া গেল,—ধনীর নিকট দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা-সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পারে?

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাহার এ ভাবনা দূর হইল; এই আড়ম্বরের মধ্যে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লমুখী অসামান্যা রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাহার হৃদয় আবার উত্তাল আনন্দ অরঙ্গে তরঙ্গিত

হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্না ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলুদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল, বড়বৌ রাগিয়া বলিলেন "ও আবার কি সোহাগীপণা"! সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়ের রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল; তিনি ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন "কাজের সময় ওসব ন্যাকরামি ভাল লাগে না—কি হাসিই পেয়েছ!" ছোট বৌ বুঝিল, কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, বড়বৌ আবার বলিলেন, "ভ্যালা আদুরেপণা শিখেছিলি! আদুরেগিরি ফলাতে হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ফলাস; আমাদের ওসব ভাল লাগে না"—এই কড়া কথায় তাহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, কিন্তু তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহার স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলকা ফিরিয়া আসিয়াছে।

* * * * * * * * * *

আর লুকাইয়া এক তরফা দেখা নহে—এবার চোখে চোখে মিলন। বধূরা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীর নবনী, দধি দুগ্ধ ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন স্থানে লইয়া আসিলেন। আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমারী বড়বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একি করেছিস্ লো, এত কেন! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি?" বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোম্‌টার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল "তা নইলে এতদিন পরে বাপের বাড়ী আসিস্? এখন বস, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকিলেই বুঝব রুচলো না।"

"মরে যাই আমি কি রাক্ষস নাকি? ও কে, বড়বৌ?"

মা তাহার উত্তর-স্বরূপ বলিলেন—"তা জানিসনে ফুলি, ও যে ছোট বৌ, কি করেই বা জান্‌বি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমের বিয়েতেও ত একবার পাঠালে না, এত করে বল্লুম—তা একবেলাও না। এমন জান্‌লে কি ওমন ঘরে বিয়ে দিই!"

ফুলকুমারী বলিল "ঐ ছোট বৌ!"

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল "এই ছোট বৌ! দেখি লো দেখি, মুখ খোল" বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোম্‌টা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। ফুল বলিল "ওমা বেশ বৌ হ'য়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!" ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এই কথা বলিল, ছোটবৌ হাসিয়া মুখ হেঁট করিয়া ঘিয়ের বাটী ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

(৩)

কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে, ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের সেই প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুর কথা,

সমস্তক্ষণ তাহার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছে,—লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় সলজ্জ আগ্রহে অধরের মৃদু হাসি চাপিয়া অধীর চরণ ধীরে ধীরে বিক্ষেপ করিয়া দোতালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় পুটুরাণী আসিয়া বলিল—"মা আমার ফুল কাঁটা ফিতে দে, পিশিমা চুল বেঁধে দেবে।" লজ্জাবতী সহসা স্বপ্নরাজ্য হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"সে কি, তোর ফুল কাঁটা ত আমি রাখিনি!" মেয়ে বলিল—"রাখিসনি কি! সেই যখন তুই কুটনো কুটছিলি আমি তোর কাছে রেখে এলুম।" মা বলিলেন—"কই আমিত তা জানিনে; আমাকে ত বলে আসিস্‌নি।" সে বলিয়া আসে নাই সেটা ঠিক! কিন্তু মা যে তুলিয়া রাখেন নাই সেটাত আর তাহার দোষ নহে। মেয়ে মুখ ঝামটা দিয়া বলিল—"কাছে রেখে এলুম—তা আর বলে আস্‌ব কি! শীঘ্র আমার দড়ি কাঁটা দে।" লজ্জাবতী নিজের দোষটাই বুঝিয়া তাহাকে আর কিছু না বলিয়া গহনা খুঁজিতে আবার নীচে নামিলেন,—আর ফুলকুমারীকে দেখিতে যাওয়া হইল না।

এদিকে দাসী আসিয়া গৃহিণীকে বলিল "দিদিমণির বিছানা ত করে এনু—তা গায়ের নেপ কি দেব?—একটা দাও।" ফুলকুমারী তখন বড় বৌয়ের ঘরে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল গৃহিণী একাকী ছিলেন দাসীর কথায় তিনি তাঁহার তলপী তলপা খুঁজিয়া একটিও ভাল লেপ পাইলেন না,—সবই ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতা চলে, কিন্তু বড় মানুষের বৌকে পায়ে দিতে দেওয়া যায় না। গৃহিণী ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তবে বিপদে পড়িলে যাঁহার বুদ্ধি না যোগায় তিনি স্ত্রীলোকই নহেন; মুহূর্ত্তের মধ্যেই উপায় আবিষ্কৃত হইল, দাসীকে বলিলেন "দ্যাখ, আজ ত হেম পশ্চিম যাবে, ছোট বৌয়ের গায়ের লেপটা ফুলির বিছানায় দিগে, আর এর একটা আমি বেছে রাখি; এসে তখন ছোট বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাস্!" দাসী তখন চলিয়া গেল, তাহার খানিক পরে আসিয়া বলিল—"এমন অগোছাল বৌও দেখিনি! পুটুরাণী গহনা রাখতে দিয়েছিল—হারিয়ে, খুঁজতে নেগেছে তাই তাকে আর বলতে পেনুনা আপনিই নেপটা নিয়ে দিদিমণির বিছানা করে এনু।"

"গহনা হারিয়েছে! কি গহনা?"

"মাথার ফুল গো ফুল! দেখ মা আমাদের দায়ে মজিও না? তোমরা সব হারাবে; আর আমরা গরীব মানুষ মারা যাব,—"

গৃহিণী এই খবরে রাগিয়া আগুণ হইলেন, আজ আনন্দের দিন, মেয়ে ঘরে আসিয়াছে—আর কি না পোড়ারমুখী বৌ গহনা হারাইয়া অলক্ষণ করিয়া বসিল। তিনি প্রথমে বড় বৌয়ের ঘরে আসিয়া খবর দিলেন—"শুনেছিস্? ছোট বৌ গহনা হারিয়েছে! এই সেদিন চেলির কাপড় খানা হারালে আবার আজ এই কীর্ত্তি! এমন উড়নচণ্ডী বৌ—"

ফুল বলিল—"মা তা দৈবাৎ হারিয়েছে, ওত আর ইচ্ছে করে হারায় নি"—ফুলকে তাহার পক্ষ লইতে দেখিয়া মায়ের রাগ আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "তুমি ত বাছা বৌয়ের গুণ জান না তাই ওকথা বলছ, দিন কতক থাক তখন বুঝবে, দেখতে

মুখখানি অমন—পেটে পেটে দুষ্টুমি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছে! আর গহনাত ওর যাবে না, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! তুই আজ বাড়ী এসেছিস, তাই ইচ্ছে করেই অলক্ষণ করছে।" বড় বৌ কোন কথা কহিল না; তিন জনে মিলিয়া ছোট বৌয়ের সন্ধানে চলিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না, ছোট বৌ নীচের সব ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিতেছিল, বারান্দায় দাঁড়াইয়াই শাশুড়ির তীব্রস্বর তাহার কাণে পৌঁছিল—"কি গহনা আবার হারিয়েছিস! (যেন চিরকাল ধরিয়া সে গহনাই হারাইয়া আসিতেছে) বাড়ীতে আর লক্ষ্মী রইলো না! পরের বাড়ী মেয়ে পাঠানই বা যাবে কি করে? শ্বশুররা যখন বলবে আমাদের গহনা কি হোল তখন লজ্জায় না মুখ কালী হয়ে যাবে!"

লজ্জাবতী আস্তে আস্তে বলিল, "শ্বশুর বাড়ীর গহনা নয়; আমার বাবা আমাকে যে ফুল দিয়েছিলেন তাই পরিয়ে দিয়েছিলুম—"

"বটে তোমার বাবা তোমায় যা দিয়েছেল তাই হারিয়েছ! তা আমরা কথা কয়েছি ঘাট হয়েছে। দোষ করলেই কথা কইতে হয়—তা কথা কইলেই অমনি বাপের বাড়ীর তুলনা। দেখলি বাছা ফুলি, দেখ—একবার মায়ের অপমানটা দেখ—"

বড় বৌ বলিল, "হলই বা বাপের বাড়ীর গহনা, জিনিষটাত হারাল,"

শাশুড়ি বলিলেন—"হারাক—হারাক—সব যাক, আমাদের কথা কয়ে কাজ কি? বলব কি হরিমোহন ঘোষের মেয়ে, নইলে এমন বৌ নিয়ে ঘর করতে পারত না, আর বাছা। তোরা কেউ কথা কসনে,—"

শাশুড়ি চলিয়া গেলেন, ঘরে গিয়া সেই কথা লইয়াই গুলজার করিতে লাগিলেন। ছোট বাবু সেদিন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সেই সকল কথা তাঁহার কাণে উঠিল, মা নানা কথার পর বলিলেন—"বাছা তোদেরত এখন ঘর সংসার হয়েছে, আমাকে ত আর দরকার নেই—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে এখানে থেকে এসব অপমান আমার আর সয় না!" ছোট বাবু ছোট বৌয়ের ব্যবহার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, গোলযোগের আর ছাই কি দিন ছিল না, আজ বিদেশ যাইবার দিনে যত হেঙ্গাম? তিনিত গৃহে গিয়াই ছোট বৌকে বকিতে লাগিলেন কেবল বকিলেও রক্ষা ছিল,—বলিলেন "আমি আর এরূপ গোলযোগ সহিতে পারি না, এই চলিলাম আর ফিরিব না!"

স্বামীকে যদি লজ্জাবতী সব খুলিয়া বলে ত এতটা কিছুই হয় না; কিন্তু স্বামীর কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়া উঠিল যে তাহার মুখ দিয়া একটি কথা ফুটিল না! বিদায়ের দিনে এইরূপ স্নেহ সম্ভাষণ জানাইয়া যখন চলিয়া গেলেন, সে বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কেবল কাঁদিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহার উপায় কি! যেরূপ স্বভাব লইয়া সে জন্মিয়াছে!

(৪)

চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছে, এ বাড়ী তাহার আপনার বাড়ী হইলেও তাই তাহার চোখে ইহার সমস্তই নূতন লাগিতেছে। মায়ের সে শ্রী নাই, তিনি এখন বৃদ্ধা, বালিকা বড় বৌ এখন গৃহিণী, দাদারা সব বড় বড়, ঘরে ঘরে বালক বালিকা সকলি তাহার কাছে নূতন, সর্ব্বাপেক্ষা নূতন, লজ্জাবতী, এবং তাহার প্রতি বাড়ীর ব্যবহার! সে যেন ছাই ফেলিতে ভাঙ্গাকুলা, তাহাকে যা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্য্যন্ত—এমন কি মাসীরা পর্য্যন্ত বকে, তাহার কি দোষ, কোন দোষ আছে কি না ইহা বিচার করিয়া দেখিবারও কেহ আবশ্যক বিবেচনা করে না,—লজ্জাবতীও কখনো নিজের দোষের প্রতিবাদ করে না।

ফুলকুমারী অবাক হইয়া গেল—তাহার হৃদয় মমতার্দ্র হইয়া পড়িল। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ লইয়া মাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখিল বৃথা চেষ্টা, যা তাহাতে আরো বেশী রাগিয়া যান। এদিকে নিষ্ফল হইয়া সে সন্ধ্যার পর লজ্জাবতীর কক্ষে গমন করিল, যদি কোনরূপে তাহাকে একটু সান্তনা দিতে পারে। গৃহ দ্বারে আসিবা মাত্র দাদার রুষ্টস্বর তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, ফুলকুমারী ভিতরে না গিয়া সেই খানেই দাঁড়াইল। তখনি প্রায় দাদাকে গৃহের বাহিরে দেখিয়া বলিল "দাদা, বৌকে বকছ, আমিত বৌয়ের কোন দোষ দেখছিনে"—দাদা সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তবে দোষ কার?"

"দোষ যদি ধরিতে হয় ত পুটুরাণীর নহিলে কাহারো দোষ নেই। সে যদি বৌকে গহনার কথা বলিয়া আসিত তাহা হইলে ত আর চুরী যায় না।"

"কিন্তু মায়ের মুখের উপর অমন চোপা করার কি আবশ্যক ছিল?"

ফুলকুমারী একটু খানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "দাদা, সেটা ঠিক চোপা নয়, মা যদি বুঝে দেখতেন, তাহলে তাতে রাগ করতে পারতেন না, তবে এখন বুড় হয়েছেন এক বুঝতে আর বুঝে বসেন—কিন্তু তাই বলে তুমিও দাদা ভুল বুঝো না। কি হয়েছে বলি শোন।" কি কথার পর লজ্জাবতী মাকে কি বলিয়াছিল, ফুলকুমারী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি ওর দোষ পেলে?" দাদা বলিলেন "না।"

ফুল। তবে ভেবে দেখ দেখি, বিনা দোষে তুমি পর্য্যন্ত ওরূপ করে বকলে ওর কি কষ্ট হয়! বিশেষ আজ বিদেশে যাবার দিন ওকে এরূপ করে বকে যাচ্ছ তোমার একটু মায়া করে না!

দাদা আর কিছু না বলিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন; শয্যায় আসিয়া দেখিলেন লজ্জাবতী কাঁদিতেছে, নিকটে বসিয়া আদর করিয়া কহিলেন "লজ্জাবতি, তুই কি চিরকাল লজ্জাবতী থাকবি? এতক্ষণ সব খুলে বল্লেইত আমি বুঝতুম তোর দোষ নেই, যা হয়েছে হয়েছে আর কখনও তোকে বকবনা; আমায় মাপ কর।" লজ্জাবতী গভীর সুখে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

(৫)

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—রাত্রি গভীর, চারিদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু লজ্জাবতীর নিদ্রা আসিতেছে না। গভীর কষ্টের পর স্বামীর প্রেমাদর পাইয়া কৃপণের ন্যায় সে তাহা এখনো আস্তে আস্তে উপভোগ করিতেছে। এক এক বার তাহার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, স্বামী সব কথা কি করিয়া জানিলেন,—কে বলিল? সহসা সে চমকিয়া উঠিল, ফুলকুমারী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল, "বৌ এখনো বিছানায় যাসনি?" স্বামীকে বহির্বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া আসিয়া সেই যে সে নীচে সতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়াছে—আর ওঠে নাই। ফুলকুমারীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"ঠাকুরঝি তুমি এখনো শোওনি?" ঠাকুরঝি বলিলেন—"আমি শুয়েছিলুম বিছানা থেকে উঠে তোকে দেখতে এলুম, দাঁড়া প্রদীপটা কাছে আনি, ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছে না।" ফুলকুমারী দীপটা নিকটে আনিয়া ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া নিকটে বসিল, বসিয়া বৌয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "তোর না ভাই বার বছর বিয়ে হয়েছে? আচ্ছা তখন কি তুই এর চেয়েও ছোট ছিলি! তোকে এখনো এমন ছোট দেখতে, মনে হয় যেন তুই কনে বৌটি!"—বৌ একটু হাসিল—ননদ তাহার হাতটি হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল "তুই ভাই অমন কেন?"

"কেমন?"

"যেখানে তোর দোষ নেই সেখানেও কথা কোসনে?"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয়, কে জানে আমি কি রকম করে বলি, সবাই ভুল বোঝে?"

"দাদাও? কেন আমিত দাদাকে বুঝিয়ে বলতে তিনি সব বুঝিলেন।"

ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ হইয়া স্বামীকে সব বলিয়াছে, তাহার জন্যই সে স্বামীর আদর পাইয়াছে, কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল "তিনি কিছু বল্লে আমার বড় কান্না পায়।"

"তাইতে কোন কথা ফুটে বলা যায় না? বুঝেছি!"

"না তা ঠিক না, তিনি বিরক্ত হ'য়ে তারপর আর জিজ্ঞাসা করেন না"—

"হায়রে আমার অভিমানিনি! কে জানে ভাই তোকে সবাই বকে কি করে! কি করে তোর উপর রাগ করে!"

"দিন কতক পরে তুমিও বকবে! দেখবে আমার উপর রাগ না করে লোকে থাকতে পারে না।"

"কক্ষণো না"

"যদি দোষ করি?"

"তাহলেও না। তোকে যে সকলেই বকে আমি কোন্ প্রাণে বকব!" লজ্জাবতী

এই কথায় তাহার হাত দুটি টিপিয়া বলিল—"তাও নাকি কখন হয়।" খানিক পরে ফুলকুমারী চলিয়া গেলেন, বৌ বিছানায় গেল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা, স্বামীর আদর, ফুলকুমারীর সস্নেহ বাক্য তাহার অকৃত্রিম সখীত্বভাব তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে লাগিল; সুখের চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাত সে জাগিয়া কাটাইল।

ভোর বেলা উঠিতে গিয়া দেখিল মাথা বড় ঘুরিতেছে—আবার সে শুইয়া পড়িল। ফুলকুমারী সকালে গৃহে আসিয়া বৌকে তখনও শয্যায় দেখিয়া মশারীর দরজাটা একটু খুলিয়া যখন উঁকি মারিল, লজ্জাবতী তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, লজ্জাবতীকে নিতান্ত বিবর্ণ, ক্লান্ত দেখিয়া ফুলকুমারী বলিল "বৌ, তোর কি অসুখ করেছে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি বলিল "না"

ফুলকুমারী বলিল—"কিন্তু তুই যে কাঁপছিস্, শীত করছে গায়ে কাপড় দেনা!"

লজ্জাবতী বিছানার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল "আমার নেপটা কই দেখছিনে ত"—গোলেমালে শাশুড়ির দত্ত লেপটি দাসী তাহার জন্য আনিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"ওমা সারারাত লেপ না গায়ে দিয়ে অমনি কাটিয়েছিস্! কেন তোর লেপ কোথায় গেল?"

"জানিনে, ঝি বুঝি শুকতে দিয়েছিল, তুলে দিতে ভুলে গেছে"—বলিতে বলিতে লজ্জাবতী বিছানার বাহির হইল। ফুলকুমারী তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "সত্যি বৌ, তুই এখন উঠিসনে, শুয়ে থাক, তোর কপালটা যেন গরম গরম মনে হচ্চে।" বৌ হাসিয়া বলিল "এখন শুয়ে থাকলে কি চলে? ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে, স্নান করলেই সেরে যাবে এখন।"

"কেন চলবে না কেন? আজ বুঝি তোর রাঁধার পালা—তা অসুখ করলেও পালা রাখতে হবে নাকি? আমি রাঁধব এখন।"

লজ্জাবতী জিভ কাটিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি—ক্ষেপেছ নাকি? সত্যি আমার কিছু হয় নি।" এমন আজগুবি অসম্ভব প্রস্তাব সে যেন জীবনে কখনো শুনে নাই। বলিতে বলিতে সে খাটে বসিয়া পড়িল। ফুল বলিল "আমার মাথা খাস, তুই শো,—" এমন সময়ে দাসী একটা লেপ আনিয়া বিছানায় ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার লেপ রইলো গো,—কাল আন্‌তে ভুলে গেছনু—তা উনুন যে বয়ে যাচ্ছে আজ কি আর রান্নাবান্না করতে হবে না?"

লজ্জাবতী বলিল "চল যাচ্চি"।

দাসী গেল, ফুল বলিল—"আমার কথা রাখবিনে, তবু রাঁধতে যাবি।"

বৌ কাতর হইয়া বলিল—"ঠাকুরঝি, তুমি রাঁধবে সে কি করে হবে?"

"কেন তাতে কি হয়! তবে আমি তোর এত পর,—বেশ।"—এই কথা বলিয়া ফুল রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, লজ্জা বলিল "শোন ঠাকুরঝি—না, তা নয়! কিন্তু মা তাহলে রাগ করবেন, তিনি ভাববেন—"

"তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া সে আমার!"

লজ্জাবতী একটু ভাবিল—ভাবিয়া সেই প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতাটা মনে মনে কল্পনা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল "ছি ছি তাও কি হয়! না ঠাকুরঝি সে কোন মতে হবে না!"

"কোন মতে হবে না! বেশ তুই রাঁধগে আমি কিন্তু সে রান্না খাব না।" ফুল রুষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল,—লজ্জাবতী ডাকিল—"ঠাকুরঝি!" কিন্তু ফুল আর ফিরিল না। লজ্জাবতী আর পারিল না—সে তাহার ঘূর্ণ্যমান উত্তেজিত উষ্ণ মস্তক লইয়া সেই খানেই শুইয়া পড়িল! এখনো একদিন যায় নাই ইহার মধ্যে ঠাকুরঝিও তাহার উপর রাগ করিল! সে বুঝিল এ রাগ ঠাকুরঝির স্নেহ হইতেই প্রসূত—সেই জন্যই তাহাতে তাহার হৃদয় অধিক বিদ্ধ হইল তাই অভিমানের দুঃখে তাহার ক্রন্দন উথলিয়া উঠিল সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে কহিল, ঠাকুরঝিও আমার উপর রাগ করিল—আমার মরণই ভাল!

(৬)

লজ্জাবতী খানিক পরে নীচে রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল ফুল উনুনে হাড়ি চড়াইয়া বড়বৌকে রান্না সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছে—বড় বৌ কুটনা কুটিতে কুটিতে হাসিয়া উত্তর করিতেছেন। ফুলের বাঁহাতী উনুনে ডালের হাড়ি—ডানদিকে কড়ায় তেল ফুটিতেছে—সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বৌলো! তেল ত চড়বড় করে এলো এখন তরকারী গুলো দিই?" বউ হাসিয়া বলিতেছে, "বলি তোমার অমন কাজ না করলেই কি নয়! চড়বড়ানি আগে থামুক তখন দেবে—" ফুল বলিল, "ঐ লো বড় বৌ ডাল উথলে উঠলো। কি করি আয় আয়—"

লজ্জাবতী বলিল, "এই যে আমি আসছি ঠাকুরঝি।" সে আসিতে আসিতে ডাল উথলিয়া খানিকটা ফুলের পায়ে পড়িয়া গেল। পা পুড়িল ফুলের তাহার জ্বালা ভোগ করিল যেন লজ্জাবতী। এই ঘটনায় এমনি সে ব্যথিত হইয়া পড়িল! সে শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি তাহার শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শাশুড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা তাইত! সত্যিই ফুলকুমারী রান্না ছে—আমার বিশ্বাস হয় নি! আবার পা পুড়িয়ে ফেলেছে! বলি সব রাজার ঝিরা! ননদ দুদিন মাত্র থাকতে এসেছে তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হল না—" বড় বৌ বলিল "আমিত সেই অবধি বারন করছি, তা ঠাকুরঝি ত শোনে না কি করব? ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে, না পারে—আমি রাঁধছি, তোর কেন বাবু আসা!"

শাশুড়ি। ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে তাই উনি রাঁধতে এয়েছেন! দেখ্ ফুলি,

আমি আজ মাথামুড় খুঁড়ে মরব! এদিকে আয় বলছি, মাইরি—এমন বৌও তো আমি কখনও দেখিনি!

ফুল বড় বৌয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না মা আমি সখ্ করে রান্তে এসেছি, আমি এই ডাল আর তরকারীটা রেঁধে যাচ্ছি—তুমি যাও"। মা বলিলেন, "তুমি রাঁধবে, আর বৌরা বসে থাকবে? আয় বলছি নইলে আমি রক্ষে রাখব না"—বলিয়া হেঁসেলে উঠিয়া ফুলের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া উপরে টানিয়া লইয়া গেলেন, এবং সমস্ত বেলা ধরিয়া এমন চোখে চোখে রাখিয়া দিলেন যে ফুলের আর লুকাইয়াও এ মুখো হইবার যো রহিল না।

(৭)

লজ্জাবতী তাহার অসুখ শরীর লইয়া নিস্তব্ধে রাঁধিল, কিন্তু রান্নার পর গৃহে আসিয়া সেই যে শুইয়া পড়িল, তাহার আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

বড়বৌ ফুলের ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া আসিল। পুটুরাণী পিসিমাকে ডাকিল "পিসিমা ভাত এসেছে খাওগে গো।" মা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আহার স্থানে আসিয়া ছোটবৌকে না দেখিয়া বলিলেন,"রাজার ঝির বুঝি আর এদিকে আসতে নেই!" পুটুরাণী বলিল, "মায়ের বড় অসুখ করেছে সে শুয়ে পড়েছে।"

শাশুড়ি বলিলেন, সব ভাণ, "কাজের নামে অমনি অসুখ!"

তাহার অসুখের কথা শুনিয়া ফুলের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল—বুঝিল বিশেষ অসুখ না হইলে সে এখানে আসিত। সে বলিল, "না, মা! সকাল থেকে তার অসুখ করেছে রেঁধে ভাল করেনি, একটা বাড়াবাড়ি না হয়।" মা বলিলেন—"অমনি বাড়াবাড়ি হোল! একটু বুঝি মাথা ধরেছে আর পড়ে আছে গেরস্থের বাড়ী অত বড়মানষী করলে চলে না।"

ফুল আর কিছু না বলিয়া আহারের পর তাহার গৃহে গমন করিল, মাও তাহার সঙ্গ লইলেন। লজ্জাবতীকে দেখিয়া শাশুড়ির জ্ঞান জন্মিল, সে সত্যই পীড়িত। ফুল তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ! আগুণ যে! বৌ শীতে কাঁপছে, আবার লেপটা গেল কোথা? কাল ত বৌয়ের বিছানায় মোটেই লেপ ছিল না—সারা রাত শীতে সারা হয়ে আসলে এ অসুখটা হয়েছে!"

শাশুড়ি বলিলেন, "বড় মানষের ঝি! একটা লেপ দিয়েছিলুম তা ফেরত দেওয়া হয়েছে! গেরস্তঘর একদিন কি নিজের ভাল লেপটি নইলে চলে না! না হয় ননদকেই গায়ে দিতে দিয়েছিলুম—তার জন্যে একেবারে অসুখ বাধান!"

লজ্জাবতী জানিতই না যে শাশুড়ি তাহার লেপ ফুলকে দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য লেপ দিয়াছেন। সকালে রন্ধন-গৃহে যাইবার সময় সে বিছানা তুলিতে গিয়া দেখিল, লেপটা তাহার নাই, ভাবিল দাসী শাশুড়ির লেপ তাহাকে বদল করিয়া দিয়াছে—তাই পুটুরাণীকে দিয়া লেপটা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফুল বলিল, "সে যা হোক,

এখন একটা লেপ পাঠিয়ে দেও দেখি!" শাশুড়ি চলিয়া গেলেন। ফুল লজ্জার সেই করুণ কাতর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন আমি জোর করে রাঁধলুম না, তাহলে ত তোর এই অসুখ হোত না!"

লজ্জাবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সে বলিল, "না আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বল দিদি তোমার আর রাগ নেই—তুমিও ভাই আমার উপর রাগ করলে!" ফুলকুমারী কাঁদিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল "আর আমি কখনো রাগ করব না—বল ভাই তুই কিছু মনে করবি নে!" লজ্জাবতী কোন কথা কহিল না তাহার মাথা ফুলের বুকে রাখিয়া গভীর প্রশান্ত সুখে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে এক হইয়া, বুকে বুকে রাখিয়া দুজনে অশ্রুজলে অশ্রুজল মিলাইল। বুঝি বা লজ্জাবতীর কাঁদিবার সাধ মিটিল!

ইহার পর আর সে কাঁদিল না—স্বামী যে কথা দিয়াছিলেন, ফুল যে কথা দিয়াছিল তাহা ঠিক রহিল—আর কখনো লজ্জাবতীকে তাহাদের বকিতে হইল না!—কয়েক দিনের মধ্যেই লজ্জাবতী রুগ্ন শয্যা হইতে একবারে চিতা-শয্যায় শয়ন করিল।

শাশুড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আহা গেল গো—নিজের দোষে প্রাণটা খোয়ালে! রাগ করে লেপটা গায়ে দিলে না গা! রাগ করে বল্লে না যে অসুখ করেছিল,—" দাসী চাকর, যা, সকলেই এই এক ধুয়া ধরিয়া কাঁদিলেন,—কেবল একটি গভীর আকৃষ্ট, অনুতপ্ত হৃদয় তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া নির্জ্জনে মর্ম্মান্তিক দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া মনে মনে কহিল,—হায় হায়, কি হার করে! কেন রাগ করিয়া কথা কহিলাম! বুঝি সে ঐ অভিমানেই! তখন আমিই তাকে মারিলাম! একবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি—একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই—আদরের ভিখারিণি তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত আমার মর্ম্মে বিঁধিয়া থাকিবে!

শিবনারায়ণদেবের জীবনচরিত।

শিবনারায়ণ যে দিন শান্তিপুর পৌঁছিলেন সেই দিবস কয়েকজন পণ্ডিত পরস্পর গায়ত্রীর প্রচোদয়াৎ শব্দের অর্থ করিতেছিলেন, কেহ বলিতেছেন যে প্রচোদয়াৎ শব্দ ঠিক এবং কেহ বলিতেছেন যে প্রচোদয়তাং ঠিক। এইরূপে দুইদিক হইতে চলিতেছে যে তুমি অশুদ্ধ বলিতেছ তুমি কিছুই জান না; এবং অন্যজন বলিতেছেন যে তুমি কিছুই জান না তোমার অশুদ্ধ বলা হইয়াছে আমি যা বলিয়াছি তাহাই ঠিক। সেই দিবস আরো দুই তিনজন পরমহংস কাশী হইতে আসিয়া সেখানকার একজন পণ্ডিতের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের উত্তমরূপ সেবা হইতেছে, সেই স্থানে শিবনারায়ণ যাইয়া উপ-

স্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কেহই বসিতে বলিল না। শিবনারায়ণের গাত্রে ধূলা লাগা দেখিয়া সকলেরই বোধ হইতে লাগিল যে বেটা পাগল। শিবনারায়ণ মাটিতে বসিলেন তখন উহার মধ্যে একজন পরমহংস শিবনারায়ণকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান কোন দিক হইতে আসিলেন? শিবনারায়ণ বলিলেন যে আমি দক্ষিণদিক হইতে আসিতেছি। উহার মধ্য হইতে অপর একজন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জাতি, তোমার বাটী কোথায়? তুমি গৃহস্থী না সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়াছ? যদ্যপি তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে তাহা হইলে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান থাকিত এবং গলায় রুদ্রাক্ষমালাও থাকিত, শিবনারায়ণ বলিলেন, আমি মনুষ্য, আমি বড়ই ভ্রষ্টলোক, আমার বাটী সত্যপুর, আমি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারি না, এবং সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ কাহাকে বলে তাহা জানি না—শুনিতে পাই যে গৃহস্থ সন্ন্যাসী—কিন্তু একজন সন্ন্যাসী দেখিতে পাই না। দেখিতেছি কেবল সকলেরই পঞ্চভৌতিক দেহ হাড় মাংসের পুতুল ও ইন্দ্রিয়—যাহা সকলের দেখা যায়। এবং একই সূক্ষ্ম শরীর হইতে সকলে কথা বলিয়া থাকে সন্ন্যাসী কি বস্তু, নিরাকার কি সাকার, লাল কালো কি সাদা—তাহা দেখি নাই। যদি আপনারা দেখিয়া থাকেন কিম্বা বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দিন ও বুঝাইয়া দিন। পণ্ডিত বলিলেন, তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, তিনজন পরমহংস মহাত্মা তোমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন যা ফুলের বুঁধি ইহারা সন্ন্যাসী পরমহংস মহাত্মা তাহা হইলে তুমি কেন না হও? বলিল, "না, যদ্যপি তুমিও তো সেই বস্তু, যাহা ইহাদের আছে তাহাই তোমার আছে। যে তুমি সেই ত উনি। পণ্ডিত বলিলেন, আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং কোথায় অধ্যয়ন করিয়াছেন? শিবনারায়ণ বলিলেন, যে স্থান হইতে আমি কথা বলিতেছি সেই স্থানে সকল বিদ্যা, সকল শাস্ত্র পড়া হইয়াছে। পণ্ডিত বলিলেন, আপনাকে কে পড়াইয়াছে? শিবনারায়ণ বলিলেন, আমাকে সর্ব্বব্যাপি অন্তরবাসী পড়াইয়াছেন এবং পড়া ও অপড়া দুই এক। তখন পণ্ডিত বলিলেন, আপনার নাম কি? শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার কি নাম তাহা আমি জানি না আমার নাম কত লোকে কত প্রকার কল্পনা করিয়া ডাকে। তাহাদের আমি সেই প্রকার উত্তর দিয়া থাকি এবং আপনি বলিয়াছেন—তুই কে এবং কি জাত—এইটীও আমার একটী নাম। তখন পণ্ডিত বলিলেন, এমন এমন কথা ঠিক ঠিক বলিতেছে এটা কেরে? আপনার নাম এবং জাতি বলে না এবং কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে তাহাও বলে না; যাহা হউক ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে এ কি পরমহংস? যদি মহাত্মা হয়েন তাহা হইলে অল্প আহার করিবে এবং আপনার হস্তেও খাইবে না; কোন ব্যক্তি আহার করাইয়া দিলে তবে আহার করিবে, নচেৎ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। সেই সময়ে ইহাকে কোনরূপে পরীক্ষা

করা যাইতে পারিবে। এরূপ ভাবিয়া পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আহার কর, এবং কাহার হস্তে খাও? শিবনারায়ণ বলিলেন, মনুষ্যের যাহা আহার—যাহা তুমি খাইয়া থাক, তাহাই আমি খাই; যে কোন মনুষ্য হউক না কেন যে আহার করাইয়া দিবে তাহারই হস্তে খাইব। পণ্ডিত বলিলেন, যদ্যপি তোমাকে মুসলমান অথবা ইংরাজগণ আহার করাইয়া দেন, তাহা হইলে কি তুমি খাইবে? শিবনারায়ণ বলিলেন, মুসলমান ও ইংরাজ কাহাকে বলে এবং উহা কি বস্তুর নাম, ইহাদের স্বরূপ কি লাল না কাল? আপনার এবং উহাদের পঞ্চতত্বনির্ম্মিত হাড় মাংস ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যাহা আছে তাহার নাম কি মুসলমান ও ইংরাজ, না উহার কথা বলার নাম মুসলমান ইংরাজ। তাহা হইলে ত ঐ সকল আপনাদেরও আছে এবং উহাদেরও আছে। যখন কোন বস্তু ইংরাজ কি মুসলমান দেখিতে পাইব তখন উহাদের ঘৃণা করিয়া আহার করিব না। যদি বল উহাদিগকে ভক্ষ্য অভক্ষ্য দ্রব্য আহার জন্য ঘৃণা করিব? তাহা করিতে পারি না, কেননা যাহা উহারা ভক্ষণ করে—মদ্য মাংস ইত্যাদি—তাহা অনেক হিন্দু শব্দবাচ্যেও আহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলকেই ঘৃণা করা যাইতে পারে—এবং তাহা হইলে বিরাট ব্রহ্মকে নিন্দা ও ঘৃণা করা হয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছিলেন,

"অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণীনাং দেহমাশ্রিতং।
প্রাণপানিসমাযুক্তোপচাম্যন্নং চতুর্বিধং॥"

অর্থাৎ চরাচর ইত্যাদি যে চারি প্রকার আহার করে তাহা আমি পরিপাক করি, অর্থাৎ আমি আহার করিয়া থাকি। তখন পণ্ডিত বলিলেন, সে যাহা হউক এখন থাক পশ্চাৎ কথা হইবে। বেলা অনেক হইয়াছে চল সকলে আহার করা যাউক। সাধু পরমহংস ও শিবনারায়ণকে তাঁহারা আহার করিতে লইয়া গেলেন। আহারীয় দ্রব্যাদি সকলের সম্মুখে আসিল, শিবনারায়ণ আহার করিতে লাগিলেন, এবং উহার মধ্যে একজন পরমহংসও আহার করিতে লাগিলেন, আর অপর দুইজন পরমহংস তাঁহারা আপন হস্তে আহার করিতেন না, কিন্তু আপন মুখে হাঁ করিয়া খাইতেন—অপর লোক খাওয়াইয়া দিলে তবে খান। উহারা বসিয়া আছেন দেখিয়া তখন অপর একজন পণ্ডিত নিজ হস্তদ্বারা ঐ দুই জন পরমহংসকে আহার করাইয়া দিতে লাগিলেন এবং তাহারা অল্প অল্প আহার করিল। শিবনারায়ণ তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী পরিমাণে আহার করিলেন যত পরিমাণে ঘটের আহারের পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ মত আহার করিয়া লইলেন—যেরূপ ইঞ্জিনেতে কয়লা ও জল দিবার যে পরিমাণ আছে সেই পরিমাণ মত ঐ সকল দ্রব্য দিতে হয় যাহাতে অগ্নি ভস্ম করিয়া এত ক্রোশ পরিমাণে গাড়ী চলিতে পারে; সেইরূপ শরীরের ইঞ্জিনেও অন্ন জল দিতে হয় শরীর দিবারাত্র চলাচল করিতে পারে। কিন্তু শিবনারায়ণের কথঞ্চিৎ বেশী আহার করা এবং নিজ হস্তে খাওয়ার দরুণত পণ্ডিতগণের শিবনারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা

জন্মিল যে ইনি পরমহংস নহেন যদি পরমহংস হইতেন তাহা হইলে অন্ন আহার করিতেন ও নিজ হস্তে খাইতেন না। পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণকে এই প্রকারে পরীক্ষা করিলেন। আহারের পর সকলে একত্রে আসিয়া বসিলেন, এবং যে যে পরমহংসগণ অন্ন খাইয়াছিলেন এবং নিজ হস্তেও খান নাই তাঁহাদিগের সহিত আদর পূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু শিবনারায়ণের সঙ্গে প্রীতিপূর্ব্বক কথাবার্ত্তা কহিলেন না। শিবনারায়ণ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মনুষ্য জীব সঙ্গ যদ্যপি পরব্রহ্ম চেতনের সঙ্গত করে অর্থাৎ উহার অভেদ হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে কিম্বা সে জড় পশু তুল্য হইবে? পণ্ডিত বলিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ হইবেক কিন্তু এরূপ জিজ্ঞাসার কারণ কি? শিবনারায়ণ বলিলেন যে, ইহার কারণ এই যে, মনুষ্যদিগের সংস্কার পড়িয়াছে, পরমহংস অন্ন আহার করেন এবং নিজ হস্তেও আহার করেন না কিন্তু ইহার বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, চরাচর সমস্ত বিরাট ব্রহ্মের শরীর ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যদ্যপি আমি নিজ হস্তে আহার করি, তাহাতে হানি কি এবং যদ্যপি অপরের হস্তে আহার করি,তাহাতে লাভ কি ক্ষতিবৃদ্ধিহইবেক? সকল হস্তইত বিরাট পরব্রহ্মের এবং যখন আপন ইন্দ্রিয় মুখ হা করিলাম, তখন নিজ হস্তে আহার করিতে কি দোষ? পরব্রহ্ম চেতন কি আপনার নিজ হস্তকে জড়ীভূত করিয়া দিয়াছেন কেবল মুখ ইন্দ্রিয়কে আহার করিবার জন্যে চেতন রাখিয়াছেন? এরূপ বিচার ও বৃত্তি ধারণে ধিক্, যে লজ্জা হয় না। মানের জন্যে এত মিছা পরাধীনতার একশেষ! যদ্যপি চেতন হইবে তবে সর্ব্বদা সকল ভাবে কষ্ট এড়াইয়া স্বাধীন থাকিবে, যাহা খুসি তাহাই করিবে এবং সেইমত চলিবে। তাহার কোন বিধি নিষেধ থাকিবে না। এ সংসারে কোন কার্য্যে কাহারও কিছুই দোষ নাই, কারণ, মায়ারূপী পরব্রহ্ম যাহাকে যেরূপ খেলাইতেছেন সে সেইরূপ খেলিতেছে। কোন কার্য্যই কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, সকলই পরমব্রহ্মের ইচ্ছা। উক্ত স্বল্পাহারি দুইজন পরমহংস কিয়ৎকাল পরে স্বল্পাহার করা হেতু ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিবার ছলে উঠিয়া যাইয়া কোন এক মুদির দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি ক্রয় করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে বসিয়া খাইতেছিলেন এমন সময় শিবনারায়ণ ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা শিবনারায়ণকে দেখিয়া লজ্জায় নিতান্ত কাতর হইলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া সুস্থ হইবার জন্য উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন "ইহাতে লজ্জার বিষয় কি আছে? ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি সকলই পরব্রহ্মের নিয়মাধীন এজন্য আমাদের লজ্জিত হইবার কারণ কি? সমাজে প্রতিষ্ঠা হউক আর নাই হউক আমাদের সত্যের উদ্দেশে ধাববান হওয়া কর্ত্তব্য। সত্য বস্তুই আমাদের আরাধ্য। কিন্তু সেই সত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অনিত্য প্রতিষ্ঠা মানের জন্য অভিমানে উন্মত্ত হওয়া পশু বুদ্ধির কার্য্য। পরে তাঁহাদের সহিত কথোপকথন শেষ

হইলে সেই দিনই তথা হইতে গঙ্গাপার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে চলিতে চলিতে ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ কোন একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদিগের আশ্রয়ের যে ঘর ছিল তাহাতে বিশ্রাম করিবার মানসে যাইয়া বসিলেন। তখন বৈকাল বেলায় ছুটির পর সন্নিকটস্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগের ছুটী হওয়ায় তাহারা সেই স্থান হইয়া যাইতেছিল, তাহারা সেই ঘরের ভিতর শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইল এবং কোন মৃত মনুষ্য ভূত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে এই রূপ ভাবিয়া সকলে মিলিয়া শিবনারায়ণকে ঢিল ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। দৈবাৎ সেই স্থান দিয়া একজন ভদ্রলোক যাইতেছিলেন। তিনি বালকগণকে ঢিল ছুড়িতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল "দেখুন মহাশয়, মড়া রাখিবার ঘরে কি একটা ভূতের মত বসিয়া রহিয়াছে, ও খেপা, না কে ও? ওবেটা আমাদিগকে গালি দিতেছে।" এইকথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অন্তর হইতে শিবনারায়ণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই কে ওখানে বসিয়া রহিয়াছিস্? উত্তর দে!" শিবনারায়ণ হস্ত দ্বারা ইঙ্গিৎ করিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিলেন। তখন তিনি শিবনারায়ণের নিকটে যাওয়াতে শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, "বালকগণের কোন দোষ নাই সকলই পরব্রহ্মের ইচ্ছা। বালকগণের মাতাপিতা তাহাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিতেছে তাহারা সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যদ্যপি মাতাপিতা ভদ্র হন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা নিজ সন্তানগণকে ভদ্রোচিত কার্য্যে উপদেশ করেন এবং তাহা লঙ্ঘন জন্য শাসনও করেন। কিন্তু যাহাদের মাতাপিতা ভদ্র নহে তাহারা কিরূপে ভদ্রোচিত কার্য্যের উপদেশ পাইবে? এবং উপদেশ লঙ্ঘনের জন্য কেইবা তাহাদিগকে শাসন করিবে? অতএব এই সকল বালকগণ যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে সেইরূপ আচার ব্যবহার করিয়া বেড়াইতেছে।" কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অতিশয় বিনীত গদ্ গদ্ ভাবে শিবনারায়ণকে প্রণাম করিলেন। পরে বালকগণের প্রতি মারিতে উদ্যত হইয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন "তোরা গ্রামের সর্ব্বনাশ করিলি, এমন মহাতেজা মহাত্মার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলি উনি যদ্যপি কোপ দৃষ্টি করেন তবে কি আর গ্রামের রক্ষা আছে?" এই কথা বলিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে শিবনারায়ণের নিকট আসিয়া বলিলেন "মহারাজ! আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি শীঘ্র গ্রামের ভিতর যাইয়া সকলের নিকট শিবনারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, বলিলেন যে,এমন মহাত্মা কখন দেখি নাই, এমন আর কখন হইবেও না। কিন্তু শিবনারায়ণ ইহা বুঝিতে পারিয়া বহুলোকের সমাগম পরিত্যাগ মানসে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে কোন একটী বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিয়া সকালবেলা পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন,পথে কোন এক জন জমিদারের চাকরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন "আমি মনুষ্য" চাকর

জিজ্ঞাসা করিল,তুই চাকরি করিবি ? তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন "হঁা,করিব কি চাকরি ?" সে বলিল "ঘোড়ার সহীসী। ঘাস ছিলিতে হইবেক, মাসে ছয় টাকা মাহিনা পাইবি।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার মাহিনার কোন প্রয়োজন নাই,তুই আমাকে বাবুর নিকট লইয়া চল, কেবল খাওয়া পরা দিলেই আমি চাকর থাকিব।" পরে সে শিবনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। তখন শিবনারায়ণ এই মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার ত এই রকম বুদ্ধি দেখিতেছি, ইহার মনিবের কি প্রকার বুদ্ধি একবার দেখা যাউক। সে ব্যক্তি নিজ মনিবের বাটী প্রবেশ করিয়া শিবনারায়ণকে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া দোতালা বৈঠকখানায় মনিবকে সংবাদ দিতে উঠিল। কিন্তু শিবনারায়ণ তাহার আদেশ মান্য না করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে একেবারে বৈঠকখানায় বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া সে ব্যক্তি শিবনারায়ণকে গালাগালি দিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত বাবু শিবনারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বসিতে দিলেন। তাহা দেখিয়া তথাকার সকলে, কেহ বা উপহাস করিতে লাগিল যে, একটা কদর্য্য পাগল আসিয়া উপস্থিত হইল ইহাকে বসিতে আসন দেওয়া কেন। কেহ বা বলিতে লাগিল,"বোধ হয় কোন সাধু মহাত্মা হইবেন।"কেহ কেহ উক্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহাকে শশব্যস্ত হইয়া আসন প্রদান করিলেন, এ ব্যক্তি কে ? তখন বাবু কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা নিজ নিজ কার্য্যে মন দেও সম্মুখে দেখিতে পাইতেছ যে হস্তপদবিশিষ্ট একজন মনুষ্য। তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার বিষয় কি আছে ?" পরে উক্ত বাবু শিবনারায়ণকে আহার করাইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আহারের কিরূপ ব্যবস্থা হইবেক ? আপনি ত সকলই জানেন এবং দেখিতে পাইতেছেন যে, আমরা মৎস্য মাংসাহারী বাঙ্গালী। মৎস্য মাংস খাই। তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার আহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই। আপনারা যাহা আহার করিবেন আমিও তাহাই আহার করিব।" কিছুক্ষণ পরে বাবু ঈশ্বর সম্বন্ধে শিবনারায়ণকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং শিবনারায়ণ যথারীতি সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তমরূপে সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন ইহা শুনিয়া তথাকার সকল লোক স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা বাবুকে কহিল যে, মহাশয় ! আপনার চাকর খুজিয়া খুজিয়া উত্তম সহীসটী আনিয়াছে। তাহাতে বাবু কহিলেন, আমার চাকর যে কার্য্য করিয়াছে সে পারিতোষিক পাইবার যোগ্য। পরে আহারান্তে গঙ্গাপার হইয়া শিবনারায়ণ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ৺ রাণী রাসমণীর কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে কালীবাড়ীর ভিতর একটী বৃক্ষের নীচে কোন এক ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। যখন শিবনারায়ণ সেই ব্রহ্মচারির নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন ঐ কালীবাড়ীর অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীর নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

তুই কে ? তোর কি জাত ? তোর বাড়ী কোথায় ? তোর নাম কি ? তুই কোথা হইতে আসিতেছিস ? শিবনারায়ণ উত্তর করিলন যে, আমি মনুষ্য তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ। আমি মায়াপুরী হইতে আসিতেছি, সত্যপুরী আমার বাটী, মিথ্যা আমার নাম, আমার জাতি অদ্বৈত। তখন ঐ অধ্যক্ষ বলিলেন যে, এবেটা এ কি বলিতেছে ? তুই কি ? কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছিস ? শিবনারায়ণ বলিলেন, এ সমস্ত শাস্ত্র পড়িবার কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক কি ? তাহাতে অধ্যক্ষ বলিল, জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক আছে। তুই গৃহস্থ না সাধু ? শিবনারায়ণ বলিলেন "গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে ? তাহাদের স্বরূপ কি ? তাহারা কোথায় থাকে তাহা আমাকে বলিয়া দেও।" অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীর প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, "তুই সাধু দেখিতে পাইতেছিস না ? তোর সম্মুখে রহিয়াছেন।" শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন সম্মুখে একটী জটাধারী মনুষ্য দেখিতেছি। উহার মধ্যে কি বস্তু রহিয়াছে যাহাকে সাধু বলিতেছ ? যাহা এ সংসারে সকল মনুষ্যেতে রহিয়াছে তাহাই উহাতে রহিয়াছে তবে উহাকে কি জন্য সাধু বলিতেছ ? তখন সেই ব্রহ্মচারী অতিশয় রাগ করিয়া ঐ অধ্যক্ষকে বলিলেন যে, এ বেটা ক্ষেপার মতন কি বলিতেছে বুঝা যায় না। ইহাকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট ধরিয়া লইয়া যাও। তিনি ইহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখিবেন যে এ ব্যক্তি কি রকমের লোক। তদনুসারে অধ্যক্ষ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট লইয়া গেলেন। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; রামকৃষ্ণ পরমহংস ক্ষণেক কালের জন্য শিবনারায়ণের মুখের দিকে চাহিলেন এবং শিবনারায়ণও তদ্রূপ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই রূপে কিছু কাল গত হইলে পর রামকৃষ্ণ পরমহংস শিবনারায়ণকে বসিতে না বলায় উক্ত অধ্যক্ষ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া (অবশ্য যেখানে আগন্তুক ভদ্রলোকের বসিবার জন্য বিছানা পাতা ছিল সে স্থান নহে) শিবনারায়ণকে বলিল, ঐ খানে বোস্। তখন রামকৃষ্ণ শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সাধু না গৃহস্থ ? কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছ ? যদ্যপি সাধু হও, কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু ? কিন্তু যদ্যপি গৃহস্থ হও তবে কোন্ জাতি ? তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আপনি কি জানেন না আমি এবং আপনি কোন্ জাতি ? কোন্ দিক হইতে আসিয়াছি ? এবং আমরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, এবং গৃহস্থ কি সাধু। স্বরূপ চক্ষে কি কখন গৃহস্থ এবং সাধু দেখিয়াছেন ? গৃহস্থ পক্ষে ব্যবহার কার্য্যের রীতিতে অসংখ্য সম্প্রদায় কল্পনা করা আছে কিন্তু সাধু, যিনি সত্য-উদ্দেশী, তাঁহার সম্প্রদায় এবং জাতি কি ? রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন যে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু ব্যবহার কার্য্যে সকলই আছে এবং বলিতেও হইবেক। ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন, যে ব্যক্তি কল্পিত বস্তুতে মগ্ন আছে তাহাকে অবশ্যই বলিতে হইবেক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা হইতে অতীত রহিয়াছেন তিনি

কেন উহার অনুসন্ধান করিবেন? ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন, যদ্যপি কল্পনার অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে তবেত তাহার পক্ষে এ কথার ব্যবস্থা। শিবনারায়ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি একাল পর্য্যন্ত নিবৃত্তি হয় নাই? যে ব্যক্তি সত্যের উদ্দেশে সত্যপথে চলিতেছেন তাহার পক্ষে অবশ্য সত্য ভাসমান হইবেক এবং যে ব্যক্তি কল্পনায় অর্থাৎ মায়ায় মগ্ন রহিয়াছেন তাহার পক্ষে অবশ্যই কল্পনা ভাসমান হইবেক। ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার পক্ষে কি সত্য ভাসমান হইয়াছেন? তাহাতে শিবনারায়ণ কহিলেন যে, আমার প্রতি ভাসমান হইয়াছেন কি না হইয়াছেন তাহা আমি কি বলিব? এবং আমি কোন্ স্বরূপ হইয়া কোন্ স্বরূপের ভাসমান স্বীকার করিব? রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন, আপনি কি পরমহংস সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন? ইহাতে শিবনারায়ণ কহিলেন পরমহংস ও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ কি? রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিলেন যিনি সত্যকে ধারণ করিয়াছেন সেই অবস্থার ব্যক্তিকে সন্ন্যাসী বলা হয়, এবং সত্য বাক্য বলা তাহাই সেই ধর্ম্মের স্বরূপ, এবং সত্য অসত্য ভাবের লয় হইয়া কেবল সত্যই যাহার অন্তরে সদা পরিপূর্ণ থাকেন সেই অবস্থায় ব্যক্তিকে পরমহংস বলা হয়। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, যদ্যপি আপনি ঐ অবস্থার ভাবের ভাবী হন তবে আর এই সকল মায়া প্রপঞ্চ জিজ্ঞাসার কোন আবশ্যক থাকে না। যাহার অন্তরে এ ভাব প্রকাশমান হইয়াছে সে কখনই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্রপাঠ করিয়া কেবল মাত্র আপনার প্রতি উক্তপ্রকার অবস্থা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে সে অবশ্যই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কারণ তাহারত অন্তরে এ অবস্থা নাই। তখন রামকৃষ্ণ পরমহংস রাগ করিয়া বলিলেন, তুমি কি মনে করিতেছ আমি কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠ করিয়া বসিয়া আছি? এজন্য তোমাকে এসকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? তুমি কি আমাকে জ্ঞান দিতেছ? শিবনায়ায়ণ বলিলেন যে, যেরূপ ভাবে আপনি কথা কহিতেছেন তাহাতে সকলই বুঝা যাইতেছে—যেমন দূর হইতে ধূম দেখিয়া অগ্নি বুঝিতে পারা যায়। এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া অধ্যক্ষ আপনাপনি বলিতে লাগিল, এ বেটা আমার পরমহংসকে জ্ঞান দিতে আসিয়াছে, বেটাকে ধরিয়া বলিদান দে রে! পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার আহারের কিরূপ ব্যবস্থা? মৎস্য মাংস খাও? কি নিরামিষ খাও? ইহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে, নিরামিষ খাই, কিন্তু আপনার যাহা বিবেচনা হয় দিবেন। তাহাতে শিবনারায়ণের জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইল। আহারের সময় অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন; শিবনারায়ণকে অধিক আহার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত গালাগালি দিতে লাগিলেন। পরে আহারান্তে শিবনারায়ণ কালীবাড়ীর বাহিরে কোন একটী গৃহে যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের ইচ্ছা হইল আর একবার শিবনারায়ণের সহিত কথা কহিবেন।

এজন্য কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিলেন যে, ঐ পাগলের মত লোকটাকে লইয়া আইস। তাহাতে দুই তিন জন যাইয়া শিবনারায়ণকে ডাকিল। শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আমি এক্ষণে আর কোথাও যাইব না, ইহাতে তাহারা শিবনারায়ণকে নানা প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্নের লোভ দেখাইতে লাগিল। তাহাতেও শিবনারায়ণ উঠিতে স্বীকার পাইলেন না। অবশেষে তাহারা রাগ করিয়া বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য পরস্পর বলিতে লাগিল যে, ধর রে ধর, বেটাকে পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া চল। না হয় এই খানে বেটাকে চেলা কাঠের দ্বারা আচ্ছা করিয়া মারিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া দে। কিন্তু দৈব-প্রসন্নতা-হেতু তাহারা ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াই চলিয়া গেল। শিবনারায়ণের প্রতি কোনও প্রকার অপকার কার্য্যে পরিণত হইল না। পরদিন প্রাতে শিবনারায়ণ তথা হইতে বাহির হইয়া কালীঘাটে কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীন সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য।

মৃচ্ছকটিক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শকট বিপর্য্যয় ব্যাপারে বসন্তসেনার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। চালক তাহাকে শকারের নিকট লইয়া চলিল। এদিকে বর্দ্ধমানক চারুদত্তের শকট চালক—বিদ্রোহী আর্য্যককে বসন্তসেনা বোধ করিয়া পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানের পথ ধরিল।

পুষ্পকরণ্ডকে চারুদত্ত ও তাঁহার সর্ব্ব সময়ের সুহৃৎ মৈত্রেয় দুইজনে বসন্তসেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন—যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইতেছেন—এমন সময়ে বর্দ্ধমানক উদ্যান দ্বারে উপস্থিত হইল।

শকট-মধ্যবর্ত্তী আর্য্যক ভাবিতে লাগিল—হায়! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি!! মহানুভব চারুদত্ত যখন বসন্তসেনার পরিবর্ত্তে আমায় শকট মধ্যে দেখিবেন, তখন প্রণয়ীসমাগম নিরাশায় তিনি কতদূর ব্যথিত হইবেন। না—বোধ হয় তাহা হইবেন না—শুনিয়াছি তিনি অতি মহানুভব ও উদারপ্রকৃতি। যিনি পরের উপকার করিতে গিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়া দরিদ্র হইয়াছেন, একজনের জীবন রক্ষা হইল দেখিয়া তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন।

বস্তুতঃ তাহাই হইল। সৌম্যমূর্ত্তি চারুদত্ত প্রথমে বসন্তসেনাকে না দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন কিন্তু যখন আর্য্যকের মুখে তাহার সমস্ত কাহিনী শুনিলেন, তখনই তাহার বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন। রাজ বিদ্রোহীকে সহায়তা করিতে-

ছেন—এতজ্জনিত ভয় তাঁহার মনে আদৌ স্থান পাইল না। আর্য্যক মুক্ত হইয়া চারুদত্তকে যখন ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত, তখন চারুদত্ত আবার মহত্বের শেষ পরিচয় দিলেন—তিনি বিদ্রোহীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখে! এতদিন তোমার পদদ্বয় শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ ছিল, তোমার স্বাভাবিক দ্রুত গতি-শক্তি পূর্ব্বের ন্যায় নাই—পথ চলিতে তোমার কষ্ট হইবে—এখনও রক্ষিগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে, অতএব তুমি এই শকটে আরোহণ করিয়াই যাও।" আর্য্যক বলিল—"মহাত্মন! আমি নিজের আত্মাকে ভুলিব, তথাপি আপনাকে ভুলিব না।"

আর্য্যক নিরাপদে প্রস্থান করিলে চারুদত্ত ভাবিলেন বিদ্রোহীর সহায়তা করিয়াছি, রাজা পালক অতি দুর্বৃত্ত সুতরাং এ স্থানে আর অবস্থান করা বিধেয় নহে, এই ভাবিয়া তিনি শৃঙ্খলাদি এক কূপে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে উদ্যান হইতে বাহির হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার বাম চক্ষু নাচিতে লাগিল।

অষ্টম অঙ্ক।

রাজার শ্যালক শকার একটা অকাল-কুষ্মাণ্ড, তাঁহার পরিচয় ভগিনীপতির নামে। তিনি বিদ্যায় বৃহস্পতির গুরু—বুদ্ধির ত সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ ছাড়া লাম্পট্য, আত্মাভিমান, অশ্লীলতা প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান গুণ তাহার সেই মেদমাংসময় দেহ-ক্ষেত্রে অনেক দিন বাস করিতেছে। শকার ভায়া প্রথমতঃ কোন কাজ না পাইয়া এক নির্দ্দোষী বৌদ্ধ ভিক্ষুককে যৎপরোনাস্তি তাড়না করিলেন, তাহার পর আবার অন্য কাজ না পাইয়া গর্দ্দভ-কণ্ঠে রাগ রাগিণীর চূড়ান্ত অভিনয় করিয়া ফেলিলেন। সে সঙ্গীত-স্রোতে পুষ্পকরণ্ডক আমূল আলোড়িত হইল—এমন সময়ে স্থাবরক শকট লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত।

শকার শকটে আরোহণ করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে তাহার মধ্যে স্ত্রীলোক দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। বসন্তসেনা সেই আস্তরণ-বেষ্টিত শকট মধ্যে বসিয়া উপস্থিত বিপদের আলোচনা করিতেছিলেন। কোথায় তিনি প্রেমপ্রতিম, উদারহৃদয় চারুদত্তের অঙ্ক নিপীড়িতা হইবেন—তাহা না হইয়া কি না দুর্দ্দৈব বলে দুরাত্মা শকারের সাক্ষাৎ লাভ করিতে হইল! শকার ভাবিল, যখন একটা স্ত্রীলোক গোপনে তাহার শকটের মধ্যে বসিয়া, তখন সে রাক্ষসী বা প্রেত না হইয়া যায় না। সুতরাং স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অনুসারে স্থির করিল সহসা এই রাক্ষসীর কাছে যাওয়া হইবে না। বিটকে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক। তাহার বন্ধু বিট তাহার আদেশ ক্রমে যখন শকটের আস্তরণ খুলিয়া বসন্তসেনাকে দেখিতে পাইল, তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "হায়! মৃগী ব্যাঘ্রের অনুগামিনী হইয়াছে! রাজহংসী শারদচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ পুলিনান্তরে শয়ান রাজহংসকে পরিত্যাগ করিয়া কাকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। বসন্তসেনে! তোমার

এ আগমন যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।" বসন্তসেনা যখন শকট বিপর্য্যয় ঘটনা খুলিয়া বলিলেন, তখন বিট বলিল "দুরাত্মা তোমায় দেখিতে পাইলে সহজে ছাড়িবে না, দেখি আমি কৌশলে উহাকে নিরস্ত করিতে পারি কি না।"

শকটে কি আছে—শকার এই প্রশ্ন করিলে বিট তাহাকে সত্য গোপন করিয়া অনেক কথা বলিল, কিন্তু কোন মতেই দুরাত্মা শকার নিবৃত্ত হইল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া বিট বলিয়া ফেলিল বসন্তসেনা ঐ শকটে আছেন। আর যায় কোথায়? দুরাত্মা শকার সলম্ফে বলিয়া উঠিল—"আমি পূর্ব্বে ইহাকে রুষ্টা করিয়াছিলাম, এক্ষণে পদতলে পতিত হইয়া প্রসন্ন করিব।" এই কথা বলিয়া সেই মূর্খ, আত্মাভিমানী বসন্তসেনাকে নানা-প্রকার অসঙ্গত মিষ্ট বাক্যে তোষামোদ করিতে লাগিল। শকারের অভদ্রোচিত ব্যবহারে রুষ্টা হইয়া বসন্তসেনা তাহার মস্তকে দৃঢ় পদাঘাত করিলেন। তখন সেই দুষ্ট রাজ-শ্যালক ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল। যখন শুনিল বসন্তসেনা শকট বিপর্য্যয়ে ঘটনা-ক্রমে পুষ্পকরণ্ডকের অপর পার্শ্বে আসিয়া পড়িয়াছেন, আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ আসেন নাই, চারুদত্তের নিকটই তাঁহার প্রকৃত গন্তব্য স্থান, তখন সে বসন্তসেনাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল "তুই আমার গাড়ি হইতে নাম্, এখনি নাম্, সেই দরিদ্র স্বার্থবাহ পুত্রের নিকট অভিসার করিতেছিস্, আর আমার গরুগুলাকে কষ্ট দিতেছিস্? দূর হ গর্ভদাসী—ইত্যাদি।" বসন্তসেনা দুর্বৃত্তের এ প্রকার ব্যবহার দেখিয়া নামিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু যখন শকারের প্রিয় বন্ধু বিট তাঁহাকে নামিতে ইঙ্গিত করিলেন, তখন তিনি অগত্যা শকট হইতে নামিয়া পড়িলেন।

এখন শকারের চেষ্টা বসন্তসেনার প্রাণ বধ করা। মূর্খের বুদ্ধি এই প্রকার প্রলয়ঙ্করী হইয়া থাকে। সে প্রথমতঃ বিটকে এ সম্বন্ধে প্রলোভিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার অপেক্ষা অনেকটা ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন। বিট অস্বীকার করাতে দুরাত্মা নিজে সেই অরক্ষিতা কামিনীর উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। বিট আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক চপটাঘাতে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল।

দুর্ব্বলচিত্ত, ভীতু শকার ভাবিল—বিট এ ক্ষেত্রে থাকিতে বসন্তসেনাকে নিহত করা অসম্ভব সুতরাং অত বড় চড় খাইয়াও ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীর ভাবে বলিল, মহাশয়! আপনি কি মনে করিয়াছেন মহৎ বংশে জন্মিয়া আমি এইরূপ অকার্য্য করিব? উহাকে ভয় দেখাইবার জন্যই এইরূপ করিয়াছি। বসন্তসেনা আপনার বর্ত্তমানে অতিশয় লজ্জিত হইয়াছে, অতএব আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করুন।" শকার ইতিপূর্ব্বে তাহার শকট-চালককে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিল, এক্ষণে বিটকে বলিল "আপনি গিয়া স্থাবরককে ডাকিয়া আনুন"।

বিট প্রতারিত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে দুরাত্মা পুষ্পচয়ন আরম্ভ করিল। বিট গোপনে থাকিয়া সন্দেহক্রমে অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল দুরাত্মা প্রণয়োন্মত্ত হইয়া পুষ্প ভূষা করিতেছে, তখন সে নিঃসন্দিগ্ধ মনে প্রস্থান করিল।

ইহার পর শকার পুনরায় বসন্তসেনার তোষামোদ আরম্ভ করিল। বসন্তসেনা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন "রে মূঢ়! আমি সহকার পাদপের উপাসনা করিয়াছি, পলাশ বৃক্ষের উপাসনা করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।" শকার তখন যথেষ্ট রুষ্ট হইয়া "দেখি কেমন করিয়া সেই দরিদ্র চারুদত্ত তোকে রক্ষা করে!" এই কথা বলিয়া উন্মত্ত ব্যাঘ্রবৎ বসন্তসেনাকে আক্রমণ করিয়া তাহার কণ্ঠনিপীড়ন করিতে লাগিল। বসন্তসেনা মূর্চ্ছিতা হইয়া ছিন্ন-লতিকার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।

এদিকে বিট প্রত্যাগমন করিয়া শকারকে বসন্তসেনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রথমতঃ বলিল "সে তোমার অনুগামিনী হইয়াছে।" কিন্তু পরিশেষে স্বীয় বাহুবলের গর্ব্ব লোপাশঙ্কায় বসন্তসেনার পতিত দেহের নিকট তাহাকে লইয়া গিয়া বলিল—"এই দেখ কি করিয়াছি।"

সেই প্রফুল্ল-প্রভাত-কমলবৎ মুখখানি মলিন হইয়া ভূতলে লুটাইতেছে, সেই সৌন্দর্য্যের আবাসস্থান দেহ-যষ্টি নিস্পন্দ ভাবে কঠিন মৃত্তিকাকে আলিঙ্গন করিয়াছে—ইহা দেখিয়া বিট স্তম্ভিত ও ভীত হইল, ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। পরে দুর্বৃত্ত শকার বসন্তসেনার নিধন অপরাধ তাহার স্কন্ধে ফেলিতে চেষ্টা করিল। বিট অনন্যোপায় হইয়া সেই উদ্যান ছাড়িয়া পলাইল।

ভীত শকার ভাবিল এখন কি করি—অপরাধ কাহার স্কন্ধে ফেলি? হাঁ-হাঁ ঠিক্ হইয়াছে—এক বাণে দুই শত্রু নিহত হইবে। দুষ্ট চারুদত্তের স্কন্ধেই এই দোষ ফেলা যাইবে; আমি অগ্রে গিয়া এ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ না হইতে হইতে রাজদ্বারে অভিযোগ করি। এই বলিয়া সে বসন্তসেনার দেহ শুষ্ক-পত্রাচ্ছাদিত করিয়া দ্রুতপদে উদ্যান হইতে প্রস্থান করিল।

এ দিকে ঘটনাক্রমে সংবাহক নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই উদ্যানে আর্দ্র বস্ত্র শুকাইতে আসিল। এই সংবাহকই পূর্ব্বে দ্যূতকর ছিল এবং উদার-চরিত্রা বসন্তসেনাই ইহাকে স্বীয় হস্তের বলয় বিক্রয় দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। ভিক্ষু আসিয়া দেখিল শুষ্ক পত্রের মধ্যে কি যেন একটা নড়িতেছে।

বাস্তবিক বসন্তসেনা মরেন নাই—মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অলঙ্কারময় মৃণাল-গঞ্জিত হস্ত পত্র মধ্যে নড়িতেছে দেখিয়া ভিক্ষু ভাবিল এ হস্ত আর কাহারও নয়। আমি যে ইহা বেশ চিনি। এই হস্তই যে আমায় অভয় দিয়াছিল। সে পত্রগুলি সরাইয়া যখন বসন্তসেনাকে দেখিতে পাইল, তখন তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

ভিক্ষু স্বীয় আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড নিষ্পেষিত করিয়া বারি প্রদানে বসন্তসেনার জীবন রক্ষা করিল। বসন্তসেনা ভিক্ষুকে দেখিয়া বলিলেন—"তুমি কে—?"

"আমি কে চিনিতে পারিতেছেন না—আমাকে আপনি দশটি সুবর্ণ মুদ্রায় কিনিয়া রাখিয়াছেন।" বসন্তসেনার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ভিক্ষু অতিশয় আশ্চর্য্য হইল এবং তাঁহাকে নিকটস্থ বুদ্ধদেবের মন্দিরে তাঁহার ধর্ম্মভগিনীর নিকট পাঠাইয়া দিল।

নবম অঙ্ক।

এই অঙ্কের প্রধান দৃশ্য—উজ্জয়িনীর আদালত। কাছারি বসিবার এখনও অনেক বিলম্ব—দুষ্টমতি শকার পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছে। আজ সে চারুদত্তের নামে হত্যার অভিযোগ আনিবে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, প্রধান বিচারক শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ প্রভৃতি আদালতের কর্ম্মচারীগণ আসিয়া স্ব স্ব আসনে বসিলেন। আদালতের হুকুম অনুসারে কার্য্যার্থীদের ডাক পড়িল। কার্য্যার্থীর মধ্যে কেবলমাত্র শকার তখন উপস্থিত। বিচারক যখন শুনিলেন অর্থীর মধ্যে কেবল রাজশ্যালক উপস্থিত, তখন বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি শকারের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় জানিতেন। প্রথমেই এই অকাল কুষ্মাণ্ডটা বিচার প্রার্থনায় আসিছে শুনিয়া তিনি দৌবারিক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন—"কল্য তোমার অভিযোগ শুনা হইবে।"

শকার ত একথা শুনিয়া রাগিয়াই অস্থির। রাজা তাহার ভগিনীপতি, বিচারক রাজার অর্থে প্রতিপালিত। সে মনে মনে ভাবিল এখনই ভগিনী ও ভগিনীপতিকে বলিয়া এই বিচারকটাকে দূর করিয়া দিব। দৌবারিক শকারের ক্রোধ ভাব উপলব্ধি করিয়া অধিকরণিককে জানাইল, তিনি অগত্যা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

শকার আদালতে প্রবেশ করিয়াই "আমার পিতা রাজার শ্বশুর—রাজা আমার পিতার জামাতা!" এই প্রকার পরিচয় আওড়াইতে লাগিল। অধিকরণিক ব্যস্ত হইয়া তাহার মূর্খতা-প্রকাশক বক্তৃতার উপসংহার করিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার অভিযোগ কি তাহা বলুন, আপনার পরিচয় আমরা যথেষ্ট জানি।" শকারের অভিযোগ "চারুদত্ত অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে হত্যা করিয়াছে।" প্রথম সাক্ষী বসন্তসেনার মাতা—তাহাকে তখনই ডাকিয়া আনান হইল। তাহার জোবানবন্দীতে প্রকাশ পাইল—বসন্তসেনা চারুদত্তের নিকট গিয়াছেন।

তাহর পর চারুদত্ত বিচার গৃহে প্রবেশ করিলেন—প্রবেশ সময়ে তাঁহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইল, বায়সগণ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সকল কুলক্ষণ দেখিয়া চারুদত্ত উদ্বিগ্ন চত্তে বিচার গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ মধ্যে শকারকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবনা আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

বিচারক চারুদত্তকে সম্মানের সহিত বসিতে আসন দিলেন। শকার ইহাতে বড় মর্ম্ম পীড়িত হইল। চারুদত্তের কথায় প্রকাশ পাইল—বসন্তসেনা তাঁহার গৃহেই ছিলেন, পরে নিজ গৃহে গিয়াছেন। এই সময়ে শকট-পরীক্ষক বীরক আসিয়া বলিল, "আমি বসন্তসেনাকে করণ্ডক উদ্যানে যাইতে দেখিয়াছি। আমি শকট পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, আমার সহকারী রক্ষী চন্দনক তাহাতে বাধা দিয়াছিল। আমি জোর করিয়া গাড়ী দেখিতে চাহিলে তাহার সহিত আমার বিবাদ হইয়াছিল।"

পুষ্পকরণ্ডকে কোন স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে কিনা দেখিবার জন্য ঘীরক প্রেরিত হইল। সে শ্যালকের বন্ধু—ফিরিয়া আসিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল, "হাঁ, মৃতদেহ দেখিয়া আসিলাম।" বিচারকের মন সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল—যে চারুদত্ত সমস্ত বিষয় দান করিয়া দরিদ্র হইয়াছেন, তিনি যে সামান্য অলঙ্কারের লোভে এই গর্হিত কার্য্য করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন।

চারুদত্তের দুর্ভাগ্য ক্রমে আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। বসন্তসেনা তাঁহার পুত্র রোহসেনকে সুবর্ণ শকট নির্ম্মাণার্থে যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, চারুদত্ত তাহা প্রত্যর্পণের জন্য মৈত্রেয়ের হস্ত দিয়া ফিরিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মৈত্রেয় পথে শুনিলেন চারুদত্ত আদালতে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি দ্রুতপদে বন্ধুকে দেখিবার জন্য আদালতে ছুটিলেন। চারুদত্তের মুখে সমস্ত শুনিয়া মৈত্রেয় শকারকে গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়ের বিবাদে মৈত্রেয়ের কক্ষস্থ অলঙ্কারগুলি ভূতলে পড়িয়া গেল।

এই আর যায় কোথায়? শকার আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। বিচারক ঈষৎ আন্দোলিত হইলেন। আদালত নিস্তব্ধ। বিচারক বসন্তসেনার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব অলঙ্কার তোমার কি না?" বৃদ্ধা চারুদত্তকে বেশ চিনিত—তাঁহার দ্বারা যে কোন প্রকার নীচ কার্য্য হইতে পারে, ইহা তাহার বিশ্বাসে নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং সে বলিল, "এ অলঙ্কার বসন্তসেনার নয়, তবে তাহার মতন দেখিতে অনেকটা বটে।" বসন্তসেনার মাতা চারুদত্তের প্রতি স্নেহ-বশতঃ সত্য গোপন করিল বটে, কিন্তু চারুদত্ত নিজেই স্বীকার করিলেন যে, এ সকল অলঙ্কার নিঃসন্দেহই বসন্তসেনার—এই বলিয়া রোহসেনকে বসন্তসেনা কি প্রকারে অলঙ্কার দিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

এত Circumstancial Evidence কি উপেক্ষা করা যায়? চারুদত্ত, বিচারক, ও আদালত শুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ। সাধারণের অনিচ্ছায় কেবল ঘটনাগত সাক্ষ্য দ্বারা তিনি যখন অপরাধী প্রমাণিত হইলেন, এবং বিচারক যখন চারুদত্তকে অবরোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন, তখন বসন্তসেনার মাতা বলিল—"যে ব্যক্তি চৌরে অপহৃত সুবর্ণ ভাণ্ডের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য রত্নাবলী দান করিয়াছেন—যিনি দান ও পরোপকারে নিঃস্ব হইয়াছেন—সে ধর্ম্মাত্মা যদি আমার কন্যাকে বধ করিয়াই থাকেন, তবে তাহাই হউক, তিনি দীর্ঘজীবি হউন, এই মোকদ্দমায় আমি অর্থী—আমি ইঁহার দণ্ড প্রার্থনা করি না। আপনারা ইঁহাকে পরিত্যাগ করুন।" কিন্তু বৃদ্ধার কথা গ্রাহ্য হইল না—সে দুঃখে মর্ম্ম পীড়ায় কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। বিচারক, "চারুদত্ত স্ত্রীবধকারী হইলেও, ব্রাহ্মণ বলিয়া অবধ্য—অতএব রাজার কাছে ইঁহার নির্ব্বাসন দণ্ডের কথা বলিয়া আইস" বলিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাজা বলিলেন—সামান্য ধনলোভে স্ত্রীঘাতককে

সেই সমস্ত অপহৃত অলঙ্কার তাহার গলায় বাঁধিয়া দক্ষিণ মশানে লইয়া শূলে চড়াও।"

দশম অঙ্ক।

ইহাই মৃচ্ছকটিকের শেষ অঙ্ক। ইহাতে চারুদত্ত চণ্ডালদিগের দ্বারা বধ্য-ভূমিতে নীত হইয়াছেন। উজ্জয়িনীর পথ ঘাট লোকে লোকারণ্য—রাস্তায় তিল রাখিবার স্থান নাই। দর্শকদের মধ্যে কেহ বা চারুদত্তের সদ্গুণাবলীর ব্যাখ্যা করিতেছে—কেহ বা তাঁহার দানশীলতার কথা বলিতেছে—কেহবা মনুষ্য-ভাগ্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতেছে—কেহবা শকারের ও বসন্তসেনার মুণ্ড নিপাত করিতেছে—কেহবা রাজা পালককে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অভিসম্পাত করিতেছে—কেহবা একবার চারুদত্তকে শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছে।

তাহার পরের দৃশ্য আরও শোচনীয়। বালক রোহসেন সেই জনতার মধ্যে পিতাকে দেখিতে ছুটিতেছে—তাহার মুখে কেবল,—হা তাতঃ! হা পিতঃ! পশ্চাতে চিরসুহৃদ্ মৈত্রেয় কাঁদিতে কাঁদিতে বালককে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন। বালক গিয়া সেই মধুর বাল-কণ্ঠে, সেই শোক বিমিশ্রিত মর্ম্মভেদী ভাষায় চণ্ডালদের জিজ্ঞাসা করিল—"ওরে চণ্ডাল! আমার পিতাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিস্।"

চণ্ডালেরও হৃদয় আছে। চণ্ডালও রাজ-শ্যালক দুর্বৃত্ত শকারের উপাদানে নির্ম্মিত নহে। তাহাদের হৃদয় পাষাণ হইলেও বালকের শোকপূর্ণ হৃদয়ভেদী কথায় গলিল। তাহারা বলিল—"এ বিষয়ে রাজার নিয়োগই অপরাধী—বাপরে! আমরা কি করিব বল?" বালক বলিল "তোমরা আমায় বধ কর, আমার পিতাকে ছাড়িয়া দাও।" চণ্ডাল কাঁদিতে কাঁদিতে চারুদত্তকে লইয়া চলিল।

দুর্বৃত্ত শকার পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে যখন বসন্তসেনাকে পীড়ন করে, তখন তাহার নিজ শকট-চালক স্থাবরক তাহা দেখিয়াছিল। স্থাবরককে সে বাটীতে ফিরিয়া যাইতে বলে—এবং নিজে গৃহে আসিয়া এই কথা প্রকাশ হইবার ভয়ে তাহাকে দ্বিতলের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখে। স্থাবরক যখন সেই স্থান হইতে চণ্ডালদ্বয়ের বধ ঘোষণা ও জন-কোলাহল শুনিল তখন সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। নিরীহ চারুদত্তের বিনা দোষে প্রাণদণ্ড হইবে, ইহা তাহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল—সে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করিয়া লম্ফ দিয়া দ্বিতল হইতে পড়িল—সেই পতনের চোটে ঘটনাবশে তাহার পায়ের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া গেল। স্থাবরক দ্রুতপদে আসিয়া সকলকে থামাইল—চণ্ডালদ্বয়কে সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিল—তাহার কথা চারি দিকের দর্শকগণও শুনিল। চারুদত্ত হত্যাকারী নহেন, এ কথায় সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।

এদিকে শকার বধ-ডিণ্ডিম শব্দ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে আহারাদি করিয়া উপরে উঠিয়া

যখন দেখিল স্থাবরক সেখানে নাই, তখন তাহার প্রাণ দমিয়া গেল—সে দ্রুতপদে শ্মশানাভিমুখে দৌড়িল। যখন দেখিল স্থাবরক সব কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"অহো! এ ব্যক্তি আমার চুরি করায় ইহাকে আমি প্রহার করিয়া অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম—তাই প্রতিশোধ লইবার জন্য এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে।" চণ্ডালেরা সেই দুর্বৃত্ত শকারের কথাতেই বিশ্বাস করিল।

এদিকে শকারের আর বিলম্ব সহে না—সে চণ্ডালদের চারুদত্তের প্রাণদণ্ডের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এবার চণ্ডালদের মধ্যে তর্ক উঠিল—"কে চারুদত্তকে বধ করিবে।" ইহাতেও বধ কার্য্যের বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া শকার আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া "অরে শীঘ্র বধ কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে শকারের উত্তেজনায় চণ্ডালেরা শেষ ঘোষণা করিয়া চারুদত্তকে কাটিবার জন্য শাণিত খড়্গ তুলিল কিন্তু সৌভাগ্যবশে খড়্গ তাহাদের হস্ত হইতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া দূরে পড়িল। ইহা দৈব নিয়োজিত—এই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বসন্তসেনা ভিক্ষুর সহিত সেই বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন! তাহার সেই আলুলায়িত কেশ, উন্মাদিনী বেশ দেখিয়া লোকে সরিয়া দাঁড়াইল। পরে সকলে যখন তাহাকে বসন্তসেনা বলিয়া চিনিল তখন তাহারা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। চণ্ডালদ্বয়ও নির্ব্বাক হইয়া পড়িল—তাহারা ভাবিল ভাগ্যে তাহারা চারুদত্তকে বধ করে নাই।

বসন্তসেনা ভিক্ষুর ধর্ম্মভগিনীর শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই চারুদত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—যখন তাঁহাকে বধ করিবার জন্য চারুদত্তের প্রাণদণ্ড হইতেছে একথা শুনিলেন—তখন পাগলিনীর ন্যায় বধ্যভূমির দিকে দৌড়িলেন। চারুদত্ত সেই শ্মশান ভূমিতে বসন্তসেনার আবির্ভাব দেখিয়া আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন—ভাবিলেন বসন্ত দেবলোক হইতে দেবীমূর্ত্তিতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন! তাঁহার আনন্দ নিজের জীবন রক্ষার জন্য নহে—বসন্তসেনা বাঁচিয়া আছেন—ইহাতে তাঁহার কলঙ্ক-মোচন হইল—ইহাই আনন্দের কারণ।

চণ্ডালেরা এই সব ঘটনা দেখিয়া বলিল, "ভাই! আমাদের উপর হুকুম আছে—যে বসন্তসেনাকে বধ করিয়াছে, তাহাকেই শূলে দিব। আইস আমরা সেই দুর্বৃত্ত রাজশ্যালককে লইয়া আসি।" শকার এই সকল গোলযোগ দেখিয়া পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে আর এক কাণ্ড উপস্থিত। আর্য্যক চারুদত্তের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া নিজের দলে গিয়া মিশিলেন। তাঁহার দল রাজ বিদ্রোহী—তাহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। কারণ, যাহারা উজ্জয়িনী রাজ পালকের দ্বারা কোন না কোনরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারাই এই দলভুক্ত। আর্য্যক অবসর বুঝিয়া সদলে রাজাকে আক্রমণ করিলেন—এবং তাঁহার প্রাণ বধ করিয়া উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

ভিক্ষু সর্ব্বিলক (আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত চৌর) আর্য্যকের দলভুক্ত প্রধান কর্ম্মচারী। সে চারুদত্তের প্রাণদণ্ডের কথা শুনিয়াছিল; এক্ষণে দ্রুতপদে আর্য্যকের লোক লইয়া বধ্যভূমিতে আসিয়াই চারুদত্তকে মুক্ত করিল। চারুদত্তের পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিল "মহাশয়! আমায় চিনিতে পারিতেছেন না? আমিই সেই সন্ধিখনক, সুবর্ণভাণ্ড অপহারী সর্ব্বিলক। সর্ব্বিলক আর্য্যক সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা চারুদত্তকে বলিল—ইহাতে চারুদত্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে রক্ষীগণ শকারকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া আনিল।

শকার ভাবিল "এবার আর আমার নিস্তার নাই। ভগিনীপতি ত পঞ্চত্ব পাইয়াছেন; এখন চারুদত্তের দলেরই ক্ষমতা—এবার চারুদত্তের শূল আমার বুকেই বিঁধিবে। কিন্তু এখনও উপায় আছে— শুনিয়াছি চারুদত্ত বড়ই উদার চরিত্র, আমার ন্যায় শত্রুকে ক্ষমা করা তাহার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে—একবার তাহার শরণাগত হইয়া দেখি না কেন?" শকারকে দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠিল কেহ বলে পাপিষ্ঠকে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া কঙ্করময় রাজপথে টানিয়া লইয়া যাও। কেহ বলে—কুক্কুর দিয়া খাওয়াও—কেহ বলে শূলে দাও—কেহ বলে করাত দিয়া দ্বিখণ্ড কর। শকার এই সকল দেখিয়া চারুদত্তের আশ্রয় প্রার্থনা করিল।

চারুদত্তের উদারতা, যাহাতে সমগ্র উজ্জয়িনী বাঁধিয়াছে—এসময়ে আরও জ্যোতির্ম্ময় ভাবে পরিস্ফুট হইল। তিনি সর্ব্বিলককে হুকুম দিলেন "ইহাকে ছাড়িয়া দাও"। চারুদত্তের এ উদারতায় সকলে দুঃখিত হইল।

এদিকে আর এক কাণ্ড উপস্থিত—চারুদত্তের পতিব্রতা পত্নী ধূতী দেবী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিবার পূর্ব্বেই চিতারোহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। যদি মৈত্রেয় ও রোহসেন এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া বাধা না দিতেন তাহা হইলে হয়ত সতীর পবিত্র দেহ পাবকের কুক্ষিগত হইত। চারুদত্ত শ্মশান হইতে এই কথা শুনিয়া দ্রুতপদে আসিয়া স্ত্রীকে জ্বলন্ত চিতানল হইতে রক্ষা করিলেন। এ আনন্দ চিত্র কিরূপ মনোজ্ঞ পাঠক একবার নিজে ভাবিয়া দেখুন।

এই খানেই মৃচ্ছকটিকের শেষ যবনিকা পতন। চারুদত্ত পুনরায় পূর্ব্বের সুখ পাইলেন—কিন্তু তাঁহার শেষের কয়টী কথা আজও আমাদের কাণে বাজিতেছে—"বিধাতা কাহাকেও ধনমানাদির অপনয়ন পূর্ব্বক তুচ্ছ করিতেছেন—এবং কাহাকেও বা প্রচুর ধন মান দিয়া তুষ্ট করিতেছেন, কাহাকে—উন্নত—কাহাকে অধোগত—

আবার কাহাকেও বা শোক মোহাদির দ্বারা অভিভূত করিতেছেন। কূপ-যন্ত্রে বদ্ধকলস যেমন কখনও উর্দ্ধগত, কখনও বা অধোগত হয়, সেইরূপ সংসার-যাত্রা নির্ধনতা, সধনতা, উন্নতি অবনতি, প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ। এই সকল সকলকেই জানাইবার জন্য যেন বিধাতা ক্রীড়াচ্ছলে এই সব অনুষ্ঠান করিলেন।"

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কবিতা।

শিশির।

ঘাসের বনে মুক্তামালা ছড়িয়ে ফেলে চপল বালা,
রাতে রাতে চলে গেছে কোন্ সাগরের পার ?
রাগ করে ছিড়েছে সাধের প্রেমের উপহার !
তারেই নিশির শিশির বলে, যাচ্চে লোকে পায়ে দলে,
মুক্ত গুলি কেঁদে গলে বিরহে কাহার ?
রাগ ছিঁড়েছে সাধের প্রেমের উপহার !
অথবা কোন বিরহিণী খুঁজতে এসে নয়ন মণি
দেখা বুঝি না পেয়ে তার সারা নিশি কেঁদে কেঁদে,
নিরাশ আশা প্রাণের তৃষা চখের জলে গেছে গেঁথে !

অভিনয়।

বলিবার নাই কিছু খুলে
মিলে যদি পরাণে পরাণ,
প্রেমিকের কথা আঁখিকুলে
বুঝাইয়া দেয় সে নয়ান !
বুঝিয়ে হাসে সে ভালবাসা,
আর সবে শুধু চেয়ে রয়।
সভয়ে পিছায়ে পড়ে ভাষা,
নীরব প্রেমের অভিনয় !

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

নীরববীণা।

আমি নীরব বীণা, অতি দীনা
ভাঙ্গা হৃদয় খানি !
আমার ছেঁড়া তার, নাই আর
মধুর বাণী।
প্রাণের কথা যত, আগে গেয়েছিত
সকলি,
মান নাহি যার, এখন তারে আর,
কি বলি ?

গান গাহে যারা, গাক তারা
জানাক ব্যথা—
আমার নাহি ভাষা, নাহি আশা
শুধু ব্যাকুলতা !
সবাই বোঝে হেথা, বলা কথা ;
কে বোঝে—নীরব প্রাণে !
কেহ কি বোঝে না ? একোজনা ?
কে জানে !

কোথায় কোথায় ?

কোথায় কোথায় ?

সবিতার জ্যোতির্ম্ময় রূপে ?
চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে ?
নক্ষত্রের কনক বিভায় ?
বিজুলি চমক বরণে ?
পর্ব্বতের অভ্রভেদী দৃশ্যে ?
সমুদ্রের মহান শোভায় ?
বনানীর গম্ভীর সৌন্দর্য্যে ?
নীরদের বিচিত্র খেলায় ?
কোথায় কোথায় ?
নির্ঝরের ঝর ঝর তানে ?
তটিনীর মৃদুল কল্লোলে ?
বিহগের সুললিত গানে
বসন্তের সুমন্দ হিল্লোলে ?
গভীর নিশীথে উথলিত
বাঁশরীর মধুময় তানে ?
প্রস্ফুটিত গন্ধে ঢল ঢল
সুকোমল কুসুম বয়ানে ?
কোথা—কোনখানে ?
সৌন্দর্য্যের সে পূর্ণ মহিমা,
সৃষ্টির সে মুক্ত শোভা রাজে—
ঐ হের এক খানি মুখে ;
দুইটি ও নয়নের মাঝে !
বিশ্বের সৌন্দর্য্য যাহে ভাতে
আনন্দের বহে পারাবার ;
চরাচর ডুবে যায় যাহে
জীবন মরণ একাকার !

ভুলে যেতে গিয়েছি ভুলিয়া !

মনে যেন পড়িছে এখন—
এক দিন ছিল সে আপন !
উঃ সে কি যুগ যুগান্তর
জ্যোৎস্নায় মগন চরাচর
মরমর তরুর পাতায়
বিহগের মধুর গাথায়
উলসিত সান্ধ্য উপবন
উথলিত হৃদি প্রাণ মন
বাহু পাশে বাঁধা দুই জনে
চুপে কথা চুম্বনে চুম্বনে !
না জানি সে কতকাল গত
স্মৃতি তার স্বপনের মত
প্রাণ পণে করিয়া যতন
জাগে যদি বিদ্যুৎ মতন
তখনি মিলিবে ধীরে ধীরে
যে আঁধার সে আঁধারে ঘিরে।
সমুখে সেই সে অমানিশি
স্তম্ভিত নীরব দশ দিশি
দুজনে বসিয়া কাছাকাছি
তবু দূরে—অতি দূরে আছি !

নক্ষত্রের ক্ষীণালোক ফুটি
দেখাইছে বিরাগ ভ্রুকুটি
অশ্রুজলে উথলিত প্রাণ
অভিমানে বিশুষ্ক নয়ান।
সহসা চাহিয়া নভ প্রতি
কি দেখি এ ভীম দৃশ্য অতি?
অনলের বর্ষি শত ধারা
চারিদিকে খসিতেছে তারা।
ক্রোধে বিশ্ব উঠেছে রাঙ্গিয়া
সৃষ্টি বুঝি পড়ে বা ভাঙ্গিয়া
শিহরি চকিতে মুদি আঁখি
সকাতরে "নাথ" বলি ডাকি
আলিঙ্গিতে বাহু প্রসারিয়া
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।
পুনঃ যবে দেখিলাম চাহি
চারিদিকে কোথা কেহ নাহি।
আঁধারে স্তম্ভিত চরাচর
আমি শুধু পড়ে ভূমি পর।
কোথায় সে? গিয়াছে চলিয়া—
নিতান্তই একাকী ফেলিয়া!
এই মোর প্রণয়ের স্মৃতি
এই মোর জীবনের মায়া
এই মোর হৃদয়ের গান
ভুলে যেতে গিয়েছি ভুলিয়া!

প্রেম।

ক্ষুদ্র মহৎ হইতে চাহে, সসীম আপন সীমা তিরোহিত করিয়া অসীমে আপনা হারাইতে চাহে, এক বহুতে মিশিতে চাহে, বহু মিশিয়া এক হইতে চাহে; ইহাই জগতের নিয়ম। কেহই আপনাতে পরিতৃপ্ত নহে, বর্ত্তমানে সুখ নাই; ভবিষ্যতের জন্য সকলেই লালায়িত, ইহাই জগতের গতি। এক চির-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া জাগতিক সমস্ত জীবই এক মহা উদ্দেশ্যের অনুগত হইয়া চলিতেছে, অথচ বুঝিতেছে না কাহার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে। মানব প্রাণে আসিয়া ইহা প্রেম-রূপে পরিস্ফুট হইতেছে। মানবের প্রাণ আপনা বিকাইয়া অন্যের হইতে চাহে, আপনার ক্ষুদ্রত্ব এই বিশ্বের মহা প্রাণের মধ্যে ডুবাইয়া মহাপ্রাণতা লাভ করিতে চাহে। কিন্তু অন্ধ মানব আপন মহান্ লক্ষ্য বুঝিতে না পারিয়াই ইতস্ততঃ ছুটা ছুটী করিয়া বেড়ায়, মণি ভ্রমে কাঁচ লইয়া পরম পুলকিত হয়। মানব নিতান্ত মলিন, নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও অনন্তের বীজ তাহার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে; আপাততঃ অন্ধকারে থাকিলেও অনন্ত আলোক সমুদ্র তাহার জীবনের ধ্রুবতারা। সেই-ই তাহারা লক্ষ্য, সে দিকেই তাহার গতি। প্রেম সেই লক্ষ্য পথে আমাদের প্রধান সহায়।

প্রেমে একে অন্যে ডুবিতে চায়, দুই মিশিয়া এক হইতে চায়। কিন্তু এ মিলন দুই বারি বিন্দুর একত্র মিলন নহে, কিম্বা বারি বিন্দুর সমুদ্রে আত্মহারা হওয়া নহে। ইহা আত্মায় আত্মায় মিলন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলন। ইহাতে কাহারও ব্যক্তিত্ব লোপ হয়

না, অথচ দুটি প্রাণ মিলিয়া এক হয়। এ অপূর্ব্ব মিলনে ব্যক্তিগত জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ হয়, আত্মার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। এমন কি ব্যক্তিত্ব বোধই এ আকাঙ্ক্ষার মূল; "তোমাতে ও আমাতে"—প্রেম সাধনার বীজ মন্ত্র। যেখানে ব্যক্তিত্ব বোধ নাই, সেখানে প্রেম জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। এবং এই ভাবের পরিপুষ্টিতেই প্রেমের পরিপুষ্টি। প্রেমের আর একটি নিয়ম সমতা। শ্রেষ্ঠের প্রতি ভক্তি, কনিষ্ঠের প্রতি বাৎসল্য, কিন্তু সমানে সমানেই প্রেম। প্রেমই সাম্যবাদ শিক্ষা দেয়। প্রেম অতি ক্ষুদ্রকেও অতি মহৎ করে ও সকলকে সমান করে। "It makes the reptile equal to the god."

পুরুষ ও রমণী যখন পরস্পরে অনুরক্ত হন, যখন সে অনুরাগ একাগ্রীভূত আকাঙ্ক্ষাতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে সচরাচর প্রেমপদ-বাচ্য হইতে দেখা যায়। কিন্তু পুরুষ রমণীর এরূপ আকাঙ্ক্ষা মাত্রই প্রেম নহে। যখন একজন আপনার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ভুলিয়া অন্যের সেবায় নিযুক্ত হয়, যখন প্রিয়জনের কল্যাণই কাহারও সকল চিন্তা, সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে, তখনই কেবল তাহাকে প্রেম নাম দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখানেই প্রেমের চরম পরিণতি হইল না। প্রেমের মধ্যেও ক্রমোন্নতি আছে। এবং ইহার উৎকর্ষাপ[illegible] মাধুর্য, নারীর সামাজিক জীবনের উপর নির্ভর করে। যে পরিমাণে নরনারী জ্ঞান ও [illegible] অর্থ হইয়াছে, যে পরিমাণে নরনারী স্বাধীনতা লাভ করিয়া সমাজ-জী[illegible] দেশবাসী অসভ্য টিউট[illegible] পরিণত করিতে পারিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহাদের এই প্রেমের [illegible] পল্লিত হইল। পুরু[illegible] লাভ করিয়াছে। কোন নির্দ্দিষ্ট কালে কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের প্রচলিত রীতি ন[illegible] হইয়া ও আদর্শ দ্বারা তৎকালবর্ত্তি তদ্দেশবাসী লোকের সমস্ত কার্য্যকলাপ, সমস্ত চিন্তা ও বাসনা বহুল পরিমাণে নিয়মিত হইয়া থাকে; ইহার হাত এড়াইবার সাধ্য কাহারই নাই। অধিকাংশ লোকের পক্ষে ইহাই একমাত্র নিয়ামক। কিন্তু অকাল ফল কি ফলে না? ফলে। এরূপ ব্যতিক্রম নিয়মেরই পরিপোষক। প্রেমের ক্রম বিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ইহারই প্রমাণ পাই। যে সময়ে সমাজ যে পরিমাণে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই নরনারীর এ সম্বন্ধ বিশুদ্ধতর আকার ধারণ করিয়াছে।

কোন পদার্থের মূল দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নিরূপণ করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। ভবিষ্যৎ দেখিয়া, তাহার চরম পরিণতি দেখিয়াই সকল জিনিসের মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। কোন পদার্থের চরম পরিণতি যাহা, যে আদর্শ অতি দৃঢ়ভাবে অন্তরে থাকিয়া কার্য্য করাতে বিবর্ত্তন সম্ভব হইতেছে, ক্রমিক বিকাশে যে আদর্শই প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সে পদার্থের প্রকৃত সত্য। যতক্ষণ না সেই আদর্শ বুঝা যায়, ততক্ষণ কিছুই বুঝা হইল না। দেশ কালের মধ্যে বিবর্ত্তনের প্রত্যেক অবস্থায়ই সেই আদর্শ আংশিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ণ বিকাশ সেই আদর্শই,—তাহা একমাত্র বিধাতার অন্তরে থাকিয়াই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিতেছে। সেই আদ-

র্শের আলোকে দেখিলে, সকলেরই মধ্যে সুশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যাইবে, নহিলে সকলই অন্ধ শক্তির ক্রীড়া বলিয়া বোধ হইবে। মানব ইতিহাসে প্রেমের বিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিলেও, আমরা তাহাই দেখিতে পাই। আদর্শকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখিলে এই বিবর্ত্তন অনেকটা অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন আদর্শের আলোক দেখি তখন তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দেখিতে পাই, আদর্শের গূঢ় কার্য্য দেখিয়া অবাক হই। ইহার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিলে প্রেমের স্বর্গীয় আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নয়নগোচর হইবে। এই বিশ্ববিজয়ী, সর্ব্বপূতকরী প্রেম জীবমাত্রের একটি সাধারণ প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন। জীব-প্রবাহ রক্ষা করা প্রকৃতির একটি আদিম বিধি। প্রকৃতি এই প্রবৃত্তির সাহায্যে স্বীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লইতেছেন, আমরাও প্রবৃত্তির প্রভাবে অন্ধের ন্যায় [illegible] কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তিতে সুখ আছে। এই সুখের আশা মানুষকে আরও অন্ধ করিয়া তুলে, তাহাকে একেবারে প্রবৃত্তির দাস করিয়া ফেলে। অতি বর্ব্বরাবস্থায় পশুর ন্যায় মানুষও প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়া [illegible]য়াছে ও দিতেছে। প্রকৃতি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্য বিবিধ [illegible] অবলম্বন করিতেছেন;—সৌন্দর্য্য-বোধ তাহার অন্যতম। সামান্য [illegible]

প্রেম।

বোধ বিরহিত নহে এবং এই সৌন্দর্য্য-বোধের যে সাক্ষাৎ উ[illegible]হায়তা, তাহাও বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদেরা নিরূপিত করিয়াছেন। মানব আপন সৌন্দর্য্যের ভাব বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রকৃতি নরনারীর মুখে এই সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া বিশেষভাবে যৌন নির্ব্বাচনের সহায়তা করিতেছেন। ইহারই প্রভাবে পুরুষ রমণীতে মুগ্ধ, রমণী পুরুষে মুগ্ধ। যখন প্রবৃত্তির উপর আসিয়া সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধ প্রভা পতিত হইল, তখন প্রবৃত্তির ও প্রকৃতি কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল, মানুষ পাশব চৈতন্য হইতে এক সোপান ঊর্দ্ধে উন্নীত হইল। ইতি পূর্ব্বে স্ত্রী জাতির অবস্থা নিতান্তই হীন ছিল, পুরুষ তাহাকে ভারবাহী পশুর ন্যায় ব্যবহার করিত। কিন্তু যখন সৌন্দর্য্য-স্পৃহা মানবান্তরে জাগরূক হইল, সৌন্দর্য্যের প্রতি একটু অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিল, তখন রমণী জাতির অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত হইল। রমণী এখনও পুরুষের সুখ সম্ভোগের উপকরণ বটে, কিন্তু এখন তাহার একটু আদর বাড়িয়াছে, সৌন্দর্য্যস্পৃহার স্বার্থবিরহিত ভাব মিশিয়া এই ঘোর স্বার্থের সম্বন্ধকেও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাহার সহিত মানুষের আত্মাভিমান ও ক্ষমতাপ্রিয়তা মিশিয়া এ সম্বন্ধকে আবার এক নূতন আকার দিতেছে। মনুষ্যের স্বভাবে যে সে আপনাকে আপনা হইতে প্রক্ষেপ করিয়া বহির্বস্তুতে আরোপ করে। ইহার ফলে উক্ত প্রকারে আরোপিত বস্তুর প্রতি আমাদের একটু আত্ম-বোধ জন্মে, তাহা আমাদের জীবনের অংশ-স্বরূপ হইয়া যায়। এই ভাবে যাহা কিছু আমাদের, তাহার সহিতই আমাদের আত্মাভিমান জড়াইয়া যায়, তাহা আমা-

দের গৌরব বা অপমানের হেতুভূত হইয়া দাঁড়ায়। সামান্য গৃহপালিত পশুপক্ষী, এমন কি, অচেতন পদার্থ-পর্য্যন্ত এরূপে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। স্ত্রী বিশেষ ভাবে এই ভাবের অধিকারিণী হন। রমণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভাব, রমণীর ব্যক্তিত্ব-ভাব এখনও পরিস্ফুট হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব পুরুষের সামাজিক অস্তিত্বের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, এখন স্ত্রীর মান সম্ভ্রমে স্বামীর মান সম্ভ্রম নিরূপিত হইতেছে। সমাজে স্ত্রীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহার নিজের মান সম্ভ্রম নাই, তিনি স্বামীর মান সম্ভ্রমের প্রতিফলক মাত্র এবং তিনি এই প্রতিফলক বলিয়াই তাহার সম্মানে স্বামীর সম্মান নিরূপিত হয়। ইহা যে রমণী-জী[illegible]জন্যে [illegible]পেক্ষা উচ্চতর অবস্থা তাহাতে আর সংশয় নাই। এবং এই উন্ন[illegible]াই তৎকালে [illegible]ফল, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধেও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছে[illegible] of fathers and hus[illegible]ষ্ঠ ও পবিত্র করিবার পক্ষে সন্তান বাৎসল্য একটি প্রধান শক্তি। এতদ্ভিন্ন স্বামী স্ত্রী উভয়ের স্বার্থ এ ভাবে বিজড়িত যে একের স্বার্থ অন্যের স্বার্থ সংসিদ্ধ না করিয়া রক্ষা করা যায় না। এরূপ ভাবে দীর্ঘকাল একত্রাবস্থান করিলে যে পরস্পরের প্রতি একটু নিঃস্বার্থ ভাব জন্মিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই দাম্পত্য সম্বন্ধ সকল প্রকার বিকারের মধ্যেও মাধুর্য্য বিরহিত নহে। (Classical) জগতে ইহাই প্রেম নামে অভিহিত হইয়াছে।

s, [illegible]
hu[illegible]

পুরাতন রোমক রাজ্য যখন জর্ম্মনদেশবাসী অসভ্য টিউটন[illegible]গের দ্বারা বিনষ্ট হইল, তখন জগতের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। পুরাতন রোমীয় সভ্যতা জর্ম্মনদিগের নূতন জাতীয় জীবনের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক নূতন সভ্যতার সূত্রপাত করিল। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সকল বিষয়েই তাহার ফলাফল পরিলক্ষিত হইল। ইহার ফলে ইউরোপ ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম ও ফিউডেল সিষ্টেম প্রাপ্ত হইল। জর্ম্মনদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবস্থা চিরকালই অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। *

রমণী জাতির অবরোধ প্রথা তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না ও অনেক কার্য্যে

---

* A great respect for the female sex had always been a remarkable characteristic of the Northern nations. The German women were high-spirited and virtuous; qualities, which might be causes or consequences of the veneration with which they were regarded.

Hallam's Europe During the Middle Ages.

Like the Gauls in regard to their Druidesses the Germans looked upon womankind as posseseing something divine in its character, and as communicating with the Gods more easily than men; and Tacitus mentions instances of the veneration thus paid to the sex. * * * Tacitus praises highly the chastity of the German women, and assures us that the Germans were almost the only people among the barbarians who lived satisfied each

রমণী পুরুষের সহায় ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে রমণী স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের অধীন ছিলেন, তিনি স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিতে পারিতেন না। তিনি পিতা বা স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয় পুরুষের অধীনে থাকিতেন। *

এই অধীনতা সত্ত্বেও রমণীজাতির প্রতি টিউটনদিগের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল ও রমণীরাও এ শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নানাবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা গীতি গান করিতে ঐতিহাসিকেরা ত্রুটি করেন নাই। পুরাতন রোমীয় ও অভিনব জর্ম্মনজাতির সমবায়ে জাতীয় জীবনের যে নূতন অভ্যুত্থান হইল, তাহাতে রমণী জাতির বর্ত্তমান উন্নতির সূত্রপাত হইল। জগতের ইতি[illegible]-প্রবাহ রক্ষা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইউরোপে জর্ম্মন জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] করিয়া [illegible] মহাশক্তির সম্মুখিন্ হইলেন, ১ম,—রোমীয় সভ্যতা; ২য়,— [illegible] সম্পন্ন করিবেন [illegible] নকট বিজয়ীর মস্তক অবনত হইল, প্রকারান্তরে জগতের রাণী রোম পরাজিত হইয়াও বিজয়ী হইলেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে রমণী জাতির অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিল। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা রমণী জাতিকেই ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায় পাইলেন। খৃষ্টের মধুর চরিত্র রমণীর কোমল হৃদয়ের আপন প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তার করিল। রমণীরাই এই ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে বিশেষ আগ্রহ [illegible] হিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাবে ক্রমশঃ তাহা সমাজের সর্ব্বত্র [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিল। দলে দলে রমণীগণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অভিভাবকগণের সহিত তাঁহাদের নানা প্রকার গোলযোগ হইতে লাগিল, অভিভাবকদের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। অভিভাবকগণের হস্ত হইতে রমণীগণকে স্বাধীন করিবার পক্ষে ধর্ম্ম প্রচারকগণ বিশেষ সহায় ছিলেন। তাঁহাদেরই প্রভাবে রমণীগণ আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন। এই ভাবে তাঁহারা আইনের চক্ষে আপনাদের স্বাধীনতা কতক পরিমাণে লাভ করিলেন। †

---

with one wife, except a very small number, who not through licentiousness, but as a mark of nobility, seem to have many wives.
Thomas Wright's Womankind.

* No free woman can live in Lombardy, or I believe, in any Teutonic State, save under the mundium of some one. Amongst most of the Teutonic races women, slaves, and youths, at least not of age to carry arms, were under the mund of some one. Of course, primarily the father, head of the family, and if he died, an uncle, elder brother &c. The married woman was, of course, under the 'mund' of her husband.
Kingsley's the Roman and the Teuton.

† They (the Christian clergy) laboured to destroy, or at last to diminish, the old patriarchal spirit, and to emancipate the female sex from the too

রমণীগণ এই সমস্ত ধর্ম্মাশ্রমের আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যানুশীলন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনেকে জ্ঞানার্জ্জনে এতদূর কৃতী হইয়াছিলেন যে, সেই তমোযুগের তমোজাল ভেদ করিয়া অনেকের নাম বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। *

এই সমস্ত আশ্রমবাসিনী রমণীরাই যে বিদ্যানুশীলন করিতেন তাহা নহে, অনেক গৃহবাসিনী রমণীরাও এই সময়ে জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। এই তমোযুগে পুরুষেরা সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদিতেই রত থাকিতেন, শস্ত্রচালনাকেই তাঁহারা পৌরুষ বিবেচনা করিতেন, বিদ্যার্জ্জন রমণীজনোচিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং পরিবারের মধ্যে রমণীরাই তৎকালে জ্ঞানের একমাত্র আধার ছিলেন। †

---

great authority of fathers and husbands. * * * When the clergy laboured to emancipate the female sex, they were certainly looking to their own interests. They had seen how the gentleness and pious spirit of the sex has assisted more than anything else in the early progress of Christianity in the West. They sought, therefore, to substitute their own influence over womankind for that of the family. The women were drawn away from earthly marriages to be, as they expressed it, married to Christ; that is, to enter the monasteries, and become nuns. The religious houses were thus filled with women who had either separated from their husbands, or refused to accept the husbands designed for them by their fathers usually under the protection, if not under the encouragement, of the ecclesiastics.
T. Wright's Womankind.

* In the comparative solitude of the cloister womankind became acquainted with letters, and her mind gradually became enlarged and elevated, and embraced a new kind of refinement. The books which were brought within the scope of monastic reading were not merely the Scriptures and works of a religious character, but they included the old Roman writers; and the more intelligent of the nuns, as well as monks made themselves familiar, as far as they understood them, with Virgil, and Horace, and Terence and Plautus. Nuns became learned as well as literary.
T. Wright's Womankind.

† We have reasons for believing that generally in knightly household the ladies were the most learned part of the family. Learning to read or write was not considered to form a necessary part of a gentleman's education until a comparatively late period; his instruction was in arms, and in the active pursuits of life. In the families of lesser rank, the female children were more frequently sent for education into a convent, where reading and writing, and some degree of learning, would be taught as a matter of course. As they grew up they formed at home the more knowing part of the household.
T Wright's Womankind.

ইহার ফলে রমণীদের অবস্থার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অনেক কার্য্যেই তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। ইহার সম-সময়ে আর একটী অবস্থা রমণীর সামাজিক পদ অপেক্ষাকৃত উন্নত করিয়া দিল। তমোযুগে Baron or Knight গণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে বাস করিতেন, কারণ সে সময় কাহারই ধন প্রাণ নিরাপদ ছিল না। তাঁহারা যখন গৃহে বাস করিতেন, তখন আপন পরিবার ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সঙ্গী ছিল না। এ অবস্থায় পারিবারিক বন্ধন ঘনিষ্ট ও দৃঢ় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পরিবারের মধ্যে রমণী অতি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার সম্মান বাড়িয়া গেল। জ্ঞানে তিনি পুরুষের অপেক্ষা উন্নত ছিলেন, এরূপ ঘনিষ্ট ভাবে একত্রাবস্থান করাতে নানাবিষয়েই তিনি স্বামীর সঙ্গিনী হইলেন। নানা বিষয়ে তিনি আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়া স্বামীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। স্বামী যখন যুদ্ধাদির জন্য দূরে গমন করিতেন, তখন তিনিই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া থাকিতেন। এইরূপে নানাপ্রকার ক্ষমতা ও দায়ীত্বের কার্য্যে আপন পটুতা প্রদর্শন করিয়া পরিবারের মধ্যে আপন পদ সুপ্রতিষ্টিত করিয়া লইলেন। *

* When the feudal possessor left his castle to go in search of war and adventure, his wife remained there; and in a situation very different from that which women almost always held in previous times. They remained there as mistress, or lady of the castle, as representative of her husband, charged in his absence with the defence and honour of the fief. This situation of rank, and almost of sovereignty, in the very bosom of domestic life, often gave to women of the fedual epoch a dignity, courage, virtues, and a splendour, which they had not displayed under other circumstances, and contributed powerfully, no doubt, to their moral development and to the general progress of their condition.

Guizot's History of Civilisation.

As a wife, woman had by this time become, instead of the slave and property of her husband, his equal, and in most of the relations of life an independent agent. She had become capable of holding independent power of her own, which was something more than reflecting that of her husband. She was now an heiress, carrying with her as a dower castles and domains, and provinces, with numerous vassals; she could be guardian of the manor, regent of the state, and as such sign deeds, and share in all the obligations imposed by peace or war. Many of the great ladies of the Middle Ages ruled over extensive territories, and took a very active part in political affairs. In the household her position had more of dignity in it, and she was looked upon with a different kind of respect. Instead of serving wine to the guests, she sat at the table, and hers was the place of honour by the side of her lord. T. Wright's Womankind.

পুরুষ গৃহে রমণীকে যেরূপ সম্মান করিতে অভ্যস্ত হইলেন, বাহিরে যাইয়া রমণীর প্রতি সে সম্মান দেখাইতে বিস্মৃত হইলেন না। ইহার সম-সময়ে আর একটি নূতন শক্তি ইউরোপে দেখা দিল। তাহার প্রভাবে রমণী জাতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রোভেন্স প্রদেশেই এ শক্তির উদ্ভব হয় এবং তথা হইতে বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ সমগ্র ইউরোপময় ছড়াইয়া পড়ে। তৎকালে ইহার ফল যেমনই হউক না কেন ইহারই প্রভাবে যে ইউরোপীয় সমাজে রমণী জাতির বর্ত্তমান উন্নত পদমর্য্যাদা তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রোভেন্সের নাইটেরা রমণীদিগকে এক প্রকার নূতন সম্মানের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহারা রমণী জাতি ও প্রেমের মহত্ব ঘোষণা করিয়া কবিতা রচনা করেন। তাঁহাদের প্রেম-সঙ্গীত ও রমণী-পূজা ইউরোপকে মাতাইয়া তুলিল। রমণীগণ বীরপুরুষদের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইলেন। রমণী এখন প্রেম ও সৌন্দর্য্যের রাণী (Queen of Beauty and Love) হইলেন। তাঁহার প্রসাদ পাইয়া বীরগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারই প্রীতি সম্পাদনের জন্য বীরগণ এখন ক্রীড়ারঙ্গভূমিতে আপনাপন শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইতে ব্যগ্র হইলেন। বিজয়ী প্রেম ও সৌন্দর্য্যের রাণী কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। রমণীরাও বীরগণের শৌর্য্য বীর্য্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন, বীরগণের সবল হস্তের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়েই আধুনিক প্রেম Romantic Love র উৎপত্তি হইল। রমণী এখন আর পুরুষের দাসী নহেন, কেবল ভোগসুখের উপকরণ নহেন; সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আশ্চর্য্য ক্রীড়া কৌশলে তিনি এখন পুরুষের উপাস্য দেবী, তিনি রাণী, তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করাই যেন পুরুষ জীবনের চরম লক্ষ্য। এই নারী-পূজা মেরী-পূজা হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে আবার মেরী-পূজার নূতন আকার প্রদান করিল এবং ইহারই অবন্তর ফলে রমণীর সম্মান আরও বর্দ্ধিত হইল। *

* Among these (Provencals) had arisen mystical doctrines on love and on the relationship between the sexes, which had ripened into sentiments of a peculiar respect for womankind. Christianity itself had been made to centre, in a great degree, in the worship of the Virgin, who was identified in this poetry with the Queen of love and beauty, and who then received a reverence not different much from that paid to the Godess Venus. * * * The great object of the Provencal poetry is love and the service of the ladies. The language and tone is delicate and becoming, but not always. Most of the poems of one of their earliest great poets now known are coarsely licentious; but two other love-songs by the same author are unexceptionable in their character. We can only assume from this contrast

কিন্তু এই সমস্ত পূজা অর্চ্চনার মধ্যেও মানবের দেব ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। বিশুদ্ধ নৈতিক জ্ঞানের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরুষ রমণীর সম্বন্ধ নীতি অংশে এরূপ মলিন ছিল যে, তাহার বিবরণ পাঠ করিতে আমাদের নীতিজ্ঞান শিহরিয়া উঠে, আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। *

---

that, whatever may have been the outward elegance and refinement of society at that period, it was under the surface to a great degree coarse and immoral. * * The love which presents itself to us in the mass of the Provencal poetry is, in form and theory at least, a sentiment full of enthusiasm, delicate and respectful seeking to elevate its object. It is exactly that sentiment upon which rests woman's position in the spirit of chivalry.

* * *

A formal ceremony was prescribed for the acceptance of a lover, in which was imitated exactly that by which, in feudalism, the vassal acknowledged his suzerain, and the knight or squire who had gone through it, had contracted similar obligations towards his lady. He placed himself on his knees before her, with his two hands joined between her hands, before witnesses, and he, by words, devoted himself entirely to her, swore to serve her faithfully to his death, and to defend her against all assailants to the utmost of his power. The lady, on her side, declared that she accepted his services, engaged to him her tenderest affections, and, in sign the union now established between them, she usually gave him a ring, and then she kissed him, and raised him on his feet.

T. Wright's Womankind.

* According to this law (of the Courts of Love) love was considered to be incompatible with marriage, which under feudalisin, was a mere affair of political or personal interests. * * * Under the external pride and pomp of the mediæval castle, the degree of morality which prevailed in its society was not very high. * * * This laxity of manners also explains why, during the feudal period, illegitimacy of birth was so little dishonourable, that the word which designated it was commonly adopted as a surname.

T. Wright's Womankind.

I have already mentioned the dissoluteness, which almost unavoidably resulted from the prevailnig tone of gallantry. And yet we sometimes find, in the writings of those times, a spirit of pure but exaggerated sentiment; and the most fanciful refinements of passion are mingled by the same poets with the coarsest immorality.

Hallam's Middle Ages.

এই সময়ে পুরুষ রমণীর শারীরিক সৌন্দর্য্যের মোহেই মুগ্ধ ছিলেন, প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিই তাঁহাদের জীবনের নিয়ামক ছিল। নৈতিক বলে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া মানবাত্মার গৌরবস্থাপনের ভাব এখনও তাঁহাদের অন্তরে উপস্থিত হয় নাই। তাহারা প্রাকৃত মানব, ইন্দ্রিয়ের মোহেই মুগ্ধ, তাহাতেই পরিতৃপ্ত; আধ্যাত্মিক সংগ্রাম তাহাদের অন্তরে উপস্থিত হয় নাই। আত্মা ও প্রকৃতি তাহাদের মধ্যে অবিভক্ত, শরীরই তাহাদের নিকট আত্মময়, শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য-বোধ আজও তাহাদের জন্মে নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাবে তাহাদের প্রাণ পরিপূর্ণ, ইহারই উপভোগ তাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই আমরা তাহাদের মধ্যে অবিভক্ত একতার ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হই, তাহাদের নৈতিক ভাবের অপূর্ণতার কথা ভুলিয়া যাই। এখানে আমরা প্রকৃতিরই একাধিপত্য দেখিতে পাই, আত্ম-রাজ্যের কথা এখানে খাটে না। সৌন্দর্য্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ স্বার্থভাব বিরহিতা রমণী যখন এই সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, পুরুষের প্রাণ যখন সৌন্দর্য্যের প্রভাবে বিমোহিত হইল; অপর পক্ষে রমণীও যখন পুরুষের সবল হস্তের, পুরুষের শৌর্য্যবীর্য্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন, তখন নরনারীর অনুরাগ নিঃস্বার্থ প্রেমে পরিণত হইল। কিন্তু শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভাবই প্রেমের সমস্ত নহে। জীবনের লক্ষ্যের বিশুদ্ধতার উপর ইহার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে যখন আধ্যাত্মিকভাব মানবান্তরে ফুটিয়া উঠিল, তখন এই প্রাকৃতিক একতা ভাঙ্গিয়া গেল, মানব-হৃদয়ে দেব-দানবের সংগ্রাম আরম্ভ হইল, মানব নূতন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে রমণী-হৃদয়ের কতকগুলি কমনীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইল। অন্তরের এই সৌন্দর্য্য বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিয়া রমণীর মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল, মানবকে উন্নত জীবনের পথে লইয়া যাইবার পক্ষে সহায় হইয়া দাঁড়াইল।

রমণী জীবনের এই আদর্শ, প্রেমের এই আদর্শ ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিবর্গকে এ পর্য্যন্ত অনুশাসিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ আদর্শ আর মানবের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মোহ আর তাহার চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নৈতিক জ্ঞান মানবান্তরে ফুটিয়া উঠাতে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের প্রতিই মানব মন অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আন্তরিক সৌন্দর্য্যই মানব হৃদয়ের পূজা লাভ করিতেছে। একদিকে যেমন নৈতিক আদর্শ উজ্জ্বল হওয়াতে নরনারীর সম্বন্ধ বিশুদ্ধতর ও উচ্চতর হইতেছে, অপর পক্ষে আর একটি নূতন শক্তির অভ্যুদয়ে, নরনারীর সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, সমাজ-জীবনে নূতন আদর্শ আনিয়া দিয়া জীবনের লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া নরনারীর সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে। তমোযুগে যে সমস্ত শক্তি রমণীর অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া নরনারীর সম্বন্ধ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহারই

মধ্যে বর্ত্তমান যুগের বীজ দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে তমোযুগ যে রমণী-পূজা প্রবর্ত্তিত করে, তাহা সাক্ষাৎভাবে নরনারীর সম্বন্ধকে পবিত্র করিতে পারে নাই; তাহাতে জীবন বিশুদ্ধ না হইয়া, আধ্যাত্মিকতা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া, প্রবৃত্তির উপর সাধুতার সিংহাসন স্থাপিত না হইয়া বরং তদ্বিপরীতই হইয়াছিল। নরনারী অসঙ্কুচিত ভাবে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া জীবনকে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়া-ভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাহা প্রেম নামে অভিহিত হইত তাহা প্রবৃত্তি ও সৌন্দর্য্য পিপাসার নামান্তর মাত্র। কিন্তু অন্য কয়েকটি অবান্তর শক্তি এই সময়ে পরোক্ষভাবে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমান যুগ আনয়ন করিয়াছে। এই নারী-পূজার একটী ফল নরনারীর সামাজিক আচরণের পরিবর্ত্তন। রমণী রমণী বলিয়াই দেশ কাল অপ্রভেদে পুরুষের সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, পুরুষ সর্ব্বদাই রমণী-সমক্ষে সসম্ভ্রমে আপনাকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। আভ্যন্তরিক ভাব যাহাই হউক না কেন, বাহ্যিক ব্যবহার এরূপ সুমার্জ্জিত হওয়াতে সুনীতির পথ কালে সুগম হইয়া উঠিল। সমাজ-জীবনে বাহিরে যে সসম্ভ্রম ব্যবহার নরনারীর মধ্যে প্রচলিত হইল, কালে তাহা অভ্যন্তরকেও সুসংস্কৃত করিয়া তুলিল। যাহা আমাদের দৃষ্টির অন্তর হয়, কালক্রমে তাহা আমাদের মনেরও অন্তর হইতে থাকে, ইহা একটী নিরূপিত সত্য। পাপের চিত্র যত আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে, ততই আমাদের উপর পাপের শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। অন্য পক্ষে সাধুতার চিত্র যতই আমাদের নয়নসমক্ষে রাখা যায়, ততই আমাদের অন্তর পরিবর্ত্তন করিয়া জীবনকে সাধুতার পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। সদাচারও এই ভাবে পাপের চিত্রকে দূরে রাখিয়া সাধুতার চিত্র সম্মুখে ধরিয়া পুণ্যের পথ সুগম করিয়া দেয়। অপর একটি শক্তি, রমণীর শিক্ষা। জ্ঞানের প্রভাব অপ্রতিহত, জ্ঞানের প্রভুত্ব স্বাভাবিক। তমোযুগে রমণী জ্ঞান লাভ করিয়া আপন পদ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, জগত-চক্রে আপনার স্থান নিরূপিত করিয়া লইলেন, জন-সমাজে আপন প্রভাব অনুভূত করাইতে সমর্থ হইলেন। জ্ঞান তাঁহাকে যে ক্ষমতা প্রদান করিল, শত পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবের মধ্যেও তাহা হইতে তিনি আর বঞ্চিত হইলেন না। সমাজ-জীবনে রমণীর পদোন্নতির পক্ষে রাজনৈতিক অধিকার অন্যতম প্রধান শক্তি। রোমের শেষ সম্রাটদিগের রাজত্বকালে যখন রোম অল্পে অল্পে আপন জীবনীশক্তি হারাইতেছিলেন, চারিদিকে সমাজ শৃঙ্খলা শিথিল হইতেছিল, বিবাহ-বন্ধন নামমাত্রে পরিণত হইয়াছিল, তখনই সেই সাধারণ অরাজকতার দিনে রমণী রাজনৈতিক অধিকার পাইলেন। মৃত্যুর মধ্য হইতেই নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল। কিন্তু টিউটন্ রমণীদিগের সে সমস্ত অধিকার ছিল না। সুতরাং রোমের বিনাশের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় রমণীর রাজনৈতিক অধিকার কিছু ছিল না। পরে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তমোযুগের রমণীরা পুনরায় রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে লাগিলেন ইহা পূর্ব্বে দেখান

হইয়াছে। এই সময়ে রমণীরা বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারী হইতে লাগিলেন, স্বীয় নামে দান বিক্রয়াদির ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ স্থাপন করিবার পর্য্যন্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বহুল পরিমাণে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। রমণীরা আপনাপন ইচ্ছামত স্বামী মনোনয়নের অধিকারও প্রাপ্ত হইলেন। এই সমস্ত কারণে রমণীর পদমর্য্যাদা বাড়িয়া গেল। এই সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার শুদ্ধ যে উচ্চ শ্রেণীর রমণীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে; ব্যবসায়-জীবী নাগরিক পত্নী ও তনয়ারাও ইহার অনেক অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সমগ্র রমণীজাতি উচ্চতর সামাজিক জীবন লাভ করিলেন। ক্রমশঃ ব্যক্তিত্বভাব ফুটিয়া উঠিল, রমণী কতক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেন। রমণী এখন আর পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি নহেন, তাঁহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাঁহার জীবনের স্বতন্ত্র লক্ষ্য আছে, তাঁহাকে সে লক্ষ্য লাভ করিতে হইবে। রমণী এ অবস্থায় যে সম্মানের অধিকারিণী হইলেন তাহা পূর্ব্ব-প্রদত্ত সম্মান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা কেবল সদাচার সঙ্গত নহে, ব্যক্তিত্বভাব-প্রণোদিত সম্মান। ইহা হইতে বর্ত্তমান যুগের উদ্ভব। সাম্যের উপর এ যুগ প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিত্ব ভাবের পূর্ণ বিকাশ ইহার লক্ষ্য, উচ্চতর সামাজিক জীবন এ লক্ষ্য লাভের প্রধান সহায়।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজে এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে যে বিপ্লবের দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছিল, যে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সে স্রোত আজও থামে নাই, সে সময়ে যে মহাযুগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আজও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু সে দিন বহু দূর নয়, যখন আমরা নূতন যুগের আবির্ভাবে উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিব। জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে রমণীগণও মস্তকোত্তলন করিতেছেন। তাঁহারা আর পুরুষের সবল হস্তের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ সেবাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা পুরুষের শির্ষস্থা দেবী হইয়া পূজা গ্রহণ অপেক্ষা নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংসার সমরাঙ্গনে অগ্রসর হওয়া অধিকতর গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছেন। বাস্তবিক একবার উন্মীলিত নেত্রে দেখিতে গেলে, এই নারীপূজা কি প্রকৃত পূজা? না, ভ্রান্তি? না, উৎকোচ? পুরুষ কি প্রকৃতপক্ষেই রমণীদের আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীব বলিয়া মনে করেন? যদি কেহ এই শ্রবণ-মধুর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা সত্য নহে। যদি তাহাই হইবে, তবে যখন জ্ঞানক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে রমণী পুরুষের সমকক্ষভাবে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন, তখন আপত্তির হস্ত উত্তোলিত হয় কেন? যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকে আমরা সমান হইতে দিতে অনিচ্ছুক কেন? ইহার সদর্থ সহজেই অনুমেয়। শিশুর সুকুমার মুখের হাসি, রমণীর কোমলতা ও সৌন্দর্য্য বড়ই মধুর সন্দেহ নাই, আমরা আদর করিয়া অনেক সুমধুর অমৃত বাক্যও বলিতে পারি সন্দেহ নাই।

শিশিরসিক্ত গোলাপের নয়নাভিরাম রাগ ও গন্ধ, মলয়ানিলের সন্তাপহারী স্নিগ্ধতা অতীব উপাদেয়, স্বর্গীয় বলিতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি গোলাপ বা মলয়ানিলকে মানবের ন্যায় শ্রেষ্ঠ মনে করেন? সুমিষ্ট কথায় প্রতারিত হয় না এরূপ লোক বিরল। শিশু ও রমণীর নাম যে একই মুখে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা আশা, করি, কাহারই অবিদিত নাই। এবং ইহাও আশা করা আর বাতুলের কার্য্য নহে যে, সামাজিক জীবনে এ অবস্থার জীবনকাল নিরূপিত হইয়াছে। যাঁহারা রমণীকে এই বিগত যুগের আদর্শক্ষেত্রে দণ্ডায়মানা রাখিয়া মৌখিক পূজা দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে আজও রমণীর মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; আর যে রমণী এরূপ পূজাতে সন্তুষ্ট, তিনিও আপনার প্রকৃত অধিকার, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পান নাই। রমণী পুরুষের পদপ্রান্তস্থিতা দাসীও নহেন, শির্ষস্থা দেবীও নহেন;—তিনি পুরুষের পার্শ্বস্থা সখি। তাঁহারা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের সর্ব্বপ্রধান বন্ধু, সর্ব্বপ্রধান সহায়। তাঁহারা উভয়েই স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অথচ প্রেমের সুমধুর বন্ধনে উভয়ে মিলিয়া 'এক', কেহ ছোট কেহ বড় নাই; উভয়েই সমান। রমণী জীবনের এই পরিবর্ত্তিত আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আদর্শের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। রমণীর কমনীয় কোমল ভাব, তাঁহার সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যরাশিই এপর্য্যন্ত প্রেমের নিয়ামক হইয়াছে। রমণীর স্বাধীন সত্তার পূর্ণ-বিকাশ হয় নাই, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, জ্ঞানক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে এপর্য্যন্ত (সাধারণতঃ) দেখিতে পাওয়া যায় নাই; কাজেই শক্তি ও সৌন্দর্য্যের মিলন ভিন্ন প্রেমের উচ্চতর আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ প্রেম-চক্ষু দ্বার দিয়া যাইয়া অন্তরে প্রবেশ করে। চারি চক্ষুর মিলন হইল আর প্রেমে দুই হৃদয় গলিয়া এক হইয়া গেল। এ জাতীয় প্রেমের চরমোৎকর্ষ রোমিও ও জুলিয়েট। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, ইহা রূপজ মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোহ হইলেও ইহা সৌন্দর্য্যের মোহ বলিয়াই ইহার যাহা কিছু মহত্ত্ব, ইহার যাহা কিছু দেবত্ব।

পুরুষ রমণীর সম্বন্ধের এ আদর্শ ভবিষ্যতের জন্য নহে, ভবিষ্যৎ আপন আদর্শ লইয়া অগ্রসর হইতেছে। যে দিন পুরুষ রমণী সাম্যের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া জ্ঞানে ধর্ম্মে পরস্পরের সহায় হইবেন, সেই দিনই প্রেমের আদর্শ পূর্ণতালাভ করিবে, সেই দিনই প্রকৃত আত্মার বিবাহ সম্পন্ন হইবে। সহানুভূতির আকাঙ্ক্ষা মানব প্রাণে স্বাভাবিক। মানব তাহার সকল চিন্তা, সকল কার্য্যে অন্যের সহানুভূতি চায়। জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে, সংসারের বিষম সংগ্রাম-ক্ষেত্রে রমণী এ পর্য্যন্ত পুরুষের সহায় হইতে পারেন নাই, পুরুষও তাঁহার নিকট সে সহানুভূতি, সে সহায়তা চাহেন নাই; তাঁহারা একটু স্নেহ মমতা, একটু আরাম পাইলেই সন্তুষ্ট। এ সমস্ত উচ্চ বিষয়ে সাহায্যের জন্য তাঁহার অন্য পুরুষ বন্ধু আছেন। সৌভাগ্যক্রমে এমন দিন আসিয়াছে বা আসিতেছে, যখন রমণী পুরুষের সর্ব্বপ্রকারে সঙ্গী হইবেন, তিনিও পুরুষের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া

জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবেন, সংসার-ক্ষেত্রে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবেন। যখন পুরুষ রমণীর মধ্যে এরূপ একটি জীবন-সঙ্গী খুঁজিবেন, এরূপ বন্ধু চাহিবেন,—যখন এই জ্ঞানের গরিমা, নৈতিক জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে, সে দিন চারি চক্ষুর মিলন-জনিত প্রেমের দিনও অবসান হইবে। তখন সৌন্দর্য্যস্পৃহা মানব হৃদয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে না, এবং জ্ঞানের দ্বারা, উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাবে প্রাণকে পরিপ্লুত করিবে। সেই শুভদিনে পরস্পরের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও নৈতিক জীবনের মহোচ্চ আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হইবে, রূপজমোহের আপেক্ষিক পঙ্কিলতা আসিয়া তাহার নির্ম্মলতা কলঙ্কিত করিবে না। যেমন প্রবৃত্তির উপর সৌন্দর্য্যের প্রভা পতিত হওয়াতে প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হইয়া আপন মলিনতা হারাইয়া নিঃস্বার্থ Romantic প্রেমে পরিণত হইয়াছে, তেমনই আবার যখন এই প্রেমের মধ্যে জ্ঞানের গরিমা ও নৈতিক আদর্শ আসিয়া আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তখন পুনরায় ইহা এক অপূর্ব্ব রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। প্রেমের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত পিয়াসের মধ্যে, প্রেমের স্বভাব-সুন্দর আত্মবিস্মৃতির মধ্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নরনারী প্রেমে আকৃষ্ট, শ্রদ্ধাভরে সসম্ভ্রমে একটু দূরে অবস্থিত। এখানে ব্যক্তিত্ব ভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, অথচ মধুর মিলনে এক। এখানেই প্রকৃত সখিত্ব সম্ভব। যখন এই ভাবে জ্ঞান ও নৈতিক জীবনের আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রদ্ধাভরে অবনত হৃদয়ে দুটি পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি এরূপ সখিত্ব স্থাপন করিবেন, তখন এই সখ্যভাবের অন্তর হইতে আর একটি মহাভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে। সেটি ধর্ম্মভাব। সান্ত ব্যক্তি জ্ঞানে ও নীতিতে যতই উন্নত হউক না কেন, তবুও তাহার সান্তত্ব ঘুচিবার নহে। প্রেমের আদর্শ, প্রেমের লক্ষ্য অনন্ত। প্রেমের মধুর বন্ধনে বদ্ধ ব্যক্তি-যুগল কখনও পরস্পরে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না;—ধর্ম্মভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিলে, অনন্তস্বরূপে আত্মসমর্পণ করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে বলবতী হইলে, প্রেমের চরম পরিণতি হয়, দুটি হৃদয় মিশিয়া অনন্তের দিকে আগ্রহে ছুটিয়া যায়। তাঁহাদের প্রেম ব্যক্তিগত জীবনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অনন্ত প্রেম-পারাবারে মিশিয়া যায়।

I would that you were all to me,
you that are just so much, no more.
* * * *
I would I could adopt your will,
See with your eyes, and set my heart
Beating by yours, and drink my fill.
At your soul's springs,—your part, my part
In life, for good and ill.

No. I yearn upward, touch you close,
Then stand away. I kiss your cheek,
Catch your soul's warmth,—I pluck the rose
And love it more than tongue can speak—
Then the good minute goes.

* * * *

Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.

যে দিন প্রেমের এই মহান্ আদর্শ মানবজীবনে দেখা দিবে, সেই শুভ দিনে পুরুষ রমণী-হৃদয়ে হৃদয় জড়াইয়া; প্রেমের বন্ধনে এক হইয়া; অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত পবিত্রতার আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবেন। অনন্ত আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইবেন। অনন্ত জীবন যে প্রেমের লক্ষ্য, তাহাতে সঙ্কীর্ণতা স্থান পাইতে পারে না, অবিশ্বাস স্থান পাইতে পারে না, অপ্রেম স্থান পাইতে পারে না। যে দুটী ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্রোত একত্র মিশিয়া একটি প্রবাহিণীর উৎপত্তি হইল, তাহা সাগরগামিনী, তাহা কখনও তাহাদের আপন ক্ষুদ্রত্বে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এই পবিত্র বন্ধনে সম্বদ্ধ যে জীবন তাহা সমাজ-জীবনের সহিত এক হইয়া, জগতের বন্ধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া, দিন দিন অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের আধার যে হৃদয়ের দেবতা, তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। এরূপ প্রেমে মানবের পুনর্জ্জন্ম হয়।

"প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়!"

এ প্রেমে যে জীবন দীক্ষিত হইয়াছে, তাহার পুরাতন, সঙ্কীর্ণ, আত্মসুখপ্রিয় জীবনের মৃত্যু হইয়া অজর, অমর, অনন্ত পবিত্র জীবন লাভ হইয়াছে। তাহার জীবন সার্থক হইয়া গিয়াছে। এ জীবনে স্বার্থ সাধন নাই—ইহা এক নিত্য উৎসর্গ। এ জীবনে প্রতিনিয়তই পুরাতন মরিয়া নূতন হইতেছে, ক্ষুদ্র মরিয়া অনন্ত হইতেছে, অপবিত্র মরিয়া পবিত্র হইতেছে। এখানে মৃত্যু ও জীবন হাত ধরাধরি করিয়া চলিতেছে, মরণের মধ্য হইতে জীবনের উৎপত্তি হইতেছে। যিনি এ মরণতত্ত্ব কিছুমাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারও জীবন বিফল হয় নাই।

প্রেমের আদর্শ অনন্ত জীবন। এ অনন্ত জীবন লাভের পক্ষে অনন্ত সাধনার প্রয়োজন। প্রেমিকের জীবন এই এক মহা সাধন। যিনি বিনা সাধনে, চারি চক্ষুর মিলন মুহূর্ত্তেই এই অমর জীবন লাভের আশা করেন, তিনি বড় ভ্রান্ত, তিনি নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন। কঠোর সাধন করিতে অবশ্যই সিদ্ধি মিলিবে, কিন্তু এই অনন্ত কালের মধ্যে

কোন্ মুহূর্ত্তে সেই শুভকাল উদিত হইবে, কে বলিতে পারে? মনুষ্য অপূর্ণ, এ পূর্ণতার আদর্শ কোন মানবের মধ্যে পূর্ণভাবে পাইবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। শেলী বলিয়াছেন,—"I think one is always in love with some thing or other; the error and I confess it is not easy for spirits cased in flesh and blood to avoid it—consists in seeking in a mortal image the likeness of what is perhaps eternal." তিনিই পরম সৌভাগ্যশালী যিনি এই মহাতীর্থের প্রকৃত সহযাত্রী পাইয়াছেন।

এ জগতের সকলেই সেই এক মহাতীর্থের যাত্রী। কিন্তু এ দীর্ঘ পথে গন্তব্য পথ ভুলিয়া গিয়া কেহ নিদ্রা যাইতেছে, কেহ বা ক্রীড়া করিতেছে, কেহ বা পথের কোন সামান্য সুখে ডুবিয়া যাইতেছে। অবিশ্রান্ত পদে ক'জন যাত্রী অগ্রসর হইতেছে? যাহারা যাইতেছে, তাহারাও মধ্যে মধ্যে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, নিদ্রাবেশে চক্ষু ঢুলিয়া পড়িতেছে। এ সময়ে সহযাত্রীর বড় প্রয়োজন। এ ক্লান্তির সময়, এ নিদ্রার সময় একজন পার্শ্বে থাকা আবশ্যক। নইলে কে জানে, কখন কে পথ ভুলিয়া যাইবে, কখন কে নিদ্রিত হইয়া পড়িবে। শুদ্ধ তাই নয়, এ পথে একাকী যাওয়া যায় না, সঙ্গী চাই-ই। এ পথে কেহই একাকী যায় না। বিশ্বের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি প্রভাবে সকলেই সকলের দিকে আকৃষ্ট; বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য লালায়িত। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, অনন্ত জীবনই ইহার এক মাত্র লক্ষ্য। দুটি হৃদয় মিলিতে না পারিলে, জীবনের সকল কার্য্যে এক হইয়া যাইতে না পারিলে, এ চরম লক্ষ্য-লাভে ব্যাঘাত জন্মে। তাই এক জন আর এক জনকে চায়, তাই এ প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা! প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা নিরর্থক নহে। প্রিয়জনের প্রেমই স্বর্গ, প্রেমিক অন্য স্বর্গের প্রত্যাশী নহেন। যদি কাহারও ভাগ্যে এ প্রতিদান ঘটে, তাহা হইলে তিনি সুখী, নইলে তাহার মত দুঃখী কে? কিন্তু তাই বলিয়া স্বার্থে প্রেমের উৎপত্তি নহে, এ প্রতিদান-আকাঙ্ক্ষা স্বার্থপরতা নহে। যাহা সুন্দর, যাহা উচ্চ, যাহা মহৎ, যাহা পবিত্র—তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকৃতিসিদ্ধ, স্বার্থ-চিন্তায় তাহার উৎপত্তি নহে। পবিত্রতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা, পবিত্র যাহা—তাহার সহচর কামনাস্ত স্বার্থপরতা নহে;—আর যদিই বা তাহাতে স্বার্থ থাকে, তবে তাহা ধর্ম্মও বটে। প্রেমের প্রতিদান চাওয়া ও পূজা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া একই কথা।

প্রেমে সকল স্বার্থ তিরোহিত হয়। যাঁহার হৃদয় উদার প্রেমের দেবমন্দির হইয়াছে, তাঁহার স্কন্ধ হইতে "আমিত্বের" বোঝা নামিয়াছে, তাঁহার ক্ষুদ্র "আমি"-টা মরিয়া গিয়াছে এবং তাহাতেই তাঁহার সুখ। এই "আমি"র মৃত্যুতেই চরমের প্রারম্ভ!

"Love took up the harp of life,
And smote on all the chords with might;
Smote the chord of self, that trembling
Passed in music out of sight."

বুদ্ধিবিকাশ।

জীবদেহে তাপ, তাড়িৎ, রাসায়নিক ক্রিয়া, প্রভৃতি প্রতি নিয়তই ধারাবাহিক বিদ্যমান আছে, এমন কি জীবনের সহিত উহারা সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিলেও বলা যায়। যথায় জীবন আছে তথায় উক্ত গুণ বা শক্তি নিচয় অপরিহার্য্য। একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু জৈবনি শক্তি যে তন্মধ্যে কোন একটী বা তৎসদৃশ ব্যাপার, বা তৎসমুদয়ের সমন্বিত ফল বিশেষ, ইহা আমরা বলিতে সাহস পাই না। বিজ্ঞানের আজকাল যতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহাতে একথা বলা দূরে থাক, এদিকে ইঙ্গিত করাও সঙ্গত নহে। জীবদেহে তাপ, তাড়িৎ, রাসায়নিক ক্রিয়া, প্রভৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্য; উহাদের সহিত জীবনের অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধও আছে; কিন্তু জৈবনি শক্তি উহাদের কোনটি বা সকলের সমষ্টি, একথা বলিবার আমাদের শক্তি নাই। ফলে জৈবনি শক্তি যে দেহাতিরিক্ত সত্বা, তাহাও আমাদের উপলব্ধি হইবার সামগ্রী নহে; সুতরাং সে কথা বলিতেও নিমিষের জন্য সঙ্কুচিত হইব না। অতএব জীবন, চৈতন্য, মন, প্রভৃতির দেহাতিরিক্ত অস্তিত্ব মনুষ্যের ধারণায় আসিতে পারে না। যাঁহারা তদস্তিত্ব সমর্থনে প্রয়াস পান, তাঁহারা শুদ্ধ কয়েকটী কথার কথাকে তৎপদে বরণ করিয়া থাকেন।

অহং ও নাহং এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিজ্ঞানুমোদিত ব্যাপার। আজকাল আর ইহার কেহই অন্যথা স্বীকার করেন না। অহং-এর অস্তিত্বও যেমন সত্য, নাহং-এর অস্তিত্বও সেইরূপ; ইহাতে আর কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডকে নাহংগত ও অহংগত করা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। ফলে জ্ঞানকাণ্ডকে এ প্রকার দ্বিভাগে বিভক্ত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা আমাদের এস্থলে বিশেষ বিচার্য্য নহে। প্রস্তাবিত বিষয়ে আমাদিগের সে মীমাংসার ততদূর আবশ্যক নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এ প্রকার বিভক্তির দোষ গুণ দুই আছে। বাস্তবিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে উক্ত প্রকার বিভাগে অব্যাপ্তি দোষ আইসে। জ্ঞান বিষয়ীর, সুতরাং সকল জ্ঞানই অহংগত। যাহাকে নাহং-জনিত জ্ঞান বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অহংগত জ্ঞান স্বতঃই আসিতেছে, যেহেতু নাহং-এর স্বরূপ বা সত্বা আমাদের জ্ঞেয় নহে; বস্তু মাত্রই প্রত্যক্ষমূলক এবং প্রত্যক্ষে অহংই প্রবল। All perception or knowledge implies mind; to perceive is an act of mind; whatever we may suppose the thing perceived to be, we can not divorce it from the percipient mind. To perceive a tree is a mental act; the tree is known *as perceived*, and not in any other way. There is no such thing known as a tree wholly detached from perception; and we can speak only of what we know.—ALEXANDER BAIN.

যাঁহারা শুদ্ধ অহং-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং নাহংকে তাহারই রচনা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী। যাঁহারা 'নাহং' স্বীকার করেন এবং 'অহং' তাহারই অবস্থান্তরীণ ভাব বলেন, তাঁহারা জড়বাদী। পরিণতিবাদীরা 'অহং'কে 'নাহং'-এর স্ফূর্ত্তি বিশেষ বলিয়া সপ্রমাণ করেন। কিন্তু অনেকে 'নাহং'এবং 'অহং'এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন যে 'নাহং' ও 'অহং' কেহ কাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী বিষয় নহে; উভয়ই সমান অধিকারী। সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনেরও এই মত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি 'অহং' ও 'নাহং'-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া মহা দ্বন্দ করিয়াও দুইটির ন্যায্য পার্থক্য রাখিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, চৈতন্যের মূল তত্ত্বই অহং ও নাহং-এর পার্থক্য অনুভূতি; কিন্তু স্থানান্তরে তর্কগতিকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে অহং ও নাহং-এর পার্থক্য স্থলবিশেষে সুসঙ্গত নহে। আমাদের চৈতন্যে কখন কখন 'নাহং' অনুভূত হয়। কিন্তু ফলে তথায় শুদ্ধ 'অহং' বই আর কিছুই নাই।

"Before closing this chapter I will notice the curious fact that after insisting with so much emphasis upon the recognition of an Ego and Non-ego as an element in all conciousness, Sir W. Hamilton is obliged to admit that the distinction is in certaincases a mistake, and that our consciousness sometimes recognises Non ego where there is only an Ego." J. S. MILL.

বস্তুতঃ 'অহং' ও 'নাহং' জ্ঞান সম্পূর্ণ পার্থক্য করা যায় না, আবার পার্থক্য অনেক স্থলে স্বতঃসিদ্ধও বটে; সুতরাং অপরিহার্য্য। জ্ঞানমাত্রই 'অহং' ভূত। জ্ঞানীর জ্ঞান, চেতন পদার্থের চৈতন্য। রাম বৃক্ষ দেখিতেছেন, এস্থলে রামের অহংগত পরিবর্ত্তন বুঝাইতেছে। কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে রাম কি দেখিতেন? রাম 'নাহং'শূন্য জগতে কি অনুভব করিতেন। সার্ উইলিয়ম হ্যামিল্টন বলেন 'নাহং' না থাকিলে 'অহং' জ্ঞান থাকে না; যেহেতু জ্ঞান আপেক্ষিক সম্বন্ধ জ্ঞাপক ব্যাপার। সুতরাং এ দুইটি থাকাই আবশ্যক। শুদ্ধ 'অহং'-এর কোন জ্ঞানই নাই। এস্থলে স্বীকার করি যে, দুইটি সংঘটন ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই, সত্য। জ্ঞান দ্বিরাত্মক। কিন্তু তাহাতে 'অহং' ও 'নাহং'-এর অপরিহার্য্য সমবায়ত্ব বুঝায় না। শুদ্ধ অহংগত দুইটি ঘটনা হইলেও জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে। মনে কর নাহং নাই। আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা রূপ দুইটি অনুভূতি থাকিলেও জ্ঞান অনিবার্য্য। এই দুইটি ঘটনায় আমার দ্বিবিধ পরিবর্ত্তন বুঝাইতেছে; সুতরাং জ্ঞান আপেক্ষিক ব্যাপার হইলেও সঙ্গত হইতেছে। Knowledge is a relation, and every relation supposes two terms. Thus in the relation in question, there is, on the one hand, a subject of knowledge,—that is the knowing mind,—and on the other, there is an object of knowledge,—that is, the thing known and the knowledge itself is the relation between these two terms." হ্যামিল্টনের

একথা প্রশস্ত বটে, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী মীমাংসা বিশেষ দূষ্য। We are concious of self only in and by its contradistinction from not-self; and are conscious of not-self only in and by its contradistinction from self.

অহং জ্ঞান নাহং জনিত বলায় ভাষার, ভাবের এবং সত্যের ব্যত্যয় হইয়াছে। পরে এ কথার আলোচনা করা যাইবে। ফলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে সমষ্টি ভাবে চিন্তা করিলে বরং এ সিদ্ধান্তটি কতকটা রক্ষা করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তটী একবারেই অন্ধকার। তাহার কোন কিছুই নিরাকরণ করা যায় না। "আমরা কিছুই স্বতঃ জানি না এবং জানিতে পারি না; আমরা শুদ্ধ অস্তিত্বের কোন ভাব বা অবস্থা-বিশেষ মাত্র জানি এবং সে জ্ঞানও আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় (Faculties) অর্জন সুলভ বা সমগুণবিশিষ্ট ভাব। We know, and can know, nothing absolutely and in itself: all that we know is existence in certain special forms or modes, and these like-wise, only in so far as they may be analogous to our faculties.

কেহ কেহ বলেন 'অহং' ও 'নাহং' এ প্রভেদ এই যে একটিতে ব্যাপ্তি (Extension) আছে, অপরটিতে ব্যাপ্তি নাই। কিন্তু যখন 'নাহং' জ্ঞান অহংভূত তখন এ প্রকার পার্থক্য করা সুন্দর নহে। ফলে অহং-এর ব্যাপ্তি নাই বলা সুসঙ্গত নহে। অহং ও নাহং এর মত বিভাজ্য। আচার্য্য বেন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ অহং-এর পূর্ব্বমত সংজ্ঞা করেন তাঁহারা বলেন অহং-এর ব্যাপ্তি নাই, ভাগ নাই, অংশ নাই, ইহা পূর্ণ ও সনাতন সৎ—ইহার ব্যাপ্তি নাই অথচ ব্যাপকতা আছে। ইহাতে সকলই সংকুলান হয়। ব্যাপ্তি অর্থে নির্দ্দিষ্ট অধিকার স্থান বুঝিতে হইবে। ব্যাপ্তি ও বিভাজ্যতা জড়পদার্থের নিশ্চয়াত্মিক গুণ। তাঁহারা অহং-এর এই প্রকার নাকার সংজ্ঞা করিয়াছেন। এই নাস্তিকবাদ বিশেষ বিষদ নহে। দেখা যাক্, এ প্রকার যুক্তি কতদূর সঙ্গত! প্রথমতঃ সময় ও দেশ মানসিক ভাব (ideas) সুতরাং নাহং-এ ব্যাপ্তি দিয়া অহং-এ ইহা অস্বীকার করা সুযুক্তি নহে। সময় ও দেশের অস্তিত্ব নাই বলিয়া তদুভয়কে মনের ধারণায় পর্য্যবশিত করিয়া এ প্রকার মীমাংসা করা বিশুদ্ধ নহে। ইহার সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে? যখন অহংই সকল ব্যাপ্তি চিন্তার আকার (form) তখন তাহাতেই দেশ (space) অন্তর্নিহিত—তাহাতেই তাহার অস্তিত্ব ও ধারণা। সুতরাং এ কথার পর অহং-এর ব্যাপ্তি নাই বলা ভাল দেখায় না। যাহার ব্যাপ্তি নাই তাহা কি প্রকারে অন্তর্নিহিত আত্মগঠনে ব্যাপ্তি চিন্তা করিবে? এ কথার যুক্তি আছে। অহং-এর ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই ইহা ব্যাপ্তি চিন্তা করে ও করিতে পারে বলাই বরং যুক্তিযুক্ত কথা। প্রত্যেক চেতনাবস্থায়, চিন্তায়, ভাবে, ভঙ্গিতে, বোধে, ধারণায়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে, ব্যাপ্তি দেখিতে পাই। শিশুর সেই ব্যাপ্তি সুস্পষ্ট নাই। তাহার দূর ও নিকট জ্ঞান প্রায় সমান, তাই চাঁদ ধরিতে চায়। ক্ষিপ্তেরও অনেকটা সেই ভাব।

রোগ বিশেষেও সেই ব্যাপ্তির ধারণা শিথিল হইয়া অবসাদে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

ডাক্তার হেন্‌রি মডস্‌লী বলেন, "But it is certain that every sensation takes place through an extended part of the body, and though not itself material, is quantitative and qualitative; that it must have that foundation in extension and be felt somewhere in definite, even measurable degree, and of definite quality." যাঁহারা মনের ব্যাপ্তি নাই বলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মূলে বিশুদ্ধ চৈতন্য আছে কি না? বস্তুতঃ একথা অস্বীকার করা ন্যায়ানুগত লোকের কর্ম্ম নহে।

অহং-এর ব্যাপ্তি নাই অথচ ব্যাপ্তি চিন্তা করিতে পারে—আভ্যন্তরিক গঠনে ব্যাপ্তি চিন্তা করিয়া থাকে, এ কথা কি প্রকারে বলা যায়? তবে কি অহং-এর ব্যাপ্তি আছে বলিব? প্রত্যেক চেতন অবস্থায় বা কার্য্যে ইহা ব্যাপ্তি চিন্তা করে এবং করিতে পারে; প্রত্যেক চিন্তায়, বোধে, ধারণায়, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে, ব্যাপ্তি আছে; রোগ বিশেষে লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে কি চৈতন্য নাই? কিন্তু প্রত্যক্ষ শারীরিক ব্যাপ্ত অংশ দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে; এবং প্রত্যক্ষ জড়াত্মিক না হইলেও গুণবাচক ও সংখ্যাবাচক। বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের গঠনে ও আকারে ব্যাপ্তি ও সংখ্যার ভিত্তি। তাহার কোথাও না কোথাও এতদুভয়ই অনুভূত হইয়া থাকে। এস্থলে অহং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষেই ব্যাপ্তির গুণ (qualities of extension) প্রাপ্ত হয়। মনে কর, গাত্রে মশক দংশন করিতেছে; যে স্থলে দংশন করিতেছে তাহা আমাদের অনুভূত হয় এবং সেই দংশন-বোধও স্থলবোধ সাপেক্ষ। অতি ক্ষুদ্র রেণুবৎ পদার্থ গাত্রে পড়িলে অনুভূত হয় না, তাহার কারণ অনুভূতির জন্য যতটা ত্বাচ স্নায়ুর ব্যাপ্তির আবশ্যক ইহাতে তত দূর আবরণ করে না। পিপাসায় যে অনুভূতি হয় তাহাও ব্যাপ্তি আছে। জিহ্বা, তালু, প্রভৃতির শুষ্ক ভাব। যাহা ব্যাপ্ত তাহাতে ব্যাপ্তি আছে। দশনের বেদনা হইলে আমরা উদর দেখাই না। বেদনা স্থলভুক্ত; সুতরাং তাহার অনুভূতি এবং বোধও স্থলভুক্ত—ব্যাপ্ত। আমরা আপনাকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে অপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি না—এস্থলে অহং-কে স্থলভুক্ত করি এবং ব্যাপ্ত দেহের দিকে দেখাইয়া দি। যখন দেহাতিরিক্ত চৈতন্য নাই, তখন ব্যাপ্ত সচেতন দেহই অহং পদবাচ্য। "আমি" সচেতন শরীরী পদার্থ। শিশু যখন অঙ্গ চালনা করে এবং আপনার হস্তপদ দংশন করে তখন সে 'অংহ' এর কতদূর ব্যাপ্তি তাহাই শিখিতে থাকে। তৎপূর্ব্বে ব্যাপ্তির সম্পূর্ণ ধারণা তাহার মনে থাকে না। চাঁদ ধরিবার প্রয়াসে বুঝা যায় যে, শিশুর দূরাদূর জ্ঞান নাই। হস্তপদ চালনা দ্বারায় চক্ষু ও স্পর্শেন্দ্রিয় ক্রমে ঐক্য হইয়া শিশুর দূরানুভূত হইতে থাকে। নিদ্রা বা রুগ্নাবস্থায় অহংজ্ঞান না থাকিলেও ত্বাচ-প্রত্যক্ষে উহা অনেক সময় স্থলভুক্ত দেখা যায়। কেহ কেহ উহাকে প্রতিষেক অচেতন ক্রিয়া (Reflex action) বলেন। যেমন শিরচ্ছেদ করিলে অনেকক্ষণ দেহ স্পন্দিত হয়। কিন্তু সে শরীর চালন ক্রিয়া চৈতন্যমূলক

নহে। বলিদানে বিচ্ছিন্ন অজমুণ্ড ভ্যা ভ্যা করিতে দেখা গিয়াছে। দ্বিখণ্ড বৃশ্চিক কিয়ৎক্ষণ দুই ধারে দুই ভাগ চলিয়া যায়। এ সমস্তই প্রতিষেক ক্রিয়া বলিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহা হইলে আমাদের তর্কের হানি হইতেছে না। প্রতিষেক ক্রিয়া চৈতন্যের পূর্ব্বাবস্থা; চৈতন্য পরবর্ত্তী অবস্থা; আত্মজ্ঞান আবার তৎপরবর্ত্তী। লজ্জাবতী লতার সঙ্কোচন এই প্রতিষেক কার্য্যের স্ফূর্ত্তি বা পরিণাম। পরিণতিবাদের ব্যাখ্যা এইরূপ। চেতনায় ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক; ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি আছে; সুতরাং চৈতন্যের ব্যাপ্ত ইন্দ্রিয় আছে। এ কথা বলায় আর চেতনার ব্যাপ্তি আছে বলায় সমান।

অপিচ আত্মজ্ঞানে ব্যাপ্তি স্বতঃ সিদ্ধ। যখনি "অহং" বলিলাম তখনি অমনি নাহং-এর সহিত জগতের বিস্তৃত রাজ্য দ্বিধা করিলাম; আপনার আপনি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলাম। অহং জ্ঞানে দেশ ও সময় সমবায়ী। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই নাহংকে স্থলাভিষিক্ত না করিয়া আপনাকে কি প্রকারে অহং সিদ্ধ করিবে? নাহং তো সাম্বন্ধিক অস্তিত্ব জ্ঞান মাত্র। তবে না হইবে কেন? চৈতন্যের মূলেই অহং-এর ব্যাপ্তি স্বীকার করা হইতেছে। আমি আছি বলিলেই—কোথায় আছি প্রভৃতি সম্বন্ধ আসিতেছে। আমি বোধ করি, বলিলেই কোথায় এবং কি বোধ করি আসিতেছে। আমার অস্তিত্বে ব্যাপ্তি বা দেশ স্বতঃই আসিতেছে। দার্শনিকেরা দেহকে অহং-এর আধার বলেন; কিন্তু দেহকেই সচরাচর লোকে আমি বলিয়া থাকে এবং তাহাই বিজ্ঞানকল্পে সত্য। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাহং হইতে অহং-এর উৎপত্তি না অহং হইতে নাহং-এর? তাহা আমরা জানি না। তবে অহং না থাকিলে নাহং জ্ঞান আসে কিরূপে? অগ্রে বোধ, পরে নাহং জ্ঞান। নাহং অহং-এর অভাব জ্ঞান মাত্র। অগ্রে অহং-এর অস্তিত্ব জ্ঞান পরে অভাব জ্ঞান হইবে। যে পদার্থের জ্ঞান নাই—তাহার অভাব জ্ঞান কি প্রকারে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? যাহার সূর্য্য জ্ঞান নাই—তাহার সূর্য্যের অভাব জ্ঞান কোথায়? যে জল দেখে নাই, তাহার জলের অভাব জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। সুতরাং অগ্রে অহং জ্ঞান পরে নাহংই নেয্য কথা। যাহা বলা হইল, তাহা নাহং অহং-এর জ্ঞান সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। প্রত্যুত প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান অনুসারে গর্ভস্থ ভ্রূণের অহং জ্ঞান নাই। ইহা ক্রমে ফুটিয়া উঠে, আবার ক্রমে লোপ হইয়া যায়। সুতরাং নাহং মূল অহং বৃক্ষ—পরিণতির স্ফূর্ত্তি। লৌহ যথা চুম্বকের স্পর্শে চুম্বকের গুণ পায়। নাহং সেইরূপ গুণাধিক্য হইয়া অহং-এ পরিণত হয়, এবং সে গুণও স্থায়ী নহে; তাহা কিছুদিনের জন্য থাকিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যায়। আবার দার্শনিকদিগের কথা ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে প্রকৃতপক্ষে নাহং অহং জ্ঞানের ভূমি; একটী অপরটীর উপর আরোপ মাত্র। সে যাহা হউক, শিশু হস্তপদ দংশন করিতে করিতে দ্বিরাত্মক জ্ঞানে অহং প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভূমে বা মাতৃস্তনে হস্ত পড়িলে তাহার যে প্রকার অনুভূতি হয় আপন গাত্রে হস্ত পড়িলে সেরূপ হয় না। আপন গাত্রে দ্বিবিধ অনুভূতি সমন্বিত হইয়া থাকে; সেই দ্বিরাত্মক জ্ঞানই ন্যূনকল্পে অহং বাচ্য। হস্ত পদ অনুভব

করিতেছে এবং পদ হস্ত অনুভব করিতেছে এবং তাহার দুইটীর পার্থক্য সত্ত্বেও একত্ব আছে; এই একত্বই ন্যূনকল্পে অহংজ্ঞান। বস্তুতঃ অহং বহুতর অনুভূতির, ভাবের, প্রতিষেক কার্য্যের বিষম-জটিল সমষ্টি, যেন রসায়নিক প্রণালীতে সংমীলিত; নানাবিধ যন্ত্রের ঐক্যতান সুরের ন্যায় একাত্মিক।

কেহ কেহ বলিবেন অহং ও নাহংকে পার্থক্য করায় অহং-এর ব্যাপ্তি আসিতেছে কই? অহং বলায় নাহং এর ব্যাপ্তি আসে আসুক, অহংএর আইসে না। বরং এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। নাহং ও অহং-এর এইরূপ সীমাবদ্ধ বা সংজ্ঞা করাই সঙ্গত। নাহং ব্যাপ্ত, অহং অব্যাপ্ত। নাহং বলিলে এই অনুভূত ব্যাপ্ত জগৎ অনুভবকারী অব্যাপ্ত জগৎ হইতে পৃথক বুঝাইতেছে। বস্তুতঃ ইহা ভুল। নাহং জ্ঞান সংশ্লেষ করিলে আমরা এই পাই যে আমার চৈতন্যে বিসদৃশ পদার্থ স্থান, মান ও সংখ্যা পাইতেছে; অর্থাৎ, ইহা বা এখানে এমন কিছু আছে যাহা আমি নহি। অনুভূতি ও অনুভূত পার্থক্য হইয়াও একত্র এক সময় বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতেই স্থানান্তরে যাহা আছে এবং সেই নাহং অনুভব করিতেছি যে আমি এতদুভয় পৃথক অস্তিত্ব—স্থানে, মানে, গুণে, ভাবে পৃথক। আত্মজ্ঞান অর্থাৎ অহং দেশকালপাত্র সাপেক্ষ। সুতরাং ইহার ব্যাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ। অহং বলিবা মাত্রই নাহং না আসিতে পারে; কিন্তু নাহং বলিলে অহং অপরিহার্য্য। নাহং অহং সম্বন্ধে জ্ঞান-সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলেও পার্থক্যের মূল। চৈতন্যের মূল সত্যেই অহং-এর ব্যাপ্তি অপরিহার্য্য।

অহং অবিভাজ্য বলায়ও দোষ আছে। যখন দুয়ের অধিক বিষয় এক সঙ্গে এক সময়ে মনোযোগ করা যায় তখন এপ্রকার সিদ্ধান্ত কি প্রকারে প্রমাণ্য? আমি যখন এক সময়ে এক ভাবে দশকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারি তখন আমার মন দশ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে না বলি কেন? যখন ক্ষুৎ পিপাসায় প্রধানতঃ ভিন্ন ভিন্ন শরীরের অংশে যন্ত্রণা হয়, ভয়ে, শোকে দেহের স্থল-বিশেষ কাতর হয়, বেদনায় আংশিক দেহ অধীর হইয়া পড়ে; তখন অহং-এর ব্যাপ্তি নাই বলি কিসে? সেইরূপ দুই খণ্ড কীটপতঙ্গ বিশেষে চৈতন্য দ্বিধা হইয়া যায় বলিতে হইবে। নিম্ন জীবদেহ দ্বিধা করিলে দ্বিখণ্ডই চৈতন্য পায়। রোগবিশেষে কখন কখন অহং-এর অংশ ও স্থল দেখিতে পাই। আমরা জানি কোন লোক বিকারাবস্থায় আপনার দ্বৈত ভাব অনুভব করিতেন। তিনি "এই আমি" বলিয়া আপনাকে দেখাইতেন ও ঐ "আমি" বলিয়া বিরলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেন। চিকিৎসকেরা বলিতেন যে তাঁহার মস্তিষ্কের দুইটী ভাগ (lobes) আক্রান্ত হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থায়ও আপনার অনেক আংশিক প্রকাশ দেখা যায়।

অধিকন্তু যখন অহংকে নাহং ভাবে চিন্তা করা যায়, তখন অহং ও নাহংকে এ প্রকার ব্যাপ্তি ও অবিভাজ্য গুণের দ্বারায় সংজ্ঞা করা সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ নহে। আমি যখন আমার মনের সংশ্লেষ বিশ্লেষ করিয়া তাহার বিভিন্ন ভাবের আলোচনা করি, তখন তাহাকে

নাহং পদবীতে না স্থাপন করিলে সঙ্গত হয় না। দার্শনিকগণ এইরূপ আলোচনাতেই মনোবিজ্ঞানের মূল স্থাপন করিয়াছেন। মহাত্মা কৌন্ত তাহারই প্রাচুর্য্য দেখিয়া দর্শনশাস্ত্রের অর্থাৎ আন্বিক্ষীর নিতান্ত বিদ্বেষী। তিনি বলেন, আমার মনের ভাব আমি অবিমিশ্রভাবে দেখিতে পাই না; কারণ তখন অর্থাৎ চিন্তাকালীন যে সকল বৃত্তির উত্তেজনা হয় তাহা হইতে চিন্তিত ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে; সুতরাং সত্য উপলব্ধির ব্যাঘাৎ জন্মে। তাঁহার মতে অপরের চৈতন্য বা মনের আলোচনা করাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী বিশুদ্ধ, নির্দ্দোষ ও প্রশস্ত। ইহাতে কোন বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, ঠিক সেই বিষয়ই অবিমিশ্র ভাবে পাওয়া যায়। এ কথার গুণও আছে দোষও আছে। তাঁহার বিশদ দৃষ্টিতে দোষ পড়ে নাই। তিনি দার্শনিকদিকের প্রাগল্‌ভে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বিজ্ঞানের পক্ষপাতিতা প্রযুক্ত মনের বেগে প্রজ্ঞার সম্পূর্ণ অনুগমন করিতে পারেন নাই। জগতে অভ্রান্ত কেহই নাই এবং কোন মতই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে এবং হইতেও পারে না। কৌন্ত জাগতিক ব্যাপার যে প্রকার সুন্দর দেখিয়াছেন এবং গবেষণার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়াও এস্থলে বিজ্ঞান অনুরাগে প্রতিভার নিশ্চলতা রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু কৌন্ত নিতান্ত ভ্রান্ত নহেন; তবে এস্থলে পূর্ণ সত্য দেখিতে পান নাই বলাই ন্যায্য। তাঁহার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় টীপ্পনীতে অর্দ্ধ সত্য আছে। মনোবিজ্ঞান তাহার সময় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেহই লেখেন নাই। যাঁহারা দর্শনে বিজ্ঞানপ্রণালীর আদর দেখাইয়াছেন, তাঁহারা সকলই প্রায় তাঁহার পরবর্ত্তী লোক। সুতরাং তাঁহার ও কথার বিশেষ ফলও হইয়াছে। তিনি বলেন, দর্শনপ্রণালী মনোবিজ্ঞানের পক্ষে অযোগ্য। তাই তিনি দর্শনের অনাদর করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান তাঁহার বিজ্ঞান তালিকায় স্থান পায় নাই। জীবনবিজ্ঞানের নিম্নে ও দেহতত্ত্বের শাখাস্বরূপে বুদ্ধিবৃত্তিরও নীতিবৃত্তির আন্দোলন হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। তাঁহার মতে মনুষ্য-মনের জ্ঞান নিজ মনের আলোচনায় না হইয়া অন্যের আলোচনায় হইবে। কিন্তু অন্যের মানসিক কার্য্য কি করিয়া বুঝিব? ভাব, ভঙ্গি, চাল, চলন, প্রভৃতি বাহ্যিক দৃশ্যতে পরের অন্তর কি করিয়া বুঝিব? বুঝিবার উপায়ই আপনার মন। পরের মন দৃষ্ট পদার্থ নহে; তাহা আনুমানিক। আপনার মন ও তাহার চিহ্নের অনুমানই পরের মনের সিদ্ধান্ত। রাম কাঁদিতেছে, গোপাল হাসিতেছে, কেদার ভাবিতেছে, ইত্যাদি দেখিয়া কি করিয়া তাহাদের মনোভাব জানিব?

আমরা নিজে যে কার্য্য যে যে মনের অবস্থায় করিয়া থাকি অন্যের কার্য্য দেখিয়া সেই সেই মনোভাব অনুমান করি মাত্র। এতদ্ব্যতীত পরের মনের বিষয় জানিবার আমাদের উপায়ান্তর নাই। তাই আমরা পরকে আপন দিয়া ব্যাখ্যা করি। পরের ব্যাখ্যা আমাতেই আছে। তাহার বাহ্যিক চিহ্ন দেখিয়া অনুমানে আপনাকে ঐ চিহ্নের অন্তস্থলে বসাইয়া দি। তাই জগতে এত প্রবঞ্চনা। প্রায় ঠিক সত্য পাওয়া যায় না। রাম

অভিনয় করিয়া কাঁদিলেন; আমি তাঁহার দুঃখ অনুমান করিলাম, সহানুভূতি হইল; তিনি সেই সুবিধায় আমায় বঞ্চনা করিলেন। কৃষ্ণ ধার্ম্মিক জানি, অর্থাৎ তাঁহার বাহ্যিক পূজা আছে, হয়তো তাঁহার ঐ একটি ভয়ানক কাপট্য। নীলমাধব দয়ালু, কেননা তিনি বড়ই বদান্য; ফলে তিনি হয়তো এক জন মহা ব্যবসায়ী, ধরার হাটে নামের ব্যবসা করিতেছেন। প্রত্যক্ষে ভুল নাই—আমাদের অনুমানেই ভুল। আবার আপনার মন দিয়া যাহা কিছু বুঝিতে পারি, শুদ্ধ পর-মনের বাহ্যিক লক্ষণ চিন্তায় তাহার কিছুই হইবে না। তবে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুকরণ করা তাঁহার অভিপ্রায় তাহাতে উভয় পথ অবলম্বন করাই বিধেয়। আপনার মন দ্বারায় পরের মন অনুমান করিয়া আবার তাহা পর-মনের বাহ্যিক চিহ্নের সহিত মিলাইয়া লওয়া (verification) উচিত। রামের কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে রাগী স্থির করিলাম। আবার তাঁহাকে রাগী ধরিয়া লইয়া কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া পূর্ব্বসিদ্ধান্ত সপ্রমাণে প্রয়াস পাইলাম; ইহাতে সত্যনির্ণয়ের সম্ভাবনা অধিক।

কৌন্তের মতে আমরা বরং আপনাদের মনোভাব (feelings) আপনার মন আলোচনায় অতি সামান্যই বুঝিতে পারি। কিন্তু সে প্রণালীতে বুদ্ধির কিছুই বুঝিতে পারি না। বুদ্ধিতে আমরা সকলের আলোচনা করিতে পারি; নিজের বুদ্ধির আলোচনা করিতে পারি না। ধর আমরা আপনাকে মনে চিন্তা করি, বস্তুতঃ তাহা চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু তর্ক করিতেছি যে "আমি" তাহা আমার তর্কে আইসে না, আর যদিও বহু আয়াসে যৎকিঞ্চিৎ পারা যায় তাহাও সেই প্রতিষেক কার্য্যে (Reflex action) মনোযোগ দিলে উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে, কেননা, সেই চিন্তিত কার্য্যকলাপ তখনি স্থগিত থাকিবে। একথার উত্তরে প্রথমতঃ এই বলা যায় যে তাহাতে যতটুকু হয় তাহাই ভাল, তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। এস্থলে কি করিব? মিশ্রভাবেও কতকটা যাহা পাওয়া যায় পরের বেলায় শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহা পাই কই? আপনাতে যাহা পাই তাহা পরের দেখিয়া শুধরাইয়া লইব। নতুবা আর উপায় কি? আর আমাদের কোন্ কার্য্যইবা অমিশ্র ভাবে হইয়া থাকে। যখন সামান্য প্রত্যক্ষে অনুমান আছে এবং তাহা ছাড়া প্রত্যক্ষ নাই, এমন কি, দৃষ্টিতে দশ ভাগের এক ভাগ দৃষ্টি, তখন আর অন্য কথায় কাজ কি? পরের বিষয় আলোচনায় যে মনোবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তবে মনোবিজ্ঞানের মূলে নিজের মন দ্বারায় অনুমান অপরিহার্য্য। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে মন কি এক সময়ে দুই চারিটী বিষয় অভ্যাস করিলে আলোচনা করিতে পারে না? কন্‌ডিলাক, হামিল্টন, স্পেন্সর, প্রভৃতি একথা স্বীকার করেন। সার্ উইলিয়ম্ হামিল্টন, বলেন যে, আমরা চারিটী বিষয়ে একবার মনোনিবেশ করিতে পারি। ফলে, সকলকার মন সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন লোক ন্যূনাধিক্য করিতে পারেন। সুতরাং এ প্রকার সংখ্যা করা কঠিন। যাহা হউক একের অধিক যে পারা যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অবশ্য এক

বিষয়ে মন যতটা প্রবল হয় তদধিক হইলে মনের ততদূর বল বা সঙ্গতি থাকে না। দার্শনিকদিগের এই একটী কঠিন সমস্যা। কিন্তু তাহা বলিয়া চিন্তা অসম্ভব বলা যায় না। আবার বলি চিন্তাকালীন আপনার চিন্তাকে আলোচনা করিতে না পারিলেও স্মৃতি দ্বারা তাহা হইতে পারে। আমাদের স্মরণশক্তি দ্বারা এ প্রকার অনেক মীমাংসা হইয়া থাকে। কোন বিষয়ে যেমন চিন্তা করিলাম, স্মৃতির দ্বারায় সেই চিন্তার সোপন উদ্ধার করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। আর পরক্ষণেও তাহার বিশেষ কোন সোপান হারাইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের বুদ্ধিপ্রবাহের জ্ঞান অনেকটাই এইরূপে পাই। আমরা স্মৃতি দ্বারায় চিন্তা করি যে পূর্ব্বক্ষণে অমুক বিষয়ে আমাদের মনে কিরূপ কার্য্য হইতেছিল। তখন কার্য্য হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার ছাব এখনও মনে আছে। এই উপায় ভিন্ন আর আমরা কিরূপে মনের কথা জানিতে পারি? রাম এক সময়ে এত ব্যগ্র হইয়া কার্য্য করিয়াছেন যে সে প্রায় অচৈতন্য ভাবেই বলিতে হইবে। পরক্ষণে তিনি প্রায় সবই স্মৃতি-দ্বারায় পরপর আলোচনা করিয়া বলিতে পারেন। আমরা কি আমাদের নিজ বুদ্ধির কার্য্য জানি না। স্বপ্নাবস্থার আলোচনা কিরূপে হয়? স্মৃতিই তাহার একমাত্র উপায়। আমরা কার্য্য সকল কি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় করিয়া থাকি? সকলই কি বিকারের প্রলাপ স্বরূপ,—আমরা জানি না বা জানিতে পারি না? কার্য্যকালে ও তাহার পরক্ষণে আমাদের স্বতঃই কার্য্যজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য। ফল দেখিয়া কিছু আমরা আপন কার্য্য চিন্তা করি না। তাহা স্বতঃসিদ্ধ; পরতঃ নহে। তবে কি উপায়ে তাহা জানিব? কোন্ত বলেন নীতি ও ধী-বৃত্তির জ্ঞানের জন্য Phrenology আবশ্যক, তদ্ভিন্ন স্বতঃ স্পষ্টতঃ হয় না। একথা নিতান্ত অযুক্ত।

এক্ষণে দেখা গেল নাহং ব্যাপ্ত ও বিভাজ্য এবং অহং অব্যাপ্ত ও অবিভাজ্য বলিয়া সংজ্ঞা করা প্রশস্ত নহে। তবে নাহং ও অহং-এ যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সেই সম্বন্ধও সমবায় নহে। নাহং জ্ঞান ব্যতীত অহং-এর ব্যক্ত থাকিতে পারে,—পূর্ণতা নহে। তবে কি নাহং অহং মূলে এক? চৈতন্য কি নাহং-এর উচ্চতর ধর্ম্ম? যাহাকে নাহং বলে, তাহার কি কোন বিশেষ গুণের অভাব? আকৃতির পার্থক্যে অহং না প্রকৃতির? এই নাহং-এ যে সকল গুণ দেখিতে পাই তাহারই কোন বিশেষ সংযোগ কি নাহং? আমরা এ কথার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে নাহং অহং-এর উচ্চতর গুণ কি স্ফূর্ত্তি বলিতে পারি না, এবং কেহ কখনও বলিতে পারিবেনও না। তাহা চিরকাল আমাদের বুদ্ধির অগম্য থাকিবে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে জীবদেহের সম্মিলনী কার্য্য সত্তার নাম অহং। তাহা অশরীর নহে এবং জড়পিণ্ডেও নাই। শরীরজ পদার্থও সচেতন নহে। চৈতন্য অবস্থা, অবস্থা ও কার্য্য-কারিতার ফল। শরীর জড়-মূলক এবং অহং জ্ঞানও সেই শরীর জনিত।

কেহ বলিবেন, কৈ জগতের সমস্ত জড় একত্র করিলে বা তাহার সার সংগ্রহ

করিলে অহং পাই না কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যায়, কৈ জগতের সমস্ত লৌহ একত্র করিলে সুবর্ণ হয় কৈ? লৌহের সারাংশ লইলে এক বিন্দুও তো সোণা হয় না? জগতের সমস্ত গরু সংগ্রহ করিলে মানুষ পাই কই? রামকেও শ্যাম করিতে পারি না। সুতরাং এরূপ তর্কে ইহার মীমাংসা হয় না। পার্থক্য জগতের মৌলিক নিয়ম, এবং সেই পার্থক্য মধ্যে সাধারণ্যপাত করিয়া কোন সাধারণ ধর্ম্ম নিষ্কাষণ করা মনুষ্য মনের ধর্ম্ম। পরিণতিবাদে জগতের যে প্রকার একত্বে বহুত্ব ব্যাপারের ব্যাখ্যা আছে—তাহাতে অবস্থা সম্বন্ধে (অর্থাৎ দেশকালপাত্র প্রভৃতি) যে আবশ্যকতা আছে তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। যে মনেরা (কীট বিশেষ) হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি, সে মনেরাও এক্ষণে অবস্থান্তরিত, পৃথিবী, গ্রহ, তারা, সূর্য্য অবস্থান্তরিত, বায়ু, জল অবস্থান্তরিত, অপর তৎসঙ্গে যতকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহারও প্রত্যাবর্ত্তন চাই। মনুষ্যের তাহা কল্পনায় দেখা বই আর অন্য উপায় কোথায়? কিন্তু সেই পরিণতিবাদে আবার যখন জড় হইতে লতা গুল্মাদি, পরে কীট-পতঙ্গাদি, তৎপরে পর পর মনুষ্যের উৎপত্তির কথা আছে, তাঁহারাও এক্ষণে জীবাণুর সীমান্তরিন গ্রহতারা হইতে আগত পদার্থ মনে করেন।

"Although subject and object (Mind and Matter) are the most widely opposed facts of our experience, yet there is, in nature, a concomittance or connection between Mind and a definite Material organsim for every individual."—ALLEXANDER BAIN.

ফলে সে সম্বন্ধটী কিরূপ তাহা নানা লোকে নানা মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অধিকাংশই ভ্রান্তিমূলক। কিন্তু সে প্রকার মীমাংসাও সময় অনুসারে অবশ্যম্ভাবী। যেমন বস্তুর অতীন্দ্রসত্ত্বা (Noumenon) কেহ কল্পনা করেন যেন বস্তুর মধ্যে কোথায় অপ্রত্যক্ষভাবে লুকাইয়া বসিয়া আছে, কেহ দেখে নাই, দেখিতে পাইবে না, জানে না, জানিতে পারিবে না, তথাচ তাহার অস্তিত্ব আছে এবং কোন কারণ না থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে; মনও তাঁহাদের মতে দেহ মধ্যে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট ভাবে অতি সংগোপনে আপনার অসীম ইন্দ্রজাল বিস্তার করতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। ইহা বহু দার্শনিকের মত ও বিশ্বাস। মনুষ্য-দেহ কাষ্ঠ পুত্তলী মাত্র, অলক্ষিত ভাবে আত্মা তাহাকে যেরূপ নাচাইতেছে সে সেইরূপই নাচিতেছে। মন তন্তুবায়—দেহ যন্ত্র—সে যেমন চালাইতেছে, উহা তেমনি চলিতেছে। ইহা ঘড়ীর স্প্রীং নহে—দেহ-যন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে এ প্রকার চিন্তা বা ধারণা বিজ্ঞানের প্রাক্‌কালীন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চিন্তার প্রধান সোপান—দর্শনের মূল ভিত্তি। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক নহে। বিজ্ঞানবিশারদ হার্বার্ট স্পেন্সরও এ চিন্তা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনিও সেই আত্মাকে কি-যেন-কি এ-নয়-ও-নয়-তা-নয় প্রকার অস্তিত্ব, বা সত্ত্বা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি মহা শাক্ত। এই অনন্ত জগতের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য অনন্ত সনাতন

শক্তির সাম্যময় জগদাত্মা, প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, স্বরূপ অথচ নিরাকার, সাধারণ অথচ বিশেষ, স্ফূরীত অথচ নির্ব্বিশেষ, অনন্ত কাল, অনন্ত মায়ায়, আপনা সম্প্রসারণ, ও বিকীর্ণ করিয়া গুটাইতেছেন ও সংযত করিতেছেন, কোথায় পাতালপুরে বা গগনমণ্ডলের এক উপান্তে বসিয়া আপনার অনন্ত মূর্ত্তির পার্থক্যতা করিতেছেন। জড় ব্যতীত শক্তি, দেহ ব্যতীত আত্মা তাঁহার প্রতিভা জ্যোতিতে বিকসিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি আধ্যাত্মিক রসে বঞ্চিত নহেন। এক্ষণে মন ও দেহের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা জানিবার জন্য লোকে লালায়িত। "It has always been a matter of difficulty to express the nature of this concomittance, and hence a certain mystery has attached to the union of mind and body. The difficulty is owing to the fact that we are apt to insist on somekind of local or space relationship between the extended and the unextended. When we think of connexion, it is almost always of connexion in space ; as in supposing one thing placed in the interior of another. This last figure is often applied to the present case. Mind is said to be internal to, or within, the body. Descartes located mind in the pineal gland ; the school-men debated whether the mind is all in the whole body, or all in every part. Such expressions are unsuitable to the case. The connection is one of dependence, but not properly of local union."—ALLEXDER BAIN.

"রাজা ও রাণী।"

বিক্রমদেব।

ধরাতলে মূর্ত্তিমান প্রণয় আপনি,
আপনা হারান ভোলা, এসেছ কি ভুলে ?
বিবশ বিভুল চোকে কি যে ও চাহনি,
চঞ্চল তরঙ্গ খেলে হৃদি উপকূলে।
হৃদয়ের দেবি সে'ত দিলেনাক ধরা,
কেন তুমি ফির পিছে প্রেম-ফাঁশি নিয়ে ?
এইত প্রেমের রীতি শুধু আত্মহারা !
পূজিবে চরণ তার নিজ হিয়া দিয়ে।
যোগাসনে যোগাধ্যানে লীন যোগীবর,
তার কাছে কোথা আছে সংসার বাসনা।
প্রেম যোগী, তবে কেন হৃদয়ের পর
দারুণ প্রলয় এত,—এ তীব্র বেদনা ?
দাড়াও সমাধি পরে প্রেম সিন্ধু কূলে,
ভোলা, তুমি পূজা কর আপনারে ভুলে !

সুমিত্রা।

গরবিণি, ছেড়ে এলে কিসের গরবে ?
জ্বালালে অনল শুধু, শান্তি-রঙ্গ-ভূমে।
এ মধু রহস্যমাখা সুবিশাল ভবে,
সকলি আচ্ছন্ন যে গো মায়াময় ধূমে।
ক্ষুদ্র নারী এত বীর্য্য কেন হৃদে তার ?
ঝরে যাবে ক্ষুদ্র এক ঝটিকা পরশে।
তোমাদের ও হৃদয় ভাল বাসিবার
ভাল বেসে নিরালায় পড়িবে গো খসে।
ত্যেয়াগি সুখের ঘর প্রেম শান্তিময়,
এলে কিনা মরুভূমে শান্তি অন্বেষণে !
প্রখর রবির তাপে সব জ্বলে যায়,
সেথায় বরষা-বারি পাবে কোন খানে ?
রমণীর ক্ষুদ্র প্রাণ ভাল বাসিবার,
এত বীর্য্য সবে বল কোনখানে তার !

কুমার।

পুরুষের মত হৃদি—কঠিনে মধুরে,
প্রেম আছে ক্ষমা আছে বীর্য্য আছে তায়।
আকুল আগ্রহ নাই যৌবনের তীরে,
প্রশান্ত জলধি সম সবি স্থির প্রায়।
কত তৃণ কুঠা ভাসে উপরে তাহার,
ডুবে যায় সেই ক্ষণে গভীর অতলে।
নিরমল শান্তিময় স্থির পারাবার,
কি পবিত্র মূর্ত্তি খানি ভরা কূলে কূলে।
পড়েনি কলঙ্ক রেখা ও হৃদয় আগে,
তবু কেন এত লাজ সন্দেহের ঘোর,
যদি সে তেমনি ধারা ভুলে অনুরাগে
পরাণে না সঁপে আসি প্রেমময় ডোর ?
এ সংসার লীলাময় শুধু কিগো ছলা ?
সে যে মূর্ত্তিমতী দেবী, তোমারি সে ইলা !

ইলা।

বসন্তের নব চারু লজ্জাবতী লতা,
আপনি নুইয়া পড় আপনার ভারে !
ললিত তনুতে বাজে পরশের ব্যথা,
আঁখির দিঠিতে হায় পড়িতেছ ঝরে।
তরুরে জড়ায়ে সদা থাক অনুরাগে,
আশ্রয় ভাঙ্গিয়া গেলে ঝরিবে আপনি।
বাজিছে প্রাণের বীণা কি বাসন্তী রাগে
শ্যামল কাননে বুঝি বন বিহগিনী।
বহিছে বৈশাখী ঝড় আঁধার সকলি,
কি দাপটে সমীরণ উজলে চপলা।
তরুরে সে নিলে ছিঁড়ে হৃদয়টি দলি,
ধূলায় লুটায় মরি একাকিনী বালা !
ঝরিছে মুষল-ধারে বুঝি বারিধারা,
আঁধারে হারায়ে গেছে নয়নের তারা।

দেবদত্ত।

এ সংসারে বিষ শুধু রমণী-অধরে,
রাজা, শাস্ত্র বশ করা সোজা নয় কভু।
বন্ধুত্বের শান্তি-ছায়ে কি অমৃত ঝরে,
অভাগা মানব তাহা বোঝেনাত তবু।
তা না হলে কভু কিগো অন্ধ কারাগারে
পোহাত তোমার সুখ বরষা-যামিনী ?
ভস্মাবৃত হীরাখণ্ডে বারেক না ফিরে
দেখিল বায়স, কোথা উড়িল না জানি।
তোমার হৃদয় চির বসন্ত কানন,
কোয়েলা, দোয়েলা, শ্যামা, দিতেছে ঝঙ্কার।
বিরহ তোমার ভয়ে লুকায় আনন,
মিলন-হরষে তান ধরে আপনার।
যথার্থ যা বিধি-দণ্ড মধুর বন্ধুত্ব,
গোপন পরাণে তব আছে, দেবদত্ত !

শঙ্কর।

'সে শুভ্র পলিত কেশ জানায় তাহার
অতীতের সুখময় কাহিনী সকলি।
বুঝায় ভবিষ্য ছবি, শান্ত পারাবার,
তীরে আছে দাঁড়াইয়া যাবে ধীরে চলি।
আজন্ম সে প্রভুভক্ত বৃদ্ধ হল হায়!
এ দুর্দ্দশা তবু চোকে হেরিতে চাহে না।
নিজ সিংহাসন পরে শত্রু হেসে চায়,
সেখানে নোয়াবে শির? হা ধিক বাসনা!
'তার চেয়ে মৃত্যু ভাল', পাষান-কঠিন
হৃদয়-বিদার কণ্ঠে কহিল কাতরে।
সে আকুল স্বর হল শূন্যেতে বিলীন,
অশ্রু-সিক্ত মুখে কেহ চাহিলে না ফিরে।
চাহিলেন ফিরে শুধু নিখিল দেবতা,
রাখিলেন মান তার বুঝিলেন ব্যথা!

রেবতী।

কি ঈর্ষা মূরতি জ্বলে রমণী নয়ানে,
কি যে রাজ্য সিংহাসন পেতেছে হৃদয়ে।
বিমাতা-রাক্ষসী যেন আপন সন্তানে
মারিয়া শোণিত পিয়ে তিয়াষা মিঠায়ে।
নির্ব্বোধ রাজার কাণে মন্ত্রবাণী হায়
পুন পুন গোপনে সে কতই সোহাগে।
রূপসীর জ্যোতির্ম্ময় রূপের শিখায়
মন্ত্র-বশীভূত সবি চলি অনুরাগে।
তীব্র কটাক্ষের সেই সুতীক্ষ্ণ চাহনি,
হৃদয় বিঁধিতে পারে ভুলাবে না আঁখি;
কি যে সুধা ঝরে হায় সে মুখের বাণী;
ভেসেছে নরক স্রোতে তারে ভর রাখি।
রমণী সংসার প্রাণ দেবি সে রমণী
তারি প্রাণে এ নিরয় কি করে না জানি!

শ্রী————দেবী।

স্মৃতি-চিহ্ন।

(একটি প্রস্তাব।)

আজকাল দেশে দেশে নগরে নগরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগ-জনিত শোক-সভার অধিবেশন শুনিয়া গভীর দুঃখের ভিতরেও আমরা অন্য একভাবে একটু আনন্দ পাই। সে আনন্দ টুকু এই যে আমরা বহুকালের অবিচ্ছিন্ন পরাধীনতায় আমাদের সকল উচ্চ বৃত্তিই এক রকম হারাইয়া বসিয়াছিলাম; শিক্ষা ও আলোচনার উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদের জাতিগত একটি উচ্চ বৃত্তির পরিস্ফুটন সাধন করিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ আমরা আবার আমাদের মহৎ লোকদিগকে যথোচিত আদর ও সম্মান করিতে শিখিয়াছি। কোন জাতিই মহৎ জাতি হইতে পারে না, যে না স্বীয় মহল্লোকদিগকে চিনিয়া সমুচিত সম্মান করিতে পারে। সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দূর বিদেশে, স্বদেশের কার্য্য সাধন করিয়া যে অস্থিগুলি জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়াছিল,

তাহাই মহাসাগরের পরপারে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তখন এতই অনুন্নত ও নীচ ছিলাম যে তাঁহার জন্য এক ফোঁটা অশ্রুও ফেলিতে পারি নাই। সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের কথা। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমরা উচ্চ শিক্ষা ও চিন্তা বলে আমাদের জাতীয় সেই বৃত্তিটিকে অনেক পরিমাণে পরিশোধিত করিতে পারিয়াছি, তাই আজ যেখান সেখান হইতে স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত শোক-তরঙ্গ আমাদের প্রাণে লাগিতেছে। এমন একটি সর্ব্বজনীন আত্মীয়তার ভাব, এমন একটি দেশব্যাপী সমবেদনার ভাব, অনেক দিন আমরা বাঙ্গালির জাতীয় চরিত্রে অনুভব করি নাই। তাই বলিতেছিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে আজ সমগ্র বাঙ্গালি জাতি শোকোচ্ছ্বাস তুলিয়াছে—নর-নারী সকলেই সেই অনপনেয় বিচ্ছেদে হাহাকার করিতেছে, আমরাও সেই সর্ব্বব্যাপী শোকের মধ্যে হাহাকার করিতেছি; কিন্তু এই ক্রন্দনের ভিতরেও বাঙ্গালির জাতীয় চরিত্রের ঐ বিশেষ ভাবটি ভাবিয়া হৃদয়ের গভীর প্রদেশে সুখী না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। রামমোহনের মৃত্যু-সংবাদে আমরা একফোঁটা চোখের জলও ফেলিতে পারি নাই, আর আজ বিদ্যাসাগরের জন্য সমস্ত বাঙ্গালি জাতি মিলিয়া দূর অদূর হইতে স্ব স্ব প্রাণের বেদনা পরিজ্ঞাপন করিতেছে। কেবল তাহাই নহে। বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দেশ ব্যাপিয়া এক অক্লান্ত উদ্যম ও আগ্রহের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। ইহা যে এক অতি সুচিহ্ন, নির্ব্বাপিত-প্রায় বাঙ্গালি জাতীয় জীবনের যে পুনরুন্মেষ তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাই গভীর দুঃখের ভিতরেও আজ একটু উচ্চ আনন্দ বোধ করিতেছি।

এই স্মৃতি-চিহ্ন সম্বন্ধে আমাদের একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। শোক-সভা, সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠে আমরা এই টুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রত্যেক সভাই সেই স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্য স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। আমরা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু আমরা চাই এরূপ ভাবে সেই স্মৃতি স্মরণীয় করা হোক যদ্দ্বারা দেশের অর্থ দেশেই থাকে, অথচ তদ্দ্বারা স্বদেশবাসীরা উপকৃত হইবে। আমরা মনে করি গরিব দেশে গরিবদের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা যদি এমন কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা হয়, যাহাতে পাঁচজনের অর্থ বিদেশে না গিয়া স্বদেশেই থাকে, এবং তদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে আপনারাই উপকার পাই, তবে সেই প্রকারের স্মৃতিচিহ্নকে আমরা প্রকৃষ্ট বলি। যে মহাত্মার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হই, কোন প্রকারের বৃত্তি কি কোন প্রকারের দেশহিতকর ও জনহিতকর স্মৃতি-চিহ্নের (Institution) স্থাপনা করিলে কি সেই উদ্দেশ্য সফল হয় না? দেশের মঙ্গলকর সহস্র অনুষ্ঠানের অভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছি। একের সাহায্যে সহজে কখনই সে সকল অনুষ্ঠিত হইবার নহে। শুদ্ধ সেই অনুষ্ঠানের নাম করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিলেও হয়ত যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইবে না। কিন্তু এই যে এমন এক সুযোগ, যে সময়ে কৃতজ্ঞতায় প্রদীপ্ত প্রাণ হইয়া লোকেরা আপনাপনিই টাকার থলি হাতে করিয়া দান করিবার জন্য অগ্রসর হয়, এই

স্বেচ্ছা-প্রদত্ত দানরাশি একত্রে সমবেত করিয়া একটি বৃহৎ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহাকে আপনাদের ভিতরে অমর করিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারি নামে কেন না উৎসৃষ্ট করা হয়? আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহা অপেক্ষা বিস্তৃতর ও শ্রেষ্ঠতর উপায়ে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবার আর কি কোনও পন্থা আছে?

আমরা গরিব—কে না জানে? তবুও জাতীয় একটি বিশেষ বৃত্তির স্বতঃ উত্তেজনায় মহাত্মার নামে স্ব স্ব সাধ্যমত দুই এক পয়সা করিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য আমরা তৎপর হইয়াছি। পাঁচের লড়ি লইয়া একটা বোঝা হইবে। আমরা কেন পাঁচটি গরিবের প্রদত্ত দান জড় করিয়া বিদেশের লোকদের দিয়ে, একটি মাজা ঘসা পালিস করা পাথর এনে মহাত্মার নাম স্মরণীয় করি? ঐ পাঁচের দান দেশে রাখিয়া যদি তদ্দ্বারা এমন কোন স্মৃতি স্থাপন করিতাম, যাহাতে অন্য পাঁচটি গরিব ভাই ভগিনী উপকার পাইত, তাহাহইলে মহত্ত্বের মহত্ত্ব স্মরণীয় করিতে গিয়া পরোক্ষভাবে দেশেরও উপকার করিতাম। আমরা জিজ্ঞাসা করি আবার, কোনটি প্রশস্ততর ও প্রকৃষ্টতর পন্থা স্মৃতি স্থাপনের—দেশের অর্থ দেশে রাখিয়া দেশের উপকার সাধন করিয়া, না, গরিব কাঙ্গালের অর্থ ধনী বিদেশীয়দের দিয়া?

আমরা সানুনয়ে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রত্যেক প্রস্তাবকারীকে আমাদের এই প্রশ্ন বিবেচনা স্থলে আনিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন সম্বন্ধে আমরা কখনই তাঁহাদের অপেক্ষা হীনতর নহি। তাঁহাদের মত আমরাও স্বদেশের মহৎ লোকদের মহত্ত্ব চিরস্মরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু আমরা সেই স্মৃতি স্থাপনের অন্যতর পন্থা অবলম্বন করিতে বলি। দিন দিন দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবনে, দেশবাসীরা যেরূপ হীনাবস্থা হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, আমরা বলি, যে দুই পাঁচটি টাকা মহতের নামে আমরা দান করি, সে গুলিও কেন বিদেশীয়দের হস্তে তুলিয়া দিয়া আমরা আপনাদের আর্থিক অবস্থাকে আরো হীন করি। যদি প্রস্তরের মূর্ত্তি, কি তৈলাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি দেশীয় লোক দ্বারা প্রস্তুত করান সম্ভব হইত, তাহা হইলেও বা জানিতাম দেশের টাকা দেশেই রহিল। অন্য উপায় অবলম্বন করিলে সেই টাকায় আরো দশজন লোক বংশপরম্পরায় হয়ত উপকৃত হইত, ইহাতে না হয় কেবল এক জন হইল। যাহাই হোক, তবুও দেশের টাকা দেশেই রহিত। কিন্তু তাহা ত আর হইবার নহে। সুতরাং প্রস্তর-মূর্ত্তি করিতে হইলে দেশের টাকা দেশে থাকিতে পারে না। আমরা তাই এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের বিরোধী। মূর্ত্তির দ্বারা যদি মহৎকে স্মরণ করিতে চাও, তাহা হইলেত photo কিনিয়া ঘরে ঘরে রাখিলেই হইবে। সাধারণের অর্থে কেন দেশহিতকর অনুষ্ঠান করা হোক না!

আমরা তাই এই প্রস্তাব করি যে, স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগরের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা একত্র করা হোক। যদি যথেষ্ট দান সংগৃহীত হয়, সেই সমবেত অর্থ উপযুক্ত

Trustee-দের হস্তে রক্ষিত হউক। এবং উহার সুদে বৎসরে বৎসরে ভারতের যেখানেই কেন দুর্ভিক্ষ হোক না, সেই সেই স্থানে অর্থ সাহায্য করিয়া অনাহারের প্রকোপ যথা-সাধ্য নিবারণ করা হোক। অনেকে বলিতে পারেন, এত অর্থ কোথা হইতে আসিবে? তদুত্তরে আমরা এই বলি, মনে করুন নানা সভা সমিতির সংগৃহীত সমবেত অর্থ পঁচিশ হাজার টাকা হইল। ইহাতে বার্ষিক আয় হাজার বারশ টাকা বৈ আর অধিক হইবে না। দুর্ভিক্ষের সর্ব্বসংহারক গতিকে এত অল্প অর্থ সাহায্যে রোধ করিবার চেষ্টা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। কিন্তু আর এক উপায় আছে। বিদ্যাসাগরের জন্য এই যে শোক-সভা সমূহ হইল, ইহাই কি শেষ? বৎসর বৎসর কি আমরা এইরূপ ভাবে তাঁহার মহত্ত্ব স্মরণ করিবার জন্য শোকসভা গঠন করিব না? দেশে দেশে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ভবিষ্যতেও প্রতি বৎসরে আমরা কি এম্নি সভা সমিতি করিয়া মিলিত হইব না? নিশ্চয়ই যদি আমরা মহত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিয়া থাকি, আমরা কখনই ভবিষ্য বৎসরে নীরব থাকিতে পারিব না। এই সে দিন লণ্ডনে ফ্যারাডের স্মরণার্থ শতবার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। ফ্যারাডে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন কবে, আজিও ইংরেজ জাতি তাঁহার গুণগ্রামের অনুশীলনে বীতরাগ হন নাই। আমরা কি তবে অদ্যকার শোক প্রকাশের পর বিদ্যাসাগরকে ভুলিয়া যাইব? তাহলে ধিক্ তেমন জাতিকে!

আমরা যেন শুনিতে পাইতেছি, আমাদের এই নিন্দাবাদে সমুদয় বঙ্গবাসী প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—আমরা কখনই ভুলিব না, এই বৎসরই আমাদের শেষ বৎসর নয়। তবে অর্থানুকূল্যের অভাব কি? বৎসর বৎসর তাঁহার নামে আমরা মিলিত হইব। দেশে দেশে এম্নি ভাবে সভা আহুত হইবে। বর্ত্তমান বংশ ও ভবিষ্য বংশ বিদ্যাসাগরের গুণ স্মরণ করিবার জন্য নগরে মিলিত হইবেন। সেই সময়ে কে মহাত্মার নামে বৎসরান্তে দুই এক টাকা করিয়া দিতে কেহ কাতর হইবেন? বোধ হয় কেহই হইবেন না। সুতরাং এই উপায়ে আমরা প্রতি বৎসর আরো কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব; এবং তাহা হইলেই এই স্থায়ী মূলধনের আয় ও প্রতি বৎসরের দান একত্র করিয়া আমরা অনায়াসেই দেশের এত বড় একটা অভাব, আংশিক পরিমাণে হইলেও, বিদ্যাসাগরের নামে মোচন করিতে পারিব। বিদ্যাসাগর গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করিয়া স্বীয় মাসিক আয়ের অর্দ্ধেকেরও অধিক ব্যয় করিতেন। আমরা যদি তাঁহার নামে এইরূপ এক "দুর্ভিক্ষ নিবারণী ধন ভাণ্ডার" স্থাপন করিয়া তাঁহার ঐ বিশেষ গুণটির সমুচিত গৌরব রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি ইহাপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে কখনই স্থাপন করিতে পারিব না। আর এত বড় একটা মহৎ দেশহিতকর কার্য্য মহাত্মার নামে সংগৃহীত দেশবাসীর অর্থ দেশে রাখিয়াই, আমরা সম্পন্ন করিতে পারি।

এস্থানে আমরা বেথুন বিদ্যালয়ে মহিলাদের বিদ্যাসাগরের জন্য শোক-সভাতে শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর যে প্রস্তাবটি পঠিত হইয়াছিল এবং যাহা অনেকের গ্রাহ্য

হয় নাই, সেই প্রস্তাবের সারবত্তার প্রতি আমাদের মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বেথুন সাহেবের পার্শ্বে বিদ্যাসাগরের প্রস্তর-মূর্ত্তি অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের নামে মহিলাদিগের সংগৃহীত অর্থে বামাকুলের সাধারণ হিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে আমরা অধিকতর ইচ্ছা করি।

এইরূপ, সেদিন ছোট লাটবাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্র লালের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উদ্দেশে টাউন হলে যে সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভার কার্য্যকারী সভ্যদিগের নিকটেও আমাদের এই প্রস্তাব বিনীত ভাবে উপস্থিত করিতেছি। মূর্ত্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে যাহাতে দেশহিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাঁহারা যেন তদ্বিষয়ে মনোযোগী হন। বিদ্যাসাগরের দয়াগুণ স্মরণ করিবার জন্য যেমন Famine Fund * কিম্বা এমন কোনরূপে যাহাতে দেশের অর্থ দেশেই থাকে অথচ কোন সৎ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিতে পারা যায় এইজন্য প্রস্তাব করিতেছি; তেমনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজার স্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য রাজার নামে এক ধন ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া উহার আয়ে উপযুক্ত কোন দেশীয়কে উক্ত বিদ্যা সম্যক্ চর্চ্চা করিবার জন্য সাহায্য করা হয়, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

আমাদের বিবেচনায়, আমরা যদি ভবিষ্যতে এইরূপ ভাবে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থ দেশেই রাখিয়া যাহাতে দেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা দেশের উন্নতি ও উপকার সাধন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হই তাহা হইলে অনর্থক রাশি রাশি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় না। আজকাল সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা স্মৃতি সংস্থাপনকে এক প্রথাস্বরূপ করিয়া বসিয়াছি। বড়লাট, ছোটলাট, প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কেষ্ট বেষ্ট যে কেহ দুদিন কোথাও চাকরী করিয়া অন্যত্র বা স্বদেশে গেলেন, অমনি তাঁহার স্মৃতি স্থাপনের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইল। অর্থদান করিলেন গরিব ভারতবাসীরা, দান কিন্তু গেল বিদেশীয়দের হস্তে। আমরা রাশি রাশি টাকার পরিবর্ত্তে পাথরের মূর্ত্তি কিম্বা কোন নীচ ধাতু ঘটিত মূর্ত্তি দেশে আনিয়া বসাইতেছি। জিজ্ঞাসা করি এ সব মূর্ত্তির মূল্য কি? পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে মূর্ত্তি প্রশস্ত রাজপথে কিম্বা কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করিলে, বল দেখি যে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা রাজবর্ত্ম বিনির্ম্মিত মূর্ত্তি চূর্ণ খণ্ড তাহাপেক্ষা এক কপর্দ্দকও মূল্যবান হইবে কি না? অনেক স্থলে হুজুকে পড়িয়া আমরা দায়ে পড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও শাসন-কর্ত্তাদের স্মৃতি স্থাপনার্থ অর্থদান করিতে হয়। কিন্তু দাতারা কি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন না যে তাঁহাদের দানদ্বারা কোন দেশহিতকর কার্য্য শাসন-কর্ত্তার নামে অনুষ্ঠিত হোক! গরিব ভারতবাসীর অর্থ এতদিকে অপব্যয়িত হইতেছে যে আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও ইচ্ছা হয় না যে, স্মৃতি-স্থাপনার্থ সংগৃহীত অর্থও বিদেশীয়ের হাতে যায়। দেশের অর্থ দেশে রাখিয়া যাহাতে দেশের উপকার সাধন করিতে পারা যায় এমন পন্থা অবলম্বনে যাহাতে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক দাতা দৃষ্টি রাখেন, প্রত্যেক সভা সমিতি মনোযোগী হন; এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। মহতের মহত্ত্ব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সকলেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যত্নবান হইব। কিন্তু সেই যত্ন ও চেষ্টার ভিতরে গরিব দেশের অবস্থা যেন ভুলিয়া না যাই। দেশের অর্থ দেশে রাখিয়া যাহাতে মহতের মহত্ত্ব মহীয়ান করা যায়, দেশের অগ্রণীগণ যেন সেই পন্থা অবলম্বন করেন, উপসংহারে, ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

* Famine Fund-এর প্রতিষ্ঠা দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা উল্লেখ করিলাম মাত্র। যদি অন্য কোন ভাবে, যাহাতে দেশের অর্থ দেশে থাকে অথচ দেশবাসীরা তদ্দ্বারা উপকৃত হইবে, স্মৃতি স্থায়ী করিতে সকলে সম্মত হন তাহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যায় না। দেশের অর্থ দেশে রাখিয়া স্মৃতি স্থাপনের চেষ্টা দেখিলেই আমরা সুখী হইব।

কুড়ানো।

হরিচরণ ভায়াকে সকলেই বিশেষ ভয় করিয়া চলেন, কারণ ভায়া কিছুতেই ঠকিবার লোক নন। এই জন্য ভায়ার অদ্ভুদ্ চেহারা দেখিয়া সকলের মনে হাস্যের উদ্রেক হইলেও সে হাসি তাঁহাদের বিপুল চেষ্টায় ওষ্ঠাধরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়! ভায়া একবার এক বরযাত্রী দলের সহিত বিবাহে গিয়াছিলেন; তাঁহার খর্ব্বদেহ মসীবিনিন্দিত বর্ণ আর মস্তকের আর্ক-ফলার প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহাকে চাণক্যের অবতার বলিয়া ভ্রম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। ভায়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইয়াই একটি কামিজ সুশোভিত বাবুর গা ঘেঁসিয়া বসিলেন। সভাস্থ সকলেই মুচ্‌কাইয়া হাসিতে লাগিলেন। বাবুটি মহা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেহে বাপু, তোমার রকম সকমে তোমার সঙ্গে মরকটের কি তফাৎ, তা'ত বুঝ্‌তে পারিতেছি না!" হরিচরণ ভায়া একটু হাসিয়া, সুসজ্জিত দন্তাবলীর আভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত উত্তর করিলেন, "আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন, তফাৎ নেই বল্লেই হয়, এই চার আঙ্গুল মাত্র"—বলিয়া তাঁহার ও বাবুটির ব্যবধান ভূমি আঙ্গুল দিয়া মাপিয়া দেখাইয়া দিলেন। চারিদিকে হাসি পড়িয়া গেল, বাবুটি আস্তে আস্তে অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

* * * *

সেবার আমাদের পাড়ায় কথকতা হইতেছিল। কথক তর্কবাগীশ ঠাকুর এক টিপ নস্য টানিয়া সন্নিকটস্থ গামছা খানিতে ওষ্ঠ দুখানি মুছিয়া "কপিগণের সমুদ্র বন্ধন কথা" আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন শত শ্রোতা তর্কবাগীশ ঠাকুরের নানাবিধ তান লয় রাগ রাগিণীযুক্ত কথা ও গানে মুগ্ধ হইতেছিলেন। আমরা বেড়াইতে বেড়াইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি ঠাকুর তখন বানরদিগের বীরত্ব বর্ণনে ব্যস্ত; নল নীল গয় গবাক্ষ

সুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি বড় বড় বানরগণ কিরূপে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড মস্তকে লইয়া শত শত যোজন পথ চক্ষুর নিমিষে এক এক লাফে আসিতেছিলেন তাহাই তিনি তখন মুখের বাহার প্রকার সংকোচন প্রসারণে দন্ত-শ্রেণীর সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাবে, হস্তের নানাবিধ সঞ্চালনে এবং অর্থ-বিহীন দুশ্রবেশ্য বহু প্রকার শব্দের দ্বারা উচ্চারণে শ্রোতাদিগের কর্ণে অমৃত সেক করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন হনুমানের কথা পাড়িলেন, তখন বিহ্বল শ্রোতারা আরও বিহ্বল হইয়া পড়িল। হনুমান মস্তকে এক বৃহৎ পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন, পদদ্বয়ে আর দুই পর্ব্বত, লাঙ্গুলে এক পর্ব্বত, এবং লোমে লোমে দুই তিন যোজন বিস্তৃত প্রস্তর-খণ্ড বদ্ধ; সহসা দেখিলাম সেই মুগ্ধ শ্রোতাদিগের মধ্যে হইতে একজন উঠিয়া শনৈঃ শনৈঃ তর্কবাগীশ মহাশয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, দেখিয়াই চিনিলাম, ও পাড়ার কাঙ্গালী গুলিখোর! কাঙ্গালী তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "ঠাকুর মহাশয়, আমাদেরও অভ্যাস আছে; আমরাও খেয়ে থাকি, কিন্তু আপনার মত এতটা নয়।" কয়েক জন বৃদ্ধ ছাড়া সকলের হাস্যে সে দিনের মত কথকতা বন্ধ হইয়া গেল।

* * * *

একজন রাজার এক মো-সাহেবের প্রয়োজন হয়। রাজা বলিলেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া মো-সাহেব লইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে অনেকগুলি মো-সাহেব কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁহে বাপু, তুমি কি মো-সাহেব হ'তে পারবে?" সেই বলে, "আজ্ঞা পারব বই কি। আমাদের ব্যবসায় হচ্চে ঐ, আমার তিন পুরুষ মো-সাহেব।" রাজা বলিলেন, "না, না, আমার বোধ হচ্ছে তুমি পারবে না; আমার বোধ হচ্ছে এ কাজ তোমার পক্ষে এই নূতন।" মো-সাহেবেরা পুনর্ব্বার বলিল "আজ্ঞে না মহারাজ পারব, পারি কি না দেখুন না।" রাজা তাহাদের সকলকেই বিদায় দিলেন। অবশেষে এক মো-সাহেব আসিয়া উপস্থিত।

রাজা। হ্যাঁ হে, তুমি কি মো-সাহেবী কাজ পারবে?

মো-সাহেব। আজ্ঞে, তাতে আর সন্দেহ আছে? আমার বাবা তার বাবা, তার বাবা, তার বাবা, সকলেই মো-সাহেব ছিলেন।

রাজা। না, আমার বোধ হচ্ছে তুমি পারবে না। এটা তোমার নূতন বোধ হবে; কেমন তা নয় কি?

মো-সাহেব। আজ্ঞে, তার আর ভুল আছে! আমার সাত পুরুষে কেউ মো-সাহেবী করেনি, ও কি ভদ্র লোকের কাজ, পেটের দায়ে নূতন এ কাজে ব্রতী হচ্ছি, আপনি যখন বলছেন আমি পারব না, তখন নিশ্চয়ই আমি পারব না!

রাজা। তুমিই পারবে। যাও আজ থেকে তোমাকে কাজে বাহাল করা গেল।

প্রবাসীর দু'চার কথা।

ভাই——

উষ্ণপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করে এরূপ শীতল-প্রকৃতি-বিশিষ্ট হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তোমার হৃদয়ের অন্তর্দাহের কথা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যথেষ্ট বিবৃত করেছ বটে, কিন্তু সে দাহ তোমার কল্পনা মাত্র—তোমার নিজের মন নিজেকে প্রতারণা করেছে, কারণ পৃথিবীতে শীতল যদি কেউ থাকে ত তুমি। যাক্ আমার হৃদয়ে প্রতিশোধ-স্পৃহা মোটেই নেই। সুতরাং তুমি যে সপ্তাহ তিনান্তে পত্রোত্তর দানরূপ অসদ্ব্যবহার করেছ, আমি তার পরিবর্ত্তে পত্র পাঠমাত্র উত্তর দিয়ে সদ্ব্যবহার ফিরিয়ে দিচ্ছি। কার হার—কার জিৎ?

সোলাপুর এবং মারহাট্টীদের সম্বন্ধে আমার মতামত লিখে পাঠাতে বলেছ। "সোলাপুর" এবং "মারহাট্টী"র যে পার্থক্য করেছ—সেটা খুব সঙ্গত হয়েছে। আমাদের এখানে "সোলাপুর" মানে জিম্‌খানার মেম্বরগণ এবং "মারহাট্টী" মানে অনাবশ্যক অত্রস্থ দেশীয় লোক। আমাদের জিম্‌খানায় একদিন ক্রিকেট ম্যাচ্ ছিল। যাবতীয় ইঙ্গী ফিরিঙ্গী এবং ইঙ্গবঙ্গীয় সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। মহিলাগণ একটা তাম্বুর নীচে সাজ সজ্জা করে গিয়ে বসে চা পানি কর্ত্তে কর্ত্তে তাবৎ সৃষ্টবস্তুর মহাপ্রভু পুরুষগণের ক্রিকেট ফিল্ডে অদ্ভুত হস্তচাতুর্য্য এবং শরীর-যষ্টির অপরূপ বিকৃতি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। যে সব পুরুষরা খেলায় যোগ দেন নি, তাঁরাও অদূরে বসে দেখ্‌ছেন এবং যথাসময়ে বিজয়ীদের করতালি দ্বারা সম্ভাষণ কর্‌ছেন। ফিরিঙ্গি মহিলা এবং খাঁটি ইঙ্গ মহিলা সকলেই যে এক স্থানে বসেছিলেন এরূপ অনুমান যদি করে থাক তাহলে নিতান্ত ভুল করেছ। শিবিকার নীচে শুধু খাঁটিদের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। আর ঝুটারা এদিকে উদিকে গাছতলায় স্ব স্ব গাড়ীর উপরে যেমন তেমন করে নিজেদের উপায় করে নিয়েছিলেন। আর ফিরিঙ্গি পুরুষগণ কিছুদূরে ঘাসের উপর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এদিক উদিক দুই একটা গাছপালা ঝোপঝাপের মধ্যে থেকে দুটী একটী পার্সি বালক ও যুবকের মুখ উঁকি দিয়েছিল। আমরা শিবিকাসীনেরা যেন একমাত্র এই পৃথিবীর রাজা—আর কারও এত আয়েসের অধিকার নেই—আর কারও প্রতি ভদ্র ব্যবহারের আবশ্যক নেই। অথচ সেই ফিরিঙ্গি দর্শকদেরও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা ক্রিকেট ম্যাচে যোগ দিয়েছিল এবং তারা আমাদের দলকে হারিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দলকে ক্যাম্পের দল বলা হয় এবং ফিরিঙ্গিদের রেলওয়ে পীপ্‌ল বলা হয় কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই রেলওয়ে কর্ম্মচারী। রেলওয়ের প্রধান লোকেরা আমাদের দলভুক্ত এবং অপ্রধানেরা আমাদের জাতির বাইরে—তাদের সঙ্গে আমাদের কোনরূপ আচার ব্যবহার চলে না। তাদের আমাদের সঙ্গে খেল্‌তে ডাকা হয় অথচ তাদের জলগ্রহণ অর্থাৎ চা গ্রহণ কর্ত্তে বলা হয় না। এতে

যদি তাদের মধ্যে কেউ নিজেদের অপমানিত বোধ করে, আমরা একটু হাসি আর তাদের মুর্খ অশিক্ষিত বলি। তাদের সঙ্গে আমাদের এই রকম সম্পর্ক। তবু কিছু সম্পর্ক আছে। তারা থাকাতে আমাদের জ্যোতি আরও বেশী প্রতীয়মান হয় সুতরাং তাদের কতকটা আবশ্যকতা আছে—তাদেরও আমরা মানুষের মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু মারহাট্টীদের সম্বন্ধে এ রকম কোন ভ্রান্তভাব আমাদের মনে স্থান পায় না। যেদিন আমাদের ক্রিকেট ম্যাচ্ ছিল, সেই দিনই এখানে মহরম উপলক্ষে সহরে নানাবিধ তামাসা ছিল। গরিব হিন্দু মুসলমান সব মেয়েরাই সেদিন সাজ গোজ করে সেই সব তামাসা দেখ্‌তে গিয়েছিল। যখন আমরা ক্রিকেট ম্যাচ দেখে আরও বেড়িয়ে চেড়িয়ে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফির্‌ছি, সেই সময় তারাও সব মেলা থেকে ফির্‌ছে। তাদের সকলেরই নূতন পরিধান আর অনেকেরই কোলে শিশু আর সঙ্গে বিবিধ বর্ণের বস্ত্র পরিহিত বালক-বালিকা। তাদের উৎসববেশ এবং উৎসবের ভাব দেখে এমন আশ্চর্য্য বোধ হল। মুহূর্ত্তের জন্যে সন্দেহ হল যে তারাও মানুষ। আজ আমরা সাব্‌লোকরা যেমন ক্রিকেট ফিল্ডে আমোদান্বেষণে গিয়েছিলুম, এরাও তেমনি আমোদান্বেষণে বেরিয়েছিল—আর আমাদেরই মতন তামাসা দর্শনান্তে সহর্ষচিত্তে বাড়ী ফির্‌ছে। কি অদ্ভুত! এদের প্রতিদিন রাস্তায় দলে দলে ঘরে বাইরে নানা ভাবে দেখ্‌তে পাই, তবু এদের অস্তিত্বের, এদের সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদের বাস্তবতা হৃদয়ে অনুভব করিনে। পথে যেতে যেতে দেখ্‌তে পাই মারহাট্টী যুবকেরা ন্যাড়া মাথায় খালি পায়ে লম্বা মোটা ধুতি পরে টেনিস্ খেল্‌ছে। তখন কি সত্যিই মনে হয় যে পাঁচজন মানুষে লন্‌টেনিস্ খেল্‌ছে? তা কেমন করে হবে বল? টেনিস—এবং ন্যাড়া মাথা খোলা পা লম্বা মোটা ধুতি এ দুটো জিনিষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বেখাপ্পা কি না। একদিন এখানকার মারহাট্টী ইউনিয়ন ক্লাবে ডারুইনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়েছিলুম। আমাদের পক্ষে মারহাট্টী জীবন যে রকম আবছায়া ভাবময়, সে বক্তৃতা-গৃহটাও তদ্রূপ অন্ধকার। শ্রেণীবদ্ধ মারহাট্টী শ্রোতা বসে রয়েছে, সেই মোটা চওড়া লালপেড়ে ধুতি চাদর, নাগরা জুতো, আর বড় বড় বিবিধ পগ্‌গ-ভূষিত, আর সকলেরই গোঁফের দুই প্রান্তভাগ বট গাছের ডালের মতন নিম্নমুখী। সেই মারহাট্টী শ্রোতা-শ্রেণীর মধ্যে একটী তীক্ষ্ণাকৃতি, বিশিষ্ট নাসিকা পার্সি বালক দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেই যেন একমাত্র জীবন্ত শ্রোতা, আর অবশিষ্ট মারহাট্টীবর্গ যেন স্বপ্নদৃষ্ট ছবিশ্রেণী। বক্তা যতক্ষণ ডারুইনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ আমার মনের ভিতরে ভিতরে একটা সন্দেহের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল "ডারুইনিজ্‌ম্ কতটা বুঝেছে না জানি।" কিন্তু সে একবার এইরূপ মত অভিব্যক্ত কর্‌লে যে ডারুইনিজ্‌মের একটা কঠিন মাত্রা বহু পুরাতন ও বদ্ধমূল গোঁড়ামিরও চিকিৎসা কর্ত্তে সক্ষম। তখন আমার মনে হল সে আমাদেরই একজন। তাকে এখানকার শীর্ণকায়, কাশীতে কম্পিত তনু, গলায় কম্ফরটরযুক্ত, অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি বিশিষ্ট এবং ঈষৎ রসিকতা কর্ত্তে সচেষ্ট হাই-

স্কুলের হেডমাষ্টার প্রতিবাদ কর্‌লে। প্রেসিডেণ্ট ছিলেন জজ্ সাহেব। সভাপতি ও বক্তাকে ধন্যবাদান্তে এবং সভাভঙ্গের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বক্তৃতা গৃহের পার্শ্বস্থ একটা ছোট গৃহ থেকে একটা অস্ফুট কলরব শোনা গেল। কিছু পরে একজন ছাত্র ছাত্রমণ্ডলীর হয়ে সাহস ও লজ্জা মিশ্রিত এক অপরূপ ভাব মুখে ধারণ করে দুচার কথায় বক্তা ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে। তার সঙ্গীরা সবাই নতমুখে, মুখে কাপড় চেপে হাস্‌ছিল। এতক্ষণের পর একটু জীবনের আমেষ পাওয়া গেল। এদের নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন উৎসাহ দুচারটে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথায় আমার চোকের সামনে একবার নিজের মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। সেই দিন থেকে স্থির করেছি এরা শুধু "মারহাট্টী" নয়, মানুষও বটে—আমাদের বাঙ্গালীদেরই ভাই। আমার পক্ষে "মানুষ" মানে উদারতা ও নবীনতা। সেই বক্তাকে মানুষ মনে হয়েছিল তার উদারতা দেখে—আর এই ছাত্রদের মানুষ মনে হল এদের নবীনতা দেখে।

এখানকার লোকদের বুদ্ধিমান বল্‌ব কিনা আমি ভেবে পাচ্ছিনে। আমার সঙ্গে যদি কেউ এদের পক্ষ নিয়ে তর্ক কর্ত্তে আসে, তা হলে আমি নিশ্চয়ই হটে যাব। সে তার্কিক নিশ্চয়ই অকাট্য যুক্তিশ্রেণীর দ্বারা প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে এরা বুদ্ধিমান। আর বাস্তবিক এদের বুদ্ধিহীন বলার কোন কারণ দেখ্‌তে পাইনে। এদেশী চাকররা আমাদের দিশী চাকরের চেয়ে কিছু কম চতুর নয় এবং তাদের চেয়ে ঢের কর্ম্মিষ্ঠ; এখানকার মুচির বুদ্ধির পরিচয় আমরা হাতে হাতে না পাই, পাদুকায় পেয়েছি। আর দর্জ্জির কথা আর কি বল্‌ব—এখানকার রমণীমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন যে সে দ্বিতীয় হাঞ্জিহাঁ—এটা কম প্রশংসার কথা মনে কোরো না। সুতরাং দেখ্‌ছ ইতর শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধির অভাব নেই। এখানকার ভদ্রলোকদের বুদ্ধির বিচার করার যথেষ্ট অবসর আমার ঘটে নি। কেবল মাত্র একটী ভদ্রলোক আমার সুপরিচিত। তাঁর সঙ্গে অনেক সময় অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়। লোকটী চিন্তাশীল ও উদার মত, এবং বেশ বুদ্ধিমান। তাহলে এপর্য্যন্ত এ দেশীয়দের বুদ্ধিহীনতার কোন পরিচয় পাইনি, তবু আমার এ জাতটাকে সাধারণতঃ বুদ্ধিমান বল্‌তে কেন সঙ্কোচ হচ্ছে জিজ্ঞেস কর্ত্তে পার। কেন তা বল্‌তে পারিনে—বুদ্ধির অভাবটা যে ঠিক কোন জায়গায়, তার ঠিকানা দিতে পারিনে কিন্তু ভিতর থেকে অনুভব করি একটা কোথায় গলদ আছে।.. হয়ত সেটা ঠিক বুদ্ধির অভাব নয়—উৎকর্ষণের অভাব; অর্থাৎ বুদ্ধি আছে কিন্তু মার্জ্জিত বুদ্ধি নেই—স্থূলবুদ্ধি আছে কিন্তু তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল সর্ব্বাঙ্গীন বুদ্ধি নেই। একজন বাঙ্গালী বি-এ ও এদেশী বি-এ তে অনেক প্রভেদ মনে হয়। বাঙ্গালী বি-এ নীতি-উপদেষ্টার আদর্শ না হতে পারে কিন্তু সে আত্মমর্য্যাদাবান্, উৎসাহী, উদ্ধত এবং বাঙ্গালীর পক্ষে যথাসম্ভব তেজস্বী যুবক। কিন্তু একজন মারহাট্টী বি-এ সাধারণ অল্প শিক্ষিত লোকেরই মতন বিনয়ী, নম্র, স্তিমিতভাবাপন্ন।

ইংরেজরা ভারতবাসীদের শিক্ষা ও উন্নতির অভাবের আলোচনা করে বিদ্রূপ করে থাকেন, মানব সমাজে আমাদের কোন প্রতিষ্ঠা দিতে চান না,—আমাদের সমাজ, আচার ব্যবহার, সুখ দুঃখের গাম্ভীর্য্য তাঁরা হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারেন না। এদিকে আমরা নিজেদের অস্তিত্বের গাম্ভীর্য্য প্রতিদিন হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। আমরা আবার ইয়ুরোপীয় সমাজের সমালোচনা করে তাদের সমাজ ও স্বভাবের উপহাসাস্পদ বৈলক্ষণ্যগুলি স্মরণ করে আপনাদের মধ্যে হাস্যরস কর্ত্তে ছাড়িনে। ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষে যে সম্পর্ক—বাঙ্গালী ও মারহাট্টীতেও কতকটা সেই সম্পর্ক। আমরা মারহাট্টীদের স্থূলবুদ্ধি ও মুণ্ডিতশির স্মরণ করে হাসি রাখ্‌তে পারিনে; আর কখন স্বপ্নেও মনে করিনে যে এই উপহসিত মারহাট্টীরা আবার আমাদের মধ্যে কিছু হাস্যকর দেখ্‌তে পারে। কিন্তু দৈব এমনি রঙ্গপ্রিয় যে মারহাট্টী ভাষায় বাঙ্গালী বুদ্ধিকে বিদ্রূপ কর্ত্তেও ছাড়ে না। জানইত সংস্কৃত বর্ণমালার "অন্ত্যস্থ ব"এবং "বর্গীয় ব"এই দুই 'ব'য়ের উচ্চারণের প্রভেদ আছে, এদের মধ্যে আকৃতিগত প্রভেদও যৎসামান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের অনাবশ্যক পরিশ্রম-বিরোধী পূর্ব্বপুরুষগণ দুই 'ব' কে, দুরকম করে লেখার ও উচ্চারণের পরিশ্রম অনেক কাল বর্জ্জন করে বসে আছেন। সুতরাং সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গীয় সংস্করণে অনেক সময় 'ব' এর স্থানে "অন্ত্যস্থ ব"এবং "অন্ত্যস্থ ব" স্থানে "বর্গীয় ব" দেখা যায়। তাই যখন পুনা ও বম্বের মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদের হাতে বঙ্গীয় সংস্করণ এল, তখন 'ব' ও 'ব' য়ের মধ্যে এমন তর ওলটপালট দেখে তাঁরা নিতান্ত বিস্মিত হলেন এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের উপর বাঙ্গালা দেশের জল বায়ুর ফল যে বর্ণমালা পর্য্যন্ত গড়াতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা কর্ত্তে বিস্মৃত হয়ে স্থির কর্‌লেন যে এই ওলটপালট বঙ্গবাসীদের বুদ্ধি বিকৃতির পরিচয়। সেই পর্য্যন্ত "বাঙ্গব" নামে একটী নতুন কথার সৃষ্টি হল এবং আর কোনরূপ অকারণ ভুল দেখ্‌লেই মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ও শিষ্যমণ্ডলী তাকে "বাঙ্গব" বলে ঠিক দিয়ে, কৌতুক করে আপনাদের মধ্যে আমোদানুভব করে থাকেন। এর ভিতর moral আছে কিনা তুমিই বিচার কর।

সে দিন ডারুইনিজ্‌মের উপর বক্তৃতার আরম্ভে বক্তা ডারুইনের মাতার পরিচয় প্রসঙ্গে বল্লেন যে মিসেস্ ডারুইনের পিতা আর্টিষ্টিক গৃহনির্ম্মাণের পথ প্রদর্শক। মারহাট্টীর মুখে "আর্টিষ্টিক" শব্দ শুনে আমার ভারি জান্‌তে কৌতূহল হল যে মারহাট্টী মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে "আর্টিষ্টিকে"র ধারণা কি রকম না জানি—তাঁরা মস্তিষ্কের উপরে যা ধারণ করেন তা যে "আর্টিষ্টিক" নয়, সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানলাভ হয়েছে। হে প্রাণীপুঙ্গব! হে মানব! মহারাষ্ট্র প্রদেশে মুণ্ডিত শিরোপরি শিরস্ত্রাণধারী তুমি "আর্টিষ্টিক" শব্দের মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ।

আমরা বাঙ্গালীরা মনে করি যে ভারতবাসীর মধ্যে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এরকম আত্মম্ভরিতা নিতান্ত অবিনয় সন্দেহ নেই কিন্তু নিতান্ত অকারণ যে নয়—তা অন্য ভারতবাসীরাও স্বীকার করে থাকেন। নিতান্ত অকারণ নয় তা ঠিক, কিন্তু এস্থলে কার্য্য কারণের মধ্যে পরিমাণের অনেকটা অযাথাত্ব আছে সেটা আমাদের চোখে প্রায়ই পড়ে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা ভারতীর বিশেষ কৃপাপাত্র—এত সাহিত্য, এত কবিতা, এত গান ভারতের আর কোন ভাষায় নেই। তা নেই বটে—আমরা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু ভারতমাতা তাঁর সব প্রতিভা বঙ্গদেশেই নিঃশেষ করেননি। তিনি বঙ্গদেশকে রবিশর্ম্মা দিয়েছেন কিন্তু মহারাষ্ট্রকে রবিবর্ম্মা দিয়েছেন। এই ইনার্টিষ্টিক উপহাসাস্পদ মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে এক আর্টিষ্টের অভ্যুদয়।* তোমরা ত রবিবর্ম্মার নাইয়র বালার ছবি দেখেছ। এখানে রবিবর্ম্মার শকুন্তলা দেখ্‌লুম। বড় আর্টিষ্টের চিত্র বটে। সবে মাত্র প্রেমোন্মেষিত হৃদয়ের এ নবীন সলজ্জ মাধুরী তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌তে প্রতিভা ছাড়া আর কে সক্ষম? এ প্রতিভা বঙ্গদেশে নেই। রবিশর্ম্মা বেশী সৌভাগ্যবান কি রবিবর্ম্মা কে জানে। আমাদের কবির গরীয়সী প্রতিভার প্রকাশক্ষেত্র কি সঙ্কীর্ণ—বঙ্গভাষার প্রাচীরাবেষ্টিত অন্তঃপুরের মধ্যে সে অবরুদ্ধ। সে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার যার আছে, সেই কেবল সে ভুবন-মোহিনী প্রভা অন্তরে অনুভব কর্‌বে। আর রবিবর্ম্মার প্রতিভা নিরবগুণ্ঠনা। তার চারি পাশে ভাষার প্রাচীর নেই। যেখানে মানব হৃদয় আছে, সেইখানেই তার ভাষাহীন মাধুরী সুগম্যা। প্রতিভার যে প্রাপ্য যশ সে কি ভারতী এ উভয় সন্তানের মধ্যে যথাযথ ভাবে বণ্টন ক'রে দিতে পার্‌বেন?

আমার চিঠিতে দুএকবার পার্সিদের উল্লেখ করেছি। এখানে ছ'সাত ঘর পার্সি আছে। সকলেই প্রায় দোকান করে। একদিন আমরা একটা দোকানে বড় অদ্ভুত সম্ভাষণ পেয়েছিলুম। সন্ধ্যের সময় দোকানে যাবা মাত্র দোকানদার সেলাম করে শশব্যস্তে বলে উঠ্‌ল "Good morning, sir—at least Good evening"। পার্সি পল্লির সাম্‌নে দিয়ে যখন আমরা যাই, তখন চতুর্দ্দিক থেকে শিশুকণ্ঠে 'সাব্ সেলাম' 'সাব্ সেলাম' এই রবে আকাশ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সেদিন একটী চার পাঁচ বছরের ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়ে আমাদের কাছে এসে সেলাম করে আত্মপরিচয় দিলে। তার নাম "পুত্‌লি বাই," তাদের বাড়ী কিছু দূরে—ঐ দেখা যাচ্ছে। এখানে সে কেবল খেলা কর্ত্তে এসেছে—সে রোজই এম্‌নি সময়ে এখানে খেল্‌তে আসে। এখানে পার্সিসংখ্যা বেশী নয় যদিও, তবুও এখানে তাদের আগীয়ারী, (অগ্নিমন্দির), পাঠশালা, শবগৃহ সবই আছে। এই শবগৃহের নাম স্তব্ধমন্দির (Tower of Silence)। এই স্তব্ধমন্দির কি রকম জান? একটা গোলাকার ছাদহীন পাথরের ঘর, তার ভিতরে পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু তিন জনের জন্যে তিন স্বতন্ত্র

* রবিবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষেরা মহারাষ্ট্রীয়, কিন্তু রবিবর্ম্মা স্বয়ং মান্দ্রাজ অধিবাসী। মান্দ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের আচার ব্যবহার ও পরিধানের প্রায় কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং রবিবর্ম্মাকে মহারাষ্ট্রীয় আর্টিষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিভাগ। মাটির থেকে হাত পাঁচ ছয় উপরে এর একটি লৌহ দ্বার আছে। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই দ্বার খুলে মন্দিরের ভিতর যাওয়া যায়। এ মন্দিরে মানুষের গতি-বিধির ঐ একমাত্র পথ। সুতরাং এ লৌহ-দ্বার অর্গলবদ্ধ থাকাতে মানুষে আর এ মন্দির-শায়ী চির-নিদ্রিতের নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। মানুষে করে না বটে, কিন্তু শকুনি গৃধিনীরা সেই শবদেহের উপর তাদের নির্ম্মম ক্ষুধার পরিতৃপ্তি কর্ত্তে ছাড়ে না। বলেছি এ গৃহ ছাদহীন—এর মাথার উপর কোন আবরণ নেই। আত্মীয় স্বজনেরা মৃত প্রিয়-জনকে এই অনাবৃত গৃহের মধ্যে পরিত্যাগ করে চলে আসেন। তার পরে শকুনি গৃধিনীরা পরমানন্দে সেই মৃতদেহের উপর তাদের উৎসব ভোজ কার্য্য সম্পাদন করে। এ কি জঘন্য! ভীষণ! হৃদয়হীন প্রথা! এদের মা কি কখন শিশুকে ভালবাসে নি? এদের যুবকেরা বোধ করি কখন প্রিয়তমার কোমল তনু হৃদয়ে ধারণ করেনি—এদের দেশে বোধ করি কেউ কাউকে তেমন করে ভালবাসে নি। তা যদি হত—তাহলে কি আজও এই জঘন্য প্রথা—এই পাষাণ নির্ম্মম মন্দিরের উপর নির্লজ্জ হৃদয়হীন অনাবৃততা নিয়ে বিরাজ কর্ত্তে পারত?

ইতি।

সোলাপুর
২২শে ভাদ্র, ১২৯৮।

শ্রীঃ———

ভেসে যাই।

অকূল সাগর মাঝে দিগ্‌ভ্রান্ত তরীর মত
জীবন-সাগর-স্রোতে ভেসে যাই অবিরত!
কোথা যাই,কেন যাই, জানিনা কারণ তার;
জানিনা অভাবে কার প্রাণ করে হাহাকার।
স্বপনের আকুলতা পথের সম্বল করি,
কিসের কুহকে ভুলে আজীবন ঘুরে মরি?
কভু হাসি, কভু গাই, ভুলিয়ে বেদনা যত;
কভু চোখে ঝরে অশ্রু বরষার ধারা মত।
কেন ব্যথা, হৃদি মাঝে কেন হেন আকুলতা,
পাষাণ হৃদয় স্তরে গাঁথা আছে কার কথা?
কি কথা বলিতে গিয়ে ভঙ্গি সে কঠিন স্তর,
অশ্রুর নিঝর ছোটে আঁখি কোনে ঝর ঝর?
জানিনাক কত দিন অতৃপ্তির ছায়া ঢাকা
হৃদয়ের আঁখি পাতে আকুলতা রবে আঁকা;
মহাশূন্য, অন্ধকার, যাই দূরে দূরে ভেসে;
ভাবিতে পারিনে আর যা হয় তা হবে শেষে!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শোক-গাথা।

কোথা হে অনাথবন্ধু, দরিদ্র-সম্বল।
তোমার লাগিয়া কাঁদে ভারত মণ্ডল ॥১
দীনজনে আর কেবা দয়া বিতরিবে।
কোমল অন্তরে আর কে ভালবাসিবে ॥২
অভাগা অনাথগণে ভাবিতে আপন।
পিতা-হীন হ'ল আজি যত দীনজন ॥৩
হা ঈশ্বর, এত দিনে কোথায় চলিলে।
ভাসায়ে অনাথে, হায়, নয়ন সলিলে ॥৪
মরমে পুড়িয়ে সবে কাঁদে মনে মনে।
অভাগা দীনের দুঃখ নাহি কিহে মনে ॥৫
ভারতের পতিহীনা নারীর লাগিয়া।
ঈশ্বর বিহনে কা'র কাতরিবে হিয়া ॥৬
নানা গ্রন্থে নানারূপে কে আর লিখিবে।
বঙ্গভাষা যতনেতে কে আর রচিবে ॥৭
কাহার নিকটে মান অপমান নাই।
ধনবান হ'য়ে তবু নাহিক বড়াই ॥৮
যে দিকে নেহারি আমি, দুঃখময় হায়।
ঈশ্বর বিহনে কিছু নাহি শোভা পায় ॥৯
হা ঈশ্বর, ধরা ছাড়ি' কোথায় চলিলে।
অভাগা বঙ্গেরে বল, কেমনে ভুলিলে ॥১০
ডুবিল, ডুবিল আজি বাঙ্গালার রবি।
ডুবিল, ডুবিল, হায়, ভারতের ছবি ॥১১
নিদারুণ মহাকাল প্রাণে ব্যথা দিল।
মহাধনে আচম্বিতে কেনরে হরিল ॥১২
যার তরে লক্ষ লোক করে হাহাকার।
তাহার জীবন কেন করিল সংহার ॥১৩
আহা আহা, মরি মরি, বুক ফেটে যায়।
লুকালে ঈশ্বর কোথা, সর্ব্ব গুণময় ॥১৪
তুমি হে দেবতা, তব বাস স্বর্গপুরে।
দয়া, বিদ্যা হেতু জন্ম অবনী মাঝারে ॥১৫
পুণ্যাত্মা আত্মার ভবে নাহি বাসস্থান।
দেবের সমাজে হবে ঈশ্বরের মান ॥১৬
খুলিল, খুলিল ওই স্বর্গের তোরন।
মঙ্গল আচার করে দেববালাগণ ॥১৭
বিমানেতে করে সবে আনন্দের ধ্বনি।
সংসারের জ্বালা ভুলিলেন গুণমণি ॥১৮
অশোক আনন্দধামে কোন শোক নাই।
ঈশ্বরের গুণগান শুনেন সদাই ॥১৯

শ্রীমতী ধনদামোহিনী দেবী।

বিলাপ।

নদীর ধারে ফুলের কলি লইয়া বসিয়াছিলাম, ঠাকুরের পূজা করিব বলিয়া। বাতাসে নদীতে ঢেউ উঠিল, এক ঢেউয়ে পদ্মের কলি ভাসাইয়া লইল, দেবতার পূজা হয় নাই। কলিটী ফুটে নাই যে গন্ধের অনুসরণ করিব। কে জানে কোথায় আমার কমল-কলি ভাসিয়া গিয়াছে!

তুমি বলিবে, ওসব কথা আবার কেন? সকলি স্বপ্ন—আসলে মন দেও, যাহা থাকে, টিঁকে তাহাই ধর। নকলে, মরিচিকায় কাজ কি?

ভাই, ভুলিয়াছ! যখন আসলে সুখ নাই তখন নকলই ভাল, যখন জাগরণে যন্ত্রণা তখন নিদ্রাই ভাল, স্বপনে যদি সুখ পাই তবে স্বপনই ভাল। এ স্বপন ভাঙ্গিবে সত্য, ভাঙ্গেত' সকলি। থাকে কি? থাকে কেবল যাতনা, এইটীই মাত্র সত্য। যখন আসলও ভাঙ্গে, নকল-ও ভাঙ্গে, অথচ আসলে সুখ নাই, নকলে আছে; তখন নকলই ভাল, স্বপনই ভাল। ফটোগ্রাফ্ত আছে, কাড়িয়া লইতে পারিবে না, মানা করিতে পারিবে না, দেখিতে পাইব, হাসিতে পারিবে না, তখন ফটোগ্রাফ্ই ভাল। স্মৃতিত মুছিবে না, স্মৃতিত' পলাইবে না, স্মৃতিত কাহারও আজ্ঞার আয়ত্ত নয় অথচ আমারই; তখন স্মৃতিই ভাল। কায়ার চেয়ে ছায়া ভাল। রবির চেয়ে রবির ছায়া ভাল। সে যায় না থাকে, সে হাঁসায় সে কান্দায়। কটু কথা বলে না, উপহাস করে না, ফাঁকি দেয় না, যখনই খুলি তখনই প্রাণটা জুড়াইয়া দেয়। কেহ কাড়িয়া লইবে সে ভয় নাই, কেহ লইয়া পলাইবে সে ভয় নাই, সদাই সে-ই।

পশুত্বে প্রয়াস আছে, পরিশ্রম আছে, যাতনা আছে, তীব্রতা আছে, বিরহ আছে; সুখ নাই। পশুত্ব সখের নানখাতাই—কুট কূট গরম। আদান আছে, প্রদান আছে, তাড়না আছে, যাতনা আছে, ভ্রুকুটী আছে, হাসিও আছে, শরীর আছে, রূপ আছে, হৃদয় নাই। কুট কূট গরম।

শোয়াইল, জাগাইল, দাঁড়াইল, ছুটাইল, ভাবাইল, কান্দাইল, হাসাইলও বটে, কিন্তু শেষে চিরদিনের তরে পলাইল। তাই বলি স্থূলতায় কাজ নাই, চেহারার রঙ্গে চাহনিতে কাজ নাই, জ্যোতি থাকে না অন্ধকার থাকে, সম্ভোগ থাকে না বিরহ থাকে, কায়া থাকে না ছায়া থাকে, দর্শন থাকে না স্মৃতি থাকে। তবে অন্ধকার ছায়া স্মৃতিই ভাল। পূর্ণতা থাকে না শূন্যতা থাকে, সুখ থাকে না দুঃখ থাকে, হাসি থাকে না কাঁন্না থাকে, মিলন থাকে না বিরহ থাকে। তবে বিরহ, দুঃখ, ক্রন্দন ও শূন্যতাই ভাল।

একটী যাইলে আর একটী আশা করা পাপ। আজিকার দুঃখে কাতর হইও না, 'কাল সুখ পাইবে সেই আশায় থাক', ইহা সয়তানের উপদেশ। ইহলোকে যাহা পাইলে না, পরলোকে তাহা পাইবে, এখানকার বিরহ স্বর্গে মিলন হইবে, এ পাপের উপদেশ। একথায় মনুষ্যত্ব নষ্ট করে, প্রতারণায় পীড়ন করে, প্রাণের প্রাণতা যায়। এটা ছায়ার ছায়া একেবারে অসার। যাহা মিলিবে না তাহার আশা দেওয়া কেন? যে গিয়াছে সে গিয়াছে, আর আসিবে না, এ কথায় বরং সান্ত্বনা আছে। যাহাকে হারাইলাম, সে আর আমার নাই এ কথায় বরং উপায় আছে। আর ভয় নাই, কাঁদিও না আবার পাইবে, এদিন থাকিবে না বলিয়া চোখের জলকে উপহাস করা পিশাচ ব্যবহার!

মুখে তার নাম করিতে প্রাণ কাঁপে, তাই বলি—সে। সে আমার নাই বলিলে এক খানা মেঘের ছায়ায় সকল জ্যোতি নিভিয়া যায়। ঊর্ণনাভের সকল জাল এক ঝাপ্টায় ছিঁড়িয়া যায়, রক্ত শুখিয়া যায়, বুক খালি হয়। এই ত আসল! বুকের ভিতর একটা তুলার বালিস চাপিয়া বুকটা পুরিয়া রাখিলে কি হইবে! এক "হরি হরি বোলে" কাজ হয়, যদি কাজের লোকের কাণে সে-কথা বাজে।

জ্যোতি গিয়াছে ছায়া আছে, সে গিয়াছে স্মৃতি আছে, ভাবনা গিয়াছে শূন্যতা আছে। নাই কি? আছে সকলি। পলাইতে সে পারিয়াছে কৈ, ছাড়াইতে সে পারিয়াছে কৈ, লুকাইতে সে পারিয়াছে কৈ। এখন বরং চক্ষু লজ্জার ভয় নাই, নিন্দা অপমানের ভয় নাই, দ্বন্দ্ব কন্দলের ভাবনা নাই। বাহির হইতে সে ভিতরে ঢুকিয়াছে, দেহ ছাড়িয়া প্রাণে মিশিয়াছে, জাগরণ নিদ্রা বা সুষুপ্তি, মোহ স্বপন বা জ্ঞান, তাতে আর আমাতে প্রাণে প্রাণে। নির্জ্জনে অনন্ত জগতে দুই জনে বিহার করিতেছি। এটা আসল বা নকল? সুখ হইল না, তার দুঃখ কি? একদিন যে সুখ পাইয়াছিলাম, সেই যথেষ্ট। কাড়াকাড়ি করিয়া যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাই যদি না পাইতাম! সুখ পাইবার ত কথা নহে, দুঃখ-পাইবারই কথা। সুতরাং যে টুকু পাইয়াছি, সেই যথেষ্ট। চাঁদের আলোতে ঢেউটী একবার উথলিয়া উঠিয়াছিল। তার পরে যে ডুবিল, অতল জলে ডুবিল, আমিও সেই সঙ্গে ডুবিলাম। যে টুকু পাইয়াছিলাম, সেটুকু অমৃত। অমৃত ভাগ্যে কয় দিন ঘটে!

এখন, "যাবত দিন যাওয়বি
নিম্ব ফল খাওয়বি
অমিয় ফল নাহি চাওয়বি।"

এক দিন আদর পাইয়াছিলাম, তখন মালতী ফুল ফুটে নাই, এখন মালতী ফুটিয়াছে আর কেন আমার আদর হইবে!

"তাবত অলি গুঞ্জরে
চাই ফুল ধুতুরারে
যাবত ফুল মালতি নাহি ফুটে।"

মালতী ফুটিলে ধুতুরার আদর হয় না—এ নিয়তির বিধান। তবে দুঃখ কি? একদিন যে ধুতুরার আদর হইয়াছিল, ইহাই ধুতুরার পরম সৌভাগ্য!

সে ছিল, সে নাই! থাকিবার ত কথা নয়। যা সুন্দর যা মিষ্ট তাত থাকে না। পূর্ণিমার চাঁদ কয় দিন থাকে? মলয় বায়ু কয় দিন বহে? কোকিল কয় দিন ডাকে? থাকে দুঃখ, থাকে অন্ধকার। আছেওত তাই। তবে কিসের জন্য এত দুঃখ!

কলুষিত পার্থিবভাবে, তাহাকে কখন সাজাই নাই। পৃথিবীর ফুলে কখন তাহাকে পূজা করি নাই। বিদ্যুতের আলোকে দিব্যচক্ষে দিব্য জ্যোতি দেখিয়াছিলাম, সে

জ্যোতি নিভে না, সে চক্ষু দূরত্বের অন্ধকারে অপরাজিত। মাটির কাজ, মাটির গহনা, গঙ্গাজলে ভাসাইলে আমার তাহাতে লোকসান কি?

নীরব কবির অশ্রুত সঙ্গীতের মধুরতা কে না অনুভব করিয়াছে? তারকার ঐশী ধ্বনি, নন্দনের পিকধ্বনি পরাভূত করে। চোখের ভাষায় ব্যাকরণ নাই, কিন্তু মধুরতার প্রতিধ্বনি পরাজিত, আধখানি হাসির অট্টতায় নয়ন মন বিমোহিত করে। প্রণয়ীর প্রাণে প্রাণে যে কথা, তরঙ্গে তরঙ্গে অভিঘাত বিদ্যুৎময়, প্রাণস্পর্শী। ব্যবধানে বাধা নাই আলোকের অভাব নাই। সে অনাহুত বেণু-রব বায়ু বংশের অনধিগত, প্রণয়ে বাধা কি?

যায় না থাকে, এমন কি আছে? মধুমান মালতী ফুল, মসুরা বা কোশলা, রাজ্য বা রাজা সকলি যায়। কণ্টক নাই কমলিনী কোথায় মিলে, প্রতারণা নাই ভালবাসা, বিচ্ছেদ নাই সম্ভোগ, ভ্রূকুটী নাই নয়ন-সঙ্কোচ নাই প্রণয়, এ সকল কথার কথা! কিন্তু প্রতারণায় যে প্রতারিত হয় সে প্রণয় করে নাই, বিরহে যার দুঃখ সে স্বার্থপর, লোকে কাঁন্দে স্বার্থ-বিনাশে। যে ভালবাসে তার অতীত ভবিষ্যৎ কি? ইহকাল, পরকাল কি? মান বিরহ কি? জন্ম মৃত্যু কি? যে লাভের আশায় ভালবাসায় ব্যবসা করে বিরহ তাহার লোকসান। যে আত্ম-গৌরব গরীয়ান করিতে ভালবাসে, তাহার অহঙ্কারে পা পড়িলে সে কান্দিয়া ফেলে। যে ভালবাসার ব্যবসা করে না, তাহার দেবতা সাকার বা নিরাকার—কি? দেখিলে কি না দেখিলে কি? সেই মুখ চোকের উপর, সেই প্রাণ প্রাণের ভিতর। মানুষ ভালবাসে না, তাই ভালবাসার বিরহে মানুষ কাঁদে!

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

পত্র।

সোলাপুর
শ্রাবণ, ১৮৯২।

ভাই—

তুমি আমাদের 'ল'কে জান কি? তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে একবার এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন,—My dear——

More next time.

Yours—

রাগ করিও না ভাই, তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া আমারও তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে!—কি লিখি? এই নীরস শুষ্ক দেশ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া উপহার দেওয়া যে কি বিষম ব্যাপার—তাহা আমার অবস্থায় না পড়িলে তুমি বুঝিবে না। না আছে এখানে বর্ণনোপযোগী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, না আছে প্রাসাদ-শিল্প-নৈপুণ্য—

কি লিখি বল দেখি? তুমি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সোলাপুর কি সমুদ্রের ধারে? শুনিয়া এখানকার সকলেই হাসিলেন, আমিও ভাবিয়া দেখিতেছি কথাটা একটু হাসিবার মতই বটে! এখানে পুকুর মেলে না তা আবার সমুদ্র! সমস্ত সোলাপুর সহরে মোট তিন চারিটি পুকুর। বম্বে সহর হইতে সোলাপুর যদিও ট্রেনে—১০, ১২ ঘণ্টার রাস্তা মাত্র,—কিন্তু হইলে কি হয়; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা ও দারজিলিং-এ যে প্রভেদ ইহাদের মধ্যেও অনেকটা সেইরূপ। বোম্বাই নগরীর সে নগর-শোভা, সুপ্রশস্ত পরিষ্কার রাজপথ, সুসজ্জিত বিপণি, বিচিত্র ত্রিতল চৌতল হর্ম্ম্যাবলি, মনোহর উদ্যান-বাটিকা, এবং সে প্রাকৃতিক দৃশ্য, সুনীল সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শ্যামল স্তর—কিছুই এখানে নাই। এখানে প্রাসাদের মধ্যে ভগ্নাবশেষ এক পুরাতন দুর্গ, একটি কাপড়ের কল, দুই-তিনটি মন্দির; রোমান ক্যাথলিকদিগের দুইটি গির্জা, এবং পারসিদিগের একটি সমাধি মন্দির। ইহা ছাড়া বাসবাটী সমস্তই কুটীরগৃহ, ইংরাজদের বাঙ্গলা, দেশীয় ভদ্রলোকের দ্বিতল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নিকেতন, দোকান পসারিও তথৈবচ, আর গরীবদিগের ক্ষুদ্র মৃত্তিকা-গৃহ যেমন সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এইত সোলাপুর সহর, তার পর ইহার প্রাকৃতিক চিত্র। এখানে নদী নাই, পর্ব্বত নাই, যত দূরে দৃষ্টি যায় নিম্নোন্নত শুষ্ক তৃণময় কঠিন ভূমি ধূ ধূ করিতেছে, সেই শুষ্ক ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে কণ্টকাকীর্ণ ছোট ছোট গাছের শুষ্ক ঝোপ, স্থানে স্থানে ঘৃতকুমারীর ক্ষুদ্র জঙ্গল, ইতস্ততঃ দূরবিক্ষিপ্ত এক একটি সঙ্গীহীন তরু, অধিকাংশই মৃতপ্রায় কঙ্কালাবশেষ মৃত-প্রায় বাব্‌লা, মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বট নীম প্রভৃতি সজীব তরু আছে বটে, কিন্তু তাহা বিরল এবং নিস্তেজ। কোন কোন রাজপথের দু'ধারে কেবল অপেক্ষাকৃত সুশ্যাম তরুগণ। একে সোলাপুর স্বভাবতঃ বৃক্ষ-বিরল শুষ্ক কঠিন দেশ, তাহার পর এ বর্ষায় এখানে বৃষ্টি নাই, পিপাসার্ত্ত, রুক্ষ তপ্ত প্রকৃতি কাতর প্রাণে আকাশের দিকে চাহিয়া আরো তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, আর লোকেরা হাহাকার করিতেছে। আসলে বর্ষাতেই এখানে বসন্ত জাগে। আর বারে এ সময় সোলাপুর কি শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছিল! ক্ষেত্রের যেদিকে চাহিয়া দেখ,—নবীন তৃণময়, গাছপালা সরস সতেজ, নবপল্লবিত, আকাশে অনবরত মেঘালোকের বিচিত্র খেলা, এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র; সঙ্গে সঙ্গে সুকণ্ঠ পক্ষীদের মধুর গীতিতে দিক্‌দিগন্ত উথলিত। এবার বর্ষাতে বর্ষা নাই; তাই সোলাপুরের এই মরু দৃশ্য। তাই পাখীরা পর্য্যন্ত এবার গান গাহিতে ভুলিয়াছে, আমরা সকালে পেচকের ডাক শুনিয়া উঠি—! তাই ভাবিতেছি কি লিখি? বিশেষতঃ তোমার মত কবি লোককে!

বলিতে কি, মাঝে মাঝে আমার যেন মনে হয় এ সোলাপুর সে সোলাপুর নহে। না আছে বাহিরের সে নবীন সৌন্দর্য্য, না আছে ভিতরের সে প্রফুল্ল ভাব, পরস্পরের আত্মীয়তা সম্পর্ক। যাঁহাদের জন্য এই নির্জ্জীব নীরস ক্ষুদ্র স্থান সর্ব্বদা

আমোদ প্রমোদ-যুক্ত সরস সজীব থাকিত, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন—সোলাপুরের যেন এখন মুমূর্ষু অবস্থা। দেশে থাকিতে তাঁহাদিগকে একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহাদের অভাব বড়ই অনুভব করিতেছি, আর মনে হইতেছে, সত্যই কি এ সেই সোলাপুর? বলিব কি গ্রহের কথা! সোলাপুরের জমিতে পা না দিতে দিতে এবার আমার Rip Van Winkle-এর দশা ঘটিয়াছিল। দুই বৎসর আগে আমরা যখন সোলাপুরে আসি তখন ট্রেন এখানে বিকালে পঁহুছিত, আমরা জানি এবারো সেই সময় সোলাপুর আসিব, পূজনীয় জজ সাহেবেরও সেইরূপ ধারণা ছিল,—ইতিমধ্যে যে রেলওয়ে কোম্পানি ৬।৭ ঘণ্টা কাল চুরীতে বাহাদুরী করিয়া বসিয়াছে—তাহা কে জানে! চিরকাল সমানে সকলকে ফাঁকি দিয়া এই খানেই সে যে আপনাকে ধরা দিবে, ইহা হঠাৎ কাহার মাথায় আসে বল? কাজেই বিকালের পরিবর্ত্তে সকালে ৯টার সময় যখন সোলাপুরে ট্রেন থামিল, আমরা মহা আগ্রহভরে জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম ষ্টেসন জনশূন্য—এই অপরিচিত জনতার মধ্যে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্নেহময় সহাস্য মুখটি দেখিতে পাইলাম না! এমন কি একজন পরিচিত সিপাহীর মুখ পর্য্যন্ত নজরে পড়িল না, কি ভয়ানক অবস্থা ভাবিয়া দেখ! এই অবস্থায় না হারাইয়া গিয়া যে ভালয় ভালয় ঠিক জায়গায় আসিয়া পঁহুছিয়াছি ইহাতে আমাদিগকে বাহাদুরী দেও কি না? কথাটা নিজের মুখে বলিতে ভাল শোনায় না, তাই তোমার মুখে শুনিবার আশায় রহিলাম।

যাহা হউক ইহা সত্ত্বেও এই সোলাপুর সেই সোলাপুরই বটে। সেই বাড়ী, সেই রাস্তা, সেই জিমখানা, সেই সাক্ষাৎ প্রতি-সাক্ষাতের ধূম, সেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, সেই বৈকালিক ভ্রমণ, সেই জিমখানায় খেলাধূলা, ঘড়ির কাঁটার মত নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন-যাপন প্রণালী—সকলি সেইরূপ, কেবল যদি সেই পরিচিত মুখগুলি থাকিত!

মতিবাগ আমাদের প্রধান বৈকালিক ভ্রমণ-স্থান। মন্দির দেখিতেই যাই, ষ্টেসনেই যাই, সহরেই (দেশীয় পাড়া) যাই, দুর্গেই যদি, ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বশেষে একবার মতিবাগে না আসিলে সে দিন বেড়ানই মিথ্যা। পথে প্রতিদিন প্রায় সেই একই রূপ দৃশ্য। আমাদের বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু দূরে—রাস্তার ধারে কয়েক ঘর তন্তুবায়ের বসতি। ময়লা রং জলা, ২৫। ৩০ হাত লম্বা রঙ্গিন সাড়ির কোঁচা ঝুলান আঁচল দুলান কাল কোল' তাঁতিনীরা কাষ্ঠদণ্ডে বস্ত্রাকারে সুদীর্ঘ রঙ্গিন সুতার বিন্যাস করিতে করিতে আমাদের দিকে চাহিয়া দেখে,—তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা "সাব সেলাম, সাব সেলাম", বলিয়া অভিবাদন করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে দুই একটি বেশ সুশ্রী মুখ। রাস্তার অন্য ধারে সুবিস্তৃত মাঠ; কখনো কখনো মাঠে এক দল মলিনবেশ স্ত্রীপুরুষ পুঁটলি পাঁটলি লইয়া বসিয়া থাকে—তাহারা যাত্রীর দল হয় অন্য কোথা হইতে সোলাপুরে সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিতে আসিয়াছে, কিম্বা অন্যত্র কোথায় যাইবার পথে এখানে আশ্রয় লইয়াছে। তাহারা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এখানে যে বন-ভোজন করিয়াছিল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শালপাতের রাশিতে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়, শকুনি গৃধিনী, এবং কাকের রাশি মিলিয়া সেই পাতুগুলি লইয়া টানাটানি করিতে থাকে। আমাদের ঘোড়াটি এমনি বীরপুরুষ, ইনি আবার সেই কাকের দল দেখিয়া ভড়কিয়া পলাইবার চেষ্টা করেন! তবু ইনি বাঙ্গলার ঘোড়া নন! রাস্তায় পগ্‌গধারী পথিক দু'এক জন, কাষ্ঠের বোঝা মাথায় স্ত্রীলোক দু'এক জন হন হন করিয়া চলে, আর স্থানে স্থানে পুলিস প্রহরী বুক ফুলাইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকে, আমাদের দেখিয়া সৈনিকি প্রথায় সেলাম করে। মাঝে মাঝে পথ আবদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ মেঘের মত গরু মহিষের পাল (অধিকাংশই মহিষ) চলিতে থাকে, গাড়ী তাহাদের মধ্যে আসিলে অল্পক্ষণের জন্য শ্রেণীভঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

রাস্তায় দু একটা টাঙ্গা—(একরূপ ঘোড়ার গাড়ী) আরোহীদিগকে ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে দ্রুত তরঙ্গ গতিতে চলিয়া যায়, কোনটার মধ্য হইতে একটি শ্বেত মুখ, কোনটার মধ্য হইতে বা সপগ্‌গ লম্ব-গুম্ফ মুখ দু একটি প্রকাশিত হয়। দরমার ছাওয়া একরূপ গরুর গাড়ীর মধ্যে কখনো কখনো এক রাশ স্ত্রীলোক ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছে, দেখা যায়। মতিবাগ যাইতে অর্দ্ধ পথে রাস্তার ধারে এদেশীয় যুবকদিগের ক্রীড়া স্থান। তাহাদের মস্তক কেশহীন, টিকি গুটান; অস্থি-পরিপুষ্ট মুখশ্রী দৃঢ়তা ও কার্য্যপটুতা ব্যঞ্জক, 'কুছ পরোয়া নেই'-ভাবে টেনিসের ব্যাট হাতে, খালি পায়ে ছুটাছুটি করিয়া তাঁহারা খেলিতে থাকেন; দেখিয়া সেকালের বর্গির গল্প মনে পড়ে, ইঁহারাই এক সময় বাঙ্গালা কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। হ্যাঁ, সেইরূপ চেহারা বটে! কোন শ্বেত রমণী গাড়ীর মধ্য হইতে এই মুক্তপদ ও মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন ও তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট শ্বেত-পুরুষ-প্রবর তাঁহাকে অভয় প্রদান করিতে করিতে উহাদের দিকে নিতান্ত হীন কটাক্ষপাত করেন। ইহাকেই বলে নিয়তি; এক দিন—বেশী দিন নহে, ইংরাজ ইঁহাদের ভয়ে কম্পমান ছিলেন!

এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা প্রতিদিন মতিবাগে যাই। কখন কখন পর্ব্ব দিনে অন্য নানারূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখা যায়। মহরমের সময় মুসলমানেরা নানারূপ সাজে বাহির হইত। বাঘ, বানর—সাহেব মেম, নাচওয়ালী প্রভৃতি সাজিয়া তাহারা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া নাচিয়া বেড়াইত। আমাদের বাড়ীতেও দুই দল আসিয়াছিল, এক দল সাহেব মেমের সাজে, এক দল নাচওয়ালী বাজিয়ে ইত্যাদি সাজে। সাহেব বিবির সাজই কিছু মজার, দুজন ফিরিঙ্গি সাহেব ও ফিরিঙ্গি মেম, দুজন খাঁটি ইংরাজ ও খাঁটি মেম। খাঁটি মেম মুখোসের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার সাজ বড় মন্দ হয় নাই—তাহারা পরস্পর হাত ও কোমর ধরিয়া ইংরাজি অনুকরণে তালে তালে নৃত্য করিতেছিলেন। চারিদিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই গল্প মিষ্টার 'বি'কে করায়

তিনি বলিলেন, তাঁহার বাঙ্গলায় আসিলে খুব খুসী হইবেন। কিন্তু একবার নাকি একজন ইংরাজ এই নাচ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। হওয়া আশ্চর্য্য নয়! ইহা নিতান্তই তাঁহাদের caricature যেমন দেবকার্সেন বাঙ্গালীর caricature করেন। আমরা গরীব বাঙ্গালী জাত; আমাদের প্রাণে সব সয়; কিন্তু ইংরাজের প্রাণে ইহা সহিবে কেন? যাহার সহে, আমাদের চক্ষে তিনি নিতান্ত সমদর্শী! আর ইংরাজের চক্ষে সম্ভবতঃ তিনি গোবেচারা পদার্থ হীন!

পর্ব্বের আর এক শোভা, রঙ্গিন বস্ত্র-ভূষিত রমণীদল তখন মাঠে পথে গাড়ীতে যেখানে সেখানে দেখা যায়।

বম্বে পুনায় যেমন পারসী রমণীর অভাব নাই, এখানে পারসী রমণীকে দৈবাৎ পথে দেখিতে পাওয়া যায়। সেদিন কেবল দেখিলাম দুই তিনটি পারসি মেয়ে মতিবাগের লোহার বেড়া ডিঙ্গাইয়া হাসিতে হাসিতে ভিতরে ঢুকিতেছে।

মতিবাগ শুনিয়া তুমি যদি ভাবিয়া বস, ইহা বুঝিবা ঈডন্ গার্ডেন্সের অনুরূপ কোন উদ্যান বিশেষ—তাই বলা ভাল, এখানে সারা বাগ খুঁজিয়া একটা বনফুল মেলে কিনা সন্দেহ। যখন মতিবাগে সেনা-নিবাশ ছিল, তখন সম্ভবতঃ মতিবাগ উদ্যান ছিল। এখন আর সোলাপুরে সৈন্য নাই; কেবল ব্যারাকের ভগ্নাবশেষ চিহ্নে, ছায়ময় তরু-ঘন পথে, ও পথপ্রান্তের পুষ্করিণীতে মাত্র এখন মতিবাগের পূর্ব্বশ্রীর কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। বাস্তবিক সমস্ত সোলাপুরে মতিবাগের মত সুন্দর তরুপথ আর নাই। ইংরাজের যাদুমন্ত্রে মরুভূমি সহসা এখানে অরণ্যানীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানে খানিক দূর পর্য্যন্ত বৃক্ষাবলী গায়ে গায়ে ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া চূড়ায় চূড়ায় মিলিয়া মিশিয়া যে শ্যামল বন-পথ রচনা করিয়াছে তাহা দেখিলে দারজিলিং-এর পার্ক মনে পড়ে। এই তরুপথ অতিক্রম করিয়া সহসা আবার আকাশ-চুম্বিত দিগন্ত-প্রসারিত মুক্ত ভূমিতে আসিয়া পড়িতে হয়, সহসা এই দৃশ্য-বৈচিত্র্য অতি মনোহারী!

তুমি শুনিলে কি মনে করিবে জানি না,—কিন্তু এই তরুবিরল অশ্যামল, মরুবৎ মুক্ত দৃশ্যও আমার বড় ভাল লাগে। নিস্তেজ পত্রবিরল দূরবিক্ষিপ্ত গাছে গাছে প্রতিহত হইয়া সজোর বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া বহে; নানারূপ পাখী নানা সুরে গান করে; সুদূর প্রসারিত মাঠের সীমান্তে মেঘের সুন্দর রং খেলিতে থাকে, উচ্চ নীচ শুষ্ক কঠিন অসমতল ভূমি দূর হইতে তরঙ্গের মত শোভা পায়। মতিবাগ-পুকুরের একটুখানি সবুজ জল তাহার এক প্রান্তে ঢলঢল করিতে থাকে, Fairy Queen একখানি পালের ক্ষুদ্র জাহাজস্থিত বোট, যাহাকে বলে (Sailing Boat) দুলিয়া দুলিয়া তাহাতে নৃত্য করেন। চারিদিক উদাস সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মনে হয়। এই মুক্তপথে কি ভয়ঙ্কর বাতাস; এখানে হাঁটিয়া চলা দায়; সম্মুখে চুল গুলা নিশানের মত উড়িতে থাকে; কাপড় পালের আকার ধরিতে চায়; ঠিক থাকিয়া চলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; তাড়াতাড়ি গাড়িতে

উঠিয়া বসিতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত। এই বাতাসই এখানকার মেঘ-শত্রু, মেঘ করিতে না করিতে এই বাতাসে তাহা উড়িয়া যায়।

মতিবাগের পুকুরটি বড় মন্দ নহে। আগে মতিবাগে গিয়া ফেয়ারী কুইনে sail করিয়া বেড়ান একটি ফ্যাসানের মধ্যে ছিল; কিন্তু অল্প দিনেই দেখা গেল, ফ্যাসানটি ঠিক নিরাপদ নহে। রাণীর মেজাজের কিছু মাত্র ঠিক নাই; অল্প বাতাসেই তিনি টলমল করেন—একবার উলটাইয়া পড়িয়া দুই জনকে জলে ফেলিয়াছিলেন; ভাগ্যবশতঃ সে দিন কোন সন্তরণ-অপারক রমণী তাহাতে ছিলেন না। আর একবার তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেবার এখানকার ডাক্তার-পত্নী এই বোটে ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, সহজ অবস্থাতেই নড়াচড়া তাহার পক্ষে ব্যায়াম-স্বরূপ; সুতরাং এ সময়ে তাঁহার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা কল্পনা করা নিতান্ত কঠিন নহে। বোটও যেমন কাত হইয়াছে তিনিও বেঞ্চ হইতে বোটের তক্তায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন; আর তাঁহার সঙ্গী দুইজনের মধ্যে একজন, Mr. D. পাল সামলাইতে ব্যস্ত; আর এক জন সোলাপুরের বাজিয়ে সাহেব Mr. B. নিজের বেহালা সামলাইতে ব্যস্ত; তাঁহার মতে এই দুই টুকরা গৃহ সরঞ্জামের মধ্যে—(স্ত্রী ও বেহালা) বেহালাই সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়, কেননা ইহা দ্বারা সংসারের অধিক উপকার দর্শে। সুতরাং অবস্থাটা তেমন সুখজনক না হইলেও কিছুক্ষণ তাঁহার এই অবস্থাতে কাটাইতে হইয়াছিল, এবং এ জন্য তিনি পরে Mr. B-কে নিতান্তই স্নেহময় আশীর্ব্বচনে অভিবাদন করেন নাই। এই গল্পটি সোলাপুরের একটি রহস্যবাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নবাগতের কাণে এ কথাটি না উঠিয়া যায় না।

মতিবাগে আসিয়া যাঁহারা দাড় বাহিতে চাহেন তাঁহারা পরীরাণীর জলি-বোটে অধিকার করিয়া ভ্রমণ করেন। আমরা গতবারে জ্যোৎস্না রাত্রে অনেক দিন দাঁড় বাহিয়া বেড়াইতাম। চন্দ্রালোকে এই নির্জ্জন হ্রদে নৌকা ভ্রমণ করিতে করিতে স্কটের 'লেডি অফ্ দি লেক' মনে পড়ে, চারিদিকে চাহিয়া দেখি যদি কোন বিপন্ন নাইটকে তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাই, কেহ না—কেহ না! কেবল কৃষ্ণবর্ণ তরু-শ্রেণী ও তাহার ছায়া আমাদের প্রতি উপহাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। পরীরাণী ও তাঁহার অনুচর—(জলি বোট) ছাড়া মতিবাগের অন্য আকর্ষণও আছে। এখানে নানারূপ শীকার মেলে, মাছ হইতে শূকর পর্য্যন্ত। একবার আমরা গাড়ীতে যাইতে যাইতে মাঠের মধ্যে একটা শূকরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। কখনো কখনো নগর নেকড়ে বাঘও পাওয়া যায়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা শৃগালই অধিকাংশ শীকারীর বধতৃষ্ণা নিবারণ করে, আমার বিশ্বাস ছিল মাছ; কিন্তু এখন শুনিতেছি; এ হ্রদের মাছেরা নাকি ভারী চতুর, সহজে ধরা দিতে চাহে না। Mr. B-র সে জন্য নিতান্ত মনস্তাপ; প্রায় বৎসরাবধি তিনি এখানে আসিয়াছেন; আর প্রতি দিনই প্রায় তিনি

ছিপ ফেলেন ; কিন্তু দৈবাৎ কোন দিন ছাড়া তাঁহার ছিপে মাছ ওঠে না। বিপদে পড়িলে লোকের বুদ্ধি জোগায় ; এইবার তিনি শঠে শাঠ্য আচরণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন ! তাঁহার এক (Idea) আসিয়াছে, ছিপ না ফেলিয়া Shoot করা, যেই তাহারা মাথা উঠাইবে অমনি গুলি-বর্ষণ। আমরা প্রস্তাব করিলাম, কেন, জাল ফেলা ? এ উপায় তাঁহার মনঃপুত নহে, ইহাতে Originality নাই। M. B. এখানকার গোপালভাঁড়, খুব হাসাতে পারেন।

সোলাপুরে আর যে দুই তিনটি পুকুর আছে ; সকলি প্রায় কোন না কোন মন্দির সংলগ্ন। দেবপূজায় ফুল চাই ; সেই জন্য মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে পুকুর, বা পুকুরের নিকটেই মন্দির। পুকুরগুলি পদ্ম-পত্র ও পদ্ম-কলিময় ; ফুল ফুটিলে না জানি কিরূপ সুন্দর দেখিতে হয়। কিন্তু জলের এই অভাবেও সোলাপুরে তেমন জলকষ্ট নাই। এখান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে একরুক নামক একটি বৃহৎ হ্রদ আছে, সেইখান হইতে কলে সহরে জল আসে। তবে তাহাতে লোকের ব্যবহার-কার্য্য সম্পন্ন ছাড়া ক্ষেত্রের জলের সুবিধা হয় না। শোনা যায় আমেরিকায় নাকি ডাইনামাইট দ্বারা মেঘ-বর্ষণ করা হইতেছে। মেঘের উপর পর্য্যন্ত আধিপত্য ! আশ্চর্য্য কি ? বিদ্যুৎ যখন ধরা পড়িয়াছে—তখন একদিন মেঘও ধরা পড়িবে ! তখন কোন স্থানে আর মরুভূমি থাকিবে না বোধ হয় ! অন্যান্য মন্দিরের পুকুরগুলি অপেক্ষা সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পুষ্করিণীটিই বড়। সিদ্ধেশ্বরের মন্দির নাকি বহু পুরাতন। মন্দির মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত মহাদেব-মূর্ত্তি বিরাজমান। আমরা দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, একজন মহারাষ্ট্রী রমণী এক মনে আরাধনা করিতেছে দেখিলাম, বোধ করি স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রার্থনা করে। মন্দিরের পুরোহিত একার্দ্ধ নারিকেল মালা ও আর কয়েকটি খেজুর আমাদের হাতে দিলেন, তাহা দেবপ্রসাদ। পূর্ব্বে এখানে যে স্থূলোদর-ভারে সর্প-গতি, প্রফুল্ল-মুখ, অনাবরিত-গাত্র পুরোহিতকে দেখিয়া দেবদর্শনাপেক্ষা সমধিক আনন্দলাভ করিয়াছিলাম ; এবার তাহাকে আর দেখিলাম না। এখানকার শৈবদিগকে লিঙ্গায়েৎ বলে—শৈবদিগের শবদাহ নাই, তাহাদের সমাধি হয়। শৈবেরা একরূপ বড় বড় রৌপ্য কবচ ধারণ করে, তাহা সূত্রে গ্রথিত হইয়া তাহাদের বক্ষ-শোভিত, এবং অঙ্গের নিকট তাহাদের সম্প্রদায় প্রকাশিত করে।

মতিবাগের নিকট রেবণসিদ্ধ নামক দেবের এক মন্দির আছে, তাহাও নাকি বহু-পুরাতন। মন্দিরের চূড়ায় কতকটা বুদ্ধের মূর্ত্তির অনুরূপ নানা মূর্ত্তি,—মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত রেবণসিদ্ধ। আমরা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রেবণসিদ্ধ মানে কি ? সে বলিল,মহাদেব। আমরা বলিলাম, রেবণ কথার অর্থ কি ? সে তাহা জানে না। এখানকার পুরোহিত গভর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক ৪০ টাকা বৃত্তি পায়। মন্দিরের পুরাতন বৃত্তি-ভোগীদিগকে গভর্ণমেণ্ট এখনো বৃত্তি দান করেন।

সিদ্ধেশ্বর-মন্দিরের পুষ্করিণীর পর পারে,—এখানকার প্রকাণ্ড পুরাতন দুর্গ। বিজাপুর সোলাপুরে পূর্ব্বে যখন ক্রমাগত বিবাদ চলিত, তখন বিজাপুরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। দুর্গ তোড়ন অতিক্রম করিয়া কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়া এক স্থানে সিন্দুর-চর্চ্চিত এক অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি। শোনা গেল ইনি দুর্গের অধিষ্ঠাতা নৃসিংহদেব। দুর্গ প্রতিষ্ঠার সময় নাকি ইঁহার সম্মুখে নরবলি হইয়াছিল। দুর্গের মধ্যে এখন পুলিসের কতক সৈন্য বাস করে।

সোলাপুরে যদিও দেব মন্দির বেশী নাই তথাপি নগরবাসীদিগের সে জন্য পূজার কোন অসুবিধা হয় না। রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে কোন একটা বড়গোছ পাথর দেখিলেই তাহারা তাহাকে দেব বানাইয়া পূজা করে। আমরা দেখিলাম দুর্গের সীমানায় এক উচ্চ প্রস্তর-খণ্ডকে সিন্দুর চর্চ্চিত করিয়া এক রমণী পূজা করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানকার কলেক্টর সাহেবের বাড়ির কাছে ময়দানের এক প্রস্তর লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। গ্রামবাসীগণ সহসা সেই প্রস্তর খণ্ড আবিষ্কার করিয়া বাদ্য বাজনা সহকারে তাহার পূজা আরম্ভ করিল। কলেকক্টর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, গভর্ণমেণ্টের কোর্ট সংলগ্ন স্থানে এইরূপে অধিকার করিতে তাহাদের ক্ষমতা নাই ; এখানে তাহারা পূজা করিতে আসিতে পাইবে না। তাহারা জজ সাহেবের নিকট নালিশ করিল। জজসাহেব তাহাদের পক্ষে রায় দিলেন।

আমরা একদিন পারসীদিগের সমাধি মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সুদূর প্রসারিত মাঠের মধ্যে এক মুক্ত ছাত, গোলাকার ইষ্টক-বেষ্টন। একস্থানে একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বার,—দূর হইতে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই দ্বার দিয়া চির-মৌনীদিগকে এইখানে রাখিয়া আসা হয়, তাই ইহার নাম মৌন বা স্তব্ধ-নিবাস।

বিধর্ম্মীগণের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং ইহার বাহ্য আকার ছাড়া অন্তরের কিছুই আমরা দেখি নাই, তবে শুনিয়াছি মধ্যে নাকি স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকার স্বতন্ত্র তিনটি শবস্থান। মন্দিরের মাথায় মাঠের গাছে গাছে শকুনি গৃধিনীর দল বসিয়া আছে। শব স্বস্থানে পরিত্যক্ত হইয়া মন্দির-দ্বার বন্ধ হইলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়। মাঝে মাঝে তাহাদের কেবল ভুক্তাবশিষ্ট-অস্থি রাশি মানুষে পরিষ্কার করে। সে দিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছিল—দু একটা শকুনি আমাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, আমরা সেই 'তেপান্তর' মাঠে তিনটি প্রাণী নিস্তব্ধে অগ্রসর হইতেছিলাম ; চলিতে চলিতে মনে হইতেছিল, যেন শবের সঙ্গী হইয়া চলিতেছি ; তাহাদের স্তব্ধ রাজ্যের গুপ্ত রহস্য তাহারা আমাদের কাণে কাণে কহিতে কহিতে সেই দিকে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পারসীদিগের এই শব-বলি প্রথায় আমরা শিহরিয়া উঠি ; ইহাতে পারসীদিগকে নির্ম্মম হৃদয়হীন বলিয়া বোধ হয়। অথচ ভাবিয়া দেখিতে গেলে, দাহ-প্রথাতে কি বিশেষ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে ? যাহাকে চিরদিন যত্নে

রাখিয়াছি, পূজা করিয়াছি, সেই ভালবাসার বস্তুকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া অগ্নি দগ্ধ করিতে যাহারা পারে—তাহারা কি কম নিষ্ঠুর? স্তব্ধ-নিবাসের স্তব্ধতা শকুনি গৃধিনীগণ মানব-নয়নের অসাক্ষাতে গোপনে গোপনে ভঙ্গ করে, আর চিতাশায়ীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ব্যক্তি,—তিনি তাহার মুখে অগ্নি প্রদান করেন; আর প্রিয়জনের আঘাতে তাহার সম্মুখে সেই দেহ ক্রমে অগ্নিসাৎ হইতে থাকে! কেবল তাহাই নহে; পারসীদের মনের এক শান্তি,—মৃত্যুর পর তাহার প্রিয়জনের প্রিয় দেহ অন্যের উপকারে আসিয়াছে! এইরূপ ধর্ম্ম ভাবের সংক্ষিপ্রণে ইহার হৃদয়হীনতাই বা কোথায়! কিন্তু আমাদের দাহ-প্রথার ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ যদি এ প্রথায় শিহরিয়া ইহাতে আমাদিগকে হৃদয়হীন বলেন; ইহাতে কি আমাদের বলিবার কিছু আছে? অথচ তাহাদের মতই কি আমরা পিতামাতাকে ভাল বাসি না, সন্তানকে স্নেহ করি না, তাঁহাদের মতই আত্ম-বিসর্জ্জী দাম্পত্য-প্রেমে হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে পরিপূর্ণতা অনুভব করি না? আসল কথা আমরা যাহাকে পূজা করি, তাহা প্রাণ মন আত্মা বিশিষ্ট জীব; তাহা সম্পূর্ণ চেতন সৌন্দর্য্য, জড় দেহ নহে! আজকাল আমাদের দেশে মৃত্যুর পর ফটোগ্রাফ লওয়া প্রথা হইতেছে, আমার মনে হয় ইহাতে যেমন হৃদয়-হীনতা প্রকাশ পায় এমন আর কিছুতে নহে! আমরা যে স্মৃতি হৃদয়ে রাখিতে চাই, তাহা তাহার আত্মাময় সৌন্দর্য্যের স্মৃতি, সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য-শালী পূর্ব্ব স্মৃতির স্থানে অচেতন শ্রীহীন বিকৃত মূর্ত্তি স্থাপন করা আমার মনে হয় শুদ্ধ ভালবাসার অপমান করা!

* * * *

ভাদ্র।

দিন ১৫।২০ আর তোমাকে লেখা হয় নাই; ইহার মধ্যে সোলাপুর নতুন শ্রী ধারণ করিয়াছে; দিন কতক হইল তিন চার দিন ধরিয়া সোলাপুরে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমাদের টেনিস কোর্ট এবং কমপাউণ্ডের কোন কোন স্থান ত একবারে পুকুর হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের মালীকে প্রাণ খুলিয়া কখনো বৃষ্টির প্রশংসা করিতে শুনি নাই। এবার তাহারো বলিতে হইয়াছিল, বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। আর ভিস্তি-গুলার ত কদিন পোহাবারো; তাহাদের আর জল তুলিতে হয় নাই। তবে আমার মনে হয় ভিস্তির চেয়েও ভিস্তির মশকেরই ইহা অধিক আনন্দের দিন। সম্বৎসর জলে ভিজিয়া এই সময়ই তাহারা শুকাইয়া বাঁচে। এখন আর বর্ষাবাদল নাই, এখানে এখন বসন্তের রাজত্ব।

চারিদিক শষ্প শ্যামল; পাখীরা অবিশ্রান্ত গান করিতেছে; মতিবাগের পুকুর নব যৌবনে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; সিদ্ধেশ্বরের এবং রেবণসিদ্ধ দেবের হ্রদ বিকসিত কমলে ঢল ঢল। আর আমাদের বাগানে গোপাল যুথী যাতি ও বিচিত্র বর্ণের নানা রকম

বিলাতী বাগানে গোলাপ খুলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; পাছের পাতাগুলির কাঁচা কাঁচা রং হইয়াছে; প্রকাণ্ড [illegible] এ [illegible]ই! [illegible]বুজ ঘাসে ভরিয়া গিয়াছে।

আমার [illegible] করি ঘাসের কোন দর নাই; কিন্তু প্রতি বৎসর এখানকার ঘাস নীলাম[illegible] হইয়া ২০০ হইতে ৩০০ টাকায় বিক্রয় হয়; ও তখন হইতে পালে পালে [illegible] মহিষের দল চরিতে আসিয়া এখানকার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে। সোলা-পুরে [illegible]ন করা বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। কেবল এখানে জলের অভাব, এমনো নহে; [illegible]কার মাটিও অনুর্ব্বর। অন্য স্থান হইতে সারমাটি আনাইয়া তবে জজ সাহেবের [illegible] বাগান হইয়াছে! তবুও এখানে দু' চারিটি বেশ ভাল বাগন আছে। আমাদের দেশের বড় মানুষের মত এ দেশের বড় মানুষলোকেরও প্রায় এক একটি স্বতন্ত্র বাগান থাকে। এখানে জজ সাহেবের এই বাগান ছাড়া পারসীদের ধর্ম্মশালা, ও সোলাপুর বস্ত্রকলে সংর্থনা [illegible]ইটি বাগান; এবং বারদ ও মাটেশ্বর নামক এ দেশী দুই জন ধনী লোকের দুইটি বৃহৎ বাগান আছে। এ দেশের লোকের বাহ্যাকৃতি ও সাজ সজ্জা দেখিলে মনে হয় ইহারা নীরেট জাতি, সারবান লোক; অনাবশ্যক সখের সঙ্গে ইহাদের বড় সম্পর্ক নাই। সাহসী সেনা, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, ডারউইন তত্ত্ববিৎ, কঠোর অঙ্ক-শাস্ত্র বিশারদ, অশেষ পাণিনীজ্ঞ; এ সকলি এ জাতিতে সম্ভবে, কিন্তু ফুলও তারার সৌন্দর্য্য ভাবনায় ইহারা যে সময় নষ্ট করিবেন, এরূপটা হঠাৎ মনে হয় না। তথাপি কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরি এদেশে ফুলের সখ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের মালা খোপায় পরা মেয়েদের ত সাজগোজের একটি অঙ্গ। তবে আমাদের চোখে সেই বড় বড় অদ্ভুতা-কৃতি মুক্তার নথ-ভরা মুখের সঙ্গে ঢ্যাবা ঢ্যাবা অদ্ভুত স্বর্ণ চাকী শোভিত অর্দ্ধ টাক অর্দ্ধ খোপাযুক্ত মাথার উপর সে ফুলহার যেন একটু খাপছাড়া দেখায়। বাস্তবিক আমার অনেক সময় মনে হয় এ দেশের মুণ্ডিত শীর্ষগণ, আর নথভারে-বিব্রতা টানা-খোপা পীড়ি-তাগণ কি পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আত্ম-হারা হইয়া মনে করে—"দেখি দেখি আবার দেখি, দেখিবার সাধ মেটে না ত?" অবশ্য করেন, নহিলে এতদিন দেশের পুরুষ-দিগের ন্যাড়া মাথা চুলে ভরিয়া উঠিত; আর স্ত্রীলোকের সাজ সজ্জা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ হইয়া দাঁড়াইত। যদিও জ্ঞানে ইহা বুঝি, তবুও কল্পনায় ঠিক ইহা ধারণা করিতে পারি না। প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্ম্মা শকুন্তলা হইতে কয়েকটি দৃশ্য আঁকিয়াছেন; দু একখানি অতি সুন্দর হই-য়াছে; বিশেষ সেইখানি, যেখানিতে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চুম্বন করিতে উদ্যত, আর শকুন্তলার অধরের মৃদুহাসিতে, নয়নের আবেশ দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে, দেহ ভঙ্গীতে, নব প্রণয়ের আধো বাধো লজ্জামাধুরী ও হৃদয়ের আগ্রহ ভাব; দুই একত্রে অতি মধুর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হইলে কি হয়, শকুন্তলা এখানে আধুনিক মহারাষ্ট্রী ললনা! তাহার পরিধানে কাছা আঁটা কোঁচা ঝুলান পরিচ্ছদ, তাহার মাথায় ফুলহারজড়িত কুণ্ডলাকৃতি বেণীবন্ধনের বাহার, মুখাবয়ব দেহগঠন সুশ্রী সুন্দর, কিন্তু মহারাষ্ট্রী জাতির আদর্শানুরূপ, সুতরাং

চিত্র সুন্দর হইলেও,—এ চিত্র দেখিয়া তপস্বী কন্যা বনবালা শকু[illegible] মনে পড়ে না। কি ভাগ্য, ইহার নাকে তবু মহারাষ্ট্রী ললনার নথ না[illegible] বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ দেশে চিত্রের অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। রবিবর্ম্মা ভ[illegible]ক এক খানি ছবি ৫০।৬০ হাজারে বরদার রাজা কিনিয়া লইয়াছেন। মধ্যবিত্ত শ্রে[illegible]মরা এ দেশে রবিবর্ম্মার শিষ্যদিগের অঙ্কিত চিত্রাদি ৩০০।৪০০ শত দামে এক এক[illegible] ক্রয় করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আপাততঃ একটি সুখবর শুনা যাইতেছে[illegible], বোম্বাই নগরের একদল বণিকজাতি (বেণিয়া) পঞ্চায়েৎ করিয়া স্ত্রীলোকের নাকে ধর্ম্ম নথ উঠা-ইতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, কাজ কি এমন কাজে যাহাতে অন্য সব দে-প্রদেশের লোকেরা নিন্দা করে। এইবার হইতে যিনি নথ পরিবেন তাঁর দশ টাকা চারি আনা করিয়া দণ্ড দিতে হইবে। যদিও ১০ টাকার উপর আবার চারি আনাটা যে কেন সেটা ঠিক বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকে পঞ্চায়েৎ করিয়া এখন পুরুষের ন্যায়াঙ্গ-বিশেষটা উঠাইতে পারিলেই ঠিক হয়! তবে আপাততঃ অনুজ্ঞাটা অমনি ভালয় ভালয় প[illegible]লিত হইবে, কিম্বা নথ খুলি-বার আগে পুরুষদিগকে তাঁহারা একবার নাকখপ্তা [illegible]ওয়াইয়া লইবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এখানকার সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস, বিধাতৃ স্ত্রীলোকদিগকে নথ-ধারণের আজ্ঞা দিয়াছেন। বুঝিবা সত্যযুগের সুদর্শন চক্র এ যুগে মহারাষ্ট্র ললনার নাসিকার নথরূপ ধারণ করিয়াছে! অন্ততঃ তাঁহাদের বিশ্বাস ইহার জোরে তাঁহারা অলক্ষ্যে ছিন্নহৃদয় করিয়া পুরুষ বিজয় করেন। এ বিশ্বাসটা যে তাহাদের নিতান্তই ভুল এমন মনে করিও না। সম্প্রতি পুনায় একটা Fancy Dress Ball হইবে; আমাদের যাইবার কথা আছে। আমি ভাবিতেছিলাম এ দেশী রাণী সাজিলে হয়। তাই এখানকার একজন ভদ্রলোককে কতকগুলি গহনা জোগাড় করিয়া দিতে বলায় তিনি বলিলেন, তাহা হইলে নাকে বড় বড় মুক্তার নথ, আর পায়ে মণখানেক আন্দাজ মল পরিতে হইবে। তাহা শুনিয়া ভাবিলাম, কাজ নাই আমার রাণী সাজায়! যাহা আছি বেশ আছি। এই ভদ্র লোকটি সুশিক্ষিত, মার্জ্জিত-রুচি; বঙ্গদেশে ইনি গিয়াছিলেন, বঙ্গভাষা জানেন, বাঙ্গালী বুদ্ধি, বাঙ্গালীরুচির প্রশংসা করেন। ইহার নথ কেমন লাগে? একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম। অবশ্য আশা করা গিয়াছিল ইনি বলিবেন,—'যদ্‌বিশ্রী'—কিন্তু ইনি উত্তর করিলেন, "মন্দ না, নথ নাকে না থাকিলে মুখ কেমন খালি খালি দেখায়!" অথচ আমার মনে হয়, আমি যদি পুরুষ হইতাম আর শুভ দৃষ্টির সময় এইরূপ নথ-পরা মুখ আমার নয়নে পড়িত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই আলপনা পিঁড়ি হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া দৌড় দিতাম। এ দেশের মেয়েদের অনেককে বেশ দেখিতে; বিশেষতঃ ছোটবেলায় ইহাদের মুখগুলি বেশ থাকে, বিবাহ না হইলেত ইহারা আর নথ পরে না। সেই ছোট ছোট সুন্দর মুখগুলির দিকে চাহিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে, আহা দুদিনে এই শ্রী কিরূপ বিকৃত হইয়া পড়িবে! বাস্তবিক এ দেশের আর সব ভাল; এ দেশের লোকের বুদ্ধির বেশ একটা গভীরতা দেখা

য়; বাঙ্গালীরা ইহাদের তুলনায় অবশ্য তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল বুদ্ধি কিন্তু তৈলঙ্গ, রাণাদে প্রভৃতি এ দেশীয় বুদ্ধিমানগণকে দেখিয়া ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত পাকা নাঁধা বলিয়া মনে হয়। এক কথায় ইহারা বুদ্ধিমান অথচ ভদ্র; তেজস্বী অথচ বিনয়ী! স্ত্রীলোককে ইহারা যথোচিত সম্মান করে; পথে অসহায় দেখিলে উপহাস দৃষ্টিতে দেখে না, বড় লোককে সম্মান করিতে অপমান জ্ঞান করে না। তাঁহাদের এই বিনয় অনেকে হীন-তার পরিচয়-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা ঔদ্ধত্যের অভাব মাত্র, তেজের অভাব নহে।, তাই বলিতেছি ইহাদের সব ভাল, কেবল যদি আর পুরুষদিগের মুড়ান মাথা, গুড়ান টিকি ও লম্ব গুম্ফ, এবং স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার ও বেশ-বিন্যাসে এরূপ বিকৃত রুচি না দেখা যাইত! অসৌখিনতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যেন স্ত্রীপুরুষেরা মিলিয়া এ দেশে প্রাণপণ যত্ন করিতেছে।

এ দেশের অভ্যর্থনা প্রথা বড় সুন্দর। যাঁহাকে সমাদৃত করিতে হইবে; তাঁহাকে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সম্ভ্রান্তদিগকে পান সুপারির নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ সভায় প্রায়ই নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে আহারাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই; তাহার পর বিদায়কালে নিমন্ত্রেতাগণের হস্তে আতর মর্দ্দন ও ফুলের তোড়া ও রাংতা-মণ্ডিত পান দান করিয়া, গলে ফুলহার পরাইয়া, গাত্রে গোলাপজল বর্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে সম্মানিত করা হয়। যাঁহার সম্মানের জন্য প্রধানতঃ সভা আহূত, তাঁহার ফুলহার ও ফুলের তোড়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। জজ সাহেব যতবার এখান হইতে কলিকাতা যান, ততবারই প্রায় এদেশের লোকেরা তাঁহাকে এইরূপে বিদায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। কখনো কখনো পান সুপারির অভ্যর্থনায় আতস বাজি ছুড়িয়া ইংরাজি বাজনা আনা-ইয়া মহা ধূম ধাম করে।

গণপতি উৎসব উপলক্ষে সে দিন একজন ভদ্রলোকের বাড়ী আমাদের পান সুপা-রীর নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণকারী ঠিক এ দেশী লোক নহেন, কর্ণাটী—বাণিজ্য ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে বাস করিতেছেন। দু এক বৎসর তঁহার বিবাহ হইয়াছে—স্ত্রী নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নহেন, ১৬।১৭ এইরূপ বোধ হয়। আমরা কিছু আগে গিয়াছিলাম, তখনো অন্য নিমন্ত্রিতগণ কেহই আসেন নাই, নৃত্যগীতাদিও আরম্ভ হয় নাই। নিতান্ত খুকড়ির মত ঠাকুর-দালানে শিবদুর্গা গণেশ কার্ত্তিককে লইয়া বিরাজিত; সম্মুখে নানা রূপ খেলানা আর দেওয়ালগিরিতে ঝুলান ল্যাম্পে ও ভূমিস্থ বাতিতে ছোট্ট দালান আগুণ হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরের কাছে একটি দেয়ালের নিকট কৌচে আমরা বসি-লাম। গীত আরম্ভ হইল, একজন হারমোনিয়মে সুর দিতে লাগিল, একজন তবলা বাজা-ইতে লাগিল, আর একজন কাণে হাত দিয়া গান করিতে লাগিল। একটু পরে গৃহস্বামীর আহ্বানে নব-বিবাহিতা গৃহিণী সভায় সন্তর্পণে সভয়ে সমাগত হইলেন; আসিয়া নিস্তব্ধে পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা উঠিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলাম, যেন তিনিই

আমাদের নিমন্ত্রিতা। কিন্তু তিনি কিছুতেই বসিবেন না, আমরা কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন না, মহারাষ্ট্রী বোঝেন না; আমরা কেহ কর্ণাটী জানি না: সুতরাং বাক্যালাপ বন্ধ, তবু ইঙ্গিতে যতদূর হয় সমাদরে সস্নেহে পিঠে হাত দিয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই ব্যবহারে তিনি এত আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া উঠিলেন, যে সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।—আমি তখন আর অনুনয় না করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বুঝিলাম তাঁহার পক্ষে ইহাই জুলুম। তাঁহার আত্মীয়েরা বারবার তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল—কিন্তু তিনি নির্ব্বাক পুত্তলির মত তবুও দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমরা চলিয়া আসিলাম, আসিবার আগে একটা খেলনার ক্ষুদ্র ভাল্লুক কল-চালিত হইয়া আমাদের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। শুনিয়াছিলাম নৃত্যগীত হইবে; গীতের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ভাবিয়াছিলাম নাচটা ফাঁক গেল, কিন্তু Programme সব ঠিক্ ঠিক।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশ অপেক্ষা এদেশ আরো পশ্চাৎপদ। আসলে সকল বিষয়েই বাঙ্গালি গতিশীল ইহারা স্থিতিশীল। নিজ বোম্বাই নগরীতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখা যায় বটে, তাহা পারসীদিগের মধ্যেই অধিকাংশ নিবদ্ধ। সুশিক্ষিত হিন্দু রমণীর সংখ্যা সেখানেই বিরল, আর এরূপ জায়গায় একটীও পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাঝে মাঝে আমরা দেশীয় স্ত্রী-সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়া আলাপ পরিচয় করিতে চাই, কিন্তু পরস্পরের ভাষা না জানায় তাহাতে তেমন সুবিধা হইয়া ওঠে না। যাঁহারা হিন্দুস্থানী বোঝেন তাঁহাদের সঙ্গে তবু একরূপ চলে তাঁহারা মারহাট্টি বলেন, আমরা হিন্দুস্থানী বলি। মারহাট্টি বাঙ্গলাই অনেকটা কাছাকাছি এক রকম করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়; তবে কহা অবশ্য চলে না। পারসী স্ত্রীলোকেরা কথাবার্ত্তায় আলাপ সালাপে বেশ পটু; এখানকার পারসী মেয়েরা যে তেমন শিক্ষিত তাহা নহেন, তবু তাঁহারা বেশ সামাজিক। হিন্দু রমণীগণ লাজুক, চুপ চাপ, ত্রস্ত ভীত; দশবার কথা কহিয়া তবে একবার উত্তর পাওয়া যায়। তাহার অর্থ প্রথমতঃ, "ইঁহারা বাহিরের লোকের সহিত একেবারে মেসেন না; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ইঁহারা নিতান্ত সম্মান দৃষ্টিতে দেখেন। কারওয়ারে যখন ছিলাম তখন একজন সব জজের স্ত্রী একদিন আমাদিগকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা কি তাঁহাদেরই মত স্নানাহার করি! এ দেশে দেখিতেছি নামে মাত্র জেনানা নাই, অর্থাৎ মন্দিরে কিম্বা বাড়ীতে কোন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া তিনি ঘোমটা না টানিয়াও নিকটে পাশ দিয়া চলিয়া যাইবেন, কিম্বা গৃহে নিমন্ত্রিত-দিগকে আবশ্যক স্থলে পরিবেশনও করিতে পারেন, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু লেখা পড়ায় কিম্বা সামাজিকতায় তাঁহাদিগকে অজ্ঞ দেখা যায়। এদেশের রাজাগণের মধ্যে আবার পুরো-পুরি জেনেনা প্রথার চলন দেখা যায়। তাঁহাদের স্ত্রীরা একেবারে পরদানসিন। আক্কেল কোটের রাণী কখন কখন প্রকাশ্য স্থলে তামাসা দেখিতে যান; কিন্তু ঢাকা গাড়ীর ভিতরে

সিয়া গাড়ীর পরদার ভিতর হইতে দেখেন। বরদার রাজা দুই বার নিজে বিলাত গিয়াছিলেন, একবার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, তথাপি এখন তিনি পরদানসিন। বেশী দিন হইল, হপ্তা খানেক হইল, বরদার রাজা নীলগিরি যাইতে পথে সোলাপুরে দুদিন অব-স্থিতি করিয়া গিয়াছেন। সে দুদিন সহরে হুলস্থূল পড়িয়াছিল। দেশের লোকের এখানে সভা সমিতি স্কুল লাইব্রেরী সাধারণাগার আছে, সে সকল স্থলে হইতেই নিমন্ত্রণ ও সমাদর-পত্র (address) লাভে রাজা সম্মানিত হইয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, ধনীলোকেরা রাজনিমন্ত্রণ করিয়া সমারোহের ত্রুটি করেন নাই। মোট দুই দিন রাজা এখানে ছিলেন দুইদিন সকালে বিকালে অবিশ্রান্ত তাঁহার উপর এত সমাদর বর্ষিত হইয়াছিল! তবুও রাজা সময়াভাবে, এবং শেষ দিন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সকল address-গুলি শুনিতে পারেন নাই। এ দেশের লোকেরা কতদূর উৎসাহ-পরায়ণ সম্মানশীল; এবং শ্রম নিপুণ তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে।

রাজার সঙ্গে এখানকার সম্ভ্রান্ত সকলেরি অবশ্য নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু আমরা প্রথম দিন বিকালে Union Club-এর নিমন্ত্রণে মাত্র গিয়াছিলাম। আমরা গিয়া দেখিলাম, প্রতিদিন যেখানে মহারাষ্ট্রী যুবকেরা টেনিস খেলে, সেই ক্রীড়াস্থল একেবারে লোকা-রণ্য; অত লোকের মধ্যে যাইতে কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু যখন আসিয়াছি তখন আর কথা কি। ক্রীড়াস্থলে ঢুকিয়াই রাজ-দর্শন পাইলাম; তাঁহার নিকটেই আমাদের বসিবার স্থল, একজন মহারাষ্ট্রী তাঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ আমাদের পরিচয় করিয়া দিলেন, রাজা সাদরে আমাদিগকে নিকটে বসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, সম্মুখে যুবকেরা টেনিস খেলিতে লাগিল। রাজ-দর্শনে ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। তাঁহাকে দেখিতে সুশ্রী বয়স ২৫ হইতে ৩০-শের মধ্যে; সাজ সজ্জা সুরুচি-সঙ্গত, সুন্দর শুভ্র বেশ পরিধান—চোস্ত পাজামার উপর নাতিদীর্ঘ মলমল চাপকান, চাপকানের হাতা দুইটি গালা-চুনাট—মাথায় লাল পাগড়ী আর অধিকন্তু পাগড়ির নীচে কেশের শোভা প্রকাশ পাইতেছে, রাজার সুরুচি ও সাহসের ইহাতে চূড়ান্ত পরিচয়; মহারাষ্ট্র জাতি হইয়া মস্তকে কেশ ধারণ করা কম কথা নহে। গহনার মধ্যে হাতে কতকগুলি বহুমূল্য অঙ্গুরী। রাজার কথা-বার্ত্তা লোকের সহিত আচার ব্যবহারও অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দুইবার বিলাত গমন করেন, সুতরাং তাঁহাতে ইংরাজি ভদ্রতা ও হিন্দু বিনয় একত্র মিশ্রিত। আমাদের সহিত তাঁহার প্রধানত ব্রাহ্মসমাজ, তাহার তিন শাখা, বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা, এই সকল লইয়াই কথা বার্ত্তা হইল। কথায় কথায় আমি বলিলাম, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই এখন প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্ম, কেননা তাঁহারা মনে মনে সকলেই প্রায় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। রাজা বলিলেন,—"কিন্তু মনের বিশ্বাস বাহিরের কার্য্যের সঙ্গে এক হওয়া চাই, তবেই ত তাহার সুদৃষ্টান্তে

সুফল হইবে।" তাঁহারই উপযুক্ত কথা! তিনি জাতিগত আচার উপেক্ষা করিয়া সস্ত্রীক বিলাত গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে রাজ্যশাসনেও তাঁহার উদার মত প্রকাশিত হয়। বরদা রাজ্য অতি সুশাসিত; প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের দিকে রাজার বিশেষ লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে ইনি আদর্শ রাজ বলিলেও হয়। আজ কাল ভারতবর্ষের অনেক রাজা ইংরাজি শিক্ষার গুণে ইংরাজের প্রকৃত রাজগুণ লাভ না করিয়া কেবল ক্রীড়া, কৌতুক, শীকারেই কালাতিবাহিত করেন। কিন্তু বরদারাজ আমোদে উন্মত্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য ভোলেন নাই; ইংরাজ সম্মিলনে ইহার দেশানুরাগ প্রজাপ্রিয়তা হ্রাস হয় নাই। আমিত মনে করিতে পারি না বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজা দেশের সামান্য লোকের আহ্বানে এরূপ প্রফুল্ল-ভাবে এরূপ বিনয় সহকারে তাহাদের মধ্যে আসিয়া তাহাদের সম্মানিত করিয়া নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন। তাঁহার দেশের লোকের সহিত কতটুক সম্বন্ধ! ইংরাজের সহিতই তাঁহার আচার ব্যবহার, ইংরাজ লইয়াই তাঁহার কারকারবার, ইংরাজকে আমোদ দান করাই যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। বিলাত যাইয়া আর ইংরাজের সহিত মিশিয়া তাঁহার এই হইয়াছে, যে তিনি দেশীয় লোককে অবজ্ঞা করেন আর সর্ব্বতোভাবে ইংরাজ হইতে চাহেন; আর বরদা-রাজ বিলাত যাইয়া দেশীয়-লোককে বিশেষ আপনার বলিয়া মনে করেন। এক দিকে ইংরাজদিগের সুপ্রথা সুশাসন অবলম্বনে রাজ্য পালন করেন, অন্য দিকে প্রজাদিগকে দেখাইতে চাহেন তিনিও তাহাদেরই এক জন; জাতিতে এক, হৃদয়ে এক, আচার ব্যবহারে এক, তিনিও যা আর তাঁহার প্রজাগণও তাহাই; তিনি যে রাজা, তিনি যে বড়, সে কেবল তাহাদের লইয়াই। বাস্তবিক সে দিন রাজ-সভায় গিয়া যে কি আনন্দলাভ করিয়াছিলাম বলিতে পারি না, চারিদিকে আনন্দ প্রফুল্ল মুখ, তাহাদের সেই আনন্দে রাজা পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ; রাজভক্তি ও দেশীয় বৎসলতার আদান প্রদানে চারিদিক উথলিত। রাজদর্শনের যে সুখ সেই দিন যথার্থ উপলব্ধি করিলাম। লাটপত্নীর মহা সমারোহময় উৎসব আসরে গিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তায় সম্মানিত হইয়াছি; কিন্তু এই সামান্য টেনিস সভায় সামান্য জনসাধারণ বেষ্টিত রাজ-সভা দর্শন করিয়া যে সুখ পাইয়াছি তাহার নিকট তাহা কিছুই নহে! রাজাকে দেখিয়া মহারাষ্ট্রী জাতির উপর শতগুণ শ্রদ্ধা বাড়িল। বাঙ্গালী উন্নতশীল সত্য; কিন্তু তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তার নিজের ভার অতি অল্প, কিন্তু মহারাষ্ট্রী আপন ভারে তরঙ্গ পরিচালনা করিতে পারে!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

লিটারেরী।

নব্যবঙ্গে একদল লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—ইহারা না কবি, না ধার্ম্মিক, না দার্শনিক; না ভাবের লোক, না কাজের লোক। কাব্য ধর্ম্ম দর্শন ভাব অথবা কাজ—কিছুরই সহিত ইঁহাদের বিশেষ পরিচয় আছে; এমন দোষারোপ কেহই বড় করিতে পারেন না। তবে সময়ে সময়ে সকল বিষয়েই ঠোকর মারিয়াছেন বটে! কিন্তু সাহিত্য, "বিশুদ্ধ সাহিত্য" লইয়াই ইঁহাদের কারবার; এমন কি উহাই তাঁহাদের পেষা বলিলেও বলা যাইতে পারে। দিবারাত্রি সাহিত্যেরই চর্চ্চা হইতেছে। ইংরাজি শিক্ষার ফল-স্বরূপে বাঙ্গালায় এই জাতির অভ্যুদয়, পুরাতন বঙ্গে এ জীব ছিল না; তাই কারে পড়িয়া ইংরাজীতেই নামকরণ করিতে বাধ্য হইলাম, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। স্বেচ্ছা হয় স্ব স্ব খেয়াল অনুসারে অনুবাদ করিয়া লইবেন, এই আমার বিনীত নিবেদন!

বাহিরে দেখিতে জীবগুলি দ্রষ্টব্য বটে। ধপধপে শুভ্র কামিজ অঙ্গে শোভিত, চরণে মেরিণো অথবা সুতার ডোরাটানা মোজা পরাজিত, তাহার উপরে গ্রীসিয়ান চটি অথবা পম্প। চুলগুলি পরিপাটী রূপে সজ্জিত—তথাপি দিনের মধ্যে সহস্র বার দর্পণের নিকট যাইয়া দেখিতে হয় সমস্ত ঠিক ঠাক আছে কিনা। কথা অতি কোমল কণ্ঠে, দূর হইতে শুনিলে নারী কণ্ঠ বলিয়া ভ্রম হওয়াই সম্ভব। বাদ্যগীত চর্চ্চা, ইঁহাদের আর একটি প্রধান কাজ। যিনি ঐ সকল বিষয়ে তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নহেন তিনি সর্ব্বদাই সাধারণের, বিশেষতঃ মহিলাগণের মনোহরণের জন্য সঙ্গীতালাপ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের সে ক্ষমতা টুকু নাই, তাঁহারা মনোক্ষোভে দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নিভৃতে সঙ্গীতের রসালাপ করিয়া থাকেন, অন্তরের আগুন অন্তরে লুকাইয়া বাহিরে দেখান বড় সমজদার। সমজদার ব্যতীত ত রসের উৎস ভাল করিয়া খুলে না!

মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে কেহই বড় কম নহেন, ইনি বলেন আমায় দেখ, উনি বলেন আমায় দেখ। কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, কেহ বা এ কার্য্যও করেন নাই; কিন্তু হইলে কি হয় বড় বড় কেতাব সর্ব্বদাই হস্তে বিরাজমান! ইংরাজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষায় ইঁহারা সকলেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ছার অঙ্ক-শাস্ত্র প্রবেশ করিয়াই কেবল ইঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাড়াইল। উহার সহিত সাহিত্যের কিনা সপত্নী বিবাদ তাই ইঁহারা সাহিত্যের উপাসক হইয়া কি করিয়া ক্রূরমতি Parabola, hyperbolaর সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন! Keats, Rossetti, Shelley প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—শুনা যায় সম্প্রতি Browning-ও নাকি এই দলভুক্ত হইয়াছেন। Wordsworth, Miltonকে কবি-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইঁহারা আপনাদের মধ্য হইতে এক একটী

মোহান্ত কাড়িয়াছেন। Cardinals-দের মধ্যে হইতে যেমন Pope নির্ব্বাচিত হন সেরূপ নহে; তবে আপনাদের প্রতিভা বিকীরণ দ্বারা জন কয়েক এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন, কেহ বড় আর এখন এ বিষয়ে ওজর আপত্তি করেন না। ভক্তগণের হৃদয়ের উপর তাঁহাদের রত্ন-সিংহাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

আধ্যাত্মিকতা ইহারা মানেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কথার উত্থাপন হইলে প্রায় এক প্রকার Agnostic হইয়া দাঁড়ান, তখন কিনা প্রমাণ করার ভার তোমার উপরে পড়ে; কাজেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে থাকেন, তুমি যত কেন ইচ্ছা বকিয়া মর না, তিনি নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্। শিষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও পাকড়াও করিলে বলেন, "কি জান যার যে কাজ তাহাই তাহার করা কর্ত্তব্য। এই দেখ আমি সাহিত্য-দেবীর High Priest আমি যদি গিয়া পুরোহিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া বেড়াই তবে আমার কিছুই প্রতিভা বিকসিত হয় না,—আমার এই সুদূর-প্রসারিত যশ একেবারে লোপ পাইয়া যায়।" অতএব সন্দেহের ছায়া নিরবচ্ছিন্নে প্রমাণীত হইয়া গেল যে, সাহিত্য—"বিশুদ্ধ সাহিত্য"ই সংসারের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদার্থ, আর উহার উপাসকেরা ধরণীর শিরোভূষণ। ভক্তবর্গ অমনি সমস্বরে করতালি দিয়া সহাস্য বদনে দলপতির চরণ বন্দনায় নিযুক্ত হইলেন।

সাহিত্য সম্বন্ধে ইহারা সার বুঝিয়াছেন,—নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। সাহিত্য আর অপর কিছুই নহে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি মাত্র। উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টির দ্বারা সাহিত্য-দেবীর উপাসনা করা এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণকে আমোদে মাতাইয়া তোলা। সংসারের জ্ঞান-ভাণ্ডারে উপঢৌকন দেওয়া তাঁহাদের মতে নিকৃষ্ট কার্য্য, তাহা বিজ্ঞান করুক। মনুষ্যের মন মস্তিষ্ক অথবা আত্মার যাহাতে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহা সাহিত্যের সীমানীর বাহিরে। ইহাদের আর একটি পরম সৎগুণ আছে, ইহারা সকলেই Artistic; ভব্যতা ও সুরুচির বিস্তারই ইহাদের এক প্রধান কার্য্য। এমন কি শিব গড়িতে গিয়া যদি বানর গড়িয়া বস তাহাতেও তাঁহাদের বড় আপত্তি নাই, তবে বানরটি বেশ ভব্যিযুক্ত ও সুরুচি-সম্পন্ন হইলেই হইল। বানর যেন সুরে কিচ কিচ করে এবং শোভন ভাবে কদলীটি অল্পে অল্পে আহার করে, যেন দেখিয়া লোকের নিকট পশু-উপযোগী হীন ক্ষুধার ভাব না ব্যক্ত হইয়া পড়ে। গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার ইহাদের সভায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অতএব "সম্পূর্ণ সত্য নহে" ইহা ব্যতীত অপর ভাষায় ঐ ভাব প্রকাশ করিলেই গোলযোগ বাধিয়া যায়। কারণ, ভাব তো কিছু দুষ্য নহে, দুষ্য ঐ কুরুচিপূর্ণ ভাষা-ব্যবহার! ইহারা Genuineness-এর বিশেষ পক্ষপাতী। এ কুসুম যেখানেই ফুটুক না কেন উঁহাদের নজরে পড়িলেই অমনি তাহাকে সভায় Exhibit করিয়া যশস্বী করিয়া তুলেন। তবে কেহ যেন এমনটি মনে করিয়া না বসেন যে, যে সে জাতীয় Genuineness ইহাদের নিকট সমাদৃত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে বিদ্যা-সাগরের মত স্পষ্টবক্তা রূঢ়ভাষী ও অপ্রিয় সত্য-বাদী Genuineness-এরও তো সাক্ষাৎ

পাওয়া যায়; কিন্তু এরূপ Genuineness তাঁহাদের মনে ধরে না! Conventionality-টা আত্মস্থ করিয়া মোহান্তদের যশঃ-ঘোষণা করা যাঁহাদের কাজ তাঁহারাই ইহাদের চক্ষে Genuine! অপর প্রকৃতির Genuinenessকে ইহারা বড় আমল দেন না। এক কথায়, যাঁহারা দলপতিগণের যশ-ভেরী নিনাদিত করেন তাঁহারাই Genuine, অপর সকলেই ঝুটা!

বিজ্ঞানের ইহারা বিশেষ পক্ষপাতী—কথায় কথায় বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক মত, ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যশ-ঘোষণা করিয়া থাকেন। তবে ইন্‌ডাক্টিভ্ লজিক এবং উচ্চ বিজ্ঞানের সহিত তাঁহাদের বিন্দু মাত্র পরিচয় নাই। তাহাতে কি আসিয়া যায়, বুলি আওড়াইতে তো কোন ক্ষতি নাই! স্পেন্সর, হক্সলী, টীন্‌ডল-এর দোহাই দিতে তো আর বিশেষ মহারণ্য ও উলুবন ইজারা লইবার প্রয়োজন করে না!

ইহাদের নিকট সত্যের খাতির নাই, খাতির আছে কেবল ভাণের। তোমার মনে মনে তাঁহাদের মানস-সন্তান গুলির প্রতি যেমনই অশ্রদ্ধা থাকুক না কেন তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যদি বলিয়া ফেলিলে "আমার ভাল লাগে নাই"—আর যাও কোথায়! সকলে রাগিয়া খুন—স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যায় আর কি! যদি আবার কুগ্রহবশতঃ কথাগুলি কোন দলপতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে, আর যদি সে স্থানে শিষ্যগণ উপস্থিত থাকেন, তবে আর রক্ষা নাই! চার দিক হইতে চোনা পুটী সকলেই অমনি ছেঁকা বেকা করিয়া ধরিলেন—এবং মূর্খ, পাগল, নির্ব্বোধ ইত্যাদি নানারূপ সুরুচিসম্পন্ন ভব্যিযুক্ত সুন্দর ভাবপ্রকাশক শব্দের যোজনা করিতে লাগিলেন। কখন বা ঈষৎ ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি ও নাসিকারন্ধ্রোত্থিত বিকৃত শব্দ দ্বারা, অথবা কনুই দিয়া আপনাপনির মধ্যে ঠেস মারিয়া জনসাধারণকে সুরুচির চরমাদর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন; কখন বা নিজের মহত্ত্ব-জ্ঞানের উচ্চ শিখর হইতে বলিয়া বসিলেন "ও সকল কথা তুমি বুঝিবে কি করিয়া!"

সুরুচি ও ভব্যতা বিরুদ্ধ আচারের উপর ইহাদের আন্তরিক বিদ্বেষ। ভালবাসা ইহাদের সাহিত্যের একমাত্র মূল স্তম্ভ! তবে বিদ্রূপ ও কটাক্ষ চলনসহী বিষয় বটে। বলা বাহুল্য যে কটাক্ষ তাঁহাদের বিরোধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া চাই; তাহাতে সত্য থাকুক বা নাই থাকুক তাহাতে বড় বিশেষ কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—ভাষার পারি-পাট্য ও রং চং একটু থাকিলেই হইল!

সংসারে জীবিকা-ধারণের জন্য যে বিষম সংগ্রাম চলিতেছে—দরিদ্রজনেদের শুদ্ধ দেহ ও আত্মা একত্র রাখিবার জন্য অহরহ কি দুর্ব্বিসহ সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তাহার মহত্ত্ব ইহাদের চক্ষে প্রবেশ করে না। ইহারা প্রেমেই জগতের সর্ব্ব বিষয়ের অবসান দেখেন। কিন্তু উদর পূর্ণ না করিয়া প্রেম করা কিরূপ তাহার বিন্দুমাত্র আভাষ যদি তাঁহাদের মানস-চক্ষের নিকট পরিজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে প্রেম প্রেম করিয়া এতটা হাঁক ডাক ছাড়া আমার বোধ হয় অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইত। ইহাদের মস্তিষ্কে এ কথাটি

প্রবেশ করে না যে, এই অনন্ত-বিস্তৃত বিশ্বে সকল বিষয়েরই যথাযথ স্থান আছে—প্রেমেরও একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, এবং তাহা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা বোধ হয় কেহই বলিতে চাহিবেন না। তবে যিনি যত বড় লোকই হউন না কেন তাঁহার প্রকৃত মহত্ব থাকিলে, তাঁহাকে জগতের পাতা বিধাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া বৃথা তোষামোদ বাক্যে কিছুতেই তিনি পরিতুষ্ট হন না, বরং বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ব্যক্তিকে অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বারা সমাদৃত করিয়া বিদায় দিতে অনুচর-বর্গকে অনুমতি করেন। প্রেম সম্বন্ধেও তাই—প্রেম-দেবী এইরূপ অযথা সম্মানে কাহাকেও বর পুত্র করিবেন এরূপ আশা করিলেও প্রায় পূর্ব্বোক্তরূপই ফল হইয়া থাকে!

শ্রীবরথাস্তী উমেদার।

প্ল্যাঞ্চেট্।

পরকালে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু লোকান্তরিত আত্মার সহিত যে ইহলোকে দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয় ইহাতে আমার তাদৃশ বিশ্বাস নাই।

কিন্তু কিছু দিন হইল কয়েকটী ভদ্র লোকের অনুরোধে আমি ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অতি বিস্ময়ের সহিত বলিতেছি আমি যে দিন হইতে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি সেই দিন হইতেই অতি বিস্ময়কর ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি। এতাবৎ কাল প্ল্যাঞ্চেটে বসিয়া যতগুলি লোকান্তরিত আত্মার সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক। তাঁহাদের উপদেশে বোধ হয় জগতে একেশ্বর বাদ প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের মহান ব্রত। আমি বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় যে কয়েকটী কবিতা পাঠাইয়া দিলাম তাহা দেখিলেই তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে। তাঁহাদের উচ্চ সারগর্ভ উপদেশ কবিতার আকারে আমারই হাত দিয়া বাহির হইয়াছিল। যখন এই গুলি বাহির হয় তখন আমি স্থির মনে সহকারি এক বালকের সহিত প্ল্যাঞ্চেটে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া বসিয়াছিলাম। বালকটীর বয়স নিতান্ত অল্প এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলায় আদৌ দখল নাই বলিলেই হয়। যখন অক্ষর বাহির হইতেছিল তখন আমি অন্যমনস্ক অর্থাৎ ঈশ্বরে মন সমাধান করিয়াছিলাম। আমি কোনও রূপে বুঝিতে পারিলাম না, কিরূপে এইরূপ সুন্দর কবিতা আমার হাত দিয়া বাহির হইল। আত্মার আবেগ বা অন্য কোন কারণে এইরূপ কবিতা বাহির হইতেছে তৎকালে এইরূপ সংশয়ও আমার হইতেছিল। কিন্তু যখন প্রশ্ন করিলাম আপনার উপদেশে কৃতার্থ হইলাম এখন স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমার সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিন। প্রত্যুত্তরে জানিতে পারিলাম সময়ান্তরে এবং স্থানান্তরে প্রত্যক্ষ হইবেন। পরক্ষণেই যেন আমার সংশয় করিবার জন্যই সেই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন গৃহে বড় ও ছোট

আঁইস, গাছের শিকড় ও ঘসা চন্দনকে ফেলিয়া দিয়া কোথা হইতে এই গুলি উপইল জানি না, কিন্তু এই গুলি পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমি এই রহস্যের ভদ্র কিছুই করিতে পারি নাই, কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে তাহাই লিখিলাম। এতদ্ব্যতীত সব বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছে ভবিষ্যতে তাহাও লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহেমচন্দ্র শর্ম্মা।

কেন মিছা মিছি মায়াঘোরে ভ্রম মন এ সংসার-কাননে মন চল রে শান্তি নিকেতন।
এসেছিস্ তুই বিদেশে কেউ নাই তোর এদেশে চল সেই দেশে যে দেশে বিরাজেন
নিত্য নিরাঞ্জন॥
অনিত্য সংসারে জন্ম করিয়ে গ্রহণ প্রমত্ত বারণ মত করিছ ভ্রমণ মানুষ হইতে যদি
ইচ্ছা যায় মন ভক্তিভরে ভাব সেই সত্য সনাতন॥

শান্তি কর মন বিভুপ্রেম বসে ও মন একান্তে বসে।

Go wiser thou and in thy scale of sense
Weigh thy opinion against Providence,
All imperfections what thou fanciest such;
say, here he gives
Too little; there too much in pride: in reasoning
pride your error lies.
All quit their spheres and rush into the skies
Pride still is aiming at the blest abodes,
Men would be angels, angels would be Gods.

Life must not run away.
Death is not form's last
It is a dark opinion of yours, is too confin'd
Else whom this Hope and Terror of the mind.
Does something and somewhere yet remain
—Reward or punishment.
—Delight or pain.
Amid two seas on one small point of land,
Amazed you stand.

এ কাল ও এ কালের মেয়ে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে আমরা কখনই সম্পূর্ণ সুখ উপলব্ধি করি ন. কালের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনায় আমরা প্রকৃত সুখ অনুভব করি। কিন্তু ব সুখী হওয়া দূরে থাকুক প্রায় সকলেই নিজ নিজ অবস্থা অপ্রীতিজনক বোধ করিয়া থা অতীত কালের স্মৃতিতে কাঁটা খোঁচা নাই, ভবিষ্যতের কল্পনায় নিগড় নাই। সম পরিবর্ত্তনে অতীতের আশপাশের ঝঞ্ঝাট চলিয়া যায়—থাকে শুধু সুখময় স্মৃতিটুকু। বৎসর শরতের জ্যোৎস্নায়, বসন্তের বাতাসে, বৈশাখি বেল জুঁই-এর গন্ধে, পরিতৃপ্ত হইয়া ভাবি, পূর্ব্বে যেমন ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না হইত—কই তেমন তো আর এখন হয় না! বসন্তে বৎসর বসন্ত নাই—এ তো শীত—বেল ফুলে গন্ধ নাই—মালীরা কুঁড়ি তুলে মালা গেঁথেছে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি—বাতাসটী মন্দ নহে—ঢেউগুলি বেশ—কিন্তু শরীরটা ভাল ন এত জল হাওয়া লাগলো, তাইতো! কিন্তু আজ আর সে সকল কিছুই মনে নাই—ম আছে শুধু গঙ্গার ধারটুকু—তাহার ঢেউগুলি, মৃদুমন্দ বাতাস—মোহময় জ্যোৎস্না।

পাল্সীতে ঢেউ লাগায়—সে দিন মাথা ঘোরায় যে কত কষ্ট হইয়াছিল—তাহা মনে নাই—মনে আছে সেই মাঝির গান—সেই দাঁড়ের ঝুপ ঝুপ শব্দ। অসুখ-কর স্মৃতি থাকে না? থাকে, কিন্তু তাহা তীব্রভাবে থাকে না;—অথবা আমরা মনুষ্য জাতি, তাহাদে সমাদরে স্থান দান করিতে চাহি না। আমাদের প্রিয়তমের রুগ্ন শয্যায় যখন আমরা তাহার সেবা করি, তখন আমরা কখনই মনে আনিতে পারি না যে, সে বিনা আমরা জীবিত থাকিতে পারি! কিন্তু, আশ্চর্য্য এই যে সে চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে আর সে দুঃখের তীব্রতা থাকে না—মৃতকে বিস্মৃত হই—অন্ততঃ হইতে চেষ্টা করি। কিন্তু সুখের স্মৃতি জ্বলন্ত ভাবে আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, স্মৃতিতেই আমরা প্রকৃত সুখানুভব করি। সুখের স্মৃতিকে আমরা অতি যত্নে আদরে পোষণ করি, বার বার তাহা স্মরণ করি, বার বার তাহার উল্লেখ করি। রুগ্ন শয্যায় সে যে কত কষ্ট পাইয়াছিল—তাহা মনে আনি না—কত যে মিষ্ট কথা কহিত তাহাই মনে মনে শতবার আন্দোলন করিয়া থাকি।

এই বর্ত্তমানের স্বাভাবিক অসন্তোষের ফলেই বোধ হয় আজকাল বঙ্গসমাজের একদল মানব এক দলের মেয়ের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট। তাঁহারা সেকালের মেয়েদের প্রভূত প্রশংসা ও এ কালের মেয়েদের যথোচিত নিন্দা করিয়া দিন রাত খুঁৎ খুঁৎ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, এ কালের মেয়েরা অতিশয় বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে, কোন কাজ কর্ম্ম করে না, কেবল বিছানায় শুইয়া নভেল পড়ে, চেয়ারে বসিয়া কাপেট বুনে। কেহ বলেন, বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া মেয়েরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, বিনা পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হওয়াতে স্বামীর উপার্জ্জিত অধিকাংশ ধনই ডাক্তারের ঘরে যায়। ছেলেরা দাসদাসীর দ্বারায়

তিপালিত হওয়াতে তাহারাও অনিয়ম ও অযত্নে রুগ্ন ও অসৎচরিত্র হয়। কেহ লেন, শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে এ কালের মেয়েরা ভক্তি করেন না; তিথি অভ্যাগতদের যত্ন করেন না, ছেলেপিলেকে স্নেহ করেন না। তাঁহারা বলেন, সমস্তই লেখা পড়ার দোষ—লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েরা বিবি হইয়াছেন, তাহাদের লেখা পড়া শেখান উচিত নহে। এইরূপ নানা জনে নানাবিধ দোষ দেখাইয়া রিশেষে উপসংহারে বলেন যে এখন গার্হস্থ সুখ চলিয়া গিয়াছে—দাম্পত্য প্রেম নাই, াতৃস্নেহ নাই—বেচারি পুরুষদের মহা কষ্ট। তাঁহারা প্রাণপণে যে পরিবারের জন্য ধন পার্জ্জন করেন, সে পারিবারিক সুখ তাঁহার তিলমাত্র নাই, কেবল জ্বালাতন। অভাব কিছুতেই ঘোচে না। কেবল টাকা নাই, টাকা নাই! স্ত্রী-শিক্ষার দোষেই তো এত অভাব। গৃহিণীর বিবিয়ানার খরচ চাই, ডাক্তার খরচ চাই, দাসদাসী চাই, রাঁধুনী চাই—যাহা হউক এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এ কালের প্রবলা অবলারা, বেচারী পুরুষদের অভিযোগ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

এ কালের মহিলাদের অভিযোগকারীগণ কহেন, সে কালে এত দাস দাসী রাখা প্রথা ছিল না—মহিলারা নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিতেন, নিজ হস্তে অন্য অন্য কাজ কর্ম্ম সকলই নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু এ কালের মেয়েদের দাস দাসী নহিলে চলে না। তাঁহারা হাত ময়লার ভয়ে পান সাজেন না, দুর্গন্ধ বলিয়া গোময়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

সত্য বটে এ কালের মেয়েরা কতক পরিমাণে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পান সাজিতে বসিয়া কাপড়ময় চুণ খয়েরের হাত মুছিতে রাজী নহেন, তাঁহারা ভাতের হাঁড়ির কালী, ও ব্যঞ্জনের হলুদে হস্ত-রঞ্জিত করিতে নারাজ। পূর্ব্ব-প্রচলিত নিয়ম আছে যে রন্ধনকারিণী হাত মুখ ধুইয়া, পরিধান বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া তবে পরিবেশনে যাইতেন। এ নিয়ম যত পালন হউক বা না হউক সে কালের মহিলারা গামছার কার্য্য সমস্তই নিজ পরিধান বস্ত্রে সারিয়া লইতেন। এ কালের মেয়েরা পরিচ্ছন্ন হওয়াতে যাহাতে হাত অপরিষ্কার না হয় তাহার উপায় করেন, তাঁহারা হাত মুছিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন।

সেকালে তেল মাখিয়া স্নান করা পদ্ধতি ছিল, কিন্তু আজকাল সাবান মাখিয়া স্নান প্রচলিত হইয়াছে—চারিদিকে সাবান ছড়াছড়ি হওয়াতে সকলেই তাহা ব্যবহার করেন—মহিলারাও অবশ্য ব্যবহার করেন। কিন্তু যে সকল প্রভুরা দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলুন দেখি যে তাঁহারাই কি আপিসের ফেরত সাবান, চিরুণি, পাউডার কিনিয়া আনিয়া গৃহলক্ষ্মীকে প্রলোভিত ও প্রফুল্লিত করেন কি না? বাস্তবিক যদি বিজাতীয় বিলাস দ্রব্য ব্যবহার, ও বিজাতীয় অনুকরণ বঙ্গীয় পুরুষদিগের অনুমোদিত না হইত, তাহা হইলে কি বঙ্গীয় রমণীগণ তাহা ব্যবহার করিতেন—না তাহা ব্যবহার করিতে

সাহস পাইতেন। যাহা হউক তা বলিয়া কি একালে যাঁহার রাঁধুনি রাখিবার ক্ষমতা নাই; তিনি কি বাজার হইতে ভাত কিনিয়া খাইয়া থাকেন? না তিনি নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া আহার করেন? তাঁহার স্ত্রী বা মাতা রন্ধন করিয়া দেন না তো কে দেয়? প্রায়ই শোনা যায় বউ রাঁধে না; বুড়ো শাশুড়িকে দিয়ে রাঁধায়। কিন্তু সেটা এমনিই কি দোষের? বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থের সকলের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই শাশুড়িকে রাঁধিতে সচরাচর দেখা যায়—এবং শাশুড়ি বা মাতা ইচ্ছাপূর্ব্বক রন্ধনের ভার লইয়া থাকেন। তবে কন্যাকে রন্ধন ভার হইতে মুক্ত করিয়া মাতা তাঁহাকে খোঁটা দেন না, কিন্তু শাশুড়ি এবং তাঁহার আত্মীয়ারা বধূকে দুই এক কথা না শোনাইয়া থাকিতে পারেন না।

আমাদের দেশে হিন্দু বিধবারা প্রায় সকলেই সহস্তে পাক করিয়া খাইয়া থাকেন। এমন স্থলে যখন তাঁহার নিজের জন্য রাঁধিতেই হইল, তখন তাহার উপর আরও দু'চার জনের রাঁধিতে কিছু কষ্ট হয় না। বিশেষ গার্হস্থ্যের অন্য অন্য কার্য্যের তুলনায় বসিয়া বসিয়া রন্ধন করাই প্রাচীনাদের পক্ষে অল্প কষ্টকর। কারণ প্রাচীন অবস্থায় নড়া চড়া স্বাভাবিক নহে। ছোট ছোট সন্তানাদি লইয়া ব্যস্ত হইতেও হয় না। অনেক স্থলে শাশুড়ি নিরামিষ রাঁধিলেন, বৌ একটু মাছ রাঁধিয়া লইলেন। নিতান্ত যদি বৌ ছেলে পিলে লইয়া বিব্রত থাকেন তো শাশুড়িই মাছ রাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলেন। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বয়োবৃদ্ধির সহিত সকল স্ত্রীলোকেরই রন্ধনে পটুতা জন্মে। বাস্তবিক পাক-প্রণালী পাঠ করিয়া ওজন করিয়া প্রত্যেক তরকারী রাঁধিতে হইলে দিনান্তে আহার জোটা ভার। সুতরাং বধূ হইতে শাশুড়ির রান্না উত্তম হওয়ায় এবং রন্ধন কৌশলাদি জানা থাকাতে অল্প খরচে হওয়ায় শাশুড়ির উপর রন্ধন ভার থাকা গৃহস্থেরও সুবিধা এবং মঙ্গল। শাশুড়ি নিজ পুত্র পৌত্রের জন্য রাঁধিতে কিছু ক্লেশ বোধ করেন না। তারপর, যাঁহার ঘরে রাঁধুনী আছে, এমন মহিলারাও কি রান্না হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন! বাবুর সখের খাবার, ছেলেদের খলখাবার—এ সকলি তো প্রায় তাঁহাদের নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতে হয়!

এই কলিকাতায় রাঁধুনী বা দাস দাসী সহজে পাওয়া যায় বলিয়া এখন প্রায় সকলেই দাস দাসী রাখিয়া থাকেন। বিশেষ অন্ততঃ একটী দাসী না রাখিলে কলিকাতায় বঙ্গকুলবধূর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। কলিকাতায় বাড়ির চৌকাঠের বাহিরে কুলবধূর পা বাড়াইবার যো নাই, কোন লোক বাড়িতে আসিলে স্বামী পুত্রের অনুপস্থিতিতে কথা কহিবার কেহ নাই। কলিকাতায় একটী দাসী ভিন্ন বাস করা যে কত অসুবিধা তাহা যাঁহাদের দাসদাসী নাই, তাঁহারাই অনুভব করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে দাসদাসীর তত আবশ্যক হয় না—পল্লীগ্রামে মহিলাদিগের কতকটা স্বাধীনতা থাকে, এবং বাটিতেও নিতান্ত পরিচিতেরাই সচরাচর হামেষা থাকে—তাঁহাদের সাম্‌নে যাওয়া ও স্পষ্ট

না হউক ইঙ্গিতেও কথা কহা চলে। অথবা আবশ্যক স্থলে খিড়কী দ্বার দিয়া বাহির হইতে পাড়ার মাসী পিসী, বা ভাইপো ভাইঝিকেও আনিয়া হাজীর করা চলে। পল্লীগ্রামে দাস দাসী পাওয়াও সুকঠিন। জমীদার বা গ্রামের ধনী ব্যক্তিও অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া দাস দাসী পাইয়া থাকেন। সেখানে সকলেই প্রায় গৃহস্থ ও চাষী লোক! তাহারা নিজের ঘরে খাটে খোটে পরের দুয়ারে যায় না। পরের দুয়ারে যাইতে হইলেই কলিকাতায় চলিয়া আসে—কারণ রাজধানীতে কাজ মিলিবেই। কলিকাতায় দাসদাসী সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া এবং আবশ্যকও অধিক বলিয়া এখানে সকলে প্রয়োজনানুসারে ক্ষমতানুসারে দাসদাসী রাখিয়া থাকেন। একটা রাঁধুনীর অসুখ হইলে সহজেই যদি আর একটা পাওয়া যায় তবে কেনই বা কষ্ট স্বীকার করিবে? সকলেই তো সকল বিষয়ে দেখিতেছেন যে হাতের কাছে উপায় থাকিতে কেহ কষ্ট করিতে চাহেন না। ট্রাম হওয়াতে ইতর ভদ্র সকলেই ট্রামে উঠিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা চিরদিন হাঁটিয়া দলে দলে কালীঘাট যাতায়াত করিত; এখন তাহাদের মধ্যে কয়জন হাঁটিবার কষ্ট স্বীকার করে? এখন সাদা ফুলের মালা গলায়, কপালে সিন্দুর, কোলে ছেলে, মাথায় বোঝা, পরিশ্রান্ত পদাতিক যাত্রী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেলা দুই প্রহরের সময় কালীঘাটের ফেরত ট্রামে যাত্রী বোঝাই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ একান্নবর্ত্তী প্রথা উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া দাসদাসীর আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেকালে একজন রাঁধিতে গেলেন, এক জন বাড়ির সকল ছেলেগুলি একত্র করিয়া ভাত খাওয়াইতে গেলেন। তখন এড়া ভাত খাওয়া ছেলেদের একটা পদ্ধতি ছিল—তখন প্রায়ই কর্ত্তারা প্রাতে উঠিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন বা দেখিতেন, দ্বিপ্রহরে বাটি আসিয়া স্নানাহ্নিক ও আহারাদি করিতেন। তাহাতে ২।৩ টার কম পুরুষদেরই আহার হইত না। সুতরাং রন্ধনকারিণী কিছু দশটার পূর্ব্বে রান্নাঘরে যাইতেন না। তাই জন্য নিয়ম ছিল একজন সকল ছেলে-গুলিকে একত্র করিয়া "চড়িভাতীর" মত দুই একটি ব্যঞ্জন ও ভাত রাঁধিয়া আহার করাইতেন। ইহাতে স্নানের বা শুচির বিশেষ আবশ্যক ছিল না—সকল দিন রন্ধন করাও হইত না—এক এক দিন গ্রীষ্মকালে চাহি কি পান্তা ভাতও খাওয়ান হইত। তাই এই ভাতের নাম "এড়াভাত" বা "বাসীভাত"। সেকালে বহুপরিবার একত্রে থাকায় আজ ইনি, কাল উনি এইরূপ পালা করিয়া রাঁধা হইত, সুতরাং সকলেই সকলের নিকট কোন না কোন বিষয়ে সাহায্য পাওয়াতে তাদৃশ ক্লেশানুভব করিতেন না। কিন্তু কখন সকলেই প্রায় পৃথক হওয়াতে, রোগে, শোকে, অন্তঃস্বত্বাবস্থায় ও শিশুসন্তান গুলিকে লইয়া প্রত্যেককেই এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় যে দাসদাসী না রাখিলে চলে না। অনেক নির্ব্বিরোধী প্রভু কহিবেন যে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ারওতো ঐ বৌ বৌ ঝকড়াই কারণ। একান্নবর্ত্তী প্রথা আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র কথা আসিয়া পড়ে, সুতরাং এখানে

তাহার বিশেষ-রূপে আলোচনা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। পৃথক রহিবার একটী প্রধান কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজ রাজত্বে কাশী যাইতে হইলে আর উইল করিয়া যাইতে হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বল্প আয়াসে অল্প খরচে বহু দূরদেশে যাতায়াত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যান। সুতরাং ঝগড়া ঝাঁটী না হইলেও পৃথক থাকা হয়—সেকালে বিদেশে নিজ প্রাণ রক্ষাই দুষ্কর ছিল, সুতরাং কেহই কর্ম্মস্থানে নিজ স্ত্রী পুত্র লইয়া যাইতে পারিতেন না। দূরত্বানুসারে কেহ সপ্তাহে কেহ মাসান্তে, কেহ বৎসরান্তে বাটি যাইতেন। কেহ বা দশ বিশ বৎসর উপার্জ্জন করিয়া একেবারে বাটী ফিরিতেন। সুতরাং তখন এক কর্ত্তার অধীনে বহু পরিবার প্রতিপালিত হইত। সময়ানুসারে একান্নবর্ত্তী প্রথার আবশ্যকতা ছিল, এই জন্য সকলেই কিছুই না কিছু কষ্ট সহ্য করিতেন। স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা সকলেই পরস্পরে পরস্পরের কাছাকাছি থাকিতে চাহে। এখন রেলের গাড়ি হওয়াতে যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার কাছাকাছি পল্লিগ্রামে যাঁহাদের বাটী, সকলেই জানেন যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পরিবার নিজ গ্রামে থাকেন তাঁহারা প্রায়ই কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন না। তাঁহাদের ভিন্ন খরচ করিয়া থাকিতে যে অতিরিক্ত খরচ হয়, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে রেলওয়ে কোম্পানিকে দিয়া থাকেন। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া স্নেহপূর্ণ গৃহে তাঁহারা সে আরাম পাইয়া থাকেন তাহা কলিকাতার বাসায় পান না,—তাই জন্য তাঁহারা নিজে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও বাটী হইতে যাতায়াত করেন।

যাহা হউক একালের মেয়েরা যে শুদ্ধ কার্য্যাক্ষম বলিয়া দাসদাসী রাখা হয় এমন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সেকালে ছেলেরা প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, পাড়ার পাঁচ সাতটী ছেলে একত্রে পাঠশালায় হাজীর হইত—দ্বিপ্রহরে বাড়ি আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিত। কিন্তু একালের ভিন্ন প্রথা—বেলা নয়টার সময় যেমন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বাড়ির কর্ত্তাকে আপিস যাইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতে হয়—তেমনি ছেলেদেরও স্কুলের তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়। এখন "পাঠশালা' পরিবর্ত্তন হইয়া যেমন "স্কুল" হইয়াছে, তেমনি বেশভূষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জামা, জুতা, ছাতা, কত কি চাহি। অনেক সময় জুতা অভাবে স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেকালে গৃহস্থ-বালকের মধ্যে কয়জন বারমাস জুতা ব্যবহার করিতে পাইত? পাল পার্ব্বণে পোষাকি কাপড়ের মত অধিকাংশের মাঝে মাঝে হয়ত জুতা আবশ্যক হইত। সেকালে যে যাহার পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিত—একালে, কি কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ কি অন্য শ্রেণীর লোক, সকলেই স্কুল আপিস যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে। এই সকল স্কুল আপিসের হাঙ্গামায় গৃহিণী ধীর ভাবে রন্ধনাদি করিবে, না সকলকে আবশ্যকীয় ভাবে গুছাইয়া দিবে। আর এই তাড়াতাড়িতে কি রন্ধনই

ভাল হয়? না, সকল রকম ব্যঞ্জন হইয়া উঠে? মাছের ঝোল ভাত হয় তো ঢের। তাও বাজার আনিতে বিলম্ব সহে না, প্রায়ই বাসী মাছ রাখা হয়। প্রভাতে উঠিয়া, কয়লার উনানে আগুণ দিয়া স্নান সমাপান্তে ভাত না চড়াইতে "দাও দাও" শব্দ। কর্ত্তা, ভাত দাও দাও, চিৎকার করিতেছেন; আপিসে জরিমানার ভয়। বড় ছেলে নূতন অ্যাপ্রেণ্টিস্ ত্রাহি মধুসূদন—ভাতের জন্য বুঝি নাম কাটা যায়। মধ্যম 'স্কুলের বেলা হোল একটু সকাল সকাল না গেলে পড়া শুনতে পাব না'। তৃতীয়, 'মাষ্টার মারবেন'। চতুর্থ 'খিদে পেয়েছে,' করিয়া আঁচলধরিয়া ঝুলিতেছে—কোলের খুকিটী একাকী পড়িয়া দুগ্ধ অভাবে ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছে। কে কাহাকে দেখে!—এমন অবস্থায় যে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা যাঁহারা কখনো এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন।

একালের মেয়ে একালেরই উপযোগী। দোষেই হোক্ আর গুণেই হোক্ একালের মেয়ে, সেকালের মেয়ের মত হইলে কি একাল চলে? শুধু শাকের ঘণ্ট মোচার ঘণ্ট রাঁধিতে জানিলে একালে আর মান সম্ভ্রম নাই। পাঁঠার বড়া বড়ি চচ্চড়ি কে কত রকম জানেন, তাহারই এখন সকলে খবর লইয়া থাকেন। শাদা ভাতের মান নাই—হলুদে ভাত রাঁধিতে জানা চাহি। "পিড়া আলপানা" "ছাঁচ কাটা" "কাঁথা শিয়ান" এখন আর শিল্পের মধ্যে গণ্য নহে। আর তাহা বাস্তবিকই এত সহজ যে একালের মেয়েদের পক্ষে তাহা কষ্টকর নহে। একালের মেয়েরা "পিড়া আলপানা", "কাঁথা শিয়ান" স্বত্ত্বেও অতি সুন্দর সুন্দর নানাবিধ শিল্প ও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন। সেকালের মেয়েরা অবকাশ পাইলেই গল্প করিতে বসিতেন—গল্পটা কিরূপ তাহা বোধ হয় বেশি বলিতে হইবে না, সেই গল্পের অধিকাংশই যে পরনিন্দায় পূর্ণ সে বিষয়ে হলপ করা যাইতে পারে। একালে একটু লেখা পড়া জানা থাকাতে, এবং বঙ্গভাষায় অনেক গুলি পাঠ্য পুস্তক হওয়াতে কেবল পরনিন্দা করিয়া সময় কাটাইতে তাঁহাদের আবশ্যকও হয় না প্রবৃত্তিও হয় না। পাড়ার বামন পিসী কায়েত মাসীকে একটু লুণ, চারটী চাল দিয়া, ভাব সাব রাখিয়া আবশ্যকমত সময় কাটাইবার খোরাক যোগাড় করিতে একালের মেয়েরা ব্যস্ত হয়েন না। ধনী মহিলারা দাসী বেষ্টিত হইয়া নিজ প্রশংসা, ও পরনিন্দা শ্রবণ করা অপেক্ষা নভেল পাঠ করিয়া, কার্পেট বুনিয়া সময় কাটান গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন। একালের মেয়েরা কিছু গর্ব্বিতা, একালের মেয়ে নিজ মনোদুঃখ বা সাংসারিক অভাব বা স্বামী পুত্রের নিন্দাবাদ যাহার তাহার কাছে করেন না। নিতান্ত সখ্যতা বা আত্মীয়তা না থাকিলে, সকল পেটের কথা খুলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তৃপ্তিলাভ করা, একালের মেয়েরা পসন্দ করেন না। তাঁহারা বইখানি, কার্পেট টুকু, নিজের স্বামী পুত্র লইয়া দিনযাপন করিতে বা একেলা থাকিতে কষ্ট বোধ করেন না। সুতরাং—পরনিন্দার হাতে ততটা আত্ম-সমর্পণ করিতে হয় না। ধনীর গৃহ ব্যতীত কয়জন গৃহস্থ মহিলা বিছানায় পড়িয়া দিন কাটাইতে সময় পাইয়া থাকেন, তাহা আমরা

তো বুঝিতে পারি না—এবং জানিও না। রন্ধন বা বাসনমাজা ব্যতীত কত কাজ আছে গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের সহস্তে সে সকলই সম্পন্ন করিতে হয়। বিছানায় পড়িয়া যে তাঁহারা অসুস্থতা টানিয়া আনেন ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায় দোষারোপ করা হয়। পল্লীগ্রাম যে এদানিক ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা তো আলস্যের ফলে নহে। তার পর অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করা—সত্য বটে, একালের মেয়েরা অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করেন না। কিন্তু অতিথি কোথায়—কাহাকে যত্ন করিবেন?

সেকালে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে পদব্রজে যাইতে লোকের আতিথ্য আবশ্যক হইত। তখন বহু পরিবারের অন্ন হইতে অনায়াসে দুই এক জনের অন্ন হইত—এবং "আসুন্তি যায়ুন্তি হাঁড়িতে দুটী চাল বেশি ক'রে দাও" বলা হইত। কিন্তু আজ কাল রেলওয়ের কল্যাণে কে কাহার দুয়ারে যায়? সুতরাং কাল-ধর্ম্মে অতিথির অভাবে আতিথ্যের ভাবও ঘুচিয়া যাইতেছে। আর কি এখন কেহ পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে চটি দেখিতে পান? সেকালে প্রতি ক্রোশে চটি—প্রতি পাঁচ ক্রোশ অন্তরে সরাই থাকিত। চটিতে মুদিনী সে কি দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য বা পরকালের ফল ভোগের জন্য অতিথিদের যত্ন করিত, ও বিশ্বাস বোধ হয় কাহারো নাই। এখন রেলওয়ে ষ্টেসনে লুচি কচুরি মোণ্ডা মেঠাই দুগ্ধ ফল প্রভৃতি সকল জাতিরই আবশ্যকীয় সকল রকম খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলেই উপাদান হয়। মনাজের যখন যেরূপ আবশ্যক, তখন সেইরূপ পাওয়া যাইবেই। নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই সকলেই আবার পরস্পরে পরস্পরের আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। আজ আমার ঘরে অতিথি এল, আমি আজ সেবা যত্ন না করলে, তারা আমাদের আবার করবে এখন—এই স্বার্থটুকু মনের এক প্রান্তে লুকাইত থাকিতই। এখন তোমারও দরকার নাই, আমারও দরকার নাই—অতিথিও নাই, আতিথ্যও নাই।

এ কালের মেয়েদের রুচি এখন সেকাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াছে। সে কালের বাউটি পৈঁছার আর এখন আদর নাই। "কলসীর কাণার" মত বাউটী পরিয়া নিমন্ত্রণ সভায় গেলে আর কেহ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে না। "অমুক বোস্ অমন কোরে বেড়ায় বটে,—কিন্তু দেখেছিস্ ভাই মিন্‌সের পয়সা আছে—নইলে গিন্নীকে অমন কলসীর কাণার মত বাউটী দিতে পারে!" কথাগুলি সঙ্গিনীকে যদিও যথা সাধ্য চুপি চুপি বলা হইল বটে, কিন্তু বাউটী ধারিণীর কাণে তাহা পৌঁছিল। তিনিও প্রফুল্ল মনে, গৌরব নেত্রে বাউটী সমালোচনাকারিণীর দিকে কটাক্ষ করিয়া "ঠিক বলেছ" ভাবটী প্রকাশ করা এখন আর কেহ গৌরবের বিবেচনা করেন না।

এক ঝুড়ি সুতায় গাঁথা সোণার নুড়ি, ঢিল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, লম্বা, চওড়া পদার্থ—নারকেল ফুল, মাদুলি, রুসণো, মরদানা, যবদানা নামে অভিহিত করিয়া, এবং তাহাদের সোণার কলসীর কাণায় সুকোমল বাহু আচ্ছাদন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী হরণ করা এ কালের মেয়েরা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন না। এবং "আমার একখানি বেণা-

রসী সাড়ী আছে গো" দেখাইবার মত। একটী বার বেণারসী সাড়ি পরিয়া নিমন্ত্রণ স্থলে উপস্থিত হইয়া, অসহ্য গরমে শ্রান্ত হইয়া "১২৫৲ টাকার সাড়ি, খাসা! একবার পরেই কি মাটি করিব" এই কথা বার বার দাসীকে বলিয়া ও আস পাশের শুভ্র সাড়িধারিণীদের শুনাইয়া কাপড় খানি সন্তর্পণে ছাড়িয়া রাখা তাঁহারা হাস্যজনক বিবেচনা করেন না।

পরিপাটী ও সুশ্রী দেখাইবার জন্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করা—বস্ত্র অলঙ্কারে যদি তাহা বিনষ্টই হইল, তবে তাহাতে আবশ্যক কি। একালে অলঙ্কার সকল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে—অলঙ্কারের কারুকার্য্য এখন নজরে পড়ে—মূল্যে লাঘবতায় তাহার হানহানী হয় না। মূল্যের সমষ্টি ট্যারচা; চৌখোপা, বেণারসী, আলমারি বাক্সে পোকা ধরিতেছে।

শুভ্র বস্ত্রের আদর আজকাল অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কণে বধূদেরই বেণারসী সাড়ী ব্যবহার করান হইয়া থাকে। ঢাকার গুলবাহার পঞ্চম পেড়ে, কেবল মাত্র আইবড় ভাতে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া থাকে। এখন সুন্দর সুন্দর পাড়ের ঢাকাই সাড়ি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। লজ্জাহীনা বলিয়া এ কালের মেয়েদের একটী দুর্নাম রটনা করা হইয়া থাকে। যদিও একালে ঘোমটা দেওয়া পদ্ধতিটা কিয়ৎ পরিমাণে কম দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন মহিলাই বিনা আচ্ছাদনে নীলাম্বরী সাড়ি পরিধান করেন না। একালে বরঞ্চ বঙ্গমহিলাদের পরিচ্ছদে লজ্জাশীলতা এবং সুরুচি পরিচায়ক।

সকলেই জানেন যে বাঙ্গালী মেয়ের "যজ্ঞি" কি এক বিষম ব্যাপার। ৫০ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে ২০০ শত জনের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে হয়। অনেক সময়ে লুচি সন্দেশ বাঁধিবার বাহুল্যতায় এত অধিক পরিমাণে খাদ্য মজুত রাখিয়াও নিমন্ত্রণ-কারিণীকে অপ্রতিভ হইতে হয়। এই কুপ্রথা এ কালের মেয়েরা অতিশয় ঘৃণা করেন। আজ কাল যে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নহে। তবে ধনীদের কথা দূরে থাকুক অধিকাংশ গৃহস্থ মহিলাও সেকালের মত আহার স্থলে উপবেশন করিয়াই সরা কয়খানি এবং পাতের লুচি কয়খানি তুলিয়া পশ্চাতে রক্ষা করেন না। এই বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া যে অতিশয় কুপ্রথা এবং অসুবিধা জনক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি!!—ইহাতে পরস্পরকেই কষ্ট পাইতে হয়। আজ তোমার ছেলের ভাতে আমি এক পাল্কি খাদ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইয়া আসিলাম—কাল আমার মেয়ের বিয়েতে তোমাকে তাহার সুদ সমেত বুঝাইয়া দিতে হইল। তবুও প্রত্যেকেই বাঁধিয়া লইতে ছাড়েন না, এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রণকারিণীও অসন্তুষ্ট হইতে ছাড়েন না। এই লজ্জাকর প্রথা এ কালের মেয়ের রুচি অনুসারে বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দারিদ্রাবস্থা না হইলে আর সরা তুলিতে কোন মহিলারই হস্ত অগ্রসর হয় না।

এ কালের মেয়ের স্বামী-ভক্তি লইয়া মাঝে মাঝে বড়ই আন্দোলন হইয়া থাকে। বোধ হয় কোন কোন দুর্ভাগা পুরুষ স্ত্রীর অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আত্মবৎ জগত সংসার

দেখিয়া থাকেন। স্ত্রী পুরুষে অল্প বিস্তর বিবাদ বিসম্বাদ সেকালেও ছিল, একালেও আছে। সেকালের মহিলারা স্বামীদিগকে ভক্তি স্নেহের সহিত ভয়ও করিতেন, এ কালের মেয়ে স্বামীকে ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকেন। "মেয়েলি কথা" "মেয়ে মুখো," "স্ত্রৈণ," প্রভৃতি কথাতে মনে হয় যে সে কালের পুরুষরা মেয়েদের কতকটা হীন ভাবে দেখিতেন। সুতরাং মেয়েরাও কতকটা ভয় করিয়া চলিতেন। সেকালের মেয়েরা স্বামী-নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং স্বামীকেও সকল কথা কহা নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সের পূর্ব্বে স্বামীর সহিত তাঁহাদের বড় একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিত না।

একালে স্বামী স্ত্রীকে কতকটা বন্ধুভাবে দেখেন, সকলকেই নিজ নিজ বাটীতে কর্ত্তৃত্ব করিতে হয় সকলেরই অনেক সময় পরামর্শের আবশ্যক হয়, সুতরাং স্ত্রীই অনেক সময়ে পরামর্শদায়িণী হয়েন। কারণ তাঁহাদের ঘরকন্নার মঙ্গলামঙ্গল ইষ্টানিষ্ট উভয়ের সমান। এই সকল নানা কারণে এ কালের স্বামীকে ততদূর ভয় করেন না বরং তিনিই বাটীর গৃহিণী হওয়াতে স্বামী সদা সর্ব্বদাই তাঁহার যত্ন স্নেহ পাইয়া থাকেন। একালে স্নেহ ভক্তির সহিত ভয় নামক পদার্থটী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাস্তবিক একালে গৃহস্থের মধ্যে দারিদ্র্যতার অতিশয় পীড়ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু এ কালের মেয়ের দোষে তাহা নহে। সেকালে ২৲ টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত এখন ৪৲ টাকার কম এক মণ চাউল পাওয়া যায় না। "যত আনি তত নাই" তাহা এ কালের মেয়ের জন্য নহে—আহার্য্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

ক্রমশঃ—

গহনা।

বিহারীলাল সেন বংশে সম্ভ্রান্ত, স্বভাবে গর্ব্বিত, কিন্তু অবস্থার দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ব্যবসায় ধরিতে হইয়াছে কেরাণীগিরি অর্থাৎ খোসামুদি। এজন্য হাড়ে হাড়ে তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে তাঁহার একমাত্র পুত্রের যাহাতে এরূপ দুর্দ্দশা না ভোগ করিতে হয়, যাহাতে সে মানুষের মত মানুষ হইতে পারে, অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া সিভিলসার্ভিস পরীক্ষা দিতে তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। টাকা কড়ি যাহা কিছু জমাইয়াছিলেন, এই দায়ে সকলি নিঃশেষ হইয়াছে, অথচ এখনো পুত্রকে আরো হাজার টাকা না পাঠাইলে নয়; তাহার পর সে পাশ হয় ত সকল কষ্টের সার্থক, নহিলে ভগবান যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন! বিহারী বাবু কর্জ্জের আশায় কদিন ধরিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের বাড়ী হাঁটিতেছেন, ৫০০ শ টাকা কোন রকমে জুটিয়াছে, আর ৫০০ কোথায় পান? পৈত্রিক সম্পত্তি বসতবাড়ী তাহা পূর্ব্বেই বাঁধা পড়িয়াছে, গহনাপত্র যাহা ছিল তাহাও সব গিয়াছে, এ অবস্থায় ৫০০ শ পাইয়াছেন এই ঢের, আর ৫০০ শ এখন মেলে কি করিয়া? বিহারী বাবু নিরাশ হইয়া রাত্রি নয়টার সময় বাড়ি ফিরিয়াছেন, গৃহিণী বলিলেন—"ওগো হেমার জ্বর ত কই সারছে না; একবার ডাক্তার ডাকাও।"

কর্ত্তা বলিলেন—"একোনাইট দিয়েছিলে, সামান্য জ্বরে আর ডাক্তার ডেকে কি হবে? আরো দু চার দিন দেখা যাক।"

আসল কথা ডাক্তারের পয়সার অনাটন; কিন্তু স্ত্রীর সাক্ষাতেও সে দুঃখের কথা ফুটিয়া বলিতে জিহ্বা সরে না! স্ত্রী মনে মনে ইহা বুঝিলেন—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু পরে বলিলেন—"মাণিকের চিঠি পেয়েছি, ৫০০ শ টাকা পাঠিয়েছে।" এই বলিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠিখানি খুলিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। বিহারী বাবু পড়িলেন।—

"বহব প্রণামা নিবেদনঞ্চ——

দিদি—বুড় বয়সে দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। যদি টাকারি সঙ্গতি নাই, পরের ভিক্ষার উপর নির্ভর, তাহা হইলে ছেলেকে যে বিলাত পাঠান কেন তাহাত বুঝিতে পারি না! আমার নিজের স্ত্রী পুত্র আছে, নানারকম খরচপত্র আছে, তার উপর তোমাদের খরচও চালান আমার সাধ্য নহে, আমি বলিয়া খালাস। তবে সেন মহাশয় আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন—তাঁহার ঋণ আমার পরিশোধ করিতে হয়। এই সঙ্গে সেই জন্য ৫০০ শ টাকা পাঠাইয়া দিতেছি। ইহার বেশী পাঠাইতে আমি বাধ্যও নহি, আমার ক্ষমতাও নাই, পারিবও না। অতএব আমাকে আর রোজ রোজ টাকার জন্য লিখিয়া বিরক্ত করিও না। সেবক শ্রীমাণিকলাল দাস।"

মাণিক গৃহিণীর ছোট ভাই, বিহারী বাবু তাহাকে সন্তানের ন্যায় নিজগৃহে লা
পালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বিবাহ দিয়াছেন, এখন বৎসর কয়েক মা
সে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া কর্ম্মস্থলে গিয়াছে। বিহারী বাবুর এই ক
অবস্থায় আপনা হইতে সে সাহায্যের নামও করে নাই, তাঁহারাও ইহার আগে আ
তাহাকে কিছু বলেন নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এবার গৃহিণী ভ্রাতার নিকট ১০
টাকা কর্জ্জ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

চিঠি পড়িয়া বিহারী বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মর্ম্মে মর্ম্মে অপমানিত জ্ঞা
করিলেন। এ কেবল তাঁহার অপমান নহে—তাঁহার স্ত্রীর অপমান, তাঁহাদের আজীব
স্নেহের অপমান। বিহারী বাবুর গর্ব্বের অনেক খর্ব্ব হইয়াছে, তিনি ঢের সহিয়াছেন
এখনো সহিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয়তার স্থলে, ভালবাসার স্থলে এরূপ অবজ্ঞা, এরূ
অপমান এখনো তিনি অবাধে গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন "টাকা ফিরা
ইয়া দাও, আমি চাহি না।" গৃহিণী বলিলেন,—'সেও কি হয়? ছেলেকে এতদিন টা
পাঠিয়ে আর একটুর জন্য সব মাটি করবে; না হয় দুট কথা বলেছে, অসময় হলে স
সইতে হয়। এ মেলে ত টাকা পাঠাতেই হবে।"

বিহারী বাবু বুলিলেন, কথাটা ঠিক, এ অপমানও তাঁহার সহিয়া চলিতে হইবে,
তিনি নিরুপায়। তিনি নীরবে এই বিষবড়ির উপাদেয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন।
গৃহিণী বলিলেন "যদি ভগবানের ইচ্ছায় পাশ হয় ত সকল দুঃখ ঘুচবে; দুদিন সয়ে যাও।"

বিহারী বাবুর নৈরাশ্যাভিভূত হৃদয় এই সুখের দিনের দিকে উন্মুখ হইয়া
চাহিল, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া চারিদিকে আর কিছুই দেখিতে পাইল না।
তথাপি মাতার আশীর্ব্বাদই ফলিল, অল্পদিনের মধ্যেই খবর আসিল, নলিন সিভিল
সার্ভিসে পাশ হইয়াছে। সে দিন এ বাড়ীতে কি মহানন্দ! খবর পাইয়া বিহারী
বাবু স্ফীত হৃদয়ে ধরাখানাকে সরার মত জ্ঞান করিতে করিতে আফিসে চলিয়া গেলেন।
গৃহিণী সে পরমানন্দ নিজের মধ্যে রাখিবার স্থান না পাইয়া হাতা বেড়ি ছুড়িয়া ফেলিয়া
ছুটিয়া তাঁহার পীড়িতা কন্যার নিকট আগমন করিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা হেম-
প্রভা জ্বরের ঘোরে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় শয্যালগ্ন হইয়াছিল, মা আসিয়া তাহার গায়ে
হাত দিয়া নাড়িয়া বলিলেন,—"হেমা, হেমা তোর দাদা পাশ হয়েছে"। হেমা চমকিয়া
জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময় দৃষ্টিতে মাতার দিকে চাহিল; মা আবার বলিলেন,—"তোমার দাদা
পাশ হয়েছে।" হেমপ্রভার মলিন বিবর্ণ মুখও এই কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে ক্ষীণ
ক্লান্ত স্বরে বলিল,—"দাদা কবে আসবে"? মা বলিলেন,—"শিগ্‌গির"। হেমপ্রভা বলিল,—
"আমিত দেখতে পাব?" আনন্দ-আগ্রহে গৃহিণী এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে হেমার
অসুখ, এই কথায় আত্মস্থ হইয়া সোৎকণ্ঠস্বরে বলিলেন "বালাই, ও কি কথা; দেখতে
পাবি বইকি।"

কিন্তু এবার মাতার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইল; হেমার সহিত তাহার দাদার দেখা হইল
। এ বাড়ীর নূতন সুসংবাদ পুরাতন না হইতে হইতে হেমার ক্ষুদ্র প্রাণ অবসিত হইল।
তা মাতা আনন্দে নিরানন্দ হইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী শোকে মুহ্যমান। বিধাতা তাঁহাকে দুইটি সন্তান দিয়াছিলেন, একটিকে আবার
জের কাছে ডাকিয়া লইলেন, একটি মাত্র অবশিষ্ট। কন্যার শোকে বিহ্বল হইয়া পুত্রের
খের দিকে চাহিয়াই তিনি প্রাণ ধরিয়া আছেন; পুত্রই এখন তাঁহার ধ্যান জ্ঞান।
লিন কবে আসিবে, তাহার বিবাহ দিবেন, বৌ হইবে, নাতিপুতি হইবে, তাহাদের
খস্বচ্ছন্দের মধ্যে তিনি মরিতে পারিবেন, কন্যার শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই সকল
থাই কহেন, ইহাই তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য। একদিন ভাবিনীর মা ভাবিনীকে লইয়া
াঁহাকে দেখিতে আসিল, ভাবিনী হেমপ্রভার সমবয়সী, প্রায়ই তাহার সহিত খেলিতে
াসিত। তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন; মাতা কন্যা সজলনেত্রে
খন তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, তিনি ভাবিনীকে কাছে টানিয়া বলিলেন,—"মাগো
কাকে দেখতে এলি বাছা, সে যে আমাদের ফেলে পালিয়েছে"। ভাবিনী ফুঁপাইয়া
কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী সজলনেত্রে, সতৃষ্ণ আগ্রহে তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া
বলিলেন,—"মা আমার, তুই আমার বুকে আয়, তোকে বুকে করে আমার প্রাণ জুড়োক।
তুই আমার মেয়ে, আমার নলিনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।"

গৃহিণী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

যদিও অনেক দিন হইতে ভাবিনী ও নলিনীর মাতা পরস্পরকে বেয়ান বলিয়া
ডাকিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এতদিন তাহা কেবল রঙ্গের সম্বোধন বা পাতান সম্পর্ক
বলিয়াই গণ্য হইত। পুত্র কন্যার বিবাহের কথা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার পূর্ব্বে কেহই
পাড়েন নাই। ভাবিনীর পিতা মাতা নানাস্থানে পাত্র দেখিতেছিলেন, তবে এ পর্য্যন্ত
একটিও মনের মত পান নাই, তাই ভাবিনী এখনও অবিবাহিতা রহিয়াছে। তাঁহারা
কিছু ধনী নহেন, ইহার উপর এক বিলাত-ফেরত আত্মীয়কে দলে লইয়াছেন—এই জন্য
তাঁহাদের পক্ষে সুপাত্র মেলা একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং বিহারী বাবুর স্ত্রী
যখন নিজে হইতে ভাবিনীকে পুত্রবধূ করিতে চাহিলেন তখন তাহার পিতামাতা সানন্দে
এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন;—অমন সিবিলিয়ান জামাতা লাভ করা ত সৌভাগ্যের কথা।

বিবাহের পাকাপাকি সম্বন্ধ স্থির হইবার আগে বিহারী বাবু কেবল কুণ্ঠিতচিত্ত হইয়া
একবার গৃহিণীকে বলিলেন, "ছেলে আসিয়া যদি বলে বিবাহ করিবে না? আমি বলি
সে আসা পর্য্যন্ত সবুর করা যাক্!" গৃহিণী একথা একবারেই অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন,
তাঁহার অমন সোণার ছেলে সে নাকি কথার অবশ হয়! আর সবুর করিতে গেলে ওরা
মেয়ে রাখিবে কেন? অমন সুন্দর মেয়ের ত আর বরের ভাবনা নাই, লাভে হতে শেষে
অমন মেয়ে তাঁহাদেরি হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

যেমন হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে কর্ত্তাদেরই শেষে হার মানিতে হয়। বিশেষ এই শোকের সময় গৃহিণীর কথা অমান্য করিয়া তাঁহার ব্যথিত চিত্তে ব্যথা দিবার পরিবর্ত্তে নিজের আপত্তিটি অযুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া ত্যাগ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। ভাবিনী বাক্‌দত্তা হইয়া রহিল, কেবল তাহাই নহে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সে তাঁহাদের নিতান্ত আপনার হইয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী ভাবিনী ও তাহার মাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহারা আসিলে ভাবিনীকে আর দুই চারি দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিতে দেন না। যে কয়দিন সে কাছে থাকে তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া পুত্রের বিরহ, কন্যার শোক ভুলিয়া থাকেন। আর সে কাছে না থাকিলে তাহার জন্য জিনিস পত্র কিনিয়া তাহাকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবার আয়োজন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। চুড়িওয়ালা, খেলানাওয়ালা, তাঁতিনী ইহারা তাঁহার বাড়ী আসিয়া কেহ আর শূন্য-হস্তে ফেরে না। কোন একটী ভাল জিনিস দেখিলেই বউয়ের জন্য তিনি কিনিতে চান, কিনিতে না পারিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। কাহারও কোনরূপ নূতন সাজ বা নূতন গহনা কি নূতন রকম সাড়ী জামা দেখিলে তখনি গৃহিণীর মনে হয় বৌমা এইরূপ সাজিলে তাহাকে কেমন মানাইত! নিত্য নতুন ফরমাস যোগাইয়া কর্ত্তা ত আর পারিয়া উঠেন না। কাজেই অন্য পাঁচ জনকেও গৃহিণীর ফরমাসের ভার বহিতে হয়।

একদিন নবীনের মা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোকে ভাই মেয়ে নিয়ে পরশু একবার আস্‌তেই হবে! পরশু ভাবিনী আসবে, তোর মেয়ে যেমন জাল দিয়ে চুল বেঁধেছে, অমনি করে তার চুল বেঁধে দিবি। বুঝলিনে ছেলে বিলেত থেকে আস্‌বে—আমাদের পুরোণো সাজ গোজ তো চলবে না, নূতন রকম শিখে রাখি, এলেতো বেঁধে দিতে হবে।"

ছেলের জন্যে তো পরে হইবে, আমরা বুঝি আপাততঃ গৃহিণীর নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই ভাবিনীর এইরূপ নিত্য নূতন সাজের আবশ্যক।

নবীনের মা বলিলেন, "তা আসব এখন, তার আর কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা ঐ রকম জাল নিয়ে আসিস, বুঝলি ভুলিসনে! যাবার সময় অমনি দামটা দিয়ে দেব।"

ভাবিনী বাড়ী না থাকিলে পানে ছোট এলাচ বাদাম পড়ে না, বাড়ীতে রুই মাছের মুড়ো কি টাট্‌কা ইলিস মাছ আসে না। যদিবা দাসী তাঁহার কথা অমান্য করিয়া বাড়ীতে ভাল মাছ আনিয়া ফেলে তো অমনি তাড়াতাড়ি তাহাকে তখনি ভাবিনীদের বাড়ী দৌড়িতে হয়। "ওগো মা ঠাকরুণ, একবার আজ বৌমাকে না পাঠালে চল্‌বে না। মা রেঁদে বেড়ে বসে আছে, তাকে খাইয়ে তবে খাবে গো।" এ কথায় ভাবিনীর মা'ই বা কোন প্রাণে মেয়েকে না পাঠাইয়া থাকেন।

যত্নের বশ সকলেই—ভাবিনীও এখানে থাকিতে ভালবাসে—কেবল তাহাই নহে, সে জানে ইহাই তাহার আপনার ঘর। বউ না হইতেই গৃহিণী তাহাকে যেমন বউ ভাবেন, সেও তেমনি তাঁহাকে শাশুড়ি ভাবে। সে কিছু নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নহে, তাহার বয়স এখন ১৩ বৎসর, তাহার সমবয়সী সখিদের সকলেরি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার নিকট যখন স্বামীর গল্প করে, আপনাপন ভালবাসার কথা জানায়, ভাবিনী তখন নলিনকে স্মরণ করে। উপন্যাসে যখন সে নায়ক নায়িকার কথা পড়ে, তখন তাহার মনে হয় সে যেন নিজের জীবনের কথাই পড়িতেছে। বইখানি শেষ হইলে সে পুরাতন কথা ভাবিতে থাকে। ছেলে বেলায় তাহার যখন নলিনের সহিত দেখা হইত, তখন নলিন তাহার সহিত কিরূপ সস্নেহ বাক্যালাপ করিত, কিরূপ যত্নে তাহাকে ছবি দেখাইত, একদিন একটী গোলাপ ফুল আনিয়া কেমন যত্নে তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিয়াছিল, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসিতে রাস্তায় যে সমারোহ হয়, তাহা দেখিতে যেদিন ভাবিনী নলিনদের বাড়ী আসিয়াছিল, সেদিন কিরূপ আগ্রহে নলিন তাহাকে সেই সমারোহ দেখাইয়াছিল, এই সব কথা মনে করে আর একটী অপরূপ আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আধো বাধো করিয়া অতি সসঙ্কোচে আর একটী কথা তাহার এই মনে আসে যে সেই নলিনদা তাহার স্বামী। একথা মনে করিতে নিজে নিজেই সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। সে ভাবে তিনি যখন আসিবেন আমি কি করিয়া তাঁহার কাছে যাইব। আর যদি তিনি আগেকার মত আমাকে আদর করেন? ছিঃ সে আমার বড় লজ্জা করিবে!"

আপনার লজ্জায় সে আপনি মুখ ঢাকে অথচ অতি আগ্রহে নলিনের আসিবার দিন গণনা করে।

গণনা শেষ হইল, নলিনের পরীক্ষা শেষে দুই বৎসর কাটিল। নলিন আজ গৃহে ফিরিবে, বিহারী বাবু তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনিতে গিয়াছেন। গৃহিণী ভাবিনীর সাজ সজ্জা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন, আর ভাবিনী একখানি আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া চুল বাঁধা কেমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে কি ভাবিয়া কে জানে মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিতেছে। সে সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। একবার সে চমকিয়া উঠিয়া ত্রস্তে আয়নার পশ্চাতে জানালার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার ভয় বৃথা, কেহ কোথাও নাই। তখন নিশ্চিন্ত ভাবে জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল, জানালার সম্মুখেই মিত্রদের মাঠ, মাঠের গাছগুলি বৈকালিক সূর্য্য-কিরণে ঝক ঝক করিতেছিল, অল্প অল্প বাতাস বহিয়া ঘাস দুলিতেছিল, গাছে পাতা দুলিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল এমন সুন্দর মধুর দৃশ্য যেন আর কখনো সে দেখে নাই, রবি

যেমন হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে কর্ত্তাদেরই শেষে হার মানিতে হয়। বিশেষ এই শোকের সময় গৃহিণীর কথা অমান্য করিয়া তাঁহার ব্যথিত চিত্তে ব্যথা দিবার পরিবর্ত্তে নিজের আপত্তিটি অযুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া ত্যাগ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। ভাবিনী বাক্‌দত্তা হইয়া রহিল, কেবল তাহাই নহে, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সে তাঁহাদের নিতান্ত আপনার হইয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী ভাবিনী ও তাহার মাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহারা আসিলে ভাবিনীকে আর দুই চারি দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিতে দেন না। যে কয়দিন সে কাছে থাকে তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া পুত্রের বিরহ, কন্যার শোক ভুলিয়া থাকেন। আর সে কাছে না থাকিলে তাহার জন্য জিনিস পত্র কিনিয়া তাহাকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবার আয়োজন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। চুড়িওয়ালা, খেলানাওয়ালা, তাঁতিনী ইহারা তাঁহার বাড়ী আসিয়া কেহ আর শূন্য-হস্তে ফেরে না। কোন একটী ভাল জিনিস দেখিলেই বউয়ের জন্য তিনি কিনিতে চান, কিনিতে না পারিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। কাহারও কোনরূপ নূতন সাজ বা নূতন গহনা কি নূতন রকম সাড়ী জামা দেখিলে তখনি গৃহিণীর মনে হয় বৌমা এইরূপ সাজিলে তাহাকে কেমন মানাইত! নিত্য নতুন ফরমাস যোগাইয়া কর্ত্তা ত আর পারিয়া উঠেন না। কাজেই অন্য পাঁচ জনকেও গৃহিণীর ফরমাসের ভার বহিতে হয়।

একদিন নবীনের মা মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, গৃহিণী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, তোকে ভাই মেয়ে নিয়ে পরশু একবার আস্‌তেই হবে! পরশু ভাবিনী আসবে, তোর মেয়ে যেমন জাল দিয়ে চুল বেঁধেছে, অমনি করে তার চুল বেঁধে দিবি। বুঝলিনে ছেলে বিলেত থেকে আস্‌বে—আমাদের পুরোণো সাজ গোজ তো চলবে না, নূতন রকম শিখে রাখি, এলেতো বেঁধে দিতে হবে।"

ছেলের জন্যে তো পরে হইবে, আমরা বুঝি আপাততঃ গৃহিণীর নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই ভাবিনীর এইরূপ নিত্য নূতন সাজের আবশ্যক।

নবীনের মা বলিলেন, "তা আসব এখন, তার আর কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা ঐ রকম জাল নিয়ে আসিস, বুঝলি ভুলিসনে! যাবার সময় অমনি দামটা দিয়ে দেব।"

ভাবিনী বাড়ী না থাকিলে পানে ছোট এলাচ বাদাম পড়ে না, বাড়ীতে রুই মাছের মুড়ো কি টাট্‌কা ইলিস মাছ আসে না। যদিবা দাসী তাঁহার কথা অমান্য করিয়া বাড়ীতে ভাল মাছ আনিয়া ফেলে তো অমনি তাড়াতাড়ি তাহাকে তখনি ভাবিনীদের বাড়ী দৌড়িতে হয়। "ওগো মা ঠাকরুণ; একবার আজ বৌমাকে না পাঠালে চল্‌বে না। মা রেঁদে বেড়ে বসে আছে, তাকে খাইয়ে তবে খাবে গো।" এ কথায় ভাবিনীর মা'ই বা কোন প্রাণে মেয়েকে না পাঠাইয়া থাকেন!

যত্নের বশ সকলেই—ভাবিনীও এখানে থাকিতে ভালবাসে—কেবল তাহাই নহে, সে জানে ইহাই তাহার আপনার ঘর। বউ না হইতেই গৃহিণী তাহাকে যেমন বউ ভাবেন, সেও তেমনি তাঁহাকে শাশুড়ি ভাবে। সে কিছু নিতান্ত অল্প-বয়স্কা নহে, তাহার বয়স এখন ১৩ বৎসর, তাহার সমবয়সী সখিদের সকলেরি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার নিকট যখন স্বামীর গল্প করে, আপনাপন ভালবাসার কথা জানায়, ভাবিনী তখন নলিনকে স্মরণ করে। উপন্যাসে যখন সে নায়ক নায়িকার কথা পড়ে, তখন তাহার মনে হয় সে যেন নিজের জীবনের কথাই পড়িতেছে। বইখানি শেষ হইলে সে পুরাতন কথা ভাবিতে থাকে। ছেলে বেলায় তাহার যখন নলিনের সহিত দেখা হইত, তখন নলিন তাহার সহিত কিরূপ সস্নেহ বাক্যালাপ করিত, কিরূপ যত্নে তাহাকে ছবি দেখাইত, একদিন একটী গোলাপ ফুল আনিয়া কেমন যত্নে তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিয়াছিল, প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ আসিতে রাস্তায় যে সমারোহ হয়, তাহা দেখিতে যেদিন ভাবিনী নলিনদের বাড়ী আসিয়াছিল, সেদিন কিরূপ আগ্রহে নলিন তাহাকে সেই সমারোহ দেখাইয়াছিল, এই সব কথা মনে করে আর একটী অপরূপ আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আধো বাধো করিয়া অতি সসঙ্কোচে আর একটী কথা তাহার এই মনে আসে যে সেই নলিনদা তাহার স্বামী। একথা মনে করিতে নিজে নিজেই সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। সে ভাবে তিনি যখন আসিবেন আমি কি করিয়া তাঁহার কাছে যাইব। আর যদি তিনি আগেকার মত আমাকে আদর করেন? ছিঃ সে আমার বড় লজ্জা করিবে!"

আপনার লজ্জায় সে আপনি মুখ ঢাকে অথচ অতি আগ্রহে নলিনের আসিবার দিন গণনা করে।

গণনা শেষ হইল, নলিনের পরীক্ষা শেষে দুই বৎসর কাটিল। নলিন আজ গৃহে ফিরিবে, বিহারী বাবু তাঁহাকে জাহাজ হইতে আনিতে গিয়াছেন। গৃহিণী ভাবিনীর সাজ সজ্জা করিয়া দিয়া রান্নাঘরে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন, আর ভাবিনী একখানি আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া চুল বাঁধা কেমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে কি ভাবিয়া কে জানে মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছে, আর মাঝে মাঝে যেন পায়ের শব্দ শুনিয়া তাহার বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিতেছে। সে সচকিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। একবার সে চমকিয়া উঠিয়া ত্রস্তে আয়নার পশ্চাতে জানালার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দেখিল তাহার ভয় বৃথা, কেহ কোথাও নাই। তখন নিশ্চিন্ত ভাবে জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল, জানালার সম্মুখেই মিত্রদের মাঠ, মাঠের গাছগুলি বৈকালিক সূর্য্য-কিরণে ঝক ঝক করিতেছিল, অল্প অল্প বাতাস বহিয়া ঘাস দুলিতেছিল, গাছে পাতা দুলিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল এমন সুন্দর মধুর দৃশ্য যেন আর কখনো সে দেখে নাই, রবি

কিরণের মধ্যে আজ যেন কেবল পুলক কম্পনই চলিতেছে। বায়ু যেন কেবল আনন্দেরি হিল্লোল। সহসা তাহার দাদা রমাপ্রসাদ ডাকিল, "ভাবিনি, এখানে কি করছিস? তোকে সবাই ডাকছেন, নলিন এসেছে, আয়।" বালিকার ওষ্ঠাধরে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভিত হইল, সে নড়িল না। রমাপ্রসাদ নিকটে আসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, ভাবিনী লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সাজগোজ দেখিয়া যে দাদা হাসিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না রমাপ্রসাদ হাসিয়া সলজ্জা ভগিনীর হাত ধরিয়া মজলিস গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই গৃহিণী বলিলেন "চিনতে পারিস, নলিন? ছোট্টটি দেখে গিয়েছিলি এখন দেখ কত বড় হয়ে উঠেছে।" নলিন তাহার দিকে চাহিয়া সসঙ্কোচে বলিল, "কে?"

রমাপ্রসাদ বলিল, "চিনতে পার না? ভাবিনী!"

তখন নলিন অসঙ্কোচে নিকটে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, " Hallo! এত বড় হয়েছে! How do you do, my pretty lass?

ভাবিনীর যে ইংরাজী বিদ্যা বেশী ছিল তাহা নহে। নলিনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হওয়া অবধি তাহার যদিও ইংরাজী শিখিতে চাড়ের অভাব ছিলনা কিন্তু শেখায় কে? দাদাকে অনেক ধরা পাকড়া করিয়াও তাহাকে দিয়া ফার্ষ্ট বুকের অর্দ্ধেকও এখনো ভাবিনী শেষ করিয়া লইতে পারে নাই। ইহা সত্বেও সে নলিনের কথার অর্থ একরূপ বুঝিয়া লইল। How do you do চলিত কথা—pretty কথার অর্থও সে জানে, কিন্তু lass কথাটা সে ঠিক ধরিতে না পারিয়া ভাবিল নলিন pretty ass বলিয়াছেন। ভাবিনী ইংরাজী জানে না বলিয়াই যে এই উপহাস তাহা সে বুঝিল; বুঝিয়া লজ্জায় যেন মরিয়া গেল এবং ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া দাদার উপরই তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। তিনি যদি ইংরাজী শিখাইতেন তবেত সে এত দিনে ইংরাজীতে পণ্ডিত হইতে পারিত! লজ্জায় সঙ্কোচে ভাবিনীর মুখে একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "বাছা, এমন সুন্দর মেয়ে বিলেতে দেখেছিস? বিয়ে করে তবে কাজের জায়গায় যাবি।"

ছেলে একটু হাসিয়া আস্তে আস্তে দুই একবার কাশিল। গৃহিণী বলিলেন "বিয়ের সবি ঠিক, কেবল দিন স্থির করে নেমন্তন্ন করে পাঠালেই হয়, আমি বলি এই রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক।" গৃহিণী যে প্রকৃত প্রস্তাবে এ কথা বলিতেছেন প্রথমবার নলিন তাহা বুঝে নাই। এবার বুঝিয়া সহসা কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। বিহারী বাবু ছেলের সঙ্কোচ বুঝিয়া বলিলেন, "তা এত তাড়াতাড়ি নাই হোল।" গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "তা বৈকি, সে হবে-না। দেখ, বাবা, বিয়ে করেই কিন্তু নিয়ে যেতে পাবিনে। ছেলে পিলে হোক, তারা আমার কাছে থাকবে, তুই তখন বৌ নিয়ে যাস। তবে বাছা রবিবারেই গায়ে হলুদ হোক—কি বলিস?"

নলিন কোন কথা কহিল না, কি যেন বলিতে গিয়া শুষ্ক কণ্ঠে দুই একবার কাশিল মাত্র। গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে এই রবিবারেই গায়ে হলুদের সব আয়োজন করে ফেল।"

নলিন সহসা অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে কহিল, "না, মা কিন্তু—কিন্তু—এখন থাক!" নলিনের এই সঙ্কোচ দেখিয়া রমাপ্রসাদ উপহাসচ্ছলে বলিল, "এত না, এত কিন্তু, এত সঙ্কোচ কিসের, একটা বিয়ে করে এসেছ না কি নলিন দা!" নলিনের বিবর্ণ মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন, "ও কি ঠাট্টা, বাছা, অমন কথা বলতে নেই! দেখ বাবা এবার তুই এলি, এবার আমার গহনা পত্র তো সব খালাস হবে, পুরোণ সাটের গহনা তাহোলে আর বৌমার জন্যে কিছুই গড়াতে হবে না। তবে আজ কাল নতুন ফেসানের অনেক রকম গহনা হয়েছে, বাপেরা শুনচি তা সব দেবে। তবু আমারওতো দু এক খানা তা না দিলে ভাল দেখায় না, আমি তাই কাদির মার কাছে দুশো টাকা ধার করে পালন পাতার দু গাছা বালা গড়িয়ে রেখেছি। দিব্যি হয়েছে; আনচি তুই একবার দেখ!" গৃহিণী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গহনা আনিতে গেলেন, কিন্তু পুত্রের ভাব গতিক দেখিয়া বিহারী বাবু কিছু দমিয়া বলিলেন, "এখন তোমার কি বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই?"

নলিন দুই একবার কাশিয়া দুই একবার এদিক ওদিক চাহিয়া আধো বাধো করিয়া আস্তে আস্তে বলিল "না"।

রমাপ্রসাদ তখন হাসিয়া আবার আস্তে আস্তে বলিল, "নলিনদা সত্যই বিয়ে করে এসেছ নাকি?"

নলিন তাহার গা টিপিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "For Heaven's sake এখন থাম!" বিহারী বাবু একটু তফাতে কৌচে বসিয়াছিলেন সে কথা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু রমাপ্রসাদ যখন এই কথার উত্তরে না থামিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তবে সত্য বিয়ে করেছ? কোথায়? কার সঙ্গে? ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে নাকি?"—তখন সহসা বিহারী বাবুর হৃৎপিণ্ডে রক্ত উছলিয়া উঠিল। তিনি নির্ব্বাক কম্পিত হৃদয়ে উত্তর অপেক্ষায় পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্তম্ভিত নীরব নলিনীমোহন কি করিতেছে না বুঝিয়া কলের পুত্তলির মত সহসা ঘাড় নাড়িল। বিহারী বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হস্তের উপর ঘূর্ণমান মস্তক রক্ষা করিলেন। আনন্দ গৃহ মুহূর্ত্তের মধ্যে শোক নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইল! গৃহিণী এই সময়ে গৃহ প্রবেশ করিয়া সহাস্য মুখে আনন্দ-উথলিতচিত্তে বালা দুই গাছি ছেলের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি বাছা পছন্দ হয়? তুই আমার বৌয়ের হাতে পরিয়ে দে" বলিয়া ভাবিনীর উদ্দেশে চারিদিকে চাহিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারতে বিলাতী সভ্যতা।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সর্ব্ববাদি সম্মত; এই দারিদ্র্য যে দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাও অনেকের ধারণা। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বিশ কোটি বা ততোধিক টাকা বিলাতে চলিয়া যায়, যাহার বিনিময়ে আমরা কোন জিনিস পাই না—এই বাৎসরিক শোষণ আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, অনেকে বলেন, সে যাহাই হউক, এই যে আমরা বিশ কোটি টাকা বিলাতে পাঠাই, তাহার বিনিময়ে যে আমরা কিছুই পাই না সে কথা ঠিক নহে; তাহার বিনিময়ে আমরা বিলাতী সভ্যতা পাইয়াছি।

ইহা সত্য। তবে উদর ভরিয়া খাইতে না পাইয়া, এত টাকা দিয়া, আমরা যে জিনিসটি কিনিতেছি, তাহা একবার "যাচাই" করা আবশ্যক। জিনিসটি কত পরিমাণে খাঁটি, কত পরিমাণে বা তাহাতে "খাদ" আছে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

২। প্রথমতঃ, ব্রিটিস রাজ্যে যুদ্ধ বিপ্লব প্রায় বন্ধ হইয়াছে, শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবাসী এবং ব্রিটন, সকলেই এক বাক্যে ইহা বলিয়া থাকেন। ইহার সত্যতা বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তি সভ্যতা বিস্তারে সহায়তা করে মাত্র। যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও অনেক দেশকে সভ্য হইতে দেখা গিয়াছে। নেপোলিয়নের সময় হইতে ফ্র্যাঙ্কো-জরমান যুদ্ধ পর্য্যন্ত ফ্রান্স দেশ কত বিপ্লবে আলোড়িত হইল, তথাপি ঐ কালে ফরাসীরা সভ্যতার পথে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল।

শান্তি যে সকল অবস্থাতেই উন্নতিব্যঞ্জক, তাহা নহে। ভারতবর্ষে শান্তি আছে বলিয়াই যে উহার উন্নতি হইতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে।

এক্ষণে ভারতে বিলাতী সভ্যতা বিস্তারের যে সকল চিহ্ন সচরাচর প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে বাস্তবিক আমাদের কতদূর প্রকৃত উন্নতি প্রকাশ করে, দেখা যাউক।

৩। **রেলরোড, টেলিগ্রাফ** ইত্যাদি। রেলরোড এবং টেলিগ্রাফের বিস্তার ভারতের বিলাতী সভ্যতার বিশেষ পরিচায়ক এবং ব্রিটিস রাজ্যের বিশেষ গৌরব বলিয়া বিঘোষিত হয়। উহাতে যে আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাতায়াতের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া এক মাসে যাওয়া যাইত, এখন সেখানে অনায়াসে এক দিনে যাওয়া যায়। টেলিগ্রাফের প্রসাদে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শত শত ক্রোশস্থিত বন্ধুবান্ধবের সমাচার পাইয়া থাকি। কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে রেলরোডের সাহায্যে দেশের চারিদিক হইতে সেখানে ভক্ষ্য দ্রব্য আনা যায়। যেখান দিয়া রেলরোড গিয়াছে, সেখানকার ফসলের দাম চড়িয়াছে; কৃষকের লাভ

হইয়াছে। গতিবিধির সুবিধা হওয়াতে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, মান্দ্রাজী সকলে মিলিয়া মিশিয়া কায করিতে সক্ষম হইয়াছে; পরস্পরের সৌহৃদ্য বাড়িতেছে।

জগতে প্রায় কিছুই অমিশ্রিত ভাল বা অমিশ্রিত মন্দ নাই। যাহাকে ভাল বলি, সাধারণতঃ তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অংশ অধিক; যাহাকে মন্দ বলি, সচরাচর তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অপেক্ষা মন্দর ভাগ অধিক। রেলরোড যে কেবলই আমাদের উপকার বা উন্নতির সহায়তা করিতেছে তাহা নহে। ইহা দ্বারা ক্ষতিও হইতেছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া রৈলরোডের ভাল মন্দ উভয় পক্ষ বিচার করিয়া দেখা যাউক। সম্প্রতি ছত্রিশগড়ের ভিতর দিয়া নাগপুর বেঙ্গল রেলরোড গিয়াছে। পূর্ব্বে সেখানে ফসল অপর্য্যাপ্ত হইত এবং অতিশয় শস্তা ছিল; এমন কি, শুনা যায়, কখন কখন ক্ষেত হইতে সমুদয় শস্য লওয়া হইত না, সেইখানেই পচিয়া যাইত। রেলরোডের পূর্ব্বে যে কখনও ছত্রিশগড়ে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল শুনা যায় নাই। এক্ষণে, রেলরোডের দরুণ ছত্রিশগড়ের ফসলের মূল্য বাড়িয়াছে; পূর্ব্বে যেখানে চাউলের সের দুই পয়সা ছিল, এক্ষণে সেখানে ৪ পয়সা হইয়াছে। কৃষকের ইহাতে কম লাভ নহে।

কিন্তু প্রথমতঃ, অন্ততঃ সমুদয় লাভ কৃষকের ঘরে যায় না। কৃষকেরা অনেক কায মজুর দিয়া করায়। শস্যের দাম চড়িয়া যাওয়ায়, মজুরদিগের মজুরি কিছু বাড়িয়াছে, যদিও যতদূর বাড়া উচিত ততদূর বাড়িয়াছে কি না সন্দেহ। অতএব লাভের কিয়দংশ মজুরদিগকে না দিলে, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অসম্ভব। যে জমি রেলরোডের যত নিকটবর্ত্তী, তাহার খাজনা তত বেশী হইয়া থাকে। অতএব, লাভের আর এক অংশ চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পজীবিদের দুরবস্থা। এখনও ছত্রিশগড়ে সহস্র সহস্র তন্তুবায় আছে; এখনও কোন কোন স্থানের লোকেরা লৌহ গলাইয়া জীবন ধারণ করে। রেলরোডের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কাপড় এবং বিলাতী লোহার বিস্তার হইলে ইহাদের অন্ন মারা যাইবে। তখন ইহারা কৃষিকার্য্য বা মজুরি অবলম্বন করিবে। সকল লোকই কৃষক এবং মজুর হইলে, জননী বসুন্ধরা ক্রমে তাহাদের খাদ্য যোগাইতে নিশ্চয়ই অসমর্থ হইবেন।

তৃতীয়তঃ, শস্যের রপ্তানি বৃদ্ধি। রেলরোডে শস্যের রপ্তানির সুসার করিয়া দেয়। পূর্ব্বে বলদের পৃষ্ঠে অল্প স্বল্প শস্য ছত্রিশগড়ের বাহিরে যাইত। এক্ষণে শত শত মণ চাউল, গম রেলগাড়ীতে লইয়া যায়। পূর্ব্বে কোন বৎসর ফসল কম হইলে, সঞ্চিত শস্য থাকা-প্রযুক্ত লোকের বিশেষ কষ্ট হইত না। এক্ষণে অধিক দাম পাইয়া টাকার লোভে, আপনাদের নিতান্ত যাহা দরকার তাহা রাখিয়া, সমুদয় উদ্বৃত্ত শস্য কৃষকেরা বিক্রয় করে। এক্ষণে সঞ্চিত ফসল অতি অল্পই থাকিবে। সুতরাং দুর্ব্বৎসরে বিশেষরূপে অন্নকষ্ট হওয়া সম্ভব।

চতুর্থতঃ, টাকার অপব্যয়। এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, কৃষকেরা ত সে শস্য বিক্রয়

করে, যাহা তাহাদের দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়, তাহার উচিত মূল্য পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে না হয় শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে টাকা জমাইয়া রাখিবে। দুর্ভিক্ষ হইলে, রেলরোডে অন্য স্থান হইতে খাদ্য যোগাইবে, কৃষকেরা সঞ্চিত টাকা দিয়া তাহা কিনিবে। কথাটি শুনিতে বেশ; কিন্তু যিনি কৃষকেরা সচরাচর কিরূপ লোক জানেন, তিনি ওরূপ কথা বলিবেন না। প্রায়ই তাহারা অতিশয় অদূরদর্শী; ভবিষ্যতের ভাবনা বড় ভাবে না। অশিক্ষিত লোকের স্বভাব এইরূপই হইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, প্রায়ই তাহারা খরচ করিয়া ফেলে। টাকা যেরূপ খরচ করা যায়, সঞ্চিত চাউল বা গম সেরূপ করা যায় না। অনেক চাসারা মদ খাইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, তাহারা যে মাত্রা চড়াইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আবার, রেলরোডে অনেক চাকচিক্য-শালী, শস্তা, কিন্তু অনাবশ্যকীয় বিলাতীয় জিনিস চাসার দ্বারে হাজির করিবে, খরচের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

অশিক্ষিত লোকদিগের মন "রাঙ্গা চোঙ্গা খেলনা" জিনিসে ভুলিয়া যায়। হাতে টাকা থাকিলে, ভবিষ্যতে দুর্ব্বৎসরে কি খাইবে, ইত্যাদি ভাবিয়া, যে উহার ক্রয় হইতে বিরত হইবে তাহা সম্ভব নহে। যেখানে মোটা কাপড়ে আরামে চলিত, সেখানে চক্‌চকে সাটিন বা বনাত চাই; যেখানে দুই পয়সার দেশী খেলনায় ছেলেরা আনন্দে নাচিত, সেখানে তাহার আটগুণ দামের খেলনা ব্যতীত তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিবে না। এই-রূপে একদিকে যেরূপ কৃষকেরা রেল বিস্তারের জন্য অধিক টাকা পাইবে, সেইরূপ অন্য দিকে উহার নিরর্থক ব্যয়েরও উপায় বাড়িবে। অধিকন্তু, আগে যে দুর্ব্বৎসরের ভরসা সঞ্চিত শস্য দেশে থাকিত, এখন আর তাহা থাকিবে না। যাহার যেরূপ আয়, তদনুযায়ী সে খেলনা প্রভৃতিতে যদি খরচ করে, তবে সেরূপ খরচ কুফলদায়ক হয় না। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা আপনাদের আয় বুঝিয়া অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া খরচ করিতে প্রায়ই অক্ষম দেখা যায়।

ভারতবর্ষের একটি বিভাগ সম্বন্ধে রেলরোডের যেরূপ কুফল ফলিতেছে এবং ফলিবে, দেখা গেল অন্যান্য স্থান সম্বন্ধেও সেইরূপ কুফল ফলিয়াছে। রেলরোড তন্তু বায় প্রভৃতি ব্যবসায়জীবিদিগের অবস্থা খারাপ করিয়াছে, বা খারাপ করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ বাধ্য হইয়া কৃষিজীবি হইয়াছে। একদিকে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে; কর্ষণ যোগ্য পতিত জমি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র অতি কমই দেখা যায় বা দেখা যায় না। অন্য দিকে, পূর্ব্বে যাহারা শিল্পকার্য্যে জীবন ধারণ করিত, এখন তাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে: কৃষকের জীবন সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে; চারিদিকে অন্নকষ্ট বাড়িতেছে।

রেলরোডে আমাদের সভ্যতা-কল্পে কিরূপ সাহায্য করে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু, বস্তুত, উহা আমাদের সভ্যতার নিদর্শন নহে। ভারতবর্ষে অন্যূন নয় হাজার মাইল

রেলরোড আছে এবং তৎসঙ্গে সোন, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর বৃহৎ বৃহৎ সেতু দেখা যায়। আমরা ঐ সকল রেলরোডে ভ্রমণ করি এবং সেতুর নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের তারিপ করি। কিন্তু ঐ সকল রেলরোড এবং সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে কাহারা? ব্রিটন-বাসীরা। উহা বিলাতী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচায়ক, আমরা যে ঐ সভ্যতা পাইয়াছি, তাহা আদৌ প্রকাশ করে না। ঐ সকল রেলরোড নির্ম্মিত হইয়াছে ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা; উহার নির্ম্মাণে যে মূলধন লাগিয়াছে তাহার অধিকাংশ যোগাইয়াছেন ব্রিটন-বাসীরা; উহা পরিচালিত হয় ব্রিটনবাসী দ্বারা। ষ্টেসনমাষ্টার-গিরি অথবা কোন কোন ক্ষুদ্র রেলওয়েতে মধ্যে মধ্যে গার্ড বা ড্রাইভারগিরি ছাড়া ভারতবাসী ভারতীয় রেলওয়েতে কোন বড় কাযে নিযুক্ত দেখা যায় না। ভারতবাসী যে অপারক—সে কথা হইতেছে না; রেলওয়ে সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা কি, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। এরূপ আলোচনা করিলে রেলরোডের বিস্তারে আমাদের কোন গৌরবের বা আত্মপ্রসাদের কারণ দেখা যায় না।

রেলরোড সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, টেলিগ্রাফ এবং বড় বড় খাল সম্বন্ধেও তাহা খাটে। ইহাও ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্ম্মিত এবং পরিচালিত—ইহাও ব্রিটিসদিগের উন্নতির পরিচায়ক, আমাদের নহে।

রেলরোডের ভাল মন্দ দেখা গেল। পাঠক ওজন করিয়া কোনটা গুরুতর দেখিবেন; কেহ কেহ মন্দটাই গুরুতর মনে করিবেন। তাঁহাদের এরূপ মনে করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে যাহার উল্লেখ করা হয় নাই। ভবিষ্যতে যদি ভারতবাসী এরূপ সভ্য হয় যে তাহারা আপনাদের চেষ্টাতে, আপনাদের টাকাতে, আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে বিস্তীর্ণ রেলরোড প্রস্তুত করিতে পারে, তখন তাহারা দেখিবে যে সমুদয় পথ বন্ধ। যেখানে রেলরোড করিলে লাভের সম্ভাবনা, সেখানে রেলরোড প্রস্তুত রহিয়াছে। বর্ত্তমান রেল-রোডে আমাদের উন্নতি হয় নাই প্রকাশ করে দেখা গিয়াছে, ভবিষ্যতে যে উন্নতি হইবে, তাহারও পথ বন্ধ করিয়াছে।

তবে কি এত রেলরোড না হইলে ভাল হইত? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি বাঞ্ছনীয় হয়, যদি তাহার জন্য আশুলাভে বঞ্চিত হওয়া ভাল হয়, তাহা হইলে না হইলেই ভাল ছিল। ব্রিটিসকৃত এবং ব্রিটিস-চালিত ৯ হাজার মাইল রেলরোডের পরিবর্ত্তে, যদি ভারতবাসীকৃত এবং ভারতবাসী-চালিত ৯০ মাইল রেলরোড দেখিতাম, তাহা হইলে ভারতবাসীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইত।

৪। **শিক্ষার বিস্তার।** শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিস রাজ্যের প্রধান গৌরব। তাহাতে আমাদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। শাক্যসিংহের সময় হইতে চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্ম সংস্কারক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুই সহস্র বৎসরের প্রচারে যে ফল ফলে নাই, একশত বৎসরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় সে

ফল ফলিয়াছে; বর্ণভেদের মূলে কুঠারাঘাত লাগিয়াছে। পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষা অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল; এক্ষণে উহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র সকলেরই সম্পত্তি। বিদ্যালয়ের ভিতরে উচ্চ নীচ সকল জাতিকেই একত্রে একই বিষয় পড়িতে হয়; পরীক্ষা, পুরস্কারে উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। বিদ্যালয়ের বাহিরে, চাকরি, মান সম্ভ্রম, উচ্চ নীচ সকলেরই সমান প্রাপ্য। তেলি, তামুলি, চাষা, ধোপা প্রভৃতি যে সকল জাতি সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের নেতৃদলে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মানুষেরই যে মনুষ্যত্বে অধিকার, পাশ্চাত্য শিক্ষা সেই সাম্যভাবটি বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার প্রভাবে অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। কোন সময়ে কোন পদার্থ কোন ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষ দ্বারা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তাহা উদরস্থ বা এমনকি স্পর্শ করিলে তুমি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। জাহাজে চড়িলে পাপ হইবে। নীচ বর্ণের সহিত খাইলে জাতি হারাইবে। বিধবা বিবাহ করিলে একঘরে হইবে। এই প্রকার যে সকল কুসংস্কার আমাদের সমাজকে কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না, তাহার বন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সংসারে অমিশ্রিত ভাল জিনিস প্রায় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষারও আনুসঙ্গিক কুফল আছে। বহুকাল বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিয়া সহসা স্বাধীনতা পাইলে, সে স্বাধীনতার কুব্যবহার অসম্ভব নহে। হিন্দু সমাজে সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা দেখিলেন সুরাপানের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই; তাঁহাদের যাঁহারা আদর্শস্থল সেই ইংরাজেরা সুরাপান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হিন্দু সমাজের মত মানেন না; বৃদ্ধ হিন্দুরা "ওল্ড ফুল্," তাহারা কি জানে? তাহারা ত সেক্‌স্‌পিয়র মিল্টন পড়ে নাই। ইংরাজ সমাজে পানাহার স্ত্রী পুরুষ একত্রে হইয়া থাকে, পানের মাত্রাধিক্য কতকটা ঘৃণিত। হিন্দু সমাজে 'মাৎলাম"র এ প্রতিবন্ধকটুও নাই; শ্রাদ্ধ বেশি দূর গড়াইল। অনেক কৃতবিদ্যলোক সুরামত্ত হইয়া পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইবেন। উচ্চশিক্ষায় কোথায় উন্নতি হইবে—না অনেকের সম্বন্ধে প্রকৃত পক্ষে অধোগতি হইল!

হিন্দু সমাজে অখাদ্য সম্বন্ধে বড়ই কষাকষি ছিল। অখাদ্যের মধ্যে কোনও জিনিস এদেশে বাস্তবিক খাওয়া উচিত কি না, ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা তাহার বিচার করিলেন না। নিজের ধর্ম্ম নিজের মত যাহাই হউক, অন্যে যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, অন্যে যে মত অবলম্বন করে, তাহার প্রতি কতকটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন মনুষ্যোচিত কার্য্য। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া গরুর হাড় হিন্দুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। দিন কত তাঁহাদের অত্যাচারের বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

বিলাতের পত্র।

সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে একজন ইংরাজ-ললনা "ভারতী"র জন্য তাঁহাদের দেশের সচিত্র পত্রিকা ও তাহার সম্পাদন-প্রণালী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং ইহা বঙ্গীয়পাঠকের নিকট আদৃত হইলে পরে তদ্দেশীয় নানাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গবাসীর এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রমণীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার সন্তোষের জন্য মূল প্রবন্ধটি এবং ভারতীর পাঠক পাঠিকাদের জন্য তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ভাং সং।

ILLUSTRATED MAGAZINES OF ENGLAND AND THEIR METHODS.

"An age of progress" has this nineteenth century been called with truth. Everything has made a move from its old standpoint, but in nothing has the change been more remarkable than in journalism, especially illustrated journalism.

Illustrated Magazines and papers of all sorts and sizes, are now so numerous, and of such varied character, as to meet the requirements of all classes.

Look over the bookstall at any station, and it seems incredible, that the demand can equal the supply. Every year fresh publications make their appearance and of late the additions have been both numerous and noteworthy. The illustrated comic paper, has made a step in the right direction, it is well got up and the drawings are reproduced in the best possible style. It is to be regretted that the paper that has made the move on this much needed point should have assumed such a title as "Pick Me Up" and also that more care is not taken to make the jokes equal to the drawings. The illustrated Weeklies are too many to enumerate; and a question occurs to the outsider "How *do* they all pay?" I myself have often wondered. The mystery was solved for me by the Editor of the "Gentlewoman."

Discussing the matter of cost and profit, he informed me that every copy of the "Gentlewoman" cost him nine pence, and yet it was sold to the trade at 4½d, who retailed it at 6d therefore even the last cost was not so great as the first. "How then do you make it pay?" was my natural query. "By the advertisements" was the reply. And yet this paper is one of the leading journals of its class. Of course this is not the case with all papers, for many considerably more than cover their expenses by the large sale of

copies independent of advertisements. Such papers as "The Graphic," "The Illustrated London News," "Punch" and many other old established publications grow richer year by year.

Some of the new periodicals however even outstrip the old. The "Strand Magazine" which was started in January of this year has now reached a circulation of 200,000 per month, while "Tit Bits" which is under the same editorship as "The Strand," *commenced* in 1881 with a circulation of 100,000 and has now reached the amazing average of 600,000 *per* WEEK! This paper is now so well-known that although not an illustrated periodical, a few particulars may prove of interest.

The advertisements in "Tit Bits" occupy a very small space and yet they bring in an income of £500 a week. Great care is taken to thoroughly overlook the various articles before publication, and three or four people are employed to do nothing, but detect any errors in spelling.

A system of prize competition is one of the paper's great attractions and the amount already given in such prizes is £4,050 not including the grand prize of £1,000 given last Xmas for the best tale.

The surplus copies are not, as is usually the case, sent to the mill, for waste paper, but are distributed by agents to the Colonies and India, where they are bought in great quantities by the soldiers. The Correspondence Column has attained such proportions, that it is impossible to answer all queries in the paper, therefore any persons enclosing a stamp in their letters receive a reply direct. This necessitates five men being specially occupied with sorting the letters, some of which are very curious. The most peculiar are kept, and when the office remove next October to larger premises it is proposed to set apart one room as a museum for these specimens.

Nearly all the newest publications are illustrated. Reproduction is now so much more economically carried out by the means of that nineteenth century discovery, photography—that the publishers are enabled to edit the cheapest papers, in an illustrated form: Witness the "Daily Graphic," sold for one penny and containing sketches of events which have occured in some instances, only the day previous.

A class of publication which has undergone a remarkable change is the lady's paper. This has now reached a standard which no longer places women on the level of the fascinating young lady whose greatest anxiety was to learn how to keep her complexion and finish that charming story about the Lady Emmeline and the wicked Count! Scientific and intellectual topics are touched upon, and 'the latest news of Arts and Sports inserted.

The "Gentlewoman" made a daring experiment last year: A tale

was started in one number, with the notice appended, that whoever wrote and sent in the next chapter in a way the Editor judged most calculated to sustain the interest, would receive a prize of three guineas! This system was carried on successfully for several weeks and five guineas was given for the concluding chapter. At the end the outlines of the story as imagined by the authoress who commenced it were given and certainly the tale had been better carried through by the many than conceived by the one. I believe this is the first work that has had every chapter written by a different person.

Editors have the reputation of being a very terrible set of men, I feel it only just to take the opportunity of stating how very kind and obliging I have found them. In gathering particulars for this article, I have bearded serveral in their dens and it is due mainly to the attention and kindness shewn me by one of the Art Editors of "Black and White" that I am enabled to give such a minute account of the various methods employed for the purposes of reproduction.

Wood-Engraving in its old form is superseded by the introduction of photography.—The drawing is photographed on to a block comprised of several sections screwed together, which, when the impression is obtained on the complete surface, are unscrewed and the various portions, handed to different engravers, the reason for this being that it would take one man too long to cut the whole picture. When the engravers have completed their work, the complete block is placed on a metal plate covered with wax, this wax is brushed over with powdered black lead to make it a conducter for the electrotyping, and then the two are placed in an hydraulic press. In a minute or two an exact mould of the engraving is obtained.

This mould is again brushed over with the black lead, then washed to clear it of all grit. Eventually it is hung in a bath of Sulphate of Copper worked by a dynamo, after a few hours the surface of the mould is covered with a layer of copper, which is peeled off, mounted on metal, and when the whole has been trimmed it is ready for the printers.

The other and cheaper mode of reproduction commonly known as "Process," consists of three methods which differ slightly as they are used for different kinds of work.—Sketches in pen and ink, chalk on grained paper, prints in black and white, and anything where the subject is worked out by means of lines, are reproduced by *Photo zinc blocks.* The subject is photographed, a negative of suitable quality obtained. Then a sheet of prepared and polished zinc is coated with a preparation sensitive to light. This coated plate is exposed under the negative, in a screw

pressure frame, to the rays of the sun or electric light. When the exposure to the light is completed, the zinc plate is taken out of the frame and developed in a solution, after which the picture is seen to remain on the zinc. The plate is then rolled over with various inks and etched in rocking baths containing acids. After several baths the picture stands up in *relief* on the zinc. It is then mounted on wood or metal, type high, and is ready to be printed from.

The second form of "process" is that called the "Meisenback." This is used for other than "line" subjects viz., wash drawings, objects, etc. A screen is placed between the negative and the subject, with a view to break up the "half tones" into dots of varying size, thus giving a softer and more pleasing effect. The after treatment is very similar to the 1st process.

In the third method, known as the "Collotype" process the prints are obtained from Gelatine which takes the place of the stone in lithography. The object is photoed and the negative printed into sensitive gelatine instead of zinc. The picture eventually appears in a very slightly raised surface on the Gelatine. The plate thus obtained is put into a press and worked by hand or power.

These are the methods employed by all the papers, the highest class periodicals using chiefly the engraving process. "Black and White" is one of the new papers of this year and its illustrations are excellent, all their work is done on the premises. Some papers prefer to hand their drawings to various firms who make reproduction a specialite. Any drawing they think worth the expense is sent to Vienna, as the Austrians have carried "process" to a much higher standard than we have.

Great as has been the improvement in English Magazines we are still far off that perfection which the Americans have attained to in their "Harper's Monthly". Let us hope that the progress already made is a sign that we may eventually reach that stage.

A. F. Morris.

"উন্নতিশীল যুগ" এই আখ্যাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর যথার্থ উপযোগী হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুই তাহার পূর্ব্বতন স্থান হইতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু সাময়িক পত্রিকা-গুলির ন্যায় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন অন্য কোন বিষয়েই ঘটে নাই। আজকাল সচিত্র ও অন্যান্য শ্রেণীর মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা এত বিভিন্ন আকার ও ভাবাপন্ন এবং এত অধিক সংখ্যক প্রকাশিত হয় যে সকল শ্রেণীর লোকেরই অভাব দূর করিতে পারে। একটা সামান্য রেলওয়ে ষ্টেশনের পুস্তকের দোকানের প্রতি চাহিয়া দেখিলে এত আমদানীর যে সমান কাটতী হইবে ইহা আশ্চর্য্য মনে হয়। প্রত্যেক বৎসরেই নূতন নূতন

কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কিছু পূর্ব্বে অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি এবং তাহার মধ্যে বিশেষরূপ আলোচনাযোগ্য কতকগুলি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সচিত্র হাস্যোদ্দীপক পত্রিকাগুলি এখন উন্নতির পথে একপদ অগ্রসর হইয়াছে। ইহা সুচারুরূপে মুদ্রিত এবং চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু এই উন্নতি সত্ত্বেও যে এই সুন্দর পত্রিকাগুলির "তুলে লও আমাকে" ইত্যাদি রূপ নানা প্রকার অদ্ভুত নামকরণ করা হয় এবং পত্রিকাস্থ রঙ্গ কৌতুকগুলি চিত্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট করিবার জন্য আরও অধিক যত্ন ও চেষ্টা করা হয় না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সচিত্র পত্রিকার সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের সকলগুলির নাম করা অসম্ভব। সাধারণতঃ লোকের মনে হয় যে ইহাতে লাভ হয় কিরূপে? আমার নিজের মনেও পূর্ব্বে অনেকবার এরূপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু পরে "Gentlewoman" নামক পত্রিকার সম্পাদক এ সমস্যাটী আমাকে বুঝাইয়া দেন। এই কাগজের লাভ ও ব্যয় সম্বন্ধে কথা উঠিলে তিনি আমাকে বলেন যে ইহার প্রত্যেক পত্রিকাখানি ছাপাইতে তাঁহার ৯ পেন্স পড়ে এবং তাঁহারা দোকানদারের নিকট একবারে সমুদায় পত্রিকাগুলি প্রত্যেক-খানি ৪½ পেন্স হিসাবে বিক্রয় করেন। দোকানদার সাধারণ লোকের নিকট প্রত্যেকখানি ৬ পেন্স করিয়া বিক্রয় করে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় অপেক্ষা বিক্রয়ের দর কম তবে ইহাতে লাভ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর—বিজ্ঞাপনে। তবু ইহা একখানি প্রধান সাময়িক পত্রিকা। অবশ্য সমুদয় সচিত্র পত্রিকার যে এই অবস্থা তাহা নহে। এরূপ পত্রিকাও অনেক আছে যাহাদের বিজ্ঞাপন ব্যতীতও মুদ্রাঙ্কনের স্থূল ব্যয় অপেক্ষা লাভের পরিমাণ অনেক অধিক। গ্রাফিক্, পঞ্চ, প্রভৃতি বহুকাল প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলির ধন ভাণ্ডারে প্রতি বৎসরেই পূর্ণতা লাভ করিতেছে এবং দুই একখানি নূতন পত্রিকা পুরাতন পত্রিকাগুলির আয়কে ছড়াইয়া উঠিয়াছে। এই বৎসর জানুয়ারী মাসে Strand নামক মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়, এখন তাহার গ্রাহক সংখ্যা ২০০,০০০; Tit Bits নামক আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ ১০০,০০০ গ্রাহক লইয়া প্রকাশিত হয় এখন তাহার নিয়মিত গ্রাহক সংখ্যা ৬০০,০০০। এই পত্রিকাখানি যদিও সচিত্র নহে তথাপি এরূপ খ্যাতনামা যে ইহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলে সাধারণের কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারে। 'টিটবিট্‌সে'র অতি অল্প মাত্রা স্থান বিজ্ঞাপনাধিকৃত থাকে, তথাপি তাহাতেই প্রতি সপ্তাহে ৫০০ পাউণ্ড লাভ হয়। ছাপাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রবন্ধ বিশেষরূপে এবং সযত্নে পর্য্যালোচিত হয় এবং কেবলমাত্র প্রবন্ধগুলির বানান সংশোধন কার্য্যেই তিন চারি জন লোক নিযুক্ত আছে। পত্রিকার পুরস্কার দান প্রথা ইহার একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক গুণ। গত খ্রীষ্টমাসে এই এই পত্রিকা ইহার গ্রাহকদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস লেখককে যে একটি ১,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেন তাহা লইয়া এ পর্য্যন্ত এ পত্রিকা ৪,০৫০ পাউণ্ড পুরস্কারে ব্যয়

করিয়াছেন। অন্যান্য পত্রিকায় নিয়মিত গ্রাহকগণকে প্রেরণ করিবার পর অতিরিক্ত অনাবশ্যক সংখ্যাগুলি যেরূপ কাগজের যন্ত্রে প্রেরণ করা হয়, "টিটবিট্‌স্"-এ তাহার পরিবর্ত্তে এই অতিরিক্ত সংখ্যাগুলি ভারতবর্ষ ও ঔপনিবেশিক দেশে যে এজেণ্ট আছে তাহাদের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তথায় সৈন্যেরা তাহা খুজরা ক্রয় করে। ইহার নিকট এখন এত প্রশ্ন প্রেরিত হয় যে সমুদয় প্রশ্নগুলির উত্তর কাগজে প্রকাশ করা অসম্ভব। সেই জন্য প্রশ্নকারী পত্রের মধ্যে একখানি ডাকের চিঠি পাঠাইলে তাঁহার নিকট উত্তর প্রেরণ করা হয়, এবং এই জন্য পাঁচ জন লোক ক্রমাগত এই চিঠি বাছার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহার মধ্যে অনেক অদ্ভুত পত্র থাকে, বিশেষ অদ্ভুত চিঠিগুলি রক্ষা করা হয় এবং এই অক্টোবর মাসে "টিটবিট্‌স" আফিস অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বাটীতে স্থানান্তরিত হইলে তথায় একটি গৃহ এই অদ্ভুত পত্রগুলির প্রদর্শনী-গৃহ করা হইবে। এখানকার আধুনিক নূতন পত্রিকাগুলি প্রায় সবই সচিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দির আবিষ্কৃত ফটোগ্রাফিতে সচিত্র পত্রিকা কত সহজে ও সুলভমূল্যে সম্পাদিত হইতে পারে "দৈনিক গ্রাফিক" তাহার সাক্ষী। ইহার এক খানির দাম এক পেনি মাত্র, অথচ এক দিন পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহারও চিত্র ইহাতে পাওয়া যায়। আজকাল মহিলাদিগের জন্য সম্পাদিত পত্রিকাগুলির একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পত্রিকাগুলি এখন যেরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাতে সে কালের মেয়েদের ন্যায় নিজের রূপের উন্নতি সাধন করা, ও লেডী এমেলাইন্ ও দুষ্ট কাউণ্টের বিষয়ে অসার গল্প স্বল্প পাঠ করাই যে মহিলা সামর্থ্য অন্তর্ভূত, এ কথা আর বলা যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বুদ্ধি প্রকাশক নানা বিষয় এবং শিল্প ও ব্যায়াম ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই এখন উক্তরূপ পত্রিকার অন্তর্ভূত ভদ্র-মহিলা নামক পত্রিকাতে গত বৎসর একটী নূতন বিষয় পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এক সংখ্যা পত্রিকায় একটী উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদক বিজ্ঞাপন দেন যে, যাঁহারা ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠাইবেন এবং তাহার মধ্যে যাঁহার লেখা সম্পাদক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে তিন গিনি পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কয়েক সপ্তাহ ক্রমাগত এই প্রথায় কার্য্য হইয়া এ উপন্যাসটী সম্পূর্ণ হয় এবং শেষ অধ্যায়ের জন্য ৫ গিনি পুরস্কার দেওয়া হয়।

পরে প্রথম উপন্যাস লেখিকার উপন্যাসের সহিত বিভিন্ন লেখকগণের উপন্যাস মিলাইয়া দেখা যায় যে প্রথমখানির অপেক্ষা দ্বিতীয়খানি ভাল হইয়াছে। আমার বোধ হয় এই প্রথম, একটী উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ লোকেরা পত্রিকার সম্পাদকগণকে ভয়ানক প্রকৃতি বলিয়া মনে করে; সেই জন্য এই স্থানে আমার বলা কর্ত্তব্য যে প্রবন্ধের জন্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে আমাকে অনেক সম্পাদকের নিকট যাইতে হইয়াছিল; এবং সকলেই আমাকে অনুগ্রহ ও

সাহায্য করিয়া বাধিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমি নিম্নে বিভিন্ন প্রকার চিত্রাঙ্কনের যে বর্ণনা দিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে "Black and White" পত্রিকার একজন চিত্রসম্পাদকের অনুগ্রহে ও যত্নের ফলে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি।

পূর্ব্বে কাষ্ঠের (একরূপ কাঠের ছাঁচ এদেশে এখনও যে উপায়ে পুস্তকে ছবি প্রকাশিত হয়) উপর খুদিয়া যে প্রকারে ছবি মুদ্রাঙ্কিত হইত, এক্ষণে ফটোগ্রাফি প্রচলিত হওয়াতে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ একখানি কাষ্ঠের উপর ছবিটী ফটোগ্রাফ করা হয়, এই কাষ্ঠখানি এক খণ্ড নহে উহা সহজেই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফটোগ্রাফ করিবার পর কয়েকজন শিল্পী এই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের উপর চিত্রের যে যে অংশ গঠিত হইয়াছে সেগুলি অবিলম্বে খুলিয়া কেবল পরে আবার ঐ অংশগুলি জুড়িয়া কাষ্ঠখানি মোম্ দ্বারা আবৃত একখানি ধাতব খণ্ডের উপর কলের সাহায্যে জোরের সহিত চাপ দিলে চিত্রের প্রতিকৃতি মোমের উপর গঠিত হয়, অতঃপর এই প্রতিকৃতির উপর গ্রাফাইটের গুঁড়া ছড়াইয়া উহা তুঁতিয়া মিশ্রিত জলে রাখা হয় ও পরে তাড়িতের সাহায্যে উহার উপর তুঁতিয়া হইতে তাম্র পাতিত করা হয়। এক্ষণে তাম্রের পাতখানি উঠাইয়া লইলে দেখিবে উহার উপর চিত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে; অবশেষে এই তাম্রপাত ধাতবখণ্ডের উপর স্থাপিত করিয়া উহা হইতে সহজেই চিত্র ছাপাইতে পারা যায়।

উপরে যে প্রকার চিত্র মুদ্রাঙ্কনের বর্ণনা করা গিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন আর এক প্রকার মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত আছে। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচ লাগে; ইহার নাম "প্রোসেস্" এবং অবস্থাভেদে ইহার তিনটী প্রকার ভেদ আছে। প্রথমটীতে রেখাময় চিত্র (যেমন কালী কলমে অঙ্কিত চিত্র) সহজেই ছাপান যায়। প্রথমতঃ চিত্রের একটী বিয়োগ চিহ্নিত ফটোগ্রাফ উঠান হয় (বিয়োগ চিহ্নিত ফটোগ্রাফ শব্দে এরূপ ফটোগ্রাফ বুঝায় যাহাতে বস্তুর যে ভাগ আলোকময় সে ভাগ আঁধার, আর বস্তুর যে ভাগ আঁধার সে ভাগ আলোকময় দেখায়—যেমন মানুষের চুল কাল, মুখ চক্‌চকে—ছবিতে ঠিক তাহার বিপরীত হইবে)। পরে এক খণ্ড দস্তার উপর বিয়োগচিহ্নিত হইতে যোগ চিহ্নিত ফটোগ্রাফ সাধারণ নিয়ম মত প্রস্তুত করা হয়—ইহা দেখিতে ঠিক চিত্রের মত হইবে অর্থাৎ চিত্রের যেখানে কাল ইহা সেখানে কাল, আর চিত্রের যেখানে সাদা ইহা সেখানে সাদা হইবে। পরে ভিন্ন ভিন্ন মসি ও অম্লের সাহায্যে প্রতিকৃতিটী দস্তায় ফুটিয়া উঠে—অর্থাৎ যে বস্তুর ছবি তাহার যেখানে উচ্চ ও যেখানে গহ্বর আছে ছবিতেও ঠিক সেইরূপ হয়, অতঃপর ইহা হইতেই সহজেই ছাপাইতে পারা যায়।

যে সকল চিত্র রেখাময় নহে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিতে যে প্রণালী ব্যবহৃত হয় তাহার নাম "মাইসেনব্যাক"—ইহা অনেকটা প্রথমোক্ত প্রণালীর ন্যায় প্রভেদ তবে এই যে বিয়োগ চিহ্নিত ফটোগ্রাফ উঠাইবার সময় পদার্থ (যাহার ফটোগ্রাফ উঠাইতে হইবে) আর ফটোগ্রাফ এই দুয়ের মধ্যে একখানি পর্দ্দা রাখা হয় ইহাতে চিত্রটী দেখিতে অতি মৃদু ও সুন্দর হয়।

"প্রোসেসের" তৃতীয় প্রণালীর নাম "কালাটাইপ" ইহাতে জিলাটিন (একপ্রকারশিরিষ) আবৃত ভূমির উপর বিয়োগ চিহ্নিত ফটোগ্রাফ হইতে যোগ চিহ্নিত ফটো উঠান হয়।

সচিত্র পত্রিকায় এই কয়েক প্রকার চিত্রাঙ্কন-প্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উচ্চ-শ্রেণীর পত্রিকায় সাধারণতঃ খুদিয়া চিত্র তুলিবার প্রথা ব্যবহৃত হয়। "Black and White" এই বৎসরের এক খানি নূতন পত্রিকা। ইহার চিত্রগুলি অতি উৎকৃষ্ট। এই পত্রিকার সমুদয় মুদ্রাঙ্কন কার্য্যেই পত্রিকার স্থানীয় কার্য্যালয়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু কতকগুলি পত্রিকা তাহাদের হস্তাঙ্কিত চিত্রগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য কেবলমাত্র মুদ্রাঙ্কনের জন্য স্থাপিত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করে। ইহার মধ্যে আবার যে চিত্রগুলি তাহাদের বিশেষ ভাল মনে হয় তাহা তাহারা মুদ্রিত করিবার জন্য ভিয়েনায় প্রেরণ করে; কারণ তথাকার মুদ্রাঙ্কন-প্রণালী আমাদের হইতে অনেক উন্নতভাবে চালিত হয়।

ইংরাজী সচিত্র পত্রিকার যদিও এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে তথাপি আমেরিকার "হার্পারস মাগাজিনে"র চিত্রগুলির ন্যায় উৎকর্ষতা লাভ করিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে তবে এই উন্নতি দেখিয়া আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে আমরাও এইরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।

তিল।

(১)

শৈশবেও প্রিয়া মোর আছিল অতুল!
বিরলে বিরামস্থলে, বিধি যেন কুতূহলে,
গড়িল সে অপরূপ রূপের পুতুল!
প্রসূতিরে চেতাইয়া, প্রতিবেশী সবে,
কহিত "এমন কন্যা হয়নি, না হবে!
রাখিও, রাখিও এরে, যত্ন করি হেন,
কুদৃষ্টি আবাগী কোন দেয় না'ক যেন!"
বৃথা বাণী!—সন্ধ্যা নামে যামিনী-ভগিনী,
দিনের সতাতো বোন, নিঃশঙ্ক ডাকিনী,
গোধূলি-আলোকে আসি নেহারিল মুখ!
গোধূলি-আঁধারে আসি চুম্বিল চিবুক!
অধরে ঢালিয়া দিল মধুর গরল;
জমাট বাঁধিয়া গেল কলঙ্ক তরল!
লোকে বলে "তিল" উহা—আমি কিন্তু জানি
কলঙ্ক রাখিয়া গেছে সন্ধ্যা মায়াবিনী!

(২)

কলঙ্ক শশাঙ্ক-দীপ্তি করে কি আবিল?
ফুল্ল নলিনীর কান্তি ভৃঙ্গ করে হ্রাস?
সুন্দরি! তোমার বক্ত্রে ওই ক্ষুদ্র তিল,
কি উল্লাস, কি উচ্ছাস, করে গো বিকাশ!
আশা ক্রোড়ে ভীতি যেন অসিত বরণ!
তথাপি ভাস্কর কিবা আশার সুহাস!
জীবনের কোলে যেন সুন্দর মরণ!
মিলন ও বিচ্ছেদের যুগল বিলাস!
নগন লোচন মোর হইয়ে মগন,
হেরেছে যামিনী জাগি সম্মোহন তিল।
অদ্ভুত কল্পনা!—জ্যোৎস্না তোমার আনন,
অধরের তিল যেন ঘুমন্ত কোকিল!
তুমি গো কহিতে কথা—পোহাত শর্ব্বরী!
জাগিয়া উঠিত পাখী কুহু কুহু করি!

প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরী ৩৩ এলগিন রোড কলিকাতা

"রাক্ষসী।"

বসন্তের উষা আসি, রঞ্জি দিল যুগল কপালে;
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি, আননে প্রিয়ার!
নিদাঘের রৌদ্র আসি, বিলসিল ললাট-নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার!
ঘন-ঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে;
তাই গো প্রিয়ার পীঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার!
নাচিল শরত-শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কুলে কুলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার!
রাহু কেতু দুই ঋতু—শীত ও বসন্ত সুধু হায়,
প্রিয়ার হৃদয়ে শশি ছড়াইল কঠিন তুষার!
তাই প্রিয়ে, তাই বুঝি, সুকঠিন হৃদয় তোমার?
উপাসনা, আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায়!
আমি গো বুঝিতে নারি দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী!
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, অথবা কৃষ্ণার চতুর্দ্দশী!

উচ্চহাসি।

কুসুমকোমল আর জ্যোৎস্না-সুশীতল,
অতি স্নিগ্ধ, সুকুমার, তব মৃদুহাসি,
কি সুন্দর!—আমি কিন্তু বড় ভালবাসি
উচ্চহাসি, উদ্বেলিত সঙ্গীত তরল!
মূর্ত্তিমতী রাগিণীর ভুজমেখলায়,
বাজি যেন উঠিয়াছে কঙ্কী, কিঙ্কিণী!
হৃদয়ের কুঞ্জে, কুঞ্জে, বাসন্তী ঊষায়,
জাগি যেন উঠিয়াছে নূপুর শিঞ্জিনী!
বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে কনক মৃণালে,
তোমার হৃদয় মাঝে প্রেমের পিয়ালা!
উচ্চশীরঙ্গিণীসম নাচে তালে তালে
মোহিনী মদিরা কিবা, পিয়ালায় ঢালা!
অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি!
সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চহাসি!

রাণীর যোড়হাত।

আমার মায়ের চক্ষে, এক কোণে হাসিরাশি,
অন্য কোণে নয়নের লোর,
কহিলেন মোরে ডাকি "ঘোর কলি উপস্থিত!
মেয়ের আক্কেল দেখ্ তোর!
ঠাকুমা ঠাকুমা বোলে, পয়সা নেয় কত ছলে,
চুমো খায় জড়াইয়া গলা.
দাসীরে পাঠায়ে দিয়ে, সন্দেশ আনায়ে ওই,
খায় দেখ্ একেলা একেলা——
এই দেখ্ মজা দেখ্"—এত বলি হাত পাতি
মা আমার কহিলা রাণীরে,
"আমারে সন্দেশ দাও"—রাণী কিন্তু আধ্খানা
আপনার গালে দিল পূরে!
বাকি আধখানা নিয়ে, গলা মোর জড়াইয়ে,
মোরে রাণী দিল খাওয়াইয়ে!
রাণীর ঠাকুমা কন "ঘোর কলি উপস্থিত,
বাপেরে চিনিল দেখ মেয়ে!"
এত বলি গৃহকর্ত্রী, কচি কচি হাত ধরি,
কহিলেন রাণীরে শাসায়ে,
"আমি বুঝি পর তোর? দুধে দাঁতগুলি সব
নোড়া দিয়ে দিব রে ভাঙিয়ে।
ঠাকুমার তিরস্কার বুঝিতে পারিয়ে রাণী
টানি লয়ে কচি হাত দুটি,
যোড়হাত করি আহা! দাঁড়ায়ে ঠাকুমা কাছে
কহে রাণী "জূঠা—পাঁওরুটি!" *
শিশুর সে যোড়হাত, কৌশল কথার ছল,
নিরখিয়া কাকারা হাসিল;
সতত দয়ার্দ্রচিত, সরোজিনী পিসি তার,
কি ভাবিয়া, নীরবে কাঁদিল!
একপাশে ছিল বসি, রাণীর জননী তথা,
(বধূ মোর) হেমন্তকুমারী,
অমঙ্গল ভাবি হায়, তাহারও নেত্রকোণে,
দেখা দিল দুইবিন্দু বারি!
রাণীর ঠাকুমা তবে, "সাট্ সাট্" বলি আহা,
রাণীরে তুলিয়া নিলা কোলে!
কতই সোহাগভরে, কতই আদর করে,
চুম্বিলেন বদন কমলে।
সুধাইলা "বল্ রাণি, কোন্ সে আবাগি মাগি
যোড় হাত দিল শিখাইয়া?
বাঁজা হয়ে চিরকাল, আছে বুঝি ঘরে বসি?
দয়া মায়া গিয়াছে ভুলিয়া!"
হে পাঠক, হে পাঠিকা, হেসনা ব্যঙ্গের হাসি,
দরিদ্রের ঘরের কথায়!
শিশু যদি ইট মারে, লাগে না গো সে প্রহারে,
যোড়হাতে বুক ফেটে যায়!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

---

* "জূঠা" কথাটা হিন্দি। ইহার অর্থ উচ্ছিষ্ট, রাণী জানিত যে উচ্ছিষ্ট ও পাঁওরুটি এ দুটি জিনিস ঠাকুমার অস্পৃশ্য।

আথেন্সের ব্যবস্থাবলী।

আমাদের জাতীয় জীবনের এই নূতন সঞ্চার, আমাদের হৃদয়ে রাজনীতি সমাজনীতি বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি ভাবের সবে মাত্র অঙ্কুর উৎপাদিত হইয়াছে। যখন এই অঙ্কুরগুলি বৃক্ষে পরিণত ও ফলফুলে শোভমান হইবে, তখনই আমাদের জাতীয় জীবনও পূর্ণতা লাভ করিবে। আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা পূর্ণ জাতীয় জীবনের কার্য্যক্ষমতা, উদ্যমশীলতা এবং ইহার সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির কিরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক; একের উপর অন্যের কিরূপ প্রভাব তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি পূর্ণ জাতীয় জীবনবিশিষ্ট দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহা কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। জাতীয় জীবন যেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইখানে সাহিত্যও পূর্ণাদর পাইয়াছে। আদর ভিন্ন সাহিত্য জীবন কখন পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। জল সিঞ্চন না করিলে যেমন গাছগুলি শুকাইয়া যায় সাহিত্যও অনাদরে সেইরূপ শুকাইয়া যায় আদর এবং যত্ন পাইলে ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে। এই আদরের ফলে ইংরাজী সাহিত্য আজ জগতের সর্ব্ব জাতীয় সাহিত্যাপেক্ষা সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্ব জাতির মনে আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ক্ষেত্র রোপিত সহস্র সহস্র বীজ হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহার সকলগুলিই সমান উৎকৃষ্ট হয় না। বীজের এবং তাহার জন্ম-স্থানের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বশতঃ ফলের গুণেরও তারতম্য হয়। ইংলণ্ডের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে অজস্র গ্রন্থ জন্মগ্রহণ করিতেছে তাহারও সকলগুলি সমান উৎকৃষ্ট নহে। যেগুলি সারবান, যেগুলি লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় তাহারা অমর জীবন লাভ করে, তাহাদের রচয়িতাকে জানিবার জন্য রাজা হইতে সামান্য ভিখারী পর্য্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়েন। সাহিত্যের এরূপ আদর আর কোথায়? প্রতি মাসে ইংলণ্ডে যে শত শত গ্রন্থ মুদ্রিত হয় তাহার মধ্যে যে গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক সর্ব্বত্র সকলের নিকট সেই গ্রন্থখানি পঠিত ও সমালোচিত হয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানিই বর্ত্তমান সময়ের সেই আদৃত গ্রন্থ; কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ হইতে এ গ্রন্থখানির একটী বিশেষ নূতনত্ব এই, সাধারণতঃ সাময়িক প্রধান গ্রন্থ সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এ গ্রন্থখানির জন্ম পূর্ব্বে। ১৮৯১ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসের Review of Reviews নামক বিলাতী পত্রিকা হইতে এই প্রবন্ধের মর্ম্ম গৃহীত হইবে। এখানি দার্শনিক গুরু আরিষ্টটেল রচিত লুপ্ত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভূত আথেন্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় গ্রন্থ এবং ব্রিটিস মিউজিয়ম ইহার সাহিত্য জগতে পুনঃ জন্মদাতা। এ গ্রন্থখানি যখন বিরচিত হয়, তখন কাগজ বা মুদ্রাঙ্কনের সৃষ্টি হয় নাই সুতরাং উহা হস্তলিপি মাত্র তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক নাই। আমাদের দেশে যেরূপ ভুর্জ্জপত্রে লিখিবার প্রথা

প্রচলিত ছিল--পূর্ব্বে মিশরে পাপিরস নামক নদ্যোৎপন্ন এক প্রকার গাছের সূত্র হইতে বিশেষ এক প্রকার লিখিবার হরিদ্বর্ণ পত্র প্রস্তুত করা হইত। ইহার এক পৃষ্ঠা মাত্র মসৃণ ও লিখিবার উপযুক্ত হইত এবং ইহাকেও পাপিরস বলা হইত। ব্রিটিস মিউজিয়মে এইরূপ পাপিরসে লিখিত দুইখানি সুদীর্ঘ মসী লিখিত পত্র এখন দেখিতে পাওয়া যায়, এই দুই খানি পত্রই আরিষ্টটেলের গ্রন্থের পুনর্জন্মদাতা। পূর্ব্বে এই পত্র দুটী গোলাকারে জড়িত ছিল, কিন্তু এক্ষণে মিউজিয়মে ইহাকে কাচের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই হস্তলিপির অক্ষরগুলি এরূপ নবীন ভাবে পরিস্ফুট আছে যে ইহা এত পুরাতন কালে লিখিত বলিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আরিষ্টটেলের গ্রন্থের আলোচনার পূর্ব্বে এই হস্তলিপির ইতিবৃত্ত আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়।

অন্যূন আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে (৭৮ খৃষ্টাব্দে) কোন মিশরবাসী ভূম্যধিকারীর ডিডিমস নামক মুহুরী তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিত। সেই সময় মিশরের অধিকাংশ অধিবাসী গ্রীক ছিল। এবং এই ভূম্যধিকারী ও তাহার মুহুরীও গ্রীক ছিল, সুতরাং এই মুহুরী যে হিসাব লিখিত তাহাও গ্রীক ভাষায় তৎকালে প্রচলিত পাপিরস পত্রে লিখিত। ইহা হইতে আমরা অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে মিশরের জমীদারীর কার্য্য কিরূপে চলিত, ক্ষেত্রে সারমাটি দিবার জন্য কোন সময় কত গরুর গাড়ীর আবশ্যক হইত, নীল নদের সেতু বন্ধনার্থে কত জন মজুর খাটিত, কোন দিন কোন মজুর কাজে না আসিলে তাহার কত মজুরী কাটা যাইত, কোন এক দিন অতিরিক্ত কাজে কয়টা অতিরিক্ত গর্দ্দভ নিযুক্ত করা হইত ইত্যাদি ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বিষয় জানিতে পারি। তবে ইহা আমাদের নিকট যথেষ্ট কৌতুহলজনক হইলেও কেবল এইরূপ বিবরণেই যদি উক্ত পত্র পূর্ণ থাকিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহার মর্ম্ম গ্রহণের জন্য আমরা বিশেষ প্রয়াস পাইতাম না, কিন্তু তদপেক্ষা অন্য কিছু প্রীতিজনক ইতিবৃত্ত আমরা ইহাতে দেখিতে পাই। এই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পুত্র অথবা অপর কোন বিদ্বান ব্যক্তির অর্থাৎ এই মুহুরীর লিখিত হিসাব পত্র যাঁহাদের হস্তে আসিত তাঁহাদের মধ্যে কাহারও আথেন্সের ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থের আবশ্যক হইয়াছিল। তৎকালে কোন গ্রন্থের আবশ্যক হইলে কাহারও নিকট হইতে সেই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া নিজে নকল করিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পাপিরসের এক পৃষ্ঠা মাত্র লিখিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেও পাপিরসের দুর্লভতা বশতঃ অপর পৃষ্ঠায় লিখিবার প্রথাও সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল এবং এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে নিজে হউক বা অপর কাহারও দ্বারা হউক তিনি ডিডিমসের হিসাব লিখিত পাপিরসের অপর পৃষ্ঠায় আরিষ্টটেলের আথেন্স সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নকল করাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পরে কিরূপে নিশ্চয় বলা যায় না, হয় ভূম্যধিকারীর মৃত্যুর পর মিশরের সাধারণ প্রথানুসারে এই পত্রগুলি তাহার দেহের সহিত সমাধিস্থ করা হইয়াছিল অথবা যে বাটীতে এই হস্তলিপিগুলি ছিল,

কালক্রমে সে বাটী ভগ্ন ও মরুভূমি উত্থিত বালুকায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। যেরূপেই হউক এ হস্তলিপিগুলি বালুকাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। মিশরের বালুকা ও বায়ুর আশ্চর্য্য শুষ্কতাগুণে নিতান্ত ভঙ্গুর ও নশ্বর পদার্থও শত শত বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষতভাবে বিরাজমান থাকে এমন কি আলেখ্যের বর্ণগুলিও নূতনের ন্যায় চাকচিক্যময় থাকে। সুতরাং এই হস্তলিপিগুলিও বালুকার দ্বারা শত শত বৎসর রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। অল্পদিন হইল য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা নানারূপ ভূপ্রোথিত দ্রব্য অধিক মূল্যে ক্রয় করেন জানিয়া কোন আরববাসী অর্থলাভাকাঙ্ক্ষায় বালুকার মধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে এই হস্তলিপিগুলি লাভ করিয়া বিক্রয় করে এবং ক্রমে হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া কালে ব্রিটিস মিউজিয়মে আনীত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর গত হইল পাপিরসের লিখিত হস্তলিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং তৎপরে একাল অবধি অনেকগুলি এরূপ হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনটিই এই অমূল্য গ্রন্থের সহিত তুলনায় আসিতে পারে না। এ গ্রন্থখানির দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতিহাসের একটি নূতন পরিচ্ছেদের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। এই খানিই যে পুরাতন লেখকদের কর্ত্তৃক বহুস্থলে উদ্ধৃত আরিষ্টটেলের রচিত আথেন্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস—ইহা পাইয়া ব্রিটিস মিউজিয়ম যে বহু শতাব্দীর মধ্যের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ লাভ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল পাপিরস লিপি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে হাইপিরাইডিসের চারিটি কি পাঁচটি বক্তৃতা, কবি আকসানের কয়েকটি পদ্য, প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইউরিপিডীসের কয়েকটি বচন ভিন্ন অধিকাংশ লিপিই সাধারণের নিকট মূল্যহীন। পুরাতন লেখকগণ কর্ত্তৃক আরিষ্টটেলের অপরাপর গ্রন্থাপেক্ষা এই গ্রন্থখানির অধিক উল্লেখ দেখা যায়; আর এই সকল উদ্ধৃত উল্লেখ হইতেই তাঁহার বিরচিত সেই গ্রন্থ এবং এই নবাবিষ্কৃত গ্রন্থখানির একত্ব নির্দ্ধারিত হয়। পুরাতন লেখকগণের গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে পণ্ডিতগণ বহু শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান দ্বারা ৯১টী স্থানে এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত আছে তাহা বাহির করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫৮টী স্থানে পূর্ব্ব লেখকগণ আরিষ্টটেলের এই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট গুলিতে কেবল মাত্র আরিষ্টটেলের রচনা বলিয়া উল্লেখ আছে, আধুনিক পণ্ডিতগণ উহা এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে ৫৮টী স্থানে গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে তাহার মধ্যে ৫৫টী স্থান এই ব্রিটিস মিউজিয়মস্থ পাপিরস লিপিতে পাওয়া যায়—লিপির ছিন্নাবস্থা হেতু দুইটী পাওয়া যায় না আর একটী উদ্ধৃত অংশ এই লিপিস্থ অংশ হইতে কতক পরিমাণে ভিন্ন, কিন্তু তাহাতে ইহা যে এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নহে তাহা প্রতিপন্ন হয় না, কারণ সাধারণতঃ অনেকে কোন গ্রন্থ হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার সময় কিরূপ ভুল করেন তাহা সকলেই জানেন যে, তেত্রিশটী অংশে এ গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই অথচ পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থের অংশ বলিয়া অনুমাণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ২৩ টী অংশ এই

লিপিতে পাওয়া যায়। পাঁচটী হয়ত ছিন্ন লুপ্তাংশে পাওয়া যাইতে পারিত, একটী উদ্ধৃতাংশের ও লিপিস্থাংশের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হয় এবং অপর চারটী সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের নহে, কারণ ইহা হইতে উদ্ধৃত হইবার কোন কারণ দেওয়া যায় না। উদ্ধৃত অংশের এবং লিপিস্থ অংশের মধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটী পদের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহাতে এই গ্রন্থই যে আরিষ্টটেলের সেই গ্রন্থ তাহা আরও অধিক মাত্রায় নির্দ্দিষ্ট হয়। এক কথায় ব্রিটিস মিউজিয়ম হইতে যে সকল পণ্ডিতগণের উপর এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই এক মতে ইহাকে আরিষ্টটেলের লিখিত "এথেন্সের রাজনৈতিক ইতিহাস" নামক লুপ্ত গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেকন আরিষ্টটেলের নিন্দা করিয়া বলেন যে, তিনি আরোহণ-প্রণালী হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া অবরোহণ-প্রণালী দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন; ইহা কিন্তু সত্যের অপলাপ মাত্র। আরিষ্টটেলের সত্য ঘটনা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যেরূপ যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিতেন অতি অল্প দার্শনিকই তাহা করিয়া থাকেন। "প্রাকৃতিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে তিনি বিশেষ প্রয়াসে নানা প্রকার জীবের স্বভাব ও গঠন প্রণালী সম্বন্ধে ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং যখন তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক লিখিবার মানস করেন তখন সর্ব্ব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ইতিহাসের সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই উপায়ে তিনি "ব্যবস্থাবলী" নামক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ইহাতে ১৫৮টী রাজ্য-ব্যবস্থা-তত্ত্ব পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহার কতকগুলি বিষয়ে তিনি নিজে সার সঙ্কলন না করিয়া তাঁহার ছাত্রবর্গের দ্বারা সে কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। "আথেন্সের ব্যবস্থাবলী" আরিষ্টটেলের কিম্বা তাঁহার ছাত্রদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল এ বিষয়ে সম্ভবতঃ আধুনিক পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত হইতে পারেন কিন্তু দার্শনিকের মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দী পর পর্য্যন্ত এ গ্রন্থখানি টিমীয়স ও অপরাপর লেখকগণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইয়াছিল; এবং পোলীবিয়স বলেন যে তাঁহারা কেহই এ গ্রন্থখানি যে আরিষ্টটেলের নিজের বিরচিত নহে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। সে যাহা হউক এ গ্রন্থখানি আরিষ্টটেলের রচনা না হইলেও তাঁহা কর্ত্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংশোধিত ও তাঁহার মতানুযায়ী ইহা একপ্রকার স্থির নিশ্চিত।

টোলেমীর রাজত্ব কালে যে সকল গ্রীকরা ইজিপ্টে উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং যাহাদের নিকট হইতে সমুদয় গ্রীক ভাষায় লিখিত পাপিরসলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহারা এথেন্সকে গ্রীসের গৌরব-স্বরূপ এবং আপনাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতির গুরু-স্বরূপ জ্ঞান করিত। সেই কালের বিদ্বানমণ্ডলী, ব্যাকরণবিৎ ও অভিধান রচয়িতাগণের নিকট আথেন্সের ইতিহাস ও সাহিত্য বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল বলিয়া তাহাদের এই গুলিকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস ছিল। বলা বাহুল্য এই কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে আরিষ্টটেলের গ্রন্থ অমূল্য সহায়।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সময়ে আমরা পরস্পরের সহিত ব্যবহারে যে সকল প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া থাকি আমাদের সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও আথেন্সবাসীগণ সেই সকল প্রবৃত্তি দ্বারা সেইরূপেই চালিত হইত। এখন আমাদের সামাজিক ও ব্যবসায়িক যে যে কারণে যেরূপ রাজনৈতিক ফল উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদেরও তদ্রূপ হইয়াছিল। এই ইতিহাস-লিপির প্রথমাংশ ছিন্নাবস্থাহেতু লোপ পাইয়াছে সুতরাং আথেন্সে রাজাদের শাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আধুনিক রাজ্যসমূহের ন্যায় আথেন্সের ও রাজ-তন্ত্র, সম্ভ্রান্ত-তন্ত্র, ও প্রজা-তন্ত্র, এই তিনটী অবস্থা পরে পরে ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার রাজতন্ত্রের ইতিহাস অতীতের গর্ভে লুপ্ত। আমরা সংক্ষেপে ইহার বিষয়ে এই ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে পারি যে—দেশের সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের আরিওপেগস্ নামে একটী সভা ছিল এই সভার প্রতিনিধিগণ রাজাকে পূর্ব্বে রাজ্যশাসনে সহায়তা করিতেন এবং এই সভার ক্রমে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসে। ইঁহারা কয়েকজন বিচারপতি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজকার্য্যের কতক ভার প্রদান করিয়া রাজার যথেচ্ছাচারিতার পথে প্রতিবন্ধক স্থাপন করেন। প্রথম একজন সেনাপতি নিযুক্ত হইল, ইঁহার দ্বারা সৈন্য বিভাগে রাজার ক্ষমতা একবারে বিলুপ্ত না হউক অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল। কিছু দিন পরে একটী বিপ্লবের পর আর্কন নামে আর এক প্রকার বিচারপতির পদ অনুষ্ঠিত হইল এবং রাজার সহিত যোগে রাজ্যশাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত হইল। এই সময়ে রাজ্যে উত্তরাধিকারিত্বের প্রথাও পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে বংশক্রমে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পাইতেন; এখন নিয়ম হইল যে আরিওপেগস্ সভার সভ্যেরা রাজবংশীয় যে কোন ব্যক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ বিবেচনা করিবেন তিনিই রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে রাজ্যশাসনের প্রকৃত ভার রাজা হইতে আরিওপেগসের আয়ত্তে আসিল এবং কিছু দিন পরে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে রাজা উপাধি নিঃশেষ হইল। এখনও কিছুকাল রাজা উপাধি ছিল, কিন্তু রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না; ধর্ম্ম বিভাগে মাত্র তাঁহার অধিকার আবদ্ধ রহিল—রাজা আচার্য্য মাত্র। উপাধিধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে আর্কনই রাজ্যের প্রধান ছিলেন। আর্কন পদ স্থাপনের সময় নিয়ম হয় যে, রাজবংশীয় কোন ব্যক্তি আর্কন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু দশ বৎসরের অধিক কাল কেহ রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন না। এই নিয়মে পর পর চারি জন আর্কন নিযুক্ত হইবার পর এ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে আর্কন নির্ব্বাচন করিবার প্রথা অনুষ্ঠিত হইল। এই নিয়মে তিন জন রাজ্যশাসন করিবার পর আবার নিয়ম পরিবর্ত্তন হইল। রাজা, আর্কন ও সেনাপতি, এই তিন জন ভিন্ন আরও ছয় জন বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। প্রজাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করা এই ছয় জনের কাজ। এই নয় জনকে নব আর্কন বলা হইত ও এক বৎসর কাল তাঁহারা কার্য্য করিতেন। আরিও-

পেগস্ প্রতি বৎসর এই নয় জন আর্কন নির্ব্বাচিত করিতেন সুতরাং নব আর্কনের ক্ষমতা বস্তুতঃ আরিওপেগসের অধীন হইয়া পড়িল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ডের রাজ্য-শাসন ভার সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিৎ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হয় তখন ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র-প্রণালীও কতক পরিমাণে এইরূপ ছিল।

আরিষ্টটেল বলেন যে এই সময় ইতর শ্রেণীর অবস্থা বড় শোচনীয় হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আটীকা প্রদেশে নিজ নিজ ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু আটীকার মৃত্তিকা অনুর্ব্বর, দেশ জলহীন, সুতরাং সকল বৎসর ফসল ভাল হইত না, আহারের জন্য ঋণগ্রস্থ হইয়া তাহাদের ভূমি সম্পত্তি বন্ধক পড়িল; ক্রমশঃ আপনারাও বন্ধক পড়িতে লাগিল—মানুষ বন্ধক দিবার প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল। দরিদ্র প্রজাবর্গের অধিকাংশই মহাজনের সম্পত্তি গরু ভেড়া অপেক্ষা হীনভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। দেশের রাজ্যশাসন বিষয়ে তাহাদের কোন হাত নাই নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার কোন উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় তাহাদের মনে যে অসন্তুষ্টি ও বিদ্রোহের ভাব উৎপন্ন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! কেবল মাত্র বিদ্রোহ করিয়াই তাহারা সম্পত্তি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের নিকট কোনরূপ সুবিধা আদায় করিতে পারিত, এক্ষণে বাধ্য হইয়া তাহারা বিদ্রোহাবলম্বন করিল। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় পরাজিত হইয়া ড্রাকো নামক কোন প্রধান নগরবাসীকে রাজ্য-সংস্কার কার্য্যের ভার দিতে স্বীকৃত হইলেন। আবার একটী পরিবর্ত্তন ঘটিল। আথেন্সের রাজনৈতিক ইতিহাস উন্নতির পথে আর এক পদ অগ্রসর হইল। ড্রাকোর নিয়মাবলী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনি ফৌজদারি আইনগুলি বিধিবদ্ধ করিলেন এবং আইন লঙ্ঘনের জন্য কঠোর দণ্ড নিরূপণ করিলেন। তিনি বলিতেন ক্ষুদ্র দোষেই মৃত্যু-দণ্ড উপযুক্ত, অধিক দোষে তাহাপেক্ষা অধিক শাস্তি আর কি দিব? তাঁহার দণ্ড এইরূপ কঠোর হইলেও তাহার একটী বিশেষ গুণ ছিল—নিশ্চয়তা। ইহার পূর্ব্বে লিখিত কোন আইন ছিল না, বিচার-পতিরা যথেচ্ছাচারণ করিতেন, এখন লোকেরা সুস্পষ্ট বুঝিতে আরম্ভ করিল কোন কোন কার্য্য দোষাবহ ও তাহার কি দণ্ড। এই আইন প্রতিষ্ঠাতেই ড্রাকোর নাম আজ পর্য্যন্তও জীবিত আছে, "ড্রাকনিয়ান ব্যবস্থা," এ কথাটী প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। আরিষ্টটেলের গ্রন্থ হইতে এই প্রথম আমরা জানিতে পারি যে ড্রাকো একজন রাজনৈতিক সংস্কারক; নির্ব্বাচন প্রথার বিস্তৃতি তাঁহার রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটী প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল। তিনি সমগ্র প্রজাবর্গকে নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রদান করেন নাই; কিন্তু বয়স্ক লোকদিগের মধ্যে যাহাদের নিজ নিজ সময়োপযোগী সাজসজ্জা ক্রয় করিবার ক্ষমতা ছিল তাহাদের নির্ব্বাচন ক্ষমতা দিয়াছিলেন।

প্রজাগণের মধ্যে কত পরিমাণ লোকের এইরূপ ক্ষমতা ছিল তাহা আমরা এখন বলিতে পারি না, তবে কতক লোকের যে এইরূপ ক্ষমতা ছিল এবং এই প্রথম বহুসংখ্যক লোক

রাজ্য শাসনের ভার পাইল, তাহা নিশ্চয়। যাহারা এই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল তাহারা রাজ-কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে পারিত, কিন্তু আর একটী উপায়ে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাও রক্ষিত হইয়াছিল। কেহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অধিক সম্পত্তিবান না হইলে রাজকর্ম্মচারী হইবার উপযুক্ত হইতে পারিতেন না। শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য হেতু তাহারা উচ্চ রাজপদ লাভ করিতে পারিত না, তবে সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে তাহাদের রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল। এ পর্য্যন্ত আরিওপেগস্ রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ক্ষমতাবিশিষ্ট ছিল; পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্রের সমুদায় কার্য্যে ইহার সাধারণ কর্ত্তৃত্ব হইল। আরিওপেগস্ ব্যতীত এই সময় আর একটি সভা স্থাপিত হয়, ইহার সভ্য সংখ্যা ৪০১ জন, কিন্তু ইহার হস্তে অতি অল্পমাত্র ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ড্রাকো রাজনৈতিক নির্ব্বাচন প্রথার দ্বারা দেশের সুবিধা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি রোগের প্রকৃত মূলে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ এই যে তিনি ব্যবসায়িক রোগে রাজনৈতিক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়টী আজকাল আমাদের দেশেও বুঝিবার বিশেষ আবশ্যক। দরিদ্র প্রজাবর্গের পক্ষে আর্কন বা সেনাপতি নির্ব্বাচনের ক্ষম-তায় লাভ কি? আপনি সে যখন ঋণের জন্য মহাজনের নিকট শারীরিক মানসিক এমন কি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধেও মহাজনের নিকট আবদ্ধ তখন এ ক্ষমতা প্রাপ্তিতে তাহার সান্ত্বনা কোথায়? সহস্রবার নির্ব্বাচনের ক্ষমতা পাইলেও তাহার অথবা তাহার পূর্ব্বপুরুষের ঋণ পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাহাকে সম্পত্তিশালী ব্যক্তির দাসত্ব করিতে হইত। ড্রাকোর সংস্কারে তাহার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না সুতরাং ড্রাকোর ব্যবস্থায় রোগের উপশম হইবে কিরূপে? পুরাতন মন্দ প্রথা চলিতে লাগিল, আভ্যন্তরিক বিবাদে রাজ্য বিব্রত হইয়া উঠিল। রাজ্যের বাহিরে আথেন্সের শত্রুগণ তাহার দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে লাগিল। চক্ষের সম্মুখে তাহার অধিকার সকল হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। গৃহের বাহিরে এই বিপদ দেখিয়া অবশেষে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সহিত পুনরায় সন্ধি স্থাপন করিলেন। পুনরায় রাজ্য সংস্কারের পূর্ণ ক্ষমতা একজন লোকের হস্তে দিতে স্বীকৃত হইলেন। এ উপায় আমাদের নিকট এখন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তখন গ্রীসের নগর ও রাজ্য শাসনের জন্য সাধারণতঃ এই উপায় গৃহীত হইত। ইহার ফল হইত এই যে, একবার যিনি এ পদে নিযুক্ত হইতেন তিনি আর ছাড়িয়া দিতেন না পরিশেষে নিজে রাজা হইতেন। আথেন্সের শুভাদৃষ্ট বশতঃ সে পদ প্রায়ই উন্নতমনা এবং মহদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তি পাইয়া-ছিল; সেই সময়ে আথেন্সে মধ্যবিৎবংশীয় সচ্ছলাবস্থাপন্ন একজন উৎকৃষ্ট বাগ্মী ও কবি ছিলেন। ইঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতায় ইতিপূর্ব্বে আথেন্সবাসীরা নির্ব্বানোন্মুখ দীপের ন্যায় একবার জ্বলিয়া উঠিয়া শত্রুগণকে নিপাত করিয়াছিল। ইঁহার নাম সোলন।

দৈবমুহূর্ত্তে উভয় সম্প্রদায় ইঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া রাজ্যভার দিলেন। ভবিষ্যৎ আথেন্স-বাসীরা ইঁহাকে প্রজাতন্ত্রের প্রবর্ত্তক স্বরূপ দেখিত।

সোলনের জীবন বৃত্তান্ত এবং কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞাত নূতন কথা আরিষ্টটেল কিছুই বলেন নাই কিন্তু তাঁহার মহান্ চরিত্র আরিষ্টটেল অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আথেন্সের রাজপুরুষ প্রজাবর্গের প্রতি হিতৈষিতার অতি দুর্লভ পরিচয় দিয়াছেন। সোলন যে সময় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন তখন দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ও বিপদসঙ্কুল। রাশিকৃত জঘন্য প্রথায় দেশ পূর্ণ, তাহাদের সকল প্রতিকার আবশ্যক; কিন্তু দেশের লোকের তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই, তাহারা নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। একদিকে সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ শ্যেন চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের পদ সম্পত্তি দেখিতেছেন, পাছে তাহা কালক্রমে হ্রাস হয়; অপরদিকে প্রজাবর্গ যাহাতে অর্থ ও ক্লেশ ব্যতিরেকে ভূসম্পত্তি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য আটিকাপ্রদেশস্থ ভূমির পুনর্বিভাগ প্রার্থনা করিতেছে। সোলনের বন্ধুগণ এই সুযোগে তাঁহাকে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা হইবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কালে সোলন যেরূপ ব্যবহার করিলেন—অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিস্বার্থ ও সৎভাবে তাঁহার সাধ্যমত যত্ন এবং চেষ্টাসহকারে দেশের দুঃখ মোচন করিয়া তৎপরে স্বীয় উচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া এরূপ অসাধারণ প্রজাভাবে জীবনযাপন করেন-এইরূপ মহান্ চরিত্র যে মনুষ্যের পক্ষে সম্ভবপর তাহা তখন কেহ স্বপ্নেও মনে করে নাই। প্রথমতঃ সোলন দেশের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ড্রাকো যাহা দেখেন নাই তাহা দেখিলেন। বুঝিলেন ব্যবসায়িক দুরবস্থাই ইহার মূল, সুতরাং তাহার উচ্ছেদ সাধনার্থ একটী অসমসাহসিক উপায় অবলম্বন করিলেন। সমুদয় পুরাতন ঋণ বেমঞ্জুর করিয়া দিলেন। এই উপায়টি ঠিক ন্যায্য না হইলেও এই দুরবস্থায় ইহা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এই উপায় দ্বারা দরিদ্র কৃষকেরা নিজে ও তাহাদের ভূসম্পত্তি বন্ধকমুক্ত হওয়ায় পূর্ব্বে যাহারা মহাজনের সম্পত্তিরূপে মহাজনের ভূমিকর্ষণ করিত এক্ষণে তাহারা নিজের ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিল। সোলন এইখানেই ক্ষান্ত রহিলেন না। এইখানে ক্ষান্ত থাকিলে কোন যথার্থ প্রতিকার হইত না। যে কারণে এ অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা পুনরায় ঘটিত, প্রজারা আবার ক্রমে ক্রমে মহাজনের নিকট বন্ধক পড়িত, এবং আবার এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিত। মহাজনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা অন্যায় হইলেও প্রজাবর্গকে নূতন অবস্থায় আনিবার জন্য একবার এরূপ করা উচিত হইয়াছিল, কিন্তু আর যাহাতে তাহা না ঘটে তজ্জন্য সোলন মানুষ বন্ধক দিবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন। এখন হইতে কোন স্বাধীন ব্যক্তি ঋণের জন্য মহাজনের দাস হইতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি আথেন্সে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গ্রীসের অপরাপর প্রধান ব্যবসায়ী জাতির মুদ্রা হইতে আথেন্সের মুদ্রার পূর্ব্বে প্রভেদ থাকায় আথেন্সের বাণিজ্যের উন্নতি পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। সোলন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগণের ন্যায় একরূপ মুদ্রা-প্রণালী প্রচলন করিলেন।

এই অর্থ-প্রণালী পরিবর্ত্তন দ্বারা ও সোলনের যত্নে আথেন্সের বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আথেন্স গ্রীসের সকল জাতির মধ্যে বাণিজ্যে প্রধান হইয়া উঠিল।

সোলনের ব্যবসায়ী সংস্কার সম্বন্ধে একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক, ইহাতে বুঝা যাইবে যে তাঁহার অসমসাহসিক প্রণালী দ্বারা তিনি নিজের স্কন্ধে কত ঘোর বিপদ আনয়ন করিয়াছিলেন। ঋণোচ্ছেদ প্রথা প্রচলন করিবার পূর্ব্বে তিনি দুই চারি জন বন্ধুর নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাদের প্রকৃতি সোলনের ন্যায় মহৎ ছিল না। সুতরাং তাহারা সুযোগ বুঝিয়া এই সময় অনেক কর্জ্জ করিয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিল তৎপরে ঋণোচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত হইলে তাহাদের আর কর্জ্জ শোধ করিতে হইল না, কিন্তু ভূমি লাভ হইল। বন্ধুদের এই চৌর্য্য কার্য্যে সোলনের চরিত্রে লোকে সন্দিহান হইল; কিন্তু সোলনের আত্মত্যাগপূর্ণ চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে বন্ধুদের অর্থবান্ করিবার জন্য এইরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব! এ পর্য্যন্ত সোলন দেশকে আশু বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া ও তাহার ভবিষ্য উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়া দেশের ব্যবসায়িক প্রতিকারে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে রাজনৈতিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া বুঝিলেন যে প্রজাদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিতে হইলে তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও কিছু প্রদান করা আবশ্যক এবং তদনুসারে তিনি দেশের ব্যবস্থা প্রণালী সম্পূর্ণ নূতনরূপে গঠিত করিলেন। এ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন ক্ষমতা সম্ভ্রান্ত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের হস্তে এবং নির্ব্বাচন ক্ষমতা মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন লোকদিগের হস্তে ছিল। সোলন রাজ্যস্থ প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রকেই নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ইহা হইতে পরে প্রজাতন্ত্র সভা জন্মগ্রহণ করিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞতাবশতঃ রাজপদের অনুপযুক্ত বলিয়া রাজপদে নিযুক্ত হইবার জন্য সম্পত্তি থাকিবার নিয়ম সোলন বজায় রাখিলেন, কিন্তু উচ্চ বংশজাত হওয়ার পদ্ধতি উঠাইয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ধনবান্ হইলেই যে কেহ রাজপদের উপযোগী হইতেন উচ্চবংশীয় হইবার প্রয়োজন রহিল না। বংশ গরিমার পরিবর্ত্তে ধন গরিমা রাজ্যের ভিত্তি হইল—সামান্য প্রজাও যদি অধ্যবসায় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিতে পারে ত রাজপদের অধিকারী হইতে পারিবে। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বংশ অপেক্ষা ধনই যে অধিক অনুগ্রহ-চক্ষে দেখে তাহা নয়; তবে উচ্চ বংশের শাসন ক্ষমতা ভগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে সোলন এই নিয়ম প্রচারিত করেন। এই সময়ে সোলন করসংক্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার করিলেন। দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর নিকট হইতে অধিক পরিমাণে কর লইবার ব্যবস্থা হইল। আয়ানুসারে কর ধার্য্য হইল। পরবর্ত্তী কালের লোকেরা সোলনকে প্রজাতন্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিত যে সম্যক্-রূপে প্রজাতন্ত্র প্রচলিত করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে; সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাই রাজপদে নির্ব্বাচিত হইতেন, আরিপেওগাসের হস্তে বহুল ক্ষমতা ছিল তথাপি ইংলণ্ডের ব্যারণ-গণ জনের নিকট হইতে জোর করিয়া যে "ম্যাগনা কার্টা" লিখাইয়া লইয়া-

ছিলেন, তাহা যেরূপ ইংলণ্ডের ব্যবস্থা প্রণালীর মূল—সোলনের বিধি ও আথেন্সের প্রজা-তন্ত্রের সেইরূপ ম্যাগনা কার্টা। সোলন প্রথমতঃ তাহাদের বিচারপতি নিযুক্ত করিবার, দ্বিতীয়তঃ বিচারপতিগণের কার্য্য সমালোচনা করিবার ক্ষমতা দিলেন। এই দ্বিতীয় ক্ষমতাটী হইতে প্রজারা বিশেষ ফল লাভ করিয়াছিল। দুই চারিজন ব্যতীত আথেন্সের সাধারণ বিচারপতিরা বৎসর কাল মাত্রের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন। এই এক বৎসরের পরে তাঁহাদের কার্য্যের এক সাধারণ পরীক্ষা দিতে হইত। এবং যে কোন প্রজার পরীক্ষক হইবার অধিকার ছিল। বহুসংখ্যক জুরির দ্বারা এই বিচার কার্য্য সমাধা হইত এবং সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোক হইতে জুরি নির্ব্বাচিত হইত। এইরূপে দেশের সমস্ত লোকে বিচারপতির কার্য্যের তত্ত্বাবধারক হইল এবং এই বিশেষ কারণে প্রজাতন্ত্র আপনার বল বুঝিতে পারিয়া তখন রাজপুরুষদিগের প্রতি আপনাদের অপ্রতিহত বল নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগকে আপনার আজ্ঞাধীন করিল। সোলনের রোপিত বীজ হইতে প্রজাতন্ত্রের অসীম ক্ষমতা লাভ হইল। বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাবলীর মধ্যে এক একটি বিশেষত্ব আছে; এই বিশেষত্বগুলি আইন সম্বন্ধে প্রধান না হইলেও দেশের ভাগ্য স্থিরকরণে প্রধান। ইংলণ্ডের বিশেষত্ব সাধারণ লোকের হস্তে রাজ্যের অর্থবল থাকা, আথেন্সের বিশেষত্ব সাধারণ লোকের হাতে বিচারপতির কার্য্যের সমালোচনার ভার থাকা। পরবর্ত্তী কালের লোকেরা যদিও সোলনকে এই কারণে প্রজাতন্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিত, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহার কার্য্যকলাপ সুচক্ষে দেখিতেন না। সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা তাঁহাদের ক্ষমতা হ্রাস হওয়া বশতঃ—এবং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা আটিকা পুনর্বিভাগিত না হওয়া বশতঃ—তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সোলনের বন্ধুবর্গ তিনি নিজের ও তাহাদের বিশেষ উন্নতি না করায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই সাধারণের অসন্তুষ্টিতেও সোলন সত্যের পথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। পাছে ক্রমাগত লোকেরা আইন পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করে এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত ব্যবস্থাবলী এক শত বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া স্বীয় পদ ত্যাগ করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই সময় তিনি কতকগুলি কবিতা লেখেন তাহার মধ্যে কতকাংশ আরিষ্টটেলের গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই কবিতায় তিনি আপন কার্য্যের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছেন এবং সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি দুর্ভেদ্য ঢাল স্বরূপ উভয় পক্ষের মধ্যে থাকিয়া কোন পক্ষকেই অপরের প্রতি অযথা আধিপত্য স্থাপন করিতে দিব না স্থির করিয়াছিলাম।" গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক সোলন এইরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহার ব্যবস্থা দেশে চিরশান্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। চারি বৎসর পরেই আবার গোলযোগ আরম্ভ হইল। প্রতি বৎসর আর্কন নির্ব্বাচনের সময় দেশস্থ তিনটি সম্প্রদায়ে তুমুল কলহ চলিত। প্রথমতঃ, সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ইচ্ছা করিতেন

তাঁহাদের পূর্ব্ব ক্ষমতা প্রত্যাবর্ত্তন করে। দ্বিতীয়, বণিক সম্প্রদায় ইচ্ছা করিতেন সম্ভ্রান্ত-তন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। তৃতীয়, নিম্নশ্রেণীস্থ প্রজা সম্প্রদায় ইচ্ছা করিত নিজেদের অবস্থার উন্নতি হয় ও তাহারা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। এই শেষ শ্রেণীস্থ লোক সংখ্যায় অধিক হইলেও রাজপদ লাভার্থে সম্পত্তি-শালী হইবার প্রয়োজন থাকা বশতঃ তাহাদের কাহারও উচ্চ ক্ষমতা ছিল না। প্রথম দুই সম্প্রদায় আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ইহাদের তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত মাত্র। এই অবস্থায় দুই সম্প্রদায়ের কলহ অবশ্যম্ভাবী। কালে আশঙ্কা ছিল যে একজন দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তি সহজেই পুরাতন প্রথার উচ্ছেদ করিয়া নিজে রাজ্যাধিকার করিতে পারে। এখন এ বিপদ আশঙ্কা আমাদের নিতান্ত অমূলক মনে হয়। কারণ জাতি এখন একটি সুবৃহৎ পদার্থ, ইহা এত বিস্তৃত যে, কোন একজন অনধিকারী ব্যক্তি সহসা এরূপ ভরসা করিতে পারে না—করিলেও একদিনের জন্যও রাজ্যশাসন করিতে পারে না, কিন্তু সে সময় এক একটি রাজ্য এ দেশের এক একটি জেলার ন্যায় ক্ষুদ্র ও তাহার প্রজাবর্গ অল্পসংখ্যক ও বহুপ্রস্থিত ছিল সুতরাং তখন সহজেই তাহারা একদল অর্থলোলুপ সৈন্য দেখিলে ভয় পাইত। গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যে অনেকবার এইরূপে রাজ্যাধিকারের প্রয়াস হইত এবং কয়েকবার তাহাদের চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছিল। আপাততঃ আথেন্সে এ সাধারণ দুর্ভাগ্য ঘটিল না। ইতিপূর্ব্বে আথেন্সে দুই একবার এইরূপ প্রয়াস নিষ্ফল হয়। ড্রাকোর সংস্কারের কিছু পূর্ব্বে কয়েকজন কুচক্রী আথেন্স অধিকার করিতে একবার চেষ্টা করে, কিন্তু নিষ্ফল হইয়া মৃত্যুদণ্ড লাভ করিল। সোলনের অবসর গ্রহণের অনতিকাল পরে দ্বিতীয় প্রয়াস হয়। ডামোসিয়স নামক এক ব্যক্তি আর্কন নির্ব্বাচিত হইলে এক বৎসর পরেও পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া নানা উদ্যোগে প্রজাবর্গের সম্মতি লাভ করিয়া দ্বিতীয় বৎসর রাজত্ব করেন কিন্তু তৃতীয় বৎসরেও যখন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না তখন আথেন্সবাসী সকলে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য মিলিত হইল। কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগ দ্বারা এ কার্য্য সহজেই সিদ্ধ হইল। আথেন্সে এই সাম্প্রদায়িক কলহ উচ্ছেদ করিয়া শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক দেশে একজন কেহ নেতা হইয়া শান্তি স্থাপন করিবেন ইহা এখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের জাতীয় বিদ্রোহ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লব আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে দেশে উচ্ছৃঙ্খলা ঘটিলে কিয়ৎকালের জন্য স্বেচ্ছাচারী নেতার অধীনত্ব ঘটাই তাহার স্বাভাবিক ফল। আথেন্সেও এ সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার হইল না। পিসিষ্ট্রেটস আথেন্সের নেতা হইলেন পিসিষ্ট্রেটস একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সুবি-খ্যাত সেনাপতি ছিলেন কিন্তু ধনী ও সদ্বংশীয় উভয় সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়েই যোগ না দিয়া তিনি প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি রাজ্য লাভ করেন কিন্তু প্রথমতঃ তাঁহার একটী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

এক দিন তিনি নিজে আহত ও তাঁহার সকটের অশ্বতরগণ বিকলাঙ্গ, এইরূপ দুর্দ্দশাগ্র
অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথে (মার্কেট্ প্লেস্) সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তাঁহা
রাজনৈতিক শত্রুগণ তাঁহার এই দুরবস্থা করিয়াছে (পিসিষ্ট্রেটসের পরবর্ত্তী কালে
অনেক রাজপুরুষ এইরূপে প্রকৃত বা মিথ্যা দুর্দ্দশার পরিচয় দিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধ করিয়া-
ছেন) পিসিষ্ট্রেটসের কথায় প্রজাবর্গ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার শরীর রক্ষার্থে একদ
সৈন্য নিযুক্ত করিয়া দিল। এই সৈন্যবর্গের সাহায্যে অচিরে তিনি নগর অধিকা
করিয়া আপনাকে রাজ্যপতিরূপে প্রচার করিলেন। আপনাকে রাজা বলিয়া প্রচার কর
এক কথা আর নির্ব্বিবাদে ও অবিচ্ছেদে রাজ্যভোগ করা স্বতন্ত্র কথা। সাধারণ সম্প্রদা
তাঁহার আধিপত্যে অমত করে নাই, কিন্তু অন্য দুই সম্প্রদায় আপাততঃ আত্মবিরো
ভুলিয়া সাধারণ বৈরী নিপাতে সংকল্প করিল। পিসিষ্ট্রেটস প্রথম এই দুই দলের কো
দলের সহিত সন্ধির প্রয়াস পাইয়া নিজেই পদচ্যুত হইলেন। উপর্য্যুপরি দুই বার রাজ্যচ্যু
ও নির্ব্বাসিত হইয়া দুই বারই ছলে বলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুই বার নির্ব্বাসনে
ফলে তাঁহার শিক্ষা হইল যে একছত্র রাজত্বে সৈন্যবর্গের প্রয়োজন। দ্বিতীয় বা
প্রত্যাগমন কালে তাঁহার সহিত আথেন্সে বহুসংখ্যক বৃত্তভোগী সৈন্য লইয়া আসিলেন।
অতঃপর তিনি রাজ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজ
করিয়া তাঁহার পুত্রকেও নির্ব্বিরোধে রাজত্ব দান করিয়া গেলেন। পিসিষ্ট্রেটসের রাজ
হইতে একটী সত্যের প্রমাণ হয়। উপযুক্ত অধীশ্বরের একছত্র শাসনে দেশের যেরূপ
আর্থিক উন্নতি হয় অন্য কোন শাসনে সেরূপ হয় না। ক্রমওয়েলের অধীনে ইংলণ্ড,
বোনাপার্টের অধীনে ফ্রান্স (শেষকালীন যুদ্ধ ব্যয় ত্যাগ করিলে) যেরূপ সমৃদ্ধিশালী
হইয়াছিল, পিসিষ্ট্রেটসের অধীনে আথেন্সও সেইরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। দেশে
শান্তি বিরাজিত হইয়াছিল, পূর্ত্ত বিভাগে নানা প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কৃষি
শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং লোকেরা ন্যায় বিচার পাইত। পরবর্ত্তী কালের লোকের
আপনাদের দুর্দ্দশার তুলনায় ইহাকে স্বর্ণযুগ বলিত। একটী মাত্র বিধি দ্বারা কেব
লোকের স্মরণ হইত যে ইহা পিসিষ্ট্রেটসের অনুষ্ঠিত রাজ্য—তাহা এই যে, কৃষি উৎপন্ন
দশমাংশ কর-স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। এই কর দ্বারা বৃত্তভোগী সৈন্যদের এবং পূ
কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এই সম্বন্ধে আরিষ্টটেল একটী রহস্য জনক গল্প বলিয়াছেন।
পিসিষ্ট্রেটস মধ্যে মধ্যে রাজ্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। একবার এই কারণে ভ্রম
করিতে করিতে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে এক বৃদ্ধ এক খণ্ড প্রস্তরময় অনুর্ব্বর ভূমি
খনন করিতেছে, তিনি তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এরূপ জমি হইতে সে কি
ফসল আশা করে? অজ্ঞাত প্রশ্নকারীর কথায় বৃদ্ধ উত্তর করিল যে "গাত্র বেদনা ও বা
ভিন্ন আর বড় কিছু নয়—এ ফলের দশমাংশ যদি পিসিষ্ট্রেটস লইত ত বাঁচিয়া যাইতাম!"
ইহাতে পার্লামেণ্টের একটী গল্প মনে পড়ে। পার্লামেণ্টের কোন বিধি অনুসারে একটী বিশে

শ্রেণীর অপরাধির অর্থ দণ্ড হইত এবং এই দণ্ডের অর্দ্ধেক গোয়েন্দার প্রাপ্য ছিল। পরে
বিধি পরিবর্ত্তিত হইয়া অর্থের স্থানে কষাঘাত ব্যবস্থা হইল কিন্তু 'গোয়েন্দার প্রাপ্য অর্দ্ধেক'
এ কথাটীর পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। বৃদ্ধের বিষয় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পিসিষ্ট্রে-
টস তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সম্পত্তি হইতে কর উঠাইয়া দিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীহিরন্ময়ী দেবী।

কৃত্রিম বৃষ্টি।

বিজ্ঞান মানবের হস্তে যে এক প্রভূত ক্ষমতা, কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি বর্ষণ তাহার এক নিদর্শন। এক বৎসর সাময়িক বর্ষার অভাব হইলে ভারতের ঘরে ঘরে কি হৃদয়ভেদী হাহাকার ধ্বনি গগণ ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, কৃষিজীবী ভারতবাসীর নিকট তাহা অবিদিত নাই। যে দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান ভারতের কোন না কোন অংশে সর্ব্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে, অনাবৃষ্টি যে তাহার এক অব্যবহিত প্রধানতম কারণ তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সুতরাং যদি বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা পর্জ্জন্য দেবতার ক্রীড়াময় শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, আমাদের আবশ্যক ও ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত করাইতে পারি, তাহা হইলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এক বিষম বিভীষিকা হইতে সহস্র সহস্র অসহায় জীবের প্রাণ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন হইয়া যায়। সম্প্রতি আমেরিকায় কি কি উপায়ে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবৃত করিয়া আমরা আমাদের পাঠকদিগের গোচর করিতেছি।

ইলিনইসের ভূতপূর্ব্ব সেনেটার ফারওয়েল সাহেব গত বিংশতি বৎসর ধরিয়া কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন এবং বরাবর সেই মত পোষণ করিয়া আসিয়া পরে যুক্ত-রাজ্যের গত কংগ্রেসের অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক পাণ্ডুলিপি প্রবর্ত্তন করেন যে সরকারী রাজত্ব হইতে দুই সহস্র পাউণ্ড (প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা) "বৃষ্টি করণের" জন্য প্রদান করা হউক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে "বিল" মহাসভায় নামঞ্জুর হইয়া যায়। তথাপি ফারওয়েল নিজের প্রতিপত্তি বলে সম্মিলনী সমিতির সভ্যদিগকে বাধ্য করিয়া সাধারণ ব্যয়ের পাণ্ডুলিপি মধ্যে ঐ টাকা সন্নিবেশিত করিয়া দেন। তাহাতে বিল পাশ হইয়া যায়। বিল পাশ হইলে জেনারেল ধীরেণপার্থ (Dyhrenfurth) বৃষ্টি করণের পরীক্ষা সমাধা করিবার জন্য মনোনীত হইলেন।

মিডল্যাণ্ড হইতে ২৩ মাইল দূরে এক স্থান পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই প্রদেশ অনাবৃষ্টি ও শুষ্কতার জন্য প্রসিদ্ধ। বৃষ্টিপাতের যতপ্রকার অন্তরায় কল্পনা করা যাইতে পারে, এখানে সে সমুদয়ই বিদ্যমান। স্থানটি এক প্রশস্ত মাঠ; ইহার উপর দিয়া সতত প্রবল বাতাস হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সুতরাং এরূপ স্থানের উপর বেলুন উড়াইয়া পরীক্ষা করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। অথচ পরীক্ষার একটি প্রণালী অনুসারে বেলুন উড্ডীন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল যে, কতকগুলো বেলুনে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস পুরিয়া আকাশপথে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কতকগুলি বেলুন কতক উর্দ্ধে তুলিয়া বড় বড় রজ্জু বা কাছি সহযোগে পৃথিবীর সহিত বদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। এই আবদ্ধ বেলুনের সহিত নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগের কথোপকথন ও সংবাদ প্রেরণ জন্য টেলিফোন সংযোগ করিয়া রাখা হইবে এবং পরীক্ষাকারী বৈজ্ঞানিকগণ ইহাতে আরোহণ করিয়া শূন্য হইতে পরিদর্শন করিবেন। নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

স্থানটি নিতান্ত অনাচ্ছাদিত; তাহার উপর হু হু শব্দে ঝড় বহিতেছে। সুতরাং বেলুনে গ্যাস পুরিবার জন্য একটি অস্থায়ী কুটির নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। বায়ুর অত্যাধিক্য প্রাবল্য নিবন্ধন পরীক্ষা আরম্ভ করিতে কিছু বিলম্ব হইল। পরে বায়ুবেগ একটু হ্রাস হইলে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনপূর্ণ বেলুনগুলি মহাবেগে আকাশে উঠিয়া শূন্যপথে মহাশব্দে ফাটিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অনেক দূর ব্যাপিয়া কয়েক ঘণ্টা অবিরলধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল।

জেনারেল ধীরেণপার্থ প্রথম পরীক্ষায় এতদূর কৃতকার্য্য হইয়া পরে আর পাঁচবার এইরূপ কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একবার এত প্রবলরূপে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছিল যে তত্রত্য অধিবাসীরা গত তিন বৎসরে তেমন মুষলধারে বৃষ্টি কখন দেখে নাই।

শেষবার পরীক্ষায় সান্ধ্য-গগণ মেঘশূন্য ও নির্ম্মল। পরিচ্ছন্ন নীলাকাশ রজতখণ্ড নক্ষত্রপুঞ্জে বিভূষিত। পূর্ব্ব দিক হইতে প্রবল বায়ু বেগে বহমান। তেমন সুন্দর পরিষ্কার আকাশ দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারে না যে বৃষ্টিপাতের কোন দূর সম্ভাবনাও আছে। অথচ জেনারেল ধীরেণপার্থ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনপূর্ণ কতকগুলো বেলুন মহাশূন্যে উঠিয়া সশব্দে ফাটিয়া গেল। পৃথিবীর উপর প্রায় সার্দ্ধ তিন মণ বারুদ, বোম ও ডাইনামাইট প্রভৃত ধূম বিস্তার করিয়া সগর্জ্জনে পুড়িয়া শেষ হইল। যাঁহারা পরীক্ষণ-বেলুনে আরোহণ করিয়া শূন্যে বায়ুমণ্ডলীর অবস্থা পরিদর্শন করিতেছিলেন, রাত্রি দশটার সময় টেলিফোন সহযোগে নিম্নে বলিয়া পাঠাইলেন যে নিম্নস্থ বারুদ ও বোম পোড়ানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে গর্জ্জন শব্দ শ্রুত হইতেছে। রাত্রি তিনটার সময় পশ্চিমাকাশে দিগ্বলয়ের উপরর মেঘের ঘন রেখা পরিলক্ষিত হইল।

বারুদের ধোঁয়া ও শব্দ ঐ দিকেই গিয়াছিল। অনতিবিলম্বে সমুদয় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং রাত্রি চতুর্থ ঘটিকার সময় মহাবেগে ঝড়, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের সঙ্গে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয় হইলে অতি সুন্দর ইন্দ্রধনুর সৃজন হইল। দিবা আট ঘটিকা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল।

জেনারেল ধীরেণপার্থের বৃষ্টিকরণ প্রক্রিয়া তিনভাগে বিভক্ত। পরীক্ষার প্রথমাংশে রাশি রাশি বারুদ পোড়ান ও বোম ছোড়া হয়। তৎপরে বস্ত্রনির্ম্মিত বৃহদায়তন চল্লিশ পঞ্চাশটি ঘুড়ির পশ্চাতে ডাইনামাইট বাঁধিয়া আকাশে উড্ডীন করিয়া পৃথিবী হইতে তার সংযোগে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহাদিগকে পোড়ান হইয়া থাকে। ইহাই পরীক্ষার দ্বিতীয় বা মধ্য অংশ। তৃতীয় বা শেষভাগে দশটা কি কুড়িটা বৃহৎ বেলুনে রাসায়নিক সংমিশ্রণ পরিমাণানুযায়ী অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস পুরিয়া আকাশ পথে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বেলুন গুলি প্রায় এক মাইল উর্দ্ধে উঠিয়া বায়ুপেষণে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিশিয়া জল হইবার সময় তোপধ্বনির মত মহাশব্দে শূন্যকে নিনাদিত ও বিকম্পিত করিয়া ফাটিয়া যায়।

বেলুনে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পুরিবার প্রণালী বোধ হয় অনেক পাঠকের নিকট বিদিত। আমরা তথাপি ধীরেণপার্থ যেরূপে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন প্রস্তুত করিতেন, তাহার বিবরণ দিলাম। বড় বড় কাচের থালীতে মাংগাণিজ ডাই-অকসাইড্ ও পটাসিয়াম ক্লোরেট পুরিয়া অক্সিজেনের চুল্লীর উপর প্রখর উত্তাপ প্রদত্ত হইত। উত্তাপে অক্সিজেন যৌগিক মাংগানিজ অকসাইড হইতে বিমুক্ত হইয়া উপরে উত্থিত হইত। এই মুক্ত অক্সিজেন নল সংযোগে চূণের জলের ভিতর দিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া বেলুনে প্রবিষ্ট হইত। বেলুনের এক তৃতীয়াংশ অক্সিজেনে পূর্ণ হইলে অবশিষ্টাংশ হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ করা হইত। কেননা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিশ্রণ হইবার ভাগ উহাদের অনুপাত ১ : ২ ; অর্থাৎ একভাগ অক্সিজেনের সহিত দুই ভাগ হাইড্রোজেন যোজিত না হইলে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভবপর নহে। অক্সিজেনের অংশ পূর্ণ হইলে হাইড্রোজেন প্রস্তুত করণ যন্ত্রসহ বেলুনের মুখনল দ্বারা সংযুক্ত হইত। হাইড্রোজেন প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বৃহৎ লৌহ নির্ম্মিত জলাধারে (tank) ইহার অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত নির্ম্মল জলে পুরিয়া উহাতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ কুচা নিক্ষেপ করা হয়। তৎপরে অল্পে অল্পে সলফিউরিক এসিড্ প্রয়োগ করিলে রাসায়নিক ক্রিয়াবলে জল হইতে হাইড্রোজেন অংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া নলপথে বেলুনে প্রবেশ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হাইড্রোজেন আবশ্যকীয় মাত্রায় না হয়, ততক্ষণ স্ফীত বেলুনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য ইহার উপরে একটা বৃহৎ জালের মত আবরণ দিয়া চারিদিকে বালুকাপূর্ণ বস্তা ঝুলাইয়া ধরিয়া রাখা হয়। উভয়বিধ গ্যাসে পূর্ণ হইলে বেলুন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। এক্ষণে কেবল বালির বস্তা সরাইয়া এবং অন্যান্য রজ্জু-বন্ধন মুক্ত করিলেই বেলুন

আকাশে উড়িয়া যাইবে। সাধারণতঃ এইরূপ explosive বেলুনে ৫০০ হইতে ৫০০০ ঘনফুট পরিমাণ গ্যাসে পূর্ণ করা হইয়া থাকে।

দূর শূন্যপথে পরিদর্শন করিবার জন্য যে বেলুন রাখা হয়, তাহা পৃথিবীর সহিত শক্ত কাছি বা রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া উপরে এক হাজার ফুট পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। ইহার ব্যাস প্রায় ২০ ফুট। মিটিয়রলজিষ্ট বেলুন সংলগ্ন ক্ষুদ্র নৌকাপরি আসীন হইয়া আপনার যন্ত্র সহকারে আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং পরিদর্শন ফল, টেলিফোন সংযোগে অধস্তন ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করেন। পরিদর্শন সমাপ্ত হইলে পরীক্ষণ-বেলুনের কাছি কাটিয়া দেওয়া হয়। বেলুন আরো উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। পরে আরোহী গ্যাস ছাড়িয়া অবতরণ করিতে থাকেন। সাধারণতঃ যেখান হইতে বেলুনে আরোহণ করা হয়, প্যারাসুট ছাতার সাহায্যে সেই স্থানে অবতরণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং বেলুনারোহী পরিদর্শনকারীর জন্য নিম্নপথে অশ্ব-রথ ধাবিত হয়। আরোহী নিরাপদে অবতরণ করিলে যানারোহণে সত্বরই পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়া সাধারণের প্রীতি সম্পাদন করেন।

জেনারাল ধীরেণপার্থ যে তিনটি বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এইঃ—

প্রথম। অধিকাংশ ঝড় বৃষ্টি উৎপত্তির প্রধান কারণ,—উচ্চ বায়ু-স্তরে অসম গুণাত্মক বায়ু-প্রবাহের সম্মিলন। এই প্রবাহের কতকগুলি উষ্ণ ও জলীয় অণুপূর্ণ, অপরগুলি অধিকতর শৈত্য সম্পন্ন। যখনি এই প্রবাহগুলি পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে, উষ্ণ অথচ আর্দ্র প্রবাহ শৈত্যময় প্রবাহ সংস্পর্শে শীতল হইতে থাকে এবং সেই সময়ে ইহার অন্তর্গত জলীয় অণুগুলি নিংড়ান হইয়া ঝরিয়া পড়ে। জলীয় অংশ প্রথমে বাষ্পাকারে বা মেঘের মত হয়। পরে অসম্বদ্ধ অণুকণাগুলি সম্বদ্ধ হইয়া জল রূপে পরিণত হয়। এক বার এইরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইলে স্বতঃই ক্রমান্বয়ে এই নিয়মে জলাণু সংগঠিত ও সম্বদ্ধ হইয়া বৃষ্টিধারা রূপে পতিত হইতে থাকে। উচ্চ আকাশে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুন ফাটিয়া যে ভয়ানক বায়ুস্তরঙ্গ উত্থিত করে, সেই তরঙ্গ-প্রবাহ অন্য স্তরের শীতল উষ্ণ বায়ু-প্রবাহের সংমিশ্রণের সূত্রপাত করিয়া দেয়। এই প্রণালী অনুসারে জলীয় অণুরাশি ক্রমশঃ ঘন ও সম্বদ্ধ হইতে হইতে যে প্রচ্ছন্ন উত্তাপ নির্গমন করে, তাহার সাহায্যে উল্লিখিত তরঙ্গ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে ঝড়ের কেন্দ্র স্থানীয় হয়।

দ্বিতীয়। শূন্যে ক্রমান্বয়ে কতকগুলো বোম ফাটার মত আওয়াজ করিলে বায়ু-স্তরে এক তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই বায়ুস্তরঙ্গ প্রভাবে জলীয় অণুকণা সকল পরস্পর সংহত ও সম্বদ্ধ হইয়া জলরূপে পরিণত হয়। এই মতবাদ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যখন মনে করি যে বজ্রপাতের অব্যবহিত পরেই অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এইরূপ বৃষ্টি-পতনের জন্য বড় বড় ঘুড়ির পশ্চাতে ডাইনামাইট ও কার্টিজ বাঁধিয়া

আকাশে আওয়াজ করান হয়। অপেক্ষাকৃত নিশ্চল বায়ু-স্তরমধ্যে অকস্মাৎ এইরূপ সবেগে আওয়াজ হইলে প্রতিহত জলীয় অণু সকল সম্বদ্ধ হইয়া, যে মেঘে জলের কোনও সম্ভাবনা ছিল না, তাহা হইতেও বৃষ্টি পতিত হয়। জেনারেল ধীরেণপার্থ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেক সময় ফশলা ফশলা বৃষ্টির অবতারণা করিতে পারিয়াছিলেন।

তৃতীয়। সংঘর্ষণে যে তাড়িত উপজাত হয়, পৃথিবী ও বায়ু মণ্ডলের মধ্যে হঠাৎ বারুদ-ঘটিত পদার্থের, প্রবল শব্দে বিস্ফাটন জন্য, পৃথিবী ও বায়ু রাশির সংঘর্ষণে সেই তাড়িত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই উপজাত তাড়িত সমীপবর্ত্তী পৃথিবী ও বায়ু মণ্ডলের বৈদ্যুতিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে এমন এক গুণ প্রবল বৈদ্যুতিক শক্তি-পূর্ণ অবস্থা আনয়ন করে যাহাতে জলীয় অণু সকল আকৃষ্ট হইয়া সংশ্লিষ্ট হয় এবং পরে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়।

জেনারেল ধীরেণপার্থের এই পরীক্ষার সংবাদ সমুদয় বৈজ্ঞানিক জগতে, কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এবং লোক-সাধারণের মধ্যেও অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। অন্যত্রে পুনরায় বিস্তারিতরূপে পরীক্ষা হইবে। আমরা আশা করি এই পরীক্ষার ভাবী ফলে কৃষিজীবীদিগের জন্য এক প্রভূত মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের ভারতবর্ষেও অল্পদিন হইতে কুদাপা জেলায় মাজিষ্ট্রেট কৃত্রিম বৃষ্টির পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষা নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। অনাবৃষ্টিপীড়িত দেশে স্থানীয় উৎসাহী কর্ত্তৃপক্ষগণ সরকারী ব্যয়ে এইরূপ পরীক্ষা অনুষ্ঠান করিলে অনেক সুফলের সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

কেন হাহাকার?

সবে বলে তুমি, নাথ,
দয়াময় প্রেমময়;
তোমার করুণা প্রেম,
সংসার ভরিয়া রয়।
তোমার প্রেমেতে, সখা,
কাননে কুসুম ফুটে;
তোমার কৃপায়, নাথ,
রবি শশি তারা উঠে।
কুলু কুলু গান গেয়ে
হরষেতে নদী ধায়;
জগৎ মাতায়ে ওই
পাখীগুলি গান গায়।
সংসারে যে দিকে চাই,
তৃণ হ'তে হিমালয়;
নীরবে নীরবে সবে
তব প্রেম বার্ত্তা কয়।
বল দেখি তবে শুনি
ওহে সখা প্রেমাধার;
তোমার সংসারে কেন,
সদা এত হাহাকার?

বল বল তবে কেন,
অস্তে যায় রবি শশি ;
মধুর কুসুম বালা
কেন ধীরে যায় খসি ?
নদীটী শুখায়ে যায়,
পাখীগুলি যায় মরে ;
জগতের নর নারী
সদা ওই হাহা করে ?
* * * * * *
বুঝেছি বুঝেছি, নাথ,
কেন ওই হাহাকার ;
ক্ষুদ্র মোরা স্বার্থ বিনা
কিছুই জানি না আর !
আমরা কাঁদি যে, নাথ,
স্বার্থ টুকু যায় বলে ;
কাঁদি না তাদের তরে
যারা সবে গেছে চলে !
রবি যবে অস্ত যায়
আমাদের পাশ হতে ;
হয় না ত অবসান,
যায় শুধু অন্য পথে।
নব দেশে নিয়ে যায়,
তাহার আলোক রাশি ;
জাগাইতে নব প্রাণে
উষায় তরুণ হাসি।
মোরা বসে অন্ধকারে
কাতরে কাঁদিতে থাকি ;
কোথা গেল, কোথা গেল,
করুণ ক্রন্দনে ডাকি।
বুঝিতে পারি না, নাথ,
জগতে যায় না কিছু ;
তোমারি কার্য্যেতে আছে,
হয় আগু নয় পিছু !
চোখের আড়ালে তাই
সান্ত্বনা না মানে মন ;
তোমার রাজ্যেতে তাই
অশ্রু বহে অণুক্ষণ !

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

বুদ্ধি-বিকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জাগতিক ব্যাপারের আদি বা অন্ত জানিবার আমাদের শক্তি নাই। এই অনন্ত দৃশ্যমালার মধ্যগ্রন্থিগুলিই আমাদের জ্ঞান বা বিজ্ঞানের অধিকার। আমরা সেই অসীম কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের গ্রন্থিগুলি পর পর অনুধাবন করিয়া থাকি ; কিন্তু জ্ঞান বা বিজ্ঞান সহকারে তাহার যতদূরই নিরাকরণ করিতে পারি না কেন, নিতান্ত চরম সীমায় আসিয়াছি ভাবিলেও, শেষ গ্রন্থিদ্বয় চিরকালই অপরিস্ফুট রহিবে। কেহ কখন তাহা স্পর্শ করিতে পারেও নাই—পারিবেও না। মনুষ্যবুদ্ধির চূড়ান্ত কীর্ত্তিতেও একথা অনুমিত হয় না। কল্পনার অতলস্পর্শ বিশ্বোদর রচনাশক্তির ইন্দ্রায়ুধবিনিন্দিত পরিধিতে সকলই আছে, কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গের আভাসও নাই। হতদর্প বিজ্ঞান যেন

সীমান্তে উপনীত হইয়া আনতমুখে দণ্ডায়মান—আদি বা অন্তের রহস্য ভেদে নিতান্ত অসমর্থ ; সুতরাং সেই বৃথা চেষ্টায় আর সময় ক্ষয় করিতে চায় না। দুইটী আঁধার সাগর মধ্যে যে সুদূরবিস্তৃত অপূর্ব্ব কাঞ্চন সেতু আছে, বিজ্ঞান সানন্দে তদুপরি ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে।

জাগতিক দৃশ্যমালার আদি ও অন্তে যে কথা, তাহার প্রত্যেক গ্রন্থগুলির আদি এবং অন্তেও সেই কথা। পরস্পর সম্পূর্ণ সংযত অথচ কোথায় সংলগ্ন তাহার কিছুই বুঝা যায় না। যাহাকে সচরাচর কথায় জড়প্রকৃতি বলে, তাহার আদি বা অন্ত কোথায়, তাহা আমরা জানিও না—জানিতে পারিবও না। তবে চিন্তাসুলভের জন্য কতকটা তদ্বৎ মনে অনুমান করিয়া লই। যেমন ভূমি পরিমাণের সময় কোন না কোন স্থান হইতে প্রারম্ভ ধরিয়া লই, অথচ তাহার প্রকৃত প্রারম্ভ নাই ; সেইরূপ সকল বিষয়েরই আমরা প্রারম্ভ ধরিয়া থাকি এবং তাহাতেই পরবর্ত্তী বিষয় কতকটা বুঝিতে পারি। বৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিবার সময়, হয় মেঘ নয় বায়বীয় বাষ্প হইতে আরম্ভ করি, নতুবা কোন বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না। কোন একটী ঘটনা বিশেষে প্রথম পদ রাখিয়া আমরা পর পর কার্য্যকারণমালার শৃঙ্খলান্তরে যাইয়া থাকি ও যাইতে পারি। এইরূপেই জ্ঞান বা বিজ্ঞানের উন্নতি সংসাধিত হয় ; নতুবা শুদ্ধ আদি ও অন্ত লইয়া গোলযোগ করিলে, গোলযোগই হইয়া থাকে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই হয় না। কে বলিতে পারে জড়প্রকৃতির আরম্ভ এবং শেষ কোথায় ? জড় ও উদ্ভিদের মধ্যেইবা ব্যবধান কি ? উদ্ভিদের সূত্রপাত এবং সমাপ্তি কোথায় ? উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগতের সীমাই বা কোথায় ? জীবজগতের প্রারম্ভই বা কি প্রকার ? চৈতন্যের উৎপত্তি বা প্রারম্ভ কিরূপ ? ধীশক্তির প্রারম্ভই বা কোথায় ? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা নাই। কিন্তু তত্রাপি আমরা প্রস্তরকে জড়পদার্থ, মাধবীকে লতা, সিমূলকে বৃক্ষ, হস্তীকে পশু বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই, লতা বলিয়া কোন উদ্ভিদ্ নাই, পশু বলিয়া কোন প্রাণী নাই ; এ সমস্তই আমাদের মানসিক সৃষ্টি—সাধারণ গুণগ্রামের মানসিক ধারণার সংজ্ঞা মাত্র। লোকে সিংহ দেখিয়াছে, ব্যাঘ্র দেখিয়াছে, মৃগ দেখিয়াছে, কিন্তু কে কোথায় পশু দেখিয়াছে ? সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগের ধ্যান আছে ; পশুর ধ্যান নাই, ধারণা আছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, বিড়াল, বানর প্রভৃতি সকলি পশুতে আছে ; কিন্তু পশু উহার কোন একটীতে নাই। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতিতে পশু নাই,—পশুত্ব আছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি সকলের সাধারণ ভাবের নাম পশু। ইহা গুণবাচক শব্দ—সাধারণ গুণের বিশ্লিষ্ট ধারণা, অথচ ইহা ধর্ম্ম বিশেষের অবয়বী মূর্ত্তি নহে। মানসিক ব্যাপারে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, শৃগাল প্রভৃতি সকলই আছে ; কিন্তু ইহার কোনটীই পশুর পূর্ণ মূর্ত্তি নহে ; ইহার কোনটীতেই উহা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয় না। কোন ফলক বিশেষে কতকগুলি জন্তুর ফটোগ্রাফ লইলে যেমন একটা সাধারণ অস্ফুট মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, মনেও তদ্বৎ সকল জীবের সাধারণ ধারণার ফল পশু। পশুত্ব সে সকল চিত্রের সাধারণ রেখা। এই মান-

সিক প্রক্রিয়াকে সাধারণ্যসংস্থাপন বলে। অনেকে সাধারণ্যপাতের (Generalisation) সহিত বিশ্লেষণের (Abstraction) গোলযোগ করেন। বস্তুতঃ এদুইটীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণ্যে দর্শন প্রবল এবং তাহার সকল রেখাগুলিই প্রকৃতিগত, ইহাতে মানসিক রচনা নাই। বিশ্লেষণে (Abstraction) কিঞ্চিৎ মানসিক অতিরঞ্জন আছে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সাধারণ্যের ফল। ইহাতে প্রকৃতির বা দৃষ্টগুণের অবিকলত্ব আছে। দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, সরল রেখা প্রভৃতি বিশ্লেষণের ফল। এতদ্‌সমুদয়ে কিঞ্চিৎ অতিরেক রচনা আছে। দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, সরল রেখা প্রভৃতির অবিকল ধ্যান বস্তুগত নহে। ইহা বস্তুগত ভাবের সাধারণ্যপাতের ফল। জগতে সরল রেখা কোথায়? অথচ সরল রেখার ধারণা মনে আইসে। সুতরাং ইহাতে সাধারণ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক আছে, এবং যাহা আছে তাহাও মানসিক রচনা মাত্র। বিশ্লেষণে সংগৃহীত অস্তিত্বে সম্ভাবনা আরোপিত। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় হইতে গুণ বিশেষ পার্থক্য করাকে বিশ্লেষণ কহে। বহু বিষয়ে প্রকাশমান সাদৃশ্য সংগ্রহের নাম সাধারণ্য। প্রথমটী অপরিহার্য্য মানসিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয়টী অবিরাম বাস্তবিক ঘটনা। প্রথমটী বাস্তবিক ঘটনার মানসিক ধ্যান; দ্বিতীয়টী বস্তুগত ধারণা—আমাদিগের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত ফল। সাধারণ্য বিষয়ভূত অস্তিত্ব; বিষয়ীভূত সাধারণ্যের নাম বিশ্লেষণ।

সে যাহা হউক, যেমন ভিন্ন ভিন্ন জীবের সাধারণ মানসিক ধারণার ফল পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি; জীবন, মন, চৈতন্য, বুদ্ধি প্রভৃতিও সেইরূপ ব্যাপার। এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের তো সীম' নাই; ইহার ভিন্ন ভিন্ন ভুবনেরও বিশিষ্ট সীমা আমাদিগের উপলব্ধি হয় নাই। বিজ্ঞান এখনও সে পক্ষে অন্ধকারে আছে; কখন নিরাকরণ করিতে পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না। অত্র জড়ের শেষ, অত্র জীবের প্রারম্ভ, অত্র উদ্ভিদের সমাপ্তি, অত্র প্রাণীর সূত্রপাত, একথা আমরা কোন মতেই জানিতে বা বলিতে পারি না। তবে এটী বৃক্ষ, এটী পর্ব্বত, এটী পশু, এটী মনুষ্য, একথা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি এবং বলিয়াও থাকি।

বিজ্ঞান এই নিয়মাধীন হইয়া আপন রাজ্য বিভক্ত করিয়াছে। ফলে সে বিভক্তিগুলিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিশদ নহে। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা (Physics) ও দেহতত্ত্বের (Physiology) মধ্যবর্ত্তী। এ তিনটী একত্র করিলে অবশ্য জড়প্রকৃতির অণুর (molecules) সর্ব্ব প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রসায়নে পদার্থবিদ্যার অপেক্ষা কিছু অধিক এবং দেহতত্ত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন আছে। পদার্থবিদ্যায় অণুর সজ্জার এরূপ পরিবর্ত্তন বিবৃত আছে যাহাতে পদার্থের পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু রসায়নে বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন আছে; এমন কি, পরবর্ত্তী বস্তুতে পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুর কোন গুণই থাকে না। দেহতত্ত্বে এ দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনই আছে এবং তদরিক্ত যাহা আছে তাহা উহার কোনটীতেই নাই। রসায়ন ইতিপূর্ব্বে দ্বিভাগে বিভক্ত ছিল। অশরীরজ এবং শরীরজ রসায়ন (Organic)। এই বিভক্তি হইতেই

নানা গোল উপস্থিত হইয়াছে। রসায়ন তদবধি জীবরহস্য ভেদে উদ্যুক্ত। ফলে জীবরহস্য রসায়নের তত্ত্বাধিকারে নাই। শরীরজ রসায়নের তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, কেবল জীব বা উদ্ভিদ্ দেহে কি কি পদার্থ আছে, তাহাদের উৎপত্তিই বা কি প্রকার ইত্যাদি নিরাকরণ করা মাত্র, অর্থাৎ জীব বা উদ্ভিদ্ দেহে আপনি রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীবনী শক্তি সহকারে কি কি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু জীবদেহে রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত যে জীবনী ক্রিয়া আছে তাহা রসায়নের ব্যাখ্যায় নাই। তবে জীবদেহে যে রাসায়নিক ক্রিয়া আছে তাহার ব্যাখ্যা রসায়নে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া জীবনী ক্রিয়া সমস্তই রসায়নে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া প্রাগল্‌ভের কথা। যদি কেহ জীবদেহের কলকৌশলের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জীবনকে সামান্য কলকৌশল (machine) বলেন, তিনিও যে প্রকার উপহাসাস্পদ হইবেন, রসায়নে জীবনী শক্তির ব্যাখ্যাও তদ্রূপ।

রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির উপর দেহতত্ত্ব নির্ভর করে; কিন্তু তাই বলিয়া তন্মধ্যে কোনটীতেই উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা নাই। ইহাতে উক্ত বিজ্ঞানগুলির নিয়মও আছে, এবং তদতিরিক্ত নিজস্বও কতগুলি নিয়ম আছে। দেহতত্ত্ব রসায়ন প্রভৃতি সাপেক্ষ; কিন্তু রসায়ন দেহতত্ত্ব সাপেক্ষ নহে। যে কয়েকটী সাধারণ নিয়মের উপর এই বিভক্তির ভিত্তি তাহা জীবন ও মৃত্যুর বিভিন্নাবস্থার উপর সংস্থাপিত। যে সকল মিশ্রণকে জৈবনিক মিশ্রণ বলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটী জীবনী কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যথা শোণিত, শুক্র, মজ্জা ইত্যাদি। আর কতকগুলি এরূপও আছে যাহারা জৈবনী কার্য্য ব্যতীত স্থায়ী; যথা, সুরাসার, অম্ল, অণ্ডলাল, ইউরিয়া ইত্যাদি।

আমরা জীবদেহ বিশ্লেষ করিয়া যাহা পাই, তাহা আর সংশ্লেষ করিতে পারি না। সে সংশ্লেষরহস্য ভেদ করা আমাদের সাধ্যাতীত। জড়প্রকৃতির সংশ্লেষ বিশ্লেষ উভয়ই সুসাধ্য; জীবপ্রকৃতি বিশ্লেষ হইলেও সংশ্লেষ অসাধ্য। আমরা অনেকগুলি জৈবনিক মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে পারি, কিন্তু তাহা কোন পূর্ব্বস্থিত জৈবনিক পদার্থের অপভ্রংশ মাত্র। তবে জড় ও জীব প্রকৃতির প্রভেদ কোথায়? উভয়কেই বিশ্লেষ করিলে এক জাতীয় রূঢ় পদার্থ পাওয়া যায়। তবে কি অণুর সজ্জায় তাহাদের বিভিন্নতা উপলব্ধি হইয়া থাকে? কাষ্ঠ, চিনি প্রভৃতি এক পদার্থে প্রস্তুত, শুদ্ধ অণুর সজ্জায় ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন। আপাততঃ আমাদের জ্ঞানে ইহার মীমাংসা নাই এবং কখনও হইবে বলিয়াও সম্ভাবিত নহে। তবে যতদূর দেখা যায় ততদূর বলা যাইতে পারে।

যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তিতে জাগতিক মায়া স্ফূরিত, তাহা নানা প্রকারই হউক বা ভিন্নদিকব্যাপী একই হউক; এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পদার্থ একই হউক বা একের ক্রমবিকাশই হউক; অথবা অনন্ত বিভিন্নই হউক, আমরা জড়প্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতিতে এই একটী বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাই যে জীবদেহে নিতান্ত জটিল মিশ্রণ

আছে। লবণের অণুতে দুইটী মৌলিক পরমাণু আছে, কিন্তু সমান্য তৈলবিন্দুতে কত শত ভিন্ন পরমাণু পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রপ্রাণী হইতে যত উচ্চে উঠা যায়, ততই আমরা ঐ অণুর জটিল সজ্জা অধিক দেখিতে পাই। লবণেতে দুইটী পরমাণু পরস্পর এক দিকে আকর্ষণ করে; কিন্তু চিনির অণু ছত্রিশটী বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট। লিবিগ্ বলেন যে ঐ ছত্রিশটী অণুর আমরা সহস্র প্রকার সজ্জা মনে কল্পনা করিতে পারি, এবং তাহার কোনটীর সজ্জার ব্যত্যয় হইলে চিনি আর চিনি থাকিতে পারে না।

অক্সিজেন্, হাইড্রজেন, কার্ব্বন ও নাইট্রজেন্ অসংখ্য ভাবে মিশ্রিত হইতে পারে। কিন্তু শীসা ও অক্সিজেন কেবল দ্বিবিধ মাত্রায় মিশ্রিত হয়। একটীতে অক্সিজেন্ দ্বিমাত্রায় অপরটীতে এক মাত্রায় মিশ্রিত হইতে থাকে। আবার এই দুইটী মিশ্রণ মিশ্রিত হইলে তৃতীয় মিশ্রণ প্রস্তুত হয়। "Lead and Oxygen combine in two proportions only, viz, the protoxide Pb O, and the peroxide Pb O_2, and these unite to form a third combination, red lead. But the combinations of the organogens are innumerable, and differ, not only in relative but in absolute quantities." লৌহ পিণ্ড অতি অল্পে মরিচা ধরে, অর্থাৎ বায়ু হইতে অক্সিজন লইয়া তৎসঙ্গে মিশ্রিত হয়। কিন্তু সেই লৌহ সূক্ষ্ম করিয়া গুঁড়াইলে তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত ও লাল হইয়া উঠে এবং সদ্যই অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া মরিচা হইয়া যায়। ইহার মীমাংসা কি? সূক্ষ্মাকারে কি লৌহ নূতন শক্তি পায়? না সূক্ষ্মাকারে ইহার কার্য্যশক্তির বিশেষ সুবিধা হয়, পিণ্ডে সে শক্তি ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট থাকায় এতাদৃশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই।

জড় ও জীব প্রকৃতির যত উচ্চে উঠা যায় ক্রমে ততই জটিল মিশ্রণ বৃদ্ধি পায়। শক্তির নানামুখীন প্রকাশ। কিন্তু শক্তির এই প্রকার জটিল মিশ্রণ কার্য্য হইতেই জীবদেহে কলকৌশলের ভাব মনুষ্য হৃদয়ে উদয় হয়। এই তাহার ভিত্তি। একবার একটী নূতন শক্তির সৃষ্টি অনুমান কর, অমনি কলকৌশল আসিয়া জীবনরহস্য ভেদ করিতে বসিবে। কিন্তু সেটী মহা ভ্রম। জীবন যে শক্তি বিশেষ তাহা বলাও ভ্রম; কেননা আমরা তাহারও মীমাংসা করিতে পারি না। সুতরাং জীবন কি এ বিষয়ের মীমাংসায় সময় নষ্ট না করিয়া তাহার দৃষ্টকার্য্য আলোচনা করতঃ সম্বন্ধ নিরাকরণ করা যুক্তিযুক্ত। আবার জীবপ্রকৃতি জড়প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ বলাও আমাদের সাধ্য নহে। সুতরাং আমরা যাহা পাই তাহা বলাই উচিত; তদতিরিক্ত অনুমানে বিজ্ঞানের সত্যপ্রিয়তার অবমাননা করা হয়। অস্থির চূণ, মজ্জার ফস্ফরিক্ এসিড্, শোণিতের লৌহ, উদ্ভিদের ক্ষার কোথা হইতে আসিল? খাদ্যে তাহা নাই, বায়ুতে তাহা নাই, জলে তাহা নাই, তবে জীবদেহে তাহা কিরূপে আইসে? জীবনের স্বতঃ শক্তিতে কি ঐরূপ পদার্থ ভিন্নাত্মক পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে? এক সময়ে এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রবল হইয়া উঠিল। জীবদেহ নির্জ্জীবকে সজীব করিবার কল হইয়া দাঁড়াইল। মৃত্তিকা, বায়ু ও

জল হইতে উদ্ভিদ্ কোন বস্তুবিশেষ সংগ্রহ করে; উহা ক্রমে আঁস ও কাষ্ঠে পরিণত হয়। এইরূপে নির্জ্জীব সজীব হইয়া উঠে! তবে কি জড়প্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি এক উপাদানেই প্রস্তুত? বিজ্ঞানের আজকাল অনুমানই তাই। মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে জীব ও অজীবের বিশেষ কোন প্রভেদই নাই। কোন কীটাণু বিশেষে (Gallionella ferraginea) কেবল মাত্র মরিচা (Oxide of iron) পাওয়া যায়। তখন লোকে জীব, অজীবের সীমাবদ্ধ করিতে সংকোচিত হয়। মূলার মৌলিক তত্ত্বের প্রভেদ স্বীকার না করিয়া এতদুভয়ের কার্য্য প্রভেদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন রাসায়নিক মিশ্রণ পদার্থ বিশেষের গুণ ও মিশিবার শক্তির উপর নির্ভর করে; কিন্তু জীবদেহে আমরা তাহার বিপরীত দেখিতে পাই। বরং জীবপ্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যাহাতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ব্যত্যয় জন্মে। সেইজন্য জীবদেহ জীবন থাকিতে পচিয়া যায় না বা বিশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু যেই জীবন যায় অমনি পচিতে থাকে, অর্থাৎ রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হয়। জীবনী শক্তিতে দেহ বিশ্লিষ্ট হইতে পায় নাই। এরূপ অনুমানও দুষ্ট। জীবনী শক্তি অনুমানও ন্যায্য নহে। অধিকন্তু জীবন থাকিতে রাসায়নিক সংযোগ না হয় কোথায়? গাত্রের তাপ কি রসায়নের কার্য্য নহে? দেহ ময় প্রতিমুহূর্ত্তই রাসায়নিক কার্য্য চলিতেছে; তবে আর জীবনী শক্তিতে তাহার ব্যত্যয় কোথায়? অপিচ রাসায়নিক ক্রিয়া জীবনী ক্রিয়ারও অধীন নহে। তবে আর জীবনী ক্রিয়ার নিকট রাসায়নিক ক্রিয়া না হইবে কেন? জীবিতাবস্থায় সে ক্রিয়া নিরস্ত থাকে না, ভিন্নদিকে পরিচালিত হয়। তাহাও জীবনী শক্তির জন্য নহে। আমরা জড়প্রকৃতিতেও তদ্বৎ ভিন্নদিকে ক্রিয়া দেখিতে পাই। গন্ধক ও সীসকে মিশিয়া থাকে। গন্ধক ও সীসক সন্নিকটস্থ হইলেই মিশ্রণকার্য্য আরম্ভ হয়। তবে অন্য কোন বিশেষ কারণ থাকিলে হয় না। কিন্তু যদি লৌহ ও সীসকের মিশ্রণকে আমরা গন্ধকের সহিত একত্র উত্তপ্ত করি, তাহা হইলে লৌহ ও গন্ধক মিলিত হইবে, সীসক স্বতন্ত্র পড়িয়া রহিবে। যতক্ষণ লৌহের অণু অসংযত থাকিবে ততক্ষণ ঐরূপ কার্য্য চলিবে; পরে লৌহ ফুরাইলে অতিরেক গন্ধক সীসকের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকিবে। ইহা কি জীবদেহে রাসায়নিক ক্রিয়াভাবের উপমান হইতে পারে না? জীবদেহ এইরূপ প্রকরণেই বায়ুদ্বারায় জীবিতাবস্থায় বিশ্লিষ্ট হয় না। জ্বলন্ত উত্তপ্ত পাত্রে সল্ফিউরিক্ এসিড্ তরল ভাবে থাকিলে জল দিলে বরফ হয়; ইহাতে কি আমরা তাপের কার্য্য নিরস্ত বলিব? তাহা নহে। সচরাচর কার্য্যই কি কার্য্য? অবস্থা বিশেষে কার্য্য বিশেষ হইয়া থাকে। কার্য্যান্তর পূর্ব্ব কার্য্যের বৈপরীত্য ভাব নহে—দিগন্তর স্ফূরিত ভাব বলিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাসায়নিক কার্য্যে ও জৈবনিক কার্য্যে ভয়ানক প্রভেদ। তবে অধুনাতন বিজ্ঞানের অনুমানে সে প্রভিন্নতা প্রাকৃতিক বিভিন্নতা নহে। জীবনী শক্তি ভিন্ন শক্তির উচ্ছ্বাস নহে; একই শক্তি, ভিন্নমাত্রায় বা অবস্থায় ভিন্নরূপ কার্য্য। নানা দিক্‌ব্যাপী বলিয়াই জীবনলক্ষণাক্রান্ত। ইহা নূতন উদ্ভাবন বা সৃষ্টি নহে।

অজীব হইতে সজীবে আরোহণ করা একটী প্রাকৃতিক গূঢ়তম রহস্য। দার্শনিকগণ সেই রহস্য ভেদ করিবার জন্য আবহমান কাল বহু প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহা তদ্রূপই দুর্ভেদ্য রহিয়াছে। কখন ভেদ হইবার সম্ভাবনাও নাই। এ দারুণ তৃষ্ণা নিবারণ করিবার কোন উপায়ও নাই। আমরা স্বভাবের ব্যাপার দর্শন ও ব্যাখ্যা করিতে পারি; কিন্তু আমাদের তদতিরিক্ত কিছুই করিবার সাধ্য নাই। আমরা ঘটনা বিশেষের পূর্ব্বাপর উদ্ভাবনের সোপানাবলী অনুধাবন করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের আদি কারণে যাইতে পারি না। ভ্রূণের কতকগুলি পর পর অপরিহার্য্য অবস্থা দেখিতে পাই, এবং তাহারও কার্য্য প্রণালী হৃদয়ঙ্গম হয়; কিন্তু ভ্রূণ কেন বা কেমন করিয়া ভ্রূণ হইল, কেন কোন পদার্থ বিশেষ ইহার অন্তর্গত হইয়া প্রকৃতিস্থ হয়, কেনইবা আকার বিশেষ পর পর অবশ্যম্ভাবী, ইত্যাদি জানিবার আমাদের অধিকার নাই।

সজীব ও অজীবের পরিবর্ত্তন-প্রণালী স্বতন্ত্র। সেই পরিবর্ত্তন-প্রণালী ও সংস্থান-সঙ্গতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। সংস্থান পার্থক্যে গতির পার্থক্য। সকল প্রক্রিয়া (function) যন্ত্র সংগঠন সাপেক্ষ। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফুস্‌ফুস্ ও যকৃতের সংগঠনের বিভিন্নতা আছে—সুতরাং কার্য্যপ্রভেদ অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে সজীব ও অজীবের সংস্থান প্রভেদ কি? অনেকেই ইহার সহজ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সজীবের জীবন আছে, অজীবের জীবন নাই! এ ব্যাখ্যায় কোন ব্যাখ্যাই নাই। মাদক দ্রব্যে লোক মত্ত হয় কেন? না ইহার মাদকতা শক্তি আছে! সজীবের জীবন, চেতনের চৈতন্য, রোগীর রোগ, মত্তের মত্ততা, বলীর বল, নামান্তর মাত্র—ব্যাখ্যা নয়।

বৈজ্ঞানিকেরাও শুদ্ধ বিশ্লেষ লইয়া বিব্রত। তাঁহারা কেবল রূঢ় পদার্থ লইয়া জীবনের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। ফলে বিশ্লেষে তাহার ব্যাখ্যা নাই। সংশ্লেষ ব্যতীত বিশ্লিষ্ট রূঢ় পদার্থে সজীবের ব্যাখ্যা কোথায়? কিন্তু বিশ্লেষে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে জীবনের ব্যাখ্যা না থাক, জ্ঞান আছে, সুতরাং সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক। জড়পদার্থের মিশ্রণই দ্বিমাত্রাসম্ভূত (binary); জৈবনিক পদার্থ ত্রি বা চতুর্মাত্রাবিশিষ্ট। রসায়নে একথা প্রমাণ। যতদূর দেখা যায়, তাহা বলায় ক্ষতি নাই; তদতিরিক্ত বলায় দোষ আছে। অশরীরজ পদার্থের রূঢ় দুইটীতে মিশ্রিত হয়; আবার সেই মিশ্রণ অপর দুইটীর কোন মিশ্রণের সহিত রাসায়নিক সংযত হইতে পারে। কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়া দেখ। প্রথমতঃ কার্বন ও অক্সিজনে মিশ্রিত হইয়া কার্ব্বনিক এসিড্ প্রস্তুত হয়। পরে হাইড্রজেন ও নাইট্রজেনের রাসায়নিক মিশ্রণ এমনিয়ার সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বনেট অব্ এমনিয়া হয়। অশরীরজ পদার্থের তিনটী বা চারিটী রূঢ় পদার্থ একবারে মিশ্রিত হইতে দেখা যায় না এবং সেই মিশ্রণে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ সকলগুলির সঙ্গে সমান ভাবেও মিশ্রিত হয় না। কিন্তু শরীরজ পদার্থের নিয়ম স্বতন্ত্র।

অক্সিজেন, হাইড্রজেন, কার্ব্বন, নাইট্রজেন দুই দুই করিয়া মিশ্রিত হইয়া অশরীরজ মিশ্রিত হয়; কিন্তু তাহারা প্রত্যেকটী একত্রে সকলের সহিত মিশ্রিত হইতে কেবল পদার্থের মিশ্রণে দেখা যায়। এই সকল মিশ্রণকে ত্রি বা চতুর্মাত্রা বলা যায়। দ্বিমাত্রা ইহাতে নাই। ষ্টার্চ ত্রিমাত্রা, অণ্ডলাল প্রভৃতি চতুর্মাত্রা। মূলার প্রভৃতি রসায়ন-সাগরদের এই মত। কিন্তু আজকাল উক্ত মতের বিপরীতে ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং উহা আর প্রমাণ্য নহে। প্রত্যহ রসায়নের উন্নতি হইতেছে। এক্ষণে রাসায়নিক ক্রিয়া সর্ব্বত্র দ্বিমাত্রিক; সজীব অজীবে কোনই প্রভেদ নাই। তবে শরীরজ পদার্থ অধিকতর জটিল মিশ্রণ। শরীরজ অণুতে জড়াণু অপেক্ষা শক্তির আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং এক্ষণে আমরা নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে অশরীরজ পদার্থে যে মৌলিক তত্ত্ব আছে শরীরজ পদার্থেও তাহা পাওয়া যায়। তবে শরীরজ পদার্থে যোগ সংখ্যা (higher multiples) অধিক। মৌলিক তত্ত্বের কিন্তু একই কথা।

এক্ষণে তাহাদের সংশ্লেষের কথা কি? যেমন বর্ণ সজ্জায় কথার পার্থক্য, ভাবের পার্থক্য, অর্থের পার্থক্য হয়, অথচ বর্ণ সেই কয়েকটী নির্দ্দিষ্টই থাকে। যথা "কথা", "থাক" "কাথ," ইত্যাদি। সেইরূপ কার্ব্বন, হাইড্রজেন্, অক্সিজেন, সেই এক মাত্রাতেই ষ্টার্চ্চ ও গঁধ হইয়া থাকে। রাসায়নিকগণ বিশ্লেষ করিয়া উভয়ে সমান মাত্রাতেই একরূপই মৌলিক পদার্থ পাইয়াছেন। কিন্তু উহারা মাত্রায় বিভিন্ন নহে; অন্যরূপ প্রভেদ আছে। মৌলিক বিশ্লেষণে (elementary analysis) এক, তবে সাক্ষাৎ বিশ্লেষণে (immediate analysis) করিলে ভিন্ন ফল পাওয়া যায়।

রসায়ন জীবদেহের পদার্থ বিশ্লেষে সমর্থ, সুতরাং তাহাতে ইহার বিশেষ অধিকারও আছে। অধিকন্তু সেই বিশ্লিষ্ট পদার্থগুলি সংশ্লেষ করিবারও ক্ষমতা রসায়নের আছে, কিন্তু সে সংশ্লেষের ফল স্বতন্ত্র। বিশ্লেষের পূর্ব্বে যাহা পাই, সংশ্লেষে তাহার কিছুই থাকে না। এই জন্য জৈবনী শক্তি রসায়নের অনধিকার চর্চ্চা বলিতে হইবে। জীব অজীবে মৌলিক তত্ত্বের পার্থক্য থাক আর নাই থাক, ফলে তাহারা প্রকৃত ভিন্নাত্মিক বা একাত্মিক ব্যাপার, ইহার মীমাংসা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে জীব এবং অজীবে যে দৃশ্যতঃ (phenomenally) বিস্তর প্রভেদ, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান দৃশ্যমালার আলোচনায় ব্যাপৃত, তাহার অন্তস্তলে যাইবার প্রয়াসও নাই—শক্তিও নাই; সুতরাং জীবের ও অজীবের মধ্যস্থ সুবিস্তৃত পরিদৃশ্যমান পার্থক্য লোপ করিবার চেষ্টা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিতে হইবে। দৃশ্য পার্থক্যে ও গুণের পার্থক্যে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন জীবমায়া (phenomena) বিশিষ্ট নিয়ম বা প্রণালীগত এবং সে নিয়ম বা প্রণালী অজীবে সঙ্গত নহে, তখন সজীব এবং অজীবের সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনাই কর্ত্তব্য। বিশ্বমায়ার নিয়ম অনুশীলন ব্রতে বিজ্ঞান ব্রতী; সুতরাং তদন্তস্তলে যাইয়া আদি রহস্য ভেদে প্রয়াস পাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

এই জন্য মহাত্মা কোন্ত শরীরধর্ম্ম রাসায়নিক নিয়মে অনুশীলন করা নিতান্ত অপ্রশস্ত বলিয়াছেন। রসায়নে কোনমতেই জৈবনিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। ফলে জীবদেহে রাসায়নিক ক্রিয়া আছে, এবং শুদ্ধ তাহার অনুশীলনে বিরত হইবারও কারণ নাই। কিন্তু তদতিরিক্ত অনুসরণ করা রসায়নের অনধিকার চর্চ্চা বলিতে হইবে। জৈবনিক ক্রিয়ায় রাসায়নিক ক্রিয়া আছে স্বীকৃত; কিন্তু তদতরিক্ত যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা রসায়নে মীমাংসা হইতে পারে না। অধিকন্তু জৈবনিক ক্রিয়ায় রাসায়নিক ক্রিয়া আছে বলিয়া তৎতাবৎ রসায়নিক নিয়মে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাওয়া ঔদ্ধত্যের কথা। দৃষ্টিবিজ্ঞানে রেখাগণিত আছে বলিয়া তৎসমুদয়কে রেখাগণিতে পরিণত করিবার চেষ্টা পাওয়া অপক্ক বুদ্ধির কর্ম্ম। অবশ্য শরীর-বিজ্ঞান রসায়ন সাপেক্ষ; কিন্তু রসায়ন তৎসাপেক্ষ নহে। তবে রসায়ন ও জীবন-বিজ্ঞানের অধিকারের নির্দ্দিষ্ট সীমা কোথায়? রাসায়নিক কতদূর জীবদেহের অনুশীলন করিবেন? কোন্ত বলেন ইহা স্থির করা অতি সামান্য কথা। যখন কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় মীমাংসা করিতে হইবে তখন উহা রাসায়নিক নিয়মে সংকুলান হয় কি না দেখা উচিত; কিন্তু যখনি তদতিরিক্ত কোন কথা আসিবে, যখনি দেখিবে জীবনের কোন লক্ষণ বা ধর্ম্ম তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে অনুমান হইতেছে তখনি রাসায়নিকের হস্ত সম্বরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার অবিকৃত বিজ্ঞানে যাহা কখনও স্বপ্নে দেখে নাই, এস্থলে তাহাই উপস্থিত। He has only to examine whether the proposed problem can be solved by the application of chemical principles alone, without the aid of any consideration of physiological action whatever. As soon as any of the phenomena of life manifest themselves, he is warned of the presence of more complex agencies than are "dreamt of in his philosyphy". (Comte.)

চেতন ও অচেতন পদার্থের পার্থক্য কি? দৃশ্যতঃ বিস্তর। ফলে মৌলিকত্বে তো বিশেষ দেখা যায় না। তবে কার্য্যের এত প্রভেদ কেন? বৈজ্ঞানিকগণ তাহা ভৌতিক জটিল সজ্জায় আরোপিত করেন। এতদুভয়ের মৌলিক তত্ত্ব এক, সুতরাং কার্য্যপার্থক্যে অণুর সজ্জাপার্থক্য অনুমিত। বাস্তবিক কি উহা অনুমান? হাঁ! কতকটা বটে। তাহার বৈজ্ঞানিক কতক প্রমাণও আছে। কিন্তু সত্য নিরাকরণে এ প্রকার অনুমান সর্ব্বতোভাবে সুন্দর নহে। এস্থলে অনুমান অনেকটা কল্পনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে আমাদের যখন ধর্ম্ম ও নিয়ম লইয়া বিজ্ঞানের ব্যবসায়, তখন এরূপ অকারণ অন্তর্নিহিত কারণ দ্বার উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পাওয়ায় চিত্তের প্রশস্তি নাই।

স্পেন্‌সর, হক্‌সলি, লিউইস, রোমানিজ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জীব ও অজীবের অধস্তনে কোন প্রভেদই দেখিতে পান না। তাঁহারা জীবধর্ম্ম অণুর সজ্জায় ও অবস্থায় দেখেন এবং আরোপিত ব্যাপারের মত বুঝেন। তাঁহারা প্রধানতঃ বীজ ও ডিম্বের দৃষ্টান্তে উহা স্পষ্টীকৃত করিতে যত্ন পাইয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাহারই সামান্য আলোচনা

করিব। বীজ বা ডিম্বকে কি বলিবে? ইহারা কি সজীব পদার্থ? কৈ উহাদের তো জীবনের কোন লক্ষণই নাই। তবে উহারা সজীব জীবদেহে পরিণত হয় কেন? অবস্থা সংযোগে হইয়া থাকে। অবস্থা সংযোগে অন্য পদার্থ হয় না কেন? যখন অন্য কোন পদার্থ সম অবস্থায় বৃক্ষে বা পক্ষীতে পরিণত হয় না, তখন অবস্থা বিশেষ উক্ত বৃক্ষ বা পক্ষীর কারণ নহে। তাঁহারা বলেন উহাদের অণুর সজ্জা এরূপ যে উক্ত অবস্থাগত হইলেই কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে গতি হইতে থাকে, এবং তাহা হইতেই জীবন-লক্ষণ সমুদ্ভূত হয়। কথাগুলি বড় মন্দ নহে। কিন্তু "সজ্জা বিশেষ" কল্পনা মাত্র। উক্তরূপ অবস্থায় উক্তরূপ পদার্থ উক্তরূপ গুণসম্পন্ন হয় বলিয়াই উক্তরূপ অণুর সজ্জা বিশেষ অনুমান আসিতেছে, নতুবা নহে। যখন নির্দ্দিষ্ট সজ্জার কোন জ্ঞানই নাই, তখন তাহার অনুমান কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। নির্দ্দিষ্ট সজ্জা কি, তাহা আমরা জানি না, অথচ অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট সজ্জা আছে, কেন না, নতুবা এমন হয় কি সে? এরূপ চিন্তা বিজ্ঞানানুমোদিত কি না, এবিষয়ে সংশয় রহিল। বিজ্ঞানবিরুদ্ধ না হইলেও জ্ঞানপ্রদ বা চিত্ততৃপ্তিকর নহে।

মনে কর অনেক বীজ বা ডিম্ব উক্ত অবস্থাগত হইলেও নষ্ট হইয়া যায়। তখন উহাতে সজ্জার ব্যত্যয় হইয়াছিল কি প্রকারে বলিতে পারি? যখন সজ্জারই নির্দ্দিষ্ট ভাব আমরা জানি না। তখন নষ্ট হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট সজ্জা ছিল না বলায় বিশেষ জ্ঞানলাভ হইল না। আবার ঐ নির্দ্দিষ্ট সজ্জাও কখন আপনি বা দৈব হইতে দেখা যায় না। এখন তবে বীজ বা অণ্ডকে কি বলিবে?

সজীব না নির্জ্জীব? জীবনের কোন লক্ষণই নাই সজীব কি প্রকারে বলা যায়? আবার যখন অবস্থা সংযোগে জীবন পায়, তখন একবারে জড়বৎ নির্জ্জীব বলাও সঙ্গত নহে। ফলে অণ্ড সেই অবস্থা অভাবে নষ্টও হয়। অনেক ইহাকে অণুর সজ্জা বিশেষ বলেন। অবস্থা সংযোগে দিক্ বিশেষে গতি হইয়া থাকে, ইহার তাহাতেই জৈবনিক কার্য্য দেখা যায়। ইজিপ্টের কবরে যে বীজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আরও হাজার বৎসর থাকিলেও নষ্ট হইত না। অথচ তাহাতে জীবনের কোন লক্ষণই ছিল না। তদবস্থায় হয়ত চিরকালই থাকিত; কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহারা জীবিত বা অঙ্কুরিত হইয়াছে। ইহাতে কি উক্ত অণুর সজ্জাই সুস্পষ্ট হইতেছে না? কিন্তু এস্থলে একটী কথা বলা যায়। সে বীজ নষ্ট হয় নাই কেন? তাহার অন্তরস্থ কোনরূপ কার্য্য ছিল, সন্দেহ নাই; নতুবা নষ্ট না হয় কেন? তবে কি বীজের জীবনী শক্তি ছিল, অবসরে ফুটিয়া উঠিল? বীজ কি তাপ হইতে জীবনী শক্তি পাইল? বীজের অণুর কি বিশিষ্ট সজ্জা আছে, নিহিত শক্তিগুলি দিক্ নির্দ্দেশ করিবামাত্রই অঙ্কুরিত হইল। এ তিনটী কথাই ভুল। অবশ্য বীজে সূক্ষ্ম বৃক্ষ নাই, অণ্ডেও সূক্ষ্ম পক্ষী নাই। কিন্তু তাহাতে এমন কিছু আছে যাহাতে ভবিষ্যদবস্থা সহকারে বৃক্ষ ও পক্ষী হইতে পারে। যদ্যপি তাহাতে পক্ষী বা বৃক্ষের ছায়াও নাই, তবে হয়

কিসে? উত্তর,—এইরূপ হইয়া থাকে, জানি না—বলিতে পারি না। কিন্তু দানা সম্বন্ধেও আমরা তদ্রূপ দেখিতে পাই—চিনির রসে কিছু দানা নাই—তবে হয় কেন? অবশ্য কারণ আছে—তাহা আমরা জানি না।

বীজে বৃক্ষ ও অণ্ডে পক্ষী উৎপন্নের যে কয়েকটী ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে এই দুইটী বীজে বৃক্ষ উৎপাদিকা ও অণ্ডে পক্ষী উৎপাদিকা শক্তি আছে; কিংবা তাহাদের অণুর সজ্জায় উক্ত উৎপাদিকা শক্তি তটস্থা থাকে; অবস্থা বিশেষ বৃক্ষে বা পক্ষীতে পরিণত হইবার দিকে পরিচালিত করে এবং অবস্থা প্রভেদে তদ্দিকে পরিচালিত হয় না। নতুবা অবস্থা বিশেষে বীজে বৃক্ষ ও অণ্ডে পক্ষীর ব্যাখ্যা পাই কই? বীজে বৃক্ষ নাই; অণ্ডে পক্ষী নাই; তাহাদের ভাবী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন সূত্রপাতও দেখা যায় না, এমন কি, সূত্রপাতের সূত্রপাতও লক্ষিত হয় না। অথচ বীজ বৃক্ষের বীজও বটে, অবস্থা সহকারে বৃক্ষে পরিণতও হইতে দেখা যায়; তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও পর বৃত্তান্ত বৃক্ষ এবং অবস্থা বিশেষ। তাহার আদি ও অন্তে সেই এতই কথা। কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বের এবং কোটি কোটি বৎসর পরের বৃত্তান্তও সেই এক। এদিকে বীজ বা অণ্ডে যদিচ অবস্থা সহকারে ভাবী ফল বৃক্ষ বা পক্ষী অপরিহার্য্য; অথচ অবস্থা ব্যত্যয়ে ভাবী ফলের কোন লক্ষণই নাই; কিন্তু ভাবী বৃক্ষ বা পক্ষীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন সূত্রপাতের লক্ষণ না থাকিলেও তাহাতে যে সেই সূত্রপাতের উপকরণ আছে, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না, নতুবা অবস্থা সহকারে হইবে কেন? তবে কেহ বলিবেন সে উপকরণ সজীব—কেহ বলিবেন নির্জ্জীব। এইমাত্র প্রভেদ, যিনি সজীব বলেন তিনি জীবনের তটস্থ আভাস তথায় অনুমান করেন; যিনি নির্জ্জীব বলেন তাঁহার মতে জীবনের উক্ত আভাসটী কল্পনা মাত্র—কৈ তাহার কোন লক্ষণই তো দেখা যায় না। তবে অবস্থা সহকারে সজীব হয় কিসে? অণুর সজ্জা বিশেষে। কিন্তু সে অণুর সজ্জাতেও গোলযোগ আছে। বিশিষ্ট সজ্জা—নিহিত শক্তি—নির্দ্দিষ্ট দিক্ প্রভৃতি অনেক গূঢ় রহস্য আসিয়া পড়ে। কৈ তাঁহাদের ব্যাখ্যাও তো বিশদ নহে। এস্থলে অণু আইসে, শক্তি বিশেষ আইসে। অবশ্য উপকরণ ও শক্তি পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না। কিন্তু মনে কর যদি উক্ত উপকরণে বৃক্ষ বা পক্ষী দেহের সূত্রপাত হইবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে অবস্থা সহকারে হইতে পারে না। এই পরিণতি হইবার সম্ভাবনা বা আশয়কে জীবনী শক্তি বল, নির্দ্দিষ্ট শক্তির দিক্ বা পথ বল, ও সব একই কথা। কেন না অণুর সজ্জা শক্তি বা কার্য্য শূন্য নহে। তাহা পূর্ব্বাপর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। "To this it may be answered that the cause of the predisposition to form organs is the latent, *vital principle*, or chicken-forming force. But I ask, why assume the presence of the mysterious entity? How, if the egg be addled, and no organs are produced, where is the vital principle there?"—G. H. Lewes. পূর্ব্ব প্রশ্নের এ উত্তর সঙ্গত নহে। জীবনবিজ্ঞান এক্ষণে এত সামান্য যে জীবনী শক্তির কল্পনায় একবারে আবশ্যক নয়, বলা যায়। এখনও যখন পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন এতদূর উন্নত হইয়াও নিহিত তাপ, তটস্থা শক্তি (latent heat, catalytic force, potential energy) প্রভৃতি ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য আবশ্যক, তখন জীবনবিজ্ঞানে হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতেও তো শক্তি বিশেষ, সজ্জা বিশেষ, দিক্ বিশেষ প্রভৃতি নানা রহস্য রহিয়াছে। তবে যে অণ্ড বিকৃত হইলে জীবনী শক্তি কোথা যায় এ কথার উত্তর কে দিতে পারে? পক্ষীর গলা টিপিলেও সেই কথা। তবে আর অণ্ডে এ সমস্যা আরোপ করিয়া কি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হইল? মরিলে জীবন কোথা যায় এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উভয়ই সমান জ্ঞানী। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক বলেন বৃক্ষ ও পক্ষী অবস্থা বিশেষে পদার্থ বিশেষের বিশেষ মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেননা আমরা বীজে বা অণ্ডলালে বিশেষ পদার্থ পাই সত্য। কিন্তু যাহা পাওয়া যায়, তাহা বলি কই? পদার্থ বিশেষ ও অবস্থা বিশেষ প্রত্যক্ষের সামগ্রী। তাহাদের মধ্যেও অনেক অনুমান আছে। কিন্তু সজ্জা বিশেষ, শক্তি বিশেষ, গতি বিশেষ কল্পনার আরোপ্য। সম্ভাবনা, আশয় প্রভৃতিও প্রত্যক্ষমূলক; কিন্তু সম্ভাব্য শক্তি প্রভৃতি কল্পনা বা কথার ছটা মাত্র। এস্থলে বিজ্ঞানোচিত যাহা দেখি তাহা বলিলাম কৈ? বৃক্ষে বীজ—পক্ষীতে অণ্ড উৎপাদন করে। যে বৃক্ষ বা যে পক্ষীর বীজ বা অণ্ড তাহা অবস্থা সহকারে সেই প্রকার বৃক্ষ বা পক্ষীতে পরিণত হয়। বীজে বা অণ্ডে যে উপকরণ আছে, তাহা বৃক্ষ বা পক্ষী হইতে উৎপন্ন। তাহাতে যে উপকরণ আছে সে উপকরণে বৃক্ষ বা পক্ষীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন সূত্রপাতও দেখা যায় না বটে—অথচ অবস্থা সহকারে সেই উপকরণেই তৎসমুদয়ের সূত্রপাত হয়। কেন? তাহা জানি না—বুঝিতে পারি না। সজ্জা কল্পনা করি—কেননা জীবনী শক্তি ধরিয়া লইলে চিন্তার বিস্তর ব্যাঘাত হয়। অথচ কি সজ্জা তাহাও জানি না। ফলে অণ্ড ও বীজকে সজীব বলিলে ক্ষতি কি? জীবনের লক্ষণ নাই, বলি কিসে? বরং থাকারই সম্ভব। কৈ অবস্থার ব্যত্যয়ে জীবনের লক্ষণ যায় কোথায়? তাহাতে অবস্থা ভেদে কি? জীবন লক্ষণ দেখা যায় না। বীজকে নির্জ্জীব ধরিয়া শুদ্ধ অবস্থাগুণে সজীব করায় সত্যের ব্যত্যয় হইয়া থাকে।

বীজ বা অণ্ডের পরিপক্ক অবস্থা ও সময় নিরপেক্ষ নহে। তাহারও উৎপত্তি আছে, স্থিতি আছে, মৃত্যু আছে। পক্ষীর অণ্ড পক্ষীর গর্ভে জন্মে—সময়ে পরিপুষ্ট হইতে থাকে—অবস্থা সহকারে বৃদ্ধি ও পক্ষীতে পরিণত হয়। অবস্থার ব্যত্যয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। পক্ষীও সেইরূপ অবস্থা সহকারে উৎপন্ন, পুষ্ট, বৃদ্ধি ও নষ্ট হয়। অণ্ডও পক্ষীর অবস্থা বিশেষ। সে অবস্থা ছাড়িলে পক্ষী পাই নাই। বীজেরও পূর্ব্বাপর অবস্থা সহকারে জীবন লক্ষণ আছে। তবে বীজ বহুদিন থাকিলে, অবস্থা সাহায্য না পাইলে বৃক্ষে পরিণত হয় না—অথচ নষ্টও হয় না। তাহার সে জীবনী শক্তি তখন কোথা যায়? বৈজ্ঞানিকের এ কথার

উত্তর যে যে বৃক্ষবীজে জীবনী শক্তি বা জীবন বহু দিন তটস্থা থাকে—অর্থাৎ বৃক্ষ বীজ বহু দিন থাকিলেও নষ্ট হয় না—অবস্থা সহকারে বৃক্ষ হইতে পারে। তিনি বলিবেন এত দিন তোমার জীবনলক্ষণ কোথায় ছিল? নিহিত অবস্থায়। প্রমাণ কি? প্রমাণ পরে জন্মান। শীতে সর্প, ভেক প্রভৃতির জীবনী ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ সংযত থাকে। ইহার তদপেক্ষা অধিক। এত স্বল্প মাত্রায় কার্য্য হইতে থাকে যে আমাদের দৃষ্ট হয় না। যখন দৃষ্ট নহে তখন কোন্ সাহসে বল? আপনার সজ্জাও আপনি যে সাহসে বলেন। উভয়ই পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার অনুকূল্যে অনুমান। এস্থলে বিশদদৃষ্টি লোকে সজ্জা বা জীবনী শক্তির কল্পনা না করিয়া বলিবেন 'জানি না—হয় তাহাই বলিতে পারি; যে হেতু অবস্থা সহকারে হইতে দেখিয়াছি। নতুবা বলিতাম না'।

বিজ্ঞান অনেক প্রাচীন কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছে, সত্য। কিন্তু নূতন কল্পনাও অনেক স্থলে প্রযোজিত করিতে ত্রুটি করে নাই। বিজ্ঞান শক্তির (force) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানে না; কিন্তু কার্য্যশক্তির (energy) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিতে সঙ্কোচিত নহে। জীবনী শক্তি নহে, অথচ জৈবনী অণুর সজ্জা বিশেষ; রোগ বিশেষের উৎপত্তি কারণ নাই, বিষ বিশেষ আছে; যথা বিসূচী বিষ, সংক্রামক জ্বর বিষ ইত্যাদি; যেন তাহার পূর্ণ তদন্ত হইয়াছে। জীবের স্বতন্ত্র সৃষ্টি নাই—অথচ পৃথিবী তাহাদের উপনিবেশ। দেহে দৈবশক্তির প্রকাশ নাই—স্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ আছে। এমন কি, স্বভাবের রোগ নিবারণ করিবার ক্ষমতাও আছে। নিয়তি নাই—পরিণতি আছে। সময়ে সময়ে বিজ্ঞানবিতের মতোন্মত্তি দেখিলে হাস্য আইসে। তাঁহারা অপরের দোষ বিলক্ষণ দেখিতে পান; নিজের দোষ দেখিতে পান না—বা দেখিয়াও দেখেন না।

"What that Life is we know not—can not know. The mystery is impenetrable. No positive philosopher attempts to penetrate it; we object however to your calling it a Spirit, *as if you knew?*"

ভাল জীবন কি তাহা আমরা জানিও না—জানিতে পারিও না। তবে এ জানিবার ভাণ কেন? তবে আর "জৈবনী অণুর সজ্জা বিশেষের ধর্ম্ম" বলিয়া উল্লেখ করা কেন?

"Positive Philosophy recognises but one object of inquiry—that of laws....." কৈ? তবে এ প্রাগল্‌ভ কেন? যেন অণুর সজ্জায় ও অবস্থাসহযোগে সকল রহস্য ভেদ হইল।

শ্রীপ্যারিলাল মুখোপাধ্যায়।

সরসী ও তটিনী।

নিরিবিলি বনে ছিল আমাদের
ছোট একখানি বাড়ী;
দশটী বারটী বকুলের গাছ,
আশ পাশে ছিল তারি।
সারাদিন ধরে পাতা যায় খসে
টুপটাপ ঝরে ফুল;
পাতায় ফুলেতে হাসি কান্না সম
ছাইত বকুল মূল।
বকুলের তলে বাঁধিয়ে দোলনা
দুলিতাম দুটি বোনে;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত সুখ দুঃখ কথা
জাগিত মনের কোণে।
না উঠিতে রবি ভাই বোনে ছুটি
যেতেম বকুল তলে;
কুড়াইয়ে ফুল গাঁথিতাম মালা,
পরাতে মায়ের গলে।
মাথার উপরে উড়ে উড়ে যেত
পাখীগুলি গান গেয়ে;
সম্মুখে সরসী জল নিতে তায়
আসিত পাড়ার মেয়ে।
চিনিতাম সবে, প্রতিদিন তারা
নিয়ে যেত জল তুলি;
পাইতাম ব্যথা একদিন যদি,
কেহ না আসিত ভুলি।
মরাল কয়টী ছিল সরসীতে
ফুটিত কমল রাণী;
এক পাশে তার বাঁধা ছিল এক
অতি ক্ষুদ্র তরী খানি,।
দিতাম সাঁতার সরসীর জলে
সুখেতে ভাসায়ে তনু;
রবির কিরণে জল-কণা ভাঙ্গি
রচিতাম ইন্দ্রধনু।
দুপুরের রোদে সরসীর ধারে
করিতাম ছুটাছুটি;
চমকি উঠিত পদ শব্দ পেয়ে
শ্রান্তকায় গাভী দুটী।
দাঁড়ি মাঝি যাত্রী ভাই বোনগুলি,
তরী খানি বাহিতাম;
বাহিতে বাহিতে সকলেতে মিলি
গান কত গাহিতাম।
সরসীর পাড়ে গাছের আড়ালে
ফুটিত চাঁদের হাসি;
সরসীর মাঝে দাঁড়ের তরঙ্গে
ফুটিত চাঁদের রাশি।
শ্রান্ত হয়ে ফিরে সাঁঝের পরেতে,
আসিতাম মা'র কোলে;
উপকথা কত শুনিতে শুনিতে
ঘুমেতে যেতেম ঢোলে।

* * *

আজিকে হেথায় নাহি সে সরসী
নাহি সে কুটীর খানি;
তটিনী বহিছে ভাসিয়া যেতেছে
কোথায় নাহিক জানি!
কূলেতে তাহার শত শত
অচেনা অজানা দেশ;
কত লোক আসে কত লোক যায়,
আনা গোণা নাহি শেষ!

বিশাল তরণী শত যাত্রী লয়ে
পাল তুলে ভেসে যায় ;
জানি না কাহারা দাঁড়ি মাঝি ওর,
কিবা তারা গান গায় !
শিশু কোলে নিয়ে হেথাও জননী
গাঙে আসে জল নিতে ;
ভাই বোন দুটী হাতে হাতে ধরি,
খেলে কূলে হর্ষ চিতে।
একদৃষ্টে চেয়ে থাকি মুখপানে,
যদি বা চিনিতে পারি ;
কি জানি যদি বা আমায় হেরিয়ে
মনে স্নেহ হয় তারি।
নিরাশ হইয়ে আকুল হৃদয়ে
শূন্যে পুনঃ চেয়ে থাকি ;
অতীতের পায়ে ঝর ঝর ঝর
অশ্রুজল ফেলে আঁখি।
কোথায় আমার শৈশব সরসী
কোথা সে সাধের ঘর ?
সংসারের কূলে জীবন তটিনী
দেখে মনে লাগে ডর !
অন্য কূল হায় না জানি কোথায়
(সংসার কঠিন বড়) ;
কেহ নাহি চেনে কারেও হেথায়
সকলেই ভাবে পর।
তটিনীর জলে পরে পরে তাই
মিশিতেছে আঁখি জল ;
আমার গানেতে তটিনী মিলায়
বিলাপের কল কল !

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

বেল্লিকের বকামি।

বাঁশবেড়ের বিনোদবিহারী বাবু বড় বিষয়ী ব্যক্তি। বিপিনবিহারী বিনোদ বাবুর বড় বেটা। বেটার বিবিধ বাজে ব্যয়ে বাপের বহু বিস্তৃত বিষয় বিক্রয়—বলা বাহুল্য বাপ বর্ত্তমান ব্যাপারে বড় বিরক্ত বিধায় বিপিনের বাঁশবেড়ের বসতিতে বিরাগ। বাহুড়বাগানের বহুবল্লভ বিদ্যাবিনোদের বসত বাড়ীর বামে বিপিনের বাপের বিশ্বাসী বন্ধু বদন বিশ্বাসের বাসায় বিপিনের বৎসরেক বাস।

বড় বাজারের বসন্ত বাবুর বার বৎসর বয়স্কা বালিকা বিমলার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া বংশীবাদন, বিমলার বাঁশি বাজানর বাহাদুরীতে বিপিনের "বাহবা বাহবা'বলা,—বিমলাকে বিবাহের বাঞ্ছা। বাঁশিতে বিমোহিত বিপিনের ব্যগ্রতা বুঝিয়া বিশে বৈশাখ বুধবারে বসন্ত বাবুর বিপিন বিমলাকে বিবাহের বন্ধন।

বিপিন বসন্ত বাবুর বাসনের বিপনীতে বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত, বিপিনের বিজ্ঞতা বলে ব্যবসায়ের বৃদ্ধি। বেতন, বারবরদারীর বন্দোবস্ত বিষয়ে বসন্ত বাবুকে

বলায় বাবুর বিরক্তি। বৃথা বাক্য ব্যয় বাহুল্য বুঝিয়া বপিনের বিদায়। বেড়াইতে বেড়াইতে বৃহস্পতি বার বৈকাল বেলা বৈদ্যবাটীর বামন বিশ্বাসের বাসায় বসিয়া বসন্ত বাবুর বিবিধ বদনাম ব্যাখ্যা।

বসন্তবাবু বিমলাকে বলিলেন "বাছা, বাপের বাড়ী বরাবর বাস ব্যবস্থা বিরুদ্ধ"। বাপের বচনে বিমলার বিধুবদন বিমর্ষ। বৎসরেক বাদ বাঁশবেড়ের বেহাইকে বেহারার বন্দোবস্ত বিষয়ে বসন্ত বাবুর বলা। বিপদ বুঝিয়া বিপিনের বাপের বন্দনা। বাপের বিপরীত বিরাগ। বসনাবৃতা, বাষ্পবারি-বিগলিতা বিমলাকে বাহকবর্গের বাঁশবেড়ের বাড়ীতে বহন। বাঁশবেড়ের বিপিন বিমলার বার বৎসর বসবাস। বিমলা বন্ধ্যা বিধায় বিপিনের বিরাগ, বিষয় বাসনা বিসর্জ্জনে বৃন্দাবনে বাসেচ্ছা। বিমলা বিষাদিতা। বিনোদবিহারী বাবু বৃদ্ধ বয়সে বংশে বাতিবর্জ্জন বুঝিয়া বিষণ্ণ,—বিষাদে বৃদ্ধের বাড়ীর বাহিরে বেড়ান বন্ধ, বসিয়া বসিয়া বাতব্যাধি; বিষম বেদনায় ব্যাকুল—বাহাত্তর বৎসর বয়সে বৈকুণ্ঠে বাস।

বিপন্ন বিপিন বিশুষ্ক বদন,—বাসবাটী বিক্রয়, বিপিন বিমলার বিবাদ,—ব্যাপার বড় বিষম বুঝিয়া বিপিনের বৃন্দাবনে বাস, বিমলার বৈষ্ণবী বেশে বিন্ধ্যাচলে বিশ্রাম।

কুড়ান।

(বিনামা বন্ধুবিরচিত।)

ইংলণ্ডের কোন নগরের একটি স্কুলে, নিম্ন শ্রেণীতে এক শিক্ষক মহাশয় জিওগ্রাফি পড়াইতেছিলেন। নানাপ্রকার প্রশ্ন হইতেছিল, উত্তরও ততোধিক প্রকার, সকলেই স্ব স্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উত্তর দিতেছে। অবশেষে মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "ভারতবর্ষ কি ?" প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র, ভিন্ন প্রকার উত্তর দিতে লাগিল, কেহ বলিল "ইউরোপের উত্তর পূর্ব্ব দিকের একটি উপ-সাগর," অন্য এক জন ছাত্র বলিল" আল্পস পর্ব্বতবাসী বৃহৎ জন্তু বিশেষ। অপেক্ষাকৃত একটি বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞ ছাত্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "ভারতবর্ষ হচ্চে আফ্রিকা দেশের একটা ভল্‌কানো" অর্থাৎ আগ্নেয় গিরি। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মাষ্টার মহাশয় ক্লাশের সর্ব্ব কনিষ্ঠ একটি ছেলের দিকে চাহিলেন, সে লাফাইয়া উঠিয়া তার বড় বড় চক্ষু দুটি মাষ্টার মহাশয়ের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল। মশায় আমি বল্‌তে পারি ভারতবর্ষ কি ? 'ভারতবর্ষ' হচ্চে এমন একটা জিনিষ যার নাম শোন্‌বামাত্র মাত্র আমাদের ঘুম আসে।" উত্তরটা শুনিয়া ক্লাশের মধ্যে ভারি হাসির ধুম পড়িয়া গেল। কিন্তু উত্তরদাতা বালক হাসির কোন কারণ

বুঝিয়া পাইল না। সেত ঠিকই বলিয়াছে, সুতরাং কিছু মাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় বসিল। মাষ্টার মহাশয় কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত এই উত্তরের তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, অবশেষে তিনি একদিন শুনিলেন বালকটি পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভার একজন সভ্যের পুত্র, সে প্রায়ই পিতার সহিত মহাসভায় যাইত ও সকল বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিত। যখনই মহাসভায় ভারতের নাম উঠিয়াছে—তখনই সে তাহার পিতা ও অন্যান্য সভ্য মহোদয়েরা চোখের উপর হ্যাট টানিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিতে পাইত, সুতরাং তাহার বিশ্বাস "ভারতবর্ষ" এমন একটা জিনিষ যাহার সহিত ইংরাজ জাতির নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইবার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

আর একবার স্কটলণ্ডের এক মেম সাহেব ভারত ভ্রমণে আসিবেন স্থির করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল ঘরে বসিয়াই ভারত সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া জাহাজে উঠেন, তদনুসারে তিনি নানাবিধ সংবাদ পত্র দেখিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার বিবিধ প্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হইল। কিন্তু তিনি এক খানি সংবাদপত্রের একটি বিবরণে কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবগত হইলেন যে ভারতবর্ষে ধূসরবর্ণ, মুণ্ডধারী একপ্রকার চতুষ্পদ প্রাণী দলে দলে শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া শরীরের রক্ত শোষণ করে ও নিদ্রার ভয়ানক ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। যাহা হউক ইংরাজ রমণী যখন একবার ভারতে আগমন বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন তখন আর এই ভীতি উৎপাদক বিবরণ পাঠে পশ্চাৎপদ হইলেন না, জাহাজে চড়িয়া ভারতে আসিলেন। একটি পরিষ্কার প্রভাতে জাহাজ বম্বের বন্দরে পৌছিল, মেম সাহেব নিজ কামরা হইতে বাহির হইয়া বম্বে সহরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, সহসা তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন, দেখিলেন বম্বেতে বন্দরের উপরেই একটি প্রাণী দাঁড়াইয়া তাহার বর্ণ ধূসর ও এক শুঁড় বর্ত্তমান আছে, তাড়াতাড়ি জাহাজের কাপ্তেনের কাছে আসিয়া মেম সাহেব বলিলেন, "আমার আর বম্বে না বা হচ্ছে না"। কাপ্তেন বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মেম সাহেব উত্তর করিলেন, "শেষে কি বিদেশে আসিয়া মারা পড়িব? ঐ রকম প্রাণী দলে দলে রাত্রিকালে আমার ঘরে গিয়ে রক্ত শোষণ করিবে? কি ভয়ানক!!" কাপ্তেন সাহেব হাসিয়া বুঝাইলেন এ গুলা একটা হাতি, নিতান্ত নিরীহ জন্তু, অনেক বাক্যব্যয়ের পর মেম সাহেব বুঝিলেন তিনি হস্তী ও মশাকে এক জানওয়ার ঠাওরাইয়াছিলেন। চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা!

স্থাপত্যবিদ্যালয় ও ডাগো স্ট্যাটি কলেজ

পত্র।

আমরা অল্প দিনের জন্য পুনায় বেড়াইতে আসিয়াছি। পুনার প্রকৃত নাম পুণ্যপুর তাহা বোধ হয় জান; নাম সার্থক বটে। এমন সুদৃশ্য শোভাময় স্থান বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমি আরো অনেক বার পুনায় আসিয়াছি, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কখনো আশ মিটিল না। নগর প্রান্তে আকাশের গায় শ্যাম পর্ব্বতের স্তর; সুপ্রশস্ত রাজপথের ধারে—কোথাও বিচিত্র উদ্যান ভবনাবলি, কোথাও পদ্ম-শোভিত হ্রদ, কোথাও প্রশস্ত শ্যাম ক্ষেত্র, কোথাও লীলাময়ী নদীর সুনীল জলরাশি শোভা সম্পাদন করিতেছে। মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে সোলাপুরের মত শুষ্ক তরু বিরল ক্ষেত্র এবং কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় ভূমিও দেখা যায়, কিন্তু মরুদৃশ্য এবং উপবন শোভার এই মিলন বৈচিত্র্যে পরস্পরের শোভা আরো রমণীয়রূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

পুনায় দুইটি সাধারণ ভ্রমণোদ্যান আছে। একটি সৈনিক কানন (Soldiers' Gardens) খড়কওয়াসলা নামক খালের ধারে। আর একটি বাঁধের বাগান (Bund Gardens)। সম্বৎসর জলপূর্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে নদীর যে উচ্চ বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে, এই বাগান ঠিক সেই বাঁধের ধারে। এই কানন পুনার পুণ্য নিকেতন বা সৌন্দর্য্য কেন্দ্র। এ বাগান একবার দেখিলে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনেও আর মন উঠে না। "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ"-এ কথা এখানে ঠিক খাটে। মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে ও রুচিচাতুর্য্যে প্রকৃতি সেখানে চিত্রিত; এখানে স্বয়ং প্রকৃতির আবির্ভাব;—তাই উদ্যান শোভা প্রাকৃতিক শোভায় মিলিত হইয়া এখানে এক অলৌকিক মহিমাময় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। কানন তলে দাঁড়াইয়া দেখ, দুই নদীর সম্মিলিত বিশাল জলপ্রপাত প্রস্তর-গঠিত উচ্চ বাঁধ অতিক্রম করিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতে হইতে চৌদিকে শুভ্র নীহার-কণা বিকীর্ণ করিয়া সুমধুর গভীর কল্লোলে নিম্নের প্রস্তর-খণ্ডময় বিদারিত উৎখাদিত ভূমিতে পড়িয়া ক্ষীণ ভাবে বহিয়া যাইতেছে। নদীর এক পার্শ্বে পর্ব্বত দৃশ্য, অন্য পার্শ্বে সেই অতি মনোহর ক্ষুদ্র কানন,—যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ। কাননের কোন স্থলে মাটী দেখা যায় না। ফুলের টব, বৃক্ষতল, ভ্রমণ পথ, উদ্যান ভূমি, সর্ব্ব স্থলই কঙ্করাচ্ছন্ন। এই শ্বেত কৃষ্ণ কঙ্কর শোভার মধ্যে স্থানে স্থানে বিচিত্র ফুলের কেয়ারি, স্থানে স্থানে তরুলতার বিচিত্র নিকুঞ্জ, স্থানে স্থানে ফুলের টবের অপরূপ বিন্যাস, এবং স্থানে স্থানে বসিবার লৌহাসন। মধ্যস্থলে ফোয়ারা খেলিতেছে। ফোয়ারার ক্ষুদ্র হ্রদে নীলাকাশ প্রতিবিম্বিত, ভ্রমণ পথের ধারে ধারে ক্রমক্ষীণ সুন্দর ঝাউ শ্রেণী মন্দির চূড়ার ন্যায় শোভিত হইয়াছে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে দিগন্তের উজ্জ্বল মেঘাংশ উকি মারিতেছে।

আর এই সকল শোভার শোভাস্বরূপ হইয়া পারসী যুবক যুবতী, বালক বালিকাগণ কতকগুলি বা উদ্যানে বিচরণ করিতেছে, কতকগুলি বা বাগানের সীমানায় লৌহশিকলের নিকট দাঁড়াইয়া জলপ্রপাতের শোভা দেখিতেছে, কোন দুইটী যুগলমূর্ত্তি বা নির্জ্জন লৌহাসনে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া আছে। পারসী ললনাদিগের বর্ণ-লাবণ্য ও সাজ সজ্জার শোভায় কাননদেশ যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ জ্যোৎস্না রাত্রে, চন্দ্রশোভিত নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলে, কাননের শুভ্র কঙ্করমণি যখন ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে, এক দিকে নদীর জলোচ্ছ্বাসে অন্য দিকে ফোঁয়ারার ধারায় যখন স্নিগ্ধ চন্দ্রজ্যোতি খেলিতে থাকে, ব্যাণ্ডের বাজনা জলকল্লোলের সহিত যখন অপরূপ তান মিশাইতে থাকে, তখন কাননবিহারী পারসিকদিগের মুখপানে চাহিয়া মনে হয়, ইহা কি অপ্সরারাজ্য—অলকাপুরী?

এই যে সকল শোভা সৌন্দর্য্যের কথা বলিলাম, দেশীয় পাড়ার সহিত তাহার অনেকটা দূর সম্বন্ধ। ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধান ভানিতে হয়—ইহা ত জানা শুনা কথা। এই সুদৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও এখানকার দেশীয় পাড়া তাহার অবস্থার শোচনীয় চিরগৌরব সমানভাবে রক্ষা করিয়াছে। সেই গলি ঘুঁজি রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে সেই খুবড়ি খুবড়ি দোকান ঘর, দোকানের আশে পাশে সেই ছোট ছোট জানালা দরজাওয়ালা সরু, লম্বা তিনতলা চৌতলা নীরেট বদ্ধ বসতবাড়ী। ইহাদের নির্ম্মাণ কৌশলের বিশেষত্বই যেন এই, কত কম আলো ও হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়। গুণের মধ্যে বাড়ীগুলো পাথরের—ও নিতান্ত আঁট সাঁট মজবুদ। আমাদের হিন্দুজাতি নাকি মায়াবাদী—এই মায়াময় অস্থায়ী সংসারে যাহা যতটুক স্থায়ী করিয়া ভোগ দখলের সুবিধা করা যাইতে পারে—তাহারি দিকে তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন সকলের মধ্যেই এই ভাব। সৌন্দর্য্যের জন্যই সৌন্দর্য্যের আদর, আমাদের শিল্পে কম দেখা যায়। স্থায়ীত্বেই আমরা শিল্পের সৌন্দর্য্য ফুটাইতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে দেখা যাইতেছে মায়াবাদে আমাদের আরও বেশী রকম Practical করিয়া তুলিয়াছে, আর ইংরাজেরা Practical বলিয়া মায়াকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সার বুঝিয়াছে, Eat, drink, and be merry। চিরদিন কিছুই থাকে না সত্য, আমরাও থাকি না, তবে যতদিন আছি সুখে থাকি, আরামে থাকি; যতটুকু পাই ভোগ করি। অত স্থায়ী অস্থায়ী দেখিবার আবশ্যক কি, বর্ত্তমানের ভাবনাই ভাব, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কি লাভ! সুন্দর যাহা কিছু পাও আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা কর, যতটুক পার যতটুক না পার। সুযোগ যতদূর পার আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর, যতটুক পাও আর যতটুক না পাও। ইহাকেই বলি জ্ঞানবাদী। ইহাতেই ইংরাজ দুদিনের জন্য কোন স্থানে গিয়াও তাহার মধ্যে যতটুক আরামে থাকিতে পারে তাহার চেষ্টার ত্রুটি করে না। আর আমাদের হাতের কাছে থাকিলেও দুদিনের সুবিধাকে আমরা অবজ্ঞা করি।

পুনার ইংরাজ পাড়ার অধিকাংশ বাড়ী এখানকার বড়মানুষ লোকের। কিন্তু ময়রার সন্দেশের মত তাঁহারা অধিকারী মাত্র, ভোগ করেন ইংরাজে। হরিরাওজি নামে পুনার এক হিন্দু ধনী, ডিউক অব কনটের জন্য যে রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখন তাহা খালি পড়িয়া আছে,—তবু তিনি তাহাতে বাস করেন না; সম্ভবত দেশী পাড়ার এক অন্ধকার খুবড়ির মধ্যে তাঁহার বসতি। নিঃস্বার্থ পরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত!

আমার মতে পুনার, পুণ্য স্থান বাঁধের বাগান, কিন্তু এদেশীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিবে না। পুনার পার্ব্বতী মন্দিরের নাম শুনিয়া থাকিবে, তাহাই পুণ্য পুরের পুণ্যতীর্থ বলিয়া খ্যাত। পার্ব্বতী-পাহাড়ের উপর পুনার পেসোয়াদিগের যে বিশ্রাম প্রাসাদ ছিল ইহা তাহারই সংলগ্ন মন্দির। মন্দির-দেবীর নাম হইতে পাহাড়ের নাম পার্ব্বতী হইয়াছে। পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে মন্দির পাদমূল পর্য্যন্ত সিঁড়ির ধাপ, একটি ধাপ হইতে আর একটী ধাপের মধ্যে এত ব্যবধান যে তাহার মধ্যে অন্ততঃ আরো ১০টী মানান-সই সিঁড়ি হইতে পারিত। তবে এই ব্যবধান গুলিও এমন ঢালু যে উঠিতে কোন অসুবিধা হয় না। সিঁড়ির সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০শ খানেক হইবে। এত সিঁড়ি এক টানে উঠা আমাদের অবশ্য কর্ম্ম নহে, আমরা দুই তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া তবুও গলদ্ঘর্ম্ম অবস্থায় মন্দির দ্বারে আসিয়া পঁহুছিলাম। এতক্ষণ আশা ছিল দেবী দর্শনে সমস্ত কষ্ট সার্থক হইবে। ওমা, উপরে উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই মন্দিরদ্বারস্থিত এক স্থূলকায় স্ত্রীলোক আমাদিগকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। আমাদের সঙ্গী বন্ধুটী অনেকবার করিয়া বলিলেন আমরা হিন্দু, কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস করে কে? প্রথমতঃ আমাদের পায়ে জুতা, দ্বিতীয়তঃ আমাদের ভাব ভক্তিতে দেব ভক্তির সম্পূর্ণ অভাব। আমরা মন্দির দেখিয়াই প্রণাম করি নাই বা পূজক যখন দেবপ্রসাদ ফুল চন্দন আমাদের হাতে দিলেন, তখনও আমরা প্রণত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলাম না। আমাদের অহিন্দুত্বের এই সকল অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে অন্যের মুখের সামান্য কথার বল কতটুক! তবে অহিন্দুকে যেন মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায় না; কিন্তু তাহার দান ত অস্পৃশ্য নহে। সুতরাং পুরোহিত মহা বিনীতভাবে আমাদিগকে দূর হইতে দেবদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রেলের বেড়ার বাহিরে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে দৃষ্টিনিবেশ করিলাম। মন্দির অপেক্ষাকৃত অন্ধকার, অতদূর হইতে মূর্ত্তি ভাল দেখা যায় না। পুরোহিত অনুগ্রহ পূর্ব্বক মূর্ত্তির নিকট প্রদীপ ধরিলেন। আমরা এদিকে ঝুঁকিয়া ওদিকে ঝুঁকিয়া যথাসাধ্য প্রকারে দেবীমূর্ত্তিকে দর্শনায়ত্ত করিতে প্রয়াস করিতে লাগিলাম। কিন্তু বৃথা! সম্মুখে মূর্ত্তি সত্য, স্বর্ণময় বৃহৎ দেবমূর্ত্তি! কিন্তু পার্ব্বতী কোথায়? গণেশকে ক্রোড়ে করিয়া এত মহাদেব বিরাজ করিতেছেন! আমরা হতাশ হইয়া অবশেষে বলিলাম—"পার্ব্বতী

ত দেখিতেছি না, ইহা ত মহাদেব!" পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "সকল লোক পার্ব্বতী দেখিতেছে—তোমরা দেখিতেছ না?" ভাবখানা—তোমাদের মত ত পাপী ভূভারতে নাই। যে পুরোহিত আলো ধরিয়া দেবদর্শন করাইতেছিল, সে বরঞ্চ লজ্জিতভাবে বলিল—"না না, এই দেখ, ভাল করিয়া আলো ধরিতেছি।" আবার আমরা মহাদেবের চারিদিকে পার্ব্বতীর অন্বেষণ-তৎপর হইলাম। অনেক কষ্টে দেখিলাম, মহাদেবের ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র এক পার্ব্বতী মূর্ত্তি লম্বোদর গজাননের পার্শ্বে এমন লুকাইয়া আছে যে দেখা যায় কি না যায়।

এখানে পার্ব্বতীর নামে মহাদেবই ধন্য। তবে এরূপ ফাঁকি জুঁকিতে দেবী যদি কিছু মনে করেন, তাহার প্রতিবিধানস্বরূপ মন্দিরগৃহের বহিস্থ দুই দেয়ালে পার্ব্বতীর দুই বৃহৎ মূর্ত্তি চিত্রিত। কিন্তু এই চিত্রের প্রতি কাহারো আকর্ষণ বা ভক্তি দেখা গেল না। সকলে আসিয়া মন্দিরস্থিত দেবদেবীকেই প্রণাম করিতে লাগিল। একজন স্থূলকায় মহারাষ্ট্রী ললনা এমন সুন্দরভঙ্গীতে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া উঠিল, দেখিলে মনে হয়, তাহার জন্য বিশেষ কস্তের আবশ্যক। কতকগুলি সুসজ্জিত গুজরাটী স্ত্রীলোক দেবী-প্রণাম করিয়া পাহাড়ের অন্যান্য স্থান দেখিয়া বেড়াইতেছিল, আমরাও তাহাদের পথানুসরণ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিঁড়ি হইতে উপরে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে পার্ব্বতী মন্দির,—চারিদিকে পরস্পর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বিতল প্রকোষ্ঠ, বামদিকের প্রথম প্রকোষ্ঠ নহবৎখানা। এই শ্রেণীতে একটী ত্রিতল প্রকোষ্ঠও আছে, ইহার বাতায়ন সম্মুখে সুন্দর দৃশ্য উদ্ঘাটিত। নীচে "পদতলে খড়ক ওয়াসলার" হ্রদ প্রবাহিত, দূরে পাহাড়ের পদতলে খিড়কির সুবিস্তৃত মাঠ। এই খিড়কির মাঠেই যুদ্ধ জয় করিয়া মহারাষ্ট্রদিগের নিকট ইংরাজেরা পুনা লাভ করেন। খিড়কি আর কি পুণার আলিপুর—এইখানেই গভর্ণমেণ্ট হাউস; অপরাপর মান্যগণ্য ইংরাজ রাজপুরুষগণও অনেকে এখানকার নদীর ধারের বাঙ্গালায় বাস করেন।

যে দিন খিড়কির ক্ষেত্রে ইংরাজ মহারাষ্ট্রীতে যুদ্ধ হইতেছিল, সেদিন পুনার শেষ পেসোয়া বাজিরাও পার্ব্বতীর উল্লিখিত ত্রিতল প্রকোষ্ঠ হইতে আপনার অদৃষ্টপরিণাম দর্শনে নিযুক্ত ছিলেন। যখন দেখিলেন পরাজিত মহারাষ্ট্রীয় সেনা পলায়নপর, তখন তিনিও প্রাসাদ উত্তীর্ণ হইয়া পলাতক হইলেন। পাহাড়ের এক প্রান্তে পেসোয়াদিগের ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান, প্রাসাদের নিকটে আর একটি শিব-মন্দির। মন্দিরের পুরোহিতগণ গভর্ণমেণ্ট হইতে এখনো বৃত্তি পাইয়া থাকেন। পার্ব্বতীর এই রাজপ্রাসাদে নাকি সাতবার বজ্র পড়িয়াছিল। বাজিরাও রাজ্য হারাইবার বৎসর খানেক আগে বুঝি শেষ বজ্র পতন হয়। জ্যোতিষীগণ ইহাতে রাজার ভাবী অমঙ্গল সূচিত দেখিলেন। তাহা শুনিয়া বাজিরাও দান ধ্যান দেব পূজা স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বিধিমত প্রকারে এই অমঙ্গলের প্রতিবিধানে সযত্ন হইলেন। কিন্তু

পোড়াকপাল জোড়া দেওয়া দেবতারো সাধ্যায়ত্ত নহে। অগ্নিদেবের রাজ-অদৃষ্টের প্রতি এমনি কৃপা যে তাঁহার পুনার যে প্রাসাদ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড অফিস হইয়াছিল, ১০।১২ বৎসর আগে সেই প্রকাণ্ড প্রস্তর অট্টালিকাও পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পেসোয়াদিগের আমলের পুরাতন প্রাসাদ পার্ব্বতী যাইতে পথে এখনও দু একটী দেখা যায়। চূড়াযুক্ত বৃহত্তোরণ বাড়ীগুলির বহির্ভাগ দেখিতে বেশ সুদৃশ্য, ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুক্ত উঠান, চারিদিকে চকমিলান ঘর, কিন্তু ঘরগুলি বিশেষতঃ জানালা দরজা নিতান্ত ছোট ছোট।

পার্ব্বতীর মন্দির ছাড়া আমরা পুনার আর একটি পাহাড়-মন্দির দেখিয়াছি। তাহাও দেবীমন্দির, কিন্তু দেবীর নাম জানি না। গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাছে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে একটি লম্বা ঘর—ঘরের মধ্যে সাত হাত পুরু মাটি জমিয়াছে, তাহার একদিকে দেবী বিরাজিত, মূর্ত্তিখানি চাঁদপারা বলিতে পারা যায়। দেবীর শরীরে হাত পা নাই, মুখখানি পাথরের চাক্তি, তাহাতে নাক চোখের শুধু চিহ্ন মাত্র আছে, আর আগাগোড়া সমস্তই সিঁদুর মাখান। ইঁহার মাহাত্ম্য কতদূর জানি না, তবে পূজার অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখিলাম না। গৃহের কোণে ঢাক ঢোল পড়িয়াছিল—আমাদের কর্ণকুহর বিদারিত করিয়া দুইজনে তাহা পিটিতে আরম্ভ করিল, আর পূজারী প্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করিতে লাগিলেন—শেষ হইলে বলিলেন—বড় জাগ্রত দেবতা, আমাদের যদি কোন মানস থাকে, চাহিলে তাহা পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমরা ইহাতে বিপরীত অর্থ বুঝিলাম। সুতরাং নিজের মানস মনে রাখিয়া পুরোহিতের মানসসিদ্ধি করিয়াই গৃহে ফিরিলাম।

নিজ পুনার এই সকল পাহাড় নিতান্ত ছোট ছোট, তবে ইহার কাছাকাছি অনেকগুলি বড় পাহাড় আছে, যেমন মহাবলেশ্বর, পঞ্চগণি, সিংহগড়। মহাবলেশ্বর ত গ্রীষ্মকালে পুনার বিহার ভবন, বড় বড় ইংরাজেরা প্রায় অনেকেই সেখানে যান, কেহ বা পঞ্চগণি ভালবাসেন। সিংহগড় ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং নিকটে। ইহা পুনা হইতে মোট ১৪ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। আমি মহাবলেশ্বর, পঞ্চগণি দেখি নাই, কিন্তু পূর্ব্বে একবার সিংহগড়ে গিয়াছিলাম। সিংহগড় শিবজির একটি প্রধান দুর্গ ছিল। ইহার প্রকাণ্ড পাহাড় পথ ছাড়া লুক্কায়িত একটি সোপান পথ আছে। আমরা সেই সিঁড়ি দিয়া অনেকটা নামিয়াছিলাম, কিন্তু সবটা নামি নাই। পাহাড়ের মধ্য দিয়া অন্ধকার সোপানশ্রেণীর বেশী দূর যাইতে সাহস হইল না। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে এখনও কামান পড়িয়া আছে। আমরা যখন সিংহগড়ে গিয়াছিলাম, তখন বর্ষার শেষ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝরণার শোভা, আর পাহাড়ের ক্রোড়ে যেখানে সেখানে হ্রদ। এই হ্রদই সিংহগড়ের একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য। আমি ত অন্য পাহাড়ে এরূপ হ্রদ দেখি নাই। পাথরের জমির উপর স্থানে স্থানে পরিষ্কার জল তক্ তক্ করিতেছে, দেখিতে বড় সুন্দর। সিংহগড়ের সর্ব্বত্রই প্রায় পাথর, দারজিলিংয়ের মত ইহা মৃত্তিকা-বহুল পাহাড় নহে।

পাহাড়ের কোন কোন স্থানে গাছের জঙ্গল, জঙ্গলে কোথাও একটা ভগ্ন মন্দির, মন্দিরে বীরহনুমান মূর্ত্তি, স্থানে স্থানে বৃক্ষতলেও সিন্দুরচর্চ্চিত পবননন্দন অধিষ্ঠিত।

সিংহগড়ের উচ্চ শিখরদেশে আমরা ছিলাম, তাহার একটু নীচে এক গ্রামে দেবালয় দর্শন করিতে গিয়া দুই একটি প্রকাণ্ড বল্মীকস্তূপ দেখিয়াছিলাম। একটিত মন্দির গৃহের শিখর দেশ প্রায় স্পর্শ করে করে এত উচ্চে উঠিয়াছে।

পুনার কাছাকাছি কারলি গুহা প্রভৃতি আরো কতকগুলি দর্শনীয় স্থান আছে। কিন্তু তাহা আমাদের দেখা ঘটিয়া উঠে নাই, ইচ্ছাও নাই। আপাততঃ আমরা পুনার বহির্শোভা ছাড়িয়া অন্তর্শোভা দেখিতে ব্যস্ত আছি। দেখিতেছি, পুনার গৌরব কেবল বাহিরের নহে, অন্তর্মহিমাতেও পুনার পুণ্য প্রকাশিত। কিছুদিন পূর্ব্বে পুনা মহারাষ্ট্রীয় রাজধানী ছিল, এখন যদিও সে হৃত-রাজ, তথাপি হিন্দুসম্ভ্রমের এখনো ইহা আকর স্থল। যে হিসাবে বোম্বাইকে পারসিপ্রধান সহর বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কেননা ধনে মানে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে পারসীকেরাই সর্ব্বাগ্রে এবং প্রধানতঃ যেখানে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই হিসাবে পুনাকে হিন্দুপ্রধান স্থল বলা যাইতে পারে। রানাদে, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি এদেশের শীর্ষস্থানীয় গণ্যমান্য উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ এখানে বাস করেন। একদিকে তাঁহাদের প্রবাহিত সমাজ-সংস্কার স্রোত, অন্যদিকে স্থিতিশীলদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই আঘাত প্রতিঘাত সংঘর্ষণে এখানকার হিন্দু সমাজে একটি জীবন্ত ভাব দেখা যায়। তথাপি বঙ্গ সমাজের তুলনায় এ স্রোতোবেগ মৃদু মন্দ। এ দেশের প্রার্থনা সমাজের সভ্য একেশ্বরবাদীগণও আচারে হিন্দুত্ব রক্ষা করিয়া চলেন। সেইজন্য এতদিন উন্নতিশীল ও স্থিতিশীলের মধ্যে বড় একটা বিবাদ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি উন্নতিশীলদিগের এক ঘর-শত্রু বিভীষণের কৃপায় বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিলক মহাশয়ও পূর্ব্বে সমাজ সংস্কারক ছিলেন, কিন্তু Consent Bill পাশ হইবার সময় বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন করিয়া "শুধাকর"দিগের (সংস্কারক) ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এমন কি, এক মিসনারীর টি পার্টিতে গিয়া সম্প্রতি যাঁহারা চা খাইয়াছিলেন তিলক-প্রমুখ দল তাঁহাদিগকে একঘরে করিয়াছে। এখন আর ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া একঘরে করা যায় না; এখানে ভিক্ষুক বলিয়া একরূপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আছে ক্রিয়াকর্ম্মের সময় তাহারা দান গ্রহণ না করিলে নাকি ক্রিয়াকর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। তাহারা ইহাদিগের নিকট দান গ্রহণে নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু রাণাদে মহাশয় এক বুদ্ধি খেলিয়াছেন। তিনি ছয় জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত চা-পায়ীদিগের মধ্যে কাহারো ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে ভিক্ষুকের অভাবে তাহাদের ক্রিয়া নষ্ট হইবে না।

যাহাহউক সমাজের এই নির্যাতন সহ্য করিয়াও উন্নতিশীলগণ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—ইহা মহারাষ্ট্রীজাতির কম গৌরবের কথা নহে। স্ত্রীশিক্ষাও বিস্তার লাভ করিতেছে,

বাল্যবিবাহ-রোধ ও বিধব বিবাহ প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য পড়িয়াছে। এলফিনিষ্টন কলেজের প্রফেসর মোদক তাঁহার কন্যাকে ১৩।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়াছেন, এবং পণ্ডিতপ্রবর ভাণ্ডারকর সম্প্রতি তাঁহার বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিয়াছেন। সমাজ এখন চীৎকার করিয়া মরুক।

কোন দেশের সামাজিক অবস্থার সহিত সাহিত্যের অবস্থার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। একের উন্নতির উপর অন্যের উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং বলা বাহুল্য সাহিত্যেরও এদেশে উন্নতি সাধিত হইতেছে। তবে এ সম্বন্ধেও বঙ্গদেশ অধিক সৌভাগ্যবান্, এদেশের বর্ত্তমান সাহিত্যে বঙ্গের প্রতিভা দেখা যায় না। তেমন পুরাতন সাহিত্যে মহারাষ্ট্রের নিকট বঙ্গ নতমুখ। ক্যাবাংশে উভয় সাহিত্যই সমতুল বলা যাইতে পারে; আমাদের বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় তুকারাম, জ্ঞানেশ্বর, নামদের প্রভৃতি সুবিখ্যাত ভক্ত কবিগণ মহারাষ্ট্র সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন বঙ্গ সাহিত্যের ন্যায় এইখানেই তাহার গৌরবের সীমা নহে। মহারাষ্ট্রী পুরাতন সাহিত্যের প্রকৃত মান, তাহার ইতিহাসে বথরে। আসল কথা মহারাষ্ট্রী পুরাতন জাতি, বাঙ্গালী নূতন জাতি, বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবার কিছু ছিল না, তাই ইতিহাস নাই। কীর্ত্তি থাকিলেই তবে ত তাহা কীর্ত্তিত হইবে? তাই ভারতের অন্যান্য সকল জাতির নাম ও মান তাহাদের পুরাতন গৌরবে—বাঙ্গালীর নাম বর্ত্তমানে, ও মানের আশা ভবিষ্যতে।

যাক্ কি বলিতেছিলাম, এদেশে এখন সাহিত্যেরও বেশ অনুশীলন দেখা যায়। নগরে গ্রামে সাপ্তাহিক পত্রিকার ছড়াছড়ি, মাসিক পত্রিকাও নিতান্ত বিরল নহে! স্ত্রীলোকও এখানে সম্পাদকতা কার্য্য করিয়া থাকেন। মিশেষ কনিৎকর মনোরঞ্জন নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা। ইহাতে নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদও ইহাতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কনিৎকর মহাশয় নিজে মিলের Subjection of women তর্জ্জমা করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহাতে প্রকাশ করিাছেন। সম্পাদিকা উপন্যাসাদি লেখেন। অনেকেই আজকাল উপন্যাস লিখিতেছেন। সম্প্রতি বাজিরাও পেসোয়ার পতন সম্বন্ধীয় একখানি উপন্যাস আমরা উপহার পাইয়াছি, তবে মহারাষ্ট্রী ভাষায় এতদূর বিদ্যা নাই যে ইহার গুণপনা কতদূর বিচার করিতে পারি। কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি কল্পনাপ্রসূত রচনাদি ছাড়া ইংরাজি কাব্যাদির যথেষ্ট অনুবাদও হইতেছে। আমরা ওথেলো ও হ্যামেলেটের অভিনয় যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ত অনুবাদ বেশ সুন্দর বলিয়া মনে হইল। অনুবাদে কাব্যের মূল ভাব বজায় রাখিয়া নাম প্রভৃতির পরিবর্ত্তনে ঠিক্ দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। নহিলে ডেসডেমোনার নাকে নথ আর হ্যামলোটের মহারাষ্ট্রী ভাষায় আত্ম চিন্তা সমস্তই অদ্ভুত হইত। কিন্তু রাও সাহেবের কন্যা চন্দ্রাবতীতে সে সাজ সজ্জা যেমন স্বাভাবিক হইয়াছিল বীরসেনের মুখে তাহার

আত্ম-চিন্তাও তেমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পুরুষই যদিও এই অভিনয়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিল, তথাপি মোটের উপর অভিনয় বেশ ভালই বলিতে হয়। বীরসেনের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল।

পুনায় অনেকগুলি সভা সমিতি আছে। এখানকার আর্য্য মহিলা নামক মহিলা সমাজ ও সার্ব্বজনীন সভা নামক রাজনৈতিক সভার নাম ত আগেই জানিতাম; তাহা ছাড়া পুরুষদিগের খেলা ধূলা, পাঠ, সম্মিলন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দুইটি ক্লব স্থাপিত দেখিতেছি। একটি নিজ সহরের মধ্যে হিন্দু ইয়ুনিয়ান ক্লব আর একটি সহরের বাহিরে ডেকন ক্লব, এখানে পারসী, মুসলমান, হিন্দু সকলেই সভ্য হইতে পারেন, সভ্যের সংখ্যাও না কি ইহার মধ্যে বিস্তর হইয়া পড়িয়াছে।

এতদ্ব্যতীত একটি সমাজ সংস্কারক সভা স্থাপনের অভিপ্রায়ে রানাদে মহাশয় কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার নিয়মাবলী প্রচার করিতেছিলেন। তাহার তিনটি নিয়ম এই—

১। ইহার সভ্য কেহ বিধবা বিবাহে বাধা দিবেন না।

২। যৌবন বিবাহে আপত্তি করিবেন না।

৩। সুরা পান করিবেন না।

এ সভা সংগঠিত হইয়াছে কি না রাণাদে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম ২০০০ হাজার যুবক ইহার সভ্য হইতে প্রস্তুত, কিন্তু আপাততঃ পুনা যেরূপ উন্নতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান তাহাতে কিছুদিনের জন্য তাঁহার মতে সভা সংগঠন স্থগিত রাখাই ভাল। তিনি বলেন কনসেণ্ট বিলের গোলযোগ হইতে পুনা সামাজিক উন্নতিপক্ষে ৫০ বৎসর পিছু হঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রানাদেই এখানকার উন্নতিশীলদিগের নেতা এবং উপযুক্ত নেতা। সমাজের অবস্থা বুঝিয়া সাবধানে অথচ অটলপদে তিনি অগ্রসর হইতেছেন। প্রার্থনা সমাজেরও ইনিই এখন দলপতি। এই প্রার্থনা সমাজ পূর্ব্বে পরমহংস সমাজ নামে একটি গুপ্ত সভা ছিল। বম্বের ডাক্তার আত্মারাম এবং রাম বালকৃষ্ণ এই দুজনে ইহার প্রথম স্থাপয়িতা। সভ্যগণ একেশ্বর মানিবেন এবং জাতি বিচার করিবেন না এই শপথবদ্ধ হইয়া শপথ পালনের নিদর্শনস্বরূপ পরস্পরের উচ্ছিষ্ট পাঁউরুটির টুকরা পরস্পরে ভক্ষণ করিতেন। তাহার পর ক্রমে এই পরমহংস সমাজ প্রার্থনা-সমাজ নাম ধারণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মতত্ত্ব—কেয়ার্ড।

বর্ত্তমানকালে যে সকল ইংরেজ দার্শনিক জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জন কেয়ার্ডের নাম শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শুনিয়াছেন। ইনি একখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেকগুলি বিষয় কূটতর্ক হইতে উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা এমন কি সাধারণ পাঠকের ধর্ম্মজ্ঞান লাভের পথ পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই স্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতে কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রস্তাব যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় প্রকাশ করিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শন এতদুভয়ে কি সম্বন্ধ। এই জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবশ্য কোন না কোন মূল কারণ আছে ইহা আমাদিগের একটী ধ্রুব বিশ্বাস। বিশেষ বিশেষ বস্তু কিম্বা বিশেষ বিশেষ ঘটনা কখনও বা আবির্ভূত হইতেছে, কখনও বা লোপ পাইতেছে; কিন্তু তাহারা সকলেই একটী সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগের সকলের প্রকৃতিতেই একটী সাধারণ প্রকৃতি বিরাজমান আছে। এই সাধারণ কারণ কিম্বা সার্ব্বভৌমিক সত্য কি? দর্শনে এই গূঢ় প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হয়। বস্তুসমূহের ও ঘটনাবলীর বিশেষত্ব ভেদ করিয়া তাহাদিগের সাধারণ প্রকৃতি জ্ঞাত হওয়াই দর্শনের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য যে জগতের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চাহিলে জগৎকর্ত্তার প্রকৃতি অবগত হওয়া প্রয়োজন; অর্থাৎ ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধিতে ইহা যতদূর বুঝিবার ক্ষমতা আছে ততদূর বুঝা চাই। অতএব আমরা দেখিতেছি যে দার্শনিক শুদ্ধ দর্শন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না; বিলম্বেই হউক আর অবিলম্বেই হউক, অবশেষে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিতে হইবে। অর্থাৎ দার্শনিক প্রশ্নসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে পৃথক্ রাখিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব এই দুইটী বিষয় পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে? দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে সকলের এক মত নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে দর্শনের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের কোনই সম্পর্ক নাই; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধি কি করিয়া অসীম ঈশ্বরের প্রকৃতি বুঝিতে সক্ষম হইবে? আবার কেহ কেহ বলেন, মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, ইহা সত্য; কিন্তু এই জ্ঞান বুদ্ধি হইতে জন্মে না, ইহা বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়। এই সকল লোক বিশ্বাস বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জ্ঞানমার্গ কল্পনা করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের মতে উহা সামান্য বুদ্ধি হইতে একটী পৃথক্ মানসিক বৃত্তি। আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মবিষয়ে সত্যসমূহ ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন—যেমন বেদে, বাইবেলে, কোরাণে—সুতরাং সে বিষয়ে আর মানুষের বুদ্ধির দ্বারা

কিছু বলিবার নাই; তাহার উচিত ঐ সকল প্রকাশিত বাক্য নিঃসন্দেহ ভাবে মানিয়া লওয়া। এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে যদি কোন সার্ব্বভৌমিক সত্য নিরূপিত করিতে হয়, ধর্ম্মতত্ত্ব যদি একটী বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হয় (যাহা সকলেই গ্রাহ্য করিবেন) তাহা হইলে অবশ্য সর্ব্বপ্রথমে উক্ত তিন প্রকার আপত্তির খণ্ডন করা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রথমে ইহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক যে ধর্ম্মতত্ত্ব আমাদিগের বুদ্ধির আলোচ্য বিষয় কি না, ইহাতে আমাদিগের বুদ্ধির প্রবেশাধিকার আছে কি না।

হার্বার্ট স্পেন্সর প্রমুখ দার্শনিকেরা বলেন যে, জগতের মূলকারণ কি তাহা জ্ঞাত হওয়া আমাদিগের বুদ্ধির সাধ্যাতীত। এই মূল কারণ সম্বন্ধে অনেকবার অনেকপ্রকার মত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের একটীও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিবার সুবিধা নাই। অতএব বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্ব এ দুটী একত্র আনিবার সম্ভাবনা নাই; দার্শনিক যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে চলিতে চাহেন তবে তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শন হইতে দূরে রাখিবেন। যাহা কিছু আমরা প্রকৃত পক্ষে জানিতে পারি, তাহা বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়া থাকে; আর ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিষয়ের আন্দোলন হয় মাত্র। স্পেন্সর বলেন যে ধর্ম্ম অর্থে আর কিছুই নহে—জগতের অজ্ঞেয় কারণকে নিঃশব্দে ভক্তি করা মাত্র। অর্থাৎ এই "কারণ" কি তাহা আমরা জানি না, তবে কোন না কোন একটী কারণ আছে ইহা আমরা জানি, আর আমাদিগের উচিত ঐ কারণের প্রতি ভক্তিমান হওয়া। স্পেন্সরের এই অজ্ঞেয়তাবাদের দুইটী হেতু আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ আমরা অতীত ব্যুৎপত্তি হইতে দেখাইতে পারি যে কোন বিষয়ে আমাদিগের প্রকৃত জ্ঞানলাভের পথ নাই; অর্থাৎ আমরা যাহা কিছু জানি তাহা আমাদিগের বুদ্ধির সাপেক্ষ; কোন বস্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাহা আমরা জানি না, উহা আমাদিগের বুদ্ধির নিকট যেরূপ বোধ হয় আমরা উহাকে কেবল তাহাই বলিয়া জানি। আমরা যখনই কোন পদার্থ বাস্তবিক পক্ষে কি ইহা জানিতে সচেষ্ট হইয়াছি, তখনই দেখিতে পাইয়াছি যে তাহার সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী দুই প্রকার মত দেওয়া যাইতে পারে অথচ এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী সত্য আর কোন্‌টী মিথ্যা, তাহা আমরা জ্ঞান দ্বারা স্থির করিতে পারি না। যেমন পদার্থের অবিভাজ্য অংশ আছে বা উহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে অবিরত বিভাগ করিবার সম্ভাবনা আছে, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমরা জ্ঞানবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি এবং পরীক্ষার ফল ইহা দাঁড়াইতে পারে যে মানুষের কোন বিষয়ে বাস্তবিক জ্ঞান লাভের পথ নাই। এই দুইপ্রকার হেতু প্রকৃতপক্ষে একই দাঁড়ায়—অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানবৃত্তি বাস্তবিক জ্ঞানলাভের অধিকারী নহে। স্পেন্সর এই দার্শনিক মত সার উইলিয়ম হামিল্‌টন ও ম্যানসেলের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহারা আবার উহা জার্ম্মাণি দেশের কাণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহারা বলেন যে আমরা যখন কোন বস্তু চিন্তা করি, তখন উহা অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া

থাকি—যেমন যখন 'ক'য়ের চিন্তা করি, তখন উহাকে খ গ প্রভৃতি হইতে বিভেদ করি। এইরূপে বিভেদ না করিলে, স্পষ্ট জ্ঞান জন্মিতে পারে না। এক্ষণে দেখ যে অসীমকে চিন্তা করা যাইতে পারে কি না; যাহা অসীম তাহা সর্ব্বগ্রাসী তাহাকে কি করিয়া অন্য বস্তু হইতে পৃথক করা যাইবে। যে মুহূর্ত্তে অসীমকে অন্য একটী বস্তুর পার্শ্বে কল্পনা দ্বারা দাঁড় করাইবে—সেই মুহূর্ত্তে অসীম আর অসীম রহিল না উহা সসীম হইয়া পড়িল। অতএব যখন আমরা অসীম বা আদি বস্তুর উল্লেখ করি তখন আমরা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিষয়ের উল্লেখ করি মাত্র। স্পেন্সর যদি এইরূপ বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি একপক্ষে অজ্ঞেয়তাবাদ প্রচার করিতেছেন আবার অপর পক্ষে কি বলিতেছেন দেখা যাউক। তিনি বলেন যে যদিচ আদিবস্তু কি তাহা আমরা কোন প্রকারে কিম্বা কোন অংশে প্রকৃত অর্থে জানিতে পারি না, তথাচ আমাদিগের জ্ঞানবৃত্তি বলিয়া দিতেছে যে উহার বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে এবং যতদিন ঐ বৃত্তি বিদ্যমান থাকিবে ততদিন এই অস্তিত্ব জ্ঞানও বিদ্যমান রহিবে।

এই বিষয়ে কেয়ার্ড কি বলেন তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে একপক্ষে আদিবস্তু অজ্ঞেয় আবার অপর পক্ষে আদিবস্তু অস্তিত্ববান্ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। উহা বাস্তবিকই যদি অজ্ঞেয় হয় তবে উহার অস্তিত্ব জ্ঞান কিরূপে সম্ভবপর হইবে? কেয়ার্ড অনুমান করেন যে অসীম আদিবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে যে অসীমের কল্পনা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুকে সসীম বলিবার পথ নাই। আমরা যে সমুদয় বিষয় জানি সে সমুদয়ই সসীম; কিরূপে জানি যে তাহারা সসীম? অসীমের তুলনায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে অসীম নামে একটী বস্তুর কল্পনা আবশ্যক। স্পেন্সর যেখানে বলিয়াছেন যে আমাদিগের জ্ঞান সসীম, সেখানে অবশ্য তাঁহার পক্ষে অসীমের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ কেয়ার্ড বলেন যে মানুষের জ্ঞান সসীম বলিয়া স্বীকার করিলে অসীম যে অজ্ঞেয় শুদ্ধ ইহাই সপ্রমাণ হয় না; অসীম অস্তিত্ব-বিহীন কিম্বা অসীমের অস্তিত্ব আরোপ আমাদিগের পক্ষে অর্থহীন ইহাও সপ্রমাণিত হয়। স্পেন্সর, হামিল্‌টন ও ম্যানসেল ইহাদিগের কেহই নাস্তিক নহেন; ইঁহারা কেহই মানুষের ধর্ম্মবৃত্তি লোপ করিতে চাহেন না। হামিল্‌টন ও ম্যানসেল বলেন যে মানুষ যেখানে বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না সেখানে অবশ্য উহার বিশ্বাসের সহায়তা লইতে হইবে। বাইবেলে যাহা ঈশ্বর স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন লোকের তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া বিশ্বাস করা উচিত। স্পেন্সর বলেন জগতের অজ্ঞেয় কারণের প্রতি ভক্তিমান্ হও।

কিন্তু মানুষের বুদ্ধি যদি বাস্তবিকই জগতের আদিকারণ জ্ঞাত হইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরই বা কি প্রকারে তাহাকে ঐ বিষয়ে জ্ঞান দান করিবেন? জন্মান্ধ যেরূপ

লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণ কাহাকে বলে কোন মতে বুঝিবে না, জন্ম-বধির যেরূপ কোনমতে তানলয় প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, মানুষও সেইরূপ উক্ত মত অনুসারে কোন প্রকারে অসীমের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। হামিল্‌টন ম্যানসেলাদি দার্শনিকদিগের মতে মানুষের বুদ্ধি স্বভাবতঃই সসীম লইয়া আবদ্ধ, তবে আর কি প্রকারে উহা অসীমে পৌছাইবে। উহার সসীমতা যদি একটী রোগের স্বরূপ হইত, তাহা হইলে না হয় ঈশ্বর উহা শোধন করিয়া দিতেন; কিন্তু সসীমতা যেখানে উহার প্রকৃতিতে বদ্ধমূল বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন আর ঈশ্বরই বা কিরূপে তাহার দূরীকরণ সাধন করিবেন? আবার দেখ আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, তাহাই যদি সসীম হয়; তবে আর আমরা কি করিয়া অসীমের অস্তিত্ব চিন্তা করিব। স্পেন্সর বলেন যে আমরা অসীমের অস্তিত্ব অবগত আছি, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অবগত নহি। ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? অসীমের অস্তিত্ব যখন আমাদিগের চিন্তাক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবে, তখনই উহা সসীম হইবে সুতরাং উহা বাস্তবিক পক্ষে অসীমের অস্তিত্ব রহিবে না। সহজ ভাষায় ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা যে অসীমের প্রকৃতি অবগত নহি, কেবল ইহাই নহে; আমরা অসীমের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও চিন্তা করিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ কেয়ার্ড বলেন যে উল্লিখিত দার্শনিকগণ যখন আদিকারণকে মানব বুদ্ধির অজ্ঞেয় বলিয়া প্রচার করেন, তখন তাঁহারা একটী কাল্পনিক আদিকারণের অবতারণা করেন মাত্র। তাঁহারা প্রথমতঃ এমন একটী আদিকারণের কল্পনা করেন যাহার রূপ রস, গন্ধ স্পর্শাদি কোন গুণ নাই, যাহা কেবল চক্ষুকর্ণাদির অগোচর নহে, যাহা এমন কি বুদ্ধির অগোচর; এবং তৎপরেই আবার তাঁহারা বলেন যে, এই আদি কারণ অবগত হইবার পক্ষে মানবীয় বুদ্ধির কোন ক্ষমতা নাই। অবশ্য নাই; প্রথমেই যদি কল্পনা করিয়া লওয়া হইল যে উহা বুদ্ধির অগম্য, তবে আবার কি করিয়া বুদ্ধি দ্বারা উহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। কেয়ার্ডের মতে আদি কারণ বাস্তবিক পক্ষে উক্ত প্রকার নহে; ইহা অসীম বটে অথচ সসীম হইতে পৃথক্ নহে। ইহা অসীম হইলেও ইহা হইতেই সর্ব্বপ্রকার সসীম উদ্‌ভূত হইতেছে, আর সসীমেই ইহার প্রকৃতি প্রকাশিত হইতেছে। মানবাত্মা সসীম হইয়াও অসীমের জ্ঞান লাভে প্রকৃত পক্ষে অধিকারী।

চতুর্থতঃ কেয়ার্ড কহেন যে অজ্ঞেয় কারণের উপাসনা করা সম্ভবপর নহে। যাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না ন্যায্য পক্ষে তাহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতে পারি না আর তাহার উদ্দেশে নতশিরও হইতে পারি না। সত্য বটে যাহা জ্ঞানের অগোচর তাহা ভাবিতে যাইলে আমাদিগের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহার সহিত ধর্ম্মভাবের কতকটা সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানের সীমায় পৌছাইয়া স্পেন্সর যেরূপ কহিতেছেন জগতের আদিকারণ দৃশ্যমান জগতের সসীম বস্তু সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহাদিগের মধ্যে কাহারই সহিত উহার তুলনা হয় না; ধর্ম্মেও আবার

সেইরূপ বলিয়া থাকে যে সৃষ্ট বস্তু হইতে স্রষ্টা পৃথক্, তাহার সহিত ইহার তুলনা হয় না। কিন্তু ধর্ম্মের এই বচন উহার শেষ বচন নহে; ধর্ম্ম যদি ঈশ্বর অজ্ঞেয় বলিয়া নীরব থাকিত তাহা হইলে আর ধর্ম্মের দ্বারা সংসারের কোন কার্য্য সাধিত হইত না। ধর্ম্ম যখন কহে যে সৃষ্টের সহিত স্রষ্টার তুলনা হয় না, তখন তাহার উদ্দেশ্য এই যে মানুষের আত্মাকে ইহ জগতের অসার পদার্থ হইতে উচ্চে উত্তোলিত করিয়া জগতের আত্মার দিকে উহাকে আকৃষ্ট করা। সংসার অসার বলিলেই ধর্ম্মের চূড়ান্ত হইল না; সার বস্তু কি তাহাও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে পুরুষে সমুদয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রাশি লুক্কায়িত রহিয়াছে, যিনি আলোক স্বরূপ এবং যাঁহাতে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই, ধর্ম্ম সেই পুরুষেরই উপাসনা ও আরাধনা করিয়া থাকে। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কারণকে বাস্তবিক পক্ষে অর্চ্চনা করা যাইতে পারে না। যেখানে কোন প্রকার জ্ঞান নাই, সেখানে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে; অসভ্য জাতিরা যেরূপ নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বাস্তবিক ও কল্পিত পদার্থের ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞেয় বস্তুর প্রতি প্রীতি ও ভক্তি জন্মিতে পারে না আর উহা ব্যতিরেকে ধর্ম্মও তিষ্ঠিতে পারে না।

অজ্ঞেয় কারণ শব্দে স্পেন্সর কি বুঝেন তাহা পাঠককে একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। এই জগতে আমরা যে সমুদয় পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদিগের রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি কতকগুলি গুণ আছে; এই সকল গুণভেদেই পদার্থদিগের বিভেদ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সকল গুণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই বস্তুর বিশেষত্ব থাকে অর্থাৎ আমরা রামকে রাম আর শ্যামকে শ্যাম বলি। মনে কর গুণগুলি সব লোপ পাইল, তাহা হইলে অবশ্য আর রাম ও শ্যামে কোন বিভেদ রহিল না। সবই একাকার হইয়া গেল; আর বাকী রহিল কি? কেবল অস্তিত্ব। রাম অর্থে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট অস্তিত্বশালী বস্তু; এক্ষণে যদি বিশেষ গুণগুলি উঠাইয়া লও, তাহা হইলে অস্তিত্বটী কেবল অবশিষ্ট থাকে। এই অস্তিত্ব কোন বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব নহে, ইহা সকলের পক্ষেই এক; ইহার নাম সাধারণ অস্তিত্ব। স্পেন্সর বলেন যে এই সাধারণ অস্তিত্বই জগতের আদি কারণ। কেয়ার্ড বলেন তাহা হইতে পারে না; ইহা আমাদিগের কাল্পনিক বিষয় মাত্র। ইহা শুষ্ক মরুভূমির ন্যায়, ইহা হইতে পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবে না। যাহা বাস্তবিক নির্গুণ, তাহা হইতে কি প্রকারে গুণশালী বস্তু সমূহের উদ্ভব ঘটিবে? এই নির্গুণ, কাল্পনিক আদি কারণকে উপাসনা করা ধর্ম্ম নহে; উহা বৈজ্ঞানিক উন্মত্ততা মাত্র। উহা অপেক্ষা কেয়ার্ডের মতে অন্যান্য সকল প্রকার ধর্ম্মই ভাল; নৈসর্গিক শক্তির উপাসনাই বল, হনুমান বিড়াল সর্প প্রভৃতির উপাসনাই বল, এমন কি প্রস্তর খণ্ডের উপাসনাই বল, ইহার কোনটীই উক্ত অজ্ঞেয় কারণের উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট ভিন্ন নিকৃষ্ট নহে।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সুরেশের উপহার।

ঐ টেবিলের উপর একখানি পুরাণ ব্লটিংবুক পড়িয়া আছে দেখিতেছ? এখনো উহা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হয় নাই। এখনো উহার চামড়া খুব মজবুৎ আছে, সোণালি ছাপান ফুল প্রায় আগেকারই মত চক্‌চকে রহিয়াছে। ভিতরে কাগজ রাখিবার খাপ পূর্ব্ববৎ অচ্ছিন্ন অবস্থাতে রহিয়াছে। কেবল মলিন মলাটের উপর চিত্রবিচিত্র ছবি, হিজিবিজি, ও বড় বড় কালীর ফোঁটা। একটী জায়গায় পরিষ্কার ছোট ছোট অক্ষরে কোণাকুণি লেখা রহিয়াছে "বন্ধুবর"। সব হিজিবিজি সব কালীর দাগের মধ্য হইতেও ইহা চোখে পড়িতেছে—অন্ততঃ সকলের না হউক এক জনের। আলিপুরের "ফ্যান্সি বাজারে' রাশীকৃত সুন্দর মূল্যবান জিনিষের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এই একটী সামান্য জিনিষ সুরেশ কিনিয়া আনিয়াছিল। সুরেশ যখন সবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছে তখন মন্মথ বি-এ পড়ে। তখন মন্মথর মত প্রতিভাশালী ছাত্র সে স্কুলে আর ছিল না। তার প্রতিভার কিরণে শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল, তার গৌরবে সমস্ত স্কুলের গৌরব। এখন কল্পনাই করিতে পার অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর বালকদের হৃদয়ে মন্মথের প্রতিভা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মন্মথ প্রায় কাহাকেও জানে না, কিন্তু মন্মথকে সকলেই বিশেষরূপে জানে। তাহার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে অনেক বালক আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত; অথচ স্কুলে আপনা হইতে গিয়া এক জন বয়স্ক ছাত্রের সহিত আলাপ করা একজন ছোট বালকের পক্ষে অসমসাহসিকতা. সুতরাং ইচ্ছা হইলেও লজ্জায় ও সঙ্কোচে কেহ অগ্রসর হইত না। তাই মনে মনে মন্মথের প্রতি দৃঢ় আকর্ষণ থাকিলেও সুরেশের তাহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা অনেক দিন অসম্পূর্ণ ছিল। একদিন দৈবক্রমে তাহা ঘটিয়া গেল। সুরেশের ভগিনীর বিবাহে অন্যান্য বরযাত্রীর সহিত মন্মথ তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। বালক সুরেশ অনেকটা আগ্রহ ও আনন্দ এবং কতকটা লজ্জার সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। সে রাত্রি সমস্তক্ষণ সে মন্মথের পাশে পাশে রহিল। স্কুলের সকলে তাহাকে কিরূপ সম্মান ও ভক্তি করে তাহা মুখে চোখে ও সলজ্জ কথায় বার্ত্তায় অল্পে অল্পে সব গল্প করিল। মন্মথর আত্মম্ভরিতা তেমন বেশী ছিল না। তাই বালকদের মহাপুরুষ-ভক্তি তাহার উপর দিয়া চরিতার্থ হইতেছে জানিয়া একটু কৌতুকজনক মনে হইল, একটু হাসি আসিল, আর এই সাগ্রহ, হৃদয়বান্, সমুজ্জ্বল বালকের প্রতি সেও আকৃষ্ট হইল। যাইবার সময় সুরেশকে একদিন তাহার বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। এই তাহাদের বন্ধুতার সূত্রপাত। সুরেশ মন্মথর অপেক্ষা সাত বৎসরের ছোট—তবুও দু-জনের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। পাঁচ বৎসর পরে যখন মন্মথ ছাত্রজীবন শেষ করিয়া কাজের জীবন গ্রহণ করিল, এবং সুরেশ এণ্ট্রেন্স

পাস করিয়া ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতে লাগিল তখনও তাহাদের এ বন্ধুতার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন; তবে এরূপ স্থলে সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে—এক পক্ষ দেয়, আর এক পক্ষ গ্রহণ করে—এক পক্ষ তন্ময়, অপর পক্ষ প্রশান্ত—এক পক্ষে গাঁট দৃঢ়, অপর পক্ষে শিথিল;—তাহাদের পরস্পরের প্রতি ভাবের একটু বৈলক্ষণ্য আছে। মন্মথ একজন বড় লোক, তাহার দেশব্যাপী খ্যাতি, তাহার গৃহে লোক সমাগমের বিরাম নাই। আর সুরেশ একজন সামান্য স্কুলের ছাত্র। পতঙ্গ যেমন আলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, স্কুলের ছাত্রেরা তেমনি বড় লোকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। মন্মথ-আলোককে এমন অনেকগুলি বালক-পতঙ্গে ঘিরিয়াছিল। সুরেশ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ মাত্র। যে তোমার শ্রদ্ধার পাত্র তাহার সহিত ঘনিষ্টতায় আসিয়াও যদি তাহাকে শ্রদ্ধার অযোগ্য মনে না হয়, তবে সে শ্রদ্ধা কালক্রমে প্রণয়ে পরিণত হইতে পারে। সুরেশেরও তাহাই হইয়াছিল। এই পাঁচ বৎসরের বন্ধুত্বে মন্মথের প্রতি তার একটা গভীর ভালবাসা জন্মিয়াছিল। বালক-হৃদয়ের প্রথম অনুরাগ ভারি হৃদয়স্পর্শী, কেননা পাত্রাপাত্রবিচারশূন্য, যথাযথপরিমাণজ্ঞানবর্জ্জিত, অতএব অনেক খানি নিষ্ফলতার অভিশাপজড়িত। মন্মথ বাস্তবিকই সুরেশের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তার প্রতি স্নেহশীলও ছিল, কতদিন সেই অপরিণতবুদ্ধি বালককে সস্নেহে উচিত পরামর্শ দিয়া তার চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছে। তবে মন্মথ যেমন সুরেশের এক মাত্র বন্ধু, সুরেশ তেমনি মন্মথের একমাত্র বন্ধু নয়। তার মতন বালকবন্ধু মন্মথর আরো দু চারটী ছিল; তাছাড়া সমবুদ্ধি বয়স্ক বন্ধুরও অভাব ছিল না। সুতরাং সুরেশ মন্মথের নিকট যতটা প্রত্যাশা করিত, মন্মথ কোনমতেই ততটা দিয়া উঠিতে পারিত না। মন্মথর এত কাজ, এত লেখা, এত বক্তৃতা, এত মিটিং, এত দর্শনপ্রার্থীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার থাকিত যে, অনেক সময় দীর্ঘকালাগত সুরেশের সহিত দুচারটীর বেশী কথা কহিবারও অবসর হইত না। সুরেশের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য না থাকিলেও তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইয়া পড়িত। এ অবহেলা যে সুরেশের মনে বাজিত না এমন নহে, তবে তাহাতে তাহার নিজের অনুরাগ, আকর্ষণ কিছুই কমিত না। তার নবীন জীবনের, নবীন উৎসাহ উদ্যমবলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবনাংশগুলি চতুর্দ্দিক হইতে আহরণ করিয়া, সংক্ষিপ্ত পকেট-এডিশন বানাইয়া সে মন্মথের জীবনের ভিতর পূরিয়া দিয়াছিল। মন্মথের জীবন হইতে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না। এতশত সহপাঠী ছিল তবু তাহাদের সহিত না মিশিয়া মন্মথের সহিত গল্প করিতেই সে ভালবাসিত। মন্মথর লাইব্রেরী ভরা বই, তবুও কোন নূতন ভাল বাঁধান মন্মথের মনের মতন বই দেখিলে সুরেশ তাহার জলপানীর টাকা দিয়া সে বইখানি বন্ধুর জন্য উপহার লইয়া আসিত। অনেক সময় মন্মথর সে গ্রন্থের দু এক পাতের বেশী উল্টিয়া দেখিবার সময় হইত না, লাইব্রেরীতে অযত্নে পড়িয়া থাকিত। সুরেশ তাহা জানিত, তবুও তাহাকে উপহার দিবার আনন্দটুকুই যথেষ্ট মনে করিত।

এক বছর সুরেশের পাড়ার ছেলেরা তাহাকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরে মিসিনরি মেমদের ফ্যান্সি বাজারে যাইল। লুব্ধনয়নে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুরেশের মনে হইল মন্মথের কি ভাল লাগিবে না জানি, কোন্ জিনিষ নিশিদিন তার ব্যবহারে আসিবে। খুঁজিতে খুঁজিতে এই ব্লটিংবুকটী চোখে পড়িল। তখন এই খাতাখানি কিনিয়া বাড়ী আসিয়া, মলাটের উপরের বাঁকোনে পরিষ্কার অক্ষরে কোণাকুণি করিয়া, ষ্টিফেনের ব্লুব্ল্যাক কালী ও বালকহৃদয়ের অনেকখানি ভালবাসা ও মিষ্টত্ব দিয়া লিখিল—"বন্ধুবর"। মন্মথ বাবু এক বৎসর এই খাতাখানি ব্যবহার করিলেন, এক বৎসর পরে ইহার মলাটটা একটু মলিন হইয়া আসিল। তখন মন্মথের গৃহ নূতন করিয়া সজ্জিত হইতেছে। দেয়ালে নূতন পেণ্ট্ লাগিয়াছে, মেজেতে নূতন কার্পেট পড়িয়াছে, গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ নূতন কৌচ, নূতন কেদারা, নূতন ডেস্ক বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই সব উজ্জ্বল নূতন আস্‌বাবের সহিত পুরাণ মলিন ব্লটিংবুক আর খাপ খায় না। অতএব বাবুদের সরকার একদিন বুদ্ধি করিয়া একটী নূতন, বহুমূল্য সুন্দর ব্লটিংবুক কিনিয়া আনিয়া নিবেদন করিল "মেজবাবু মহাশয়ের ঘরে সবই নূতন জিনিষ পত্তর, কেবল ঐ খাতাখানাই যা পুরোণ, তাই চীনে বাজার দিয়ে আস্‌ছিলেম, মনে কর্‌লেম একখানা ভাল দেখে কিনে নিয়ে যাই। বাবুর কি এখানা পছন্দ হয়?" তখন সুরেশ সে ঘরে উপস্থিত ছিল। মন্মথ ডেস্কের সামনে বসিয়া একটা বক্তৃতা রচনার মাঝামাঝি ঘোর চিন্তামগ্ন। সুরেশ তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে একটা কৌচে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় মিলের লজিকে নিবিষ্টচিত্ত। সরকারের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিবামাত্র সুরেশ সিধা হইয়া উঠিয়া বসিয়া সাগ্রহে মন্মথের উত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। মন্মথ নূতন ব্লটিংবুকখানি একবার দেখিয়া, পুরাণখানি আর একবার দেখিয়া, আপনার হস্তস্থিত কলমের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, "হ্যাঁ এটা ময়লা হয়েছে বটে, তা নূতনটা এনেছ বেশ করেছ, রেখে যাও"। এই বলিয়া পুনর্ব্বার লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরেশ বুঝিল মন্মথ তাহার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা বশতঃ ভুলিয়া গিয়াছে যে খাতাখানি সুরেশের উপহার। সে ব্লটিংবুক কেবল ব্লটিংবুক মাত্র—আর কিছু নয়—কাহারও উপহার কি না সে কথা ভাবিতে মনে পড়িল না—ব্যবহার্য্য কি অব্যবহার্য্য তাই শুধু মনে হইল। বালক হৃদয় ভেদ করিয়া একটী ছোট চাপা নিশ্বাস উঠিল। সে মিনিট দুই তিন মাথা নামাইয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। সুরেশ মন্মথের পশ্চাতে বসিয়াছিল, তাই মন্মথ কিছু জানিল না। তাহার দিনকতক পরে সুরেশ আবার মন্মথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। তখনও বেলা হয় নাই, মন্মথ বাবু তখনও অন্তঃপুর হইতে এ গৃহে আসেন নাই। সুরেশের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া করিয়া তাহার ডেস্কের প্রতি চোখ পড়িল। দেখিল নূতন খাতা এখনো ব্যবহৃত হয় নাই, ডেস্কের এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, পুরাণখানি যথাস্থানে আছে। মন্মথ গৃহে আসিতে কি কথা কহিবে মনে করিয়া

হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আপনার নতুন ব্লটিং এখনো ব্যবহার করেন নি?" ও বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করিতে তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল অথচ গোড়ায় ঐ কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মন্মথ ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া দুটো নাড়াচাড়া করিয়া বলিল "হ্যাঁ কর্‌ব, কিন্তু পুরোণটার সঙ্গে বেশ একরকম বণিবণাও হয়ে গেছে, অনেকদিন ধরে এইটেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, সহজে আর নূতনটার সঙ্গে কারবার কর্ত্তে ইচ্ছে করে না, আচ্ছা আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক্"। এই বলিয়া পুরাণ খাতা হইতে কাগজপত্র সব বাহির করিয়া নূতন খাতায় পূরিল। পুরাণ খাতা গৃহকোণে ফেলিয়া রাখিল। সুরেশের মনে হইল তার ভালবাসা গৃহকোণে অনাদরে গড়াগড়ি গেল! একবার ইচ্ছা হইল সে খাতাখানি তুলিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া যায়। কিন্তু মন্মথ বাবু কি ভাবিবেন? সুরেশের আগ্রহ দেখিলে তাঁর মনে পড়িবে এ সুরেশের উপহার—তাহার হৃদয়-বেদনা বুঝিতে পারিবেন, সে বড় লজ্জা করিবে। খাতা উঠান হইল না। সুরেশ শেল্‌ফ হইতে একখানা বই পাড়িয়া বসিয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার দিনকতক পরে মন্মথ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সে খাতা খানির উদ্ধার করিল। তাহারা দেখিল মেজদাদার ডেস্কের উপর একখানি চক্‌চকে নূতন খাতা বিরাজ করিতেছে, গৃহকোণে পুরাণ খানি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা বিচার করিল এখানি অগ্রজের পরিত্যক্ত, অতএব তাহাদের ভোগে আসিবার অবস্থা প্রাপ্তি। তাহার পরদিন হইতে খোকাবাবুদের পাঠ-গৃহের টেবিলে সে খাতাখানির অধিষ্ঠান হইল। মন্মথ বাবুর দুই বালক, দুই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতায় মিলিয়া সুরেশের উপহার দখল করিল। তখন মলাটের উপর বিচিত্র ছবি চিত্রিত হইল, এবং মসীরেখায় সুরেশের হস্তাক্ষর প্রায় ঢাকা পড়িল। মন্মথের গৃহে যাইতে হইলে এই গৃহ দিয়া যাইতে হয়। সুরেশ যতবার মন্মথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, ততবার আগেই এ খাতাখানি চোখে পড়ে। ততবারই মনে করে "মন্মথ বাবু যখন এ ঘর দিয়া যান তখন কি তাঁর একবারও মনে পড়ে না যে খাতাখানি আমার উপহার? একটু বোধ হয় স্নেহের সঙ্গে দেখেন, একবার বোধ হয় দাঁড়াইয়া ভাবেন "ঐ ক্ষুদ্র 'বন্ধুবরের' ভিতর কতখানি ভালবাসা নিহিত রয়েছে।" হা মুগ্ধ ভ্রান্ত বালক! তুমি নিজের হৃদয়ের কথা বন্ধুতে অর্পণ করিতেছ। প্রবল প্রমাণকেও দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া মিথ্যা আশার সুখ তোমার হৃদয়ে পদবী লাভ করিতে চাহে। তুমি বুঝিতে পার না, যে উপহার দ্রব্য তোমার পক্ষে গভীর অর্থপূর্ণ—হৃদয় ব্যঞ্জক, তোমার খ্যাতনামা, অনবসর বন্ধুর পক্ষে তাহা কেমন করিয়া একেবারেই অর্থহীন—শূন্যব্যঞ্জক। চিরদিন এই চলিয়া আসিতেছে। উপহার দ্রব্যটীর সঙ্গে কতখানি হৃদয় দেওয়া হইয়াছিল তাহা যে উপহার গ্রহণ করে তাহার মনে থাকে না, যে উপহার দেয় তাহার মনে থাকে! তাই গ্রহীতার পক্ষে দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপহারত্বটুকুও নষ্ট হইয়া যায়; দাতার চোখে সে হৃদয় বিমিশ্রিত দ্রব্যও চিরদিন অবিনশ্বর।

আথেন্সের ব্যবস্থাবলী।

পিসিষ্ট্রেটস প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে দুইবার নির্ব্বাসনে ১৪ বৎসর কাল কাটিয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর হিপিয়স ও হিপার্কস নামক তাঁহার দুই পুত্র একত্রে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। হিপিয়স রাজ্যের প্রকৃত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। হিপার্কস সাহিত্য ও শিল্প চর্চ্চা করিয়া এবং আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেন। তের বৎসর কাল ভ্রাতাদ্বয় পিতার প্রণালী অনুসারে রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে হিপার্কস হারমোনিয়স নামক কোন আথেনিয়ান যুবকের অবমাননা করায় সেই যুবক এবং তাহার বন্ধু আরিষ্টগিটন তাঁহাদের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন। তাঁহাদের ষড়যন্ত্র অর্দ্ধ সফল হইল, হিপার্কস নিহত হইলেন কিন্তু হিপিয়সের গাত্র স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ধৃত হইলেন। হারমোডিয়স সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন। আরিষ্টগিটন মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। হিপিয়স এই ঘটনায় ভীত হইয়া শাসনের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিলেন, পূর্ব্বের অকপট ও মৃদু ভাবের পরিবর্ত্তে সন্দিগ্ধ ও নির্দ্দয় ভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের উদার চরিত্রের পরিবর্ত্তে বধধর্ম্মী হওয়ায় সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইলেন। আথেন্সের মহোদ্বংশোদ্ভব যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাসনে ছিলেন এক্ষণে তাঁহারা হিপিয়সের প্রতি সাধারণের গভীর ঘৃণা দেখিয়া এই সুযোগে সৈন্যবল সাহায্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল প্রয়াসের পর অবশেষে স্পার্টার সহায়তায় আথেন্সের দুর্গ অবরোধ করিলেন। হিপিয়স আপনার পুত্রগণ ও দলবল সহকারে শত্রুগণের ব্যূহ ভেদ করিতে গিয়া তাহাদের হস্তে পড়িয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং দেশত্যাগের অনুমতি পাইয়া পারস্যে গিয়া আথেন্সের প্রজাবর্গের উপর প্রতিশোধ লইবার বাসনায় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই খানে একাধিপত্বের শেষ হইয়া প্রজাতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। আবার সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত হইল। বোধ হইল না যে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি হইতে আথেন্সবাসীরা শিক্ষালাভ করিয়াছে। হিপিয়স যাঁহাদের উদ্যোগে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেবল ক্লিশথিনিস নামক এক ব্যক্তি এই শিক্ষা মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য সকলের ন্যায় তিনিও সাধারণ শত্রু নির্ব্বাসনের সময় সাধারণ লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য লোকের ন্যায় তৎপরে তাঁহার প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার ভুলিয়া যান নাই। সাধারণ-তন্ত্রকে তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী ক্ষমতা দিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টার রাজাও সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করায় কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার

কর্ত্তৃত্ব স্থগিত থাকে। কিন্তু প্রজাবর্গ একান্ত মনে তাঁহার পক্ষ লইয়া শত্রু দমন করায় অপর পক্ষের অবশেষে অতি কাতরভাবে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। ক্লিসথিনিস পুনরায় রাজ্যভার লইয়া সংস্কার কার্য্যে যত্নবান হইলেন। তাঁহার কার্য্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক ভাবের উচ্ছেদ সাধন করা। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইহাই আথেন্সের দুরবস্থা ও দুর্দ্দশার কারণ। পুরাতন সম্প্রদায় তিনটী স্থানীয় বিভাগ অনুসারে বিভক্ত ছিল এবং স্থানের নামানুসারে তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছিল। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ নদীসমূহের নিকটবর্ত্তী নিম্নভূমিতে বাস করিতেন সেই জন্য তাঁহাদের নাম ছিল নিম্নভূমিস্থ সম্প্রদায়। ব্যবসায়ী দল সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন, তাহাদের নাম ছিল তটভূমিস্থ সম্প্রদায়। দরিদ্রশ্রেণী দেশের মধ্যভাগে এবং অনুর্ব্বর পার্ব্বত্যদেশে বাস করিত, তাহাদের নাম ছিল পার্ব্বত্য সম্প্রদায়। এইরূপে দেশ বিভাগের সহিত রাজনৈতিক বিভাগের সামঞ্জস্য ছিল; ব্যক্তিবিশেষের স্থানীয় ভাব হইতে তাহার রাজনৈতিক ভাব গঠিত হইত। দেশের শান্তিময় অবস্থায় এ প্রণালী সুচারুরূপে কার্য্যকারী হইতে পারে, কিন্তু আথেন্সের বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে নানারূপ সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও কলহের কারণ ঘটিত। এই জন্য ইহার সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্লিসথিনিস এই প্রাদেশিক বিভাগের পরিবর্ত্তে সমুদয় প্রজাবর্গকে নূতন করিয়া দশ ভাগে বিভক্ত করিলেন। পূর্ব্বে যাহারা আথেন্সের প্রজাতন্ত্রের সভ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল না, এইরূপ অনেক লোকও এই বিভাগের এখন অন্তর্ভূত হইল। এই দশটী বিভাগের প্রত্যেক বিভাগেই কয়েকজন নিম্নভূমিস্থ কয়েকজন তটভূমিস্থ ও কয়েকজন পার্ব্বত্যদেশস্থ লোক ছিল। এইরূপে নূতন বিভাগ পুরাতন বিভাগের স্থান অধিকার করিল। যাহাদের মধ্যে পূর্ব্বে বিরোধ বাধিয়াছিল, তাহারা ঘনিষ্টতর রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল। বিশেষতঃ একপ্রাদেশিক ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানাস্তরিত হওয়ায় ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক ভাব পুনরায় পূর্ণরূপে পুষ্টি লাভের সম্ভাবনা রহিত হইল। সেই সময় লোকেরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেও ইহার দ্বারা আথেন্সের ইতিহাস হইতে সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত হইল। ইহাই ক্লিসথিনিসের রাজ্যের প্রধান সংস্করণ। ইহার পর তিনি সাধারণ-তন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য কার্য্যে হাত দিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক আথেন্সবাসীকে নির্ব্বাচন-ক্ষমতা ও বিচারপতি নির্ব্বাচনের ভার দিলেন তদ্ভিন্ন তিনি প্রজাতন্ত্র সভাকে আর একটী ক্ষমতা দিলেন। সাধারণে যদি রাজ্যস্থ কোন ব্যক্তি হইতে রাজ্যের বিপদাশঙ্কা করিত তবে এই সভা তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্ব্বাসন করিতে পারিত। ইহার দ্বারা পিসিষ্ট্রেটসের ন্যায় অপর কেহ রাজ্যাধিকার করিবার আশঙ্কা দূরীকৃত হইল এবং লোকেরা স্বেচ্ছামত নেতা নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইল, আথেন্সে পূর্ণরূপে প্রজাতন্ত্রের আধিপত্য হইল, 'সোলন যে কার্য্য সম্ভবপর করিয়া গিয়াছিলেন ক্লিসথিনিস তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। এই সময় হইতে এই স্থানে আমরা প্রকৃত প্রজাতন্ত্রত্ব দেখিতে পাই। এবং এই চিত্র বর্ত্তমান সময়ে অনেক দেশের পক্ষে

মূল্যবান। আরিষ্টটলের গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে প্রজাতন্ত্রের উন্নতি ও আথেন্সের অবনতি-কাহিনী বিবৃত। যথাযথরূপে ইতিহাস আবৃত্তি ভিন্ন সাধারণতঃ আরিষ্টটল কোন কার্য্যের দোষ গুণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন নাই। তথাপি তাঁহার লেখা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী। বিশেষতঃ—এক স্থানে তিনি পূর্ব্ব নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রজাতন্ত্রের সদয় ব্যবহারের প্রশংসা করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত বাহির হইতে বিপদের চিহ্ন দেখা দেয় নাই—ততদিন এই ব্যক্তিগণ অবাধে আথেন্সে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছিল কিন্তু বাহিরে বিপদের আশঙ্কা হইলে পাছে তাহারা গৃহশত্রু হইয়া দাঁড়ায় এই আশঙ্কায় তাহাদের পুনরায় নির্ব্বাসিত করা হয়। প্রজাতন্ত্রের শাসনে প্রথম কয়েক বৎসর দেশের সমধিক উন্নতি হইতে লাগিল। বাণিজ্য বৃদ্ধি বশতঃ দেশে লক্ষ্মীর অবস্থান হইল। কতকগুলি রৌপ্যখণি ও আবিষ্কৃত হইল ও সেই অর্থে কয়েকখানি রণতরী প্রস্তুত হওয়াতে আথেন্স গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিল। এই সময় আথেন্সের একটি বর্হিবিপদ উপস্থিত হইল। নির্ব্বাসিত হিপিয়স পারস্যরাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পারস্যের সহিত আথেন্সের বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে ছিলেন, তাহার ফলে পারস্যের সহিত গ্রীসের সমর উপস্থিত হইল। পারস্য গ্রীক কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। এ যুদ্ধ বিষয়ে আরিষ্টটলের বিশেষ কিছু বর্ণনা নাই। তবে সকলেই মারাথন থার্ম্মপলির ইতিবৃত্ত বোধ হয় জানেন। এই যুদ্ধের দ্বারা আথেন্সের ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ইতিহাসে কি ফল হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করাই আরিষ্টটলের উদ্দেশ্য। ইহার পর আথেন্সের দুই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিল। প্রথম—এস্কেলাস সফোক্লিস, ইউরিপিডস, আরিষ্টোফেনস প্রভৃতি লেখকগণের উৎকৃষ্ট নাটকাবলী এই সময়ে বিরচিত হইল। দ্বিতীয়—নিম্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার অত্যন্ত বৃদ্ধি সত্বেও প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা কিছুকালের জন্য কতকাংশে হ্রাস পাইল। পারস্য রাজের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধকালে যখন পারস্য সেনা প্রায় গ্রীস অধিকার করিয়াছে,—গ্রীসের উদ্ধার আশা অতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, যখন দেশবাসীরা জলযুদ্ধার্থে জাহাজে যাইতে অনিচ্ছুক, সেনাপতিগণ নিরুৎসাহ ও উদ্যম বিহীন, নিরাশ হৃদয় প্রজাবর্গ পারস্য-কবলে দেশ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, প্রত্যেকে আত্ম রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যগ্র, যখন আথেন্স ও সমগ্র গ্রীসের ভাগ্য তুলাদণ্ডে কম্পমান তখন প্রাচীন আরিওপেগস সভার সভ্যেরা অগ্রসর হইয়া নিজ কোষ হইতে অর্থ দানদ্বারা নাবিক-সৈন্যগণকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, ঘটনা স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল। সালামির যুদ্ধে পারস্যকে উৎসন্ন করিয়া গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করিল। আরিওপেগসের সাহসপূর্ণ অধ্যক্ষতা-ভার ও কার্য্যে এই মহা বিপদ হইতে দেশ উদ্ধার হইল। সাধারণের কৃতজ্ঞতার নূতন পাট্টা পাইয়া সভার নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষমতা আর একবার নব জীবন লাভ করিল এবং আর বিংশ বৎসর কাল অক্ষুণ্ণভাবে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতাপন্ন বলরূপে বিরাজিত রহিল। এই ক্ষণিক জীবনের পরে আবার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের

ক্ষমতা লোপ পাইল। কোন দেশে অতীত কার্য্যের জন্য কাহারও নিকট বহুকালের জন্য সমগ্র জাতিকে কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। যখনই কৃতজ্ঞতার পাত্র উন্নতির পথরোধক বা সংস্কারদ্বেষীরূপে দাঁড়াইয়াছেন তখনই জাতি তাহাকে অকাতরে পথ হইতে অপসারিত করিয়াছে। আরিওপেগস-সভা একজন বিশেষ ব্যক্তি নহে তাহার সভ্যগণ কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে অতএব তাহা যে ব্যক্তি-বিশেষাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা পাইবে এরূপ আশা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি কারণে আরিওপেগস দিন দিন হীনচরিত্র হইতে লাগিল। পূর্ব্বে আর্কন পদে যাঁহারা অভিষিক্ত হইতেন তাঁহারা এক বৎসর পরে পদত্যাগের পর আরিওপেগসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকার পাইতেন। প্রথম উচ্চবংশীয় ব্যক্তি ভিন্ন কেহ আর্কন পদ লাভ করিতে পারিতেন না কিন্তু ১ম ও ২য় পারস্য যুদ্ধের মধ্যকালে এইরূপ নিয়ম হয় যে, রাজ্যের ক্ষুদ্রতম প্রজাও এই পদ লাভের অধিকারী এবং সূর্ত্তিদ্বারা আর্কন নির্ব্বাচিত হইবে; তবে কোন প্রকাশ্য মন্দ চরিত্রের ব্যক্তি এই পদ পাইবেন না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইল যে, নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞ আর্কন এখন রাজ্যের প্রধান হইয়া দশজন বিচারপতির সভায় রাজ্য শাসন করিত। আর এক বৎসরের পর এই আর্কন আরিওপেগসে প্রবেশ করিতেন সুতরাং ইহা ক্রমে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সভা আর রহিল না এবং ক্রমে ক্রমে ইহার শাসন ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিল। এই কারণে লোকদের শ্রদ্ধাও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে আসিতে ৬২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে চূড়ান্ত সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। তৎকালে এফিয়নটিজ সাধারণ উন্নতিশীল লোকের নেতা ও থেমিষ্টকিলস পুরাতন দলের নেতা ছিলেন। গ্রীসের জন্য থেমিষ্টকিলস অনেক গৌরবময় কার্য্য করিয়াছিলেন! সালামি যুদ্ধের বিজয় গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য এবং গ্রীসকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করিবার তিনিই কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের স্থিরতা ছিল না এবং এখন লোকের সন্দেহ হইতে লাগিল যে গ্রীসের পরমশত্রু পারস্য রাজের সহিত তিনি ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এই ঘটনাই আরিওপেগসের উচ্ছেদের মূল। আরিওপেগস থেমিষ্টকিলসের বিশ্বাসঘাতকতার বিচার করিবেন ধার্য্য হইল। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা—বিচার না হয় এবং তিনি তাহা নিবারণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই উদ্যোগ প্রণালী হইতে তিনি কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন তাহা বুঝা যায়। থেমষ্টকিলস আরিওপেগসের একজন সভ্য ছিলেন এবং তিনি কোন সূত্রে জানিয়াছিলেন যে আরিওপেগসের উচ্ছেদ সাধন করিতে একিয়নটিজ ইচ্ছুক। এক্ষণে তিনি এফিয়নটিজের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, আরিওপেগস ছলক্রমে তাঁহাকে ধৃত করিতে মন্ত্রণা করিতেছে এবং আরিওপেগসের নিকট যাইয়া বলিলেন এফিয়নটিজ তাঁহাদের উচ্ছেদ মন্ত্রণা করিতেছে ও যদি আরিওপেগস হইতে কয়েকজন লোক যাইতে ইচ্ছুক হয়েন তবে তিনি তাহাদিগকে মন্ত্রণা স্থানে লইয়া যাইতে পারেন। এফিয়নটিজকে ভয় দেখাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করান তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এবং এইরূপে সে অভিসন্ধি পূর্ণ হইল।

থেমিষ্টকলিসের কথানুসারে আরিওপেগসের কতকগুলি সভ্য তাঁহার সহিত এফিয়নটিজের আবাসে গমন করিলেন। এফিয়নটিজ তাঁহাদের দেখিয়া থেমিষ্টকলিসের কথা ঠিক ও ইহারা তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছেন ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলায়ন করিয়া একটী মাঠে আশ্রয় লইলেন। এফিয়নটিজ বুঝিলেন যে এখন সাহস ভিন্ন উপায় নাই তখন তিনি প্রজাবর্গের সভায় (এই সভা আরিওপেগস সভায় সমালোচনার বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত) উপস্থিত হইয়া আরিওপেগসের ক্ষমতা লোপ করিবার জন্য তাহার নামে দোষারোপ করিতে লাগিলেন, থেমিষ্টকিলস আসিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। এই সভা ও সাধারণ সভ্য কর্ত্তৃক তাহাদের প্রস্তাব অনুমোদিত ও গৃহীত হইল, আরিওপেগসের রাজনৈতিক ক্ষমতা একেবারে লো প পাইয়াইহা খুনী মকদ্দমার বিচারালয় হইল, প্রজাতন্ত্রের এই শেষ শত্রুর বিনাশের পর আবার নির্ব্বিবাদে প্রজাতন্ত্র অগ্রসর হইতে লাগিল। যে ব্যক্তিদ্বয় দ্বারা এই অবস্থা সংঘটিত হইল তাঁহাদের উভয়ের পরিণামই মন্দ। এফিয়নটিজ শত্রু পক্ষ দ্বারা নিহত হয়েন এবং থেমিষ্টকলিসের বিশ্বাসঘাতকতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি প্রাণ ভয়ে পারস্যে পলায়ন করেন। আরিওপেগস সভার মৃত্যুর পর হইতে আরিষ্টোটলের আর প্রজাতন্ত্রের সহিত সহানুভূতি দেখা যায় না। তাঁহার মতে ইহার পর হইতেই আথেন্সের অবনতির সূত্রপাত। এই সময় যে কোনরূপ অবনতি ঘটিয়াছিল তাহা নহে বরং অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সমধিক উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু আরিষ্টোটলের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কালাবরণ ভেদ করিয়া ইহাতে আথেন্সের দুরবস্থার অঙ্কুর দেখিতে পাইল। অপরিমিত ক্ষমতাবান সাধারণ প্রজারা উৎকোচের বশবর্ত্তী। রাজপুরুষেরা যে অর্থ দিয়া উৎকোচ দেন এরূপ নহে অর্থাপেক্ষা অধিক বিপদজনক উৎকোচ দিয়া থাকেন। দেশে সুবিধা ছাড়িয়া প্রজাদের নিজের সম্পত্তি রক্ষা ও উন্নতির উপায় প্রবর্ত্তনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া থাকেন। দূরবর্ত্তী আবশ্যকীয় বিষয় হইতে মন অপসারিত করিয়া আপনাপন সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখায় দেশে সমূহবিপদ উপস্থিত হয়। আরিওপেগসের মৃত্যুর পর প্রথম দশ বৎসরকাল আথেন্সের ইতিহাসে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। এই সময় গ্রীকের নিকটবর্ত্তী সমুদায় দ্বীপ আথেন্সের অধিকৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বে বা পরে আথেন্সের অধিকার কখনও এরূপ বিস্তার লাভ করে নাই। ইতিমধ্যে আথেন্সের ভাণ্ডারে অর্থ আসিতে লাগিল, তাহার দ্বারা নানাপ্রকার সুবৃহৎ অট্টালিকায় নগর সুসজ্জিত হইতে লাগিল। এই চারুকার্য্য এখনও পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করে। ভাস্কর কার্য্য, স্থপতি কার্য্য ও সাহিত্য দ্বারা এই সময় আথেন্স সমুজ্জ্বলিত হইয়াছিল। আথেন্সের নাটকাবলী সেক্সপিয়রের গ্রন্থ ব্যতীত এখনও পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম সাহিত্য। সম্পদশালী-আথেন্স গৃহে বাহিরে সর্ব্বত্র খ্যাতিপন্ন ও অন্যান্য দেশের ঈর্ষাজনক হইল। পেরিক্লিস এই সময়ে আথেন্সের নেতা ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা অনেকাংশে এই অবস্থা সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু আথেন্সের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু করেন নাই—সুতরাং আরিষ্টোটল তাঁহার এ সকল

কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বলেন নাই। ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা আরিষ্টোটলের মতে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি জুরীদিগকে অর্থদানের ব্যবস্থা করেন। আথেন্সে বহুসংখ্যক জুরী ছিল। দুই শত হইতে পাঁচ শত জন পর্য্যন্ত লোক একত্রে বসিয়া একটী মকদ্দমা শুনিতেন। ইহারা দোষ সাব্যস্ত ও শাস্তি বিধান উভয় কার্য্যই করিতেন। এইরূপে বহুসংখ্যক লোকের অর্থ লাভ ও উৎকোচ প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হইল। এইরূপ ফল হওয়াই পেরিক্লিসের অভিপ্রায় ছিল। সাইমন নামক দ্বিতিশীল দলের ধনাঢ্যনেতার ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তিনি এ উপায় অবলম্বন করেন। ধনবান সাইমান সাধারণ লোককে বহুদান ও সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্ষমতালাভ করিতেছিলেন। পেরিক্লিসের নিজের অর্থ ছিল না সেই জন্য তিনি সাধারণ কোষাগার হইতে বহু সংখ্যক প্রজাকে এই উপায়ে উৎকোচ দিতে লাগিলেন। তবে এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, ইহা দ্বারা প্রজাবর্গের বিচার কার্য্যের জ্ঞান জন্মাইতে লাগিল। দুঃখের বিষয়, ভবিষ্যতে এই উৎকোচ গ্রহণ দৃষ্টান্তের বহুল অনুকরণ হইয়াছিল। পেরিক্লিডের ক্ষমতা দ্বারা আপাততঃ ইহার কোন মন্দ ফল হয় নাই। সাধারণের ভুল দেখিলে যে ব্যক্তি স্পষ্ট করিয়া বলিতে ভীত হয়েন না, এইরূপ সদ্বিবেচক উন্নতমনা ও মহানুভব ব্যক্তির হস্তে প্রজাতন্ত্রের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করিলে তাহার কার্য্য উৎকৃষ্ট রূপে চালিত হয়। পেরিক্লিস এইরূপ রাজনীতি বিশারদ বিজ্ঞ ও সৎস্বভাবাপন্ন লোক ছিলেন। সোলন ভিন্ন তাঁহার মত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আথেন্সের ইতিহাসে আর কেহ ছিল না। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় আথেন্সের সহিত স্পার্টার বিবাদ উপস্থিত হয়। পেরিক্লিস পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে আথেন্স যদি গ্রীকের প্রথম স্থান অধিকার করিতে চাহে তবে একদিন না একদিন স্পার্টার সহিত তাহার যুদ্ধ করিতে হইবে। তিনি পূর্ব্বেই স্পার্টার ক্ষমতা হ্রাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন আথেন্সকে সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গৃহে এবং বাহিরে তাঁহার শাসনের কুফল দেখা দিতে লাগিল। আরিষ্টটলের গ্রন্থে বাহিরের বিষয় বিশেষ কিছুই নাই দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর সকল বিষয়েই অবনতি লক্ষিত হইল। এই প্রথম প্রজারা উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক অসমাদৃত ক্লিত্তল নামক এক ব্যক্তিকে কর্ত্তৃত্ব পদে বরণ করিল। এ পর্য্যন্ত বরাবর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নেতারূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। ক্লিত্তলের কার্য্যের কোন উচ্চনৈতিক প্রণালী বা রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। প্রজাতন্ত্র ক্ষমতাবান বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে যেরূপ শুভ ফল উৎপাদন করে, কুচক্রী আত্মহিতান্বেষী ব্যক্তির হস্তে তদ্রূপ অশুভ ফল উৎপাদন করে। ক্লিত্তলের হস্তে পড়িয়া আথেন্সের নিতান্ত শোচনীয় দশা ঘটিল। স্পার্টার সহিত যুদ্ধে আথেন্স পরাজিত হইলে। আথেন্সের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দেওয়া হইল। আথেন্সের সাম্রাজ্য হস্ত

বহির্ভূত হইয়া গেল। গৌরব রবি অস্তমিত হইল। আরিষ্টটল স্পার্টার সহিত যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই মাত্র বলিলে হইবে যে আথেন্সের প্রতি স্পার্টা অনেক অত্যাচার করে এবং অত্যাচারের এক বৎসর পরে নির্ব্বাসিত কয়েকজন ব্যক্তি আথেন্সে ফিরিয়া আসিয়া আথেন্স পুনরায় অধিকার ও প্রজা-তন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর ৮০ বৎসর কাল পার্য্যন্ত আথেন্সের ব্যবস্থা প্রণালীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই সময়ে আরিষ্টটল তাঁহার গ্রন্থরচনা করেন (৩২৫ পূঃ খৃঃ) সাধারণ প্রজাবর্গের সভা ক্রমশঃ আপনার হস্তে অধিকতর ক্ষমতা সঞ্চয় করিতে লাগিল এবং রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের পুত্তলিকাবৎ হইয়া পড়িলেন। ইহার পর আর কর্ম্ম শৃঙ্খলতা বা বিজ্ঞ রাজনৈতিকতা দেখা যায় নাই। তাহার পরে মাসিডনাধিপতি আথেন্সের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডিমিস্থনিস প্রভৃতি বাগ্মীগণ উদ্দীপনাপূর্ণ কাতর অনুনয় বাক্যে প্রজাগণকে অত্যাচারী মাসিডন-রাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। শৃঙ্খলাহীন আথেন্স সহজেই ফিলিপাধিকৃত হইল। আথেন্সের জাতীয় জীবনের শেষ হইল।

মধুগয়া বা চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা।

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আজ দুর্গোৎসব, কাল শ্যামা পূজা, পরশ্ব কার্ত্তিক পূজা, ইত্যাদি, আমাদের সাধের বঙ্গদেশে, পূজায় পার্ব্বণে ছয়লাপ। বাঙ্গালির হৃদয় সদাই আনন্দ উৎসবে প্রমত্ত। চৈত্র মাসে সংক্রান্তির সময় আমাদের দেশে চড়কপূজা, বাণ-ফোড়া, গোষ্ঠাদি উৎসব হইয়া থাকে। এই সময় সকল শ্রেণীর লোককেই ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দোকানদার, পশারি, ধনী, দরিদ্র, সকলেই স্ব স্ব পাওনাদারের কাছ হইতে টাকা আদায়ে ব্যস্ত। কেহই নিশ্চিন্ত নাই। কারীকর, মজুর, মুটে, সকলেই স্ব স্ব মনিবের দ্বারে দণ্ডায়মান। আবার এ দিকে জমীদারি কাছারিতে নায়েব, কারকুন, গোমস্তা, সকলেই প্রজাবর্গের সহিত হিসাব নিকাশ করিতে, রসিদাদি দানে ও ওয়াসিল বাকী করিতে ব্যস্ত। নায়েব মহাশয়ের চালটা কিছু বুনিয়াদি ধরণের। তিনি অলস ভাবে উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া তাম্রকূট সেবনে রত। এইরূপ সকল শ্রেণীর লোককে এই সময়ে

অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা যায়। কিন্তু বিহার বা উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গিয়া দেখ, বঙ্গদেশের সহিত তাহার কত প্রভেদ! বঙ্গ হাস্যমুখী, পশ্চিম প্রদেশ মুহ্যমান নীরব প্রাণশূন্য।

বিহার অঞ্চলে গয়া হিন্দুর এক মহৎতীর্থস্থান। এই সময়ে দেশ বিদেশ হইতে যাত্রীগণ আসিয়া গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডোৎসর্গ করিয়া থাকেন। বৎসরের মধ্যে যে সময়ে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হয়, তখন লণ্ডন নগর লোক জনে, আমোদ আহ্লাদে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া সেই সময়কে যেমন লণ্ডন-সিজন্ বলে তেমনি এই পিণ্ডোৎসবের সময়কে গয়ার সিজন্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সহরটি এই সময়ে লোকে লোকারণ্য। গয়া ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানি ও পি, জি, ষ্টেট্ রেলওয়ে চার পাঁচখানি স্পেশাল ট্রেণ দিয়াও যাত্রী লইয়া যাইতে পারে না। এবং পি, জি, ষ্টেট্ রেলওয়েটি সিংগল লাইন হওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হয়। অধিকন্তু এ লাইনের গাড়ী বড় ধীরে ধীরে চলে বলিয়া বড় বিরক্তজনক বলিয়া বোধ হয়। বাঁকীপুর জংসন ও 'পুন্‌পুন্' ষ্টেশনে সময়ে সময়ে শত শত যাত্রীকে ট্রেণাভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। এই সময়ে পিণ্ডদান করিলে পিতৃকুল সন্তুষ্ট থাকেন এবং প্রদত্তকের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ প্রবাদ থাকায় সকলেই পিণ্ডদানে পিতৃকুল উদ্ধারার্থ কৃত-সংকল্প। এই সময়ে পিণ্ডদান করার নাম "মধুগয়া" করা। পুন্‌পুন্ নদের তীরে পিণ্ডদানের বিশেষ ফল থাকা প্রযুক্ত অনেকেই এখানে তদর্থে অবতরণ করিয়া থাকেন। মধুগয়ার সময়ে গয়া সহরে প্রায় ৩।৪ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া থাকেন। গয়া সিটি (City) এই সময়ে যাত্রীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। তৎকালে এখানে অল্প অল্প গ্রীষ্ম পড়িয়া থাকে। বায়ু দূষিত হওয়ায় ওলাউঠা ব্যাপক-রূপে সহরে প্রাদুর্ভূত হয়। সিটি অতিক্রম করিয়া পরিশেষে টাউনেও ওলাদেবী দেখা দিয়া থাকেন। এইরূপ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের আর একটি বিশেষ কারণ এই যে এখানকার ড্রেন, ও নর্দ্দামা ও অপরাপর জল নির্গমের পথগুলি এত সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কার এবং দুর্গন্ধময় যে তাহা কথিতব্য নহে। মিউনিসিপালিটির এ বিষয়ে বোধ হয় তত দৃষ্টি নাই। যাহাতে এই সকল দূরীভূত হয় ও ভবিষ্যতে যাহাতে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল হয় তাহার উপর তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শুনা যায় যে এখানকার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে বোধ হয় ড্রেনগুলি অপরিষ্কৃত থাকা উহার অপর একটি প্রধান কারণ। অধিকন্তু সিটিতে বাড়ীগুলি এত ঘেঁশ ঘেঁশ যে তাহাদের মধ্য দিয়া উত্তমরূপ নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হয় না।

গয়া সহরটি দুইভাগে বিভক্ত:—গয়া সিটি ও গয়া টাউন। পুরাতন গয়াকে গয়া সিটি বলিয়া থাকে। এইখানে বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির অবস্থিত। ইহা পর্ব্বতের উপর বিরাজমান। এইখানে গয়ালিরা বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেক দ্বিতল, ত্রিতল বাটী এইখানে আছে। অভ্যাগত যাত্রীগণের বাসারূপে এইগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই সিটির মধ্যে অনেকগুলি পল্লি আছে, তাহার মধ্যে বহুয়ার চৌরা, নউয়াগড়ি, করসয়লি, দক্ষিণ দরজা ইত্যাদিই প্রধান। বহুয়ার চৌরা হইতে সিটির সীমা আরম্ভ হইয়াছে। দক্ষিণ দরজা ইহার দক্ষিণ সীমা। সিটির সর্ব্বোচ্চ পল্লির নাম করশয়লি। এখানে অনেক খ্যাতনামা গয়ালিক বাস। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু রামহরি ঢেঁড়ী মহাশয়ই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইনি মহাশয় ব্যক্তি এবং অন্যান্য গয়ালীর ন্যায় গয়া কার্য্যান্তে টাকা কড়ার নিমিত্ত ইহার উৎপীড়ন অত্যাচার নাই বলিয়া অনেক যাত্রী ইহার এখানে আসিয়া থাকেন।

মুসলমানরাজ আলমগীর কর্ত্তৃক স্থাপিত অংশের আধুনিক নাম "গয়া টাউন্"। এই নিমিত্তই বোধ হয় অতি প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে "আলমগীর পুর গয়া" এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে গয়া সাহেবগঞ্জ ও রামনগর গেটটিই প্রধান। ইহা এখন মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়াছে; গয়া কলেক্টরেটের সম্মুখবর্ত্তী "পীরমনসুরের" মস্‌জিদ্‌টিও অতি প্রাচীন; ইংরাজ শাসনে গয়া টাউনের অনেক সংস্কার এবং ম্যাক্‌লিয়ড-গঞ্জাদি নামক নূতন পল্লি ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। গয়া টাউনে অনেক পল্লী আছে, তাহার মধ্যে নাদরাগঞ্জ, চক্, রামনা, সরাই, পুরাতন-গোডাউন ইত্যাদিই সর্ব্বপ্রধান। রমনার মধ্যে জেলার কোর্ট সমূহ ও কালেক্টারি অবস্থিত আছে; চক ও পুরাতন গোডাউনে সকল প্রকার শস্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই পল্লী দুইটীকে কলিকাতার "বড় বাজার" বা লণ্ডনের "লেডেন হল ষ্ট্রীট" বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না; পুরাতন গোডাউনে সকল প্রকার শস্যাদিও ভূষিমালের কারবার ও ব্যবসা হইয়া থাকে; সিটি ও টাউনের পথ ঘাট ও নালা নর্দ্দামাগুলি অতিশয় অপরিষ্কার ও পূতিদুর্গন্ধময়, এই গুলির আশু সংস্কার স্থানীয় মিউনিসিপালিটির সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; দেশী পল্লীতে (Native quarter) ইহাদিগের দৃষ্টি প্রায়ই পড়ে না।

বিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট, ও ফল্গু এই তিন স্থানে প্রায়ই অধিকাংশ লোকপিণ্ড দিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা 'খাপরাইল' করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হয়। গয়া-শ্রাদ্ধকার্য্য ৪।৫ প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে "তিনবেদী" "পঞ্চবেদী" ও "একচল্লিশ বেদী" বা "খাপরাইলই" প্রধান। "তিনবেদী" অর্থাৎ তিনটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয়; "তিনবেদী" গয়াকার্য্য বিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট ও ফল্গু এই তিন স্থানে পিণ্ডদানান্তে সম্পন্ন হয়। "পঞ্চবেদী" উপরি উক্ত তিনটী স্থান ভিন্ন "গয়াকূপ" ও "সীতাকুণ্ড" বা "মঙ্গলা গৌরীতে" আবার দুই বেদী পিণ্ড দান করিতে হয়। "একচল্লিশ বেদীতে" পিণ্ড দান করার অপর নাম "খাপরাইল" করা; ইহা অতি কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য এবং সুচারুরূপে সমাধা করিতে প্রায় দেড় মাস সময় লাগিয়া থাকে। উপরি উক্ত বেদী ছাড়া "উত্তর মানুষ", "পাতাল গঙ্গা", "ব্রহ্মযোনি", "রামশীলা",

"প্রেতশীলা", "বুদ্ধগয়া" ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে পিণ্ডদানান্তে ইহা সমাধা হয়। "উত্তর মানুষ" নামক পুষ্করিণীতে সদা সর্ব্বদা যবের পিণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পুষ্করিণীর জল অতি অপরিষ্কার এবং এত দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে যে পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের টেকা দায় হইয়া উঠে। স্বত্বভোগী গয়ালিগণ যখন ইহা পরিষ্কার রাখেন না তখন স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ইহা স্বহস্তে লইয়া পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে সম্যক্ বন্দোবস্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সকল সদনুষ্ঠান সম্পন্নার্থে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। তদর্থে (Pooree Pilgrim's Act)-এর ন্যায় এখানেও ঐরূপ একটী আইন প্রচলিত করা কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের উচিত; অধিকন্তু বর্ষাপ্রারম্ভে এখানে কলেরা ও বসন্ত রোগ সহরকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে; ইহাতে অভ্যাগত যাত্রীগণই বেশী ভুগিয়া থাকেন; তাঁহাদেরই হিতার্থে এখানে ঐরূপ একটী আইন হইলে ভাল হয়। করভার তাঁহাদেরই উপর কিম্বা গয়ালিগণের উপর পড়া উচিত।

"উত্তর মানুষ" পুষ্করিণীটী চতুষ্পার্শ্বে পাথরে বাঁধান। দলে দলে যাত্রীগণ এই সময়ে পিণ্ড-দানার্থ এই খানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা মন্ত্রঃপূত করিয়া যব-পিণ্ড পিতৃগণের তর্পনার্থ দান করেন। এই পুষ্করিণীর নিকটেই পিতামহেশ্বর নামক এক অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ইহা বিরাজমান। প্রবাদ এই যে, অতি পুরাকালে ব্রহ্মা এই স্থানে মহেশের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করণান্তর পিতৃকার্য্যোপলক্ষে গদাধরের পাদপদ্মে উপনীত হন। নিকটে অপরাপর দেবালয় আছে। শীতলা দেবীর মন্দির পুষ্করিণীটির উত্তর পাড়ের শোভা পরিবর্দ্ধন করিতেছে। দক্ষিণপাড়ে "কানফাট্টা" নামক শৈব সম্প্রদায়ের এক অতি প্রাচীন মঠ আছে। অনেক গয়াবাসী ও গয়ালিললনাগণ সময়ে সময়ে বহু সমারোহের সহিত শীতলাদেবীর পূজা দিয়া থাকেন। অভ্যাগত যাত্রীগণের নিকট হইতে গয়ালিগণ এই পুষ্করিণীর প্রবেশ দ্বারে শুল্ক আদায় করিয়া থাকেন। মধুগয়ার সময়ে বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দির হইতে এই পুষ্করিণী পর্য্যন্ত এত জনতা হয় যে লোক ভেদ করিয়া যাওয়া বড়ই দুষ্কর হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের মধ্যে যত মেলা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কুম্ভের মেলাই সর্ব্ব প্রধান। কিন্তু বাৎসরিক যত মেলা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বোধ হয় "সোনপুর" বা "হরিহর ছত্রের" মেলাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। হরি ও হরের সম্মিলন হওয়ায় এস্থানে প্রতিবৎসর যে মেলা হইয়া থাকে তাহার নাম "হরিহর ছত্রের" মেলা। এই মেলাটি অতি প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কৃষি সম্বন্ধীয় উৎকর্ষ সাধনার্থ যেমন প্রদর্শনি কৃষি মেলা হইয়া থাকে এই মেলাটীকেও ঐরূপ কৃষিমেলা বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে এইরূপ মেলা জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। "হরিহর সোনপুরের" মেলার পর অনেক জীবজন্তু, গো, মেষ, মহিষ, হস্তি, অশ্বাদি অবিক্রিত রহিয়া থাকে। এই চৈত্র সংক্রান্তির সময় তাহার মধ্যে অধিকাংশ গয়ায় আসে। ফল্গুনদীর পরপারে গদাধরের মন্দিরের সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র উপ-

পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হয়। পর্ব্বতটি চতুর্দ্দিক ও আশিখর পর্য্যন্ত বৃক্ষ লতা এবং গুল্মাদিতে পরিবেষ্টিত হওয়ায় স্থানটি অতি মনোরম হইয়া উঠিয়াছে এবং এখানে আসিলেই মহাভারতাদিতে উল্লিখিত মহর্ষিগণের তপোবনের কথা মনে স্বতঃই উদিত হইয়া হর্ষ পরিবর্দ্ধন করে। এই উপপর্ব্বতের শিখরদেশে মন্দিরাভ্যন্তরে সীতাদেবীর একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবাদ এই যে সীতাদেবী এই স্থলে স্বীয় শ্বশুর মহারাজ দশরথের শ্রাদ্ধকার্য্য করিয়াছিলেন এবং বালুকাময় পিণ্ড দানান্তে তর্পণ সমাধা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। খাপরাইল অন্তর্গত একবেদীপিণ্ড এই স্থলে প্রদত্ত হইয়া থাকে। "গয়া মাহাত্ম্য" নামক পুস্তকে এই তীর্থটিকে "সীতাকুণ্ড" এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপপর্ব্বতের পাদদেশে "বাহরি বাজার" নামক একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম আছে। প্রতিবৎসর চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রামটির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি বুদ্ধগয়ান্তর্গত কোন প্রতাপশালী মোহান্তের। তিনি এই স্থানে আগত গোমহিষাদি বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিয়া বিশেষ লাভ করিয়া থাকেন। গো-মহিষাদি কৃষি উপযোগী শত শত জন্তু সমূহই এই মেলায় অধিক বিক্রিত হইয়া থাকে। কৃষিজীবীগণ এই সময় বলদ ইত্যাদি ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হয়, এবং বর্ষাগমে যথেচ্ছা চাষ করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিতে পারে বলিয়া, এই মেলাতে তাহাদের ও দেশীয়লোক সমূহের বিশেষ উপকার হয়। মহিষাদি হলধারী জন্তুগণ পরিণত বয়স্ক বা কৃষিকার্য্যের বহির্ভূত হইলে কৃষকগণ এই সময়ে তাহাদিগকে অনায়াসে বিক্রয় করিয়া কার্য্যোপযোগী গবাদি ক্রয় করিয়া থাকে। সমগ্র গয়াজেলার ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য জেলার লোক সমূহও এই স্থান হইতে গবাদি পশু ক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। এই স্থানে এই মেলা হওয়াও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ-সাধন এবং গো-জাতিরও উন্নতি বিধান সম্ভাবনা আছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও এইরূপ কৃষি মেলা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল সুসভ্য দেশের স্থানীয় ভদ্রলোকগণ, জমিদার সমূহ, এমন কি, গভর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে এতদূর উৎসাহ যে তাঁহারা পশু-উৎপাদক (Breeder দিগকে) স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক (medal) পেয়ালা (cup) ও সার্টিফিকেট দিয়া সম্মানিত করেন যাহাতে তাহারা অধিকতর সম্পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট শাবক সমূহের উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগী ও রত হয়। কিন্তু আমাদিগের হতভাগা দেশে এই সকলের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে ধনীলোক অনেক আছেন বটে যাঁহারা এই সকল সদনুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে আদৌ মনোযোগ ও উৎসাহ নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় কণ্টিনেণ্টে এই সকল সদ্বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদানার্থ যেমন সখের প্রদর্শনি মেলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পারিতোষিক ও লাভ প্রদান করা হয়, এইখানেও কৃষি ও পশুজীবিদিগকে সেইরূপে উৎসাহিত করিতে ভারতবাসীর বিশেষ উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

চৈত্র সংক্রান্তির সময় গয়ায় যে মেলা হইয়াথাকে, তাহাকে প্রাদেশিক ভাষায় "বিশুয়ার মেলা" বলিয়া থাকে। যদি স্থানীয় গোরক্ষণী সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, এই সৎসংকল্পে যোগদান করিয়া মেডেল, ডিপ্লোমা, তাম্র, রৌপ্যাদি পদক বিতরণ দ্বারা উৎপাদকদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন ত ভাল হয়। ইংলণ্ডাদি দেশে গোজাতির উৎকর্ষ সাধনার্থ কত ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। ঐ সকল সভ্যদেশের অধিবাসীগণের উৎসাহ তদনুরূপ। হিন্দুবহুল যে ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাভী উৎপন্ন হইত, সুস্বাদু দুগ্ধ প্রদানার্থ যে দেশের গাভী জগৎ বিখ্যাত ছিল, সেই ভারতের আধুনিক জীর্ণ শীর্ণ গাভী দেখিলে হিন্দুর প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। মথুরা, ভাগলপুর ও মহিশূর প্রদেশে তেজস্বিনী ও উত্তম গাভী জন্মে বটে, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অল্প ও বহুমূল্য। গৃহস্থ লোকে অধিক মূল্য দিয়া ঐরূপ কয়টা গাভী কিনিতে সক্ষম? রাজা মহারাজারা ঐরূপ গাভী অনেক রাখিতে পারেন সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ সমাজের কথাই এস্থলে বিবেচ্য। সবলকায় গাভী উৎপাদনার্থ বিলাতি সার্ট-হর্ণ (Short horn)-এর সহিত দেশী গাভীতে উৎপন্ন দোয়াঁসলা জাতিই আমাদিগের দেশের উপযোগী এইরূপ বোধ হয়। এবং লাভ ও অর্থোপার্জ্জনার্থ আমাদিগের দেশে ইংলণ্ডের অনুকরণে গো চাষ প্রচলিত করা বিধেয়।

বিলাতে সাইরেন-সিষ্টার নামক এক কৃষি বিদ্যালয় আছে। তথায় কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সযত্নে শিক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের অনেক লোক ঐ স্থান হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ সকল মহোদয়গণের সাহায্যে ঐরূপ কৃষি বিদ্যালয় যাহাতে আমাদিগের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নিমিত্ত প্রত্যেক হিতৈষী ভারতবাসীর সবিশেষ চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদিগের দেশে ঐরূপ কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এখন অনেক অন্তরায় আছে। তাহা সত্ত্বেও এ সদনুষ্ঠানে আন্দোলন করিলে ভবিষ্যতে শুভ ফল-প্রদ হইবে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই ভারতবাসীর জীবন। আমাদিগের দেশে বলদাদির সাহায্য ব্যতিরেকে হলচালনাদি কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। সেই কারণ বশতঃ আমি "বিশুয়ার" প্রদর্শনি মেলা ও গোজাতির উন্নতি সাধনার্থ দুই একটি কথা সূচনা করিলাম মাত্র।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এ।

কত ভালবাসি।

কচি প্রাণ ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি,
কাছে ছুটে আসে মোর হাসি রব তুলি।
সাধ মনে গলা ধরে কোলেতে উঠিবে,
হাসি বিনিময়ে কত চুম্বন লুটিবে।
বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ হেরিয়া আমায়,
ম্লান-আঁখি বাছাগুলি ধীরে ফিরে যায়।
কোন সে হৃদয় হীনা বলরে বাছনি,
করিয়াছে অনাদর শুধায় জননী।

নহিগো হৃদয় হীনা, এই এ অন্তর
আদর করিতে তারে কত যে কাতর।
কাণ চাহে, সদা শুনি ওই আধ বোল,
টানিয়া লইতে প্রাণে ব্যাকুল এ কোল।
কিন্তু ভয় হয় বড় আমার আদরে
যদি অমঙ্গল ছায়া পড়ে তার পরে;
চাহি তবু নাহি দিই মোর স্নেহ হাসি;
কেমনে বুঝাব আমি কত ভালবাসি!

মরণ।

(১)

কে বহিতে পারিত এ জীবনের ভার
আবদ্ধ রহিত যদি মরণের দ্বার।
যতই বোঝার ভারে অবসন্ন হিয়া
ততই মরণ তরে উঠে আকুলিয়া।
একদিন পাব ওই মধুর বিশ্রাম
এই এ আশায় খেটে মরে অবিরাম।
সহস্র ব্যথায় যবে জর্জ্জরিত কায়
ওই সুখ চেয়ে তবে আশ্বাস সে পায়।
একদিন এ জীবন হবে অবসান,
একদিন মৃত্যু কোলে পাইবে নির্ব্বাণ,
কঠিন পাষাণ মত চেতনা বিহীন,
ধূলিমাঝে যাতনার হইবে বিলীন;—
মরণের স্নেহময় ওই ভালবাসা,
ওই সুখ ওই শান্তি ওই এক আশা—

না থাকিলে এতদিন মানব হতাশ
ছাইত প্রলয়ে মহা ধরণী আকাশ!
নিশ্বাস বাতাস আর অশ্রুজলধার
ডুবাইয়া দিত এই পৃথিবী অপার।
সূর্য্য চন্দ্র শোভা রাশি সে মহা আঁধারে
কোথায় ডুবিয়া যেত অকূল পাথারে

(২)

মরণে হইত যদি সব অবসান,
তা হলে পারিত কিরে বাঁচিতে পরাণ!
এ প্রাণ হইলে অন্ত আর যদি কিছু,
নাহি থাকে এই মহা যন্ত্রণার পিছু,
এই ব্যথা এই অশ্রু এই ভালবাসা,
এইখানে যদি তার শেষ সব আশা,
থাকে যদি এক শুধু মহা অন্ধকার
আর কিছু নাহি থাকে তাহার মাঝার,

তা হলে এ তিলে তিলে মৃত্যু ব্যথা সহি
কি কাজ এ কষ্টময় প্রাণভার বহি;
আছে বিষ, আছে ছুরি, তটিনীর জল
কেন তারা পড়ে থাকে বৃথায় বিফল!
ডুবিয়া যাইত বিশ্ব আত্মহত্যা ভারে
বাঁচিয়া রহিত কিরে কেহ এ সংসারে;

জানিতে পেরেছে নর মৃত্যু তার নাই
আজিও জগত মাঝে বেঁচে আছে তাই।
আর কিবা আছে-নাই নাহি তাহা জ্ঞান,
কিন্তু জ্ঞান আছে তবু অমর পরাণ!
উচ্ছৃঙ্খল অন্ধখেলা নহে এ সংসার,
ওই সুখ ওই শান্তি ওই আশা তার!

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।

সূতিকা গৃহে বানরত্ব।

মনুষ্য অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ডারুইনের মত কি তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিবার আবশ্যক করে না। বিলাতের লুই রবার্টসন নামক একজন বিখ্যাত ডাক্তার ডারুইনের মত পোষক কতকগুলি লক্ষণ শিশুদিগের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া নাইন্‌টিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি পত্রিকায় তৎসম্বন্ধে যে একটি কৌতুকজনক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে আমরা তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

"অতি অল্পদিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে ভূস্তরাবদ্ধ যুগযুগান্তরের জীবকঙ্কাল আমাদিগের জ্ঞানলাভের সহায়ক বলিয়া যেরূপ মূল্যবান্, শিশুদিগের জন্য রচিত যে সকল সামান্য উপকথা গাথা সনাতন কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাও আমাদিগের নিকট সেইরূপ মহামূল্য। কেন না ইহা হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ-গণের আচার ব্যবহার স্বভাব ও ইতিহাস আমাদের জ্ঞানায়ত্ত হইতে পারে। তবে এই সকল গাথা গল্পের ন্যায় সূতিকা গৃহও যদি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট আরো কিঞ্চিৎ সহজে প্রবেশ সাধ্য হইত, কিম্বা মৌচাকের বা পিপীলিকার আবাসের ন্যায় পরীক্ষণীয় হইত তবে এত-দিন যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচার ব্যবহার ও স্বভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপাততঃ ভ্রূণতত্ত্ব ও মানবতত্ত্বের মধ্যে একটী গভীর গুহা বিরাজমান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সম্মুখেই গুহা পূরণোপযোগী যথেষ্ট দ্রব্য পড়িয়া আছে, অথচ যথেষ্ট যত্নসহকারে এতদিন পর্য্যন্ত কেহ এ গুহা-গহ্বর পূরণে প্রয়াস পান নাই, ইতিপূর্ব্বে ইহার জন্য দুই এক বার মাত্র সামান্য নিষ্ফল চেষ্টা দেখা গিয়াছে। আমি বিশেষ অনুকূল ঘটনাধীনে এতৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে এই গহ্বর শূন্যতা দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহার কতকগুলি ফল এরূপ অদ্ভুত—এবং আমার শরীরতত্ত্ববিৎ ও মানবতত্ত্ববিৎ বন্ধুগণ প্রথমতঃ এইগুলি বিশ্বাস

করিতে যেরূপ ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় এদিকে পূর্ব্বে আর কেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু ইহার কতকগুলির সত্যতা সহজেই প্রমাণ করা যায় এবং তাঁহাদের সম্মুখে দুই একটী প্রত্যক্ষণীয় পরীক্ষা ধরিবা মাত্র তাঁহাদের সে সন্দেহ অপহৃত হয়। অপর কতকগুলির সম্বন্ধে এরূপ নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না,—তবে পাঠক সমস্ত পড়িয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

শিশুদিগের স্বাভাবিক অবস্থার বিষয় এত অল্প আলোচিত হইয়াছে যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শিশুদের চিকিৎসা সম্বন্ধে যথেষ্ট পুস্তক আছে কিন্তু যে সকল বিচক্ষণ ডাক্তার ইহা লিখিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই অসুস্থ কালের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। আর শিশুর সুস্থকালের অবস্থা ডাক্তারদিগের দ্বারা যাহা পর্য্যালোচিত হইয়াছে তাহাও প্রধানতঃ রোগ সময়ে উপকার লাভের অভিপ্রায়ে ও আশায়। সুতরাং যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধীয় অনেকগুলি লক্ষণ তাঁহাদের চক্ষে পড়ে নাই কিম্বা পড়িলেও তাহার প্রকৃত ভাব নির্দ্ধারিত হয় নাই। সাধারণতঃ চিকিৎসক পিতামাতা ও পরিচারিকা এই তিন শ্রেণীর লোকের শিশু স্বভাব বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিবার উপায় আছে। তন্মধ্যে সুস্থকায় শিশুগণের চিকিৎসক আবশ্যক হয় না, দ্বিতীয়তঃ পরিচারিকাদিগের শিশু সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা যথেষ্ট থাকিলেও তাহা আমাদের বড় কাজে আসে না; কারণ তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে এক কথায় দশ কথা উত্তর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে কথা-স্রোত হইতে আদি অন্ত কিছু বাহির করা যে কিরূপ কঠিন তাহা বোধ হয় বুঝাইবার আবশ্যক করে না। পিতামাতারা তাঁহাদের সম্বন্ধ হেতু বিজ্ঞানের স্থির পক্ষপাতীহীন দৃষ্টিতে সন্তানের কোন লক্ষণ পরীক্ষা করিবার উপযোগী নহেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, একজন অজ্ঞ কাফ্রি ভ্রূণতত্ত্ব বুঝিতে যেরূপ অক্ষম পিতামাতাও নিজ সন্তানতত্ত্ব বুঝিতে তদ্রূপ অক্ষম। তবে কখন কখন এই শ্রেণী বহির্ভূত দুই একজন লোক দেখা যায়। ডারুইন নিজেই তাঁহার Expression of the Emotions and Decent of man নামক পুস্তকে তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে পরীক্ষিত কতকগুলি বিশেষ কৌতূহলজনক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি কতকগুলি প্রধান বিষয় তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এইগুলি আমরা এখানে আলোচনা করিব। ডারুইন তখন যে বিষয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন (অর্থাৎ মনুষ্য বৃক্ষবাসী চতুর্ভুজ জন্তু হইতে উৎপন্ন) ইহা জানিলে তাঁহার তদ্বিষয়ে সাহায্য হইত, তথাপি এই ঘটনাগুলি যে তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির চক্ষে পড়ে নাই তাহাতে মনে হয় যে বহির্জগতের ন্যায় অন্তঃপুর মহলে তাঁহার অতটা অধিকার ছিল না এবং গৃহিণীর মতে ডারুইন বংশ ও ডারুইন মত এই দুয়ের মধ্যে প্রথমের প্রাধান্য বশতঃ দ্বিতীয়ের কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ডিম্ব অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত জরায়ুতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে

সেগুলি জীবের অতীত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার মাত্র। অর্থাৎ ক্রমোন্নতিবাদ অনুসারে অতি ক্ষুদ্র জীব ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে মানুষে পরিণত হইয়াছে এবং এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে অবশ্য যুগযুগান্তর লাগিয়াছে, কিন্তু কিরূপে ইহা ঘটিয়াছে তাহা জরায়ুর পরিবর্ত্তন সমূহ দেখিলে আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। সেইরূপ আবার সদ্যঃজাত শিশু ক্রমে ক্রমে কিরূপে বয়স্ক মানবে পরিণত হয় তাহা দেখিলে মানব সমাজের অতীত ইতিহাস আমরা অনেকটা জানিতে পারি। মানুষের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল অন্যান্য জীব সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি। আমাদের গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে ঘোড়া ও গরু উভয়েই অনেকটা এক নিয়মে বাস করে, উভয়েই ময়দানে ঘাস খাইয়া চরিয়া বেড়ায়। কিন্তু তথাপি একটু মনোযোগ পূর্ব্বক ইহাদের বৎসগুলিকে দেখিলে বুঝা যায় যে ইহাদের পূর্ব্ব-বংশদিগের আচার ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রভেদ ছিল। অশ্ব শাবক প্রথমেই দীর্ঘপদবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই বয়স্ক ঘোটকের ন্যায় দ্রুতগামী হয়। মাতার পশ্চাতে ভিন্ন অন্যত্র কোথাও লুকাইবার চেষ্টা করে না এবং মাথা তুলিয়া এরূপ ভাবে চলে যেন কোন বিপদ আছে কি না দেখিবার নিমিত্ত সতর্ক ও পলায়ন তৎপর রহিয়াছে। গোবৎসেরা সাধারণতঃ খর্ব্বপদ ও মন্দগামী এবং অশ্ব শাবকের ন্যায় চতুর কিম্বা চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম নহে। কিন্তু আত্মরক্ষা সম্বন্ধে ইহার আর একটী অদ্ভুত বুদ্ধি আছে। গাভীগণ বৎসদের কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিয়া অদূরে চরিতে যায় এই সময়ে বৎসেরা নিতান্ত স্থির ভাবে মৃতের ন্যায় লুকাইয়া পড়িয়া থাকে এমন কি পদদলিত হইলেও শব্দ করিয়া বা নড়িয়া আপনার গুপ্তস্থান ব্যক্ত করে না! ইহা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে গৃহপালিত অশ্বদের পূর্ব্ব বংশীয়েরা মাঠ প্রান্তর ইত্যাদি বৃক্ষ বিহীন অনাবৃত স্থানে বাস করিত এবং শত্রুদের আগমন বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া বিপদ দেখিবামাত্র পলায়ন করিত। বন্য গাভীগণ অরণ্যের বাহিরে আশ্রয় লইত না (এখনও অষ্ট্রেলিয়া এটেস্কাজের বন্য স্থানে এরূপ দেখা যায়) এবং শত্রু দেখিলে মৃগের ন্যায় তাহাদের দৃষ্টি বহির্ভূত ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিত। কত সহস্র সহস্র বৎসর যে সকল গো ও অশ্ব বংশ গৃহপালিত হইয়াছে এবং অনাবশ্যক বশতঃ যাহাদের বন্যগুণ অনেক লোপ পাইয়াছে তাহারাও পুনরায় ছাড়া পাইলে আত্মরক্ষা হেতু পূর্ব্ববংশীয়দিগের আচরণ গ্রহণ করে এবং এক বংশেই তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ঘ্রাণ প্রভৃতি গুণের পুনরাধিকারী হয়। আপাততঃ বোধ হয় অষ্ট্রেলিয়ার "ব্রম্বিজের" ন্যায় সতর্ক ও দুষ্পোষ্য বন্য জীব আর নাই। কতদিনে কত যুগে যে তাহাদের বন্য গুণগুলি অস্থি মজ্জাময় হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝাইতে হইলে কতদিনের গৃহপোষ্য অবস্থাতেও তাহাদের স্বভাবের যে কিরূপ অল্প পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখার ন্যায় জাজ্বল্যমান প্রমাণ আর দেওয়া যায় না। মানবের মধ্যে দেখা যায় যে স্কুলের বালকদের চিন্তা প্রণালী ও কার্য্য অনেকটা অসভ্য জাতিদের চিন্তাপ্রণালী ও

কার্য্যের মতন। শিশুদের মধ্যেও এইরূপ পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। অশ্বশাবক ও গোবৎসের ন্যায় শিশুদের মধ্যেও আত্মরক্ষার ভাব দেখা যায় এবং তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে তাহাদের এই বৃত্তির প্রয়োজন ছিল। ইহার একটী প্রমাণ এই যে, অপরিচিত লোক দেখিলে তাহারা ভয় পায়। প্রথমতঃ ইহার কারণ বুঝা যায় না যে, যে শিশু এ পর্য্যন্ত সকলেরই কাছে স্নেহ মমতা পাইয়াছে—বিপদ কাহাকে বলে জানে না সে কেন নূতন লোক দেখিলে ভয় পায়? শিশুদের মধ্যে সমভাবে এ লক্ষণটী দেখা যায় না, কাহারও কম কাহারও বেশী ; সেইজন্য মনে হয় যে এই বৃত্তিটি বেশী দিন রক্ষা করিবার আবশ্যক হয় নাই (যুগ হিসাবে অধিক দিন)। ডারুইন ছেলেদের এই সঙ্কোচ ভাবকে সাধারণ বন্য জীব মাত্রেরই সঙ্কোচের সংস্কারাবশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্কোচের কারণ অন্বেষণার্থে আমাদের বড় বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন হয় না। আমরা জানি মনুষ্যেরা পূর্ব্বে মনুষ্যখাদক ছিল। তাহারা একটী ক্ষুদ্র স্থানে (আধুনিক একটী গ্রামের মত) দল বাঁধিয়া কয়েক পরিবারে বাস করিত, এইরূপে কিঞ্চিৎ দূরে এক একটী দল থাকিত এবং একদলের সহিত অন্য দলের বিদ্বেষ ছিল। এই সময় একদলের লোক অপর দলের বাসস্থানে গমন করিলে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের সহিত শিশুদিগকেও লইয়া যাইত। এরূপ অবস্থায় যে শিশু অপরিচিত লোক দেখিবামাত্র দৌড়িয়া তাহার মাতার কাছে আশ্রয় লইত নির্ভীক বিশ্বস্তচিত্ত শিশুদিগের অপেক্ষা তাহার পরিত্রাণ পাইবার অধিক সম্ভাবনা ছিল। অনেক সময় কোন দলের পুরুষেরা শীকারার্থে বাহিরে গমন করিলে বিপক্ষ দলেরা আসিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা করিত ও বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। শীকারীরা আগমন করিয়া দেখিত তাহাদের গৃহ পরিবার সমুদয় উৎসন্ন হইয়াছে। কোন পরিবারের মধ্যে যাহারা সৌভাগ্য ক্রমে লুকাইয়াছিল তাহারাই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। শত্রু ও অপরিচিত দুই কথার অর্থ একই ছিল। অপরিচিত লোক দেখিয়া যে শিশু প্রথমে মাতার কাছে গেল যে মাতা তাহাকে লইয়া কোন গুহায় লুক্কায়িত হইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিল সেই শিশুই পরে আবার বংশ স্থাপয়িতা হইল। প্রায় সহস্র সহস্র বৎসর সমাজের অবস্থা এইরূপ ছিল। আমাদের মধ্যে সেই জন্য এইরূপ স্বভাবের লক্ষণ আজিও বর্ত্তমান দেখা যায়। জন্তুদের বাচ্ছারা প্রায়ই কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া খেলা করে এবং আমাদের ছেলেরা অতি অল্প বয়স হইতেই লুকোচুরী খেলা আরম্ভ করে। আমি একটী এক বৎসরের ছেলেকে দেখিয়াছি সে কোন শিক্ষা ব্যতিরেকে পর্দ্দার আড়ালে লুকাইত এবং ধরিলে নিতান্ত ভয়ের ভাণ করিত। ছেলেরা মুখে কাপড় দিয়া বা মশারীর ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া যেরূপ খেলা করে তাহাতে বোধ হয় তাহা আরও পুরাতন পূর্ব্ব পুরুষের স্বভাবের লক্ষণ। বৃক্ষবাসী জন্তুদের মধ্যে এই লক্ষণটী দেখা যায়। মশারী বা কাপড় বৃক্ষের কোটরের কাজ করে। উহার মধ্যে যেন শরীরটী লুক্কায়িত আছে এবং চোখ ও অল্প মুখের অংশ বাহিরে কোন বিপদ আছে কি না উঁকি

মারিয়া দেখিবার জন্য একবার একটু বাহির করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ যেন কোটরে টানিয়া লয়। ছোট ছেলেরা খুব শীঘ্রই গৃহপোষ্য নানা প্রকার পশুদের বিভিন্নতা বুঝিতে পারে। আমি জানি এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বাকশক্তিহীন অনেকগুলি শিশু, ভেড়া গরু কুকুর ও বিড়ালের শব্দের বিভিন্নতা বুঝিতে ও অনুকরণ করিতে পারিত এবং অশ্ব ও গরুর বিভিন্নতা বুঝিতে পারিত। অনেক সময় আমি পিতা মাতাকে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি যে, কোন দূরবর্ত্তী জন্তু অন্য কোন কারণ বশতঃ যাহা বয়স্ক লোকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই তাহা শিশুর অগ্রে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। জন্তুদের ছবি দেখিতেও শিশুরা অত্যন্ত ভাল বাসে এবং ছবি দেখিবার সময় যদি কেহ ছবিস্থ সিংহ বা গাধার ন্যায় শব্দ করে তবে তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ করে। আপাততঃ একথা গুলি সামান্য মনে হইতে পারে কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখা যায় যে শিশুর পূর্ব্ব পুরুষদের সহস্র সহস্র বৎসর জন্তুদের গঠন ও শব্দ জ্ঞানের উপর জীবন নির্ভর করিত, এই জ্ঞানই জন্তুদের হস্ত হইতে এবং অনাহারের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় স্বরূপ ছিল, যাহাদের এরূপ জ্ঞান ছিল তাহারাই কেবল রক্ষা পাইত, তাহা হইলে শিশুদের এই স্বভাবের মধ্যে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের স্বভাবের লক্ষণ নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হয়।

বৃক্ষবাসী বানরদের মধ্যে হস্ত দ্বারা বৃক্ষ শাখা দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিবার শক্তি একান্ত প্রয়োজনীয় সুতরাং এই শক্তি তাহাদের অত্যন্ত অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। মৃত Frank Buckland বলিয়া গিয়াছেন যে, মানবাকৃতি বানরের হাত নঙ্গরের মত এবং নঙ্গরের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহারা হস্ত ব্যবহার করে বলিয়াই এইরূপ গঠন হইয়াছে। কেবল যে বয়স্ক বানরের মধ্যেই এই শক্তি আছে তাহা নহে। বানরেরা যদিও সাধারণতঃ মানুষের ন্যায় এক হাতে বাচ্ছাকে রাখিয়া স্তন দান করে তথাপি সময়ে সময়ে যখন কোন বৃক্ষারোহী শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিবার আবশ্যক হয় তখন সময় ও সুবিধার জন্য মাতার দুই হাতই ব্যবহার করিতে হয় এবং বাচ্ছারা সাধারণত মাকে ধরিয়া দৃঢ় ভাবে ঝুলিতে থাকে। যাঁহারা বানরদিগকে এই পলায়নপর অবস্থায় দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে সাধারণতঃ বাচ্ছারা মায়ের গলা বা বক্ষের নীচের লম্বা লোম মুষ্টি দ্বারা ধারণ করিয়া ঝুলিয়া থাকে। জুয়লজিক্যাল গার্ডেনে ভূমিষ্ঠ একটী বানরের বাচ্ছা এইরূপ ধরিয়া থাকিত। ওয়ালেস তাঁহার Malay Archipilago গ্রন্থে একটী বনমানুষের বাচ্ছারও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মাকে বধ করিয়া তিনি এই বাচ্ছাটী ধৃত করেন। তিনি বলেন মানব শিশুর ন্যায় এ বাচ্ছাটী নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অসহায় ও বসিতে অপটু ছিল। কিন্তু তাহার একটী শক্তি ছিল। বাচ্ছাটী যখন তাঁহার দাড়ি ধরিয়াছিল এমন দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিল যে সহজে তিনি তাহার মুষ্টি ছাড়াইতে সমর্থ হয়েন নাই। বাচ্ছাটী বাড়ী লইয়া যাইবার পর তিনি দেখিলেন সে কিছু হাতে না ধরিবার পাইলে নিতান্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইত এবং মাটীতে গড়াইয়া গড়াইয়া কিছু ধরিবার দ্রব্য অনুসন্ধান

করিত। প্রথমতঃ তাহাকে তিনি কাঠের কয়েকটী শিক দেন কিন্তু কিছু কোমল পদার্থ চায় দেখিয়া পরে একটা মহিষের চামড়া জড়াইয়া গোল করিয়া তাহা দেন। প্রথম প্রথম বেচারী এই চামড়াতে ঝুলিয়া তৃপ্তি লাভ করিত ক্রমে ক্রমে যখন চামড়ার দ্বারা তাহার মাতার অন্য অন্য কাজ করাইতে চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হইল না তখন কষ্টে সে লোমগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মুখে পুরিতে লাগিল এবং আর একটু হইলেই তাহা গলায় বাধিয়া নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যাইত সুতরাং তাহাকে আর এ সামান্য সান্ত্বনা-চামড়া দেওয়াও বন্ধ করিতে হইল। এ বানরটীর সমুদয় ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহল-জনক এবং পড়িলে বড় মায়া করে।

অশ্বের দ্রুত গামীত্ব ও গরুর লুকাইবার ভাবের ন্যায় বানরের এই মুষ্টি শক্তি আত্ম-রক্ষার ভাব হইতে উৎপন্ন। অনেক কাল পর্য্যন্ত বানরের এ শক্তির প্রয়োজন ছিল। বিপদ কালে যে বাচ্ছা মাকে এরূপ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে না পারিত তাহার মাটীতে পড়িয়া বা গাছের শাখার মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক প্রাণ বিনষ্ট হইত। অনেক কাল পর্য্যন্ত এই শক্তির আবশ্যক বশতঃ যে এই শক্তি বর্দ্ধিত ও তাহাদের পর পুরুষদের মধ্যে ইহার চিহ্ন থাকিবে ইহা নিশ্চয়ই। ইহা দ্বারা আমার মনে আসে যে শিশুদের মুষ্টি শক্তি পরীক্ষা করা উচিত। শিশুদের যদি সাধারণ শারীরিক শক্তি ভিন্ন মুষ্টিতে কোন বিশেষ শক্তি না থাকে তবে মনুষ্যের সহিত হয় বানরের সম্বন্ধ নিতান্ত অল্প কিম্বা ডারুইন-মত এক বারেই অসত্য। ঘটনা ক্রমে যেখানে অনেক শিশু আছে এবং তাহাদের উপর পরীক্ষা সম্ভব এরূপ সুবিধা মত অবস্থা পাইয়া আমি রীতিমত ধারাবাহিক পরীক্ষা দ্বারা শিশুদের মুষ্টি শক্তি পরীক্ষায় নিযুক্ত হই। এক মাসের নিম্ন বয়স্ক ৬০ জন শিশু আমি পরীক্ষা করি এবং ইহার মধ্যে ৩০ জন জন্মের এক ঘণ্টা পরকালের মধ্যে পরীক্ষিত হয়। এই পরীক্ষায় অদ্ভুত ফল নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। দুই জন ছাড়া আর সকলেই আঙ্গুল কিম্বা ½ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা লাটী ধরিয়া বাজীকরেরা পৃথিবীর সহিত সমতল দণ্ডে যে ভাবে ঝুলিয়া থাকে সেই ভাবে অন্ততঃ দশ সেকেণ্ড কালের জন্য আপনার শরীরের সমুদয় ভার রক্ষা করিয়াছিল। এক ঘণ্টা কাল নিম্ন বয়স্ক ১২ জন শিশু আধ মিনিট কাল ভার রক্ষা করিয়াছিল এবং ৩।৪ জন ঐ বয়স্ক শিশু এক মিনিট কাল ঐরূপে ঝুলিয়াছিল। চার দিন পরে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহাদের মুষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রায় সকলেই আধ মিনিট কাল ধরিতে পারে। জন্মের দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ পরে এই শক্তির চরম উৎকর্ষ হয়। সকলেই এই সময় প্রায় দেড় মিনিট ধরিয়া রাখিয়াছিল। দুই জন দুই মিনিট এবং তিন সপ্তাহ বয়স্ক এক জন ২ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড রাখিয়াছিল। সুস্থকায় শিশুদের মধ্যে দুই সপ্তাহ পরে শীঘ্র শীঘ্র মেদ সঞ্চয় হইয়া শরীরের ভারাধিক্য বশতঃ কিম্বা এই ক্ষমতার চর্চ্চা না করা বশতঃ ইহার পর হইতে এই ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসে। একটী এক ঘণ্টা বয়স্ক শিশু দুই হস্ত দ্বারা আমার আঙ্গুলে দশ সেকেণ্ড কাল

প্রথম ঝুলিয়া পরে স্বেচ্ছায় ডান হস্ত খুলিয়া (যেন অন্য আশ্রয় ধরিবার চেষ্টায়) কেবল বাম হস্ত দ্বারা আর ৫ সেকেণ্ড কাল ঝুলিয়াছিল। একটী আশ্চর্য্য এই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুষ্টি না শিথিল হইয়া আসে ততক্ষণ ক্রন্দন করে না বা অন্য রূপ অসুবিধার চিহ্ন প্রকাশ করে না।

ঝুলিবার সময় সকলেই উরুদেশ শরীরের সহিত সমকোণ রেখায় নত করিয়া থাকে এবং কেহই শরীরের নিম্নভাগ সোজা সরলভাবে ঝুলাইয়া রাখে না। এই ভঙ্গী এবং পদের তুলনায় হস্তের দীর্ঘতার দ্বারা তাহাদের আকৃতি জুয়লজিকেল গার্ডেনের "সালী" নামক বনমানুষের একটী বিখ্যাত চিত্রের ন্যায় দেখিতে হয়। শিশুদের উরুর এই বক্রতা এবং নিম্ন অঙ্গের তুলনায় ঊর্দ্ধ অঙ্গের দীর্ঘতার বিষয় সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বক্তব্য আছে কারণ আমার বোধ হয় শরীরতত্ত্ববিদেরা এ পর্য্যন্ত ইহার যে, হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক সন্তোষজনক নহে। ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শিশুদের সম্মুখ হস্তের মাংসপেশীর এই ক্ষমতা বিশেষতঃ তাহাদের শরীরের অপরাপর অংশের বলের তুলনায় হস্তের এই প্রভূতবল অত্যন্ত বিস্ময়জনক এবং এই বলের উৎপত্তি কিরূপে হয় ও হইবার কারণ কি তাহা জ্ঞাতযোগ্য। একজন বয়স্কলোক যে বলের কার্য্য সহজে করিতে অক্ষম, (যদি কেহ বিশ্বাস না করেন তবে তিনি একটী লাঠিতে পৃথিবীর সহিত সমতলদণ্ডে তিন মিনিট কাল হস্তদ্বারা ঝুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন) একজন তিন সপ্তাহের শিশুর তাহা সহজে আয়াসসাধ্য ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে কি?

মাংসপেশীর এই বিশেষ বল হইতে বুঝা যায় যে হয় ইহাতে তাহাদের এখন বিশেষ কোন কার্য্যের সহায়তা করে কিম্বা পূর্ব্বকালে জীবনসংগ্রামে কোন বিশেষ সহায়তা করিত। এখন ইহা স্বতঃ প্রমাণ্য যে মানবশিশুর এই বলের কোন আবশ্যক নাই। এক যদি দক্ষিণ ইংলণ্ডে কোন প্রদেশের শিশুদের কিছু কার্য্যে লাগে। সেই স্থলে এইরূপ নিয়ম আছে তিন দিনের শিশুকে একটী নূতন খড়াচ্ছাদিত ঘরের ঢালু ছাতের উপর আস্তে আস্তে ফেলা হয়, শিশু খড়গুলি ধরিয়া ছাতের উপর থাকে, কিম্বা অসহায়ভাবে গড়াইয়া পিতার হস্তে ফিরিয়া আসে—তাহা দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যতের কোষ্ঠীফল গণনা করা হয়। কিন্তু তাহা ভিন্ন তাহাদেরও জীবন মৃত্যু কিছুই ইহার উপর নির্ভর করে না; সুতরাং দেখা যাইতেছে সভ্য অসভ্য কোন জাতির মধ্যেই এই ক্ষমতা শিশুদের কোন প্রকারে আবশ্যকীয় নহে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই ক্ষমতার উৎপত্তির কারণও যে অন্যান্য পূর্ব্ব গঠনের অবশিষ্ট-গঠনাংশের ও অনাবশ্যকীয় আচরণের ন্যায় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে অনুসন্ধান করা উচিত এবং মনুষ্য যাহা হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন কেবলমাত্র বৃক্ষবাসী চতুর্ভুজদের মধ্যেই এই ক্ষমতা দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যেই জীবনসংগ্রামে ইহার আবশ্যক বশতঃ ইহার চর্চ্চা হইয়াছিল।

সকলেই জানেন যে মানবশিশু জন্মিবার তিনমাস পূর্ব্বে একরূপ ঘন লোমদ্বারা তাহার শরীর আবৃত থাকে এবং আর একটী নূতন সোপানে পৌছিবার পূর্ব্বে এই লোমাচ্ছাদন উঠিয়া যায় এবং এই সময়ে তাহার অস্থির গঠনে ইহার পরবর্ত্তী কাল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বানরের গঠনের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সময়ে স্কন্ধপ্রদেশের অস্থি উরুর অস্থির সহিত সমপরিমাণ এবং করনলিস্থ অস্থি (Ulna) পদনলির অস্থির (Tibia) ন্যায় সমদীর্ঘ ও সমপ্রধান হয়। জন্মের পরে দেখা যায় যে শরীরের নিম্নাংশ আয়তনে ঊর্দ্ধাংশ অপেক্ষা দীর্ঘ কিন্তু তথাপি বয়স্কলোকের নিম্নাংশের তুলনায় দীর্ঘ তখনও হয় না। শরীরতত্ত্ব-বিদেরা প্রাণের নিম্নাংশের হ্রস্বতার এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে জন্মপূর্ব্বের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষত্ব বশতঃ এইরূপ হয়। মাতৃ নাড়ী হইতে মাথা ও হস্ত প্রভৃতিতে অধিকতর বিশুদ্ধ বায়ু গমন করে এবং নিম্নাংশে অপেক্ষাকৃত দূষিত বায়ু প্রবেশ করে। তাঁহারা বলেন যে এই কারণে জন্মের পূর্ব্বে মাথা ও হাত শরীরের অপরাপর অংশ হইতে সমধিক পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। ইহার ঠিক বিপরীত বলিলে অনেকগুলি প্রধান প্রধান লোকের মতের বিরুদ্ধ বলা হয় এবং যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈশ্বর বড় বড় সহরের নিকট দিয়া বড় বড় নদী প্রবাহিত করাইয়াছেন এই কথা ও বুদ্ধির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন তাহার মতের বিরুদ্ধ বলা হয় তথাপি ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে রক্তশিরা রচিত হইয়াছিল রক্তশিরা অনুসারে মানুষ রচিত হয় নাই। একটা অজানা কারণে না হইয়া মাথা ও হাত মানবশিশুর অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা অগ্রে পূর্ণতালাভ করে ও তথায় অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধরক্ত চালিত হয়—এই যুক্তিই আমার সঙ্গত মনে হয়। যে সকল জন্তুদের শরীরের নিম্নাংশ অধিক কার্য্যকারী তাহাদের শিশুদের গঠন আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা বুঝা যায়। ইহার জন্য আমরা পূর্ব্বে যে অশ্বশাবকের উল্লেখ করিয়াছি তাহার কথা বলিলেই হইবে। জন্মের পূর্ব্বে অশ্ব ও মনুষ্য উভয়েরই এক প্রণালী দ্বারা রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে অথচ অশ্ব-শাবকের জন্মকালেই পশ্চাতের পদ এরূপ পূর্ণতা লাভ করে যে সে দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারে। আমেরিকার মহিষেও ইহার একটী বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহিষ-শাবকদের পিতা মাতার সহিত প্রান্তরে থাকিবার জন্য দ্রুতগামী হওয়া প্রয়োজন সেই জন্য তাহাদের পশ্চাৎপদ যে কেবল গরুদের তুলনায় দীর্ঘ এমন নহে তাহাদের নিজেদেরও বয়স্ক কালের তুলনায় সমধিক উচ্চ।

মানবশিশুর মস্তক ও ঊর্দ্ধাংশ উক্তরূপ সুগঠিত ও পূর্ণতালাভ করিবার কারণ কি? আমার বোধ হয় কারণ এই যে, অনেককাল অবধি প্রথমে জীবনযাত্রার জন্যে হাতের আবশ্যক ছিল ক্রমে ক্রমে লোকে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। হাতাহাতি যুদ্ধের পরিবর্ত্তে বুদ্ধি দ্বারা জীবন চালিত হওয়ায় যাহাদের মস্তিষ্কের বল নিতান্ত অল্প হইত তাহারা অল্পদিনেই নিহত হইত। এক কথায় জীবনের

জন্য কিছু বুদ্ধি ও হাতের বল আবশ্যক ছিল এবং প্রকৃতি সেই জন্য মস্তক ও হস্তে অধিকতর বিশুদ্ধ রক্ত চালিত করিয়া তাহাদের সম্যধিক পূর্ণতা লাভের সহায়তা করিত।

শিশুদিগের মধ্যে দেখা যায় যে তাহাদিগের উরুদেশ সম্মুখ ভাগে দেহের উপর আনত। কেহ কেহ বলেন যে মাতৃগর্ভে জরায়ুর পদদ্বয় উদরের তলদেশে লগ্ন থাকে, সেই জন্য শিশুদিগের উরু দেহের সহিত সরল রেখায় না থাকিয়া উক্তরূপ আনত হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না কারণ অন্যান্য জীবে দেখা যায় যে, তাহাদিগের জন্মের পর শরীরের অবস্থা মাতৃগর্ভের অবস্থার উপর ঐরূপ নির্ভর করে না। মানুষের শিশুর উরুদেশের ঐরূপ আনত অবস্থা দেখিলে বানরদিগের কথা মনে হয়, কারণ তাহাদিগের উরু ভাগ স্বভাবতঃ আনত আর চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাহাদিগের পদ শরীরের সহিত লম্ব রেখায় অবস্থিত। আমি দেখিয়াছি ছেলেরা যখন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াইতে সক্ষম হয় তখন তাহারা সাধারণতঃ কুণ্ডলী করিয়া নিদ্রা যায় এবং যদি কাপড় ইত্যাদিতে বাধা পায় তবে অনেকে চতুষ্পদ জীবের ন্যায় অর্থাৎ উদরাংশ নীচে রাখিয়া এবং হাত পা সব গুটাইয়া নিদ্রা যায়। শুনিয়াছি পশ্চিম আমেরিকার কাফ্রিমাতারা ছেলেদের উপুড় করিয়া শোয়াইয়া রাখে এবং পৃথিবীর আরও অনেকস্থানে এইরূপ করিয়া থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিরাই কেবল বোধ হয় ইচ্ছা পূর্ব্বক সোজা ভাবে চিত হইয়া শয়ন করে। কোন কোন অসভ্য জাতি বানরের ন্যায় হাটু উঁচু করিয়া বসিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যায়। জুয়লজিকেল গার্ডেনের বানরেরা এবং শতকরা ৮০ জন শিশু অবিকল একভাবে হাত পা গুটাইয়া নিদ্রা যায়। অসভ্য জাতিদের নিদ্রা যাইবার অবস্থা জানিতে পারিলে বোধ হয় এ সম্বন্ধে আরও ফললাভ করা যাইতে পারে।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

মালবিকা-অগ্নিমিত্র।

কালিদাসের রচিত এই গ্রন্থখানির যথেষ্ট আদর হয় নাই। প্রোফেসর উইল্‌সন্ ত ইহাকে কালিদাসের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া মানিতেই চাহেন না যে, ইহা তাঁহারই রচনা। কিন্তু উইল্‌সন্ সাহেব তাঁহার সন্দেহকে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তির স্তম্ভে ঠেসান দিয়া অটল ভাবে খাড়া করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, এ নাটক খানি কালিদাসের অন্যান্য নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে হীন, সুতরাং ইহা যে, সেই একই কালিদাসের রচিত তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এ কিরূপ যুক্তি? সকল কবির সকল রচনা কিছু সমান উৎকৃষ্ট হয় না। জীবন-মধ্যাহ্নের কবি জীবন-প্রারম্ভের কবির রচনা দেখিয়া আপনা আপনি লজ্জিত হয়েন। কবি এবং কবির রচনা ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মধ্য দিয়া গিয়া পরিণতির রাজ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। সেই জন্যই গ্রন্থের তারতম্যতা

বিচার করিয়া অনেকস্থলে তাহার রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। রোমিও-জুলিয়েট অপেক্ষা কিং লিয়ার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কি বলিব রোমিও-জুলিয়েট সেক্ষপীয়রের রচনা নহে ? শকুন্তলার তুলনায় মালবিকা-অগ্নিমিত্র নিকৃষ্ট হইতে পারে কিন্তু এই মালবিকা-অগ্নিমিত্রই ভাবী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শকুন্তলার ভবিষ্যৎ সূচনা করিতেছে। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গার জল যেমন কূলে কূলে ছাপিয়া থাকে, শকুন্তলায় তাঁহার কবিত্বের বিকাশ তেমনি কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলার কবি তাঁহার পাকা হাতের ছাপ মারিয়া আমাদের আদর্শ উচ্চ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আর আমরা মালবিকা-অগ্নিমিত্রকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে পারি না। কিন্তু কালিদাসের নাটকের মধ্যে সে সর্ব্বোচ্চ স্থান না পাউক অন্যান্য সংস্কৃত নাটক মহলে তাহার যে উচ্চাসন অবশ্য প্রাপ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে কোন্ নাটক কোন্ কবির প্রণীত তাহা নির্ণয় করিবার সাধারণতঃ একটী মাত্র নাটক-বহির্গত উপায় আছে—সেটী নাটকের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকারের নামানুসন্ধান শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশীর প্রস্তাবনায় কালিদাসের নাম দেখিয়া যদি প্রমাণীকৃত হয় যে এ দুই গ্রন্থ কালিদাসের রচিত তবে মালবিকা-অগ্নিমিত্রের বেলায় সে প্রমাণ অগ্রাহ্য করা নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব যে একটী মাত্র বাহ্যিক প্রমাণের দ্বারা গ্রন্থকারের নাম নির্ণীত হইতে পারে সে প্রমাণ উইল্‌সনের সন্দেহের বিপক্ষে। তাঁহার বিরোধী আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। প্রথমেই ইহার ও শকুন্তলার নান্দী তুলনা করিয়া দেখ।

শকুন্তলায় কালিদাস বলিয়াছেন :—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বেকালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ।

মালবিকা-অগ্নিমিত্রে বলিতেছেন :—

একৈশ্বর্য্যে স্থিতোপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসংমিশ্রদেহোপ্যবিষয়মনসাং যঃ পুরস্তাদ্ যতীনাং
অষ্টাভির্য্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স নস্তামসীং বৃত্তিম্ ঈশঃ।

উভয়ের মধ্যে একই মহান্ ভাব। সেই এক অনাদিপুরুষের অবতারণা। এ যে শিব, এ রত্নাবলীর, পার্ব্বতীর যৌবনের প্রতি সস্পৃহলোচন শিব নহেন। এ বিলাসী জনের আরাধ্য দেবতা নহেন। নাটকখানি আদিরস প্রধান বলিয়া ইতর কবির ন্যায় কালিদাস তাঁহার নান্দীতে হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের গাম্ভীর্য্য হ্রাস করিয়া তাঁহাকে বিলাসিতার শরণ্য বলিয়া আবাহন করেন নাই। তাঁহার এ দেবতার ধারণায় জাতিভেদ কি

দেশভেদগত রুচিভেদ নাই, এ সকল দেশের সকল কবির মানস-ঈশ্বর। কালিদাসের নান্দীর আর একটী বিশেষত্ব আছে। তিনি কখন দীর্ঘ নান্দী লেখেন না। তাঁহার নান্দীর ন্যায় সংক্ষেপ অথচ পরিপূর্ণ সুন্দর নান্দী আর কোন গ্রন্থকারে পাওয়া যায় না।

এই গ্রন্থের প্রস্তাবনা পড়িলেই বুঝা যায় যে এ নাটকখানি কালিদাসের প্রথম রচনা। এই তিনি প্রথম লেখকরূপে সাধারণের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। সূত্রধার তাহার অনুচর পারিপার্শ্বককে ডাকিয়া বলিল "পরিষদ্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি আজ বসন্তোৎসবের রাত্রে কালিদাস প্রণীত মালবিকা-অগ্নিমিত্র নামক নাটক অভিনয় করিতে হইবে।" পারিপার্শ্বিক আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিল "কিহে বল কি ? বড় বড় নামজাদা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ অতিক্রম ক'রে বর্ত্তমান কবি কালিদাসের গ্রন্থ অভিনীত হবে, পরিষদের এ কেমন ধারা বিচার ?" সেকালের প্রাচীন ও সেকালের নব্যদের ভিতর অনেকটা একালের প্রাচীন ও একালের নব্যদের মতনই সম্বন্ধ ছিল। প্রাচীনেরা সহজে নব্যদের সারস্বতমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিতেন না, নব্যেরাও আপনার প্রতিভার বলে সে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া লইতে ছাড়িতেন না। নূতন অপ্রথিত যশের নাটক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিলে সাধারণ বিচারহীন দর্শকমণ্ডলীর অবিশ্বাস, আপত্তি, ক্ষোভ সব কালিদাস পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরও কবির প্রস্তুত ছিল।

সূত্রধার বলিল "ওহে তোমার কথাটা বিবেকবিশ্রান্তের মতন হইল, জাননাকি—

পুরাণং ইত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবং ইত্যবদ্যং
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।

ইহার অর্থ :—যাহা কিছু পুরাতন তাহাই যে সুন্দর এমন নহে, এবং নূতন বলিয়াই যে কোন কাব্য অপদার্থ এমনও কোন কথা নাই। বিদ্বান্ যিনি, তিনি পরীক্ষা পূর্ব্বক অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করেন, মূঢ়ই কেবল পরের বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হয়।" এই কথাটার ভিতর কবির কতটা আত্ম প্রত্যয়! অথচ কেমন সুন্দর সংযত ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যে গুণী, যাহার নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস আছে, তাহার ত মনে হইতেই পারে যে সে অবহেলার পাত্র নয়। অথচ অবহেলার সম্ভাবনা মনে করিয়া বিনয়ীজনের সেই ক্ষমতার উপর সংশয়ও উপস্থিত হয়। আপনার যোগ্যতা আবিষ্কার করিয়াও যতক্ষণ পরের আদর না পাওয়া যায় ততক্ষণ সেই যোগ্যতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব কি না ভাবিয়া পাওয়া যায় না। তাই প্রথিতযশ হইয়াও কালিদাস বলিয়াছিলেন "আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে।" তিনি নিজের যোগ্যতা হৃদয়ে অনুভব করেন, অথচ বিদ্বানের সমালোচনার প্রতিও শ্রদ্ধা আছে। তাই তাঁহার আত্ম প্রত্যয় আছে কিন্তু ভবভূতির ন্যায় স্পর্দ্ধাপূর্ণ আত্মাভিমান নাই। তাহার এক প্রধান

কারণ বোধ হয় ভবভূতির ন্যায় তাঁহার অবহেলা সহ্য করিতে হয় নাই, জীবিত কালেই তিনি যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিলেন। মালবিকা-অগ্নিমিত্রের এই যে প্রস্তাবনা ইহা যত না নাটকের প্রস্তাবনা তাহার অপেক্ষা কবির প্রস্তাবনা।

"পুরাণং ইত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবং ইত্যবদ্যং"

এই দুইটী চরণে নবীন কবি কালিদাস সাধারণের সমক্ষে প্রথম আত্মপ্রস্তাবনা করিলেন।

সূত্রধারের উত্তর শুনিয়া পারিপার্শ্বক বলিল "তবে সেই পূজ্য ব্যক্তিরা যা ভাল বোঝেন তাহাই হউক।"

সূত্রধার—"তবে সত্বর প্রস্তুত হও। পরিষদের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, যেমন দেবী ধারিণীর আদেশ তাঁহার এই সেবাদক্ষা পরিচারিকার শিরোধার্য্য।" এই বলিয়া সূত্রধার নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতে রাণীর পরিচারিকা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল, নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রস্তাবনা কেমন সুন্দর ভাবে নাটকে মিলাইয়া গেল। এ কৌশল কালিদাস ভিন্ন অন্য শিল্পীতে দেখা যায় না। অন্যান্য কবির গ্রন্থে প্রস্তাবনার শেষ এবং নাটকের আরম্ভ অত্যন্ত স্পষ্ট! রত্নাবলীর সূত্রধার প্রস্তাবনার শেষে বলিল "অয়ং মম যবীয়ান্ ভ্রাতা গৃহীত যৌগন্ধরায়ণ ভূমিকঃ প্রাপ্তএব তদেহি" "এই যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যৌগন্ধরায়ণ সাজিয়া আসিতেছে, তবে চল আমরা যাই" এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহার অনতিবিলম্বে যৌগন্ধরায়ণ বীরদাপে প্রবেশ করিল। বৎস রাজমন্ত্রী, যৌগন্ধরায়ণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল, নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু সূত্রধারের শেষ কথার রেশ অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের কাণে লাগিয়া রহিল—"মম যবীয়ান্ ভ্রাতা গৃহীতযৌগন্ধরায়ণ ভূমিকঃ।" ম্যানেজারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নেপথ্য রচনা সাঙ্গ করিয়া বুলি কণ্ঠস্থ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ সাজিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এ যে নকল যৌগন্ধরায়ণ, সবই যে ফাঁকি এই ভাবটাই অনেকক্ষণ ধরিয়া মনে লাগিয়া থাকে, নাটকের ভিতর মগ্ন হইতে একটু বিলম্ব হয়। ভবভূতিতেও এই দোষ লক্ষিত হয়। কিন্তু কালিদাস কখন নেপথ্যের রহস্য ফাঁস করিয়া দর্শকের মোহ ভাঙ্গিয়া দেন না। মালবিকাগ্নিমিত্রে রাণীর পরিচারিকা প্রবেশ করিতেই আমরা সূত্রধারকে ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ নাটকের ভিতর মগ্ন হইয়া যাই। রাজ্ঞী ধারিণী, তাঁহার পরিচারিকাবর্গ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ছবি সত্যের ন্যায় চকিতে মানসপটে উদয় হয়। কালিদাসের এই কৌশলটী উইল্‌সনের সন্দেহের বিপক্ষে আর একটী যুক্তি। নাটকের অভ্যন্তরে এমন আরও অনেক আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী যুক্তি পাওয়া যাইবে নাটকের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উল্লেখ করিব।

"মালবিকা-অগ্নিমিত্র" এই নামটী পড়িয়াই আমরা ইহার গল্পটী কতকটা আঁচিয়া

লইতে পারি। মালবিকা নায়িকা, অগ্নিমিত্র নায়ক, এবং যখন সংস্কৃত নাটকের নায়ক তখন নিশ্চিত রাজা না হইয়া যান না। এই রাজা অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার মিলনই যে এই নাটকের মেরুদণ্ড তাহা নাটক না পড়িয়াও অনায়াসে অনুমান করা যায়। এখন বিবিধ ঘটনাবলী ও বিচিত্র চরিত্রসমূহের সমাবেশ করিয়া এই প্রণয় ব্যাপারটী কবি কেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলেন তাহাই আমাদের দেখিতে বাকী আছে।

প্রথম অঙ্কের আরম্ভে রাণীর দুই পরিচারিকার কথোপকথনে আমরা মালবিকা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর পাই। রাজ্ঞী ধারিণী তাঁহার পরিচারিকাকে গণদাস নাট্যাচার্য্যের নিকট জানিতে পাঠাইয়াছেন মালবিকা উপদেশ গ্রহণে তৎপর কি না। পথে তাহার কৌমুদিকার সহিত দেখা হইল। দুটো একটা অন্য কথার পর কৌমুদিকা বলিল "সখি, মালবিকা ত গণদাসের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করে, সঙ্গীতশালাতেই থাকে, তবে রাজা তাহাকে দেখিলেন কেমন করিয়া?" বকুলাবলিকা বলিল "গণদাস, রাণী ও তাঁহার পরিচারিকাবর্গের একটী ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহাতে মালবিকাও চিত্রিতা ছিল। রাজা সেই চিত্রে মালবিকাকে দেখিয়াছেন।"

কৌমু—"তার পর?"

বকুলা—"তার পর আর কি? রাজা সেই ছবি দেখিয়া মালবিকার পরিচয় জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেই রাণীর ভয় হইল। সেই পর্য্যন্ত মালবিকাকে সাবধানে সাবধানে রাখেন, যেন রাজার চোখে না পড়ে।"

এই চিত্রে মালবিকা দর্শনই এই নাটকের বীজ।

বকুলাবলিকা রাণীর আদেশ মত গনদাসের নিকট গিয়া তাঁহার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিল। রাণী কিরূপ উত্তর ইচ্ছা করিয়াছিলেন জানি না, গণদাস যাহা বলিলেন মালবিকা তাহা শুনিলে চরিতার্থ হইত সন্দেহ নাই। গণদাস বলিলেন এমন পরমনিপুণা মেধাবিনী শিষ্যা তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি যে উপদেশ দেন তাহা অভিনয়ে এমন সুন্দর রূপে ফুটাইয়া তুলে যেন আচার্য্যকেই সে পালটিয়া উপদেশ দেয়। রূপে গুণে এমন অদ্বিতীয় মেয়েটীকে রাণী কোথায় পাইলেন, গণদাস জিজ্ঞাসা করিলেন। বকুলাবলিকা বলিল "সীমান্ত প্রদেশের রক্ষক রাজ্ঞীর ভ্রাতা বীরসেন তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহার বেশী কেহ কিছু জানে না।" তাহার পর মালবিকা কোথায় আছে জানিতে চাহিল।

গণদাস—"ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাভিনয়ং উপদিশ্য বিশ্রম্যতাম্ ইত্যভিহিতা দীর্ঘিকাবলোকনগবাক্ষগতা প্রবাতম্ আসেবতা তিষ্ঠতি।"

"এই মাত্র আমি তাহাকে পঞ্চাঙ্গাভিনয় শিখাইয়া বিশ্রাম করিতে বলাতে সে গবাক্ষের ধারে বসিয়া দীর্ঘিকা অবলোকন করিতে করিতে বায়ু সেবন করিতেছে।"

কৌমুদিকা ও গণদাসের সহিত বকুলাবলিকার কথোপকথনে আমরা মালবিকার

সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাতে মালবিকার কি একখানি সুন্দর ছবি মনে আসে। এই সুন্দর, ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতী শিল্পী বালিকাটির পরিচয় কেহ জানে না, সে এখানে কোন্ অপরিচিত রাজ্যে অপরিচিত লোকের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রান্ত দেহে গবাক্ষের ধারে বসিয়া একলাটি দীর্ঘিকা অবলোকন করিতে করিতে কি ভাবিতেছে? গবাক্ষের বায়ু কি তাহার স্নেহমধুর পিতৃগৃহের অতীত স্মৃতি বহিয়া আনিতেছে না? আর হয়ত বা সেই অতীতের সঙ্গে কোন নূতন সুখস্মৃতি জড়িত হইয়াছে। রাজাও তাহার প্রতি অভিলাষযুক্ত আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু মালবিকার মনের কথা এখনো জানা হয় নাই।

ইহার পরের দৃশ্য রাজ সভায়। অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা রাজকার্য্য করিতেছেন। বিদর্ভ রাজপুত্র কুমার মাধবসেন স্বীয় কনিষ্ঠ ভগিনীকে রাজা অগ্নিমিত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে বিদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে পিতৃব্য পুত্র, বর্ত্তমান বিদর্ভরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কারারুদ্ধ হন। এই সম্বাদ পাইয়া অগ্নিমিত্র, বিদর্ভরাজকে মাধবসেন ও তাঁহার ভগিনীর কারামুক্তির আদেশ পাঠাইয়া দেন। সেই আদেশের উত্তরে বিদর্ভরাজ লিখিয়াছেন "তিনি মাধবসেনকে কারামুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন যদি নাকি অগ্নিমিত্র তাঁহার শ্যালককে মুক্তি দেন। মাধবসেনের ভগিনীর কথা তিনি কিছু বলিতে পারেন না, যেহেতু যুদ্ধের গোলমালে সে হারাইয়া গিয়াছে। তবে তাহার অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিতে পারেন।" এই বন্দীবিনিময়ের প্রস্তাবযুক্ত স্পর্দ্ধাপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া রাজা সরোষে বৈদর্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা আদেশ করিলেন। পরক্ষণেই বিবেচনা করিলেন অমাত্যদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া এইরূপ অকস্মাৎ একটা যুদ্ধ কার্য্যে সৈন্য প্রেরণ করা উচিত হয় না। অমাত্যদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা তাঁহার প্রস্তাব শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিল। সেনাপতির প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ প্রচার হইল। সেই দিনকার মত রাজকার্য্য শেষ হইল, সভা ভঙ্গ হইল। এই রাজসভার দৃশ্যে রাজার রাজভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজার মতন রাজা বটে। শুধু যোগ্যসচিবে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন। স্বয়ং রাজাসনে বসিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করেন। কিন্তু সহস্রের শুভাশুভ যখন তাঁহার উপর নির্ভর, তখন কেবলমাত্র আপনার বুদ্ধির উপর একান্ত বিশ্বাস অনেকস্থলে প্রমাদের কারণ হইতে পারে, সুতরাং অমাত্যদের মতামত না শুনিয়া আপনার আদেশ প্রচার করেন না। এ কালিদাসের রাজা বটে। কিন্তু রাজার রাজভাবের সহিত আমাদের আপাততঃ ততটা সম্পর্ক নাই, যতটা সম্পর্ক তাঁহার মনুষ্যভাবের সহিত। রাজার হৃদয়ও ক্ষুদ্র বালিকাহৃদয়ের প্রেমের জন্য কাঁদে। সেকালের রাজারা বোধ করি সাধারণ মানুষের অপেক্ষা একটু বেশী করিয়াই কাঁদে। আমাদের কালের একটা কাঁদুনে মানুষকে ঈপ্সিত দ্রব্য

সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া তবু ঠাণ্ডা করা যায়। কিন্তু সেকালে তাহা হইত কৈ? সেকালের প্রেমিকরা বড় "ছিঁচ কাঁদুনে" ছিলেন। একটা দিলে তাহাতে মন তৃপ্ত হইল না আর একটার জন্য কান্না সুরু করিলেন। তাহাও যদি মিলিল তবে আবার একটীর জন্য ক্রন্দনপর্ব্বের উদ্যোগ হইল। কবি কাঁহাতক এত যোগাইয়া উঠেন বল! অগ্নিমিত্রের দুইটী প্রেয়সী ঘরে বিদ্যমান্। একটী যিনি প্রধানা মহিষী, তিনি অন্তঃপুরের কর্ত্রী, কিন্তু রাজার হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব তাঁহার অনেকদিন রিজাইন দিতে হইয়াছে। ইরাবতী এতদিন তাঁহার পদে নিযুক্তা ছিল, কিন্তু মালবিকা আসিয়া অবধি ইরাবতীরও আশু-পদচ্যুতির ধ্রুবসম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

রাজাত মালবিকাকে চিত্রে দেখিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু রাজ্ঞী ধারিণীর যেরূপ আঁটঘাট বন্দোবস্ত তাহাতে সাধ্য কি মালবিকার নাকের ডগাটুকু দেখেন, সমগ্র মালবিকা ত দূরের কথা। তিনি অনন্যোপায় হইয়া বিদূষককে উপায় উদ্ভাবন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন, এ সকল কার্য্যে ব্রাহ্মণের বুদ্ধির দৌড় কি না অনেক দূর। সভা ভঙ্গ হইলে বিদূষক আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। হাতে হাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। হরদাস নামে আর এক নাট্যাচার্য্য ছিল। বিদূষক কৌশলে গণদাসের সহিত তাহার বিবাদ বাধাইয়া বিচারার্থে তাহাদের রাজসমীপে উপস্থিত করাইল। অভিনয় বিদ্যায় তাহাদের মধ্যে কে বেশী দক্ষ তাহারা এই বিবাদের মীমাংসাপ্রার্থী। হরদাস রাজার আশ্রিত; গণদাস রাণীর আশ্রিত। রাজা যদি একাকী বিচার করেন তবে হরদাসের প্রতি পক্ষপাতিতা হইবে, এবং মহিষীর প্রতি অসম্মান করা হইবে, সুতরাং রাণীরও সভার ডাক পড়িল। রাণী পরিব্রাজিকা পণ্ডিতী কৌশিকীকে সঙ্গে লইয়া সভায় আসিলেন। এই পরিব্রাজিকার সবিশেষ পরিচয় কেহই অবগত নহেন, কিন্তু রাজা রাণী উভয়েই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন। রাজা তাঁহাকে প্রাশ্নিকপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আচার্য্যদ্বয়ও তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিল, কারণ রাজা ও রাণী অন্যতর পক্ষাবলম্বী, তিনি উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন। পরিব্রাজিকা বলিলেন অভিনয়বিদ্যা প্রয়োগপ্রধান, সুতরাং মুখে মুখে প্রশ্ন করিয়া কোন লাভ নাই, প্রয়োগতঃ দেখিয়া উভয়ের বিদ্যার তারতম্যতা বিচার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাও ত অনেকবার দেখা গিয়াছে, তাহাতে উভয়কে সমান পারদর্শী বলিয়া বোধ হইয়াছে। তবে এক কথা। কাহারো কাহারো আত্মসংস্থা ক্রিয়া সুন্দর কিন্তু সংক্রান্তি সুন্দর নহে। অর্থাৎ কেহ কেহ অভিনয় কৌশলে নিজে সুদক্ষ, কিন্তু অপরকে সেই কৌশলে দীক্ষিত করিতে অক্ষম। যে উভয় বিদ্যাতেই সমান বিচক্ষণ তাহাকে যোগ্যতর শিক্ষক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব শিষ্যদের অভিনয় দেখা আবশ্যক। এতক্ষণে রাজার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, বিদূষকের ষড়যন্ত্র ফলিল।

মালবিকার অভিনয় দেখিয়া গনদাসের যোগ্যতা বিচার করিতে হইবে এই স্থির হইল। রাণী যে শান্ত হৃদয়ে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন তাহা নহে। আচার্য্যদ্বয়ের বিবাদই তাঁহার প্রথমতঃ ভাল লাগে নাই। তাহার পর যখন দেখিলেন তিনি তাহাদের যত নিবৃত্ত করিতে যান বিদূষক বিদ্রূপ বাক্যে তাহাদের ততই উত্তেজিত করিয়া তোলে, তখন আর তাঁহার কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। তাঁহার হৃদয়ের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। পরিব্রাজিকার প্রস্তাবে যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন, আপত্তির উপর আপত্তি নির্দ্দেশ করিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না। বিদূষকের তীব্র পরিহাস বাক্যে উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইয়া, গণদাস ভট্টাচার্য্য চটিয়া পিঁড়ি হইতে উঠিয়া বলিল "শিষ্যতে যদি তাহার ক্রিয়াসংক্রান্তি পরীক্ষিত না হয় তাহা হইলে লোকে বলিবে "গণদাস জ্ঞানপণ্য বণিক, তাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া এখন নিগ্রহসুলভ বিবাদ হইতে দূরে থাকিতে চাহে", সে চুপ করিয়া বসিয়া এই নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারিবে না, অতএব রাণী যদি শিষ্যাতে তাহার ক্রিয়াসংক্রান্তির পরীক্ষা প্রদর্শন করিতে না দেন তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সে আচার্য্যগিরিতে ইস্তফা দিবে। তখন রাণীর অগত্যা সম্মতি দিতে হইল। কিন্তু তাঁহার এত কেন আবেগ—মালবিকাকে আড়ালে রাখিতে এত কেন যত্ন—তাহার প্রতি রাজার অভিলাষ সন্দেহ করিয়া এত কেন হিংসামিশ্রিত প্রেমের উচ্ছ্বাস? রাজা মালবিকার সম্পত্তি হোন্ আর নাই হোন্ তাঁহারত তাহাতে কোন লাভ লোকসান নাই। রাজা তাঁহার আর কখনই হইবেন না। ইরাবতী তাঁহাকে অনেক দিন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, রাজাতে এখন কেবল তাহারই ভোগ দখল। রাজ্ঞী ধারিণী রাজার অন্তঃপুরের মহিষী বটে কিন্তু অন্তরের প্রেয়সী নহেন। স্বামীত ইরাবতীকে গৃহে আনিয়া অবধি, প্রেমহীন শুষ্ক মহিমার শিখরে ধারিণীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তবে আজ নূতন করিয়া এ ব্যথা কেন? তাহার কারণ আছে। ইরাবতীর প্রতি রাজার প্রণয় কালক্রমে অনেকটা সহ্য হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আবার আর একটা সপত্নীসম্ভাবনায় সেই পুরাতন মৃতপ্রায় বেদনা নাড়া খাইয়া সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সেই লুকান শেল কে যেন টানিয়া তুলিতেছে। তাই আর আজ যেন মাঝে কোন ইরাবতী নাই, যেন কেবল তিনি আর তাঁহার প্রিয়তম এতদিন ঘন প্রেমসংশ্লেষণে জড়িত ছিলেন, আজ এই প্রথম মালবিকা আসিয়া তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে, তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃজন করিতেছে। আরো এক কথা। ইরাবতী আসিতে তিনি স্বামী-হৃদয় হইতে যতটা দূরে পড়িয়াছেন মালবিকা আসিলে, সে দূরত্বের পরিমাণ যেন আরো বাড়িয়া যাইবে। এত দিন তাঁহার স্বামীর প্রেমের যতটুকু বরাদ্ধ ছিল, মালবিকা আসিলে তাহাও বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে। এতজন ভাগীদার, আর একটী বই হৃদয় নয়, তিন জনে বাঁটিয়া লইলে প্রত্যেকের ভাগে কতটুকু পড়িবে? তাহার অপেক্ষা দুই জন ছিল ভাল। এই দৃশ্যে রাজ্ঞী ধারিণীর প্রেম ও স্বামী-হৃদয় বাঁধিয়া রাখিবার জন্য কাতর পিপাসা অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়াছে। আর

কোন দৃশ্যে রাজ্ঞীর এই অধীরতা প্রকাশ পায় না। অন্যান্য দৃশ্যে তিনি শুধু রাজ্ঞী, এই দৃশ্যে তিনি প্রণয়বিকলা নারীও বটে।

গণদাস ও হরদাসের প্রতি রাজার আদেশ হইল, আপন আপন শিষ্যাকে সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবতার অভিব্যক্তির নিমিত্ত বিরল নেপথ্যে সাজাইয়া ছলিকা নামক নাটক অভিনয়ার্থে সঙ্গীতশালায় আনয়ন করিয়া মৃদঙ্গ ধ্বনির দ্বারা তাঁহাদের আহ্বান করিবে। তাহাই হইল। সাঙ্কেতিক মৃদঙ্গধ্বনি শুনিয়া রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া সঙ্গীতশালাভিমুখে গমন করিলেন। রাজ্ঞী ধারিণীর সম্মুখেই চঞ্চলতা দেখাইয়া যে অবিনয় প্রকাশ করিতেছেন হৃদয়ের অধীরতায় সে খেয়াল আর নাই। এই খানে প্রথম অঙ্কের শেষ হইল। ধারিণী মনের দুঃখে, অভিমানে নীরবে দগ্ধ হউক, রাজা দ্বিতীয়াঙ্কে মালবিকা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী সরলা দেবী।

দুইটি কবিতা।

বিধবার ঠেঁটি। *

মা! তুমি বাঙ্গালির ঘরে কুললক্ষ্মী; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাঙ্গালির ধন নাই, মান নাই, গৌরব নাই, বাহুবল নাই—আছে কেবল দুর্দ্দম্য সুখলালসা আর পরশ্রীকাতরতা আর পাপাসক্তি, তুমিই কেবল তপস্বিনীবেশে, আতবান্নে জীবন ধারণ করিয়া, উপবাস করিয়া, পরার্থব্রতে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মূর্ত্তিমান সত্য হইয়া, জাজ্বল্যমান ধর্ম্ম হইয়া বাঙ্গালিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইতে দাও নাই। মা!—আমি কবি মুখে শুনিয়াছি, দিব্যকর্ণে শুনিয়াছি, দেবতাদিগের মুখে শুনিয়াছি "যে দিন বঙ্গগৃহে তপস্বী-ব্রতধারিণী বিধবা থাকিবে না, সে দিন বাঙ্গালির অস্তিত্ব লোপ হইবে"! তাই, আমার ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে বঙ্গবিধবার পুনর্ব্বিবাহের সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক ছিল সব রাশীকৃত করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি।

পাপিষ্ঠ আমরা, তাই মা! আমরা তোমার শ্বেত বস্ত্রের মর্য্যাদা বুঝি না। কবি

* ঠেঁটি—শ্বেতবস্ত্র।

উৎপ্রেক্ষার ছলে বর্ণনা করিয়াছেন যে "মহাকবি Milton অলোক-পুত্রদিগের (Gabriel Raphael) প্রভৃতির জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া আর জ্যোতির জ্যোতিঃ মহাজ্যোতির দিকে চাহিয়া দুই চক্ষু হইলেন।" কিন্তু মা, এই মুহূর্ত্তে, এই মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে, তোর ঐ শ্বেত বস্ত্রের শান্তিময় জ্যোতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ধ আমি—আমি চক্ষুষ্মান হইলাম। কি শীতল জ্যোতিঃ মা! চক্ষু জুড়াইয়া গেল!

১

কাজ কিরে মিছে আর চক্ষু রেখে,
দেখিতেই যদি তোরা না পেলি চোখে!
দেখ বিধবার অঙ্গে,
ঝলকেরে রঙ্গে ভঙ্গে
রত্নময় সাড়ি খানি!—মরি যে শোকে!
"শাদা ঠেঁটি" বলে ঘৃণা করে গো লোকে!
যা—যা—তোরা গাঙ্গে গিয়া,
আয় চক্ষু প্রক্ষালিয়া—
মিছামিছি আমি কেন মরি গো বকে?
পড়েছে রে ঘোর ছানি তোদের চোখে!

২

কেরে বলে বালিকাটি,
পরি এ অপূর্ব্ব সাটী,
নুইয়া পড়েছে আহা অবনি তলে?
শ্বেত করবীর ভাতি,
এক ঝাঁক প্রজাপতি,
উড়িয়া বসেছে এই অতসী ফুলে,
মর্ম্মের মূল কেহ যায় নি দলে!
কি উজ্জ্বল! দেখ্ দেখ্ নয়ন খুলে—
ঝল্ মল্, কলহংসে, গগন ফুলে?
বিন্ধ্যের শ্বেত মর্ম্মরে,
সফেন চারু নির্ঝরে,
এ হেন মাধুরী কিরে পড়ে উছলে?
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভুলে?

কে রে সেই কারিগর,
রবিরশ্মি হ'তে থর
কৌশলে ধবল বর্ণ নিল রে ভুলে?
তারাপুষ্প থরে থরে
বসাইল যত্ন করে,
জ্যোৎস্না-রেশমের মরি এই দুকূলে?
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভুলে?

নিশাশেষে নিজে শশী,
সুধাসরসীতে পশি,
ছোপাইয়া দিল, বস্ত্র সুধাধবলে
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে?
ধরিয়া চারু চিবুক,
চুম্বিয়া মোহন মুখ,
যামিনী আসিয়ে চুপে, এলান' চুলে,
শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে গেছে চারু দুকূলে
"ছায়াপথ" এরে বলে!
আছে কিরে মহীতলে;
হেন আভা কপোতের গ্রীবা উজ্জ্বলে?
টগরে, তুষার জলে,
শ্বেত শতদল দলে,
কদম্ব কেশরে আর কুন্দ বিমলে?

জাতি, যুথী, মল্লিকায়,
শুভ্রনীরদের গায়,
সুন্দরী অধরে ঢাকা মুক্তা ধবলে,
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে?

৪

অধরেতে হাসিরাশি,
চুপে চুপে, ধীরে আসি,
আপনি বাসন্তী রাণী, ভাব বিহ্বলে,
হাতে কনকের থালা,
পুষ্প মালা তাহে ঢালা,
শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে গেছে চূতমুকুলে,
(ওগো) শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে গেছে চূতমুকুলে।
ও নয়রে মুক্ত-চুল;
গুঞ্জরিছে অলিকুল
আর কি রে বসে তারা রক্ত পারুলে?
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভুলে?

৫

মা তুই কমলা রাণী!
(ভুলি নাই সে কাহিনী)
নীলকণ্ঠ মত্ত যবে ভখি গরলে—
আগুল্‌ফ লম্বিত কেশে,
আর্দ্র দেহ, আর্দ্রবেশে,
দাঁড়াইলি তীরে আসি পদকমলে
পদ্মরাগ মণিপ্রভা পড়ে উথলে!
উলাঙ্গিনী!—দুরু দুরু
কাঁপে তোর বক্ষ উরু,
চাহিলি হরির পানে নেত্র সজলে!
লজ্জা নিবারণ হরি,
পাঠাইলা ত্বরা করি,
মানস সরসী হ'তে মরাল দলে!
রাজহংস যত্ন করি,
কটি আবেষ্টন করি,
ঢেকে দিলে নগ্ন তনু শ্বেত অঞ্চলে!
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে!

৬

শ্মশানে আছিলি শুয়ে,
শ্মশান-বাসিনী মেয়ে,
গৌরী তোরে নেহারিয়ে জয়ারে বলে—
"সখিরে হেরে ও কান্তি,
কন্যা ব'লে হয় ভ্রান্তি,
হেরি ওরে শুনে মোর দুগ্ধ উথলে!
আমার দুহিতা নাই,
আজি হ'তে ওরে তাই,
করিনু আপন কন্যা; তোরা সকলে
চমরীর পুচ্ছ দিয়া,
ধাত্রি দে রে আচ্ছাদিয়া—
নগ্নদেহে আছে বালা পড়ে ভূতলে!
(আহা) নগ্নদেহে আছে বালা পড়ে ভূতলে!
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে?

৭

স্বামী তোরে গৃহে আনি,
নীলাম্বরী সাড়ী খানি,
পরাইয়ে দিয়েছিল, চুম্বি কপোলে!
লজ্জা বস্ত্র নিয়ে তোর,
পলাইয়ে গেল চোর,
তাই তুই সারা রাত্রি বসি বিরলে,
মিহি মিহি সুতাগুলি,
হৃদয় হইতে তুলি,
বুনিলি এ অপরূপ শুভ্র দুকূলে!
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ভুলে?

৮

বাকলে তনুয়া ঢেকে,
মালিনীর তীরে সুখে,
রূপে বন আলো করি, থাক সরলে—

অপ্সরীরা এই পথে,
বিমানেতে যেতে যেতে,
সখী-কন্যা ভাবে তোরে ভ্রম-বিহ্বলে !
হেসে হেসে, কুতূহলে,
বন পুষ্প দেয় ঢেলে !
শ্রী-অঙ্গ সাজায়ে যায় মল্লিকা ফুলে,
(ওগো) শ্রীঅঙ্গ সাজায়ে যায় স্ফুট বকুলে !
হরিণী অবাক প্রায়,
বিশাল লোচনে চায়—
কি সুধা ঢেলেছে তার প্রাণ তরলে !
কে রে বলে ঠেঁটি এরে মোহের ছলে ?

৯

দুর্গতি নাশিনী তুমি !
পবিত্র এ বঙ্গভূমি,
তোমার চরণস্পর্শে, সর্ব্বমঙ্গলে !
আশ্বিনেতে দশভুজা—
বার মাস তোর পূজা !
সুবর্ণ প্রতিমা হেন নাহি ভূতলে !
তোর ও দুকূল তলে,
কি মণি মাণিক্য জ্বলে,
আমি কি বুঝিতে পারি, সর্ব্বমঙ্গলে ?
খ্যাপা ছেলে আমি তোর, কবি-বাউলে !
ধর্ম্ম মন্দিরের চূড়ে,
ধবল পতাকা উড়ে !
গৃহে গৃহে বারাণসী, অবনি তলে !
দেখ্ দেখ্ বঙ্গবাসি, চক্ষু মেলে !

বধূ।

(প্রিয় ভারতি ! কবি ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের মানসীর বধূ Subjective আর আমার বধূ কিছু Objective। যার যেমন অদৃষ্ট। দেখিও বোন্, দুই জায়ে যেন কোন্দল না বাধে। আর তোমারও যেন "বৌ কাঁট্‌কি ননদের" অখ্যাতি না হয়)।

১

"বেলা যে ঢের্ হোল (ওলো ও) খেতে চল্"
পুরাণো সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে পান্তাভাত ? কোথা অম্বল ?
পদ্মপুকুরের কোথা সে জল ?
ছিলাম আন্‌মনে, একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "লো খেতে চল্।"

২

ধামাটি লয়ে মাথে, পথ সে সোজা !
বামেতে নোনাগাছ, ডাহিনে জামগাছ,
কাঁটালি কলা শিরে মোচার বোঝা,
বাগানে পাকা পাকা, তেলে হলুদে মাখা,
হায়রে আম তুই ফলের রাজা।

আম পাড়িয়ে ধীরে, আঁচলে লই পুরে,
পিক কুহরে শাখে, শুনিতে মজা।
পথে আসিতে ফিরে, হাসিয়ে ফিক্ ক'রে,
আসি বলিত সই "বোন্ শুনে যা"।

৩

কুমড়ো উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
মাচানে ঝিঙ্গেগুলি, নাচিছে দুলি দুলি,
কাঁকুড় শশাগুলি রয়েছে ফুটি।
আমারে হেরি তারা, হর্ষে হ'ত সারা,
কি কব তাহাদের সে লুটোপুটি।
রঙ্গে লুন্ হাতে, কথা তাদের সাথে——
"আয়লো কাছে আয়, কাঁকুড় ফুটি।"

৪

গাঁয়ের্ বাহিরে, সেই জলের খাল্,
পাড়েতে সারি সারি শ্যামল তাল।
গামছা পরি ধীরে, নামিয়া সেই নীরে,
সাঁতার দেই ধীরে, গাছ-আড়াল।
বসিয়ে তরুশিরে, দেয় গো শিষ্ ধীরে,
শ্যামার নাহি লাজ—ভয়জঞ্জাল।
আমারও নাহি কাজ, আমারো নাহি লাজ,
আনি কমল তুলে, ভাঙ্গি মৃণাল।"

৫

হায় রে রাজধানী, কে তোর রাজা ?
বাজারে দুধ জোলো কেবলি তোলো তোলো,
ব্যাকুল বালিকার কি ঘোর সাজা,
পাতান দই কই ? কোথা ধানের খই ?
খেজুরে রস কই ? সে চাল্‌ভাজা।

৬

নিদাঘে দেয় এরা বরফজল,
জানে না হায় এরা, কত শীতল,
মধুর শাঁসে ভরা, মধুর জলে পোরা,
সোহাগে ঢল ঢল, ডাবের জল।

৭

হরির লুট দেওয়া হেথা বালাই,
হেথা ধরম নাই, করম নাই,
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা,
কাঁদন্ ঘুরে বলে "কিছুই নাই"।

৮

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খাইতে নারি কিছু কহিবে পাছে—
"কিছুতে নাহি তোষ, এ ত বিষম দোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ওযে
জিলিপি রসে ভরা, মণ্ডা মনোহরা,
ভাল জিনিশের ও কি মর্ম্ম বোঝে ?"

৯

থাকিলে এলোচুলে, পাশরি দুঃখ,
হয় গো তোলই হাঁড়ি সবারি মুখ।
হয়ে মাথাল ফল, শোভিলে ধরাতল,
পরাণে ইহাদের উপজে সুখ।

১০

কাঁকুড়া ধরি খায়, রাক্ষস এরা,
দয়ার গলে এরা বসায় ছোরা
বুঝি এদের কাছে, বাঁজা হইয়ে আছে,
ফল ও মূলে ভরা বিপুল ধরা।

১১

কোথায় আছ তুমি ? কোথায় মাগো !
কেমনে ভুলে তুই, আছিস্ হাঁগো ?
আইলে পৌষ মাস, নয়নে মৃদু হাস,
আর কি পিঠেপুলি ভাজিবি না গো ?
করিয়ে ঝুনো ছাঁই, দুঃখেতে তুলি হাঁই,
বুঝিবা স্মরি মোরে, তুলিয়ে রাখ।
রৌদ্রে হ'য়ে খুন, লয়ে কুমুড়া গুণ,
বুড়া ও বুড়ি কাছে কুশল মাগো।

১২

এদেরো গোরু আছে, বাঁধা দড়াতে
চাহে আকুল হ'য়ে মোর পানেতে ;
যেন গো আমাদের, বুধিটি পেয়ে টের,
হেথায় আসিয়াছে মোরে ভেঁটিতে।

১৩

নিমেষ তরে তাই স্বপন টুটে—
ব্যাকুল ছুটে যাই পাতিতে ঘুঁটে ;
ননদী বলে ধেয়ে "ওগো কেমন মেয়ে,
ব্যঙ্গ টিট্‌কারি, ঝটিকা উঠে।

১৪

বাদাম আক্‌রোট্‌ মুখেতে গোঁজে,
রসাল তালশাঁস কেহ না বোঝে।
সবাই বলে ছলে, "খাবার দিতে এলে,
কেন গো কোনে বউ নয়ন বোজে?"

১৫

আমার আঁখি জল বোঝেনা কেউ,
সদাই লেগে থাকে পিছনে ফেউ।
জিলিপি রস্‌করা, মণ্ডা মনোহরা,
ডালিম পাটনার, লখনৌ সেউ,
দেয় যা এত করে, থাকে তা পাতে পড়ে,
'দেখিনি কোন কালে এমন বউ।'

১৬

দেবেনা কাসুন্দি, গুড় অম্বল ;
সদাই মনে হয়, খেজুরে গুড়ময়,
মায়ের পিঠে পুলি, কাল, ধবল।
তাই গো খেয়ে খেয়ে, মৃত্যু মঙ্গল।
ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্—
"বেলা যে ঢের হ'ল, খাইতে চল্"
কবে হইবে বেলা? ফুরাবে সব খেলা,
নিভাবে আঁখিজলে জঠরানল,
জানিস্ যদি কেহ আমারে বল্।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

শোকসংবাদ।

রাজকুমার ডিউক অব্ ক্লারেন্সের অকালমৃত্যু সংবাদে আমাদের হৃদয় নিতান্তই ব্যথিত। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে রাজকুমারী 'মে' র সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা! কোথায় বিবাহ, আনন্দ-উৎসব, কোথায় মৃত্যু।

মহারাণী ভারতেশ্বরী, যুবরাজ ও যুবরাজ পত্নী, এবং রাজকুমারী 'মে' র শোক-তপ্ত হৃদয় ঈশ্বর তাঁহার শান্তি বারি-ধারা সিঞ্চনে শীতল করুন ; এই প্রার্থনা।

সখিসমিতি।

কি ধনশালিনী কি গৃহস্থপত্নী কি কৃতবিদ্যা কি অশিক্ষিতা কি স্বদেশীয়া কি বিদেশীয়া সম্ভ্রান্ত রমণীগণের সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয় ও তাঁহারা একপ্রাণা হইয়া রমণী-স্বভাবসিদ্ধ পরোপকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যমবতী হইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে প্রায় ৫ বৎসর হইল সখিসমিতি নামক একটি মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন। আর এই অন্তঃপুর-প্রথাযুক্ত বঙ্গদেশের পক্ষে এইরূপ সমিতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না।

এইরূপ সম্মিলনে যে কেবল রুচির উৎকর্ষসাধন, ভাবের উৎকর্ষসাধন, পরিবারের প্রতি পরিবারের, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের অকারণ বিদ্বেষভাবের অপনয়নে মনের উদারতা বৃদ্ধি—সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকা বশতঃ মহিলাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ যে গুণটির অভাব দেখা যায়—প্রভৃতি সুফল হইবে এমন নহে, মহিলাজাতির স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি—যাহার জন্য মহিলাজাতির মহিলাত্ব, তাঁহাদিগের গৌরব, তাহার বিকাশ সাধনে সংসারের প্রকৃত উন্নতি সাধন হইবে। এখন একটী কথা উঠিয়াছে—একালের মেয়েরা সেকালের মেয়ের মত মহৎহৃদয়া নহেন,—তাঁহাদের তেমন দয়া ধর্ম্ম নাই, সদনুষ্ঠানে তাঁহাদের তেমন প্রবৃত্তি দেখা যায় না ইত্যাদি।

কিন্তু কথাটা কি ঠিক্? ভিকারী ভিক্ষা লইতে আসিলে কি তেমনি আগ্রহভরে ইঁহারা ভিক্ষাদান করেন না? অনাহারীকে অন্নদান করিয়া কি ইঁহারা তেমনি সুখানুভব করেন না? প্রকৃতপক্ষে রমণী স্বভাব আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে, কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বে যেরূপ স্থলে দয়া-প্রকাশের আবশ্যক হইত এখন আর ঠিক সেরূপ হয় না এইমাত্র প্রভেদ। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিই, আগে রেল ছিল না যাত্রীদিগের সদা সর্ব্বদা গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইতে হইত এখন সে প্রয়োজন নাই, সুতরাং সেরূপ আতিথ্যও উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু এস্থলে তাহা বাহুল্য।*

অবস্থার পরিবর্ত্তনে সমাজেরও যেমন কোন কোন অভাব দূর হইতেছে তেমনি কোন কোন অভাবের বৃদ্ধি এবং নূতন সৃষ্টিও হইয়াছে। সুতরাং দানের আধারেরও পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। যেমন, একান্নবর্ত্তী প্রথা নানা কারণে ক্রমিকই এখন

* গত আশ্বিন কার্ত্তিকের ভারতীতে "একাল ও একালের মেয়ে" নামক একটি সুনিপুন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেইটি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আগে একজনের উপার্জ্জন পরিবারের অন্য দশ জনে ঠিক সমভাবে উপভোগ করিত, এখন অবস্থার গুণে ঠিক আর সেরূপটি হওয়া সম্ভব নহে। বিধবাগণ আগেকার অপেক্ষা অধিক কষ্টে পড়িতেছে, কুমারীদিগের বিবাহ বহুব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে—ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে দিন দিনই অন্নকষ্ট বাড়িতেছে—কাজেই সঙ্গতিহীনার সংখ্যা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা বহু অধিক, দয়াশীলা রমণীগণের করুণা-দৃষ্টি এই দিকে পড়িলে যথার্থ উপকার হইবার সম্ভাবনা। সখিসমিতি এই সদনুষ্ঠান ব্রত ধারণ করিয়াছে। সখিসমিতির উদ্দেশ্য—সঙ্গতিহীনা কুমারী ও বিধবা বালিকাদিগকে প্রতিপালন শিক্ষাদান ও স্থল বিশেষে অর্থ সাহায্য করা,—এবং পরে অবস্থা অনুকূল হইলে—অর্থাৎ অর্থের সুবিধা হইলে সেই শিক্ষিত বালিকাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা। ইহাতে একসঙ্গে অনেক গুলি ভাল ফল হইবার কথা—সঙ্গতিহীনাগণ নিজ নিজ সম্ভ্রম রক্ষা ও পরান্নজীবিকার উপর নির্ভর না করিয়া আপনাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে,—অনাথা বিধবাগণ এইরূপ সৎকার্য্যে জীবন নির্ব্বাহের সুবিধা পাইলে পুনর্ব্বিবাহ না করিয়াও তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন ; এইরূপে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বৈধব্যাচরণের প্রতিও তাঁহাদের আস্থা জন্মিবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের দ্বারা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হইবে,—মিশনারী রমণীগণ আজ কাল যে কাজ করিতেছেন আমাদের দেশীয় নারীগণের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে। মিশনারী রমণীগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যেরূপ যত্নবতী সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদিগের এই শুভ ইচ্ছা সত্ত্বেও নানাকারণে তাঁহারা অন্তঃপুরের শিক্ষাকার্য্য যেরূপ সুচারুভাবে করিতে অক্ষম দেশের নারীগণ সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সহজে তাহা সাধিত হইবে। কিন্তু সেজন্য বহু অর্থের প্রয়োজন এবং তৎপূর্ব্বে অনেকগুলি রমণীকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে। আপাতত ছয়টি মাত্র বালিকা সমিতির অধীনে আছে এবং একটির পাঠ সমাপন হইয়াছে, সমিতি ইচ্ছা করিলেই এখন তাহাকে এই বৈশাখ হইতে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু বালিকাদিগকে ভরণপোষণ ও শিক্ষা দান করা অপেক্ষা তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করা সমধিক ব্যয়সাধ্য। তাহাদিগের পঠদ্দশায় তাহারা কোন স্কুলে থাকিতে পারে, কিম্বা যাহার তাহাতে আপত্তি আছে সে কোন ভদ্রমহিলার আশ্রয়ে থাকিয়া স্কুলের গাড়ীতে স্কুলে যাতায়াত করিতে পারে ; কিন্তু পাঠ সমাপ্তে তাহাদিগকে শিক্ষয়িত্রীরূপে পুরমহিলাদিগের নিকট পাঠাইতে হইলে সেজন্য গাড়ী চাই, তাহাদিগের থাকিবার আশ্রয়বাটী চাই, আপাততঃ একজন বালিকা বলিয়া সমিতি যেন তাহার আশ্রয়ের অন্য বন্দোবস্ত করিতে পারে, কিন্তু দুই চারিজন হইলেই তাহাদের স্বতন্ত্র আবাস-গৃহ এবং ভরণপোষণব্যয় বা বেতন চাই, এ সকল ছাড়া তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ এবং তাহাদের রক্ষক-

স্বরূপ একজন সুশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা বয়স্কা রমণী চাই অল্প বেতনে সেরূপ রমণী মিলিবার কথা নহে। এক কথায়, একটি অনাথাশ্রম হইলেই একার্য্য সুসঙ্গতরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। সেই আশ্রমই তাহাদের আবাস বাটী হইবে, সেইখানে আশ্রয় লাভ করিয়া ভবিষ্যতে তাহারা পরোপকার কার্য্যে জীবন যাপন করিবে।

বুদ্ধির প্রবণতা অনুসারে এইখানে তাহারা শিক্ষা পাইতে পারিবে। যাহাদের লেখাপড়ার বুদ্ধি অধিক তাহাদের মধ্যে কেহ বা উচ্চ শিক্ষা পাইতে পারেন কেহ ডাক্তারি শিখিতে পারেন ; অন্যরূপ হইলে কাহাকেও বা সেলাই কাহাকেও বা চিত্রবিদ্যা কাহাকেও বা গানবাজনা শেখান যাইতে পারে। ইহার ফল পুরমহিলারা পরে লাভ করিবেন। কিন্তু এরূপ একটি অনাথাশ্রমের জন্য অন্ততঃ মাসে ৫০০৲ টাকার আবশ্যক। সমিতির সেরূপ অর্থবল কোথায় ? এতৎসঙ্গে সমিতির যে আয় ব্যয় হিসাব প্রদত্ত হইতেছে তাহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন—আপাতত সমিতি যে ছয়টি বালিকাকে প্রতিপালন করে তাহার ব্যয়ভার বহন করাই তাহার আয়ের পক্ষে একটু অতিরিক্ত। সমিতির আয় বৃদ্ধি করিয়া বৎসর বৎসর অধিক সংখ্যক বালিকাকে আশ্রয় প্রদানের ইচ্ছাতেই প্রধানত সখিসমিতি হইতে শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপে যে অর্থ সঞ্চিত হয় তাহাতে একটি কিম্বা দুইটি বালিকার শিক্ষাব্যয় সঙ্কুলান হইলেই যথেষ্ট। অবশ্য এক একটি বালিকার প্রতিপালন ও শিক্ষাভার বহন যেরূপ ব্যয় সাপেক্ষ তাহাতে ছয়টি বালিকার উপকারে সমর্থ হইয়া এই ক্ষুদ্রপ্রাণ সমিতি কম আহ্লাদিত নহে, তবে এই খানেই তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নহে। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ কিন্তু অপরিমিত আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বোম্বাই বিভাগে পণ্ডিতা রমাবাই যেরূপ বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন ; যে কোন বিধবা ইচ্ছা করিলেই যেমন সেখানে আশ্রয় পাইতে পারেন, সেই অনুকরণে এখানেও একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করা সমিতির প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু দুঃখ এই, এখনো পর্য্যন্ত সমিতি তাহাতে অপারক। তথাপি আমরা নিরাশ নহি। এই শিশু-সমিতির সাহায্যে আমরা যেরূপ দান প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আমরা দানশীল মহোদয় মহোদয়াগণের নিকট কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের মুক্তহস্ততায় সমিতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এইরূপ প্রত্যাশা করিতেছি।

পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকা হইতে ভিক্ষা আনিয়া প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকায় বিধবাশ্রম বাটী ক্রয় করিয়াছেন, আর এ দেশের ধনাঢ্য মহাজনগণের মধ্যে এমন কি কেহ নাই যিনি দেশের অনাথাদিগের সাহায্যে একটি আশ্রয়বাটী প্রদান করিয়া চিরকীর্ত্তিমান হইবেন ? আমেরিকাবাসীগণ এ দেশের বিধবাদিগের সাহায্যে রমাবাইকে মাসিক ১০০০৲ হাজার টাকা দান করেন—আর আমাদের দেশের সহৃদয়গণ দেশের অনাথাদিগের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া কি দেশের কার্য্য করিবেন না !

দীনবৎসলা, রাণি, মহারাণি, বেগমগণ, তোমরা এই সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্ত হইয়া রমণী নামের মান ও রমণী হৃদয়ের মাহাত্ম্য রক্ষা কর; আর করুণহৃদয় রাজা, মহারাজা, নবাব, জমীদারগণ ও সহৃদয় দেশবাসী নরনারীগণ, তোমাদের যাহার যেমন সাধ্য এই সৎকার্য্যে দান করিয়া হিন্দুর দানশীল নাম রক্ষা কর। আমরা তোমাদের দেশের রমণী, ভিক্ষাপাত্র লইয়া তোমাদের দ্বারে দাঁড়াইয়াছি—রমণীর প্রতি সম্মান, রমণীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন কর, আর বিদেশীয়গণ তোমরা বিশ্বজনীন উদারতা প্রভাবে বিদেশের প্রতি করুণা করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন কর। এই প্রার্থনা, করুণাময় জগদীশ্বর আমাদের এই মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল করুন।

সখিসমিতির উদ্দেশ্য
ও
নিয়মাবলী।

উদ্দেশ্য।

১। সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সম্মিলন ও সদ্ভাববর্দ্ধন।

২। যে কোন সঙ্গতিহীনা, কি বিধবা কি কুমারী—সখীসমিতির উদ্দেশ্যানুমোদিত সদনুষ্ঠান ব্রত পালনে ইচ্ছুক তাহাকে আশ্রয় ও শিক্ষা প্রদান; অন্ততঃ অনাথাদিগকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করা।

৩। সমিতির পালিতাগণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহাদিগকে বেতন দিয়া অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার। *

নূতন নিয়মাবলী।

১। সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্রেই এই সমিতির সখী হইতে পারিবেন।

২। কেহ নূতন সখী হইতে চাহিলে, কোন বিশেষ কারণে অন্য সখিগণ আপত্তি না করিলেই তিনি সখীরূপে গৃহীত হইবেন।

৩। মাসিক এক টাকা করিয়া সখীদিগের চাঁদা দিতে হইবে। অধিক দান করিলে

* তবে যদি কোন কারণে কোন বালিকা ভবিষ্যতে এ কার্য্য করিতে না চাহেন তবে তাঁহাকে ভরণপোষণ ও শিক্ষা দান করিতে সমিতির যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তিনি তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। সেই অর্থে সমিতি অন্য এক বালিকার উপকারে সক্ষম হইবে।

আরও ভাল। তবে মাতা এবং বালিকা কন্যা দুই জনে সখী হইলে বালিকার ন্যূনপক্ষে বৎসরে তিন টাকা দিলেও চলিবে।

৪। অভিভাবকের অভিমত ব্যতিরেকে কোন বালিকার ভার সমিতি গ্রহণ করে না।

৫। যে পুরমহিলা সমিতিতে মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে সখী না হইয়া দানের ইচ্ছায় সখী হইতে চাহেন তিনি সমিতির নিমন্ত্রণে আসিতে বাধ্য নহেন।

৬। সখীগণ লক্ষ্য রাখিবেন যেন টাকার বিল শোধ করিতে দেরী না হয়; কেন না এই চাঁদার উপরেই পালিতাগণের প্রতিপালন কার্য্য নির্ভর করিতেছে।

৭। বিদেশেই থাকুন বা কলিকাতায় থাকুন—যাঁহারা সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ কিম্বা শিল্পমেলার কর্তৃত্ব ভার যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদিগের দ্বারা সমিতির কর্ত্রীসভা গঠিত।

৮। কলিকাতাবাসী উৎসাহী সখীগণের মধ্যে হইতে বাছিয়া বৎসরে বৎসরে আট কিম্বা দশজনের একটি ক্ষুদ্র সভা গঠিত হয়, সমিতির বালিকাগণের সম্বন্ধে তত্ত্বাবধারণ করা, নূতন কোন আশ্রয়প্রার্থী বালিকাকে লওয়া না লওয়া প্রভৃতি সমিতির অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ ইঁহাদের পরামর্শ দ্বারা স্থির হইয়া থাকে।

সখিসমিতি ও শিল্প মেলার কর্ত্রীসভার সখিগণ।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ,	(Mrs. M. Ghose.)	শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস	Mrs. G. N. Dass.
,, বরদাসুন্দরী ঘোষ,	,, L. Ghose.	,, চন্দ্রমুখী বসু	Miss C. M. Bose.
,, ললিতা রায়,	,, P. L. Roy.	,, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	Mrs. N.N.Dutt.
,, মনোমোহিনী দত্ত,	,, R. C. Dutt.	,, মৃণালিনী দেবী	,, R. Tagore.
,, সৌদামিনী গুপ্তা,	,, B. L. Gupta.	,, বিধুমুখী রায়	,, R. N. Ray.
,, থাকমণি মল্লিক,	,, O. C. Mullick.	,, প্রসন্নময়ী দেবী	,, Bagchi.
,, সরলা রায়	,, P. K. Ray.	,, সুরবালা দেবী	,, T. N. Mukharji
,, প্রসন্নতারা গুপ্তা	,, K. G. Gupta.	,, স্বর্ণকুমারী দেবী	,, J. Ghosal.
,, হিরণ্ময়ী দেবী	,, P. Mukerji.	সম্পাদিকা।	
,, সৌদামিনী দেবী	,, S. P.Ganguli.		

১২৯৫ সালের (ইং ১৮৮৮) মহিলাশিল্পমেলার দান প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কুচবিহার		১৫০৲
,, মহারাণী স্বর্ণময়ী, সী, আই,		১০২৫৲
,, রাণী পতিতপাবনী দেবী	নলডাঙ্গা	৫০৲
শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (Mrs. S. Tagore)	কলিকাতা	২০০৲
,, হেমাঙ্গিনী দেবী (Mrs. W. C. Bonnerji)	ঐ	১০০৲
	মোট	১৫২৫৲

জের		১৫২৫
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী (Mrs. J. Ghosal)	ঐ	১০০৲
,, স্বর্ণলতা ঘোষ (Mrs. M Ghose)	ঐ	৫০৲
,, ললিতা রায় (Mrs. P L Roy)	ঐ	৪০৲
,, বরদাসুন্দরী ঘোষ (Mrs. L. Ghose)	ঐ	২৫৲
,, জগৎতারিণী মিত্র (Lady Mitter)	ভবানীপুর	২৫৲
,, সরলা রায় (Mrs. P. K. Ray)	কলিকাতা	২৫৲
,, প্রসন্নতারা গুপ্ত (Mrs. K. G. Gupta)	ঐ	২৫৲
,, সৌদামিনী দেবী (Mrs. S. P. Ganguli)	ঐ	২৫৲
,, সুশীলাবালা দেবী (Mrs. D. N.Tagore)	ঐ	২৫৲
,, হিরণ্ময়ী দেবী (Mrs. P. Mukerji)	চুঁচুড়া	১০৲
মিশেস লালবিহারী দে	ঐ	১০৲
,, চন্দ্রমাধব ঘোষ	ভবানীপুর	১৬৲
শ্রীমতী কমলা বসু (Mrs. P. N. Bose)	কলিকাতা	২০৲
,, থাকমণি মল্লিক (Mrs. O. C. Mallick)	ঐ	১০৲
মিশেস এ, মিত্র	কাশ্মীর	৫৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী (Mrs. G. Tagore)	কলিকাতা	৫৲
,, কুমুদিনী দেবী (Mrs. N. C. Mukerji)	ঐ	১০৲
,, কাদম্বিনী ঘোষ (Mrs D. C .Ghose)	ভবানীপুর	৪৲
,, হেমন্তকুমারী দেবী (Mrs. M. N. Banerji)	কলিকাতা	৫৲
,, মোক্ষদা দেবী (Mrs. S. B. Mukerji)	ভাগলপুর	১০৲
,, কাদম্বিনী দেবী (Mrs. J. P. Ganguli)	কলিকাতা	৪৲
,, বসন্তকুমারী দাস (Mrs. G. N. Dass)	ঐ	৫৲
,, প্রসন্নময়ী দেবী (Mrs. L. C. Mukerji)	ঐ	৫৲
,, মোহিনী ঘোষ (Mrs. P. Ghose)	ঐ	২০৲
মিশেস জে, শর্ম্মা	ঐ	[illegible]
,, পি, কে, ঘোষ	ঐ	[illegible]
,, পি, সি, রায়	ঐ	[illegible]
শ্রীমতী শৈলবালা রায় (Mrs. D. N. Ray)	ঐ	[illegible]
মিশেস কে, এন্, মিত্র	ঐ	[illegible]
শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু (Miss. C. M. Bose)	ঐ	[illegible]
,, রাধারাণী লাহিড়ী (Miss. R. Lahiri)	ঐ	[illegible]
মিশেস টী, এন্, চক্রবর্ত্তী	দার্জিলিং	[illegible]
	মোট	২০৪৲

৫১৭

পত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুনায় যে সকল বালিকা বিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলই প্রধান। সবশুদ্ধ প্রায় ৩০০ বালিকা এখানে পড়ে, বেশির ভাগই হিন্দু বালিকা। খৃষ্ট বালিকার সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নহে। স্কুলে ড্রইং এবং পিয়ানোও শেখান হয়। সকল ক্লাশের বালিকারাই আমাদিগকে পুস্তক পাঠ করিয়া শোনাইল। আশ্চর্য্য এই তাহাদের ইংরাজি উচ্চারণ এদেশীয় পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেকগুণ ভাল। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসীর ন্যায় মহারাষ্ট্রীদিগের ইংরাজি উচ্চারণে একটি অদ্ভুত টান আছে, কিন্তু বালিকারা উচ্চারণেও এতটা ইংরাজি ধরণ দখল করিয়াছে যে সেই টান তাহাদিগের প্রায় নাই বলিলেই হয়। একটি ক্লাশের বালিকারা আমাদিগকে গাইয়া শোনাইল। একটি গানের অনেকটা ইংরাজি রকমের সুর। একজন সেতার বাজাইতে জানে কিন্তু সেতার আনিয়াও লজ্জায় বাজাইতে পারিল না। মোটের উপর [illegible] স্কুলটি দেখিয়া বেশ সন্তুষ্ট হইলাম। কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে এখানে পড়িতে দেখিলাম, ইহা খুবই শুভলক্ষণ।

এতক্ষণ একটি কথা বলা হয় নাই। পণ্ডিতা রমাবাই কিছুদিন হইতে তাঁহার পুণ্য নিকেতন শারদাসদন পুনায় স্থাপিত করিয়া পুনার মাহাত্ম্য শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রমাবাইকে বোধ হয় তুমি দেখ নাই? তিনি উজ্জ্বল চক্ষু, শোভন ললাট, সুদশনা, বিম্বাধরা গৌরী, তাঁহার মুখে বুদ্ধির জ্যোতি, হাসিতে ও হাবভাবে শিশুসুলভ সরলতা, কথাবার্ত্তায় নিরভিমান অমায়িকতা প্রকাশিত। সিঁতির দুই পাশ হইতে ছোট ছোট ঘন চুল ঘাড় পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে। পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, (এ দেশের বিধবারা রঙ্গিন বস্ত্র পরে, কেবল কাল রং তাহাদের পরিতে নাই) যদিও মহারাষ্ট্রী প্রথায় তাহা কাছা কোঁচা দিয়া পরা, তবুও পরিবার ধরণ সাধারণ হইতে বেশ একটু তফাৎ, একদিকে আপাদ তাহাতে সুচারুরূপে আবরিত, অন্যদিকে লম্বা কোঁচা শোভনভাবে ভূমে লুটাইয়া পড়ায় দেখিতেও বেশ সুন্দর হইয়াছে। পায়ে বিলাতি মোজা ও নাগরা জুতা। সবশুদ্ধ যেন খানিকটা পুরুষের বেশ; কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বেশ মানায়, তাঁহার সুগঠিত দেহের শোভা ইহাতে বেশ বিকসিত হইয়াছে। তাঁহার কন্যাটি নয় দশ বৎসরের হইবে। তাহার মুখে, কথায় বার্ত্তায় একটি চমৎকার উজ্জ্বল ভাব। কিন্তু মনোরমা মায়ের মত দেখিতে হয় নাই। বর্ণে, চেহারায় সে বাঙ্গালীর ন্যায়।

আমরা একদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া পণ্ডিতার সহিত কাটাইয়া ছিলাম। কি সুখে সে দিনটা কাটিয়া গিয়াছিল। কেবল বিদ্যাবুদ্ধিতেই রমাবাই অসামান্যা নহেন,

হৃদয় তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিকেও অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি আদর্শরমণী। লোকের যে একটা বিশ্বাস আছে, লেখা পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক কঠোর হইয়া পড়ে, এখানে আসিয়া তাহার বিপরীত দেখুক। রমাবাইয়ের সহৃদয়তা, দয়াশীলতা, পরদুঃখকাতরতার পরিচয় তাঁহার বিধবা আশ্রম শারদা সদনে। ১০ বৎসর শারদা সদন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এইরূপ মাসিক আয় সংস্থান করিয়া তবে তিনি আমেরিকা হইতে ফিরিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আশ্রমবাটী নির্ম্মাণের জন্য যত টাকা আবশ্যক, তাহাও তিনি সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন।

আশ্চর্য্য এই বিদেশীগণই তাঁহার এই মঙ্গল উদ্দেশ্যের সহায়ক। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া শারদাসদনের জন্য তিনি অর্থ ভিক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু যে সকল রাজাগণ সামান্য কারণে ১০।২০ হাজার টাকা খরচ করেন, তাঁহারা এজন্য কেহ বা পাঁচশ কেহবা হাজার দিয়াছেন, কেহ বা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া এ পর্য্যন্ত কিছুই দেন নাই। দেশের এই শোচনীয় অবস্থায় বিদেশীর করুণার উপরই তাঁহার একমাত্র ভরসা। তিনি স্থির করিয়াছেন, আমেরিকার সাহায্য ফুরাইতে না ফুরাইতে অষ্ট্রেলিয়া গিয়া তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

শারদা সদন বিধবাদিগের আশ্রয় নিকেতন। যে কোন হিন্দুবিধবা এখানে আশ্রয় চাহেন, তাঁহার জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত। তিনি বিনা ব্যয়ে এখানে থাইতে পরিতে শিখিতে পারেন। তবে যদি কোন কুমারীকে তাহার পিতা মাতা এখানে শিক্ষার জন্য পাঠান ত তাঁহাদিগকে স্কুলের বেতন দিতে হয়। রমাবাইয়ের ইচ্ছা নিরাশ্রয় বঙ্গবিধবাগণও এই আশ্রমে আসেন। এমন কি, বেশী বঙ্গবিধবা পাইলে তাহাদিগের শিক্ষার জন্য বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত তিনি নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত।

আপাততঃ আশ্রমে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪ জন ছাত্রী, তাহার মধ্যে ২৮ জন বিধবা, তিন চারিটি শিশু বিধবা। রমাবাইয়ের আশ্রয়ে ইহারা সকলে অত্যন্ত সুখে আছে। ছোট ছোট বালিকাগণ তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, তাঁহাকে চুম্বন করিতেছে, বড় বড় মেয়েরা রমাবাইয়ের সহিত সখীর মত বাক্যালাপ করিতেছে। সংসারে আপনার লোক তাহাদিগকে আপনার করে নাই, তাঁহার প্রাণঢালা স্নেহে তাহারা সেই অযত্ন, অভাব ভুলিয়াছে। তিনি তাহাদের মাতা ভগিনী সখী সর্ব্বস্ব। ৪।৫ বছরের শিশু হইতে ২৫।৩০ বৎসরের বয়স্কা বিধবাও এখানে আছে, সকলের মুখে একই কথা, রমাবাই আমাদের খুব ভালবাসেন, আমরা অত্যন্ত সুখে আছি। কোন বিধবা একবার রমাবাইয়ের আশ্রমে আসিলে নিজের বাড়ীতে অল্পদিনের জন্যও আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না, তাহাদের ভয় হয় পাছে আর এখানে না আসিতে পায়।

এখানে দুই একটী সধবাও আছে, শাশুড়ীর পীড়নে তাহারা মর মর হইয়াছিল, তাই তাহাদের পিতা তাহাদিগকে এইখানে রাখিয়াছে। রমাবাই সম্পূর্ণ দেশীয় রকমে থাকেন,

মেয়েদের সঙ্গে একত্রে নীচে বসিয়া আহার করেন। কেবল তিনি নহেন, এখানে যে ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী আছেন, তাহাকেও তিনি বেশ দেশী রকম করিয়া লইয়াছেন। আমাদের এক শ্রেণীতে সেদিন তিনিও পিঁড়িতে বসিয়া হাতে করিয়া ভাত ব্যঞ্জন খাইতে লাগিলেন। রমাবাই যখন তাঁহার অনাথা আশ্রিতাদিগের মধ্যে বসিয়া বলিলেন, ইহারা আমার পরিবার, আমার সন্তান, তখন সেই শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "আর আমি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা।" রমাবাই ও আনন্দিবাই যোশি যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন নাকি উহারা মাঝে মাঝে সেদেশী মেয়েদের এইরূপ প্রথায় ভোজ দিতেন, কিন্তু গাউন পরিয়া ত নীচে বসা সুবিধা নহে, তাই তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্রী ললনার বেশ পরিতে হইত। রমাবাইয়ের অ্যালবমে মহারাষ্ট্রী সাড়ী পরা মার্কিন-রমণীর কয়েকখানি ছবি দেখিলাম। মহারাষ্ট্রী-সাজ এত ভাল হইয়াছে, যে সহসা তাহাদিগকে বিদেশীয় নারী বলিয়া চেনা যায় না।

সে দিন দুপুর বেলা আহারের পর আশ্রমবালিকাগণ আমাদিগকে তাহাদের নানারূপ খেলা দেখাইল। আমাদের দেশের মেয়েদের যেমন আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌, চোর চোর, লুকোচুরী, প্রভৃতি নানারূপ খেলা আছে, এদেশেও সেইরূপ ফুকরি নামে কতকগুলি মেয়েলি খেলা আছে। খেলাগুলির প্রধান গুণ তাহাতে শরীরের সর্ব্বাংশের পরিচালনা হয়, যেন সেই অভিপ্রায়েই খেলাগুলির সৃষ্টি। একরূপ খেলা, চারিজন চৌকোণ হইয়া দাঁড়াইয়া মুখোমুখি পরস্পরের হাতে তালি মারিতে মারিতে স্থান পরিবর্ত্তন করে। এইরূপে দাঁড়াইয়া হাতে হাতে, বসিয়া পায়ে পায়ে যুদ্ধ চলিতে থাকে, যে অধিকক্ষণ খেলিতে পারে, তার জিৎ। আর একরূপ, মাথা হেলাইয়া পরস্পরকে অভিবাদন করিতে করিতে তালে তালে পা ফেলিয়া চলে, সে বেশ দেখিতে। আর একরূপ গহনা পরা খেলা দেখিলাম, তাহা সব চেয়ে মজার। দাঁড়াইয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে করিতে আপনার দুই হাত আয়নার মত মুখের কাছে ধরিয়া তাহাতে একবার করিয়া মুখ দেখে, আর একবার করিয়া হাত সরাইয়া মিছামিছি চুল আঁচড়ায়, এবং মাথায় হাতে গলায় কোমরে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে যেন গহনা পরিতেছে এইরূপ ভাণ করে। এই খেলায় দাঁড়াইয়া অঙ্গ চালনা করিতে করিতে ক্রমে অল্পে অল্পে অবনত হইয়া মাটিতে বসে, আবার আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়ে। এই যে খেলাগুলির কথা বলিলাম, ইহা খেলিতে খেলিতে মেয়েরা মুখে এক অদ্ভুত রকম শব্দ করিয়া তাল রাখে, সেইজন্য ইহার নাম ফুকরি খেলা।

ইহা ছাড়া কতকগুলি খেলা দেখিলাম, তাহা সামাজিক চিত্রাভিনয়। ইহার মধ্যে শাশুড়ী বৌ খেলাই প্রধান। একজন শাশুড়ী একজন বৌ সাজে। শাশুড়ী বৌকে যে কথা বলে বৌ কিছুই যেন বুঝিতেই পারে না, শাশুড়ী যদি চায় হাঁড়ি, ত বৌ আনে বেড়ি, এই রূপে ক্রমাগত তাহাকে জ্বালাতন করিতে থাকে, আর শাশুড়ী চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি হাঁড়ি খাইতে বসে।

একবার একজন যুবতী বৃদ্ধা-শাশুড়ী সাজিলেন। তিনি কুব্জভাবে লাঠি ধরিয়া চলিতে চলিতে কেবলি বৌয়ের উপর তম্বী করেন। রাঁধিয়া মেয়েকে ভাল ক'রে খাওয়ান, আর বৌয়ের অন্নে থুতু দিয়া রাখেন, বৌয়ের গহনা চুরী করিয়া মেয়েকে দেন। কিন্তু বৌও শাশুড়ীর উপযুক্ত, শাশুড়ী বৃদ্ধা, চলিতে পড়িয়া যান, চোখে দেখিতে পান না, কাণে শোনেন না, বৌ তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া ভাল রান্না নিজে খায়, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া গহনা কাড়িয়া লয় ইত্যাদি। শাশুড়ী বৌকে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে পাড়াপড়সির কাছে তাহার নিন্দাবাদ করিয়া মনের ঝাল ঝাড়েন। এই খেলায় শাশুড়ীর অভিনয় বড় সুন্দর হইয়াছিল, তাহার ফোগলা স্বর, অনর্গল আবল তাবল বুলি, চলিবার ধরণ, পাড়াপড়সির নিকট বৌয়ের নিকট অভিযোগ, এ সমস্তই খুব হাসির হইয়াছিল।

এ দেশের শাশুড়ী বৌয়ের সম্পর্ক আমাদের দেশের চেয়ে যে বেশী মধুর নহে, এই অভিনয়গুলিই তাহার সাক্ষ্য। বরঞ্চ এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের অবস্থার আজকাল অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। শাশুড়ী আর বৌকে বড় একটা গঞ্জনা দিবার সুযোগ পান না; কিন্তু এখানে শাশুড়ীর দৌরাত্ম্যের নাকি এখনো বাড়াবাড়ি! এদেশে এইরূপ একটি প্রবাদ গল্প আছে, চাতক পক্ষী আগে একজন শাশুড়ী ছিল, বৌয়ের উপর সে এত পীড়ন করিত যে একদিন তৃষ্ণাতুর হইয়া বৌ মরিয়া গেল, তবুও শাশুড়ী তাহার মুখে জলবিন্দু দিলেন না। মরিবার সময় বৌ শাপ দিয়া গেল, "তুমি চাতক হইয়া চিরকাল জলের তৃষ্ণা সহ্য কর।" সেই হইতে শাশুড়ী চাতক হইয়া জলের জন্য হাহাকার করিতেছেন। 'শাশুড়ী বৌ' খেলা ছাড়া আরও দুই এক রকম অভিনয় খেলা ছিল, কিন্তু তাহা তেমন বিশেষ কিছু নহে।

এই সকল খেলাধূলার পর বেলা ৪টের সময় নিমন্ত্রিতা রমণীগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রমাবাই হিন্দু, খৃষ্টান, ইংরাজ, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রমণীমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের মধ্যে কয়েকজন মিশনারী রমণী মাত্র আর হিন্দুর মধ্যে মিশেস রানাদে ও তাঁহার যাতৃগণ, মিশেস ভাণ্ডারকর ও তাঁহার কন্যা মিশেস ভট ও তাঁহার কন্যা এইরূপ কয়েকজন উন্নতশ্রেণীর মহিলা ছাড়া আর কেহ আসেন নাই। আগে হইলে আসিতেন, কিন্তু আজ কাল পুনার মতিগতি এমনি, যে অনেকে ইংরাজ মহিলার নিমন্ত্রণে তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে বরঞ্চ পাঠাইবেন কিন্তু রমাবাইয়ের নিমন্ত্রণে আসিতে দিবেন না। আগে রমাবাইয়ের স্কুলে যতগুলি মেয়ে ছিল এই হুজুকে তাহার কতক কামিয়া গিয়াছে।

নিমন্ত্রিতাদিগের মধ্যে দেশীয় খৃষ্টমহিলা ও ইহুদি রমণীর সংখ্যাই অধিক ছিল। এই সকল ইহুদীরমণীগণ মহারাষ্ট্রীধরণে কাপড় পরেন, মহারাষ্ট্রীভাষায় কথা কহেন; কিন্তু তাঁহাদের চেহারার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আমাদের গল্প স্বল্প চলিতে লাগিল, গান বাজনাও বন্ধ রহিল না, দুই জন হিন্দুরমণী

গান করিলেন; তাহার মধ্যে একজন বেশ সুকণ্ঠী। ইহার পর রমাবাই আমাদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতার মর্ম্ম আমাদের দেশের প্রশংসা ও আমাদের প্রশংসা। তিনি এইরূপে আরম্ভ করিলেন—"মহারাষ্ট্র' এই কথাটা যেমন শ্রুতিকঠোর খটখটে কথা, মহারাষ্ট্র দেশও তেমনি অসমতল বন্ধুর কঠোর ক্ষেত্র আর ইহাদের অধিবাসীগণের চেহারাতেও সেই অনুযায়ী একটি কঠোরতার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু নদীবহুল, সমতল, কোমলপ্রকৃতি বঙ্গদেশের সকলি সুকোমল, তাহার দৃশ্যে কোমলতা, ভাষায় কোমলতা, সন্তানগণের মূর্ত্তিতে স্বভাবে কোমলতা বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই জন্যই কি বঙ্গদেশের গৌরব; তাহা নহে। বঙ্গের গৌরব বঙ্গবাসী বিদ্যাবুদ্ধিতে ভারতের অন্যান্য জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া। ধর্ম্মগত, ভাষাগত, সমাজগত সকল রকম উন্নতিতেই বাঙ্গালী অগ্রগামী। মহারাষ্ট্রে রাণাদে, ভাণ্ডারকর আছেন সত্য কিন্তু বাঙ্গলা দেশে রাণাদে ভাণ্ডারকরের সংখ্যা অধিক। কেবল তাহাই নহে তাঁহাদের মহত্ত্বভাবও গুরুতর। বঙ্গের রামমোহন রায়ের যশোগীতি সুদূর পশ্চিমেও ধ্বনিত।"

এই বলিয়া সংক্ষেপে প্রথমে রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকলাপ পরে পূজনীয় পিতৃদেবের মহৎজীবন এবং সেই প্রসঙ্গে ক্রমে আমাদের দেশের ধর্ম্মগত সমাজগত উন্নতির উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে অভিনন্দন প্রদান করিয়া পণ্ডিতা বক্তৃতা শেষ করিলেন।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি সম্প্রতি পণ্ডিতার এক ইউরোপীয় বন্ধু তাঁহাকে রামমোহন রায়ের এক গোচ্ছা চুল পাঠাইয়াছেন, বক্তৃতার সময় তাহা তিনি আমাদের দেখাইলেন।

পণ্ডিতার কি চমৎকার বাগ্মীতা, যাহা বলেন অতি হৃদয়গ্রাহী করিয়া সরল সুন্দর ভাষায় অনর্গল বলিয়া যাইতে পারেন। মিশেস রাণাদেও বলেন বেশ। রমাবাই তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন 'মহিলাদিগের উন্নতি উদ্দেশে পুনায় আর্য্যমহিলা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার এখন আর সাড়াশব্দ নাই, সে গভীর নিদ্রামগ্ন আর বঙ্গের নারীগণ সোৎসাহে কার্য্য করিতেছেন।' এই কথার উত্তরস্বরূপ মিশেস রাণাদে উঠিয়া বলিলেন "আর্য্যমহিলা" ঘুমাইতেছে সত্য কিন্তু তাহা শিশুর ঘুম, শিশু যেমন ঘুমাইয়া বল সঞ্চয় করিয়া জাগিয়া উঠে আর্য্যমহিলা সমাজ তেমনি যৌবনের তেজ লইয়া জাগিয়া উঠিবে। নূতন উদ্যমে কাজ করিবার জন্য সে ঘুমাইয়া বল সঞ্চয় করিতেছে মাত্র।

ইহার পর আমি পণ্ডিতা রমাবাইকে তাঁহার সস্নেহ আতিথ্য ও সাদর অভ্যর্থণার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও নিজেদের অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়া কথঞ্চিৎ পরিমাণে মনের কৃতজ্ঞতা-আবেগ ভার নিবৃত্তি করিলাম।

বাস্তবিক সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সেদিন খুবই অনুভব করিয়াছিলাম। পণ্ডিতার সেই আত্মদানের আনন্দ, পরোপকার-ব্রতপালনের অদম্য উৎসাহ দেখিলে নিজের অযোগ্যতা, ক্ষুদ্রতা পূর্ণমাত্রায় বুঝা যায়। অথচ তাহাতে ঈর্ষা নাই; আত্মগৌরবের অভাব

অনুভব নাই, কেননা সেই গৌরব জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া আমিও তখন সেই গৌরবভাগী হইয়াছি; তবে তখনো দুঃখ কেবল এই ভাবিয়া সেই জ্যোতি একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

হায়! বঙ্গে মহাত্মা পুরুষ উদয় হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গের মহাত্মা রমণী বঙ্গের রমাবাই কবে উদয় হইবেন? যিনি বঙ্গের নিরাশ্রিতাদিগের দুঃখে হৃদয় শোণিত পাত করিতে সমর্থ হইয়া তাহাদিগের দুঃখ ক্ষালন করিতে পারিবেন! যতদিন না তাহা হইতেছে ততদিন হতভাগিণীগণ, তোমরা বুকফাটা কান্না কাঁদ তোমাদের অশ্রু কেহ মুছাইবে না। ধন্য তুমি রমাবাই!

সভাভঙ্গে অন্য সকলে চলিয়া গেলে আমরা পণ্ডিতার সহিত আহারাদি করিয়া বিদায় লইলাম। একদিনে আশ্রম-বালিকাদের সঙ্গে আমাদের এত ভাব হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা তখনো আমাদের ছাড়িতে চাহে না। ছোট ছোট মেয়েরা আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "যাইতে দিব না" বড় বড় মেয়েরা হাত ধরিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল "আর একটু থাক"। তাহাদের এই অকৃত্রিম সরল স্নেহের স্মৃতি সঙ্গে লইয়া একই সঙ্গে আনন্দ ও নিরানন্দ হৃদয়ে আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

পুনার আর একজন রমণী মিশেস সোরাপজি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মহোদ্যমে কাজ করিতেছেন। ইনি ধর্ম্মে খৃষ্টান, জাতিতে হিন্দু, বিবাহ করিয়াছেন পার্সী। ইহার সপ্ত কন্যা, সকলেই সুশিক্ষিতা। মিস সোরাপজি বি, এ, যিনি বিলাতে আছেন তিনি ইহাঁরই এক কন্যা। আর এক কন্যা হাই স্কুলের প্রধান কর্ত্রী। অন্য দু এক জনের বিবাহ হইয়াছে এবং বাকী সকলে পুনায় মিশেস সোরাপজির যে কয়টি স্কুল আছে তাহারই শিক্ষয়িত্রী। মিশেস সোরাপজির একটি স্কুলের পুরস্কার বিতরণে আমর উপস্থিত ছিলাম। স্কুলে ছোট ছোট বালক বালিকা উভয়েই পড়ে, আর হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পারসি এই সকল জাতির সন্তানই আসিয়া থাকে।

মিস কিনিয়ার্ডদ্বয় যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা দর্শনে গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিবার পথে তাঁহারা পুনা বম্বে হইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা হাতে করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিলেন এবং পুরস্কার প্রদান হইয়া গেলে বালক বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজিতে তাহাদিগের মনোরঞ্জক দুই একটি কথা বলিলেন, মিশেস সোরাপজি আবার মহারাষ্ট্রী ভাষায় তাহা অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। মিস কিনিয়ার্ড যাহা বলিলেন তাহার প্রথম কথা,—তাঁহারা কখনো এই স্কুলের বালক বালিকাদিগকে ভুলিবেন না আর ছেলেরাও যেন তাঁহাদিগকে না ভোলে, অন্ততঃ তাঁহাদের এই ইচ্ছা, এইরূপ আশা। ছেলেরা সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল "কখনই ভুলিব না।"

তাঁহাদের দ্বিতীয় কথা;—"দেশে গিয়া তাঁহাদের বালক বালিকাদিগকে বলিবেন, তাহারা সেখানে যেরূপ হাসি মুখে পুরস্কার গ্রহণ করে,"—পুরস্কার পাইলে এদেশের ছেলের

মুখেও সেইরূপ হাসি ফুটিয়া উঠে তাহাদের মত ইহারাও তখন সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে।"

নূতন সংবাদ বটে! অসম্পূর্ণাবৃত-দেহ দীন-অসভ্যবেশ ও মলিন মুখের সহিত হাসি ও প্রফুল্লভাব এতই অসঙ্গত ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার যে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া গিয়া খবর না দিলে সে দেশের বালক বালিকারা এরূপ অসম্ভব কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না! এখন তাহাদের নানা জ্ঞানের সহিত আর একটা জ্ঞান এই বৃদ্ধি হইবে যে, ভিন্নদেশে এমন একরূপ আশ্চর্য্য জীব আছে যাহাদের ঠিক পশু না বলিলেও বলা যায়, কেননা চেহারাতে তাহারা কতকটা মানুষের কাছাকাছি আর শ্বেত প্রাণীর ন্যায় হাসি দ্বারাই তাহাদিগকে হর্ষ প্রকাশ করিতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

কবিতা।

নিজের কথা।

যাহা কিছু মনে আসে
লিখে রেখে চলে যাই,
দুই দিন পরে তারে
আবার দেখিতে ধাই,
যত দেখি তত যেন
আর কার মনে হয়!
আমার হৃদয় কথা
হেন মনে নাহি লয়!
কখন্ ও ভাব গুলি
এসেছিল ভুলে যাই!
কিছুতেই কূল তার
খুঁজে যেন নাহি পাই!

চেনা চেনা মনে হয়
শুধু যেন মাঝে মাঝে,
এখনো সুরটি যেন
একটু হৃদয়ে বাজে!
শুনেছিনু কোন খানে
শুনেছিনু কার মুখে,
শুনেছিনু কোন দিন
সুখে কিম্বা হবে দুখে!
ঠিকানা করিতে তার,
কিছুতে না পারে মন,
মন হয় এরা কিরে
আমার নিজের জন!

পরের কথা।

১

কবিতার গ্রন্থ যত
খুলে দেখি হয় মনে,
হৃদয় করিছে যেন
ছলনা আমার সনে!

কি জানি কি মায়াবলে
বাহির হইয়া আসি,
গ্রন্থরূপে রহিয়াছে
সম্মুখেতে পরকাশি!

২

নহিলে কেমন করে
অপরে জানিবে তাহা,
সযতনে লুক্কায়িত
হৃদয় নিভৃতে যাহা !
প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে
আমার হৃদয় কথা,
আমার আনন্দ খেলা
আমার যাতনা ব্যথা ;
কোন দিন কার পানে
চেয়েছিনু কি নয়নে,

৩

কোন দিন কারে দেখে
বেজেছে কি তার মনে,
সমস্ত জীবন মোর
যা কিছু লুকান ছিল,
কে তাহা কেমন করে
বাহির করিয়া দিল !
বল দেখি সত্য করে
ওরে হৃদয় আমার,
কাণে কাণে চুপি চুপি
বলে ছিলি কিনা তার ?

কবিতার জন্ম।

কবিতা কি বিলাপের তান
কবিহৃদি ভেদ ক'রে
উঠিছে আকুল স্বরে
যাতনার সঙ্গীত মহান !
সারাদিন যেমন কানন
মর মর রব করে
অস্ফুট যাতনা ভরে,
চিরকাল করিছে ক্রন্দন !
মাঝে মাঝে নাহি পারি আর,
উচ্ছ্বাসিত ঝটিকায়
উন্মত্তের মত গায়
মর্ম্মভেদী মহা হাহাকার !
তেমনি কি চির ব্যথা ভরে !
কবির হৃদয় বাজে !
উচ্ছলিয়া মাঝে মাঝে
উঠে তাই কবিতার ধার !
পার্ব্বতীয় কঠিন প্রদেশে
নির্ঝরের ধারা যথা পড়ে,
মৃদু মৃদু ঝরঝরে
তরল রজতময়ী শেষে—
নদী হয়ে বেগে চলে যায় ?
অপূর্ব্ব শ্যামল বেশে
দুই কূল ওঠে হেসে
কুলু কুলু গান গেয়ে ধায় !
কবির হৃদয় ভেদ করে
বিমল রজত পারা
উজ্জ্বল প্রেমের ধারা
তেমনি কি বিশ্ব মাঝে ঝরে ?
অথবা কবিতা শুধু
আনন্দেরি গান ?
হেরি চারু মনোলোভা
মধুর বিশ্বের শোভা
বাজে শুধু পুলক মহান !
প্রভাতের অরুণ পরশে

প্রেমে ভরা ঢল ঢল
সুবিমল শতদল
প্রস্ফুটিত পুলক-হরষে,
যথা দেয় হর্ষ উপহার,
আকুল সুবাস-রাশি
মধুর রূপের হাসি
তপনের উদ্দেশে তাহার,—
দেখিয়া বিশ্বের মধুহাস—
যেমন আনন্দ প্রাণ
পাখী গুলি গায় গান
আপনি উঠেরে গীতোচ্ছ্বাস।
তেমনি কি কবিজনা
লভি বিন্দু প্রেমকণা
ইশ্বরের মহা-প্রেম হতে
গাহিতেছে অবিরাম
তাঁহার আনন্দ নাম,
দেব শিশু তারা কি মরতে ?

শ্রীমতি হিরণ্ময়ী দেবী।

ঋণ পরিশোধ।

(১)

নগর প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কিছুদিন হইতে সামন্তসিংহ তাঁহার দুইটী মাতৃহীন সন্তান ও বৃদ্ধ ভৃত্য রামকান্তকে লইয়া এই কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম প্রথম কৌতূহলাক্রান্ত প্রতিবাসীগণ বিদেশীর সহিত আলাপ পরিচয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু উদ্ধত গর্ব্বিত সামন্তসিংহ নিজ ব্যবহারে তাহাদের স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি তাহাদের বন্ধুত্ব-প্রয়াসী নহেন। সামন্তসিংহ যে লোক মন্দ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বংশে সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থায় দরিদ্র বশতঃ তিনি ধনীর বন্ধুত্বাচরণকে অপমান এবং দরিদ্রের সদ্ব্যবহারকে অনুগ্রহ ভাবিয়া তাহাদের নিকট হইতে আপনাকে দূরে রাখিতেন। ক্রমে ক্রমে প্রতিবাসীগণ আর কেহ আসিত না। কিছুদিন পরে সামন্ত সিংহের মৃত্যু হইল। রামকান্তের স্নেহের কোলে বালক বালিকা দুইটী বাড়িতে লাগিল। বালিকা ইরাবতী বালক অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় মাত্র ; কিন্তু মাতৃহীন বালকের সহিত তাহার সম্বন্ধ তবুও কতকটা মাতার ন্যায়। বালক বালিকার স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইরাবতী হাস্যময়ী স্নেহময়ী। যদি কোন দিন বালকের মুখ ম্লান না দেখে ত আপনার ভাইটী পাখীটী ফুলগাছটী লইয়া আনন্দে তাহার দিন কাটিয়া যায়। পৃথিবী তাহার আপনার, পৃথিবী মধুর। আর সমরসিংহ তাহার পিতার ন্যায় উদ্ধত ও গর্ব্বিত। পিতা যে প্রতিবাসীদিগের বন্ধুত্ব অবহেলা করিয়াছেন সে তাহা জানে না ; তাহার বিশ্বাস যে দারিদ্র্যবশতঃ তাহাদের অবজ্ঞা করিয়া কেহ কাছে আসে না। বাল্যকাল হইতে পৃথিবীর উপর তাহার দারুণ বিদ্বেষ, কেননা সে ভাবে সকলেই তাহার শত্রু। এই পৃথিবীকে এই লোকদিগকে এক দিন সে পদানত করিবে কেবল এই এক আশা তাহাকে

উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া বালকের কঠোর হৃদয়ে কোমল ভাবেরও অভাব ছিল না; কিন্তু সে কেবল একজনের জন্য। ইরাবতীর বিন্দু সুখের জন্য সমর প্রাণ দিতে পারিত। এক দিন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ইরাবতী বাহিরে কোলাহল শুনিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত শীকার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। বালিকার ফুলের মত মুখখানি তাঁহার চোখে পড়িল। তাহার পরদিন রাজা তিলকসিংহ একাকী কুটীরে আসিলেন, ক্রমে রোজই আসিতে লাগিলেন। সুন্দর সুপুরুষ নৃপতিকে ইরাবতী যে সহজেই হৃদয় সমর্পণ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? লোকাচার-জ্ঞান বালিকার ছিল না। সুতরাং রাজা যে দরিদ্র কন্যাকে বিবাহ করিবেন না ইহা তাহার মনেই হয় নাই, সে জানিত তিলকসিংহই তাহার ভবিষ্যৎ পতি। নবপ্রেমোস্ফুট ফুলটী আপনার সুখস্বপ্নে মগ্ন। প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে রাজা আর রোজ আসেন না, অবশেষে একবারেই আসা বন্ধ করিলেন। ব্যথিত বালিকা কাঁদিয়া দিন দিন ফুলটির ন্যায় শুখাইতে লাগিল। এমন সময় এক দিন শুনিল রাজকুমারী সরোজিনীর সহিত তাঁহার পরিণয় স্থির হইয়াছে। রাজকুমারীকে আনিতে লোক জন গিয়াছে আসিলেই বিবাহ হইবে। মর্ম্মাহত বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সমরসিংহ মূর্চ্ছিতা ভগিনীকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যদি সে বাঁচে রাজার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন, যদি না বাঁচে তবে প্রতিশোধ লইবেন। বালিকার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল কিন্তু শয্যা হইতে বালিকা আর উঠিল না। সমর সিংহ ও রামকান্ত প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়াও শুষ্ক ফুলটি পুনর্জীবিত করিতে পারিলেন না। বালিকা ৩।৪ দিনের পর প্রাণত্যাগ করিল।

(২)

আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। প্রান্তর লোক সমাগমে পরিপূর্ণ। সসজ্জ সেনাবৃন্দ ও মণিমাণিক্য ভূষিত রাজপুরুষেরা রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য মহাসমারোহে অগ্রসর হইতেছে। এই উৎসবের এক কোণে একটী মলিন ছায়া। একজন বালক ও একটী বৃদ্ধ একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে একটী শবদেহ লইয়া এই উৎসবের মধ্য দিয়া শ্মশান যাত্রা করিতেছেন। রাজ অনুচরবর্গ তাহাদের যাইতে দিবে কেন? মহিষীর আগমন-আনন্দের মধ্যে তাহারা দরিদ্র শোকার্ত্তকে এ অমঙ্গল ছায়া লইয়া যাইতে দিবে? বাধা পাইয়া সমর সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইলেন। ইরাবতী আজ মৃতা—আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিয়া সিংহাসনে বসিতে যাইতেছে আর ইরার শ্মশানের পথও বন্ধ? অদূরে রাজকুমারীর অনুচর পরিবেষ্টিত রত্নখচিত শিবিকা দেখা গেল, দ্বিগুণতর উৎসাহে বাজনা বাজিয়া উঠিল, সমরেরও হৃদয় দ্বিগুণতর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাণী সরোজিনীই ইরাবতীর মৃত্যুর কারণ! এই আনন্দ উৎসবই তাহার হৃদয়ে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে! প্রতি-

শোধ! প্রতিশোধ! রাজার হৃদয়হীন ব্যবহার রাণীর নিকট প্রকাশ করিয়া সরোজিনীর হৃদয়ানন্দ মলিন করিবার ইচ্ছায় তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ক্রোধাবেগে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাজকন্যার শিবিকা একবার থামিল, রাজভৃত্য আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক রাজ উপহার একথাল সুন্দর পুষ্প রাজকুমারীকে প্রদান করিল।

সহসা অদূরে একটা কোলাহল উঠিল। রাজকুমারীর মনে হইল হয়ত রাজা নিজেই আসিয়াছেন। তাঁহার গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই ভৃত্যবর্গের ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বুঝিলেন তাহা নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন কি গোলযোগ? ভৃত্য উত্তর করিল "কোথাকার কে দুইজন এক শবদেহ লইয়া শ্মশানে যাইতেছে, সরিতে বলিতেছি তা সরিবে না, ঐ দুর্ব্বৃত্ত আবার বলিতেছে রাজ পথে সকলের অধিকার সমান!"

রাজকুমারী বলিলেন "তোমরা সরিয়া যাও, পথ দাও, মৃতের অসম্মান করিও না।" আজ্ঞাটা অনুচরদের ভাল লাগিল না কিন্তু কি করিবে রাণীর হুকুম—পথ ছাড়িয়া দিল। সমরসিংহ শবদেহ লইয়া সরোজিনীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকন্যা আপনার সুখস্বপ্নে মগ্ন ছিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কি বলিবেন, কিরূপে অভ্যর্থনা করিবেন, সলজ্জ প্রেমপূর্ণ কত চিত্র তাঁহার হৃদয়ে খেলিতেছিল; এই সময় আবরণ-হীন কোমল-সৌন্দর্য্যপূর্ণ পাণ্ডুবর্ণ মৃতবালিকা-মুখ তাঁহার চোখে পড়িল। কোথা হইতে কাহার ক্রোড় শূন্য করিয়া অকালে ফুলটী বৃন্তচ্যুত হইল! হয়ত নবযৌবনের সুখস্বপ্নের ঘোর না ভাঙ্গিতে চির অতৃপ্তি লইয়া জীবন অবসান হইয়াছে। কিম্বা কি জানি যদি বা অনাদরেই ও ফুলটী খসিয়া গিয়া থাকে? নিরাশপ্রেমে কোমল হৃদয়খানি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে! এই শোক দৃশ্যে রাজকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আপনার সুখের মধ্যেও শোক-বেদনায় নয়ন অশ্রুময় হইয়া উঠিল। চকিতের মধ্যে রাজকুমারী রাজোপহার পুষ্পের কয়েকটী লইয়া হাত বাড়াইয়া মৃতার পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। এই উপহার দান ও অশ্রুবিন্দু সমর দেখিতে পাইলেন তাঁহারও অশ্রুহীন নেত্রে অশ্রু দেখা দিল। যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন বলা হইল না নীরবে চলিয়া গেলেন।

(৩)

তাহার পর আজ ২২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তিলকসিংহের ভ্রাতা উদয় সিংহ সেনাপতি সমরসিংহের সাহায্যে তিলকসিংহকে বধ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। সমর সিংহ এক্ষণে মন্ত্রীপদ লাভ করিয়াছেন। রাজ সভায় বিচার চলিতেছে; মন্ত্রীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র-অপরাধে মৃত মহারাজের পুত্র কুমার অজিত সিংহ অভিযুক্ত।

বিংশবর্ষ বয়স্ক সুন্দর গর্ব্বিত যুবক এবং প্রৌঢ়া বয়স্কা একটী রমণী ও ষোড়শী বালিকা তিন জনে সভায় নীরবে দণ্ডায়মান। বিচারপতি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি মন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলে কেন?" যুবক গর্ব্বিত ভাবে উত্তর করিলেন "আমার পিতা তিলকসিংহের মৃত্যুর জন্য আমি মন্ত্রীর নিকট ঋণী; সেই ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।"

বিচারে অজিতসিংহ তাঁহার মাতা ও ভগিনীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। প্রহরীরা তাঁহাদের কারাগারে লইয়া গেল।

একদিন কারারক্ষক কমলকে বলিল "রাজকুমারী আপনার সহিত একজন লোক সাক্ষাৎ করিতে চায়—রাজাজ্ঞা আসিয়াছে আপনি অন্য ঘরে আসুন।" কমল তাহার সহিত বাহিরে গিয়া দেখিল একজন লোক তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভ্রাতা ও মাতার প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি কি দান করিতে প্রস্তুত আছ?" কমল কম্পিত স্বরে বলিল "আমার প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি"।

অপরিচিত বলিলেন "তোমার প্রাণ দিবার আবশ্যক নাই, শপথ কর আমি যাহা বলিব তাহা করিবে।" বালিকা শপথ করিল। অপরিচিত তাহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন যে এই পত্র কাল প্রত্যূষের পূর্ব্বে খুলিও না কিম্বা ইতিমধ্যে কাহারও নিকট এ পত্রের কথা উল্লেখ করিও না।" কমল বস্ত্রমধ্যে পত্রখানি লুকাইয়া রাখিল। সেই দিন সন্ধ্যার পর কারারক্ষক অজিত সিংহের কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "তোমাদের সময় হইয়াছে আমার সঙ্গে আইস"। তাঁহারা বুঝিলেন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। দিনের বেলায় রাজপরিবারের প্রাণদণ্ডে প্রজাগণ আপত্তি করিতে, বাধা দিতে পারে, তাই উদয় সিংহ অন্ধকার রাত্রে তাহা সমাধা করিতে ইচ্ছুক।

পরস্পরের হাত ধরিয়া নীরবে পরস্পরকে বল দিয়া মৃত্যুপথে যাইতে অগ্রসর হইলেন। কারাগারের বাহিরে একখানি শকট ছিল। অনুচরের কথায় তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিলেন। শকট চলিতে লাগিল, অনেক ক্ষণ পরে শকট থামিলে অনুচর তাঁহাদের নামিতে বলিল। তাঁহারা নামিয়া দেখিলেন সম্মুখে একটী বাটী, কিন্তু বধ্যস্থান বা তাহার কোন আয়োজন দেখিতে পাইলেন না। বিস্মিত হইয়া অনুচরের প্রতি চাহিলেন। অনুচর তাঁহাদের নীরব প্রশ্ন বুঝিয়া বলিল মন্ত্রীর অনুরোধে রাজা তাহাদের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া নির্ব্বাসন দিয়াছেন এবং আজ রাত্রের জন্য এই বাটী স্থির রাখিয়াছেন। পরদিন প্রত্যূষে কমল পত্রখানি বাহির করিয়া দেখিল পত্রের শিরোনামা "শ্রীমতী রাণী সরোজিনী"। কমল পত্রখানি মাতাকে দিল, রাণী পড়িলেন "আমার ভগিনীর মৃত্যু ঋণ পরিশোধ করিতে তিলকসিংহের প্রাণ গ্রহণ করিয়াছি। আপনি বিবাহের দিনে আমার মৃতা ভগিনীকে যে ফুল উপহার দিয়াছিলেন আজ তাহার পরিবর্ত্তে আপনাকে তিনটী প্রাণদান দিয়া সে ঋণ পরিশোধ দিলাম।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

বুদ্ধি-বিকাশ।

"The same is true in regard to the term *Mind*. In so far as mind is the common name for the states of knowing, willing, feeling, desiring, &c., of which I am conscious, it is only the name for a certain series of connected phenomena or qualities, and, consequently, expresses only what is known. But in so far as it denotes that subject or substance in which the phenomena of knowing, willing, &c., inhere,—something beyond or under these phenomena,—it expresses what, in itself or in its absolute existence, is unknown." Sir. W. Hamilton.

বুদ্ধির ক্রমবিকাশ আলোচনা করিতে হইলে অগ্রে মনোবিকাশের আলোচনা আবশ্যক। মন কাহাকে বলে, মনের ধর্ম্ম বা লক্ষণ কি, দৈহিক কোন্ কোন্ অবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, ইত্যাদি না জানিলে উক্ত বিষয় অনুশীলন করা অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কাহারও সত্ত্বা, স্বরূপ, তন্মাত্র প্রভৃতি জানিবার শক্তি মনুষ্যের নাই। দৃশ্য, মায়া, ঘটনা প্রভৃতি লইয়া আমাদের ব্যবসায়। আমাদের তদন্তস্তলে যাইবার আদৌ অধিকার নাই। মনুষ্যের জ্ঞানরাজ্য সুবিশাল বা অসীম হইলেও উক্ত সীমা দ্বারায় আবদ্ধ। সুতরাং মনের স্বরূপ, সত্ত্বা লইয়া বৃথা বাদানুবাদের আবশ্যক নাই। আর আবশ্যক হইলেই বা সামর্থ্য কোথায়? আবশ্যক সামর্থ্য সাপেক্ষ। সামর্থ্যে অধিকার এবং উত্তরাধিকার উভয়ই প্রকাশমান। সম্ভাব্য অধিকারই সামর্থ্য।

অধিকন্তু মনের স্বরূপ, সত্ত্বা জানা দূরের কথা; ইহার ভালরূপ সংজ্ঞা করাও যায় না। ব্যতিরেকী পদের (Abstract term) অর্থ হয়, ব্যাখ্যা হয়, বর্ণনা হয়, প্রকৃত সংজ্ঞা হয় না। মনের কয়েকটী গুণ বা ধর্ম্মের উল্লেখ দ্বারা সচরাচর সংজ্ঞা করা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে যথার্থ সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে না। ফলে ঐরূপ গুণ বা ধর্ম্ম দ্বারায় উহা নিরূপিত হয়। মনের তিনটী প্রধান গুণ, ধর্ম্ম বা বৃত্তি আছে। অনুভূতি, ইচ্ছা ও চিন্তা। এই তিনটী গুণ, ধর্ম্ম, বা বৃত্তির সমষ্টির নাম মন। ইহার প্রত্যেকটীই বিশ্লিষ্ট ব্যাপার। এই ত্রিবিশ্লিষ্ট মূর্ত্তির সমন্বিত ভাবকে মন বলে। মনোবিজ্ঞান আদৌ আত্মজ্ঞানসম্ভূত ছিল। আপনার মন আলোচনাই ইহার প্রধান উপায় ও উদ্দেশ্য ছিল। তদ্ভিন্ন মনোবিজ্ঞান অনন্যোপায়। এককালে ইহাই তাহার সম্বল ছিল। কাল সহকারে উহা দেহতত্ত্ব সাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। পরে বিজ্ঞানবিতেরা মনোবিজ্ঞানকে একেবারে দেহতত্ত্বের সম্পূর্ণ অধীনে সংস্থাপিত করিলেন। দেহতত্ত্ব পক্ষপাতীরা তদ্ভিন্ন মনোবিজ্ঞানের উপায়ান্তর নাই বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন। ক্রমে প্রাগল্‌ভের একশেষে উপনীত। শরীর-যন্ত্রে মনের অস্তিত্ব বা আবাস অন্বেষণে

অনেকে বিব্রত হইলেন। অধিক কি বলিব, মনোবিজ্ঞানে মন বিষয় ভাবে (objective) আলোচিত হইতে লাগিল। মন যেন দৃষ্ট স্পৃষ্ট বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এক কালে ইউরোপের চতুর্দ্দিকে সে আন্দোলনের স্রোত ছুটিয়াছিল। ভারতেও তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মৃদুমন্দ সমীরে খেলিতে লাগিল। * আজকাল সে অনুরাগ অনেকটা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু তত্রাপি মন যে কতকটা বিষয় ভাবে আলোচিত হইতে পারে, তাহা এখনও অনেকে স্বীকার করেন।

আপনার মন বিষয়ী (Conscious subject); কিন্তু পরের মন আমার পক্ষে বিষয়ী নহে। তবে কি তাহা আমার মনের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়? না। পরের মন আমার প্রত্যক্ষের সামগ্রী নহে। সুতরাং পরের মন আমার পক্ষে বিষয়ীও নহে—বিষয়ও নহে। উহা আমার অনুমানের সামগ্রী। তদ্বিষয়ে আমার কোন অনুভূতিই নাই। শুদ্ধ শরীরের কার্য্য দেখিয়া আমি পরের মন অনুমান করিয়া থাকি। তাহার লেশমাত্রও আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। রামের সম্মুখে একটী বৃক্ষ আছে। রাম আমার ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট লোক। আমি বৃক্ষ ও রাম উভয়কেই দেখিতেছি। রাম বৃক্ষাভিমুখে চাহিয়া আছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার অনুমান হইতেছে যে রাম আমাকে না দেখিলেও সম্মুখস্থ বৃক্ষটী দেখিতেছেন; অর্থাৎ, বৃক্ষ ও চক্ষের সহযোগে আমার যে প্রকার অনুভূতি হইতেছে, তাঁহারও সেই প্রকার অনুভূতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ, রাম আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব। তাঁহার চক্ষু তো আছেই এবং তাহাও নিমিলীত নহে। তিনি বৃক্ষাভিমুখে চাহিয়াও আছেন, এবং ভাবগতিকে বোধ হইতেছে তিনি অন্য চিন্তাও করেন নাই, অর্থাৎ, আমি অন্য চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে যে ভাবে থাকি তিনি সে ভাবে চাহিয়া নাই, এবং বৃক্ষ দেখিবার সময় আমি যে ভাবে দেখি তিনিও এক্ষণে সেই ভাবেই চাহিয়া আছেন। অতএব রামের বৃক্ষদর্শন আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। শুদ্ধ দৈহিক কার্য্যের সাদৃশ্য লক্ষণে আমার মন দিয়া তাঁহার মন অনুমান করা মাত্র। বৃক্ষ আমার অনুভূতি; রামের বৃক্ষদর্শন আমার অনুমান মাত্র। রামের প্রত্যক্ষ তাঁহার দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া আমরা নির্ণয় করিয়া থাকি। রামের অনুভূতি আমার অনুভূতি নহে। আমার অনুভূতি বা প্রত্যক্ষও তাঁহার অনুমান। তাঁহার অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ আমার অনুমান। আমার ন্যায় তাঁহার শরীর—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সকলই সমান; সুতরাং তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া অনুমান হয় যে তাঁহারও আমার মত অনুভূতি, ইচ্ছা, চিন্তা প্রভৃতি সকলই আছে। সদৃশ-লক্ষণ-যুক্ত বিধায়ে তিনি আমারই মত

* "Mind, however, can be studied both objectively and subjectively, that is, by the observation of its own phenomena, or by the observation of the phenomena of other minds."—Physiological Basis of Psychology, by Mahendra Lal Sircar, M. D.

অনুভব, ইচ্ছা ও চিন্তা করিয়া থাকেন। ফলে, অন্যমনস্ক প্রযুক্ত রাম বৃক্ষ না দেখিলেও দেখিতে পারেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, আমি যে অবস্থায় বৃক্ষ দেখি বা অনুভব করি, রাম তদ্বস্থ বা তৎসদৃশাবস্থায় বৃক্ষ দেখেন। এ অনুমান অবশ্যম্ভাবী। ভাল, রাম মানুষ; তাঁহার সম্বন্ধে এ অনুমান সঙ্গত হইলেও হইতে পারে। অন্যান্য ইতর প্রাণী সম্বন্ধেও কি সেই কথা? হাঁ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতির চক্ষের সঙ্গে আমার চক্ষের সাদৃশ্য আছে; সুতরাং সাদৃশ্যের মাত্রায় উক্ত অনুমান অনিবার্য্য। এস্থলে ন্যূনাধিক্যের কথায় আবশ্যক নাই। সাদৃশ্য সম্বন্ধে উক্ত প্রকার অনুমান সুসঙ্গত ও নিতান্ত অপরিহার্য্য।

যখন দেহের সদৃশ গঠনে ও কার্য্যে পরের মন অনুমিত, তখন তাহা আর বিষয়ভাবে আলোচনার সম্ভাবনা কোথায়? আজকাল মুখ দেখিয়া মনের কথা বলিবার (thought-reading) একটা ধুয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় তদ্বিষয়ে ভয়ানক আন্দোলনও চলিতেছে। যদি পরের মন বিষয়ভাবে আলোচিত হইতে পারিত, তাহা হইলে উক্ত বিদ্যায় লোকে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইত। কিন্তু পরের মন অনুমানের সামগ্রী বলিয়াই পরের মনের সকল কথা বলা বা জানা নিতান্ত অসম্ভব। কেননা, মুখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনের কথা বলিতে হইলে যতদূর মুখদর্পণে মনের প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট রেখা পড়িবে, ততদূর কতকটা বলা গেলেও যাইতে পারে। কিন্তু মানসিক যে সকল সামান্য কার্য্য মুখে প্রতিভাসিত হয় না, অথবা অতি সূক্ষ্মাকারে বা অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, তাহা বলিবার উপায় কি? আবার একজাতীয় অনুভূতিতে লক্ষ লক্ষ কথা হইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচনেরই বা উপায় কোথায়? অবশ্য প্রবল মনোবেগ মুখে সুস্পষ্ট দেখা যায়; কিন্তু সেই বেগের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা কি, তাহা বলা অসম্ভব। মনে কর গোপাল রাগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে অবশ্যই রাগের ছবি সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার রাগের কারণ কি, তাহা মুখে প্রকাশ পাওয়া, বা প্রকাশ পাইলেও অনুমান করা, অসম্ভব। তাঁহার রাগের কারণ কি? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি না কুটম্বের রূঢ় কথা! ইহার লক্ষণ মুখে কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? অধিকন্তু মনের প্রবল বেগ ব্যতীত সামান্য বিষয়ের ছবি মুখে স্পষ্ট প্রতিফলিত না হইবারই কথা। আমার মনে একটী সামান্য বৃক্ষ, ইষ্টক বা পক্ষী উপস্থিত; তাহাদের ছবি মুখভঙ্গিতে প্রকাশ হয় বলিয়া জানা নাই এবং হইলেও পরস্পর পার্থক্য করা অসাধ্য। অধিকন্তু আমার মনও সতত চঞ্চল; সদাই মনে নূতন কথা উঠিছে, ফুটিছে, ডুবিছে, একমন হইলেও কোথা হইতে নূতন ছবি আসিয়া উঁকী মারিয়া থাকে। তাহা না হইলেও সামান্য মনের কথায় মুখের কোন বৈলক্ষণ্য হয় বলিয়া আমাদের জ্ঞান নাই; কিন্তু তাহা হইলেও অনুভব করা নিতান্ত অসম্ভব। তবে যদি শুদ্ধ মুখভঙ্গি দেখিয়া মনোভাব বলিবার প্রথা না হয়, এবং তাহার স্বতন্ত্র কোন উপায় থাকে, তাহার মীমাংসা এস্থলে করা অনাবশ্যক। ফলে সে উপায়ে মনোবিজ্ঞানের অনেক উন্নতির

সম্ভাবনা। তবে যদি শুদ্ধ মুখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনের কথা বলা হয়, তাহাতে যে সকল কথা বলা অসম্ভব, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কেননা, মুখে সুখ, দুঃখ, হর্ষ, চিন্তা, ভয়, রাগ প্রভৃতির জাতীয় রেখা সুস্পষ্ট দেখা যায় এবং সেই রেখা দেখিয়াও তৎসমুদায় অনুমান করা যায়; কিন্তু তাহার প্রত্যেকের নানাবিষয়ী সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন দেখা, বা দেখিলেও বলা, কতদূর সঙ্গত জানি না। রামের শোক উপস্থিত—মুখে কালিম ছায়া পড়িয়াছে এবং অন্যান্য সমস্ত শোকসূচক চিহ্নও প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে, তাহা পুত্রশোক কি না, এবিষয় জানিবার উপায় কি? শ্যাম জ্যামিতির চিন্তায় নিমগ্ন, হয়ত ততদূর পর্য্যন্তও বলা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি কোন প্রস্তাবনার কোন্ অংশ ভাবিতেছেন, তাহা বলা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মস্তিষ্কের কোন একটী ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ডিম্বাকার (cell) সামান্য পরিবর্ত্তনে হয়ত একটা সুমহৎ চিন্তা উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা আমার দৃষ্ট না হইবারই সম্ভাবনা, এবং হইলেও তাহার সহিত চিন্তার পারম্পার্য্য সম্বন্ধ নির্ণয় করা আপাততঃ সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে আইসে না। মুখের ভাবভঙ্গিতে অনেক কথা পাওয়া গেলেও যাইতে পারে; সকল কথা পাওয়া অসম্ভব। বরং স্থূল কথা জানা যায়; সূক্ষ্ম কথা জানা একেবারেই অসাধ্য।

যদি পরের মন আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হইত, তাহা হইলে তাহার সকল অনুভূতি, ইচ্ছা ও চিন্তা আমার সাক্ষাৎ (immediate) হৃদয়ঙ্গম হইত। তাহা হয় না বলিয়াই মনুষ্যচরিত্র আমাদের একটী মহান্ সমস্যা। আমার নিজের মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে প্রকার দৈহিক পরিবর্ত্তন দেখা বা জানা যায়, অপরের সেই প্রকার দৈহিক পরিবর্ত্তন দেখিলে আপনার তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনের পরিবর্ত্তন অনুমান করিয়া লই। স্থূলতঃ পরমন জানিবার এই এক প্রধান উপায়।

পরমন আমার পক্ষে বিষয়ী নহে। নিজমনই বিষয়ী। একথার আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক করে না। পরমন আবার আমার পক্ষে বিষয়ও নহে। পরমনের বিন্দুবিসর্গও আমি স্বতঃ জানিতে পারি না। রামের দানেচ্ছা হইয়াছে। মনে কর, তিনি দানও করিলেন। আমি তাঁহার অর্থব্যয় প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। তাঁহার দানেচ্ছা আমার প্রত্যক্ষের বা অনুভূতির সামগ্রী নহে। তাহা শুদ্ধ আনুমানিক ব্যাপার। হয়ত তাঁহার আদৌ কখন দানেচ্ছা হয় নাই, অথচ দানও করিয়া থাকেন। তাই পরের মন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অল্প। তাই পরের মনোভাবে আমাদের এতাধিক সংশয়। তবে শারীরিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া অনুমান দ্বারায় যতদূর সম্ভব জানা যায়। আপনার মন ব্যতীত পরমন শুদ্ধ অনুমান কাণ্ড। অপিচ আমরা পরের দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া নিজ মনের আনুষায়িক ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। সে ব্যাখ্যাও আমি-ময় অনুমান মাত্র। নিজমনের পরিবর্ত্তনের সহিত দৈহিক পরিবর্ত্তনের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ দেখিয়া পরের সেই প্রকার দৈহিক কার্য্য দ্বারায় সাদৃশ্য ও সমবায় সহায়ে নিজ মনের অনুরূপ পরিবর্ত্তন বসাইয়া কার্য্যকারণমালা সম্পূর্ণ করি।

অতএব পরমন আমার বিষয় বা বিষয়ী নহে। কিন্তু আমার মন এতদুভয় পদেরই অধিকারী। আমি নিজমনের বৃত্তিনিচয় বিষয় ভাবেও আলোচনা করিতে পারি। এমন কি, আমি আপনাকে আপনিই বিষয়ভাবে চিন্তা করিয়া থাকি। নিজ মন যে বিষয়ী—এ কথার, বোধ হয়, কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই। স্মৃতি সহকারে অনায়াসেই নিজমনকে বিষয়ভাবে আলোচনা করিতে পারা যায়। আমি গতকল্য যে চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা অদ্য অনুভব করিতে পারি। পরশ্ব যে মিষ্টান্ন খাইয়াছি, তাহার অনুভূতি আজ হৃদয়ে জাগাইতে পারি। সেদিনকার রাগেও আজ মনকে মাতাইতে পারি। এমন কি, আমার মনের পরিবর্ত্তন, আমার দৈহিক পরিবর্ত্তন, এতদূর অভ্যস্ত বা হস্তগত হইয়াছে যে, ইচ্ছামত কৌতুকছলে তাহাদের অভিনয় করিয়াও থাকি। সে যাহা হউক, আমার মনোবৃত্তি আমি অনেকটা তন্ন তন্ন করিয়া বিষয়-ভাবে, আলোচনা করিতে পারি। সুতরাং আমার মন আমার স্বতঃ পরতঃ চিন্তার বিষয়। অতএব নিজ মন আলোচনার দ্বিবিধ উপায় লক্ষিত হয়। ইহা বিষয়ী হইয়াও বিষয় হইতে পারে। পরমন জানিবার এতদুভয় উপায়ের একটীও নাই। তাহা সমস্তই অনুমানমূলক।

পূর্ব্বে আরও বলা হইয়াছে যে আমাদের জ্ঞানকাণ্ডকে বিষয়গত ও বিষয়ীগত ভাগে বিভক্ত করায় দোষ, গুণ দুই আছে। কারণ, যাহাকে বিষয়গত বলা যায় তাহাও অনেকটা বিষয়ীগত; সুতরাং সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত করা অসম্ভব। জ্ঞান বিষয়ীর; তবে বিষয়কে বিষয়ী হইতে পৃথক্ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বৃক্ষজ্ঞান বিশ্লেষ করিলে বিষয়ীকে স্বতন্ত্র বিভক্ত করা যায় না। বৃক্ষে আমার অনুভূতি আছে; সে অনুভূতির-কারণ কি, তাহা হয়তো জানি না, ফলে সে কারণেও আমার অনুভূতিতে পৃথক করা যায় না, অথচ তাহা বিষয় ছাড়াও নহে, সে অনুভূতিতে বিষয় ও বিষয়ী উপস্থিত। সে যাহা হউক, সমন্বিত ভাবে এস্থলে বলা আবশ্যক যে শুদ্ধ পরের মন কেন, নিজের মন ব্যতীত সকল জ্ঞানই অপরিহার্য্য অনুমানমূলক। বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, প্রভৃতি সকলেরই অস্তিত্ব আনুমানিক। সম্মুখস্থ প্রস্তরখণ্ড আমার প্রত্যক্ষের সামগ্রী; কিন্তু সে প্রত্যক্ষ বিশ্লেষ করিলে কয়েকটী অনুভূতী মাত্র পাই। সেই অনুভূতির সমষ্টি নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ সমবায় সূত্রে গ্রথিত। ফলে প্রত্যক্ষ ব্যতীত আমার বিষয় জ্ঞান কি আছে? সে প্রত্যক্ষও সময় এবং দেশ সাপেক্ষ। সেই দেশ কাল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইতে পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান মাত্র। মূলে তা এই কথা। আবার প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় বিশেষের অনুভূতি এবং সেই অনুভূতি প্রযুক্ত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ব অনুভূতির অনুমান আছে। সম্মুখে কাষ্ঠফলক দেখিলাম। নয়নে বর্ণ ও অবয়বের কতকটা আভাস পড়িল। অমনি দর্শন মাত্রই পূর্ব্বের তাচ্ প্রত্যক্ষের কাঠিন্য প্রভৃতি অনুমিত হইয়া কাষ্ঠফলক জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষে প্রায় দশভাগের এক ভাগ ইন্দ্রিয় বোধ ও নয় ভাগ অনুমান। সুতরাং নিজ মনই প্রকৃত বিষয় ও বিষয়ী। তদ্ভিন্ন সমুদয়ই অনুমানমূলক জ্ঞান।

আমরা বোধ বা চৈতন্যের অন্তস্তলে যাইতে পারি না, সুতরাং জ্ঞান মাত্রই বোধ বা চৈতন্য মূলক। বোধ বা চৈতন্য দুই প্রকার। কতকগুলি স্বতঃ আর কতকগুলি পরতঃ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিষয়াগত একাত্মিক; বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বিরাত্মিক, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অহং বা বিষয়াগত নহে। ইহাদের কারণ আপনাতে সম্পূর্ণ নাই। যে বোধ স্বতঃ আপনাতে সম্পূর্ণ নাই, তাহাকেই বিষয়, বাহ্যজগৎ বা নাহংগত জ্ঞান বলা যায়। ইন্দ্রিয়-বোধ এইরূপ বিষয় সাপেক্ষ। ইন্দ্রিয়বোধের চিরন্তন প্রত্যাশা বা সম্ভাবনাকেই (Permanent possibility of sensation) বহির্জগৎ বা জড় প্রকৃতি বলে। ধীমান জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের এই মত। এস্থলে সত্য তত্ত্ব (Reality) শুদ্ধ চিরন্তন ইন্দ্রিয়বোধের সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল। আত্মজ্ঞান অনুভূতি মাত্র; তদ্ব্যতীত সমস্ত অস্তিত্ব জ্ঞানই চিরন্তন বোধ সম্ভাবনা। এরূপ সংজ্ঞায় চিত্তের প্রীতি হয় না বটে; কিন্তু তাহাতে কি করা যাইতে পারে। তদতিরিক্ত আমাদের অধিকার নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়বোধে নিজত্ব বাদে বিষয় বা বহির্জগৎ বলিব। বস্তুতঃ তাহা অন্তর্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভেদ করা যায় না। ফলে অনুমানে যতটুকু আইসে, তাহাই স্বীকার্য্য। ইন্দ্রিয়বোধ সমস্তটুকু মানসিক ব্যাপার হইলেও একটী সামান্য অনুমান অপরিহার্য্য। সে অনুমানে ইন্দ্রিয় ও তাহার ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আরও কিছু আইসে যাহার অস্তিত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা উত্তেজিত হয় এবং ইন্দ্রিয়বোধ রূপ ফল হইয়া থাকে।

এস্থলে পুনশ্চ বলা আবশ্যক যে নিজের মনই প্রকৃত বিষয়ী, এবং বিষয় ভাবেও তাহা কতকটা আলোচিত হইতে পারে। বস্তু বা পরমন আনুমানিক ব্যাপার। শুদ্ধ অস্তিত্ব সম্বন্ধে বস্তু অনুমানের সামগ্রী; পরমন-অস্তিত্ব এবং ধর্ম্ম এতদুভয় সম্বন্ধেই আমার অনুমান মাত্র। বস্তুধর্ম্ম প্রত্যক্ষমূলক; পরমনের ধর্ম্ম প্রত্যক্ষমূলক নহে। তবে সেই পর-মনের ধর্ম্ম দৈহিক কার্য্যের সমবায় সম্বন্ধে অনুমান। দৈহিক কার্য্য প্রত্যক্ষের বিষয়; আমরা সেই দৈহিক কার্য্য দেখিয়া নিজ মন দিয়া পরমনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। সকল অনুমানের ন্যায় ইহাতেও বিলক্ষণ ভ্রম প্রমাদেরও সম্ভাবনা। কিন্তু কি করা যায়, তদধিক আমাদিগের সামর্থ্য নাই। উপরান্তর অভাবে তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকি এবং থাকাও উচিত।

নিজ মনে পরমনের ব্যাখ্যা সত্য। কিন্তু সময়ে সময়ে পরমনের ব্যাখ্যায়ও নিজ মনের জ্ঞানোৎকর্ষ সংসাধিত হইয়া থাকে। আমরা অনেক সময় নিজ মনের জটিল সমস্যা বুঝিতে পারি না। চিন্তাপ্রক্রিয়া, প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ আপনার অনেক মানসিক পরিবর্ত্তনই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না। পরের দৈহিক কার্য্য দেখিয়া সে সকল জটিল ব্যাপার বিশদ হইতে পারে। মনে কর, আমার রাগ হইলে যে প্রকার দৈহিক লক্ষণ পাওয়া যায়, পরের তদনুরূপ দৈহিক কার্য্য বা লক্ষণ দেখিয়া তাহার রাগ অনুমান হইয়া থাকে। রাগে নিজ দৈহিক লক্ষণ আমার জ্ঞান আছে, তাই আমি পরের রাগ

হইয়াছে কিনা, জানিতে পারি। কিন্তু আমার কবে যে প্রথম রাগ হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না এবং বলিতেও পারি না। দেহের কোন্ অবস্থায় বা কত বয়সে রাগের সম্ভাবনা, বিজ্ঞান যদি এবিষয় নিরূপণ করিতে চায়, তাহা হইলে আপনার মনের আলোচনায় একবারেই হয় না। আমার মনের প্রারম্ভ আমার জানা নাই; তাহার কবে বা শেষ হইবে তাহাও আজ বলিতে পারি না; সুতরাং এস্থলে পরমন আলোচনাই বিশেষ ফলপ্রদ। ইহাতে নানা সংশয় থাকিতে পারে; কিন্তু তত্রাপি ইহাতে অনেক জ্ঞানেরও সম্ভাবনা আছে। যখন আপনার মনের প্রারম্ভ না জান, তখন পরের মনের প্রারম্ভ জানিবে কিসে? আপনার মন দিয়া তো পরের মন অনুমান করিতে হইবে? হাঁ! সত্য। আপনার মন দিয়া পরমন অনুমান করি বটে; কিন্তু যে কার্য্য বা শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া আজ পরের মন অনুমান করি, সেই কার্য্য বা দৈহিক লক্ষণ দ্বারায় যতদূর অগ্র পশ্চাৎ অনুমান করিতে পারা যায়, ততদূরই করিব। যে সময় বা যে দিন প্রথম ঐ মানসিক কার্য্য-জ্ঞাপক দৈহিক কার্য্য পাইব, সেই দিন তাহার মনের প্রথম বিকাশ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। অধিকন্তু সাদৃশ্য অনুমানে আমার নিজ মনের প্রারম্ভও সেইরূপ সময়ে বা দৈহিক অবস্থায় অনুমান করিব। ইহাতে পূর্ণ সত্য না থাকিতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে। অপিচ আপনার মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে আলোচিত হইতে পারে না। অনেকটা মিশ্রভাবেই হইয়া থাকে; কিন্তু পরের মন আমি বেশ বিশ্লেষ করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে আলোচনা করিলেও করিতে পারি। এইরূপে নিজমন হইতে পরমন এবং পরমন হইতে নিজ মনের ব্যাখ্যা উন্নত ও বিশাল হইতে থাকে। এস্থলে পরমন অর্থে অপর মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবজন্তুর মন বুঝিতে হইবে। যথায় দৈহিক কার্য্য বা লক্ষণ দেখিয়া মনের অনুমান হইবে, তথায়ই মনোবিজ্ঞানের অধিকার। বিশেষতঃ মনোবিকাশ বা বুদ্ধি-বিকাশের আলোচনায় কীটানুকীটের মনও অনুশীলনীয়।

তবে সকল বিষয়েই সম্ভব অসম্ভব আছে। যতদূর সে আলোচনা সাধ্যপর ততদূর করাই কর্ত্তব্য। মনুষ্যমন চূড়ান্ত ব্যাপার বটে; কিন্তু তাহার সামান্য সূত্র না আলোচনা করিলে ক্রমবিকাশ জ্ঞানের সম্ভাবনা অতি সামান্য।

মনোবিজ্ঞান সেইজন্য দেহতত্ত্ব সাপেক্ষ। দেহতত্ত্ব সাপেক্ষ বলায় অনেকটা পরের দেহই বলা যাইতেছে। আপনার দেহের কতকটা বাহ্যিক লক্ষণ জানি এবং তাহাদের সহিত মনের সমবায় সম্বন্ধও বুঝি; কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন সহকারে আমার দেহের আভ্যন্তরিক ঘটনা আমি জানি না। আমার স্নায়ুপ্রভৃতির পরিবর্ত্তন আমার প্রত্যক্ষের সামগ্রী নহে। সুতরাং দেহতত্ত্বে অনেকটাই পরদেহ বুঝাইতেছে। এস্থলে নিজ দেহের আভ্যন্তরিক কার্য্য পরদেহ প্রত্যক্ষে অনুমান। মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনে মনের প্রক্রিয়া বুঝিতে গেলে, সম্পূর্ণই পরের কথা আসিতেছে। কে আর আপন মস্তিষ্ক বাহির

করিয়া মনের প্রক্রিয়া আলোচনা করিতে পারে ? এস্থলে পরের কথা স্বতঃই আসিতেছে। আপনার মনকে ভিত্তি করিয়া পরমন আলোচনায় মনোবিজ্ঞানের উন্নতি ; কিন্তু নানা জাতির মন নানা অবস্থায় আলোচনা করাও মনোবিজ্ঞানের কর্ত্তব্য। নতুবা মনোবিজ্ঞান পরিপক্কাবস্থা কখনই লাভ করিতে পারিবে না। অন্যত্র যাহাই হউক, বুদ্ধি-বিকাশ অনুধাবন করিতে হইলে এই প্রকার আলোচনাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

নিজ মনোবৃত্তি বিশুদ্ধ ভাবে আলোচনা করিতে পারা যায় না বলিয়াই মহামতি কৌন্ত মনোবিজ্ঞানের প্রতি ভয়ানক অনাস্থাপ্রকাশ করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে তৎসাময়িক মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানপদবাচ্যই হইতে পারে না। আজ অন্যান্য বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে তাহার যে প্রকার উন্নতি দেখা যায়, তখন তাহার লেশমাত্রও ছিল না। ফলে তখন ততদূর প্রত্যাশা করাও অসঙ্গত। কৌন্তের অনুবর্ত্তী লেখকেরা আজ মনোবিজ্ঞানে পূর্ণমাত্রায় দেহতত্ত্ব প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার শুভ ফল ফলিয়াছে, বলিতে হইবে। তাঁহার মতে আপনার মনের আলোচনায় মনোবিজ্ঞান সংস্থাপিত হইতে পারে না। আপন মনের আলোচনায় অন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তির আলোচনা হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে অন্ততঃ নিজের যে বুদ্ধিবৃত্তি বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিশুদ্ধ ভাবে অনুশীলন হইতে পারে না, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই জন্য তিনি প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করিলে কথা ছিল ; তৎপ্রতি দারুণ কটাক্ষ ও অভিযোগ করায় অনেক সদাশয় মহানুভবেরও ক্ষোভ হইয়াছে। তাঁহার মতে মনোবিজ্ঞান জীবনবিজ্ঞানের অন্তর্গত দেহতত্ত্বের শাখা স্বরূপে আলোচ্য। মনুষ্যমনের জ্ঞান লাভের জন্য পরমন আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজ মন না দিয়া কি প্রকারে পরের মন আলোচনা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। পরের দৈহিক অবস্থা বা লক্ষণ দেখিয়া কিরূপে তাহার মনের পরিবর্ত্তন বুঝিতে হইবে, এবং তাহা নিজ মন ব্যতীত হওয়া সম্ভব কিনা, তাহারও তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয়, নিজ মনের দ্বারায় দৈহিক লক্ষণে যে পরের মন উপলব্ধি হয়, একথা অনাবশ্যক বিবেচনায় তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাই সম্ভব ; নতুবা এতাদৃশ মনস্বী ব্যক্তির এ সামান্য বিষয় অগোচর ছিল বলিয়া মনে আইসে না।

কৌন্ত বলেন নিজ বুদ্ধিতে সকলই আলোচিত হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে নিজ বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। চক্ষু সকলি দেখে, শুদ্ধ আপনাকে দেখিতে পায় না। তবে আপনাকে পর করিয়া, দর্পণে প্রতিফলিত নিজ মূর্ত্তি দেখিতে পারে। আমার চিন্তিত মনকে আমি বিশুদ্ধভাবে চিন্তা করিতে পারি না, এবং কতকটা চিন্তা করিতে পারিলেও পূর্ব্বচিন্তার অনেক অপসৃত হয়। তাহাতে পূর্ব্বচিন্তা ও পরবর্ত্তী চিন্তা উভয়েই বিশুদ্ধ ভাবে থাকে না। এতদুভয়ের একটা মিশ্র ভাবের অনুভব হইয়া

থাকে। এবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি। কিন্তু এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এ প্রকার নিজমনের আলোচনা কঠিন হইলেও একবারেই অসম্ভব নহে। এ ব্যাঘাত সত্বেও মনোবিজ্ঞানের আত্ম আলোচনই মূল। বস্তুতঃ নিজ মানসিক প্রক্রিয়া নিজ মনে অনেকটা আলোচিত হইয়া থাকে এবং হইতেও পারে। স্মরণশক্তি দ্বারায়, কার্য্যকালে না হউক, পরক্ষণেই নিজ মন অবিকল আলোচনা করা যায়। মনে কোন চিন্তা উপস্থিত হইলে তাহার সোপানবলি, চিন্তাকালে না হউক, তৎপরে অনেকটাই আলোচিত হইতে পারে। চিন্তাকালে না হয় বলাও কতকটা যুক্তিবিরুদ্ধ। ভাবিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের নিজ বুদ্ধির আলোচনা অনেকটাই নিজ বুদ্ধি দ্বারায় হইতে পারে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞান দেহতত্ত্ববিবর্জিত নহে। হর্টলী, ব্রাউন, জেমস্ মিল. প্রভৃতি না ধরিলেও হার্বার্ট স্পেন্সর, এলেক্‌জেণ্ডার বেন, জি, এচ লিউইস্ প্রভৃতি অনেক মনোবিজ্ঞানে দেহতত্ত্ব (Physiology) সংমিলিত করিয়াছেন। কৌন্তের সে দারুণ কটাক্ষ এক্ষণে আর মনোবিজ্ঞানে ভাল দেখায় না। জন ষ্টুয়ার্ট এই নিমিত্ত কৌন্তকে দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কৌন্ত এবিষয়ে মহা ভ্রান্ত। ষ্টুয়ার্ট মিল কৌন্তের একজন প্রধান প্রতিপোষক, এবং চিন্তা রাজ্যেও উচ্চাসনের অধিকারী। তাঁহার কথায় ওজগুণ সমধিক। সুতরাং আলোচনার বিশেষ আবশ্যক।

"There is another grave aberration in M. Comte's view of the method of positive science, which though not more unphilosophical than the last mentioned, is of greater practical importance. He rejects totally, as an invalid process, Psychological observation properly so called, or in other words, internal consciousness, atleast as regards our intellectual operations. He gives no place in his series to the science of Psychology, and always speaks of it with contempt. The study of mental phenomena, or, as he expresses it, of moral and intellectual functions, has a place in his scheme, under the head of Biology, but only as a branch of Physiology. Our knowledge of the human mind must, he thinks, be acquired by observing other people."

J. S. Mill.

মহামতি মিলের কথায় দোষও আছে, গুণও আছে। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কৌন্ত আত্মমন আপনি আলোচনা করাকে অপ্রশস্ত বলিয়াছেন। ফলে এস্থলে আলোচনার প্রণালী মাত্র লইয়া কথা, এবং সেই প্রণালীও সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। কৌন্তের এপ্রকার কটাক্ষে অতিরেক দোষ আছে। তিনি তৎকালিক দার্শনিকদিগের তত্ত্ব-প্রণালীতে বিরক্ত হইয়া, একবারে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। ফলে ততদূর যাওয়াও ভাল হয় নাই। তাঁহার প্রণালীতেও দোষ রহিয়াছে। পরের মনে নিজ মন বুঝা অসম্ভব। তাঁহার সময়ে দর্শনশাস্ত্রের অতীব শোচনীয় অবস্থা ছিল ;

সেই জন্যই তিনি উক্ত প্রকার অন্যায্য দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু কৌন্ত কোন্ স্থানে যে নিজ মানসিক আলোচনা (Psychological observation) একবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাই নাই। তিনি মনের আলোচনার দ্বিবিধ উপায় বলেন নাই; সত্য। নিজ মনের আলোচনায় যে মনোবিজ্ঞান গঠিত, একথাও তিনি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে শুদ্ধ দেহতত্ত্ব সাহায্যে মনোবিজ্ঞান সংগঠিত হওয়া উচিত। অধিকন্তু এবিষয়ে তাঁহার কথায় প্রাঞ্জলতা নাই এবং কতক গোলযোগও আছে। কিন্তু এখনও দার্শনিকদিগের প্রণালী সুসঙ্গত নহে। সুতরাং কৌন্ত সে সময় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত অন্যায্যও নহে। ফলে কৌন্ত মনোবিজ্ঞান একবারে অপনীত করেন নাই। ষ্টুয়ার্ট মিলের এ অভিযোগ সমীচীন হয় নাই। কৌন্ত প্রকৃতপক্ষে মনোবিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেন নাই। তবে মনোবিজ্ঞান তাঁহার সময় যে প্রণালীতে আলোচিত হইত, তাহাই অপ্রশস্ত বলিয়াছেন। যখন জীবনবিজ্ঞানের অন্তর্গত দেহতত্ত্বের শাখাস্বরূপে আলোচনা করিতে বলিলেন, তখন আর মনোবিজ্ঞানের অপনয়ন করিলেন কোথায়? তিনি মনোবিজ্ঞানের অবমাননা করেন নাই; শুদ্ধ প্রণালীর অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিতে হইবে; নতুবা অন্যভাবে আলোচনা করিতে বলিবেন কেন? তবে জীবনজ্ঞানের প্রশাখা স্বরূপ, অর্থাৎ দেহতত্ত্বের শাখার স্বরূপ আলোচনা করিতে বলিয়াছেন। আর বস্তুতঃ তাহাতেই বা দোষ কি? জীবনবিজ্ঞান দেহতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট ব্যাপার; তবে আলোচনা সুলভের জন্য পৃথক্। বরং এই কথাই সুসঙ্গত। তবে নিজ চৈতন্যকে স্থান না দিলে চলে না। তাহাই মনোবিজ্ঞানের জীবন। অধিকন্তু মন কিছু জীবন বা দেহে আরোপিত বিষয় নহে যে ইহার সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনার আবশ্যক ও সম্ভাবনা। মনকে জীবন হইতে পৃথক করিলে জীবনবিজ্ঞান নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইবে। সুতরাং কৌন্ত মনোবিজ্ঞানকে জীবনবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন না করিয়া বরং ভালই করিয়াছেন।

দার্শনিকগণের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। অনেকে চৈতন্য—ভাব, ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রভৃতিকে দেহের সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া বলেন না অন্য কোন অস্তিত্ববিশেষের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই নশ্বর দেহ মধ্যে মন অবস্থিত, তাহা প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, আত্মার আত্মা; তাহার দেহের সহিত সংস্পর্শ আছে বটে, সম্পর্ক নাই। কৌন্ত মনোবিজ্ঞানকে দেহতত্ত্বের শাখা বলায় এ প্রকার দার্শনিকের ঘৃণা হইতে পারে। কিন্তু যিনি মনোবিজ্ঞান দেহতত্ত্ব সাপেক্ষ বলেন তাঁহাদের এ কথায় অনাদর করিবার কারণ নাই। যদি মানসিক ক্রিয়া জৈবনী ক্রিয়া হয়, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞান জীবনবিজ্ঞানের প্রশাখা বটে; আর যদি মানসিক ঘটনা জৈবনী ঘটনা হইতে মূলত পৃথক হয়, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞান স্বাধীনভাবে আলোচনার সামগ্রী। কিন্তু মিল মহোদয় যে শ্রেণীর লোক এবং চিন্তারাজ্যের রাজা তাহাতে পূর্ব্ব মতই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে।

অধিকন্তু যদ্যপি মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃপ্রত্তির সম্যক্ আলোচনা মনোবিজ্ঞানের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে কৌন্তও প্রকৃত মনোবিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। তবে তিনি সেই নাম লইয়া তৎসাময়িক দার্শনিকগণমধ্যে পরিগণিত হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। আত্মজ্ঞানে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির প্রক্রিয়া বুঝা অসম্ভব, একথা তিনি মহাত্মা ব্রুস্থার মত অবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রুস্থার প্রণালী যে অধিকতর ফলপ্রদ, ইহা তাঁহার সপ্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। ডাক্তার ব্রিজেস্ বলেন যে কৌন্ত আজীবন বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যেরূপ প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন তাহা মিল প্রভৃতির প্রণালী হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে।

প্রসিদ্ধ ফরাসী দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লিত্তর মহোদয় মিলের এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি অগ্রেই উক্ত প্রবৃত্তিনিচয়ের আলোচনায় এবং তাহাদিগের কার্য্যালোচনায় সবিশেষ প্রভেদ দর্শাইয়াছেন। কৌন্তের মতে জীবনবিজ্ঞানের বাহিরে মনোবিজ্ঞান হইতে পারে নাই; মিল বলেন মনোবিজ্ঞান যে সমস্ত ভাবের অধিকারী জীবনবিজ্ঞানে তাহার ব্যাখ্যা না। এস্থলে মূলেই গোল হইতেছে। মনোবিজ্ঞানে কখন মস্তিষ্কের বৃত্তি এবং কখন সেই বৃত্তির প্রক্রিয়া বা কার্য্যফল বুঝায়। যদি বৃত্তিই ইহার আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে তিনি কৌন্তের পক্ষ; আর যদি সেই কার্য্যফল উহার প্রকৃত আলোচনার সামগ্রী হয় তাহা হইলে তিনি মিলের পক্ষ। বৃত্তি সম্বন্ধে সমস্ত কথাই জীবন বিজ্ঞানের অধিকার। তাহাদের বিশ্লেষই হউক, আর শ্রেণীবদ্ধ করাই হউক, যাহা কিছু বৃত্তি সম্বন্ধে বলা যায় বা বাহ্য শক্তিদ্বারায় তাহাদের যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে বা হইতে পারে; তৎ সমুদয়ই জীবন বিজ্ঞানের আলোচ্য। কৌন্ত সেই ভাবই প্রবল রাখিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান পশুপক্ষী সম্বন্ধেও হইতে পারে। সুতরাং আত্মতত্ত্বের প্রবৃত্তিনিচয়কে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার শক্তি একবারেই যাইতেছে। পশুবুদ্ধি, পশুবৃত্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণ জীবনবিজ্ঞানের অধিকার। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে জীবনবিজ্ঞানের অধীনে মনোবিজ্ঞানের আলোচনার স্থান দিয়া কৌন্ত নিতান্ত ভ্রমান্ধের ন্যায় কার্য্য করেন নাই। এস্থলে মনোবিজ্ঞান অর্থে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি মনোবিজ্ঞান ভাববিজ্ঞান (Ideology) স্বরূপ বুঝায়, তাহা হইলে এ নিন্দাবাদের হেতু আছে। তিনি মানসিক বৃত্তি সমুদায় ও তাহাদের ফলনিচয়ে পার্থক্য দেখাইবার জন্য ভাষাবিষয়ক দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে ভাষাবৃত্তি বা শক্তি (Faculty) মস্তিষ্কের (Cerebrum) কোন (Anterior convolution) আভ্যন্তরিক অংশে অবস্থিত; এবং একথাও অত্যন্ত প্রমাণ্য। কিন্তু তাহা হইলে প্রকৃত দেহতত্ত্বের কথা আসিল, কোন নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া বুঝাইল। ফলে যদি ভাষাবৃত্তি জীবনবিজ্ঞানের অধিকার হয়, ব্যাকরণ সেরূপ নহে। ইহা উক্তবৃত্তির ফল মাত্র। সঙ্গীতবৃত্তি জীবনবিজ্ঞানের অধিকার। Ideology, Logic,

Ethics, Æsthetics) বৃত্তিফল, এবং সকল বৃত্তি ফলের ন্যায় ব্যতীরেকী (abstract) বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত নহে। তাহারা সকলই হয়ত বিশেষ নামধারী বিজ্ঞান হইলেও হইতে পারে।

যাহা হউক মনোবিজ্ঞানের পক্ষে কৌন্তের মত যতদূর সঙ্গত হউক না কেন, মন-বিকাশ বা বুদ্ধিবিকাশের আলোচনায় তাঁহার মত নিতান্ত প্রশস্ত। নিজের মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নিজের আলোচনার সামগ্রী নহে; সুতরাং পরমন আলোচনায় তাহা বুঝা যায়। অবশ্য নিজ মনের দ্বারায় পরমন দৈহিক কার্য্য দেখিয়া অনুমিত। কিন্তু সেই সকল কার্য্য দেখিয়া ক্রমবিকাশের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যখন নিজ মনদ্বারায় পরমন অনুমিত, তখন সে বিকাশের ক্রম নিজ মনের বিকাশ-জ্ঞান না থাকিলে কি প্রকারে সম্ভব? অবশ্য নিজ মনোবিকাশের কতক জ্ঞান থাকিলে উহা পরমন বিকাশের ক্রম দেখিলে আরও প্রবল হইত। এক্ষণে তদভাবে বিশদ হইবার সম্ভবনা অল্প। সমস্তই আনুমানিক ব্যাপার। তবে যখন তাহা ভিন্ন উপায় নাই তখন এ প্রকার আলোচনায় যতটুকু জ্ঞানলাভ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। আমার কবে প্রথম চৈতন্যের উৎপত্তি হইল, কবে অন্যান্য মানসিক ব্যাপার পর পর ফুটিল, তাহা আমার জানা নাই এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই; তখন পরের দৈহিক কার্য্য দেখিয়া সেই বিকাশক্রম অনুমানে অনেক সংশয় থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা অনন্যোপায় বলিয়া বিজ্ঞানবাচ্য এবং প্রমাণ্য। ফলে সে অনুমানেও বিলক্ষণ যুক্তি আছে সুতরাং কতক সত্য বলিতে হইবে।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

বিফল মিলন।

নদীতীরে বিনয় ও তরুণা।

তরুণা। কে জানে হৃদয় কেন আজি,
উথলিয়া উঠিছে হরষে!
পরাণের সহস্র রাগিণী
বাজিতেছে কি তার পরশে।
শুভ্র শশী জ্যোৎস্না ছড়ায়,
সুকোমল নীলাভ গগনে;
সুরবালা খেলা ছলে যেন
জড়াইয়া রয়েছে কিরণে!
কল্লোলিনী কুলু কুলু রবে,
বহে যায় সাগর-গামিনী;
আমাদের দূর শিলান্তরে,
এলোচুলে চাহিয়া যামিনী।
এমন জ্যোছনা রাতে হায়,
বিনয় কেন লো তুমি ম্লান;

কি বিষাদে অধীর হৃদয়,
ছল ছল কেন দুনয়ান?
চল যাই পিতার নিকটে
শুনিব সে অতীত কাহিনী;
কি করিয়া তেয়াগিল মোরে,
স্নেহময়ী জননী দুখিনী।
মনে নাই সে কুঁহেলিময়,
শৈশবের হাসি খেলা গান;
দাঁড়ায়ে সে সমাধি সৈকতে
আজ আমি, সবি অবসান!

বিনয়। তরুণা, এ ছায়াবাজী-ময়,
বিশাল রহস্য-ভরা দেশে,
সবি শুধু নাট্যশালা প্রায়,
কেহ যায় কেহ চায় হেসে।
নিদাঘের খর রবি তাপে
শুষ্ক পাতা উড়ে সমীরণে;
জীর্ণ স্মৃতি কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভাসিয়া বেড়ায় শুধু প্রাণে।
কেহ কারে আপনার ভেবে
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেয় পায়;
কেহ হায় দলিয়া চরণে
ঘৃণা ভরে উপেক্ষিয়া যায়!
এই ত নিয়ম ধরণীতে
কেবল ছিঁড়িছে মায়াপাশ,
হলাহলে কেনা সুধাভ্রমে
হৃদয়ে ধরিছে শত আশ!
তোমার সে অতীত কাহিনী
বলি তবে, বলি নাই কভু;
ছিল মোরে পিতার নিষেধ,
তোমারে কহিনু আজ তবু।
একদিন কুটীরের দ্বারে
পিতা আমি রয়েছি দুজনে;
নিতান্ত সে শৈশবের কথা
ছায়া ছায়া পড়িতেছে মনে।
মলিন রমণী মুখ খানি,
কোলে তার শিশু সুকুমার;
মূর্ত্তিমতী উষারাণী যেন
উজলিছে মোদের দুয়ার!
রমণী কাতর স্বরে ধীরে
বলেছিল দু'চারিটি বাণী,
বিশাল সে নয়নের কোলে
জাগিছে মরণ ছায়া খানি।
তরুণা, সে শিশু বালা তুমি,
উষা রাণী তুমি এ গেহের;
শৈশবের খেলাবার সাথী,
প্রেমের প্রতিমা যৌবনের।
তোমারি আঁখির দৃষ্টি দিয়া
বুঝেছি এ জীবনের মূল,
ফুটেছে পরাণে তাই শত
প্রেমময় শোভাময় ফুল।

তরুণা (চমকিয়া)—
ওকি কথা বুঝিতে পারি না!
বোলনা আমায় তুমি আর;
কোথা চাঁদ কোথায় জোছনা?
কালো কালো মেঘ অন্ধকার।
একি শুনি পিশাচের হাসি!
এই কি সে পুণ্যময়ী ধরা?
ওকি শুনি ঝটিকা গর্জ্জন,
স্রোতস্বিনী পাগলের পারা!
পিতা—পিতা, কোথা আছ তুমি!
আমি যে পাগল মেয়ে তোর;
কে জননী—কেহ নাই হেথা?
পিতা তুমি—তুমি শুধু মোর!
কি বলিছ? জননী আমার,

তোমার কি কেহ নয় হায়!
পিতা শুধু তোমারি কি পিতা?
আমি পিতা বলিব না তায়!
মোরা দুটি ছোট ভাই বোন
প্রকৃতির শোভাময় বুকে,
দুটি ছোট তরঙ্গের মত
পাশাপাশি ভেসে ছিনু সুখে!
এর পরে তুমি, ভাই, কেন
আনিছো ভীষণ অভিশাপ;
জাননাকি পুণ্যময়ী ধরা,
এ জগতে স্নেহের প্রতাপ!

বিনয়। ভুল করেছিনু আমি, বোন,
ক্ষম মোরে, আমি ভাই তোর।
স্নেহময়ি, ওই স্নেহটুকু
জিয়াইবে এ পরাণ মোর;
যাও তুমি পিতার সকাশে,
আমি যাব ফুল তুলে নিয়ে;
দুজনে গাঁথিব মালা-গাছি
পাব সুখ তাঁর করে দিয়ে।

তরুণা। সেই ভাল, যাই তাঁর কাছে
হেথা আমি থাকিব না আর;
সন্ধ্যারতি এতক্ষণে বুঝি
শেষ হয়ে গেছে গো পিতার!

প্রস্থান।

বিনয়। আশা ভাঙ্গা পরাণ আমার!
কি হয়েছে কিবা ক্ষতি তোর?
চিরদিন হৃদয় মন্দিরে
প্রেমের প্রতিমা দেবি মোর!
শুনিল না বুঝিল না কথা
দলে গেল নিঠুরের মত;
যে চরণ পরশে তাহার
ফুটেছে কুসুম শত শত!
দেবী সে'ত ধ্যান ধারণার
মূর্ত্তিমতী হইবে কেমনে?
ভালবাসি, শুধু ভালবাসি
আর সবি কি ছার পরাণে!
বলিব না তুলিব না আর
অস্ফুট প্রেমের কাহিনী;
আমিত জেনেছি নিখিলেতে
সেই মোর হৃদয়ের রাণী!
শুকাইয়া ধীরে যাব ঝরে
ফুটিব না চাহি না ফুটিতে।
ক্ষণিক এ ভঙ্গুর জীবন
ফুরাইবে নিমেষে খেলাতে।
ওই যে হাসিছে চাঁদ তারা—
ধ্রুবতারা সে মোর পরাণে!
জগতের পথ দেখাইবে
অলক্ষ্যে সে দুইটি নয়ানে।
ভুল সবি,— ভুল কিছু নয়;
এই সুখ! সুখ কারে বল?
বড় তিক্ত সংসারের খেলা
সুধা এই প্রেম হলাহল!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীরে বীরেন্দ্র সিংহ পূজায় আসীন।

বীরেন্দ্র।
পূজা সাঙ্গ এতক্ষণে, তরুণা কি আনমনে
খেলায় ভুলিয়া আছে মোরে?
অথবা তটিনী কূলে, একাকিনী এলোচুলে
মগনা কি কল্পনার ঘোরে!
কিবা হরিণীরে লয়ে, দূর শৈল পানে চেয়ে
হেরিতেছে জলদের খেলা

হেরিছে তটিনী বারি, ছায়া খানি কাঁপে তারি
চন্দ্রকরে উজলিছে বেলা।
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, পথ মাঝে কুড়াইয়ে
এনেছি রেখেছি স্নেহে বুকে;
কেন ওরে হেরে মোর, পরাণে এ মোহ-ডোর,
দিন কাটে কি মোহিনী সুখে!
এ তরুণা লতিকায়, বিনয়ে বাঁধিব তায়
এই শেষ সাধ মনে মনে;
বৃদ্ধের পলিত কেশে—কি বিশ্বাস! কবে শেষে
চলে যাব সহসা কি ক্ষণে।
বলিব বিনয়ে ফুটি, সুখের লহরী ছুটি
কি হরষ জাগাইবে তার।
দুই জনে হাতে হাতে, পার হবে এক সাথে
এ বিশাল মহা পারাবার।
ওই যে তরুণা আসে কুটীরো যেনগো হাসে,
আমার হৃদয় সুখে হারা;
কেন মা কেন গো রাণি মলিন ও মুখ খানি
কি দুখে হয়েছো মাগো সারা?

তরুণা।

পিতাগো, পিতাগো মোর! আমি যে আঁধারে ঘোর
ডুবে গেছি নাহিক কিনারা;
বিশাল সংসার মাঝে সকলেই সুখে আছে,
দুঃখী আমি পিতামাতা-হারা।
বিনয় বলেছে মোরে কেহ নাই এ সংসারে
আমি একা বালিকা দুখিনী;
এত দিন স্বপ্ন-ছায় মগন আছিনু হায়
ফুরায়েছে সে সুখ-যামিনী।
ওকি পিতা চোখে জল সত্য মোরে আজি বল,
পিতা তুমি নহকি আমার?
বুঝেছি, কি হবে বলে নাই ঠাঁই এ নিখিলে
দিন আছে শুধু কাঁদিবার।

বীরেন্দ্র সিংহ।
নলিন নয়ন দুটি অশ্রুজলে কেন ফুটি,
কাঁপে রাঙা অধরের পাতা;
মা আমার অভিমানী আয় কাছে আয় রাণি
কে দিয়েছে তোর বুকে ব্যথা?
আপনার পিতা নাই সেই দুঃখে আজি তাই
অভিমানী কেঁদে হলি সারা;
আমি যে জনক তোর তরুণা বালিকা মোর,
তুই মোর নয়নের তারা।
বিনয়ের হাতে ধোরে সঁপিয়া যাইব তোরে
রবি এ কুটীরে দোঁহে সুখে,
হাসিগুলি রাশি রাশি বেড়াইবে ভাসি ভাসি
চির দিন তোদের ও মুখে!

তরুণা।
ওই কথা বার বার! শুনিতে চাহি না আর,
ভাই বোনে বিবাহ বন্ধন!
বুঝেছি আজিকে মোর সকলি আঁধার ঘোর
ডুবে গেছে গ্রহ তারা গণ।
পিতাগো ও কথা বলে দিওনা হৃদয় দলে
দাও মোরে শক্তি দাঁড়াবার;
তোমার ও স্নেহ ছায় গোপনে ঘুমাব হায়
সাধ মোর কিছু নাই আর।
বিনয় স্নেহের ভাই এই থাক্ এই চাই
আর আমি কি বলিব বল?
পিতা তুমি ডাক মোরে, একবার স্নেহভরে,
মুছিব এ নয়নের জল।

বীরেন্দ্র।
মা আমার আয় কোলে, মুছায়ে দি আঁখি জলে
ভুলে যাও নিদারুণ কথা;
তোর-ও করুণ হিয়ে বল মাগো কি করিয়ে
আমি দেব একটুও ব্যথা!

আমি মা জনক তোর, স্নেহের তরুণা মোর
তুই মেয়ে আর নোস কেহ।
বিনয় তোমার ভাই স্নেহের ভগিনী তুই
তোরি তরে উজল এ গেহ।

বিনয়ের সাজিপূর্ণ ফুল লইয়া প্রবেশ

বিনয়।

বোনটি আয়লো কাছে যত ফুল ছিল গাছে
এনেছি যতনে তোর তরে;
শুভ্র এ মল্লিকা ফুলে মালা গাঁথি এলো চুলে
দোলাব কতনা স্নেহ ভরে।
নিবিড় আঁধার ভরা ও নীল গগনে সারা
যেমন তারকা ফুটে চায়;
তেমনি ও কাল কেশে ফুলগুলি চাবে হেসে,
কণ্ঠে হার দুলিবে শোভায়।
আর এই যুঁই ফুলে মালা গাঁথি দোঁহে মিলে
পিতার পূজার উপহার;

তরুণা।

এস পিতা আঙ্গিনায় বসি সেফালির ছায়
শুনিব সে গীত পাপিয়ার।
সারাদিন করে খেলা ঘুমায়েছে সন্ধ্যাবেলা
আমাদের সে দুটি হরিণী;
বল পিতা অতীতের আজিকে আমায় ফের
আছে যত দুঃখের কাহিনী।

বীরেন্দ্র (স্বগত।)

আমার স্নেহের ছায় ক্ষুদ্র এ লতিকা হায়,
তিলে তিলে বাড়িয়াছে ধীরে।
আজ চোকে জল আসে কি দুঃখলহরী ভাসে,
সব সাধ আশা গেল ঝরে।
বিনয়ের সুখ রাশি আঁধারে গেলগো মিশি
কি করে চাব ও মুখ পানে?
নয় তার ক্ষুদ্র হৃদি এ দুঃখ না সবে যদি
কি কাজ তবে সে ছার প্রাণে।

তৃতীয় দৃশ্য।

তটিনীবক্ষে তরুণা।

দূরে শৈলের প্রবেশ।

শৈল। কি প্রখর রবিতাপ, এসেছি কোথায়!
এযেগো অচেনা পথে আসিয়াছি ভুলে;
অবশ চরণ শ্রান্ত, কি পিপাসা হায়!
বড় শ্রান্ত বসি গিয়ে তটিনীর মূলে।
মায়ার কানন একি? এনু কোথা হতে,
কে বালিকা নদীজলে, বুঝি সুরবালা!
ভুলায়ে আজিকে তাই—এনেছে এ পথে;
পথহারা পথিকেরে লয়ে কেন খেলা!
কিম্বা মরীচিকা বুঝি, আলেয়ার আলো,
পথভ্রান্ত পথিকের ভুলায় নয়ন;
অন্ধের নয়ন নাই সবি যেরে কালো,
কোথা হতে এল আজ রবির কিরণ!
সুনীল তরঙ্গপরে কেমন সুধীরে,
দুলিছে লাবণ্যলতা তনু সুকুমার;
দুলিছে অঞ্চলখানি চঞ্চল সমীরে,
কেশরাশি এলোথেলো ঘেরে চারিধার!
দিগঙ্গনা বুঝি হবে, তাই রবি-করে,
নামিয়া এসেছে এই তটিনীর জলে?
প্রত্যেক ভঙ্গীতে মরি কি লাবণ্য ঝরে!
কি উন্মাদ! দুরু দুরু হৃদয়ের তলে।

তরুণা নদী হইতে উঠিয়া সোপানে থমকিয়া দাঁড়াইল।

শৈল। (স্বগত)—
চিত্রার্পিত ছবি যেন রয়েছে চাহিয়া
কি নয়ন কিবা দৃষ্টি অঙ্কিত হৃদয়ে।
সৌন্দর্য্য হিল্লোল এক এসেছে ভাসিয়া

পরাণের দুটি বেলা পড়িছে ভাঙ্গিয়ে,!

(শৈল তরুণার নিকট যাইয়া)

পথ হারা হয়ে হেথা এসেছি পথিক,
ভুলায়ে এনেছে দুটি হরিণীর আঁখি,
কোথা যাব জানিনাক অজানিত দিক্,
কেহ কি অতিথি এলে সুধায় না ডাকি?
জান যদি বল দেবি, বড় শ্রান্ত দেহ,
দুদণ্ড বিশ্রাম তরে হয়েছি আকুল।
কে জানে মায়ার খেলা কোথা হেথা গেহ,
এযেগো নিবিড় বন কণ্টক সঙ্কুল।

তরুণা। অদূরে আছেন পিতা কুটীরের দ্বারে,
পথিক ভুলেছো পথ এস সাথে মোর,
রাজপুত কুণ্ঠিত কি অতিথি সৎকারে?
এস তবে বেলা যায়, শ্রান্ত যদি ঘোর।

শৈল। (স্বগত)

প্রতি কথা—মূর্চ্ছিত যেনগো বীণা তার,
ঘুমঘোরে এক সাথে উঠিল গাহিয়া।
কি প্রশান্ত মূর্ত্তি খানি দেবি করুণার,
অভাগা মানব তরে রয়েছে চাহিয়া।
মৃগয়ার তরে এসে শুভক্ষণে হায়!
হেরি হরিণীর আঁখি হয়েছি আহত।
সৌন্দর্য্য প্রতিমা দেবি প্রতিমার প্রায়
পাষাণ হৃদয়ে মোর হয়েছে অঙ্কিত!

(তরুণার প্রতি)—

চল দেবি শ্রান্ত অতি পথশ্রমে আজ,
তোমার করুণা রাশি জুড়ায়েছে প্রাণ;
প্রাতিদান কি দিব এ সংসারের মাঝ,
অসীম মমতা এ যে নাহি প্রতিদান!

চতুর্থ দৃশ্য।

তটিনীতীরে তরুণা।

সেই দিন এইখানে দেখা তাঁর সনে,
কি মোহ মদিরা বহে অধীর পরাণে!
চঞ্চল অবশ পারা আমি যে আপনা হারা
কিযে সে স্বরগ ছবি দুইটি নয়ানে!

ভালবাসা ইহাই কি জানিনাত হায়!
মুহূর্ত্তে কিশোর খেলা অবসান প্রায়!
কিছুই লাগে না ভালো অন্ধকার ছায়া কালো
পরাণ নিভৃত-তলে আজি মোর ভায়
সেই সে প্রথম দেখা বিস্মিত চাহনি,
হারাইব আপনারে তখনো জানিনি!
এলোথেলো বালিকাটি যৌবন সীমায় ফুটি
সহসা বাজিবে প্রাণে উন্মাদ রাগিণী!

শৈল যুবরাজ! হায় পাগল বাসনা!
ভিখারিণী কোন ধ্যানে রয়েছ মগনা;
উপাস্য দেবতা হয়ে প্রেম উপহার পায়ে
নেবে না কি? কি দারুণ নিরাশ বেদনা!

বিনয়ের প্রবেশ।

তরুণা, একাকী তুই আছিস হেথায়,
কত যে খুঁজেছি তোরে কি বলিব হায়!
বিষাদ মগনা লতা কি তোর দারুণ ব্যথা?
জাগিছে হৃদয় পরে চোকে তাই ভায়!

শৈশবের সাথী আমি তোর খেলাবার,
ছেয়েছে আমার প্রাণে তোর ও আঁধার!
কি দারুণ দুঃখে তোর হয়েছে পরাণ ভোর,
এখনো দুলিছে ওই আঁখি অশ্রুধার?

তরুণা।

কি জানি কেনগো আজি গেছি ভুলে সবি,
শৈশবের খেলা ধূলা অতীতের ছবি।
ভাইটি থাক্ সে কথা; আজিকে পথিক কোথা?
বহুক্ষণ হের ঐ উঠিয়াছে রবি।

বিনয়।

বুঝেছি তরুণা তুমি ভালবাস তায়,
শুন তবে সেও বোন তোমারে যে চায়।

তরুণা।

ভালবাসে সে আমারে? এ নাকি গো হতে পারে
কি ভুল শুনেছ ভাই বলগো আমায়!

বিনয়।

ভুল নয় তুমি রাণী, দরিদ্র আমরা,
এ সুখে কেন গো চোখে বহে অশ্রুধারা!
আঁধার হবে এ গেহ, কে আর করিবে স্নেহ,
তরুণা মোদের তুই নয়নের তারা।

রাজার প্রাসাদে সেই উচ্চ বাতায়নে,
সন্ধ্যায় একেলা বসি রবি আনমনে।
ভাবিয়া মোদের মুখ, উথলি উঠিবে দুখ
ছাইবে মোদের কথা আকুল পরাণে।

তোর সে আঁখির জল হেরিবে না কেহ,
কেহ বুঝিবে না ব্যথা করিবে না স্নেহ।
করুণ দুইটি আঁখি কেহ ওই মুখে রাখি
বুঝাবে না; এ হৃদয়ে তোরি শুধু গেহ।

হয়ত মোদের ভুলে যাবিরে দুদিনে,
সহসা ছায়ার মত পড়িবেক মনে।
সুখের স্বপন প্রায় জাগিবে হৃদয়ে হায়,
ফুটিবে হাসির রেখা ও দুটি নয়নে।

তরুণা।

বিনয় আমিত কভু ভুলিব না হায়,
জাগিবে এ সুখ মোর পরাণের ছায়।
স্নেহের সাথিটি বলে ঠাঁই দিও হৃদি তলে,
আমি চির দিন মনে রাখিব তোমায়।

বনের হরিণী আমি ছোট বনফুল,
প্রকৃতির বুকে থাকি সবি মোর ভুল।
মুক্ত বন পথে ফিরি যেমন তটিনী বারি
বহে আপনার মনে ভাসায়ে দুকূল।

কি জানি কিসের ভুলে ভুলে আপনায়
সঁপিয়াছি আপনারে সে চরণ ছায়।
সে যদি গো যায় ভুলে নাহি ঠাঁই এ নিখিলে;
মুখ খানি হেরি তার মরিব গো হায়।

পিতারে কেমনে ফেলে যাব মনে হয়,
কিন্তু পরাণের বাঁধ রোধিবার নয়!
ছুটেছে যে সিন্ধুপানে আত্মহারা আনমনে
ছুটিবে তাহারি পানে এ ক্ষুদ্র হৃদয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীবক্ষে নৌকা।

(তরুণা ও শৈল)

তীরে বীরেন্দ্র সিংহ ও বিনয়।

বীরেন্দ্র।

তরুণা, নয়ন তারা মোর!
শূন্য করে মোর গেহ, ভুলিয়া সকল স্নেহ,
এ দারুণ অন্ধকারে ঘোর!
ডুবাইলি মোরে আজ, বিশাল সংসার মাঝ
মা আমার আমি গেহ হারা।

পূজার সময় হলে কে আনিবে ফুল তুলে
ঘুরে ঘুরে বন পথ সারা।
হেরিলে বিষণ্ণ মুখ, কার উথলিবে দুখ
অশ্রু ভরা সজল নয়ান;
আয় মা করুণা রাণি দেখি ওই মুখ খানি
শেষ এই জুড়াক পরাণ।

(শৈলের প্রতি) —

যুবরাজ তব করে, ক্ষুদ্র মোর লতিকারে
সঁপিনু করিও তুমি স্নেহ;
অজানিত দূরদেশে, একেলা বেড়াবে ভেসে
ওর মুখে চাহিবে না কেহ।
তোমার করুণ আঁখি ওই মুখপরে রাখি
দেখাইও নিখিলের ছবি;
বন হরিণীর প্রায়, চঞ্চলা বালিকা হায়
ওর চোখে মুক্ত-প্রাণ সবি।
বিশাল সংসার তীরে কতনা সংশয় ফিরে
হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে বিষ;
এক প্রাণ দুই জনে অনন্ত সিন্ধুর পানে
বহে যাও করি এ আশীষ।

নৌকা দৃষ্টিপথ হইতে দূরে।

বীরেন্দ্র।

কে জানে ভবিষ্য ছবি! তাঁরি পানে লক্ষ্য সবি!
এ ক্ষুদ্র মানব কোন্ ছার!
আজিকেত তরুণারে সঁপিলাম শৈল-করে,
কি অদৃষ্টে লেখা আছে তার!

কেন চোকে আসে জল এ হৃদয় সচঞ্চল
আজিকে কাঁপিয়ে কেন সারা;
দীপ শিখা সমীরণে কাঁপিছে জ্বলিছে ক্ষণে
নিভু নিভু ওই ধ্রুবতারা!

বিনয়।

যে যাবার গেল চলে, কেন মিছা অশ্রুজলে
ভাসিতেছ পিতাগো আমার;
আছিলাম দুই জনে সহসা সে কোনক্ষণে
সাথী হল সাথে খেলিবার।
আবার নিমেষে হাসি কোথায় গিয়াছে ভাসি
এত পিতা নহে তার গেহ;
তুমি আমি দুই জন এ আঁধারে নিমগন
সাধ করে রহে কিগো কেহ!
পিতাগো আমিত আছি পরাণের কাছাকাছি
আরো আজ টেনে লও মোরে;
সংসার ছলনাময় হেথা কেহ কারো নয়,
কেন মোরা ঘুরি মায়া ঘোরে!
সুন্দর এ তপোবনে তুমি আমি দুই জনে
কাটাব এ জীবনের দিন,
খেলা সাঙ্গ হলে পরে নশ্বর আঁধার তীরে
আঁধারেতে হইব বিলীন।
এস পিতা গেহে চল, মলিন ও অশ্রুজল
মুছে ফেল, হাসি আন মুখে;
একবার স্নেহ স্বরে, ডাক মোর নাম ধরে,
একবার টেনে লও বুকে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(১)

লোকে ভালবাসে—বাসিয়া ভাবে, তাহার ভালবাসার ব্যক্তিকে কিনিয়া রাখিতেছে। কি নির্ব্বোধ! তুমি ভালবাসিতেছ বলিয়াই যে, তাহার তোমাকে ভালবাসিতে হইবে, এমন কি কথা! তুমি ভালবাস অতএব তোমার কষ্টের জন্য সে দায়ী, এ কোন্ দেশী যুক্তি? তুমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছ, সেই জন্যই সে তোমার প্রতি হাসিয়া চাহিবে, এ কিরূপ প্রত্যাশা? তুমি আদর চাহ, সে আদর করে না, অতএব সে নিষ্ঠুর! তুমি আদর করিতে যাও, সে ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধ দৃষ্টিতে চাহে; তুমি অপমানিত হইয়া ভাব, সে Tyrant, কিন্তু ভাবিয়া দেখ Tyrant কে? তুমি ভালবাস বলিয়াই ভালবাসা চাহ ইহা হইতে Tyrrany কোথায়? যদি ভাল চাও এ কুবুদ্ধি ত্যাগ কর। যদি প্রত্যাশাহীন হইয়া হাসিমুখে ভালবাসিতে পার ত বাস—কাহারো ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, নইলে সরিয়া পড়—মর, যাহা ইচ্ছা কর, কিন্তু এই উপদেশটি মনে রাখিও, আপনাকে কাহারও উপর Thurst করিও না।

(২)

অসুখ কাহাকে বলে? অর্থাৎ অভাব। শারীরিক অসুখ অর্থাৎ শরীরের স্বাস্থ্যের অভাব; মনের অসুখ, আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্তিজনিত অভাব। অনেক সময় মনে হয় এ অভাব, এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতো—যদি কেবল অন্যের অনুগ্রহ পাওয়া যেত। কি ভুল; ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবন রক্ষা করিতে যাওয়া! তার চেয়ে মরণ ভাল, এটা কেন লোকে ভাবে না, পড়ে আছি একলা, জানালার দিকে চেয়ে। গাছপালা আকাশের দিকে চেয়ে ঊর্দ্ধমুখে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিছে। আকাশ তারি মধ্যে ব্যাপ্ত! সে কেবল বুঝতে পারে না, কেবল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে পিপাসিত নেত্রে চেয়ে আছে। আমরাও ঐরূপ করি। কেবল হাহাকার! কি যে চাই বুঝি বুঝিনে? মমতা, করুণা, সহানুভূতি, প্রেম, একি আকৃতিময় বস্তু! যে তাকে ধরতে চাওয়া? সেত সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত; তবে কেন? শুধু কটাক্ষের জন্য, শুধু কথার জন্য, শুধু ভাষার জন্য, শুধু প্রকাশিত ভাবের জন্য ব্যাকুলতা।

(৩)

যদি আমরা আমাদের কাতর আর্ত্তনাদের সময় চারিদিক প্রফুল্ল দেখি—তখন আমাদের হৃদয় আরো শুষ্ক হয়ে যায়; সে প্রফুল্লতা কেবল মরুর প্রজ্বলন্ত হাসি বলিয়া মনে হয়, আমরা তখন মৃত্যুকে এক মাত্র বন্ধু বলিয়া তাহারই ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই! কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সংসার unsympathetic নয়, সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না; তবে মিথ্যার ভ্রমে পড়িয়া যাহারা কাঁদে—যেমন শিশুর চাঁদের জন্য ক্রন্দন—তাহারি অদৃষ্টে সহানুভূতি নাই। কিন্তু বাসনা মিথ্যা হইলেও কষ্ট মিথ্যা নহে। শিশু

যদি তাহার অকারণ কষ্টেও সে মাতার স্নেহ-সান্ত্বনা না পায়, তাহা হইলে কাঁদিয়া তাহার জীবন শেষ হইতে পারে; আর আমরা ত জীবনে প্রতিদিনই দেখিতেছি, সহানুভূতির অভাবে মানুষ নিঃশব্দে জীবন ত্যাগ করিতেছে! তবে কি করিয়া বল সংসারে ক্রন্দন বৃথা যায় না?

(৪)

আঃ কি প্রশান্তি! মৃত-মুখ কি প্রশান্ত! সংসারে প্রার্থনা করার কিছু নেই, আদরণীয় কিছু নেই, কেবল মৃত্যু! মুহূর্ত্তে সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান। আচ্ছা জ্বালা যন্ত্রণা! সংসারে কি আনন্দ নেই? আছে মৃত্যুতে। সেই আনন্দের ছায়া মাত্র জীবনে অনুভব করা যায়। যদি অত আনন্দ সম্মুখে, যদি অত প্রশান্তি সম্মুখে তাহা হইলে কষ্টই বা কেন? এ সমস্তই দুদিনের জন্য, তাহার পর চিরনির্ব্বাণ! দুদিনের জন্য কেন হিংসা দ্বেষ, কেন মানাভিমান, কেন অহংকার, কেন বাসনা কামনা? প্রশান্তি, আনন্দ—পূর্ণানন্দ আমাদের সম্মুখে বিরাজিত! আর সমস্ত ভুলিয়া যাও, কেবল মৃত্যুর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান কর।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর, আর ধর্ম্ম বিশ্বাস-মূলক। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রমাণ-ব্যতিরেকে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না, এবং ধর্ম্মও আপনার মহিমা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় না। এই বিশ্বাস দ্বারা কিছু শুভ ফল উৎপন্ন হয় না, কেবল "অল্প বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মে"—বেকনের এই কথার সত্যতা সুস্পষ্ট সপ্রমাণিত হয়। বিদ্যালয়-প্রত্যাগত বালকমাত্রেই প্রায় আজকাল বিজ্ঞানের দুই চারি পাতা উল্টাইয়া থাকে, আর তদ্দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি আস্থাও শিথিল হইয়া পড়িতে দেখা যায়। তাহারা মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করুক বা নাই করুক তাহাদের জীবনের কার্য্যে ধর্ম্মের প্রভাব বড় বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ইহা তাহাদের নিজের দোষ নহে, তাহাদের শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। বিজ্ঞানের সংস্পর্শে পড়িয়া তাহাদের বুদ্ধি আর পিতামহদের ন্যায় পূজা অর্চ্চনায় শ্রদ্ধাবান হইতে দেয় না। বিশ্বাসের বলে পিতৃপিতামহের নিকট যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইত হার্বার্ট স্পেন্সারের শিষ্যদলের নিকট তাহা কুসংস্কার ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বিষে বিষক্ষয়। বিজ্ঞানঘটিত ব্যাধির বৈজ্ঞানিক ঔষধই উপযুক্ত ব্যবস্থা। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান অতি ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ। একথা আমাদের

দেশে নিতান্ত নূতন নহে। আমাদের পুরাতন দর্শন ও যোগ শাস্ত্র প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিলে অতি সহজেই উহা বুঝা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার আলোচনা করিবার উপযোগী শিক্ষা-লাভ আমাদের অদৃষ্টে সহসা ঘটে না। তদ্ভিন্ন আজন্মকাল ইংরাজী ধরণে ইংরাজী শিক্ষা বশত প্রাচীন মুনিঋষিগণের মত অপেক্ষা আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতের গুরুত্বই আমাদের নিকট অধিক। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ যেমন বিজ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, অপর পক্ষে একদল লোক সেইরূপ বিজ্ঞানের দ্বারাই আবার ধর্ম্মের পোষকতা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লেখকদের মধ্যে প্রোফেসর হেনরী ড্রমণ্ড একজন। তদ্বিরচিত "অধ্যাত্ম জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম" নামক পুস্তকে এতৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কি সম্বন্ধ? এবং ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবার সম্ভাবনা আছে কি না?

দৃশ্য জগতের সহিত অধ্যাত্ম জগতের সম্বন্ধ নিরূপণ করাই ধর্ম্মতত্ত্বের কার্য্য। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নানা প্রকার আকারভেদ আছে; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সকল ধর্ম্মের মূলেই এই এক সম্বন্ধ নির্দ্ধারের প্রয়াস নিহিত রহিয়াছে। বিজ্ঞান কি? যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দ্বারা এই দৃশ্য জগতের কার্য্যসমূহ নিষ্পন্ন হইতেছে সেই নিয়মাবলী ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর নাম বিজ্ঞান। এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। "প্রাকৃতিক নিয়ম," এ কথাটীরই বিজ্ঞান হইতে উদ্ভব। বৈজ্ঞানিক বিধির জন্মের পূর্ব্বে কেবলমাত্র ঘটনাবলীরই আলোচনা হইত। সংসার তখন অসংখ্য অসম্বদ্ধ ঘটনাবলীর সমষ্টি মাত্র ছিল। সে কালেও কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির মনে এই জগৎ যে শৃঙ্খলাবদ্ধ, এই ভাবটীর পূর্ব্ব ছায়া পতিত হইয়াছিল এবং পিথাগোরাস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ কল্পনানুসারে পৃথিবীকে কাল্পনিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যথার্থ নিয়মের সন্ধান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। কোপার্ণিকাস্ গ্যালিলিও এবং কেপলার সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা ও বিধির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। কিন্তু নিউটনের অভ্যুদয়েই বিজ্ঞান-জগতে নবযুগের আরম্ভ হইল। জগতে আকর্ষণ শক্তি আছে, এই সত্যটী যখন মানুষের মনে এই দ্বিতীয় সত্যটী উদ্ভাসিত হইল, তখন হইতে ঘটনার পরিবর্ত্তে অবশ্য মূল্যবান; কিন্তু জগৎ যে নিয়মাবদ্ধ, এই জ্ঞানটী উহা হইতে অধিকতর মূল্যবান। ঘটনার শৃঙ্খলাই আলোচনার মুখ্য স্থল অধিকার করিল। এই ঘটনা-শৃঙ্খলারই অপর একটী নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। এই কথাটী সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। নিয়ম যে কেবল মাত্র ঘটনার শৃঙ্খলা তাহা অনেকে বুঝেন না, তাহার সহিত কার্য্য কারণের সম্বন্ধ সংমিশ্রিত করিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়া জানিয়াছি যে, এক খণ্ড

ইষ্টক যদি ঊর্দ্ধে প্রক্ষেপ করা যায় তবে তাহা অবশেষে মাটীতেই আসিয়া পড়ে, ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু কি কারণে পড়ে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা, তাহার সহিত নিয়মের কোন সংশ্রব নাই। নিয়ম হইতে নূতন কিছুরই উৎপত্তি অথবা সপ্রমাণের সম্ভাবনা নাই; নিয়ম নিজে কোন ক্ষমতা নয়, কেবল যাহা হইয়াছে যাহা হইতেছে সেই ঘটনা-প্রণালীই নিয়ম। সর্ব্বত্র এক প্রথা অনুসারে একরূপভাবে কার্য্যকারী বলিয়াই উহা নিয়ম। যেমন আকর্ষণ-শক্তি যে কি বস্তু তাহা নিউটন আবিষ্কার করিয়া যান নাই, এবং এই শক্তির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না সে সম্বন্ধেও কিছু মীমাংসা করেন নাই; তবে এই শক্তি জগতে যে কি প্রণালীতে কার্য্যকারী তাহা মাত্র তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে।

অক্ষ-সমান্তরাল রেখাগুলি (Latitude) যেরূপ পৃথিবীর ভূমিভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সেইরূপ পৃথিবী ও ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাবলীর মধ্যে রেখারূপে বিস্তৃত থাকিয়া তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছে। হয়ত তাহারাও অক্ষ-সমান্তরাল রেখা-গুলির ন্যায় আমাদিগের কল্পনা প্রসূত বিষয় মাত্র; কিন্তু মানবচিত্তের নিকট তাহারা অস্তিত্বশালী, কারণ তাহাদিগের দ্বারা আমরা কার্য্যাবলীর প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। এখন কথা এই যে, এই নিয়ম-রেখাগুলি কি কেবল মাত্র দৃশ্য জগতেই আবদ্ধ, না তাহা ছাড়াইয়া ও আধ্যাত্ম রাজ্যের সীমানা পর্য্যন্ত তাহারা বিস্তৃত? যিনি উভয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি কি জগতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং যে জগতে এই রেখা-চিহ্নগুলির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের গতি স্থগিত করিয়াছেন? ইহা কি বিশ্বাস্য যে সংসারের এক ভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অপর ভাগ উচ্ছৃঙ্খল? আমাদের সম্মুখে এই অসীম সৌন্দর্য্যময় ও ছন্দোময় প্রকৃতি দেখিয়াও আমরা কি আর একটী ছন্দহীন রহস্যময় নূতন জগতের আধিপত্য স্বীকার করিব?

এই কথাগুলি নিয়ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ঘটনা সম্বন্ধে নহে। কারণ, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহা আমরা জানি। সকল কালের সকল দেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, দার্শনিক, কবি, ও পণ্ডিতগণ উভয় জগতের মধ্যগত সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য ও নিয়মের সাদৃশ্যের মূল্যের তারতম্য আছে। ঘটনার সহিত নিয়মের যে সম্বন্ধ ঘটনার সাদৃশ্যের সহিত নিয়মের সাদৃশ্যেরও সেই সম্বন্ধ। ঘটনা অপেক্ষা নিয়মের সহিতই সত্যের অধিক ঘনিষ্টতা; এমন কি নিয়মই বিজ্ঞান, নিয়মের আবিষ্ক্রিয়াই বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া; সুতরাং প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলীর সহিত যদি আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীর সাদৃশ্য দেখান যায়, তবে প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতকেও বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত করা যাইবে।

এই সাদৃশ্যের মূল্য যে সকলের নিকট সমান নহে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সাদৃশ্য-যুক্তির (Analogy) মূল্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন মাত্রা গ্রহণ করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল

বলেন, যদি প্রকৃত সাদৃশ্য দেখান যায় তবে সাদৃশ্য-যুক্তি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেই হয়। কিন্তু যথার্থ সাদৃশ্য দেখান নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার; সেই জন্য সাধারণতঃ সাদৃশ্য যুক্তির সাহায্যে লোকের বাস্তবিক আন্তরিক বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয় না; তবে বিরুদ্ধ যুক্তির উত্তরস্বরূপে কার্য্যকারী বটে। সাদৃশ্য যুক্তি-অস্ত্রে শত্রু বিনাশ করিতে পারে না শত্রুর অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষার সক্ষম হয় মাত্র; সুতরাং তাহার মূল্য অতি সামান্য। অন্য-পক্ষে সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, সাদৃশ্যই সকল যুক্তির মূলদেশে অবস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে দুইটী বিশেষ কারণবশতঃ আমাদের এই বিবাদ ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ, আমরা প্রকৃতির নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ জানিতে চাহি না; প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাখ্যা করাই আমাদের প্রয়োজন। ইহাই সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ প্রমাণ পদ্ধতি (Proof)। বস্তুর অস্তিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে উহা আমরা দেখিতেছি। যদি দেখিতে না পাই তবে কিছুতেই আমরা তাহাতে প্রত্যয় যাই না। বুদ্ধির হীনতাই যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইবার প্রকৃত কারণ তাহা নহে, অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব দেখিবার শক্তি অর্থাৎ মানসিক চক্ষুর অক্ষমতাই ইহার প্রকৃত কারণ। দ্বিতীয়তঃ এবং ইহাই বিশিষ্ট যুক্তি, প্রাকৃতিক জগতের নিয়মাবলীর সহিত আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীর সাদৃশ্য দেখান আমাদের অভিপ্রায় নহে। দৃশ্য জগতের মধ্যে যেমন হেমন্ত ঋতু দৈহিক অবনতির এবং বিশুষ্ক বৃক্ষপত্রের পতন মৃত্যুর সঙ্কেত স্বরূপ, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সেইরূপ আধ্যাত্মিক নিয়মাবলীর ছায়া অথবা প্রতিকৃতি (Image) নহে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দৃশ্য জগতেই আবদ্ধ এবং তাহার বাহিরে তাহার সহিত সাদৃশ্য লক্ষণযুক্ত নূতন প্রণালীর নিয়মাবলী কার্য্যকারী, এ কথা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। অদৃশ্য জগতের নিয়মাবলী ও দৃশ্য জগতের নিয়মাবলী উভয়ে একই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রক্ষেপণ (Projection) মাত্র। আমাদের বক্তব্য এইমাত্র যে একই নিয়ম উভয় জগতে বিদ্যমান, উভয় জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয় তাহা উভয় জগতে একই নিয়মের কার্য্যকারিতার ফল। একই নিয়ম দণ্ডের একভাগে আত্মা অপর ভাগে পদার্থ। সুবিধার জন্য আমাদের মাঝে মাঝে "সাদৃশ্যযুক্তি" কথাটী ব্যবহার করিতে হইবে কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন যে সাদৃশ্য প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—উভয় রাজ্যই যে এক নিয়মের অধীন ইহা সপ্রমাণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এমন কি উভয় জগতের নিয়মাবলীর মধ্যে সাদৃশ্য পর্য্যন্ত আছে বলিয়া এখন পর্য্যন্তও সাধারণে স্বীকার করেন না। কখন কখন সঙ্গত-যুক্তি-পূর্ণ ভিত্তির উপর আধ্যাত্মিক জগতে দুই একটি নৈতিক কার্য্য প্রদর্শনের প্রয়াস হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রাকৃতিক জগতের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কেহই যুক্তি প্রয়োগ করেন নাই। প্রকৃতির সমুদয় বিভাগেই ক্রমে ক্রমে নিয়মের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু

আধ্যাত্মিক রাজ্য তাহার কর্ত্তৃত্ব বহির্ভূত; কেননা সকলেই একবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন যে আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃতিক জগৎ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, একের নিয়মের সহিত অপরের কোন সংশ্রবই নাই। এই মতের সমধিক প্রাদুর্ভাবই বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা উৎপাদনের প্রকৃত কারণ। বিজ্ঞান প্রকৃতির শিষ্য। বিশ্বজগৎ প্রতিপদে নিয়মাবদ্ধ কেবল এই অধ্যাত্ম রাজ্য সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন না; এবং সেই কারণেই এই নিয়ম বহির্ভূত রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানিতে চাহেন না। নিয়ম বহির্ভূত উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু উক্ত কারণে আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কি পরীক্ষা করিয়া দেখাও কর্ত্তব্য নহে যে ধর্ম্মজগৎ নিয়মের অধীনে আসিতে পারে কি না?

যুগ যুগ কাল পরিমাণে একে একে বিজ্ঞানের এক এক বিভাগ জ্যামিতির এক একটী চিত্রাকারের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতেছে এবং অপরাপরের সাহায্যে সমগ্র বিজ্ঞান-রাজ্য পূর্ণতা লাভ করিতেছে। আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বে অনেক উন্নতরি প্রয়োজন। জীবনহীন রাজ্যের জ্ঞানের বিষয়ে জ্ঞানের প্রাণী রাজ্যের উন্নতির পূর্ব্বে উন্নতির প্রয়োজন, অধ্যাত্ম জগতের জ্ঞানের পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বে পূর্ণজগতের জ্ঞানের পূর্ণতার প্রয়োজন। অধ্যাত্ম শাস্ত্র এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বলব্ধ প্রাচীন পরিচ্ছদ পরিয়াই রহিয়াছে কিন্তু এ পরিচ্ছদ চিরদিন টিকিবার নহে—ক্রমশঃ দেখা যাইবে যে এ বেশ পরিবর্ত্তিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। দার্শনিক ধর্ম্ম হইতেই কাল সহকারে বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইবে। বিজ্ঞান কিরূপে ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করে তাহা এখন অনেক পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই জন্ম ও বৃদ্ধির নিয়ম একই রূপ। যেমন ভূতত্ত্ব—এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব অন্বেষণে বাহির হইয়া যাহা প্রথমে আনয়ন করিল, তাহা কোন ক্রমেই সত্য বলিয়া উল্লেখ করা যায় না; প্রকৃতির ঘটনাবলী সর্ব্বত্রই সুশৃঙ্খল ও নিয়মাবদ্ধ তবে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধেই যে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিবে তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। এক বস্তুর মধ্যে এক অংশ নিয়মাবদ্ধ এবং অপরাংশ উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। অল্প দিনের মধ্যেই বর্ত্তমান যথার্থ ভূতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে এবং প্রথমোক্ত ভূতত্ত্ব যে মিথ্যা তাহা প্রমাণিত হইল। বর্ত্তমান ধর্ম্মতত্ত্ব ও প্রথমোক্ত ভূতত্ত্বের ন্যায় বলা যাইতে পারে। এই উচ্ছৃঙ্খল ঘটনাবলীকে ক্রমে ক্রমে নিয়মাবদ্ধ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব যত কাল প্রচলিত না হয়, ততদিন বৈজ্ঞানিকগণ তাহার সত্যে অবিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু বিজ্ঞানই কি তাঁহাদের শিক্ষা দেয় না যে বিশেষরূপ পরীক্ষা ভিন্ন কোন বিষয় সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্তে পৌছান কর্ত্তব্য নহে? বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা ধর্ম্ম পরীক্ষিত হউক। ধর্ম্মের মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে তবে উহা নিশ্চয়ই নিয়ম জগতের

অধীনে আসিবে ; প্রকৃতির অভ্যন্তরে যদি তাহার মূল নিহিত থাকে তবে সহস্র অসত্য-জাল ছেদ করিয়াও সত্য প্রকাশিত হইবে। লিনিয়সের উদ্ভিদতত্ত্ব মানবজ্ঞান অনেকাংশে বর্দ্ধিত করিয়াছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের প্রণালী অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী হইয়াছিল অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-জগতের সত্যতা প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক সহায়তা করিয়াছিল ; কিন্তু উহা মানববুদ্ধি কল্পিত অপ্রাকৃতিক প্রণালী উদ্ভূত সুতরাং উহা অধিক দিন আধিপত্য করিতে পারিল না। লিনিয়স নিজেই জানিতেন যে কালক্রমে উহা লোপ পাইবে এবং ইহাও তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কালসহকারে এই কাল্পনিক প্রণালী হইতেই প্রকৃত তত্ত্ব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল। ধর্ম্মও যদি যথার্থ হয় তবে কাল্পনিক প্রণালী হইতে ক্রমে ক্রমে তাহারও যথার্থ তত্ত্ব কালসহকারে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবে।

কেহ যেন এরূপ না মনে করেন আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এই যে বর্ত্তমান ধর্ম্মতত্ত্বও লিনিয়সের প্রণালীর ন্যায় কৃত্রিম ও মানসকল্পিত। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বর্ত্তমানে প্রচলিত অধ্যাত্ম শাস্ত্র অনেক স্থলেই বলিবার ধরণ ও রচনাপ্রণালীর অল্পমাত্র পরিবর্ত্তন সহকারে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অভ্যন্তরে ধর্ম্মতত্ত্বের মূল নিহিত থাকিলেও তাহা এপর্য্যন্ত সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই উহা নিয়মবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া কেবল মাত্র (Authority) বড় লোকের কথার উপর স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট নিয়ম ব্যতীত অপর কোন (Authority) বিশ্বাসের মূল নাই তাহাদের নিকট এই শাস্ত্রের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইহার জন্য নূতন ভিত্তি অন্বেষণ করা প্রয়োজন। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝায় না যে বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের বিশেষত্ব লোপ পাইবে। সমুদয় বস্তুকে একাকারে পরিণত করা বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সমগ্র পূর্ণ একের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিশেষত্ব বিদ্যমান থাকিবে। আমরা যদি বিজ্ঞানকে সরল করিবার অভিপ্রায়ে রাসায়নিক ঘটনাগুলি পদার্থবিদ্যা প্রণালীতে কিম্বা শরীর-বিদ্যার ঘটনাগুলি রাসায়নিক প্রণালীতে অথবা মানসিক বিজ্ঞান অন্তর্গত বিষয়গুলি শরীর-বিদ্যার প্রণালী অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হই অর্থাৎ এই বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-গুলির বিভেদ উঠাইয়া দিতে উদ্যত হই, তবে তাহাতে বিজ্ঞানের উপকার না হইয়া বরং অপকারই হয়। সেইরূপ আমরা যদি ধর্ম্ম-জগতের ঘটনাগুলি অবিকল প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় গণ্য করিতে সচেষ্ট হই, উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিভেদ না মানি তাহা হইলে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই অপকার হয়। এই মতটী যদি প্রমাণীত হয় তবে তদ্দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানের বাসনা পূর্ণ হইবে। বৈজ্ঞানিকগণের অভিপ্রায় এই যে মানবচরিত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। ইতিপূর্ব্বে পজিটিভিজম্ ব্যতীত ধর্ম্মকে উক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার অপর কোনও প্রয়াস হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কাহাকে

বলে ? হক্সলি বলেন, প্রমাণ ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তির উপর যাহার ভিত্তি স্থাপিত তাহাই বিজ্ঞানানুমোদিত কেহ যদি ধর্ম্মকে তাঁহার অভিমত উক্তরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তবে তাহাই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারিবে। এখন দেখা যাউক ধর্ম্মকে কিরূপে এই আখ্যার উপযোগী করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে কি আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা আবশ্যক ? আর যদি তাহা হয়, তবে এ সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে ? বহুসংখ্যক লোকের নিকট আধ্যাত্মিক জগতের ঘটনাবলী প্রাকৃতিক জগতের ন্যায়ই সত্য ; এবং এমন লোক অনেকে আছেন যাহাঁদের নিকট উহা প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলীর আপেক্ষাও অধিক মাত্রায় সত্য বলিয়া পরিগৃহীত। অধিকাংশ ব্যক্তির নিকটেই আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্ব দুর্ব্বোধ্য নহে ; তবে তাহার সংজ্ঞা করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বটে। কেহ কেহ পার্থিব জীবন অপেক্ষাও আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্ব অধিক অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পার্থিব জীবন ব্যতীত অপর কিছু যে আছে ইহা সকলেই একরূপ অনুভব করিয়া থাকেন, তবে তাহা যে কি তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ভবিষ্যৎ আমাদের নিকট সন্দেহ-কুহেলিকাময়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই অন্ধকার রাজ্য দেখিয়া ভীত হন কিন্তু কেহ কেহ উদ্দীপনাবলে এই অন্ধকার মধ্যেও সত্যের আলোক দেখিতে সমর্থ হন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে সকলেই এই আলোক দেখিতে পাইবেন। এই অন্ধকার যদি প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে উজ্জ্বলিত হয় তবে ক্রমে ক্রমে উহা প্রকৃতি-রাজ্যের অন্তর্ভূত হইবে। প্রাকৃতিক জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ একত্রে মিলিয়া যাইয়া প্রকৃতি যে আত্মার সদৃশ অপর কোন বিভিন্ন বস্তু নহে, উভয়েই যে এক প্রণালীতে কার্য্য করে ? এই সত্যটী বুঝা যাইবে। আধ্যাত্মিক জগৎ কি পরিমাণে যে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভূত তাহা আমরা জানি না, তবে সমুদয় অংশই যে নহে তাহাতে সন্দেহ প্রয়োজন করে না ; কতক অংশে রহস্যের স্থান আছে। রহস্য ব্যতীত বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম হইতে পারে না। ধর্ম্মকে গণিতশাস্ত্রে পরিণত করা অথবা ঈশ্বরকে প্রাণীতত্ত্বের মধ্যে আনয়ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিজ্ঞান ধর্ম্মের উপর যতই আধিপত্য স্থাপন করুক না কেন তথাপি রহস্যের রাজ্য একেবারে লোপ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই রহস্যের অস্তিত্বে শঙ্কিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই কেননা রহস্যের অস্তিত্বও বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই বৈজ্ঞানিকগণের ঘোর আক্ষেপের বিষয় এই যে চতুর্দ্দিক রহস্য-জালাবদ্ধ। ধর্ম্ম বিভাগেও অবশ্য এ রহস্য থাকিবে। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান নিশ্চয়তার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার যে অনেক লাভ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ ; তবে লাভ যে শুধু ধর্ম্মের হইবে এমন নহে বিজ্ঞানও তাহাতে উপকৃত হইবে। বিজ্ঞানের এক অংশ যখনই অপর এক অংশকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করে

নিজে পুনরায় সুদ সমেত তাহা আদায় করিয়া লয়; যথা, প্রাণীতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব। একত্র অবস্থিত মানবমণ্ডলী ও অপরাপর জীবমণ্ডলীর কার্য্যের সাদৃশ্য কোমট্ যখন প্রথম বিশেষরূপে ব্যক্ত করেন জীব ও সমাজতত্ত্ব উভয়ে তদবধি এ পর্য্যন্ত পরস্পরের নিকট এত সহায়তা লাভ করিয়াছে যে বলা যাইতে পারে দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করিয়া একত্রে উন্নতির পথে চলিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যেও ধর্ম্ম সেইরূপ নানারূপ অসত্য-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উন্নত হইবে এবং শুষ্ক কঠোর বিজ্ঞানও ধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কেহ বলিতে পারেন ধর্ম্ম-জগতে যদি প্রাকৃতিক নিয়ম বর্ত্তমান থাকে তবে উহা এতদিন আবিষ্কৃত হয় নাই কেন? ইহার কারণ এই যে আমরা যখন যতটা সত্য বুঝিবার ক্ষমতা লাভ করি তখন সেই পরিমাণে সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। নিউটনের নিকট আকর্ষণের বিধি যখন প্রকাশিত হইল তাহার পূর্ব্বে যদি উহা প্রকাশিত হইত তবে হয়ত আমরা তাহা বুঝিতেই পারিতাম না। এতদিন আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। শিশু যেমন পিতামাতার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করে আমরাও ঈশ্বরানুগ্রহে আধ্যাত্মিক বীরপুরুষগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মে আস্থা করিতাম; এবং শিশুকে কারণ বলিলেও সে যেমন তাহা বুঝিতে অক্ষম আমরা সকলেও তেমনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম ছিলাম। এখন বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদের মন গঠিত হইতেছে, আমরা আর শিশুর ন্যায় নিজে না বুঝিয়া কোন বিষয় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহি না; এই ভাব হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমরা এখন কারণ বুঝিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছি এবং সম্ভবত অচিরেই তাহা জ্ঞাত হইব।

প্রাকৃতিক নিয়ম যে আধ্যাত্মিক জগতেও বিদ্যমান, এরূপ মনে করিবার আমাদের কারণ কি? ইতি পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়েই একভাবে কার্য্য করে। 'নিয়ম' এই ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া উহা যে আধ্যাত্মিক জগতেও কার্য্যকারী হইবে তাহা এক প্রকার নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি যদি নিয়মাবদ্ধ হয় তবে প্রকৃতির অন্তর্গত মানব সম্পূর্ণ রূপে অর্থাৎ দেহ ও মন উভয় বিভাগেই নিয়মাবদ্ধ। দেহ ও মনের প্রণালী উভয়ে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, এক ভাগ উচ্ছৃঙ্খল ও অপর ভাগ নিয়মাবদ্ধ এ কথা বলা সঙ্গত নহে। তবে মানব-চরিত্র ও মানবদেহ যে বিভিন্ন জাতীয় নিয়ম সূত্রে গ্রথিত হইবার সম্ভাবনা তাহা বোধ করি বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যেমন নিয়মের বিশেষত্ব আছে, মানব সম্বন্ধেও সেইরূপ; দেহ-রাজ্যের নিয়ম অন্তর-রাজ্যের নিয়ম হইতে স্বতন্ত্র হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তবে সমুদয় বিভাগই নিয়মের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। নব্য বিজ্ঞানের একটী প্রধান অবিষ্কার এই যে নিয়মেরও নিয়ম আছে। প্রথম সংসারে

উচ্ছৃঙ্খল ঘটনাবলী মাত্র ছিল তাহার পর উহার মধ্যে নিয়মরেখা দৃষ্ট হইল; কিন্তু এ নিয়মগুলির পরস্পরের মধ্যস্থিত বন্ধন তখনও দৃষ্ট হয় নাই। ক্রমে নিয়মরাজ্যেও নিয়মের শৃঙ্খলা দেখা দিল। এই নিয়মের নিয়মটীর অপর এক নাম (Law of Continuity) অথবা ধারাবাহিত্ব বিধি, অর্থাৎ নিয়ম সর্ব্বত্র বরাবর একই ভাবে অবস্থিত; এই বিষয়টী সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কিঞ্চিৎ কঠিন বটে। কিন্তু যদি উক্তরূপ নিয়মহীন একটী জগতের কল্পনা করা যায়, তবে উহার মূল্য কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। শিশুপাঠ্য একখানি উপন্যাস পুস্তকে একটী কল্পিত জগতের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সেখানে কোন দিন সূর্য্য উদিত হয় কোন দিন বা হয় না, আবার যখন ইচ্ছা উদিত হয় যখন ইচ্ছা অস্ত যায়; শিশুরা কখন ১টা কখন ২টা কখন বা ১০টা মস্তক লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কখন মস্তক পৃষ্ঠের উপর, কখন বক্ষের উপর, কখন বা গলদেশের উপরে অবস্থিত থাকে; কেহ শূন্যে লম্ফ প্রদান করিলে আজ হয়ত নীচে পড়িল, কাল কিন্তু শূন্যেই ঝুলিয়া রহিল; প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নব নব ভাবে কার্য্য হইতেছে—আজ এই কার্য্যে এই ফল হইয়াছে বলিয়া কাল যে তাহাই হইবে এরূপ নহে, যখন যাহা ইচ্ছা ঘটিয়া থাকে। কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা নাই। এই রাজ্যের অধিবাসীদিগের কি কোনরূপ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? পৃথিবীতেও যদি ধারাবাহিত্বের নিয়ম না থাকিত তবে ইহাও ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল জগতে পরিণত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে নিয়মের এরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক যে একই প্রথানুসারে এক জাতীয় সর্ব্ব কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে, নতুবা আমরা প্রকৃতির উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। পৃথিবীতে যে সকল নিয়মের কার্য্যকারিতা দেখা যায় তাহা যে কেবলমাত্র এই পৃথিবীর মধ্যেই আবদ্ধ এমন নহে; যথা, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহগণও আকর্ষণ শক্তির অনুবর্ত্তী। অতএব এখন আমরা বলিতে পারি যে প্রাকৃতিক নিয়ম কেবলমাত্র দৃশ্য জগতেই আবদ্ধ তাহা নহে, অদৃশ্য জগতেও সমভাবে উহা ধারাবাহী-ক্রমে বিরাজমান। কেহ যদি ইহ অস্বীকার করেন তবে অস্বীকার করিবার কারণ প্রদর্শনের ভার তাঁহারই উপর পড়ে। আমরা বিজ্ঞান ও প্রকৃতির ধর্ম্মানুসারে উক্ত মত পোষণ করিয়াছি, উহার বিপরীত কিছু প্রমাণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিপরীত প্রমাণে পরিণত হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে প্রাকৃতিক জগতের অনেক নিয়মের আধ্যাত্মিক জগতে কোন কার্য্য দেখা যায় না। যেমন, আকর্ষণ শক্তির আধ্যাত্মিক জগতে কোন স্থান কোথায়? ইহার তিন প্রকার উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ আমরা এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পারি না যে আধ্যাত্মিক জগতে আকর্ষণ শক্তি নাই। দ্বিতীয়তঃ আকর্ষণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা হয়ত তাহার বিশেষ চিহ্ন দেখিতে না পাইতেও পারি, তাহার কারণ এইরূপ হওয়াও সম্ভব যে, আত্মার মধ্যে এমন কোন শক্তি নিহিত আছে যদ্দ্বারা আকর্ষণ শক্তিরও প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইতেছে; যেমন কতকগুলি উদ্ভিদ্ জীবনীশক্তি বশতঃ আকর্ষণ শক্তির অধীনে থাকিয়াও বৃদ্ধি সহ-

কারে ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ আত্মার মধ্যে যদি কোন প্রকার পদার্থ না থাকে তথাপি বস্তুর অভাবে আমরা আকর্ষণ শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় নাও পাইতে পারি; কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে যে আকর্ষণ শক্তি একেবারে নাই তাহা বলা সঙ্গত হয় না। জীবন্ত ও জীবনহীন পদার্থের মধ্যে দুই প্রকার বিভিন্ন নিয়মের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা দ্বারা একের নিয়ম যে অপরের মধ্যে বর্ত্তমান নাই তাহা সপ্রমাণ হয় না। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি নিয়ম সর্ব্বত্রই এক প্রথা অনুসারে কার্য্যকারী। কিন্তু উভয় বস্তু বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক হওয়া প্রযুক্ত আমরা নিয়মগুলির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই না। সেইরূপ যদি পার্থিব জীবনের নিয়মগুলি আধ্যাত্মিক জীবনে সুস্পষ্টভাবে না প্রকাশ পায় তবে তাহা হইতে সে রাজ্যে সে নিয়মগুলির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা সঙ্গত হয় না। নিয়মগুলি আছে কিন্তু বস্তুর অভাব বশতঃ তাহা সুষুপ্তাবস্থায় আছে; অথবা অপর কোন নূতন নিয়মের প্রভাব বশতঃ তাহাদের শক্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইতেছে, এবং আধ্যাত্মিক জগতেও নূতন নিয়ম থাকা সম্ভবপর কি না এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম তত্ত্বের জ্ঞানের বৃদ্ধিসহকারে আমরা মীমাংসা করিতে সক্ষম হইব; কিন্তু যাহাই হউক পুরাতন নিয়মগুলির অস্তিত্ব কিছুতেই লোপ হইবার নহে। আমরা যখন পদার্থতত্ত্ব ছাড়াইয়া জীবতত্ত্বে পৌঁছাই তখন দেখি জীবনের ঘটনাগুলি বুঝিবার নিমিত্ত পদার্থতত্ত্বের নিয়ম-সমূহ ভিন্ন আরও কতকগুলি নূতন নিয়মের প্রয়োজন হয়; সেইরূপ আবার জীবন-বিজ্ঞান হইতে যখন মনোবিজ্ঞানে পৌঁছাই তখনও আবার কতকগুলি নূতন নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব সহজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে যখনই আমরা বিজ্ঞানের নিম্নতর প্রদেশ হইতে কোন উচ্চতর প্রদেশে উঠিব তখনই নূতন নিয়ম পাওয়া যাইবে। এ কথা স্বীকার করিলে অবশ্য আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে যখন আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরাজ্য ছাড়াইয়া ধর্ম্মরাজ্যে পৌঁছাইব তখন কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রকাশিত হইবে। কিন্তু ড্রমণ্ডের মতে এইরূপ কোন নূতন নিয়ম থাকিলে প্রাকৃতিক জগতেও তাহার কার্য্যকারিতা দেখা যাইবে। আমরা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত তুলনা করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের ঘটনা কল্পনা করিয়া থাকি। আমাদের ভাষা পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে গঠিত। মনোরাজ্যের ও ধর্ম্মরাজ্যের ঘটনাসমূহ ব্যক্ত করিতে আমরা যে সমুদয় কথা ব্যবহার করিয়া থাকি সেগুলি পূর্ব্বে প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র ব্যক্ত করিত। যেমন, আমরা যখন বলি যে অমুকের মাথায় একটী বিষয় ঘুরিতেছে এখানে অবশ্য ঘুরিতেছে বলিতে প্রথমতঃ আমরা প্রাকৃতিক জগতের একটী ঘটনা বুঝি এবং পরে তাহার দৃষ্টান্তে মানসিক ঘটনাটী প্রকাশ করি মাত্র। অতএব ধর্ম্মরাজ্যে যদি এমন কোন নূতন নিয়ম থাকে যাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত পদার্থজগতে আমরা দেখিতে পাই না; তাহা হইলে সে নিয়ম আমাদিগের মানববুদ্ধির অগম্য হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক আমরা বৈজ্ঞানিক কতকগুলি বিষয় হইতে ইহা দেখিতে পাই যে প্রথমে আত্মা ছিল আর তাহা হইতে পরে পদার্থ রচিত হইয়াছে, আর প্রাকৃতিক জগতে যে সমুদয় নিয়ম আছে সেগুলি অধ্যাত্ম রাজ্যের নিয়ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সুতরাং আমরা পরে যদি ধর্ম্মতত্ত্বে কোন নূতন নিয়ম প্রাপ্ত হই তাহা হইলে তাহার কোন না কোনরূপ প্রতিকৃতি পদার্থ জগতে দেখিতে পাইব ইহা নিতান্ত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

কার্থেজের মহাশক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এদিকে হ্যানিবল সমস্ত রণসম্বন্ধীয় কার্য্য কলাপ নিষ্পন্ন করিয়া নবতি সহস্র পদাতিক ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে রোমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আইবিরস্ (Iberus) নদী উত্তীর্ণ হইয়াই তাঁহাকে প্রকৃত রণকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল। তত্রস্থ দেশাধিপতিগণকে কিঞ্চিৎ উপঢৌকন প্রদানে বশীভূত করিয়াই হানিবল আইবিরস্ নদী ও পিরিনিস্ (Pyrenees) পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া অক্লেশে যাইতে পারিতেন, কিন্তু কার্থেজের দূরদর্শী সেনাপতি তাহা করিলেন না। আইবিরসের উত্তরকূলবর্ত্তী জাতি সমূহেরা ও তত্তীরবর্ত্তী হ্রোডা (Rhoda) এবং এম্পোরী (Emporiæ) নামক নগর দুইটী রোমের মিত্রপক্ষ ছিল। হ্যানিবল দেখিলেন যে স্পেনের এই অংশ অবিজিত থাকিলে, ভবিষ্যতে রোমানেরা এই স্থান হইতে কার্থেজ আক্রমণের সুবিধা পাইবে। সুতরাং হ্যানিবল এই দেশ অধিকারের জন্য সমস্ত বল প্রযুক্ত করিয়া অল্প কাল মধ্যেই তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বহু সেনাক্ষয় হইল। উক্ত প্রচুর সেনাক্ষয়ের অন্যতম কারণ এই যে বহু বিলম্বের আশঙ্কায় তাঁহাকে শত্রুনগরী সমূহকে অবরুদ্ধ না করিয়া বলসহকারেই একেবারে অধিকৃত করিয়া লন। এতদ্ব্যতীত হ্যানো নামে জনেক কার্থেজীয় সেনাপতিকে দশসহস্র সৈন্য সহ এই বিজিত প্রদেশসমূহের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইতে হইল, আর বিগত সমরে খ্যাতিলাভ করিয়াছে এরূপ কতকগুলি স্পেনীয় সৈন্য, বোধ হয় অবশিষ্ট সৈন্যকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তিনি স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ও বিগত যুদ্ধে যে বিশেষ সেনাক্ষয় হইয়াছিল, এই উভয় কারণে হ্যানিবল পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক ও নয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র লইয়া গল্ দেশে প্রবেশ করিলেন।

পিরিণিস্ হইতে রোণ নদ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইল না। এখানে উপঢৌকনাদি প্রদানে স্পেনীয় অধিপতিদিগকে বশীভূত করিলেন। কিন্তু রোণ নদের বামকূলস্থ গল জাতিরা রোমের ম্যাস্যালিয়ট্ (Massaliot) জাতির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া হ্যানিবলের গতিরোধ করিবার উপক্রম করিল। সুতরাং তিনি দেখিলেন যে এগুলিকে না পরাজিত করিতে পারিলে, তাঁহার আর অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

সিপিও ইতিমধ্যে রোণ নদের পূর্ব্বমুখের নিকট উপস্থিত হইলেন। হ্যানিবলের গতিবিধির বিষয় তিনি অত্যল্পই জ্ঞাত ছিলেন, পিসা (Pisa) নগরী হইতে রোণে আসিতে তাঁহার সৈন্যদল সমুদ্র-পীড়ায় (Sea-sickness) বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছিল। সেনা সমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত সিপিও কিয়দ্দিবস তথায় অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। হ্যানিবলকে প্রত্যেক পদে যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, এবং তিনিও তাহার পূর্ব্বেই রোমের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিবেন; এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সিপিও রোণ (Rhone) নদাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শত্রুদল কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে জানিবার নিমিত্ত তিনি তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য ও মোসলিয়ট্ জাতীর অধীনস্থ কতকগুলি গল সৈন্য রোণ নদের বাম উপকূলাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রোণ নদকে পশ্চাতে রাখিয়া রোমের দক্ষিণ দিকে শত্রুর অবস্থান নিরূপণার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন না।

কিয়দ্দিবস পরে তিনি সৈন্য স্পেনে পাঠাইয়া ও নিজে ইটালীতে ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে রোণ নদের মুখের নিকটে বসিয়া রহিলেন, আর এদিকে হ্যানিবলের বিজয়ী সৈন্যদলের গতিরোধ করিতে গলেরা বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সমুদ্র পথ হইতে যত দূরবর্ত্তী স্থান হইবে, ততই রোমানেরা তাঁহার গতিবিধি জানিতে পারিবে না এই উদ্দেশে তিনি রোমানদের স্পেন হইতে ইটালী যাইবার যে রাস্তা ছিল তন্মধ্য দিয়া না যাইয়া রোণ ও ডিউরান্স (Durance) নদীর সংযোগ স্থল দিয়া আসিলেন। নদীতীরবর্ত্তী অসভ্য জাতি সমূহকে নির্দ্ধারিত মূল্য প্রদানে নৌকা করিয়া নদী পার হইয়া গেলেন। তাহারা অন্যান্য তরী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠ আহরণ করিতেও আপত্তি করিল না। এইরূপে দুই দিবসের মধ্যেই তিনি সৈন্য পাঠাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু গলেরা পাছে তাঁহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় এই আশঙ্কায় তিনি ২২ মাইল অগ্রে কতকগুলি সৈন্যকে রোণ নদ পার হইতে অনুমতি দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে তাহাদের সম্ভবতঃ কোন শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। রোণ নদের তীরস্থ তরুরাজি কর্ত্তন করিয়া তাহারা একপ্রকার সেতু নির্ম্মিত করিয়া নিরাপদে পরপারে উত্তীর্ণ হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমস্ত প্রদেশ শৈলমালায় পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে অত্যুচ্চ

পর্ব্বতশৃঙ্গের পার্শ্বে কিয়দ্দূর সমতল ভূমি। এইরূপ এক খণ্ড সমতল ভূমিতে আসিয়া হ্যানিবলের পরিশ্রান্ত সৈন্যমণ্ডলী বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এদিকে হ্যানিবল উপরোক্ত সেনাগুলি স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়া কেবল দুই দিবস তথায় বিশ্রাম করিলেন; তৎপরে সসৈন্যে রোমাভিমুখে অগ্রসর হইতে উদ্যোগী হইলেন। এখন যে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তথায় বাধা বিপত্তি বিস্তর; কারণ সে স্থানে অভ্রংলিহ আল্‌পস্ পর্ব্বত হইতে গ্রীষ্মাবসানে বরফ গলিয়া রোণ্ নদকে স্ফীত করিয়াছে। সাধারণতঃ এই সময়ে ইতালীর দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী নদীসমূহ প্রায় শীর্ণশরীরা দেখা যায় কিন্তু উপরোক্ত কারণ বিদ্যমান থাকায় রোণ নদ উত্তাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী হইয়া প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল; সুতরাং সৈন্য ও রসদাদি পার করিবার সুবিধার জন্য বড় বড় তরিগুলির সম্মুখভাগে ছোট ছোট গুলিকে রাখিয়া নদীর প্রবল স্রোত হইতে কোন ক্রমে রক্ষা করিয়া পার করিলেন। শেষোক্ত তরীগুলিতে বাছা বাছা পদাতিক সৈন্য আর বড় বড় তরীগুলিতে অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন। আর এক এক জন নৌকারোহী তিন চারিটা অশ্বকে একত্রে এক রশ্মি সংযত করিয়া সন্তরণ করাইয়া পার করাইতেছিল। নদীর অপর পারে বিপক্ষের সৈন্যেরা হ্যানিবলের সৈন্যকে বাধা দিবে এই ভরসায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। ইত্যবসরে বিপক্ষ গল্ সৈন্যের ঠিক পশ্চাদ্ভাগে এক জ্বলন্ত ধূমশিখা তীক্ষ্ণদর্শী হ্যানিবলের লক্ষ্যগোচর হইল। পূর্ব্বপ্রেরিত সৈন্য নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহাই তাহার সঙ্কেত চিহ্ন! তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যসমূহকে পরপারে যাইতে আদেশ করিলেন।

তাহারা যত শীঘ্র পারে পরস্পর পরস্পরের কার্য্যে উৎসাহ দিয়া প্রবলস্রোতমুখে তরীগুলি বাহিয়া লইয়া চলিল। সম্মুখে গল্ সৈন্যেরা অবজ্ঞাসূচক বিকট মুখভঙ্গী করিয়া তাহাদিগকে সমরে আহ্বান ও সমর সঙ্গীত করিতেছিল, পশ্চাতে তাহাদের মিত্র পক্ষীয়েরা তাহাদের প্রায়োন্মুখ সমরে প্রোৎসাহিত করিতেছিল; কিন্তু এই সময় হঠাৎ বিপক্ষ গল্ সৈন্যের পশ্চাদ্দেশে এক ভীষণ অগ্নিশিখা দেখা গেল। গলেরা চমকিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখাতে স্পেনীয় ও আফ্রিকাবাসী সৈন্যসমূহের তীক্ষ্ণাগ্র ও শ্বেত পরিচ্ছদ তাহাদের নয়নগোচর হইল। তাহারা একেবারে আসিয়া গল্ সৈন্যের উপর পড়িল। এদিকে হ্যানিবলের সৈন্য নদীর এ পারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। হ্যানিবল লম্ফপ্রদানে কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াই অতি সত্বর আপনার সেনার ব্যূহ রচনা করিয়া চমকিত, সন্ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত গল্ সৈন্যকে চতুর্দ্দিকে সন্তাড়িত করিলেন। বিপক্ষ গল্ সৈন্যেরা কে কোথায় পলাইল তাহার ঠিকানা রহিল না। হ্যানিবল আর বৃথা সময় অতিবাহিত করা নিরর্থক বিবেচনা করিয়া নদীর পরপারস্থ অবশিষ্ট সৈন্যগুলিকে এ পারে আনিবার নিমিত্ত যে তরীগুলি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে গুলিকে পাঠাইয়া দিলেন।

সিপিও হ্যানিবলের সৈন্যমধ্যে এখন আর নদী ব্যবধান রহিল না। তৎপর দিবস অতি প্রত্যূষে শত্রুর অবস্থান, গতিবিধি ও সৈন্যবল প্রভৃতির তত্ত্ব লইবার জন্য কতকগুলি নিউমিডীয় অশ্বারোহীকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আর সিজেল্‌পাইন্ (Cisa-lpine) * আল্প্‌স্ পর্ব্বতবাসী গল্ সর্দ্দারসমূহ আসিয়া কি বলে শুনিবার নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে একত্রে আহ্বান করিলেন। তাহাদের কথা দ্বিভাষিকেরা স্পেনীয় ও আফ্রিকাবাসী সৈন্যদের বোধগম্য করাইতেছিল আর উপরোক্ত গল্ সর্দ্দারদিগের আগমনই হ্যানিবলের সন্তমগুলীর উৎসাহ বর্দ্ধনের অন্যতম কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। কারণ এই সকল লোকের আগমনে সিজেল-পাইন্ গলাভিমুখ পথ যে একেবারে অনতিক্রমনীয় তাহাদের এই পূর্ব্ব বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। আর পূর্ব্বোক্ত দ্বৈভাষিকদের মুখে গল্ সর্দ্দারগণের উহাদের দেশের মধ্যে দিয়া প্রশস্তমার্গ পরিদর্শন ও সৈন্যসমূহের খাদ্যাদি যেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এরূপ স্থানে লইয়া যাইবারও প্রতিশ্রুতি শুনিল। অবশেষে হ্যানিবলের মুখে তাহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধক অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিল। তিনি তাহাদের একত্রিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে রোমাভিমুখে অগ্রসর হইতে তাহারা যেন পশ্চাৎপদ না হয়। কার্থেজ হইতে রোমে আসিতে যে পথ নিতান্ত দুর্গম তাহা রোন্ নদ পার হইয়া অনেক সরল হইয়াছে। গলেরা যে নিতান্ত বন্ধুর ন্যায় পথপ্রদর্শক হইয়া লইয়া যাইবে, তাহার সাক্ষী স্বয়ং গল্‌দেশাধিপতিগণ তাহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। কোন ওজর আপত্তি না করিয়া এখন সকল বিষয়ে তাঁহার কথা মানিয়া কাজ করিলেই তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় সেনাদের আনন্দ কোলাহলে তাহাদের রোমে যাইবার সম্পূর্ণ সম্মতি সূচিত হইল। অতঃপর পরদিবস অতি প্রত্যূষেই আবার রোমাভিমুখে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সজ্জিত হইতে আদেশ দিয়া তাহাদের সেই রাত্রের জন্য বিদায় দিলেন।

সৈন্যগণকে বিদায় দিবার কিয়ৎকাল পরে শত্রুর অবস্থান জানিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব-প্রেরিত নিউমিডীয় সৈন্য সমূহকে অতিবেগে পলাইয়া আসিতে দেখা গেল। পূর্ব্বে যত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই হত কিম্বা আহত হইয়াছে, অনুমানে বোধ হইল যে রোমীয় সৈন্য পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া শত্রুর সেনানিবেশের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া তাহারা অশ্বের মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিল। এদিকে সিপিও এই অবশিষ্ট প্রত্যাবৃত্ত সৈন্যের মুখে শত্রুর অবস্থান নিরূপণ করিতে পারিয়া রোন্ নদের মুখে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া শনৈঃ শনৈঃ রোন্ নদের বাম উপকূলের দিকে পার হইয়া আসিয়া সন্ধানে জানিলেন হ্যানিবল্ সসৈন্যে

* গল্ রাজ্য আল্প্‌স্ পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী থাকায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। গলদেশের যে অংশ আল্পসের অপরদিকে ছিল তাহার নাম (Trans-Alpine) ও যে ভাগ ইতালীর দিকে সংস্থিত ছিল তাহার নাম (Cis-Alpine)।

সে স্থান হইতে তিন দিন প্রস্থান করিয়া উত্তর দিক্ দিয়া রোনের বাম উপকূলের দিকে গল্‌রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এ সময় অজানিত শত্রুমধ্যে সৈন্য লইয়া গমন করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। একে গলেরা বড় ভয়ানক জাতি;—বিদেশী সৈন্যমাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত; তাহাতে রোমের উপর তাহাদের যে দারুণ সম্প্রীতি, এ সমস্ত কারণে উহাদের দেশ দিয়া যাইতে তাঁহার ভরসা হইল না। এখন যদি হ্যানিবলের গতি রোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা বুঝিলেন। রোন্ নদী হইতে পীসা (Pisa) নগরী যাইতে সোজা পথ কিন্তু গল্‌দিগের দেশের মধ্যে দিয়া যাইতে হইলে হ্যানিবলকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে ও তাহারা দুর্গম গিরিসঙ্কট দিয়া সেখানে গিয়া ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পৌঁছিবে আর সম্ভবতঃ যদি হ্যানিবল্ অগ্রে গিয়া পৌঁছেন, তাহা হইলে তত্রস্থ রোমান্ সৈন্য হ্যানিবলের গতিরোধ করিবার চেষ্টা দেখিবে। এই সকল বিবেচনায় তিনি রোন্ নদী পুনর্ব্বার পার হইয়া স্পেনে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে সৈন্যগুলি পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং প্ল্যাসিণ্টিয়া (Placentia) ও ক্রিমোনা (Cremona) নামক স্থানে ম্যান্‌লিয়স্ (Manlius) আটিলস্ (Attilus) নামা পূর্ব্বোক্ত প্রিটারদ্বয়ের অধীনে যে পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য ছিল, সে স্থানে যাইয়া সেই সৈন্যভার গ্রহণ করিলেন।

স্পেনে ভ্রাতার অধীনে সৈন্য পাঠাইয়া ও নিজে (Cis-Alpine) সিসাল্‌পাইন্ গলে আসিয়া সিপিও যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা, তাঁহার বিচক্ষণ সমরবুদ্ধি ও আশ্চর্য্য সেনানেতৃত্বের জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বস্তুতঃ এ বিপদের সময় এরূপ অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার কার্য্য না করিলে রোমের সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিতা হইতেন সন্দেহ নাই। যদিচ কার্য্যগতিকে তাঁহার কলকৌশল সকল হ্যানিবলের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ রণকৌশলে সম্যক্ ব্যর্থ হইয়াছিল, তথাপি রোমের কথা ভাবিতে গেলে তাঁহার কার্য্য সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত বলিয়াই বোধ হয়! কারণ সিপিও যদি স্পেনে সৈন্য না পাঠাইয়া রোন্ মুখে হ্যানিবলের গতিরোধ করিবার জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতেন আর এ দিকে বীরাগ্রণী হ্যানিবল্ ও তদীয় ভ্রাতার অধীনে সৈন্য সকল শিক্ষিত হইয়া স্পেনের বল বর্দ্ধিত করিত, তাহা হইলে রোমানেরা কদাচ কার্থেজের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইত না। আর বোধ হয় ভবিষ্যতে সিপিওর পুত্রও জ্যামা-বিজেতা বলিয়া জগতে অতুল খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ স্থল।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

একাল ও একালের মেয়ে।

অধিক আর কিছু বলিবার নাই, একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিবেন যে কালের পরিবর্ত্তনে ও ইংরাজ রাজা হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার গতিরোধ মানুষের অসাধ্য। আমাদের নব্য সম্প্রদায় ইংরাজী সম্প্রদায় দেখিয়া মুগ্ধ। তাঁহারা যথাসাধ্য সেইরূপ ধরণ ধারণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ সুখী না হইতে পারিয়া বোধ হয় মহিলাদিগকে সকল অসুখের মূল বিবেচনা করিতেছেন। রমণীগণ চিরকালই পুরুষদিগের আশ্রিত ও তাহারা যে চিরকালই পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া থাকেন,তাহা কাহারো মনে হইতেছে না। আমাদের বাঙ্গালী যুবকদিগের রুচি রীতিনীতি আচার ব্যবহার অনুসারেই একালের মেয়ে গঠিত হইতেছে। লাল কস্তাপেড়ে সাড়ি পরা, মাথায় চওড়া সিন্দুর, কপালে বৃহৎ সিন্দুর টিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্ণবর্ণ ঠোঁট, হাতে শাঁখা, পায়ে দুগাছা মল—ঝোঁটন করিয়া খোপাবাঁধা স্ত্রীর সহিত, বোধ করি একালের স্বামী বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক ঘরে ঢুকিতেও দিবেন না। তাঁহারা অতীত কালের মহিলাদের গুণটুকু মাত্র স্মরণ করিয়া, একালের মেয়েদের উপর নানাবিধ দোষার্পণ করিতেছেন। বাস্তবিক ঐ সকল দোষে মহিলারা দোষী কি না—বাস্তবিক মহিলাদের নিজস্ব সম্পত্তি, মায়া মমতা, স্নেহ ভালবাসা একালের মেয়েদের আছে কি না তাহা কেহ কখনো ভাবিয়াও দেখেন না। হাতের কাছে কলম পাইলেই একালের মেয়ে সম্বন্ধে যাহা মনে আসে লিখিয়া ফেলেন। কিন্তু একালের মেয়ে সেকালের মেয়ের মত হইতে পারে না, এবং হইলেও তাঁহাদের উপর অধিকতর অনুরাগী হওয়া নব্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অসম্ভব। দূর হইতে—লেপা পোছা উঠান—চালে লাউগাছ, মাচায় শসাগাছ, আশে পাশে কামিনীফুলের গাছ, লেবু গাছ, দু চারটী বেল ও যুঁইয়ের গাছ-বেষ্টিত কুটীরখানি দেখিয়া আমরা কল্পনায় কতবার ঐ কুটীরে বাস করিতে কত না সাধ করিয়া থাকি, নিজেদের কোঠাবাড়ির ইট কাটের উপর কত তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ করি। কিন্তু বাস্তবিক যদি কোঠাবাড়ি ছাড়িয়া ঐ কুটীরে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তখন তাহার সমস্ত অসুবিধা আমরা জানিতে পারি। তখন কুটীরে বাস যে কতটা কষ্টকর এবং আমাদের পক্ষে কতদূর অসম্ভব তাহা বুঝিতে পারি। এখনো পল্লীগ্রামে প্রতি গৃহস্থ বধূরা বাসন মাজে, রাঁধে, ধান সিদ্ধ করে, উঠান ঝাঁট দেয়, গরুর সেবা করে। কিন্তু বল দেখি কয়জন গৃহস্থ পুরুষ, গরুর দড়ি ধরিয়া চরাইয়া বেড়ায়—কাটারি দিয়া বাঁশ কাটিয়া বাগানের বেড়া দিয়া থাকে? কয়জন পুরুষ ছাতা জুতা ব্যতীত টোকা মাথায়, খড়ম পায়ে দিয়া পথ চলিতে অপমান বিবেচনা করেন না? চাসাভুষার ঘরেও অন্তত একটী কামিজ নাই, এমন ব্যক্তি কয়জন আছে? কিন্তু তাহাদের মেয়েরা জ্যাকেট একটা বৃহৎ জানোয়ার কি বিলাতী খাবার তাহা জানে না। তুমি আজ যদি

আদর করিয়া তোমার মেয়েকে পূজার সময় একটী জ্যাকেট কিনিয়া দাও তাহা হইলে সে শ্বশুরবাড়ী হইতেও কি দোলের সময় আর একটী জ্যাকেটের প্রার্থী হইবে না—এবং মেয়ের মা হইয়া স্বামীর নিকট সন্তানদের পোষাকের জন্য দৌরাত্ম্য করিবে না? অনেকে মেয়েদের লেখা পড়া শিক্ষার বিরোধী কিন্তু এখন ছোট ছোট মেয়েদের লেখা পড়া শেখান হইয়া থাকে, পাড়ায় পাড়ায় স্কুল পাঠশালা বিরাজিত। পিতামাতা ভাবেন, "আহা পরের ঘরে যাবে,—একটু লিখিতে পড়িতে শিখুক—এর পর তবু দুটো মনের কথা লিখেও তো জানাতে পারবে,—পরের খোসামোদ করতে হবে না।" শুদ্ধ তাহা নহে, একালে কন্যা দেখিতে আসিয়া, "তোমার নাম কি" জিজ্ঞাসা করিয়া "যাও মা উঠে যাও" ইহা কেহ বলেন না। তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করিয়া মেয়েটী বোবা কি না, পরীক্ষা করা হইল। এখন বুদ্ধি শুদ্ধি কেমন তাহারও তো পরীক্ষা চাই "কি পড়" তাহার প্রশ্ন। একটু পড়া শুনা জানা না থাকিলে একালের মেয়ের বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত দায়। অধিকাংশ এম, এ, বি, এর, ধনুর্ভঙ্গ পণ যেন শুধু রূপ দেখে না বিয়ে দেওয়া হয়, লেখা পড়া জানা চাই। বিবাহের সময় শিক্ষিত বর অশিক্ষিত কনে, অর্থাৎ কিছুই পড়িতে লিখিতে পারে না, শুনিলে অতিশয় দুঃখিত হন। তিনি বাসর ঘরে শালী শালাজদের কনেকে লেখা পড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। ফুলশয্যা বাদে বর্ণপরিচয় প্রথম দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেন—এবং বারবার লেখেন যেন লেখা পড়াটা শেখান হয়। বালিকার বিবাহ হইয়াছে, আর স্কুল যাইবার নিয়ম নাই, সুতরাং স্কুলের ভয় বা বন্ধন নাই—তাহার পুতুল খেলায় মন,—সেও পড়িবে না, মাতাও ছাড়িবেন না—ভয় পাছে জামাই রাগ করে। তিনি কর্ত্তাকে পেড়াপিড়ী করেন—"ওগো মেয়েটাকে একটু পড়াও না" ছেলেকে বলেন, "ওরে সুশীকে সকাল বিকেল তোর কাছে বইখানা নিয়ে বসাতে পারিস্ নে," দুপুর বেলা পাড়ার বিদ্যাবতী মহিলাদের সাধ্যসাধনা করিয়া বালিকাকে লেখা পড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। এদিকে "ক খ" আরম্ভ না হইতে হইতে বরের নিকট হইতে মস্ত মস্ত প্রেমলিপি আসিতে আরম্ভ হইল। বিষম বিভ্রাট, কন্যার মাতা প্রমাদ গণিলেন, বাপ মেয়েকে লেখা পড়া শেখান নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পাড়ার মেয়েরা উক্ত পত্রের উত্তর দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন,—কেহ, ভাল কবিতা খোঁজেন, কেহ গান পছন্দ করেন,—তাঁহাদের দিন গুলা বেশ আমোদে কাটিল,—দেখিয়া শুনিয়া ঠাট্টার হাসিতে মেয়েটা লজ্জায় সারা হইল। তাই বলি একটু লেখাপড়া না জানা থাকিলে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত দায়। তবে যদি লেখা পড়াই শিথিল, তাহা হইলে একালের মেয়ের ভাব ও রুচির পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

এ বিষয়ে আর অধিক কত বলিব, এইখানেই ইতি করা যাক্, শেষ কথা এই যে একালের মেয়ে একালেরই উপযোগী।

শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।

প্রিন্স্ আলবার্ট ভিক্টর।

মহারাণীর পৌত্র, প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ডিউক অব্ ক্লারেন্সের অকাল মৃত্যুর কথা ভারতীর পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতেছি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে ফ্রগমোর নামক স্থানে উক্ত রাজকুমারের জন্ম হয়। কিন্তু তখনও তাঁহার জন্মিবার কালপূর্ণ হয় নাই; সেই নিমিত্ত তাঁহার জন্ম সময়ে চিকিৎসকাদি রাজকর্ম্মচারীরা কেহই উপস্থিত ছিলেন না। উইণ্ডসরের ডাক্তার ব্রাউন নামক চিকিৎসককে কেবল তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনা হয়; নয়টা বাজিবার দুই মিনিট পূর্ব্বে রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় লর্ড গ্রাণ্ভিল্ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন; তিনিই রাজকুমারের জন্মের সাক্ষী রহিলেন। পরদিন লণ্ডনে যখন শুভসংবাদ পৌঁহুছিল, তখন সহরের গির্জার গির্জায় আনন্দের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, পার্কে তোপধ্বনি উঠিল, হাউস্ অব্ লর্ডস্ তখনকার লর্ড ডার্বি ইংলণ্ডের সিংহাসন যাহাতে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ এবং তাঁহার নবজাত পুত্রের উত্তরাধিকারীগণ বহুকাল ধরিয়া উপভোগ করেন এই উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর ১০ই মার্চ্চ তারিখে, প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের বিবাহের প্রথম সাম্বাৎসরিক উৎসব দিনে, বকিংহাম প্রাসাদে রাজশিশুর নামকরণ কার্য্য সমাধা হয়। মহারাণী তাঁহার পৌত্রের নাম আলবার্ট ভিক্টর ক্রিষ্টিয়ান এড্ওয়ার্ড রাখিলেন।

রাজকুমারের শৈশবাবস্থা সাণ্ডিংহাম নামক স্থানে অতিবাহিত হয়; তাঁহার সতরমাস বয়ঃক্রমকালে তাঁহার ভ্রাতা রাজকুমার জর্জ্জের জন্ম হয়। দুই ভ্রাতার শিক্ষার ভার রেভরেণ্ড জন নীল্ ডল্টন নামক এক পাদরির হস্তে অর্পিত হয়। রাজকুমার আলবার্ট ভিক্টরের দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের উৎকট ব্যারাম উপস্থিত হয়; সে সময়ের কথা তিনি কখনও ভুলেন নাই। ১৮৭৭ অব্দে রাজকুমার মহারাণীর ব্রিটানিয়া নামক জাহাজে নাবিক হইয়া প্রবিষ্ট হয়েন; এবং ১৮৭৯ অব্দে ৬ই আগষ্ট তারিখে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা জর্জ বাকাণ্টি নামক জাহাজের নাবিকতা গ্রহণ করেন। জাহাজে এইরূপ সামান্য নাবিক হইবার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহারা যাহাতে কঠোর শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। নৌ-বিদ্যা, কামান-বিদ্যা, গণিত-শাস্ত্র ও ফরাসি ভাষা এই কয়টী বিষয় তাঁহারা জাহাজে শিক্ষা পাইতেন। যতদিন তাঁহারা এইরূপ ছাত্রাবস্থায় ছিলেন, ততদিন তাঁহাদিগকে ঠিক অন্যান্য ছাত্রদিগের ন্যায় পরিশ্রম ও কার্য্য করিতে হইত। পাহারা দেওয়া, পাল টাঙ্গান, নৌকার কার্য্য ইত্যাদি জাহাজের যে

সমুদয় নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য আছে সে সমুদয়ই তাঁহারা করিতেন রাজকুমার বলিয়া তাঁহাদিগকে কোন বিষয়ে শিথিলতা করিতে দেওয়া হইত না। উল্লিখিত বাকাণ্টি জাহাজে তাঁহারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৮২ অব্দের শরৎকালে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণ সময় তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া গমন করেন, এবং তথায় মহা সমাদর লাভ করেন। ১৮৮৩ অব্দে প্রিন্স ভিক্টর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন; এক সময়ে তাঁহার পিতা ও পিতামহ ঐ বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষক ডল্টন তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার বয়স যত অধিক হইতে লাগিল, ছাত্রাবস্থার আদব কায়দাও তাঁহার নিকট ততই কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, এই সময় তাঁহার অমায়িক ভাবে সকলেই মুগ্ধ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি কালে তিনি ইতিহাসের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। তিনি কখনও আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া ভাণ করিতেন না এবং পাণ্ডিত্য লাভের আকাঙ্ক্ষাও করেন নাই। কেম্ব্রিজে যখন ছুটী হইত, তখন তিনি জার্ম্মাণি দেশের হাইডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেন। কেম্ব্রিজ পরিত্যাগ করিবার পর তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে বিনা পরীক্ষায় সম্মান সূচক এল্ এল্ ডি উপাধি দান করেন।

১৮৮৫ অব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে রাজকুমার কিশোর অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণবয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেন; সাণ্ডিংহামে তাঁহার পিতার ভবনে মহোৎসব হয়; এবং সে সময় প্রিন্স অব্ ওয়েল্স তাঁহাকে এক যোড়া বন্দুক উপহার দেন; রাজকুমার উত্তমরূপ বন্দুক ছুঁড়িতে পারিতেন।

এই উৎসবের সময় অনেক লোকে রাজকুমারকে পত্র লিখেন; তন্মধ্যে মহাত্মা গ্লাড্ষ্টোনের পত্র সর্ব্ব বিখ্যাত। রাজকুমার তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখেন যে এই উপলক্ষে তিনি যে সমুদয় উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে ঐ পত্রখানি যত আদরণীয় অন্য কিছুই তেমন নহে।

অতঃপর ১৮৮৫ অব্দে রাজকুমার দশম হসারস্ নামক সেনার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, এবং ইহার সহিত তিনি অল্ডাবসট, ইয়র্ক, ও ডব্লিন এই তিন নগরে বাস করেন। তিনি সাতিশয় যত্নসহকারে সৈনিকের কার্য্য শিক্ষা করেন এবং যথা সময়ে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বভাবগুণে সৈন্যেরা সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত; এই সময়ে তিনি নিয়মিত শীকারে যোগ দিতেন এবং ষ্টীপ্ল্চেস্ নামক ক্রীড়ায় অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইতেন।

১৮৮৯ অব্দের অক্টোবর মাসে প্রিন্স ভিক্টর আথেন্স সহরে তাঁহার পিতৃস্বসা-কন্যার বিবাহে উপস্থিত ছিলেন; পরে মিশর হইয়া নবেম্বর মাসে বোম্বে পৌঁছেন। এ দেশে তিনি কিরূপ সমাদরে পরিগৃহীত হয়েন, তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। অতঃপর মার্চ্চ মাসে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। তাঁহাকে এদেশে যেরূপ সম্মান ও সমাদর

করা হয় তাহাতে তিনি এখানকার অধিবাসীদিগের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠার নিদর্শন প্রাপ্ত হয়েন। যখন মে মাসে (১৮৯০ অব্দে) তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন তখন ডিউক অব্ ক্লারেন্স ও এভন্‌ডেল এবং আর্ল অব্ আর্থলোন এই উপাধি পাইয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভায় হাউস অব্ লর্ডসে প্রবিষ্ট হয়েন। ২৩শে জুন তারিখে তিনি তথায় আসন গ্রহণ করেন। এখন হইতে রাজকুমার ইংলণ্ডের একজন গণ্য ব্যক্তি হইলেন। রাজকুমার বক্তৃতা দিতে ভাল বাসিতেন না, কিন্তু তথাচ তাঁহার পদের খাতিরে অনেক সময় তাঁহার উক্তকার্য্য করিতে হইত। হাঁসপাতাল, মেলা, ক্রীড়া ঘর ইত্যাদি খুলিবার সময় তাঁহার উপস্থিত থাকিতে ও বক্তৃতা করিতে হইত।

গত ডিসেম্বর মাসে প্রিন্সেস্ মেরি অব্ টেকের সহিত রাজকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। এবং এই শুভ কার্য্য উপলক্ষে নানাদিক হইতে নানা আয়োজন হইতেছিল; সহসা উৎসব-আনন্দ বিষাদে বিলীন হইল, চারিদিক নিরানন্দ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল; তিনি সাংঘাতিক ইন্‌ফলুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মীয়স্বজন ও সর্ব্বসাধারণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ১৪ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবারে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। উক্ত দিবস প্রাতে নয়টা দশমিনিটের সময় তাঁহার জীবন-লীলা সমাপন হয়!

মাঘ মেলা।

পবিত্র মাঘের মেলা, গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা
মরি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, রূপের তুফান!
পা দুখানি খোলাখালা, হাতে প্রদীপের থালা,
ঈষৎ ঘোমটা টানা উজল বয়ান—
বঙ্গবালা পুণ্যবতী পূজিবারে ভাগিরথী
নামিছে বন্যার ধারে সোপান লহরী;—
ভক্তের চরণস্পর্শে জাহ্নবী কাঁপিয়া হর্ষে
কল্লোলি আশীষ দান করে প্রাণ ভরি।
পুলক প্রফুল্ল প্রাণ, শতকণ্ঠে 'মা' 'মা' তান,
স্তব স্তুতি হুলুধ্বনি আনন্দ কল্লোল—
দিগন্ত ধ্বনিয়া ছোটে, স্বর্গে উথলিয়া উঠে,
অচেতন জাগে পেয়ে চেতনা হিল্লোল।

উপকূলে সার সার শোভিছে দীপের হার
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে উৎসর্গ দেউটি;
মহোৎসবে হুলস্থূল, রাতে যেন দিন ভুল!
জলস্থলে আলোকের ফুল ফোটাফুটি!
বুঝি বা স্বর্গের তারা মন্ত্রাহ্বানে আত্মহারা
ধরায় ফুটেছে আসি দেবী পদতলে—
সমাপি এ পুণ্য কর্ম্ম, লভিবে নূতন জন্ম,
বিসর্জ্জি জীবন আজ জাহ্নবীর জলে!

* * * * *

১

সুবিজন নিরালয় ঠাঁই
প্রমোদ উৎসব হেথা নাই
স্নান করে বিধবা একাকী
সঙ্গে মেয়ে বালিকা বড়াই।

২

অষ্টম বর্ষীয়া বালা
উমা যেন, স্বর্ণলতা নাম,
মিষ্ট মিষ্ট আধো বাধো কথা
নাহি তবু কথার বিরাম!

৩

উপকূলে বসিয়া বালিকা
জ্বালাইছে পূজার প্রদীপ,
এই জ্বলে এই নিভে যায়,
দু একটি করে টিপ্ টিপ্।

৪

করযোড়ে জপিছে জননী
'দয়াকর দয়াময়ী গঙ্গে'।
সহসা নীরব হয়ে শোনে
বালিকা কি কহিতেছে রঙ্গে!

৫

দীপ জ্বালি সারি দিয়া কূলে
নামি গঙ্গা মাগিছে সে বর,
'সীতার মত হব সতী
রামের মত পাব পতি,
ভুলে গেনু—এই যা তা পর'?

৬

মাতা কহে 'কর বাছা ব্রত
লক্ষ্মণ দেবর হয় যেন,
কৌশল্যা শাশুড়ি হোক তোর—
শ্বশুর সে দশরথ হেন।

৭

ধৈর্য্য পাস পৃথিবী সমান,
কাজ কর্ম্মে অটল সুদক্ষি,
গঙ্গা তাঁর শীতলতা দিন,
স্বামীগৃহে হয়ে থাক লক্ষ্মী'!

৮

মেয়ে কহে কাঁদিয়া তখন,
'না মা আমি করিব না বর,
শামা গেছে শ্বশুরের ঘরে
আসে না সে করে তিন সত্য।

৯

তোরে ছেড়ে যাব না মা কোথা
জানিস্ মা আমি পেমি পিশি,"
মা কহে "থামরে সর্ব্বনাশী,
ও কি কথা ক'স্ কোন দিশি?

১০

বিধবা সে তাই ঘরে আছে,
বাছা কি করিলি অকল্যাণ!
মা গঙ্গা, শিশু ও বোধ হীন
ও কথা দিওনা মনে স্থান"।

১১

ও পারে চমকে চিতানল
মা কাঁদি তাহার পানে চায়;
বালা হাসি বলে, 'দ্যাখ মাগো'
কেমন প্রদীপ ভেসে যায়!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

কুড়ান।

"ফ্রাঙ্কো প্রসিয়ান ওয়ার" আরম্ভ হইবার পর, একটি যুদ্ধে ফরাসীরা তাঁহাদের হত আহত কতকগুলি সৈন্য, বিজয়ী বিপক্ষদিগের হস্তে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। বৈকালে একজন ডাক্তার আসিয়া তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, পরীক্ষায় যাহাদের মৃত দেখিলেন তাহাদের কপালে বড় বড় অক্ষরে D লিখিয়া, আর যাহাদের আহত দেখিলেন তাহাদের কপালে W লিখিয়া চলিয়া গেলেন। আহত সৈন্যদিগকে হাঁসপাতালে পাঠান হইল, মৃতদিগকে দূরে লইয়া কবর দেওয়ার আদেশ হইল। মৃতদিগের মধ্যে একজন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, ডাক্তার ভ্রমবশতঃ তাহার কপালে D লিখিয়াছিলেন, সন্ধ্যার বাতাসে ও দীর্ঘকাল বিশ্রামে তাহার মূর্চ্ছা অপনীত হইলে সে দেখিল, কয়েক জন শব-বাহক তাহাকে কোথায় লইয়া যায়। সে কাতরতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, আমায় কোথায় নিয়ে যাও"? একজন বলিল "তুই মরেছিস্ কি না, তাই তোকে ফেল্‌তে নিয়ে যাচ্ছি; মরলে আবার কোথায় নিয়ে যায় তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? তোর মত আহাম্মক ত দুনিয়ায় আর নেই দেখ্‌চি!" কাতর স্বরে আহত সৈনিক উত্তর করিল "দোহাই তোমাদের আমাকে রক্ষা কর আমি মরিনি"। শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, অবশেষে বলিল "বেটা পণ্ডিত হয়েছে, ডাক্তারের চেয়ে বেটার নাড়ীজ্ঞানটা বেশী হ'লো, আরে নির্ব্বোধ, ডাক্তার বলে গেল তুই মরেছিস্, আর তুই কিনা খপ্ করে বলে ফেল্লি, আমি মরিনি!—বাহোবা যাহোক!!"

কর্ণওয়ালের 'কোন কয়লার খণিতে একজন মিথডিষ্ট পাদরী বক্তৃতা করিতে গিয়াছেন। যত নিম্ন শ্রেণীর কাণ্ডাকাণ্ডবিহীন পশুচরিত্র জনবুলকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সৎপথে লইয়া তাহাদিগকে মনুষ্য করা, এই মিথডিষ্ট পাদরীগণের কাজ। পাদরীসাহেব খনির ভিতর গিয়া দেখিলেন শ্বেতকায়, কৃষ্ণবদন একদল কুলী কি এক সামান্য বিষয় লইয়া মহা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একটি নূতন ও ভদ্রবেশধারী

লোক দেখিয়া তাহারা কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইল, পাদরীবর তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন "Do you know Jesus Christ?" অর্থাৎ "যিশু খৃষ্টকে কি তোমরা জান?" কুলীর দলে ভারি এক ভাবনা পড়িয়া গেল, সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল, অবশেষে সর্দ্দার কুলি অতি চিন্তাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "হোয়াট্ লম্বোর, সার?" অর্থাৎ "মশায় নম্বর টা কত?" সে ভাবিয়াছিল, যিশুখৃষ্ট হয়ত একজন কুলী হইবে, কাজেই তাহার নম্বর টা জিজ্ঞাসা করা উচিত! পাদরী মহাশয় আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, এই হতভাগ্যদিগের জন্য সৃষ্ট অনন্ত নরকের মহা বিভীষিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ধর্ম্ম মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন।

পারস্যের শাহ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার বিলাত যান। ডিসেম্বর মাসে তাঁহার লণ্ডনে অবস্থান কালীন এক দিন একটি বিখ্যাত লর্ড, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই লর্ড মহাশয়ের শাহের সহিত আলাপ ছিল, এমন কি উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে রসিকতা পর্য্যন্ত চলিত। সকালে দুজনে ঘরে বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছেন—বাহিরে শীত, কুয়াসা বরফ বৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন; লর্ড মহাশয় একটু নরম গোছের রসিকতার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না, একটু সম্ভ্রমের সহিত শাহকে বলিলেন "শুন্‌তে পাই মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ সূর্য্য পূজা করিতেন, সেটা কি সত্য?" শাহ গম্ভীরভাবে অতি সামান্য মনোযোগের সহিত উত্তর করিলেন "হাঁ, সে কথা সত্য, কিন্তু আমার পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় যদি আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ সূর্য্যের তেজোমহিমার সমুজ্জ্বল জ্যোতি অনুভব করতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁরাও সূর্য্যের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।" লর্ড মহাশয় আর কোন উত্তর করিয়াছিলেন কি না, তাহার সঠিক সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছে নাই।

সমালোচনা।

দেহাত্মিক তত্ত্ব। ডাক্তার সাহা প্রণীত।

আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠে প্রীত হইলাম। লেখক দেহতত্ত্বের কয়েকটী সার কথা চয়ন করিয়া গল্প সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। সাধারণের পাঠোপযোগী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভাষা সরল হইয়াছে। ডাক্তার সাহার যে দেহতত্ত্বে বিশেষ অধিকার আছে, তাহার আমরা উত্তম পরিচয় পাইলাম। গ্রন্থখানির রচনা সুন্দর এবং ইহাতে

চিন্তারও অসদ্ভাব নাই। মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি অতি পরিপাটী হইয়াছে। তবে গল্পচ্ছলে এতাদৃশ গুরুতর বিষয় বিবৃত করা কতদূর যুক্তিযুক্ত বলিতে পারিলাম না। অধিকন্তু গল্পেরও বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই। বরং গল্পের আড়ম্বরে অনেকস্থলে মূলকথা পরিসর পায় নাই। মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বোধ্যও হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ডাক্তার সাহার কয়েকটী কথা নিম্নে আলোচনা করিলাম। "পাপেও পুণ্যের সঞ্চার আছে, পুণ্যেও পাপের সঞ্চার আছে, অবিমিশ্র পাপপুণ্য নাই।" একথা পাপপুণ্যে কতদূর সংলগ্ন বলিতে পারিলাম না। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভালমন্দ সম্বন্ধে এ প্রকার মত সুবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে। কিন্তু অত্র এপ্রকার অসংলগ্ন কথা প্রয়োগের অর্থ বুঝিলাম না। শুদ্ধ এপ্রকার কথায় তো জ্ঞান নাই; বরং সাধারণের উপদেশ পক্ষে হানিই আছে। "There is nothing either good or bad, but thinking makes it so" হামলেটের একথার ভাব আছে, রস আছে; তত্ত্ব নাই, উপদেশ নাই, এবং তত্ত্ব ও উপদেশের জন্য বলাও হয় নাই। ইহাতে স্থান, মান, লয়ের যোগ্যতা আছে। তাই ইহার এত আদর। আমরা গ্রন্থকারের উক্ত কথার যোগ্যতা পাইলাম না। জ্ঞানকল্পে উহার বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক। "কোথায় যে জীবনের আরম্ভ, আর কোথায় যে তাহার শেষ, তাহা কে দর্শাইতে পারে?" একথা সত্য। কিন্তু "জীবনের প্রারম্ভ ও শেষ, প্রায় মৃতাবস্থার সমান" একথা আমাদের বুদ্ধিগোচর হইল না।" চিন্তা ও কার্য্যশীল মধ্যবর্ত্তী কালই জীবন নাম প্রাপ্তির যোগ্য।" এস্থলে যোগ্যাযোগ্যর কথার আবশ্যক কি। ইহাই কি জীবন? বিজ্ঞানে তো তাহা বলে না। ইহা জীবনের উচ্চক্রম-লক্ষণ হইতে পারে! বৃক্ষাদির জীবন আছে—চিন্তার লক্ষণ কোথায়? মহাত্মা গইতের ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু তাঁহার সে জীবন অর্থে জীবনের সার্থকতা। বিজ্ঞানের জীবন তাহা নহে। কার্য্যশীলতা সকল পদার্থেরই আছে; কিন্তু জীবন সকলের স্বীকার্য্য নহে। "There is not a leaf rotting on the high way but has force in it: how else could it rot?" কার্লাইলের একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। "জীবনের এক ভাগ মৃত্যু ও অপর ভাগ জীবন; আবার মৃত্যুরও এক ভাগ জীবন ও অপর ভাগ মৃত্যু।.....অতএব জীবন মৃত্যু উভয়ই সমান।" ইহা ভাবুকের কথা হইতে পারে, বৈজ্ঞানিকের নহে। "জীবনের এক ভাগ মৃত্যু" বরং বুঝা যায়; কিন্তু "মৃত্যুর এক ভাগ জীবন" বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থের শেষেও কয়েকটী জ্ঞানগর্ভ কথা আছে বটে; কিন্তু দর্শনরাজ যে ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহার কিছুই হয় নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এ মহা সমস্যা পূর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া ভোলানাথ ভুলিতে পারেন, সাধারণ পাঠকে ভুলিবেন কি না, তাহা পরে জানা যাইবে।

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

বিলাতের পত্র।

এডিনবরা।

মঙ্গলবার, ১১।৮।৯১

ভাই—দা,

আজ সন্ধ্যাবেলা এডিনবরায় ফিরে এসেছি। অনেক দিনের পর একটা যায়গায় এসে স্থির হয়ে বসে পড়ে, যেন সমুদ্র থেকে নেমে কঠিন মাটির উপর পদার্পণ করার মত ঠেকছে। এতদিন কোথাও দুই রাত্রের বেশী থাকা হয় নাই, কোন দিন খাওয়াদাওয়া কিছুই ঠিক সময়ে হয়ে উঠে নাই, কেবল বেড়াতে ও এদিক ওদিক নানা রকম দৃশ্য দেখতেই দিন কেটে গেছে।

তোমাকে বলেছিলেম যে শুক্রবার আমাদের বন্ধু সে—এখানে এসে পৌঁছিলে পর শনিবারই আমরা যাত্রা কর্‌ব। সে—যথা সময়ে লণ্ডন থেকে এসে উপস্থিত হলেন এবং তার পর আমাদের সব পরামর্শ শেষ হল। ঠিক হল, যে আপাততঃ আমরা চার জনে যাত্রা করব, তার পর গ্লাশগো হতে ব—বাবু প্রত্যাগমন করবেন, কারণ আগামী একজামিনের তাড়ায় আপাততঃ তাঁর নিতান্ত সময়াভাব।

শনিবারেই আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল; সে—, চ—, ব—ও আমি এই চারি জনে বেশ একটি সুহৃৎসমিতি পূর্ণ করা গেল। দলের নেতৃত্ব চ—বাবুকে দেওয়া হল, কেন জান? তিনি যে সকল স্থান বেশ জানেন, বা ইতিপূর্ব্বে অনেক ভ্রমণ করেছেন, তা নয়, কিন্তু তাঁর নিজের বড় ও বিষয়ে জেদ ছিল তাই, আমরা বিবাদের ভয়ে তাঁর হাতেই আমাদের ভাগ্য সমর্পণ করলেম।

আমাদের গাড়ী শীঘ্রই সব সুড়ঙ্গ (tunnel) পার হয়ে, ফোর্থ উপসাগরের কিনারা দিয়ে ফোর্থ সেতুর উপর এসে উপস্থিত হল। নবনির্ম্মিত এই আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের মহৎ কীর্ত্তির নাম বোধ হয় ঢের শুনেছ ও ছবিও দেখেছ। সেতুটা অতি প্রকাণ্ড আয়তনের, এত বড় সেতু বোধ হয় পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে, অথচ, নিতান্ত কাছে না এলে এর আসল আয়তন টের পাওয়া যায় না। বরং দূর হতে যেন ছোট হালকা ও সরু বলে বোধ হয়। ইতি পূর্ব্বে একদিন ষ্টীমারে করে সেতু দেখতে এসেছিলেম, সে দিন নীলাকাশের উপর আঁকা যেন একটি পাতলা, ছোট সেতুর মত দেখিয়েছিল, এত সুন্দর যে সেদিক হতে চোখ ফেরাতে পারি নি। এই আশ্চর্য্য সেতু পার হয়ে, আমাদের গাড়ী দ্রুতবেগে যেন বারবার ফোর্থ নদীর তরঙ্গ পার হতে হতে সমতল ভূমির উপর দিয়ে চল্লো। দুই দিকেই কেবল শস্যপূর্ণ মাঠ, অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, আর মাঝে ফোর্থ নদীর শুভ্র জলরাশি ঘুরতে ঘুরতে চলেছে। দূরে বামদিকে হাইল্যাণ্ডের

(Highland) অভ্রংলিহ পর্ব্বতরাজি, পৃথিবীর এক ধারের প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে, দক্ষিণে, পশ্চিম গ্রম্পিয়ানের (Western Grampians) নীলবর্ণ মূর্ত্তি, যেন ভূমিতে অবতীর্ণ আকাশের রূপভেদের মত দেখায়। দুই ধারে এই রকম পাহাড় অনেক দূর পর্য্যন্ত চলেছে, মাঝে প্রকাণ্ড এক সমতল ভূমি, এবং তার মধ্যে ফোর্থ নদী। এই উপত্যকার মাঝে একটা মাত্র ছোট পাহাড় আছে, তার উপর ষ্টার্লিং (Stirling) সহর অবস্থিত। আমরা যথা সময়ে তথায় উপনীত হলেম, এবং ষ্টেসনে ব্যাগ প্রভৃতি রেখে চ—র সঙ্গে সঙ্গে বাসা খুঁজতে চল্লেম। অবশেষে অনেক ঘোরা হাঁটার পর একটি Temperance হোটেলে থাকাই স্থির হল। এর পর সকল স্থানেই এই রকমে চ—বাসা স্থির করতেন।

ভ্রমণেচ্ছার আবেগে, তখনই সকলে মিলে সহর দেখতে যাওয়া গেল। সহরে দেখবার পদার্থ বিশেষ কিছুই নেই, তবে গোটা কত যুদ্ধ নিকটেই হয়েছিল, তাই সহরের এত নাম। ইতিহাসের বিখ্যাত Stirling Castle দেখতে গেলেম; দুর্গটা বিশেষ কিছুই আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। দুই একটা রক্তপাতের চিহ্ন, অন্ধকার ঘর ও গোটাকত অন্ধকার কারাগার, যা সকল দুর্গেই দেখা যায় তা এখানেও দেখা গেল, এবং তাদের সবিশেষ ইতিহাস, প্রদর্শকের (Guide) মুখে শোনা গেল। তার পর একটা ছোট পাহাড়ের উপর Beheading stone বলে একটা লোহার রেলিং দ্বারা বেষ্টিত পাথর দেখতে গেলাম; সেখানে নাকি, পূর্ব্বকালে যত বিদ্রোহীদিগের মাথা কাটা হত, এবং তাদের রক্ত-চিহ্ন আজও নাকি দেখা যায়। আমার চক্ষুতে ত দেখা গেল না, এবং শুনলেম নাকি যে কে একজন Spectroscope দ্বারা পরীক্ষা করে বলেছে, রক্তের নাম গন্ধও নেই, তাই তার পর থেকে স্বদেশানুরাগী স্কচগণ সেটাকে লোহার রেলিংএ বদ্ধ করেছে!

সন্ধ্যার সময় শুনলেম যে ষ্টার্লিং-এর বাৎসরিক মেলা একদিন আগে মাত্র শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু নিকটস্থ ব্রিজ অব অ্যাল্যান্ (Bridge of Allan) সহরে আজ বড় ধুমধাম ও মেলা হচ্চে। শ্রবণ মাত্র, সকলেই ট্রামে উঠে, তথাভিমুখে চল্লেম—পথে লোকের ভিড় দেখে কিন্তু স্পষ্ট বোধ হল যে এতক্ষণে নিশ্চয়ই মেলা ভঙ্গ হয়ে গেছে, কেননা সকলেই ষ্টার্লিং অভিমুখে চলেছে। গাড়ী আধপথ যেতে না যেতেই, অনেক লোক উঠে, গাড়ী ফেরাতে বল্লে। আমরা চারজনে আপত্তি কল্লেম, পরিশেষে যখন দেখলেম যে খেলা হয়ে গেছে আমাদের যাওয়া বৃথা, তখন আমরাও সম্মতি দিলেম। প্রত্যাগমন কালে এত লোক গাড়ীতে উঠেছিল, যে অর্দ্ধেক লোককে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে ঝুলতে হয়েছিল; দু একজন ঘোড়ার স্কন্ধদেশও আক্রমণ করেছিলেন। খানিক পরে সকলে মিলে স্বদেশীয় গান জুড়ে দিলে। সেই ধূলায়, চীৎকারে, ভিড়ে ও ঠেলাঠেলিতে, ব্রিজ অব অ্যাল্যানের মেলা আমাদের মনে দৃঢ়াঙ্কিত হয়ে আছে। অনেক কষ্টের পর বাসায় এসে একটু সুস্থ হওয়া গেল।

ষ্টার্লিংয়ে থাকতে একদিন ব্যানকবর্ণের (Bannockburn) যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলেম। এখন ত যুদ্ধক্ষেত্র, বার্লি ও গমের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মাঝে কেবল এক জায়গায় ব্রুসের বিখ্যাত বোরষ্টোন (Boarstone) রেলিং দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে; যুদ্ধাবসানে যেখানে রবার্ট ব্রুস স্বহস্তে ধ্বজারোপণ করেছিলেন, আজ সেইখানে একটা Union Jack উড়ছে। সেখান হতে কিছু দূরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পাদক ওয়ালেসের স্মরণস্তম্ভ। আমরা বৈকালে সে দিকে বেড়াতে গিয়ে পথে একটা কুটীরে বসে, যে রকম ষ্ট্রবেরী খেয়েছিলেম, তা শুনে তোমার বোধ হয় লোভ হবে। মনে কর একটা ফলের বাগান, তাতে ষ্ট্রবেরি, গুজবেরি, ব্ল্যাকবেরি, আপেল, পেয়ার ও পীচ, শত শত ফ'লে রয়েছে; মাঝে মাঝে নানারকমের ফুলের শোভা। বেড়ার একধারে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, আর এক ধারে একপাল গোরু চরছে। আমরা শান্ত হয়ে কুটীরের দ্বারে গেলেম; অতিথি-পরায়ণ স্কচ বাগানের একটা বেঞ্চে আমাদের বসতে বল্লে, এবং কন্যাদের ডেকে, একজনকে ক্ষেত থেকে ষ্ট্রবেরী পেড়ে আনতে ও আর একজনকে দুধ দুইতে আদেশ দিলেন। সেই টাটকা ষ্ট্রবেরী ও গরম সদ্য দোহিত দুধ, যে কত ভাল লেগেছিল তা বলতে পারি নে। তুমি সঙ্গে থাকলে যে কতদূর আমোদিত হতে তা বেশ অনুভব করতে পারছি। সে—ত এক পাত্র খেয়ে সন্তুষ্ট নয়; আবার চাইতে গেল। বৃদ্ধ স্কচ এসে ফের আর এক পাত্র করে সকলকেই দিলে। আসবার সময় বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে তার হাতে দু একটা রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা গেল; কোথায় সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের বিদায় দেবে, তা না উল্টে আরও দাম দাবি করে বসলো! "Wily" স্কচদের কাণ্ডই এই! যা হউক, দাম দিয়ে ত চলে এসে বন্ধুবরের দুর্ব্বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে বাসায় ফিরে এলাম। ইংলণ্ডের কুটীরবাসীরা এর চেয়ে ঢের বেশী অতিথিপরায়ণ। কম্বার্ল্যাণ্ডে একদিন হেলভেলিন্ পর্ব্বত থেকে নেমে নিতান্ত শ্রান্ত ও পিপাসায় কাতর হয়ে এক মেষপালকের কুটীরে যে রকম সাদর সৎকার পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে বৃদ্ধ স্কচের সৎকার বিলক্ষণ ভিন্ন রকমের। মেষপালক ও তাহারস্ত্রী কোনও রকমে কিছু গ্রহণ করলে না, এমন কি ছোট মেয়েটিকেও কিছু নিতে বারণ করে দিলে।

সে যাহা হউক আমরা তার পর দিন ষ্টার্লিং সহর ছেড়ে স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত হ্রদ লমণ্ড ও ক্যাট্রিনের অভিমুখে যাত্রা করলেম। সেখানকার হ্রদ ও পর্ব্বতরাজির সৌন্দর্য্য বর্ণনা আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর কর্ম্ম নয়। ট্রস্যাক্সের অরণ্যানী, লক ভেনাখার, ব্রিগ্ও টর্ক, লক ক্যাট্রিন্ ও লমণ্ড সার ওয়ালটার স্কটের পাঠকগণের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। স্বভাবের সৌন্দর্য্য এই সব জায়গায় যেমন, তেমন বোধ হয় সমস্ত ইংলণ্ডে আর কোথাও দেখা যায় না। যদিও ভারতের হিমাচলের কাছে স্কটলণ্ডের হাইলাণ্ড শোভা পায় না, সুইটজারলাণ্ডের আল্‌স্ পর্ব্বতের কাছে দাঁড়াতে পারে না; সেরূপ গাম্ভীর্য্য, সেরূপ sublimity স্কটলণ্ডে যদিও দেখা যায় না;

এখানে সবই যদিও ছোট আয়তনের, কিন্তু এইরূপ ছোট আয়তনের জন্যই এ জায়গা গুলি আরও বেশি সুন্দর দেখায়; একেবারে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, যেন ছবির মত দেখায়। কতকগুলি জায়গার ছবি, আমার মনে এমন শক্ত হয়ে অঙ্কিত হয়ে গেছে যে কখনও ভুলব মনে হয় না। তার বিবরণ আমি আর অধিক কি লিখব, যদি জানতে ইচ্ছা হয় তবে ফের একবার সার ওয়ালটার স্কটের লেডী অব দি লেক ও রব রয় পড়। সেই এলেনের কুঞ্জবন ও ভূতের গুহা (goblin's cave) এখনও সেই শোভায় আবৃত রয়েছে।

অবশেষে সেই দিন সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ নয়টার পর লক লমণ্ডের কূলে ইন্‌ভার্সনেড্ (Inversnaid) নামক একজায়গায় এসে একটু বিশ্রাম করতে পাওয়া গেল। আমাদের বিশ্রামের যে সবিশেষ প্রয়োজন ছিল তার আর সন্দেহ নেই। শেষ পথটায় বড়ই আমোদ হয়েছিল। আমরা একটা কোচ গাড়ীতে আসছি; গাড়ীগুলা অতি সামান্য রকমের, অর্থাৎ চাকার উপর একটা প্লাটফর্ম ও তার উপর গোটাকতক বেঞ্চ মাত্র, ছাত নেই; আমরা অল্প দূর মাত্র এসেছি, এমন সময় খুব বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমাদের ত ছাতার ভিতর আশ্রয় নিতে হল—, ছাতার ভিতর খুব বৃষ্টির সময় আশ্রয় লওয়া কি রকমের তা বোধ হয় তুমি বেশ জান; অধিক বলবার দরকার নাই। তবে এইটুক না বলে থাকতে পারছিনে, যে ছাতার কোণ্ থেকে মুষলধারে যে রূপ স্রোত বইতে লাগল, আকাশের জলের চেয়ে তার তোড় ঢের বেশী। আমার ছাতার এক কোণ্ সামনের বেঞ্চের এক জন লোকের ঘাড়ের ঠিক উপরেই ছিল; সেটা ইচ্ছাবশতঃ কি অনিচ্ছাবশতঃ হয়েছিল, সেটা তুমিই বিচার করতে পারবে। যাহক সে লোকটা কিছু বেশীমাত্রায় হুইস্কি বোতলের সেবা পরায়ণ হয়েছিল—সে ত খানিক ক্ষণ কোন খবরই নিলে না—তার পর সহসা পার্শ্বোপবিষ্টা পত্নীকে সম্ভাষণ করে বলে উঠল যে এই রকম স্রোত যদি কিছু অধিক ক্ষণ বইতে থাকে তা হলে সে কাপড় চোপড় পরিত্যাগ করে সন্তরণ দিতে আরম্ভ করবে। এ কথাটা পরিহাসচ্ছলে বলেছিল কি না জানি না, কিন্তু তার পত্নী সেটা পরিহাস বলে গ্রহণ করে নাই। আমারই অন্যায় দেখে ছাতার কোণ্টা স্কন্ধ দেশ থেকে সরিয়ে ঠিক তার হাতের আস্তিনের উপর রাখলেম। এবার লোকটা একেবারেই স্রোতোবেগ সহ্য করতে না পেরে যথার্থই সাঁতারের উদ্যোগ আরম্ভ করলে। অনেক কষ্টে, অনেক সান্ত্বনার পর কিছু স্থির হয়ে, স্রোতের কারণ ঠিক করতে ঊর্দ্ধমুখ হল—কিন্তু নাকে চোখে মুখে ছাতার জল পড়ায় তখনি তাকে অধোমুখ হতে হোল। এরপর সে যা বলতে আরম্ভ করলে, তা এখানে লেখা অনাবশ্যক।

যাহক, অবশেষে ত ইন্‌ভার্সনেডে এসে বিশ্রাম করা গেল। আহারাদির পর বনে রবরয়ের গুহা ও ইন্‌ভার্সনেডের বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া গেল। তখন রাত দশটা হবে, কিন্তু সন্ধ্যার আলোক যথেষ্ট ছিল, ও আকাশে শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশীর

চাঁদ শোভা পাচ্ছিল। বনের মধ্যে, জলপ্রপাতের জল, চাঁদের আলোকে, হীরার মত কি সুন্দর ঝক্‌মক্ করছিল। চ—ত মনের আনন্দে গান জুড়ে দিলেন।

পর দিন প্রাতে লমণ্ড হ্রদে বেড়াবার জন্য আমরা তিন জনে একটা ক্ষুদ্র তরণী নিয়ে নিজেরাই বাইতে বাইতে চল্লেম। অল্প দূর যেতে না যেতেই সে—বাবু গলা ছেড়ে "ভাসিয়ে দে তরী" আরম্ভ করলেন। দুধারের পাহাড় থেকে সে শব্দ আবার ফিরে আসতে লাগল। চাঁদের আলোকে চারিদিকের বন যত সুন্দর দেখিয়েছিল সূর্য্যালোকে পর্ব্বত ও হ্রদ তার চেয়েও শোভাময় দেখাচ্ছিল। দাঁড় বাইবার বিদ্যা আমাদের সকলেরই সমান; সে—কিছু পারিত, কিন্তু গানে ব্যস্ত থাকায় তাকে আর বাইবার জন্য বিশেষ পীড়াপিড়ি করলেম না; ব—একেবারেই বাইতে জানে না, তাই তার হাতে হালটা দেওয়া গেল ও তার পর চ—তে আমাতে মহা তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হোল—কিরূপ ক'রে দাঁড় টানাটা ঠিক বিজ্ঞান সঙ্গত; তর্কের তোড়ে ক্রমে গানটান ত সমস্ত থেমে গেল, হাতা হাতি হবার উদ্যোগ হয় আর কি, নৌকা ত উল্টাবার দেরি নাই এমন সময় আমাদের উভয়েরই মনে পড়ে গেল যে সকাল অবধি কিছুই খাওয়া হয় নাই, অতএব, নৌকা না উল্টিয়ে, ফিরে গিয়ে আহারের চেষ্টা দেখলেই ভাল হয়। দুজনের হঠাৎ এরকম মনের মিল হওয়াতে সমস্ত গোল তখনি মিটে গেল। আমরা শীঘ্রই নৌকা থেকে মাটিতে নামলেন। মনের মিলের মত সংসারে আর কিছুই নেই!

আমার বড় ইচ্ছা ছিল, বেন লমণ্ড পর্ব্বতের (Ben Lomond) উপর আরোহণ করি। কিন্তু দিনটা কুয়াসায় আবৃত থাকায় সে ইচ্ছা পূর্ণ করতে সাহস হোল না। সেই দিনই, ষ্টীমার ও রেলে গ্ল্যাসগো সহরে আসা গেল। ব—সেই খান থেকেই বিদায় নিলেন, বিষাদিত চিত্তে, তাহাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আমরা ক্ষুণ্ণ মনে বাসা স্থির করতে গেলেম। চ—এর পরামর্শ অনুসারে অনেক নিষ্ফল অন্বেষণ ও ভ্রমণের পর একস্থানে বাসা ঠিক হোল। দিন কয়েক ঐ সহরের সব দেখে শুনেই দিন কাটান গেল।

তার পর সেখান থেকে ষ্টিমারে ওবান (Oban) নগরাভিমুখে যাত্রা করলেম। ষ্টিমার গ্ল্যাসগো সহরের মধ্য দিয়ে, দুর্গন্ধ লালজলপূর্ণ ক্লাইড (Clyde) নদীর উপর দিয়ে চললো। লণ্ডনের কাছে টেমস্, নদীর মধ্যে ওজন্য বিখ্যাত, কিন্তু ক্লাইডের মত জল এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হয়েছিল এক বোতল জল তুলে নিয়ে আমাদের রাসায়ণবিৎ ব—কে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তাঁর বাসার লোকের সে জল পরীক্ষায় অত্যন্ত অমত থাকতে পারে ভেবে নিবৃত্ত হলেম। যাহক বড় অধিকদূর এ রকম জল নয়; পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজের কারখানা ছাড়িয়ে ডনুন (Dunoon) নামক জায়গায় এসে সমুদ্রের লোনা জল পাওয়া গেল। তার পর দুচার জায়গায় থেমে একবারে সমুদ্রে এসে বুট দ্বীপের (Isle of

Bute) ধার দিয়ে উত্তরাভিমুখে চল্লেম। দুই পার্শ্বেই বড় সুন্দর পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক আধখানা গ্রাম—কোথাও পাহাড় কেবল ঘাসে আবৃত কোথাও বা দু একটা স্কচ ফার (Scotch Fir) বা ঝাউ গাছ দেখা যায়, কোথাও বা একেবারে ঘন পাইন গাছের (Pine) বন পাহাড় ছেয়ে মেঘের মত রয়েছে। জন মানব কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা গেলে দু একটা চাষা কি মেষপালক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ জায়গাটার নাম কাইল্‌স্ অব বুট (Kyles of Bute)। রথসে (Rothesay) নগর স্কটলণ্ডের ব্রাইটন (Brighton) বলে বিখ্যাত; সেটা এই দ্বীপেই অবস্থিত, আমরা শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হলেম। এই সময়ে সহসা আমি সে—কে কোথাও দেখতে পেলেম না; চারিদিকে অনেক খোঁজা খুজির পর দেখি যে ডেকের এক কোণে সে—একটি ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত! আমি ত আশ্চর্য্য হলেম কেননা জানই ত সে—আমাদের মধ্যে কিরূপ লাজুক—তিনি যে একজন অপরিচিত রমণীর সঙ্গে সহসা গল্প আরম্ভ করে দেবেন তা আমি মনেও করি নি। তার পর কাছে গিয়ে দেখি যে মহিলাটি আর কেহ নয়, আমাদেরই পূর্ব্ব পরিচিত মিসেস্ ক্রষ্টি (Mrs. Christie); তাঁহাকে মনে আছে বোধ হয়—আমাদের সঙ্গে ডোমিনো (Domino) খেলতে বড় ভালবাসতেন। তাঁদের বাড়ী গ্ল্যাসগো সহরেই। আমিও গিয়ে সম্ভাষণাদি করে, গল্প আরম্ভ করে দিলাম; তিনি, দুই দিকের সমস্ত স্থানের নাম ও বিবরণ বলে দিলেন এবং সেদিন তিনি আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে থাকায় আমাদের আর গাইড্ বুকের আবশ্যক হয় নাই।

ষ্টীমার শীঘ্রই আর্দ্রিশ্রাগে (Ardrishrag) পঁহুছিল। সেখানে এই বড় ষ্টিমার থেকে নেমে লিনেট্ (Linnet) বলে একটা ছোট, ষ্টীমারে উঠে ক্রীনান খাল দিয়া চল্লেম, এ খালটা এত ছোট যে আমাদের দেশের দুখান বজরা এ খালে পাশাপাশি যেতে পারে না, কিন্তু এটা তৈয়েরি করে ওবানে যাবার পথ অনেক কম ও সহজ হয়েছে। এখানে দুই দিকেই বিস্তৃত মাঠ কোথাও দু একটা শস্যক্ষেত্র, বা পাইন বন, দূরে দু একটা পাহাড় দেখা যায় মাত্র। পথে অনেকগুলা লক (Lock) আছে; ষ্টীমার যখন লকে আসে তখন আমরা নেমে, এ দিক ও দিক বেড়াই, বা আসল হাইলাণ্ডের ব্যাগপাইপ বাজান শুনি কি অসি-নৃত্য (Sword dance) দেখি। যাহা হউক, এ রকম করে ত সময় কাটিয়ে ক্রীনান খালের শেষে উপস্থিত হলেম। সেখানে আবার বড় জাহাজে উঠে সমুদ্রের উপর দিয়ে চল্লেম; সমুদ্রে একটু তুফান হয়ে ছিল, বড় বেশী নয়, কিন্তু তাতেই যে রকম আমাদের জাহাজ দুল ছিল, তাই যথেষ্ট। জানই ত সমুদ্রে আমার অবস্থা কি রকম হয়; এখানেও সেই দশা। কি হয়েছিল জানি না, আমি সমস্ত ক্ষণই সেলুনে শুয়ে ছিলাম, মাথা তুলতে পারি নি। চ—আমায় ডাকতে এল, ডেকের বাতাসে আরাম পাব, ও শীঘ্রই এলজা

ক্রেগ বলে (Ailsa Craig) জলমগ্ন একটা আশ্চর্য্য পাহাড় দেখা যাবে ইত্যাদি নানা প্রলোভন দেখালে, কিন্তু শর্ম্মা তাতে ভুল্‌লেন না! ("Meg was deaf as Ailsa Craig") সন্ধ্যার সময় ওবানে পঁহুছিলে পরে মাথা তুলে ছিলেম। সে—রও অনেকটা আমারই মত দশা হয়েছিল।

ওবানে এসেই, বাসায় ব্যাগ ফেলে শ্রান্তি নিবারণের জন্য একটা পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যাওয়া গেল। ওবান সহরটা প্রায় একশত হোটেলের সমষ্টি, তা ছাড়া প্রায় পনেরটা দোকান, একটা ষ্টেশন ও একটা জেটি আছে। সহরের পেছনে গোটা-দশ ছোট ছোট কুটীর আছে, তাতেই বোধ হয় জন কতক লোক সমস্ত বৎসর বাস করে। তা না হলে শীতকালে এখানে একেবারে লোক থাকে না। সহর ফেলে রেখে, বনের ভিতর দিয়ে চল্লেম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে—"নির্ম্মল সলিলে যমুনে ও" আরম্ভ করে দিলে; সেই সঙ্গে চ—ও "O my darling Clementyne" ধরলে। রক্ত মাংসের শরীরে অনেক সহ্য হয় কিন্তু যমুনা ও Clementyne একত্রে আক্রমণ করলে পলায়নই সৎপন্থা; এই বিবেচনা করে আমিও দৌড় দিলেম— অবশেষে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের তলায় এসে হাঁপ ছেড়ে বসে পড়লেম। তার পর সে—ও চ—এসে সঙ্গ ধরলেন, তিন জনে মিলে পাহাড়ে আরোহণ করা গেল। চূড়ায় উঠে চ—আবার ক্লেমেণ্টাইনের গুণ ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে দিলেন;—

"Thou art lost and gone for ever,
Dreadfully sorry, Clementyne!"

এই পদের পর আমার হাসি চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠলো। চ—সহসা গান বন্ধ করে হাত তুলে আমায় বারণ করলে—"হেস না হে, এটা কমিক গান নয় বড় প্যাথেটিক!" আর একটু হলেই, আমি পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে সমুদ্রে এসে পড়তেম! কিন্তু সহসা একটা ছোট হাইল্যাণ্ড গোরু তাড়া করায় আমাদের তাড়াতাড়ি একটা বেড়া অতিক্রম করে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রে এসে পড়তে হোল, নইলে কি দুর্দ্দশা হোত বলতে পারিনে!

যাহক আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, অতএব এখান থেকেই বিদায় হই।

তোমারই

একই গান।

একবার চুপ কর একবার থাম ওরে
আমার পরাণ,
ওই ও করুণ স্বরে দিন রাত ধ'রে কিরে
গাবি একই গান!
দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্যময়
অনন্ত এ বিশ্ব;
দেখ সেথা কিবা গায় কোন কথা বলে তোরে
প্রতি নব দৃশ্য!
ওই শোন সমস্বরে বলিছে হেথায় নাহি
বিলাপের স্থান;
এক যায় এক আসে নব নব সুখ ভাসে
স্মৃতি অবসান!
যে গেছে সে যাক চলে চাহিনা রাখিতে ধোরে
হোক সে বিলীন;
আবার তাহার ঠাঁই আসিবে নূতন রূপে
আনন্দ নবীন।
প্রতিদিন ফুল ফুটে প্রতিদিন ঝরে তারা
ফোটে নব ফুল;
রবি অস্তাচলে যায় নূতন তপন আনে
আলোক অতুল!
একটী বিহঙ্গ গীত চিরতরে থেমে যায়
শত পাখী গায়;
একটী বসন্ত যায় আবার দক্ষিণে ছুটে
বসন্তের বায়;
একটি তারকা খসে আকাশেতে শত তারা
ঢালে জ্যোতি-হাসি;
একটী জাহ্নবী ঢেউ সাগরে মিশায়ে যায়
আপনা বিনাশি!
হিমগিরি হতে পুনঃ তটিনী বহিয়া আনে
নূতন জীবন;
বিরহের গীত খানি না হইতে অবসান
গাহেরে মিলন;
তুই কেন হেথা বসে একা একা প্রাণ মোর
একই গান গাবি!
বিচিত্র ধরণী মাঝে বাহির হইয়া আয়
সুখ কত পাবি।
উদার আকাশ কোলে পাখা দুটী মেলাইয়া
উড়ে যাবি মন,
মেঘ সাথে মিশে গিয়ে করিবি স্নেহের ভরে
মেঘ আলিঙ্গন!
সহস্র বরণমালা করিবেক খেলা আসি
হৃদয়েতে তোর,
ভেসে যাবি কত দেশে কত নব দৃশ্য দেখে
রবি স্বপ্নে ভোর!
ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে অলির মতন তুই
বেড়াবি ছুটিয়া;
প্রাণ ভোরে নিবি তার অমৃত বিমল মধু
সুখেতে লুটিয়া!
কুসুমের রেণুগুলি গায়েতে লাগিবে তোর
পরিমলময়;
আনন্দেতে গুণগুণি মৃদুল ঝঙ্কার রবে
গাহিবি হৃদয়!
মিলাইবি কণ্ঠ তোর বিহঙ্গের সুরে, আর
তটিনীর সনে;
খেলাইবি সমীরণে আপন মনেতে তুই
নন্দনের বনে!
তবু আসিবি না প্রাণ! বল দেখি কেন হায়!
কিসের কারণে;
"ভুলিতে নারিস্ তুই এক নিমিষেরো তরে
সেই একই গানে!"

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

বর্ণান্ধতা।

বোধ হয় আমরা খুব অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকি যে, কোন প্রকারের রং চিনিতে আমাদিগের কখনও ভুল হইতে পারে। যার দৃষ্টিশক্তি আছে যে দূরের বা নিকটের যে কোন বস্তু সহজেই চিনিতে পারে, তাহার পক্ষে যে কোন প্রকারের বর্ণ নির্ব্বাচন করা খুবই সহজ—ইহাই সাধারণের ধারণা। কিন্তু অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত শিক্ষা প্রদান করে। এমন কি, যাঁহাদের বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বিবিধ ক্রমের বর্ণসমন্বিত পশমের সূক্ষ্ম বর্ণ-পার্থক্য ঠাহরাইতে পারেন না এইরূপ দেখা যায়। কারণ আমরা সাধারণতঃ যাহাই মনে করি না কেন, প্রকৃত পক্ষে একই বর্ণের সহস্র প্রকারের ভেদ নির্ণয় করা তত সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ, একই বর্ণ দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষু-যন্ত্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিরও অনেক ভ্রান্তি সংঘটন করিয়া দেয়। এইরূপ বর্ণ-ভ্রম ঘটে না ইদৃশ লোক অতি বিরল। কিন্তু আমরা ইহাদিগের কথা বলিতেছি না। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদিগের নিকট লাল ও সবুজ দুইই সমান। ইহারাই প্রকৃতঃ বর্ণান্ধ এবং এইরূপ দৃষ্টি দুর্ব্বলতার নামই বর্ণান্ধতা।

এমন সময় ছিল যখন লোকে ঈদৃশ দৃষ্টি দৌর্ব্বল্যকে পীড়া বলিয়া গণ্য করিত এবং এই অপ্রিয়কর রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইত! কিন্তু দুঃখের বিষয় চিকিৎসকের পুঁথিতে এ অসামান্য পীড়ার কোন ব্যবস্থা পাওয়া যাইত না। এক্ষণে সে দিন আর নাই। বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং স্থিরীকৃত হইয়াছে ইহা বাস্তবিক কোন পীড়া নহে; ইহা চক্ষুর স্বাভাবিক দোষ বা দুর্ব্বলতা মাত্র। সকলেরি এরূপ চক্ষু দোষ আছে এমত নহে; কেহ কেহ অপনাপনি এইরূপ দুর্ব্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহাদিগের দৃষ্টিশক্তি অন্যদিকে প্রখর হইলেও ইহারা কোন কোন বর্ণ একেবারেই চিনিতে পারে না। যাহার সম্পূর্ণরূপে বর্ণান্ধ, তাহাদিগের নিকট, আলোকের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যানুসারে সকল কাল, কিম্বা সাদা অথবা ধূসর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ণান্ধ। কোন বর্ণের অতি সূক্ষ্ম ক্রম-ভেদ চিনিয়া উঠা প্রায় সকলের পক্ষেই দুরূহ বোধ হয়। ইহা ব্যতীত, সংসারে এমন দুটি লোক পাওয়া যায় না, যাহাদিগের বর্ণ নির্ব্বাচন জ্ঞান সমান। বর্ণান্ধ ব্যক্তিদিগের অনেকের হয় ত অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি থাকিতে পারে। যদি দুখানি সমান আকারের কিন্তু ভিন্ন বর্ণের বস্তু দূরে রাখা যায়, যাহারা বর্ণান্ধ তাহারা দুখানি বস্তু যে রহিয়াছে

ইহা অনায়াসেই নির্ণয় করিতে পারে কিন্তু কি বর্ণের তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। বর্ণান্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে পীত চিনিতে কিছুই কষ্টবোধ হয় না; যদি নীল রং যথেষ্টরূপে আলোক দ্বারা উজ্জ্বল করা হয়, ইহারা তাহাও সহজে চিনিতে পারে। কিন্তু লোহিত বর্ণই বর্ণান্ধ ব্যক্তিদিগের চিনিয়া ওঠা অতি দুষ্কর। বস্তুতঃ, কোন ব্যক্তি বর্ণান্ধ কি না জানিবার পরখই এই। লোহিত ও সবুজ এই দুই বর্ণ Complementary * বা পূরক বর্ণ। সুতরাং লোহিত চিনিতে না পারিলে সবুজ চেনা অসম্ভব। এই জন্যই, লোহিত ও সবুজ চিনিতে না পারার নামই বর্ণান্ধতা। চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থায় সাদা আলোতে তিনটী রং সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে লাল একটী। কিন্তু বর্ণান্ধের চক্ষে লাল দৃষ্ট হয় না।

এই কৌতূকাবহ অদ্ভুত শারীর-রহস্য প্রকৃতরূপে প্রণিধান করিবার জন্য আমাদিগের বর্ণ-বোধ কিরূপে হয় এবং বর্ণই বা কি ইহাই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। নিউটন সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কার করেন সাতটি বর্ণ আদিম বা অমিশ্র। সূর্য্যরশ্মি বিশ্লিষ্ট করিলে তাহা সাত প্রকারের বর্ণে বিভাজিত হইয়া পড়ে,—বেগুণে (Violet), ঘননীল (Indigo), ব্লু নীল (Blue), হরিৎ (Green) পীত (Yellow), কমলা লেবুর রং (Orange), গাঢ় লাল (Red), ইহাদের যে কোন একটিকে যদি কোনরূপে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা যায়,—যেমন যদি কোন একটি প্রিজমের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত করা হয়,—সেই মৌলিক বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ করে না। এই জন্য, এই সাত প্রকারের অবিভাজ্য বর্ণকে অমিশ্র বা মৌলিক বর্ণ বলে।

ইথর তরঙ্গের বিকম্পনের আধিক্য বা অল্পতার উপর বর্ণ বৈষম্য নির্ভর করে। যদিও কোন একটি আলোক রেখার অন্তর্গত তরঙ্গগুলি একই বেগে ধাবিত হয়, তথাপি প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ আকারে সমদীর্ঘ নয়। এই জন্যই কোন নির্দ্দিষ্ট কালে ইহাদের প্রত্যেকের বিকম্পন সংখ্যা সমান হয় না। যেমন, লোহিত বর্ণের তরঙ্গ আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং বেগুণে রংয়ের সর্ব্বাপেক্ষা ছোট; সুতরাং এক সেকেণ্ডে লোহিত বর্ণের তরঙ্গ-বিকম্পন যতবারে এক নির্দ্দিষ্ট দূর পরিভ্রমণ করিবে সেই সময়ে সেই নির্দ্দিষ্ট দূর ভ্রমণ করিতে বেগুণের তরঙ্গ-বিকম্পন অধিকবার হইবার কথা। কার্য্যতঃও তাই হইয়া থাকে।

* যে দুটি বর্ণের একটি বিনা অপরটির পূর্ণ বোধ জন্মে না, তাহাদিগকে Complementary বর্ণ বলে। সাদা আলোর সাতটি বর্ণের মধ্যে যদি কোন একটি গোপন করা যায়, অবশিষ্ট গুলির সংমিশ্রণ জাত বর্ণকে Complementary বলা হইবে। কেননা, যতক্ষণ না গুপ্ত বর্ণটি অবশিষ্ট গুলির সহিত একত্র হয় ততক্ষণ সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণ বোধ হইবার নহে। এইরূপে লাল ও সবুজ, অরেন্জ্ ও ব্লু, ইণ্ডিগো-নীল ও পীত পরস্পর পূরক বর্ণ।

লোহিত তরঙ্গবিকম্পন এক সেকেণ্ডে ৪৫৮ লক্ষ কোটি বার কিন্তু ইহার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটারের * ৬২ কোটি অংশ; আর বেগুণের তরঙ্গ-বিকম্পন এক সেকেণ্ডে ৭২৭ লক্ষ কোটি বার। কিন্তু ইহার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটারের সার্দ্ধ ৪২ কোটি অংশ মাত্র।

একটি কিরণ রেখা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, বিভাজিত বর্ণমালার এক সীমায় লোহিত অপর সীমায় বেগুণে, অপর বর্ণগুলি এতদুভয়ের মধ্যস্থলে। তরঙ্গ-বিকম্পন-ক্রম লোহিতে অল্প, বেগুণে বর্ণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লোহিতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, বেগুণের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। মধ্যবর্ত্তী বর্ণমালায়, লোহিত হইতে আরম্ভ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে বিকম্পন-ক্রম অধিক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অল্প হইয়া থাকে। ঈদৃশ তরঙ্গ-কম্পনের অসমতাই বর্ণ-ভেদের প্রধান ও একমাত্র কারণ।

বর্ণ বোধের জন্য আমাদের শরীরে দুটি অতি জটিলতম যন্ত্র আছে; মস্তিষ্ক এবং চক্ষু। চক্ষুর গঠন বুঝিতে হইলে আমরা যদি একটি ছোট Camera obscura এর কথা মনে রাখি তাহা হইলে অতি সহজেই এই অতীব জটিল প্রক্রিয়া বুঝিতে পারিব। চক্ষুর সর্ব্বোপরি একটী স্বচ্ছ শাদা পরদা আছে, ইহাকে ইংরাজীতে Cornea বলে। এই শ্বেতাবরণের অব্যবহিত পশ্চাতে আর একটি ঝিল্লিময় ব্যবধান থাকে, ইহা গোলাকার নানা রঞ্জিত পদার্থে পূর্ণ। ইহাই চক্ষের গোলক, কাহারো কাল, কাহারো ধূসর, কাহারো বা নীল প্রভৃতি মিশ্র বর্ণের হইয়া থাকে। ইহার ইংরাজি নাম Iris। গোলকের মধ্য প্রদেশে একটি ছিদ্র থাকে, যাহাকে Pupil বা তারা বলে। তারা পথ দিয়াই আলোক চক্ষে প্রবেশ করে। গোলকের পশ্চাতে স্ফাটিক লেন্স। ইহা দেখিতে দুখানি কুব্জ-পৃষ্ঠ লেন্স মাঝে যোড়ার মত, এবং Double convex lens এর মত কার্য্যও করে। লেন্স হইতে চক্ষুর সমুদয় পশ্চাৎভাগ এক প্রকার স্বচ্ছ তরল চটচটে, ডিম্বের শ্বেতসারের ন্যায় পদার্থ থাকে, ইহার ইংরাজী নাম Vitreous humour। চক্ষুর সম্মুখভাগে শ্বেতাবরণ ও লেন্সের মধ্যস্থলে এক প্রকার স্বচ্ছ জলবৎ পদার্থ থাকে, ইহাকে Aqueous humour বলে। চক্ষুর পশ্চাদ্দেশের অভ্যন্তরাংশ এক প্রকার অতি কোমল শুভ্র, স্বচ্ছ পরদা দ্বারা আবৃত, ইহাই চক্ষের Retina। রেটিনা দৃক্-স্নায়ুর (optic nerve) বিস্তৃতি মাত্র। দৃক্ স্নায়ুর সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ। রেটিনার পশ্চাতে আর একটি কৃষ্ণবর্ণের পরদা তাহার পশ্চাতে শেষ আবরণ। শেষ আবরণ পশ্চাৎ হইতে সমুদয় চক্ষুকে বেষ্টন করিয়া সম্মুখের স্বচ্ছ শ্বেতাবরণের সহিত মিলিত। চক্ষুর আভ্যন্তরীণ গঠন এইরূপ। এক্ষণে যদি আমরা সহজ Camera

* এক মিলিমিটার—এক মিটারের সহস্রাংশ; এক মিটার ৩৯.৩৭ ইঞ্চের সমান। আমাদের দুই হাতের কিছু অধিক।

obscuraএর কার্য্য মনে করি, তাহা হইলেই সহজে দৃষ্টিকার্য্য বুঝিতে পারিব। কামেরা অবস্কিউরার ছিদ্রের মত চক্ষুর তারা বা Pupil ; কামেরার Condensing lensএর মত চক্ষুর যুক্ত কুজ-পৃষ্ঠ স্ফাটিক লেন্স। কামেরার পরদার (Screen) মত চক্ষুর রেটিনা। কোন বস্তুর প্রতিকৃতি রেটিনায় প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃক্-স্নায়ু সহযোগে মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তখনি আমাদের দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে।

আর একটি কথা। আমরা দেখি সকল বস্তুরি কোন না কোন বর্ণ আছে। তদনুসারে কাহাকেও লোহিত, কাহাকেও পীত কাহাকেও কৃষ্ণ ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করি। বস্তুতঃ এইরূপ সংজ্ঞা অমূলক। বর্ণ কোন বস্তু বিশেষের অবিচ্ছেদ্য ধর্ম্ম নহে। কাহারো আপনার কোন বিশেষ বর্ণ নাই। তবে সকলেরি শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিবার ধর্ম্ম বা শক্তি আছে। শুভ্র জ্যোতিতে আলোকিত হইবার সময় বস্তুমাত্রেই সেই আলোককে অল্প বা অধিক পরিমাণে বিশ্লিষ্ট করে এবং অসম ভাবে আলোকের বিভিন্ন তরঙ্গ কম্পন প্রতিফলিত করে। যে বস্তু যত অধিক পরিমাণে কোন বিশেষ প্রকারের তরঙ্গ কম্পন প্রতিফলিত এবং অবশিষ্ট কম্পন আত্মসাৎ করিতে পারে, সেই বস্তু প্রতিফলিত তরঙ্গের বর্ণ প্রাপ্ত হয়। যেমন মনে কর একটি লাল গোলাপ ফুল ; ইহা সূর্য্যালোক বিশ্লিষ্ট করিয়া কেবল লোহিত তরঙ্গ কম্পন গুলিকেই প্রতিফলিত করে, অবশিষ্ট বর্ণ নির্দ্দেশক কম্পন গোপন করিয়া রাখে, এই জন্যই ইহা লোহিত। সবুজ পত্র ; ইহা কেবল সবুজ তরঙ্গ কম্পন প্রতিফলিত করে, অবশিষ্ট গুলি করে না, এই জন্যই ইহা সবুজ। বাস্তবিকই গোলাপের লাল রং কিম্বা হরিৎ পত্রের হরিৎ বর্ণ যে নিজের নহে, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা অতি সুন্দর রূপে পাই যখন কোন আঁধারময় কক্ষে সূর্য্য রশ্মি বিশ্লিষ্ট করিয়া, বিশ্লিষ্ট রশ্মির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপর উক্ত পদার্থগুলি ধরি। লাল গোলাপ লোহিত বর্ণের মধ্যে ধরিলে আরো উজ্জ্বল লোহিত প্রতীত হইবে, কিন্তু পীত, হরিৎ, নীল বা বেগুণে বর্ণের মধ্যে লোহিত রূপে পরিদৃষ্ট না হইয়া পীত, হরিৎ, নীল বা বেগুণে রূপেই পরিদৃষ্ট হইবে। সবুজ পত্রও ঐরূপ। সবুজ বর্ণেই উজ্জ্বল সবুজ বলিয়া প্রতীত হইবে; অপরাপর বর্ণের উপর ধরিলে সেই সেই বর্ণেরি হইবে। সুতরাং বর্ণ কোন বস্তুর অন্তর্গত স্বাভাবিক নিরপেক্ষ ধর্ম্ম নহে। ইহা পরোক্ষ গুণ মাত্র।

আমাদিগের দৃক্-স্নায়ু স্নায়ুমণ্ডলের কেন্দ্র মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। মস্তিষ্ক হইতেই সকল প্রকারের অনুভূতি জ্ঞান সঞ্চারিত হয়। যখনি কোন দৃশ্য বস্তু আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, তখনি এই ভৌতিক কার্য্য সংসাধিত হয় ; দৃশ্যবস্তু হইতে কোন বিশেষ বর্ণের কতকগুলি তরঙ্গ কম্পন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরস্থ রেটিনার উপর আঘাত করে। এই আঘাত মস্তিষ্কে বহন করিবার জন্য মূল দৃক্-স্নায়ু প্রশস্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু-সূত্র ও গ্রন্থি বিস্তার করিয়া রেটিনারূপে অবস্থান করে। রেটিনার স্নায়ু-সূত্র গুলি দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। ইহাদের অগ্রভাগের আকার ভেদে ইহাদিগকে যথাক্রমে rods

দণ্ডাকার ও cones কোণাকার বলা যায়। এই উভয়বিধ স্নায়ু-সূত্র মধ্যে কোণাকৃতি অর্থাৎ মোচার অগ্রভাগের ন্যায় সূত্র গুলিই বর্ণবোধ বহন করিবার সবিশেষ উপযোগী। যাহাদিগের রেটিনার মোচাগ্র সদৃশ স্নায়ু-সূত্রগুলি বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয় নাই, তাহারাই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ণান্ধ হইয়া থাকে। যদিও, বাহ্য বর্ণ, ও তাহার অনুভূতির সহিত মানব-স্নায়ু-মণ্ডলের ঠিক কি সম্বন্ধ, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান আজও পর্য্যন্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ, তথাপি আমরা যখন দেখি নিশাচর জন্তু যাহাদিগের বর্ণনির্ব্বাচন শক্তির কোন বিশেষ আবশ্যকই নাই, তাহাদিগের চক্ষুতে যষ্টি আকারের স্নায়ু-সূত্রগুলি অতি প্রবলরূপে বিকশিত কিন্তু মোচাগ্র আকারের সূত্রগুলির সম্পূর্ণরূপেই অভাব, তখন এই মত বাদই স্বীকার করিতে হয় যে মোচাগ্র-সদৃশ সূত্রগুলির অল্প বা অসম্পূর্ণ বিকাশই বর্ণান্ধতার প্রধানতম কারণ। কিন্তু লোহিত বর্ণের তরঙ্গ কম্পনই যে কেন, যাহা অন্যান্য তরঙ্গ কম্পন অপেক্ষা ধীরতম গতিমান, অসম্পূর্ণ বিকাশ মোচাগ্র সদৃশ স্নায়ু সূত্রদ্বারা সঞ্চালিত হইবে না, ইহা এখনও অমীমাংসিত ও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

সে যাহাই হউক, বর্ণান্ধতা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যাহার এইরূপ দৃষ্টি-দুর্ব্বলতা থাকে, তাহার জন্মাবধিই থাকে এবং ইহা অনেক পরিমাণে পৈতৃক বা বংশানুক্রমিক। অন্যান্য কারণেও এইরূপ আংশিক বর্ণান্ধতা ঘটিতে পারে, যেমন যদি কোনরূপে হঠাৎ মস্তিষ্ক কঠিন আঘাত পায়, তাহা হইলে এইরূপ বর্ণান্ধ দোষ ঘটিতে পারে, কিম্বা কোনরূপ কঠিন পীড়ায় ফল স্বরূপ অথবা অতিরিক্ত সুরাপান হেতু বর্ণান্ধতা ঘটিতে পারে। ঈদৃশ কারণসঞ্জাত বর্ণান্ধ দোষ কতক পরিমাণে চিকিৎসা দ্বারা সংশোধিত হইলেও হইতে পারে কিন্তু যাহা জন্ম হইতে, যাহা স্বাভাবিক, তাহার কোন ঔষধ নাই, তাহা সম্পূর্ণরূপেই অনারোগ্য ও অচিকিৎস্য।

সংখ্যা গণনা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে প্রতি শত পুরুষের মধ্যে প্রায় ৪ জন বর্ণান্ধ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বর্ণান্ধের হার অতি অল্প, এক সহস্রে গড় দেড় জন। এইরূপ অসদৃশতার অনেকে অনেক প্রকার হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদিও স্ত্রী-জাতির বর্ণ বোধ পুরুষদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা হইলেও সংখ্যা গণনা দ্বারা সময়ে সময়ে যে হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা যে বিশ্বাস যোগ্য নহে, ইহাই সকলের মত। অধ্যাপক উইলসন পুরুষ ও রমণীর বর্ণান্ধতার হারের অসমতার সম্বন্ধে এই যুক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন যে পুরুষদিগের অপেক্ষা রমণীগণ বর্ণ নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রদর্শনের অধিকতর প্রয়াসী হইয়া থাকেন। সুতরাং যে রমণী জানেন তিনি বর্ণান্ধ, তিনি কখনই সর্ব্ব সমক্ষে নিজের এই দৃষ্টি দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন না। যাঁহারা জানেন তাঁহাদের বর্ণ-বোধ বেশ পরিস্ফুট তাঁহারাই আপনাদিগের ক্ষমতার পরিচয় দিবেন। কাজে কাজেই যে রমণীদিগকে বর্ণান্ধতার জন্য পরীক্ষা করা হয়, তাঁহাদিগের সকলেই

সে দোষ বিবর্জ্জিত বলিয়াই, তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ণান্ধের হার অল্প হইয়া দাঁড়ায়। অধ্যাপকের এই হাস্য-জনক যুক্তির মধ্যে সার কতটুক আছে তাহা পাঠক বিচার করুন। আর একজন যে একটি সুন্দর যুক্তি প্রয়োগে উহা খণ্ডন করিয়াছেন তাহা এই। যাহারা বর্ণান্ধ তাহারা পরীক্ষায় না পড়িলে আপনাদিগের এই দুর্ব্বলতা জানিবে কিরূপে। যে বাস্তবিকই বর্ণান্ধ সে বুঝিতে পারে না লাল ও সবুজে পার্থক্য কি? তাহার পক্ষে লালও যা সবুজও তা। সুতরাং যে স্বাভাবিক বর্ণান্ধ পরীক্ষায় না পড়িলে, নিজের এই দৃষ্টি দুর্ব্বলতা তাহার জানিবার কোন উপায়ই নাই। আমরা জানি আমাদের পরিচিত কোন একটি ব্যক্তির এইরূপ দুর্ব্বলতা আছে। সে ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে লাল কালি ও কাল কালি ঠিক করিতে পারে না। লিখিবার সময় হয়ত ভুলক্রমে লাল কালির দোয়াত হইতেই লিখিয়া যায়। নিজে বুঝিতে পারে না লাল কালিতে লিখিতেছে কি কাল কালিতে লিখিতেছে। আমরা অবশ্য তাহার ভুল দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। আমাদের স্বভাবই এই। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আত্মতৃপ্তি করিতে আমরা সকলেই মজবুত।

বর্ণান্ধতা পুরুষের মধ্যেই অধিক হউক, আর স্ত্রীলোকের মধ্যেই অল্প হউক, এইরূপ স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা মানব জগতে অবস্থান জন্য অনেক সময়েই প্রভূত অমঙ্গল সংঘটিত হয়। অর্ণব-পোত বাহক, রেলওয়ে শকট পরিচালক পৃথিবীর মধ্যে অনেক আছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই বর্ণ-বোধ শক্তি সম্যকরূপে পরিস্ফুট হওয়া আবশ্যক। অথচ কত বর্ণান্ধ-দোষ-সম্পন্ন ব্যক্তি এই সমুদয় দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্যভার সম্পাদন করিয়া থাকে। কত সময়ই না নিশাকালে অথবা কুজ্ঝটিকার সময় এক বর্ণের আলোককে অপর বর্ণের ঠাহরাইয়া বর্ণান্ধ নাবিক বা চালক ভয়ঙ্কর বিপদের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছে। এই নৌ-ব্যবসায়ীদিগকে পারদর্শিতার পত্র প্রদান করিবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের বর্ণ-নির্ব্বাচন-বোধ শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তবে ইংলণ্ডে এ সম্বন্ধে তত কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা হয় না। এই জন্য অনেক বর্ণান্ধ ব্যক্তিও পোত সঞ্চালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনেকদিন হইতেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তারা কোন নাবিককেই পোত চালন কার্য্যের যোগ্য মনে করেন না, যেনা এক চক্ষু দ্বারা কোন বর্ণের আলোক ঠিক করিতে পারে এবং ঈদৃশ দক্ষ লোককেও তাঁহারা এক মাসের অপেক্ষা অধিকতর কালের জন্য পারদর্শী পত্র প্রদান করেন না। বাস্তবিক যাহাদিগের হস্তে কত বহু মূল্যের সম্পত্তি, কতশত নরনারীর জীবন ন্যস্ত তাহাদিগের বর্ণ নির্ব্বাচন ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় না পাইলে ঈদৃশ কঠিন দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্যে তাহাদিগকে নিয়োগ করা কখনই উচিত নহে।

শ্রী শ্রীপতিচরণ রায়।

নিলাম।

(১)

অতুল হরিবাবুর স্ত্রীর দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি পুত্র। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালককে হরিবাবুর স্ত্রী আপনাদের বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল করুণাই যে তাঁহার এই আশ্রয় দানের কারণ তাহা নহে। আরও একটী কারণ ছিল। হরিবাবু কলিকাতায় ৫০৲ টাকা মাহিয়ানায় কর্ম্ম করিতেন। গৃহিণী একমাত্র শিশু কন্যাকে লইয়া হরিবাবুর পৈতৃক স্থান বৈদ্যবাটীতে থাকিতেন। হরিবাবু বাসা খরচ বাদ বাটীতে যে টাকা পাঠাইতেন তাহাতে সংসার বেশ একরকম স্বচ্ছলে চলিত। তবে গৃহে পুরুষ না থাকায় অনেক ছোট খাট কাজে কর্ম্মে অসুবিধা হইত। তাই কতকটা করুণা কতকটা সুবিধার জন্য হরিবাবুর স্ত্রী অতুলকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিলেন। অতুল গৃহিণীর আবশ্যক মত কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। গৃহিণীও অতুলের আহারাদির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু আহারাদি ভিন্নও যে দশম বর্ষীয় বালকের আরও কিছু প্রয়োজন সেটা তাঁহার মনে আসিত না। গৃহিণী যখন সুকুমারীকে বুকে লইয়া ছাইপাঁশ অর্থহীন কথায় আদর করিতেন, সুকু যখন মাতার গলা জড়াইয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া তাহা হাসিমুখে শুনিতে শুনিতে তদনুরূপ উত্তর দিত, তখন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃত জননীর কথা মনে করিয়া বালকের চক্ষু যে জলে ভরিয়া যাইত, সেইরূপ মাতৃ-স্নেহের অভাব অনুভব করিয়া সে যে আড়ালে গিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার উচ্ছাসিত বাল্যহৃদয় দমন করিত তাহা তিনি দেখিতেন না।

কোন কোন দিন বালিকা সুকু খেলিবার জন্য অতুলকে খুঁজিতে গিয়া দেখিত অতুল কাঁদিতেছে, বালিকা তখন সন্দেশের আধখানা দিয়া কি নূতন পুতুলের ভাগিদার করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুটী দিয়া চক্ষু মুছাইয়া বলিত দাদা কাঁদিস নে। অতুল সুকুকে কোলে লইয়া পাখীর বাসা পাড়িয়া দিতে যাইতেন।

(২)

অতুল অনেক কষ্টে এণ্ট্রেস পাশ করিয়া ২০৲ জলপানি পাইয়া এবার কলিকাতায় পড়িতে যাইতেছেন। হর্ষবিষাদে অতুলের হৃদয় আচ্ছন্ন। হরিবাবুর উপর আর নির্ভর করিবার আবশ্যক নাই তাই অতুল সুখী। কিন্তু সুকুকে ছাড়িয়া যাইবেন কিরূপে? সুকুর সন্দেশ বা পুতুলের পরিবর্ত্তে দরিদ্র অতুলের হৃদয় ভিন্ন আর দিবার কি ছিল? কিন্তু হরিবাবু ত আর তাহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তে তাহাকে কন্যা দান করিবেন না। যদি ঈশ্বর দিন দেন তখন যাহা হয় হইবে। এখন নিরাশ প্রেম হৃদয়ে ঢাকিয়া সুপ্ত বালিকার মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া অতুল প্রাতঃকালের গাড়ীতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

ঈশ্বরেচ্ছায় অতুল এল্‌এ পাশ হইয়া জলপানি পাইয়া ডাক্তারী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহার মনের নির্ব্বাপিত প্রায় আশাদীপ একটু জ্বলিয়া উঠিয়াছে এমন সময় হরিবাবুর পত্র পাইলেন যে জমীদার পুত্র নবকান্তর সহিত সুকুমারীর আগামী মাসে বিবাহ। বৈবাহিকেরা ধনবান সুতরাং ধনীর কন্যা তাঁহারা চাহেন না; সুন্দরী বধূ চাহেন। সুকুমারীর ন্যায় সুন্দরী গ্রামে আর কেহ নাই।

অতুলের আশা যদিও বড় বেশী ছিল না তবুও এ কথা শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। নিজের জন্য শুধু নহে সুকুমারীর জন্য আরো। নবকান্তও কলিকাতায় অতুলের সহিত এক স্কুলে পড়িতেন। অতুল তাহার স্বভাব জানিতেন। তাঁহার স্বভাব নানা প্রকারে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুকুমারী তাহার হইবে না তিনি জানিতেন কিন্তু তাই বলিয়া স্বর্ণপ্রতিমা কি ধূলিসাৎ হইবে। হরিবাবু যে জানিয়া শুনিয়া কন্যাকে এরূপ পাত্রে সমর্পণ করিবেন তাহা অতুলের বিশ্বাস হইল না। অতুল নিজে যাইয়া হরিবাবুকে এ বিষয় বলিবেন স্থির করিয়া সেইদিনই বৈদ্যবাটী গমন করিলেন। হরিবাবু ও গৃহিণী অতুলের কথা শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন "তুমিও যেমন বাবা! আপনার কপালে সুখ, বয়স ধর্ম্মে অমন হয়; বিয়ে হলেই জামাই শুধরবে। অমন ঘর কি ছাড়া যায়!"

অতুলের কথার ফল হইল না। মহা আড়ম্বরে সুকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল।

(৩)

অতুলের ডাক্তারীতে এখন বেশ পসার হইয়াছে। অতুল কলিকাতার একজন গণ্যমান্য ধনী লোক। তবে অতুল এখনও অবিবাহিত। মাসে দুই এক বার যখন অতুল বৈদ্যবাটীতে হরিবাবুর স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে যান গৃহিণী তখন তাহাকে বিবাহের জন্য চাপিয়া ধরেন কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজী করাইতে পারেন না। গৃহিণী যে কথার কথা মাত্র তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করেন তাহা নহে, অতুল যথার্থই এখন তাঁহার পুত্রস্থানীয়। কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহারা সুখী হইবেন আশা করিয়াছিলেন; সে আশা পূর্ণ হয় নাই। ধনীর বধূ দরিদ্র পিতামাতাদের সহিত বড় সম্বন্ধ নাই। তবু মেয়ে সুখে থাকেত তাহাতেই সুখ। কিন্তু বড় মানুষের ঘরের কথা লুকান থাকে না,—গৃহিণী দাসীর মুখে খবর শুনিতেন জামাতা মেয়েকে অনাদর করে মদ খাইয়া অপমান করে, ইহাতে গৃহিণীর চক্ষের জলে দিন কাটিয়া যাইত। কিছুদিন পরে হরিবাবুর মৃত্যু হইল। গৃহিণীর আর আপনার কেহ রহিল না। কিন্তু আপনার কেহ থাকিলেও অতুল অপেক্ষা যে গৃহিণীকে বেশী যত্ন করিতে পারিত তাহা বোধ হয় না। এই যত্নের ফলে যে স্নেহ একদিন অতুল চাহিয়া পায় নাই তাহা পাইল। গৃহিণী তাহাকে নিতান্ত আপনার করিয়া লইলেন। মাঝে মাঝে মনে করিতেন যদি সুকুর সহিত অতুলের বিবাহ দিতাম তবে কি ভালই হইত! কিন্তু সেরূপ ভাবিয়া এখন আর ফল নাই,

মনের আগুণ মনেই নির্ব্বাণ করিতেন। অতুলের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ লইয়া ঘর সংসার করিতে পারিলেই এখন তিনি সন্তুষ্ট হন। অন্য বিষয়ে কোন কথা তাঁহার অতুলকে দুবার বলিতে হয় না—কিন্তু এবিষয়ে অতুল বড় এক গুঁয়ে, কিছুতেই তাঁহার কথা শুনেন না।

অতুল এবার গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন গৃহে সুকুমারী তাহার পুত্র ও দুইটি কন্যা রহিয়াছে। বিবাহের পর সুকুর সহিত তাঁহার এই প্রথম দেখা; অতুল চমকিয়া উঠিলেন। সুকু বিবাহের পর এই প্রথম পিতৃগৃহে আসিয়াছে আর কোথাও স্থান নাই তাই স্বামী এখানে পাঠাইয়াছেন।

নবকান্ত যথেচ্ছাচার-খরচে অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার পর কিছুদিন পূর্ব্বে এক জমীদারের সহিত খুনের মকর্দ্দমায় অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে। এমন কি, বিষয় বন্ধক দিয়া ঋণ করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে হইয়াছে। এখন খুনের অভিযোগ হইতে যদিও নিস্তার পাইয়াছেন কিন্তু মকর্দ্দামা খরচে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, এমন টাকা নাই যে সুদ দিয়া পর্য্যন্ত এখন পাওনাদারকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, পাওনাদার মকর্দ্দমা করিয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া লইতেছে। সপ্তাহ পরে বিষয় নীলাম হইবে, কিছু পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বস্বান্ত গৃহহীন নবকান্ত স্ত্রীপুত্র শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়াছেন।

গৃহিণী অতুলকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—বলিলেন "বাবা রক্ষা কর তুই, আর আমাদের কে আছে? আমার যেমন কপাল—নইলে কেন এমন হবে। এমন জামাইও করেছিলুম! তখন তুই বলেছিলি ওখানে বিয়ে দিওনা, তা কর্ত্তাত তোর কথা শুনলেন না! আহা যদি তোর সঙ্গে বিয়ে দিতুম!"

সুকু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না। স্বামী সহস্র দোষ করুন স্বামীর নিন্দা অসহ্য। তবু যেন মা যা বলেন সহিতে হয় কিন্তু অতুল যে বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীর নিন্দা করিয়াছিল, মা যে অতুলের সহিত বিবাহ হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন—এতদূর সহিল না;—তবে ইহাতে মায়ের উপর যত না রাগ হউক অতুলের উপরই বেশী রাগ হইল। আর সুকু কি এমনি হতভাগিনী ভিখারিণী যে স্বামী-নিন্দুকের সাহায্য লইবে? সুকু বলিল "মা চুপ কর—অত গোল করা কেন? বাপের বাড়ী এসেছি বলে কি আমরা ভিক্ষে কর্ত্তে বেরিয়েছি—আমাদের জন্য তোমার ভাবতে হবে না—সে যার ভাবনা তিনি ঠিক করবেন।"

অতুল সুকুর হৃদয় ভাব বুঝিলেন; বুঝিলেন,—অতুলের নিকট সাহায্য লইতে যদিবা সুকুমারী কিছু মনে না করিত কিন্তু গৃহিণীর ও কথার পর আর লইবে না। একটু পরে ব্যথিত হৃদয়ে অতুল সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

(৪)

সন্ধ্যা হইয়াছে। এখনও ঘরে দীপ জ্বলে নাই। যে গৃহ প্রতিদিন শত দীপে আলোকিত, শতকণ্ঠ-কলরবে পূর্ণ হইত আজ তাহা অন্ধকার নীরব নির্জ্জন। কেবল এক জন

লোক এই গভীর নির্জ্জন প্রাসাদের প্রেতাত্মার মত একাকী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। বাহিরের অন্ধকার বেশী কি তাহার হৃদয়ের অন্ধকার বেশী তাহা তাঁহার মুখ হইতে বুঝিতে পারা কঠিন। পিতৃ পিতামহের চিরন্তন আবাস তাঁহার দোষে কাল পরহস্ত গত হইবে, স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে, সেই জন্য কি নবকান্তের হৃদয়ে অনুতাপের অন্ধকার, মুখে যাতনার ছায়া? কিম্বা এখনও নবকান্ত নিজের দোষ বুঝেন নাই। যাহারা তাঁহার ধনসম্পদ কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার হৃদয়ে বিজাতীয় বৈরীভাব জ্বলিয়া উঠিতেছে?

হঠাৎ পার্শ্বে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন—কি বিপদ—এক দণ্ড কি সুস্থির থাকিতে পারিবেন না—শ্যাম তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল! আজ বিপদের দিনে নবকান্তকে সকলে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কেবল বৃদ্ধ শ্যাম অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। সে নবকান্তকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। যদি প্রাণ দিয়াও সে নবকান্তের পূর্ব্ব সৌভাগ্য ফিরাইতে পারিত তবে অকাতরে তাহা করিত। তাহা পারে না, তাই মলিন ছায়াটীর মত নবকান্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। কিন্তু এ স্নেহের মূল্য নবকান্তের কাছে নাই। যদি অশ্রু মুক্তা হইত বা টাকা হইত তবে নবকান্ত তাহার মর্য্যাদা বুঝিতেন। ইহাতে তিনি কেবল বিরক্ত হন মাত্র। এই একটু আগে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন আবার বুঝি সে আসিতেছে! নবকান্ত ক্রোধভরে চাহিয়া দেখিলেন শ্যাম নহে, অতুল দাঁড়াইয়া আছেন। এ পরিবর্ত্তনে নবকান্তের ক্রোধের যে শমতা হইল তাহা নহে বরং বাড়িয়া উঠিল। সেই ছেলেবেলাকার অতুল—যে তাঁহার শ্বশুরান্নে পালিত, সেই দরিদ্র অতুল আজ ধনবান আর তিনি আজ নিঃস্ব। দোষটা যেন অতুলেরই। কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। একটু পরে শ্যাম বাতিহাতে আসিয়া বলিল—"একবার ঘরে আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, আমি সমস্ত ঠিক করে রেখে এসেছি।" নবকান্ত রাগিয়া বলিলেন—"দেখ, ফের যদি বিরক্ত কর্‌বি তাহলে তোকে চাবিবন্ধ করে রাখ্‌ব।" শ্যাম বলিল—"আরে পিত্তি পড়ে গেল যে, সেই দুটো কখন মুখে পড়েছে না পড়েছে! ভগবান, তোমার মনে এই ছিল!" নবকান্ত বলিলেন—"তুই এখন যাবি কি না যাবি? যদি অমন করে বক্‌বি, তাহলে আমি আজ খাব না; যা বলছি।" শ্যাম দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"তা আমি যাচ্ছি, আপনি একটু পরে আসুন।"

শ্যাম চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অতুল বলিলেন—"বড় অন্ধকার, বাতিটা এখানে রাখিয়া যাওত হে।" শ্যাম তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল—"অতুল বাবু! আজ সব অন্ধকার, মশায়, সব অন্ধকার—" নবকান্তের তাড়া খাইয়া শ্যামের আবার কথা বন্ধ করিতে হইল। অতুল তাহার হাত হইতে বাতি লইলেন, সে বিষণ্ণ মুখে চলিয়া গেল। ভৃত্য চলিয়া যাইবার একটু পরে নবকান্ত রূঢ় স্বরে বলিলেন—"কোন দরকার আছে?

বিষয়টা কিরূপ বোধ করি খবর লইতে আসিয়াছ? কাল কিনিতে চাও বুঝি?" অতুল কোন উত্তর করিলেন না, পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া নীরবে তাঁহার হাতে দিলেন। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া নবকান্ত তাহা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়িয়া বিস্মিত হইলেন, যাহা পড়িলেন বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলেন আসল অভিপ্রায়টা কি বল দেখি?

অভিপ্রায় যে কাগজে অস্পষ্ট ভাবে লেখা ছিল এমন নহে, তবে নবকান্ত তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়া সেই নিঃস্বার্থ অভিপ্রায়ের মধ্যে স্বার্থপূর্ণ লুক্কায়িত গূঢ় উদ্দেশ্য সন্দেহ করিয়াই এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অবশ্য ইহাতে নবকান্তের দোষ দেওয়া যায় না। তাহার অভিজ্ঞতায় সংসারের প্রকৃতিই এই। ইহার পর দুই জনে কথোপকথন চলিতে লাগিল। একটু পরে অতুল চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে অতুল বলিলেন,—"কিন্তু আমার অনুরোধটী মনে রাখিবেন—একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না"। নবকান্ত যে সব সময় সকলের অনুরোধ রক্ষা করিতেন তাহা নহে তবে অতুলের এ অনুরোধটি চিরকালই রক্ষা করিয়াছিলেন।

পরদিন চৌধুরীদের বিষয় নীলাম হইবে, অনেক লোক জমা হইয়াছে—এমন সময় খবর আসিল নীলাম বন্ধ। চৌধুরী মহাশয় ঋণ শোধ করিয়াছেন।

বিফল মিলন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

যশলমীরের রাজ প্রাসাদে বীণা।

বীণা—

শৈল নাকি আসিয়াছে ফিরে
আবার বিবাহ হ'বে তার?
ভিখারিণী দরিদ্রের বালা
অত রূপ নাই কারো আর!
দেখিব সে কেমন রূপসী;
কতদিন রহিবে মাধুরী!
আমিও ছিলাম রূপবতী!
দুদিনে গিয়াছে সব ঝরি!
ধিক মোরে! সে ক্ষুদ্র বালিকা,
মোর মত সেও অভাগিনী—
এত রোষ কেন তার পরে
সে কি হবে হৃদয়ের রাণী?
সে কি জানে দারুণ ছলনা
লুকায়ে রয়েছে হৃদে তার।
দুই দিন শুধু দুই দিন
আপন সে নয় বেশী আর!
ভালবাসা শুধু বুঝি তবে
রূপসীর সৌন্দর্য্যের শিখা;
চঞ্চল নয়ন কোণে শুধু
ছল না কালিমা ভরা রেখা!

আমি রাণী ! হায় কোথা রাজা !
অপরের কোমল চরণে !
আত্মহারা মুগ্ধ হয়ে হায়,
সঁপিয়াছে আপন পরাণে !
এই খানে বিদায়ের দিন
চেয়েছিল নয়ন সজল,
কে জানিত কে জানিত আগে
সে হৃদয়ে এত আছে ছল !
বেঁধেছি পরাণে আমি আজ,
দেখিব সে হাসি মুখখানি,
উঠিছে ফুটিয়া কত প্রেম
কত কয় সোহাগের বাণী।
কার লাগি এ পরাণে সাধ !
বুঝিল না সে যদি বেদনা ;
অভাগিনী কোন মোহে আর
বল তোর জীবনে বাসনা ?
একবার দেখিব তাহায়
অতৃপ্ত এ দুটি আঁখি ভরে ;
একটি সে একটি চুম্বন,
প্রেমমাখা পুরাণ অধরে !
তার পরে তার পরে হায়
কে জানে কোথায় যাব চলে ;
আত্মহত্যা আছিল কি ভাগ্যে,
বল, বিধি, কোন পাপ ফলে !
ওই আসে ! হেথা কেন আর
কে আমি গো ! আমি ভিখারিণী !
হারায়েছি পতির প্রণয়,
আর ত নহিগো রাজরাণী।

সপ্তম দৃশ্য।

যাতায়ন পার্শ্বে তরুণা।

তরুণা—

অজানিত এ কোথায়
আসিয়া পড়েছি হায় !
কেহ কি গো হবে নাক সাথী ?
উদাস পাগল পারা
আমার পরাণ সারা
নিভে গেছে সুখালোক ভাতি।
পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী
হেথা আমি একাকিনী
কোথা মুক্ত বন পথ মোর,
কে জানে কেন গো হায়
আঁখিজল জল উথলায়
হৃদে যেন অন্ধকার ঘোর।
যখন সে আসে কাছে,
কি ঝটিকা হৃদি মাঝে
বহে যায় সরেনাক বাণী।
কতবার মনে করি
চেয়ে দেখি প্রাণ ভরি
তার সে মধুর মুখ খানি।
কতনা সোহাগ ভরে
দুটি হাতে হাত ধরে,
সে পরশে কি বিদ্যুত শিখা !
অবশ পরাণ মোর
কি মোহেতে হয় ভোর
একটি সে চুম্বনের রেখা।
তবু কেন এ আবার,
কি যে দুঃখ গুরুভার
চেপে আসে হৃদয়ের তলে।

অজানিত দুখ ছায়
হৃদয় ডুবিছে হায়
তাই অশ্রু নয়নে উথলে !

বীণার প্রবেশ।

তরুণা—

কে গো তুমি ম্লানমুখী
কি দুখে তুমি গো দুঃখী
কেন মোর হেরিয়া তোমায়
চোখে আসে অশ্রুজল ?
সখি গো শুধাই বল
কি ব্যথা ও অধর পাতায় ?

বীণা—

সরলা বালিকা ওরে !
এ দুখ বুঝিবি কিরে,
এ দারুণ নিরাশ বেদনা !
সঁপেছিনু আপনায়,
যাহার চরণছায়
দলে গেছে—নিভেছে বাসনা।
কোমলা সরলা বালা
তুই কি জানিবি জ্বালা,
কত সখি নিরাশা প্রণয়ে ?
এ দীর্ঘ দিবস নিশি
অন্ধকার দশ দিশি,
আছি মরণের পথ চেয়ে।

তরুণা—

কিছু ত বুঝিনা হায়
মধুর স্নেহের ছায়
মগন রয়েছি ঘুম ঘোরে ;
সত্য কি গো হলাহল
দারুণ সংসার ছল
প্রণয়ের গভীর অন্তরে !

অষ্টম দৃশ্য।

তরুণা ও শৈল নিদ্রিত, শূন্য-বিষ-পাত্র হস্তে বীণার প্রবেশ।

বীণা—

অজানিত আকর্ষণে হৃদয় চঞ্চল,
কে যেন আসিয়া ধরে যুগল চরণ ;
বিদ্যুত লহরী খেলে নয়ন উজল,
কোন মোহে কোন স্বপ্নে হতেছি মগন।
এ কোথা এসেছি আমি ! হল পথ ভুল।
এই কি সে স্বর্গ সেই অপ্সরা আলয় ?
ফুটিয়া রয়েছে বুঝি নন্দনের ফুল !
বিষ পানে চিত্ত ভ্রম নিমেষে কি হয় !
না না এ যে মোর গৃহ আমি যে এখানে,
শৈল তুমি মোরে ছেড়ে তরুণীর পাশে ?
আমি যে গো ভিখারিণী কেন গো এখানে,
আসিয়াছি পথভুলে কিবা কোন আশে ?
কি যাতনা ! নিমেষের, জনমের নয় ;
তৃষিত অধর মোর একটি চুম্বন ;
মুহূর্ত্ত দেখিয়া লই, শেষ বুঝি হয়
সংসারের মোহ আশা জীবন স্বপন !

শৈল (চমকিয়া উঠিয়া)—

একি স্বপ্ন ! তুমি বীণা ! কেন গো এখানে !
নিমেষের সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গাবে আমার ;
নিদয় নিঠুর আমি আমার পরাণে
বহিছে আবার নব প্রেম পারাবার !

বীণা (থমকিয়া ভূমিতে বসিয়া)

আসি নাই সখা প্রেম ভাঙ্গাতে তোমার,
যেতেছি, এসেছি তাই লইতে বিদায় ;
নিভিছে নয়নজ্যোতি সকলি আঁধার
একবার কাছে এসো দেখে নিই হায় !

তরুণা (জাগিয়া)—

এ কি বীণা ! তুমি সখি ভূতলে শয়ান,
কি হয়েছে,আবার কি ছলে গেছে তোরে ?
জলভরা কেন তোর ও দুটি নয়ান,
আমি সখী তোর, বীণা বলিবিনা মোরে ?

বীণা (কাতর স্বরে)—

তরুণা স্নেহের বোন আমি বোন তোর,
যাই সখি অভাগীরে করোনাক মনে।
ফুরায়ে এসেছে যে লো জীবনের ঘোর
বাঁধা সখি তোমাদের আমি মাঝখানে।

(শৈলের প্রতি)

একবার আর সখা দেখি মুখখানি,
আমারে কোরোনা মনে, দুখ-স্মৃতি হায়।
অন্ধ আঁখি আর বুঝি ফোটেনাক বাণী,
প্রিয়তম জন্মতরে এ শেষ বিদায় !

নবম দৃশ্য।

শৈল ও তরুণা।

তরুণা—

তাই বুঝি আমারে হেরিয়া,
চাহিত ও সজল নয়ানে।
কহিত এ নিরাশার ব্যথা,
কি বুঝিবি সরল পরাণে!
এ নিখিলে আমি অভাগিনী,
বুঝিতে পারিনি কোন কথা,
নিমেষের তরে মাঝখানে,
এসে সখা দিনু এত ব্যথা।
যাই আমি, কোথা যাব হায় !
আমারে করোনা মনে আর।
এ সংসার ছি ছি ঘৃণা হয়,
ছলনার ক্ষুদ্র পারাবার !

শৈল—

তরুণা তুমিও যাবে চলে
একাকী আমিই রব হায় ?
মুগ্ধ প্রিয়ে কেন করে ছিলে,
চপল ও আঁখির ভাষায়।
জাননাকি সংসারের খেলা,
দুটি হৃদে বাজে একই তার।
মুগধ এ আপনা পরাণে
সঁপেছি ও চরণে তোমার।
কি ক্ষণে কি মহা শুভক্ষণে
দেখা হল তোমায় আমায়।
ভুলেছি এ নিখিল সংসার,
ভুলে সখি গেছি আপনায়।

তরুণা—

এ খেলায় কাজ নাই আর
আমার এ পরাণ উদাস।
চলে যাব আপনার গেহে
মুক্ত পথ, উদার আকাশ।
আছে সেথা সবি মোর মত,
শিখি নাই প্রণয়ের ভাষা।
কেন সখা বাঁধিতেছ মোরে,
নিতান্ত সে কেবলি দুরাশা।

শৈল—

যেতে সাধ যদি তবে যাও,
এ পরাণ যাও নিয়ে সাথে।
শ্যামল সে তটিনীর তীরে
স্নিগ্ধ সেই তরুর ছায়াতে।
নিমেষেও আমারে স্মরিয়া
যদি শুধু অশ্রু উথলায়—
ধন্য হবে প্রণয় আমার।
সফল মানিব আপনায়।

তরুণা—

ভুল সবি ভুল, শুধু ভুল করে
আমারে বেসেছ তুমি ভাল।
শুধু সখা নয়নের তৃষা,
অমৃত নহে, এ হলাহল !
দুদিনের এ মোহ ফুরাবে
আমি হব ধূলিতে বিলীন,
এ কি প্রেম জনমের তরে,
মনে কি থাকিবে চিরদিন ?
বীণারে কি বাস নাই ভাল
দাও নাই হৃদয় তাহায় ?
ছি ছি এ যে পাপময় ধরা
পুণ্য বুঝি বল ছলনায় ?

শৈল—

কি নিঠুর তোমার পরাণ,
এত রোষ এত তিরস্কার ;
তোমারি তরেতে শুধু প্রিয়ে
পাপ পুণ্য ভাগী এ ধরার।
কি পাপ করেছি নেই মনে,
তোমারে বেসেছি শুধু ভাল।
অনুতাপে জর জর হয়ে
জ্বলিয়া মরিব চির কাল।
যাও তুমি আমারে ফেলিয়া,
একবার তবু চাও ফিরে।
চিরদিন আমার পরাণ
বেড়াবে তোমারে ঘিরে ঘিরে।
কাজ নাই যাক্ ভেঙ্গে যাক্
দুদিনের এ মোহ স্বপন।
একবার জনমের তরে
ধর সখি এ দুটি চুম্বন !
তাও কি নেবেনা ঘৃণাভরে ?
এত কি ঘৃণিত আমি হায় ?

কি উন্মাদ বিদ্যুৎ লহরী
দুটি আঁখে আজি উজলায়।

তরুণা—

ভুলে যেও করোনাক মনে,
নিঠুরা এ অভাগীর কথা।
নিমেষের তরে মাঝখানে
জাগাইতে এসেছিনু ব্যথা।
এই খানে হোক সব শেষ
জনমের তরে এই হায় !
প্রেমের এ ছলনা স্বপন,
শেষ হল তোমায় আমায়।

প্রস্থান

শৈল—

গেল চলে তবু গেল হায় !
ছলে গেল পরাণ আমার।
এ আঁখি কি শুধু তিয়াষায়
ভুলে হেরেছিল মুখ তার ?
বীণারে কি বাসি নাই ভাল,
এত তীব্র নহে সে দহন,
সংসারের সে যে ছেলে খেলা
হাসি অশ্রু আশার স্বপন।
ভুলেছিনু তার প্রেম রাশি,
তরুণা যে ভুলালে আমায়।
প্রেম—প্রেম নশ্বর জগতে
এই কি সে প্রেম বলে হায় ?
এ যে তীব্র হলাহল জ্বালা,
কোথা যাব ভুলিব কি করে !
কেন হল এই অভিনয়,
দণ্ড দুই খেলিবার তরে।

পূর্ণিমারাত্রি।

কুটীরে বীরেন্দ্র সিংহ ও মুমূর্ষু বিনয়।

বিনয়।

এখনও কেন গো পিতা রয়েছ জাগিয়া
অপলক দুটি আঁখি চেয়ে মুখে মোর!
যাও পিতা রাত হল, কি হবে বসিয়া,
বুঝি শেষ হয়ে এলো জীবনের ঘোর।
কিছু সাধ নেই—যেন শুধু একবার,
(কি দুরাশা এখনও জাগিছে পরাণে)।
এ কুটীরে আসিবে না পিতা সে কি আর,
চাহিবে না হাসি মুখে সে দুটী নয়ানে?
দাও আজি কুটীরের দুয়ার খুলিয়া,
জ্যোছনা কিরণ ধারা আসুক হেথায়,
গাছে কি তেমনি ফুল রয়েছে ফুটিয়া,
সে যদি থাকিত গেঁথে দিত ফুলহার।
ও কি পিতা! পদধ্বনি? শুষ্কপত্রমাঝে,
কে আসিছে সেই বুঝি, যদি তাই হয়!
কি ঝটিকা বহে যায় হৃদয়ের মাঝে!
দেখো পিতা বুঝি সেই, আর কেহ নয়!

বীরেন্দ্র—

বিনয় স্নেহের ধন নয়নের মণি,
অকূল সংসারে মোর তুই ধ্রুব তারা
কেন বৎস নিদারুণ ও কঠোর বাণী
কি করে রহিব একা হলে তোমা হারা!
কিছু নয় শুষ্ক পাতা বুঝিগো সমীরে,
থেকে থেকে হেথা হোথা করে মর মর,
অথবা বনের পশু হেথা হোথা ফিরে,
কিম্বা শুনিতেছ বুঝি নির্ঝরের স্বর?

তরুণার প্রবেশ।

বীরেন্দ্র—

সত্যই এলি মা তুই দুখীদের ঘরে,
হেরিবারে আমাদের তরুণা আবার!
ওকি মাগো কেন চোখে অশ্রুজল ঝরে
দলিত কুসুম মরি পরশেগো কার!
(তরুণা বীরেন্দ্র সিংহের গলা জড়াইয়া)
আমি পিতা অভাগিনী দুখিনী তোমার,
ভুল করে গিয়েছিনু ভেঙ্গেছে সে ভুল,
এ সংসার ছলনার ক্ষুদ্র পারাবার,
আমি ক্ষুদ্র তৃণ গাছি, পাথার অকূল।
বুঝিতে পারি না পিতা সংসারের ভাষা,
নিবিড় স্নেহের ছায়ে আছিনু মগন।
ক্ষত আজ তীক্ষ্ণ বাণে! হায় কি দুরাশা!
এ যে তীব্র জ্বালাময় দারুণ দহন।

বিনয়—

পিতা কাছে সরে এসো দেখি শেষ দেখা,
মিটিয়াছে অতৃপ্ত এ জীবন বাসনা।
হোথা ওই দেখা যায় স্বরগের রেখা
জ্যোতির্ম্ময় কি আলোকে হারাই আপনা।
আজ সখি তুমি হেথা আসিয়াছ হায়,
আমি যে দাঁড়ায়ে আছি মৃত্যুর সামনে।
বিফল মিলন আজি তোমায় আমায়,
আর হেরিব না সখি তোমার আননে।
কিবা স্নিগ্ধ সমীরণ কি মধু পরশ,
কি প্রশান্ত সুবিমল মরণ সাগর।
কুসুমিত তরুলতা, মধুর হরষ;
দিগঙ্গনা খেলা ছলে ঘিরে চারিধার!
তুমি কি আসিবে সাধে, দাঁড়াবে কি পাশে,
এস যাই দুই জনে হাতে হাত ধরে।
না না বৃদ্ধ পিতা মোর চায় মোর আশে,
তুমি আঁখি তারা হবে এই ধরা পরে।

এ কি ভুল! কি চাহিগো? নেই আশা আর,
একটি হিল্লোলে মৃদু ভেসে যাই হায়।
ও তীরেতে গিয়ে ফিরে দেখিব এ পার,
বিফল মিলন সখি তোমায় আমায়!
কি চাহিগো? কিছু নয়; এ ছার বাসনা!
ওই হোথা ডুবে যায় আলোক আঁধারে।
বিবশ বিভুল আমি হায় আনমনা!
কে তুমি তুলিছ মোরে দুটি হাত ধরে?
আমিত ডুবিয়া যাই কে তোমরা হেথা,
আমি নই তোমাদের কেন মোরে ঘিরে?
কেন এত অশ্রুজল, কেন এত ব্যথা!
ছেড়ে দাও ডুবি ধীরে মরণ সাগরে।

মৃত্যু।

তরুণা—

বিনয় খেলার সাথী শৈশবের ঘরে,
কি দেখিনু অভাগিনী হেথা ভাই এসে,
চোলে গেলে একাকিনী রব ধরা পরে,
সবি গেল সবি গেল একা আমি শেষে!
কি অনল জ্বালাইয়া এসেছি সেথায়,
প্রাণ ফাটা সকরুণ কথা গুলি তার
এখনো রয়েছে জলে হৃদয়ের ছায়,
তুমিও ত গেলে চলে কে রহিল আর?

মূর্চ্ছা।

বীরেন্দ্র—

শেষ হল এই খানে সব অভিনয়,
আমি একা দাঁড়াইয়া দারুণ আঁধারে।
ছেড়ে গেলি অভাগায় তুইও বিনয়,
যদি যাবি সাথে কেন না নিলিগো মোরে!
কি গভীর অন্ধকার ভবিষ্যের ছবি,
ডুবিয়া যেতেছি তার গভীর অতলে,
আলো নেই হাসি নেই নেই সেথা রবি,
সুবিকট অন্ধকার চেয়ে আঁখি মেলে।
(তরুণাকে)
আয় মা আয় মা রাণী আয় বুকে মোর,
আশা কণা টুকু এই অকূল পাথারে!
দেখি চেয়ে প্রাণভরি মুখ খানি তোর,
তুই মা মধুর আলো এ ঘোর আঁধারে।

তরুণা—

আমারে ডেকোনা পিতা আর স্নেহ স্বরে
রাক্ষসী অভাগী আমি যেথা যাই হায়!
জ্বালাইয়া দিয়া আসি সেথা স্তরে স্তরে
অসহন তীব্র জ্বালা হৃদয়ের ছায়?
এই কি সুখের ঢেউ মধুর সমীরে,
ভাসিয়া ভাসিয়া আসে মানব পরাণে!
এই কি সে আলেয়ার আলো ছায়া ফিরে
মরীচিকা জ্বালাইয়া দেয়গো নয়ানে।
এ সুখে কি কাজ পিতা কাজ নেই আর,
সংসারের সুখ যত থাকুক সংসারে।
ঝটিকা গর্জ্জনময় অন্ধ পারাবার
বহে যাক, মগ্ন রব কুজ্ঝটি আঁধারে!
বড় শ্রান্ত দুদিনের খেলা সাঙ্গ হায়!
তোমার স্নেহের কোলে ঘুমাব আবার;
আর কেহ নাই পিতা মোদের হেথায়
চারিদিকে ছেয়ে শুধু ভীষণ আঁধার!

সমাপ্ত।

হার-জিৎ।

"Oh, but a man' reach should exceed his grasp,
Or what's a heaven for ?

Ro Browning.

এই বিশ্ব সংসার, এই মানব-জীবনকে সচরাচর একটি বিষম সংগ্রামক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সকলকেই অহর্নিশি সংগ্রাম করিতে হইবে। পলাইলে রক্ষা নাই, হার মানিলেও ছাড়ে না, মৃত্যু পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতেই হইবে। তুমি বাল্যকাল হইতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা কর নাই, তোমার সংগ্রামোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র নাই, একথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। যদি হার মানিয়া অস্ত্র শস্ত্র ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে অপর সকলের পদতলে দলিত হইতে হইবে, আমরণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেই মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। ক্রন্দনে কোন ফল নাই; কে তোমার ক্রন্দন শুনিবে? পরাজিতের কথা কেহ শুনে না। তবে যদি সংগ্রামে বিজয়ী হও, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে তোমার সুখের দ্বার উদ্‌ঘাটিত, যেখানেই যাও সেখানে তোমায় আদর করিবে, তোমাকে সম্মান করিয়া লোকে কৃতার্থ হইবে তোমার বক্ষঃস্থলে ষ্টারের পর ষ্টার ঝুলিবে, তোমার শিরে যশের মাল্য দুলিবে, তোমাকে আর জনতার মধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে না, তোমাকে দেখিয়া লোকে আপনা হইতেই পথ ছাড়িয়া দিবে। ইহাই এ সংসারের নিয়ম। ইহার নামই জীবন-সংগ্রাম।

উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণী জগতে চার্লস্ ডারউইন ও হারবার্ট স্পেন্সার এই জীবন সংগ্রামের নিয়ম বাহির করিয়া তাহার নাম প্রদান করিয়াছেন "Survival of the fittest" মানবের ইতিহাসেও এই নিয়মের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে। প্রাকৃত-জগতে এই নিয়মেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মানুষও প্রকৃতির নিয়মের অনুগত হইয়া আপন জীবন গঠন করিবে কি না, করা উচিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। প্রাকৃত-জীবনে স্বার্থ সাধনই জীবন লাভ ও রক্ষণের উপায়, অধ্যাত্ম-জীবনে স্বার্থত্যাগই প্রকৃত জীবনের সোপান। স্বার্থ-সাধনই বল, আর স্বার্থ-ত্যাগই বল জীবনের চরম লক্ষ্য যাহাই হউক না কেন, Survival of the fittest এই নিয়ম উভয় জগতেই তুল্য ভাবে প্রযুজ্য। তোমার অন্তরে যদি তেজঃ থাকে, তোমার বাহুতে যদি বল থাকে, তাহা হইলে এই জীবনে তুমি বিজয়ী হইবে, এ জগতে তোমার স্থান অটুট। আর যদি তুমি দুর্ব্বল হও, কাপুরুষ হও, তাহা হইলে এ জগতে তোমার স্থান নাই, কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া তোমাকে অন্ধকারে মুখ লুকাইতে হইবে।

আমরা লোকের মুখে সর্ব্বদাই হার-জিতের কথা শুনিতে পাই। কেহ দোকানে জিনিস কিনিতে গিয়াছিলেন, দোকানদার দাম ফেলিতে ভুল করিয়া খরিদ মূল্যের কম লইয়াছে, তিনি তাড়াতাড়ি টাকা দিয়া জিনিস লইয়া আসিয়া বাহাদুরী করিতেছেন, তিনি আজ বড় জিতিয়া আসিয়াছেন। কেহ বা দলিল জাল করিয়া কোন বিধবাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া যাহাতে আপনার চৌদ্দপুরুষ চৌঘুড়ী হাঁকাইয়া সুখের দোলায় দুলিয়া জীবন যাপন করিতে পারে এ ব্যবস্থা করিতেছিলেন; বিচারকের সন্দেহ হওয়াতে মোকর্দ্দমা খারিজ হইয়াছে, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন, তাহার বড় হার হইয়াছে! এরূপ হার-জিতের শত শত উদাহরণ ত সর্ব্বক্ষণই আমাদের চক্ষের উপর বিরাজিত রহিয়াছে। কবি অমৃতময়ী তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন—রাম কাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, নানা দেশ হইতে আমন্ত্রিতগণ সমবেত হইয়াছেন, পৌরজন আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছে, প্রজাবর্গের সুখবর্দ্ধন করিবার জন্য কত শত উপায় কল্পনা-বলে উদ্ভাবন করিতে করিতে রাম সুখসাগরে ভাসিতেছেন, এমন সময় কুমন্ত্রণা-কুশলী-কৈকেয়ী রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের ব্যবস্থা করিলেন, রাম অম্লান বদনে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিধান করিলেন। লোকে বলিল, এবার রামের হার।—শঠ প্রধান শকুনীর সাহায্যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে অক্ষে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন, পাণ্ডবেরা বনবাসী হইলেন, আর দুর্য্যোধন এক ছত্র রাজা হইয়া অতুল ধন ও ক্ষমতার অধীশ্বর হইলেন, তাহার অত্যাচারে ভারতভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল আর পাণ্ডবেরা পরগৃহে দাসত্ব স্বীকার করিলেন। দুর্য্যোধন এ সংসারে বিজয়ী। প্রাকৃত-জগতে প্রাকৃত-লোকের চক্ষে এই ভাবেই জয় পরাজয়ের মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে বিজয়ী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ভোগ সুখের সমস্ত উপকরণ নিয়তই তাহার করায়ত্ত; ক্ষমতা তাহার, ঐশ্বর্য্য তাহার, প্রতিপত্তি তাহার। তাহার ভয়ে লোক সশঙ্কিত, তাহার প্রসাদের জন্য লোক লালায়িত। কিন্তু অধ্যাত্ম রাজ্যে এ ভাবে মূল্য নিরূপিত হয় না, তাহার কষ্টিপাথর স্বতন্ত্র। সে কষ্টিপাথরে বিচার করিলে এ সমস্ত হারজিৎ স্থান বিনিময় করিবে। রাম রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন সত্য, বনবাসের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি তিনিই প্রকৃত বিজয়ী। এতটা দুঃখ, এতটা অভাব অম্লান বদনে সহ্য করা, আত্মার প্রভাবে দুঃখকে পরাজয় করিয়া দুঃখের উপর আত্মার সিংহাসন স্থাপন করাতে যে শৌর্য্যের পরিচয় তাহা কোথায় মিলে? লিয়োনিডাস্ থার্ম্মপলির পবিত্র ক্ষেত্রে আপনার হৃদয়ের শোণিত দিয়া যে পরাজয় ক্রয় করিয়াছিলেন, কোন্ বিজয়ী আপনার সমস্ত বিজয়-গৌরব বিনিময় করিয়া সে পরাজয় লাভ করিতে শ্লাঘা মনে না করেন? আর এই যে সে দিন ছিলিয়ান্‌ওয়ালাতে ইংরাজের মতে শিখ হারিল, সে পরাজয় কি শ্রীহীন ভারত-শিরে একটি দীপ্তিমান নক্ষত্র নহে? তবে জয় পরাজয়ের অর্থ কি?

ঐ যে বালক সতৃষ্ণনয়নে সুমিষ্ট আহারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, লোভ পরবশ হইয়া তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছে, এমন সময় মাতার নিষেধ বাক্য স্মরণ হওয়াতে মুখের গ্রাস নামাইয়া রাখিল, তাহার বীরত্বের পরিমাণ কোথায় মিলিবে? আর যখন জগতের বুদ্ধ সর্ব্বজন বাঞ্ছনীয় রাজপদ, প্রাণ-সমা প্রণয়িণী, নয়নানন্দকর পুত্র পরিত্যাগ করিয়া জীবন সমস্যা পূরণ করিতে বনচারী হন, তখন তাঁহার সে বিজয় ভুবনে অতুলনীয়। তাইত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, হারজিৎ কাহাকে বলে? আবার কত শত সহস্র লোক সামান্য একটু দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রন্দনের রোলে আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে, কেহ বা পাগল হইতেছে, কেহ বা আত্মহত্যা করিতেছে। তাহারা এ সংসারে পরাজিত; তাহাদের স্থান কোথায়? যেমন দুঃখ সহ্য করাতে বীরত্ব আছে, তেমনই সুখ সহ্য করাও সামান্য বীরত্বের পরিচয় নহে। গরিবের সন্তান, চিরদিন শাকান্নে প্রতিপালিত; সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপা গুণে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন; কিন্তু সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অসহ্য কণ্ডূয়ণ সহ্য করিতে না পারিয়া "হঠাৎ বাবু" হইয়া পড়িলেন, ধরাটা ছোট হইয়া হঠাৎ সরা সদৃশ হইয়া পড়িল। তাহার তেজে ছোটখাট লোকের তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল। কিন্তু পৃথিবীর দুলাল সরকারেরা ক্রোর-পতি হইয়াও পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হন না, পুরাতন প্রভুর গৃহ হইতে হাঁটিয়া মাসহারা পেন্সন্ স্বরূপ আটটি টাকা আনয়ন করা শ্লাঘা বলিয়া বিবেচনা করেন। এ শৌর্য্য বীর্য্য সংসারে দুর্ল্লভ।

তাইত বলি হারজিৎ কাহাকে বলে? মানুষ সুখের ভিখারী, "সুখ সুখ" করিয়া সারাটা জীবন ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সুখ চাহিল, বা সুখের উপকরণ সংগ্রহ করিল, সংসার তাহারই জয় ঘোষণা করে। আর যে ব্যক্তি সুখের অন্বেষণ করিতে করিতে আপন অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হইতেছে, নৈরাশ্য হইতে নৈরাশ্যে, দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে উপনীত হইতেছে, আমরা তাহারই পরাজয় স্মরণ করিয়া কৃপা করি। কিন্তু সুখদুঃখ জয় পরাজয়ের প্রকৃত নিদর্শন নহে। মানুষ দুঃখের মধ্যেই বিজয়ী হইতে পারে, সুখের মধ্যেও পরাজিত। Aristides হারিয়াই বিজয়ী, Themistocles জিতিয়াও পরাজিত। প্রকৃত জয় আত্মার শক্তির উপর নির্ভর করে। সুখদুঃখ আত্মার শক্তি পরীক্ষা করিবার উপায় মাত্র। যিনি যে পরিমাণে শক্তিশালী তিনি সেই পরিমাণেই সুখদুঃখ ধারণ করিতে পারেন, এবং এই ধারণা-শক্তিই মানবাত্মার মহত্বের পরিমাপক। তুমি আজীবন ধন সঞ্চারের জন্য আপনার জীবন নিয়োজিত করিয়াছ, তুমি যশের অন্বেষণে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়াছ, তুমি জ্ঞান লাভের জন্য দেহপাত করিয়াছ বা কোন লোকহিতকর কার্য্যের জন্য জীবন মন উৎসর্গ করিয়াছ, অথবা কাহারও প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় মনের শক্তিরাজি একাগ্রীভূত করিয়াছ, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, তুমি দুঃখে অভিভূত হইলে, তোমার হস্তপদ অসাড় হইল, মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইল, হৃদয় নির্জ্জীব হইয়া পড়িল, তোমার

সমস্ত শক্তি নৈরাশ্যের করাল কবলে নিপতিত হইল তুমি জীবন-সংগ্রামে পরাজিত, এ সংসারে আর তোমার স্থান নাই, এখন তোমার জীবন মৃত্যুর রূপান্তর মাত্র। আর তুমি, তুমি যে বড় হাসিতেছ, আনন্দের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছ, সুখের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া তোমাকে নিমজ্জিত করিতেছে, তুমি মাথা তুলিতে পারিতেছ না, ঐ তরঙ্গের উপর যে মহা আকাশ প্রসারিত রহিয়াছে, সুখে আত্ম বিস্মৃত হইয়া তাহা দেখিতে পাইতেছ না—তুমিও মনে করিও না তুমি এ সংগ্রামে বিজয়ী, তুমিও পরাজিত। তোমার ভাইয়ের আত্মা দুঃখে ডুবিয়াছে, তুমি না হয় সুখে ডুবিয়াছ—কিন্তু সংসার সমুদ্রে ডুবিলে দুজনেই। প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ যিনি, সংসার সংগ্রামে বিজয়ী যিনি, তিনি কখনও সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, কিছুতেই ডুবেন না, তাঁহার মস্তক সুখদুঃখের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে উত্থিত হয়, যত সুখ বা যত দুঃখই আসুক না কেন, তিনি তাহা ধারণ করিয়া আপনাতে অধিষ্ঠিত। মহা সমুদ্রের ন্যায় তিনি আপন বেগ আপনাতেই ধারণ করেন, তাঁহার অন্তরের উচ্ছ্বাস কখনই বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না। বস্তুতঃ এই ধারণা শক্তিতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত মহত্ব। নিউটনের সাতাশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল যখন তাঁহার প্রিয় কুক্কুর ডায়মণ্ড দ্বারা ভস্মীভূত হইল, যখন কারলাইলের বহু পরিশ্রমের ফল, জীবনোপায় স্বরূপ ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত মিল হারাইয়া ফেলিলেন, তখন তাঁহারা শোকে অভিভূত হন নাই, ক্রোধ বা বিরক্তি তাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের শক্তি এ আঘাতে কিছু মাত্র হ্রাস হইল না, বরং নূতন উদ্যমে তাঁহারা সেই বিনষ্ট ধনের পুনরুদ্ধারে যত্নশীল হইলেন। তাঁহাদের আত্মা দুঃখে বিজয়ী। আবার যখন নিউটনের প্রতিভার আলো ইউরোপময় ছড়াইয়া পড়িল, যখন সমস্ত বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহাকে সম্মান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, যখন তাঁহার মস্তকে জয়মাল্যের পর জয়মাল্য বর্ষিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহার বীর্য্যশালী চিত্ত সুখে বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল না, তাঁহার সে অগাধ হৃদয় চঞ্চল হইল না; তিনি দুঃখে যেমন বিজয়ী হইয়াছিলেন, সুখেও তেমনই বিজয়ী রহিলেন, তাঁহার আত্মা সুখ অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে উত্থিত হইল। এই ভাবে সুখ দুঃখের উপর তুল্য ভাবে আত্মার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে যিনি সমর্থ হইলেন, তিনিই ধন্য, তিনিই জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী, তিনিই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। আর যে সংসারে আসিয়া কেবল "সুখ সুখ" করিয়া লালায়িত হইয়া বেড়াইল, যাহার আত্মা সুখ দুঃখের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ডুবিয়া গেল, আর সেই মহা আকাশের দিকে চক্ষু তুলিতে পারিল না, যাহার মস্তক সুখ দুঃখের শক্তিকে জয় করিয়া অনন্তের সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারিল না, সে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত, অধ্যাত্ম-রাজ্যে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

মালবিকা-অগ্নিমিত্র।

(২)

আচার্য্যদ্বয় আপন আপন শিষ্যা লইয়া প্রস্তুত, এখন কাহার পরীক্ষা আগে গ্রহণ করা উচিত। গণদাস, হরদাসের অপেক্ষা, জ্ঞানে না হউক, বয়সে বৃদ্ধ বলিয়া, স্থির হইল প্রথমে তাহারই শিষ্যার অভিনয় দেখা কর্ত্তব্য। অনতিবিলম্বে আচার্য্যের সহিত বিরলনেপথ্যবতী মালবিকা রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইল। শিল্পাচার্য্য গণদাস শিল্পীর নয়ন দিয়া নিরলঙ্কার সুন্দরী বালিকার অঙ্গসৌষ্ঠবতা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মুগ্ধ হইতেছে, আর প্রবল রূপতৃষ্ণাপরায়ণ বিলাসী রাজা ত তাহাকে দেখিয়া একেবারে বিহ্বল, আত্মহারা। চিত্রগতা অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখিয়া রাজার মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল, পাছে জীবন্ত প্রতিমা তাহার অনুকরণের নিকট মাধুর্য্যে পরাজিত হয়। এখন সে আশঙ্কা দূর হইল। এখন বুঝিলেন চিত্রকর কিছু ক্ষিপ্রহস্ত শিথিলপ্রযত্ন; রূপসীর পরিপূর্ণ মাধুরী চিত্রেতে ধীরে সুস্থে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই। এদিকে রাণী এতক্ষণ কম্পিত হৃদয়ে যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই হইল। মালবিকাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহার প্রতি রাজার আকর্ষণের বেগ শতগুণ বাড়িয়া গেল। মালবিকাও সঙ্গীতচ্ছলে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "নাথ মাং পরাধীনাম্ ত্বয়ি গণয় সতৃষ্ণাং" "হে নাথ এ পরাধীনাকে তোমার প্রতি সতৃষ্ণ জানিও।" এই কথাটা রাজাকে আরো আলোড়িত করিল। সত্যইকি মালবিকা, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিল? গান সমাপ্ত হইলে মালবিকা আপনা হইতে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিদূষক তাহাকে ডাকিয়া দুটো বাজে রসিকতার ছল করিয়া আরো কিছুক্ষণ রাজার নয়ন পথে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। সে ফন্দী বেশীক্ষণ টিঁকিল না। রাণী বিদূষকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গণদাসের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শিষ্যার অভিনয়-প্রদর্শন কি সমাপ্ত হয় নাই?" গণদাস রাণীর প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিয়া শিষ্যাকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। পরিব্রাজিকা প্রাশ্নিকপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালবিকার অভিনয় সম্বন্ধে সকলে যখন তাঁহার মতামত জানিতে চাহিল তিনি বলিলেন যথাশাস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হইয়াছে। অঙ্গের প্রত্যেক ভঙ্গীটি যেন অন্তর্নিহিত বচন, ভাবের অনুবন্ধও চমৎকার।" রাজা স্বীকার করিলেন গণদাসের ক্রিয়াসংক্রান্তির এরূপ উৎকর্ষতা দেখিয়া তাঁহার স্বপক্ষগৌরব শিথিল হইয়াছে। গণদাসের পরীক্ষাত শেষ হইল, হরদাসের পরীক্ষা এখনও বাকী আছে। কিন্তু তাহা দেখিতে আপাতত রাজার ইচ্ছাও নাই, সময়ও নাই, আর তাহা নাটকের পক্ষেও অনাবশ্যক; কারণ তাহা নাটকীয় নির্দ্দিষ্ট পরিণামের অঙ্গীভূত নহে, সুতরাং এইখানেই মধ্যাহ্ন বৈতালিক পঠিত হইল,

রাজা অব্যাহতি পাইলেন। তাহার পরদিন হরদাসের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রাজা মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাপন করিতে মহিষীর সহিত অন্তঃপুরে গমন করিলেন; দ্বিতীয়াঙ্কের শেষ হইল।

এখন রাজা ও মালবিকার মিলনোপায় কি? রাজা ইচ্ছা করিলেই মহিষীর উপর প্রভুত্ব খাটাইয়া আপনার জেদ বজায় রাখিতে পারেন। কিন্তু তাহার একটা প্রতিবন্ধক আছে—প্রকাশ্য বিদ্রোহের সাহস তাঁহার নাই। তাহার একটী কারণ চক্ষুলজ্জা! মালবিকার চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়া তিনি মনে মনে মহিষীর নিকট অপরাধী। আমাদের সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া লজ্জাকর হইবার কথা নহে। তবু দ্বিতীয়বার বিবাহোদ্যত স্বামীর প্রথম স্ত্রীর প্রতি সলজ্জ অপরাধীর ভাবে এই সামাজিক আচারের অনাচারত্বটুকু ধরা পড়ে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ না করিবার আরো একটী কারণ এই যে, রাজা বাস্তবিকই মহিষীকে সম্মান করিয়া চলেন। এ যে সম্মান সে তাঁহার পত্নীত্বের প্রতি সম্মান। তাঁহার প্রবল রূপলালসা এবং সেই লালসার অনুকূল সামাজিক প্রথা তাঁহাকে মহিষীর নিকট অবিশ্বাসী করিয়াছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একেবারে মনুষ্যত্বহীন কর্ত্তব্যবোধশূন্য নহেন। রাজহৃদয় হইতে বিচ্যুত করিয়া যে পত্নীর প্রতি ঘোর অবিচার করিয়াছেন, রাজ-সংসারেও তাঁহার কর্ত্রীত্বের প্রকাশ্য অবমাননা করিয়া নিতান্ত ইতরের ন্যায় কিরূপে ব্যবহার করিবেন? রাজা অন্যসংক্রান্তহৃদয় বলিয়াই মহিষী তাঁহার নিকট আরো বিশেষ সম্মানিতা। বিক্রমোর্ব্বশীতে কালিদাস এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। উক্ত নাটকে, দেবী প্রিয়ানুপ্রসাদন নামক এক ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন। রাজা তাহা শুনিয়া দেবীকে বলিলেন "কল্যাণি! কেন অকারণে এই কঠোর ব্রতের দ্বারা তোমার মৃণালকোমল গাত্রকে ক্লেশ দিতেছ? যে দাস তোমার প্রসাদাকাঙ্খী, তুমি আবার তাহার নিকট কি প্রসাদ ভিক্ষা করিবে?"

নাটকের নায়িকা উর্ব্বশী আড়াল হইতে রাজার কথা শুনিয়া, সখি চিত্রলেখাকে বলিল "ইঁহার প্রতি রাজার অত্যন্ত সম্মানভাব দেখিতেছি।" ভাবটা, "তবেত ইনিই রাজার প্রণয়িনী, আমার পক্ষে রাজার প্রণয়াশা দুরাশা মাত্র।" চিত্রলেখা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল "অয়ি মুগ্ধে অন্যসংক্রান্তহৃদয় হইলে শিষ্টাচারী ব্যক্তি পূর্ব্বপ্রণয়িনীদের প্রতি অধিকতর আনুকূল্য করিয়া থাকেন।" অর্থাৎ প্রেমের অভাব, সম্মান ও শিষ্টাচার দিয়া পূরণ করিয়া, কর্ত্তব্যবোধের চক্ষে ধূলা দিয়া তাহাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থির করিতে চেষ্টা করেন। ইহাও ভাল। তৃতীয় সংখ্যক 'সাধনায়' পূজনীয় সমালোচক যে বলিয়াছেন "সেকালের মহিষীদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল বলিয়াই তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল রাজকুলকে দমনে রাখিতে পারিতেন" এ কথাটা ঠিক বোধ হয় না। ভাবিয়া দেখা উচিত মহিষীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আসিল কোথা হইতে? রাজার দোর্দ্দণ্ডতর হইতে কি আটক ছিল?

অসংযত রাজচরিত্রের মধ্যেও উচ্চ মনুষ্যত্বের অঙ্কুর ছিল বলিয়াই তাঁহারা মহিষীর শাসনে মস্তক অবনত করিতেন। রাজাবরোধে মহিষীর আইন অটুট্য—সেও রাজারি শাসনে। রাজা আপন শাসনে আপনি বদ্ধ সুতরাং মহিষীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের শক্তি তাঁহার নাই। তাই মালবিকালাভে নিরাশ হইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এ দিকে মালবিকাও দিন দিন মালতী মালাটির মতন ম্লায়মান হইয়া পড়িতেছে। এখন তাঁহাদের মিলনোপায় কি? দৈব তাঁহাদের সহায় হইল।

রাণীর প্রমোদোদ্যানের একটী অশোক বৃক্ষে আজও ফুল ফুটে নাই। সে বন্ধ্যা কুসুমশ্রীহীনা তরু কোন সুন্দরী রমণীর সালক্ত সনুপূর চরণতাড়না প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যের সঞ্জীবনী স্পর্শে জড়ও সচেতন হইয়া উঠিবে, সুন্দরী নারীর পাদস্পর্শে সে তপনীয়াশোক যৌবনমঞ্জরিত হইবে। রাণী স্বয়ং আসিয়া তাহার দোহদ পূর্ণ করিতে অক্ষম, কারণ দোল্‌না হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি ভগ্নপদ লইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন। সেই জন্য মালবিকাকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন মালবিকার পাদতাড়নায় আজ হইতে পঞ্চরাত্রে যদি সে বৃক্ষ কুসুমিত হয় তবে মালবিকার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

মালবিকা প্রমোদ উদ্যানে সেই অশোক তরুর সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল। রাণীর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহাকে বৃক্ষে পদাঘাত করিতে হইবে। অনতিবিলম্বে বকুলাবলিকার সেই অলঙ্কার লইয়া আসিবার কথা, এখনও সে আসিয়া পৌঁছে নাই। মালবিকা একলা থাকিবার অবসর বড় একটা পায় না। মন খুলিয়া কাঁদিবার সুখও অভাগিনীর ভাগ্যে তাই দুর্লভ। যে দুঃখ আপন মনে নির্জ্জনে উপভোগ করা না যায়, সে অশ্রুহীন, রুদ্ধ, অন্তর্দাহকর দুঃখ কঠোর, কঠিন, সান্ত্বনারহিত। বহু লোক-সমাকীর্ণ রাজান্তঃপুরে মালবিকার এতদিন সেই প্রচ্ছন্ন তুষানল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। বিজনতার মূল্য তাই বালিকা জানিয়াছিল, তাই আজ এই কয়েক মুহূর্ত্তের স্বাধীনতা সম্মুখে দেখিয়া তাহার মনে হইল এই সময়টুকু হইতে বিলাপ-সমুদ্রে মগ্নতার সুখ আদায় করিয়া লইবে। সে যে অবিজ্ঞাত হৃদয় রাজার প্রতি অভিলাষবতী এই কথা স্মরণ করিয়া একবার আপনাতে আপনি লজ্জিত হইল। একবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "রে হৃদয়! থাম্, থাম্, বিরত হ! তোর এ বাসনা পূর্ণ হইবার নহে—বৃথা এ আয়াস।" তাহার স্বাধীনতার মেয়াদ ফুরাইল। বকুলাবলিকা নুপূর আনিয়া মালবিকাকে সাজাইতে লাগিল। মহিষী বলিয়াছেন তাহার পদাঘাতে বৃক্ষ কুসুমিত হইলে মালবিকার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। মালবিকা মনে মনে ভাবিতে লাগিল যদি তাহার পদাঘাত ব্যর্থ হয়, যদি বৃক্ষে ফুল না ধরে তবে এই সজ্জাই তাহার মৃত্যুসজ্জা।

নাটকের প্রায় সমস্ত প্রধান পাত্র পাত্রীদের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। কেবল একজনের সহিত পরিচয় হইতে এখনো বাকী আছে। সে রাজার দ্বিতীয়া পত্নী, ইরাবতী। রাণীর পরিচারিকারা ইতি মধ্যে অনেকবার কাণাকাণি করিয়াছে যে, ইরাবতীর জন্য রাজা এককালে যেরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, মালবিকার জন্য এ নূতন চঞ্চলতা তাহাকেও অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলে ইরাবতীর জন্যও রাজা এককালে খুব চঞ্চল হইয়াছিলেন। এতদিন ইরাবতীই রাজার "আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি" হইয়া সমস্ত হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু ইতি মধ্যে রাজা যে গোপনে গোপনে মালবিকার নিকট আপনাকে বিনামূল্যে বিক্রীত করিয়া ইরাবতীকে দেউলে করিয়াছেন সে খবর ইরাবতী এখনও পায় নাই। ইরাবতীর পায়ের তলা হইতে রাজা সমস্ত হৃদয় জমিটা সরাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু ইরাবতীর বিশ্বাস যে সে পূর্ব্ববৎ তাহারই উপর অটলভাবে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ নববসন্তসমাগমে সে সরল প্রেমপূর্ণ আনন্দচিত্তে রাজার সহিত দোলাধিরোহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে। রাজার মানসিক অবস্থা আপাততঃ ঠিক ইরাবতীর সহিত দোলাধিরোহণ করিবার মত নহে। ইরাবতীর প্রতি পূর্ব্ব প্রণয়ের ভাব আর নাই; সুতরাং এখন তাহার সহিত নিভৃতে প্রণয়ালাপ কেবল চেষ্টাসাধ্য, আয়াসজনক। আর তিনি জানেন পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ অধিক আদরও চেষ্টাযুক্ত হইলে ব্যর্থ হইবে! কেননা স্ত্রীলোকেরা যেরূপ নিসর্গনিপুণ তাহাতে করিয়া ইরাবতী সে আদরের প্রাণহীনত্বটুকু নিমেষে ধরিয়া ফেলিবে। মনস্বিনী রমণীর পক্ষে প্রেমহীন আদরের ন্যায় অপমানজনক আর কিছুই নহে। এই বিবেচনা করিয়া রাজা মনে করিলেন একটা কোন ওজর করিয়া ইরাবতীর প্রার্থনা কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু আবার ভাবিলেন তাহার চিরপরিচিত রাজানুগ্রহ হইতে তাহাকে একেবারে বঞ্চিত করিবেন? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া ইরাবতীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য না করাই স্থির করিয়া বিদূষকের সহিত বিষণ্ণ হৃদয়ে প্রমোদ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইরাবতীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু যাহাকে দেখিলেন তাহাকে দেখিয়া মনে হইল জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ নয়। বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া বকুলাবলিকা ও মালবিকার কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। এখন বকুলাবলিকা রাণীর পরিচারিকা বটে, কিন্তু বিদূষক তাহাকে হস্তগত করিয়া রাজার দৌত্যে স্বীকৃত করাইয়াছে। সে মালবিকার পায়ে আল্‌তা পরাইতে পরাইতে, কৌশলে রাজার কথা পাড়িয়া তাঁহার প্রণয় ব্যক্ত করিল। মালবিকা প্রথমে মনে করিল, সখী বুঝি তাহার সহিত কৌতুক করিতেছে, কিন্তু বারম্বার করিয়া বলায় ক্রমশঃ তাহার বিশ্বাস হইল। তখন বলিল "সখি, দেবীর কথা মনে করিয়া আমার ভয় হয়।" বকুলাবলিকা বলিল "ভ্রমরের দ্বারা পীড়িত হইবার ভয় আছে বলিয়া কি বসন্ত-কালে আম্রমুকুল বিকসিত হইবে না?" রাজা মনে মনে বকুলাবলিকাকে সাধুবাদ

করিতে করিতে সময় বুঝিয়া আপনিই দেখা দিলেন। রাজার কিন্তু একটী বড় ভুল হইয়াছিল। এখনি যে ইরাবতীর এই উদ্যানে আসিবার কথা আছে তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আর তাহা মনে থাকিলেও বোধ হয় উপস্থিত সুবিধার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তিনি ভুলিয়াছেন, কিন্তু ইরাবতী ভুলে নাই। সেও যথা সময়ে নিপুণিকার সহিত উদ্যানে আসিয়া রাজাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অশোকতলায় মালবিকাকে দেখিয়া অন্য এক বৃক্ষান্তরাল হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তায় যখন জানিতে পারিল যে, রাজা ও মালবিকা পরস্পরের প্রণয়াভিলাষী তখন তাহার প্রাণ শুখাইয়া গেল, বুকের কাছটা কেমন করিয়া আসিল। কিন্তু তখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না যে রাজা সত্যই অবিশ্বাসী। কিন্তু যখন দেখিল রাজা বৃক্ষান্তরাল হইতে সহসা মালবিকাকে দর্শন দিয়া তাহার সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন তখন আর অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। নববসন্তের সুখের ঘোর হইতে তাহার কি দারুণ জাগরণ! তাহার নবীন হৃদয়ের সুন্দর বিশ্বস্ত প্রেমময় ভাবের সহসা কি তীব্র কুৎসিত ঈর্ষায় বিকৃতি। রাজা মহিষীকেই ভয় করিয়া চলেন, কিন্তু ইরাবতীতেও যে ভীতির কারণ আছে তাহা স্মরণ ছিল না। মহিষীর শাসনের সম্পর্ক রহিত এই নির্জ্জন নেপথ্যে তিনি মালবিকার সহিত কিঞ্চিৎ মিষ্টালাপ বেশ গুছাইয়া আনিয়াছেন এমন সময় তাঁহার পূর্ব্ব আদরের আদরিণী সুরাপানে টলিতে টলিতে, যৌবনভারে হেলিতে হেলিতে, রাগে জ্বলিতে জ্বলিতে একটা আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল। মহিষীর তুলনায় ইরাবতী বালিকা সুতরাং মহিষীর ধীর সুশোভন প্রশান্ত-তেজ তাহাতে থাকিবার কথা নহে, তাহার উপর আপাততঃ মদ্যপান প্রযুক্ত তাহার নিজের উপর কিছুমাত্র আয়ত্ত নাই—একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান শূন্য। তাই সেই মধুমুখে রাজার প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ এবং কাঞ্চী লইয়া তাড়না চলিতে লাগিল। এমন বিপদেও মানুষে পড়ে,—নাকালের চূড়ান্ত। রাজা বিদূষককে কাণে কাণে বলিলেন "ওহে বয়স্য আপাততঃ পরিত্রাণের উপায় কি ?"

"কি আর ? জজ্ঘা-বল ?"

কথাটা রাজার সঙ্গত বোধ হইল না। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে নিজেকে দোষী সপ্রমাণ করা হইবে, তাহা হইলে ত চলিবে না। অভিমানিনী রমণীর আবেগপূর্ণ তীব্রবচন বড় অস্বস্তি জনক—ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিয়া যাওয়া চাই। শোভন সারল্যের সহিত মালবিকার প্রতি তাঁহার অনুরাগ স্বীকার করিলে রাজোচিত, আত্মমর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার হইত। কিন্তু তাহাতে তিনি দণ্ডার্হ হইতেন—ইরাবতীর রাগ বাড়িত বই কমিত না; দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে কেহ তাহার প্রতি তীব্রভাবাপন্ন এ জ্ঞান প্রীতিজনক নহে; যে পীড়া, যে দণ্ড তাহার প্রাপ্য তাহা বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে সবল, মহৎ

হৃদয়ই সক্ষম। ভোগাসক্ত দুর্ব্বল বিলাসী হৃদয়ের আরামের প্রতি সবিশেষ আকর্ষণ। শাস্তি আরামবিরোধী, অপ্রীতিকর; সুতরাং রাজার দুর্ব্বল আরাম-প্রিয় হৃদয় তাহা ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিতে নিতান্তই নারাজ। দুর্ব্বলের অস্ত্র কপটতা; রাজা আত্ম রক্ষার্থে সেই অস্ত্র প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন; ইরাবতী যখন তাঁহাকে মালবিকার প্রণয়াভিলাষী শঠ, অবিশ্বাসনীয় হৃদয় বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল তখন তিনি অম্লান চিত্তে, অম্লান বদনে বলিলেন, মালবিকার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তিনি শুধু ইরাবতীগত-প্রাণ, তিনি বিশ্বাসীর আদর্শ ইত্যাদি ইত্যাদি। ইরাবতীর চরণে পতিত হইয়া মিষ্ট মিষ্ট কথায় তাহার অকারণ কোপ সংহরণ করিতে অনুনয় করিলেন। রাজার বিশ্বাস-ঘাতকতার চাক্ষুষ প্রমাণ ইরাবতী পাইয়াছে, সুতরাং সে মিষ্ট কথায় প্রতারিত হইবার পাত্র নহে! পা টানিয়া লইয়া রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনে একটা অপ্রীতিকর ভাব জাগাইয়া গেল। এই দৃশ্যে কবির শিল্পচাতুর্য্যের অভাবের পরিচয় দিয়া গেল। রাজার এই অরাজোচিত মিথ্যাচরণ স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু সুন্দর নহে; সুতরাং ইহা চিত্রিত না করাই শকুন্তলা-কবির পক্ষে শ্রেয় ছিল। বিক্রমোর্ব্বশীতেও ইহার জুড়ি একটী দৃশ্য আছে। উর্ব্বশী ভূর্জপত্রে রাজাকে এক প্রেমলিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছে; বিদূষকের অসাবধানতাবশতঃ তাহা বাতাসে উড়িয়া গিয়া দেবীর হস্তগত হইয়াছে; রাজা ও বিদূষক যখন সেই পত্র খুঁজিতে ব্যস্ত, তখন দেবী তাহা লইয়া গিয়া রাজার হাতে দিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র তুমি যাহা খুঁজিতেছিলে, এই তাহা লও।" রাজা ফাঁপড়ে পড়িয়া বলিলেন, "তিনি এ ভূর্জপত্র খোঁজেন নাই, ইহা পূর্ব্বে কখন দেখেনও নাই; চরণে পতিত দাসের প্রতি মহিষীর অকারণ কোপ সংহরণ করিতে আজ্ঞা হউক" ইত্যাদি ইত্যাদি। রাণীত তখন রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু সেকালের পতিব্রতা নারীর স্বামীর উপর বেশীক্ষন রাগ থাকে না; রাজার প্রণিপাত লঙ্ঘন করিয়া যে পাপ করিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাণী রোহিণীসংযোগে প্রিয়ানুপ্রসাদন নামে এক ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। প্রথমে চন্দ্রপূজা করিয়া তাহার পর স্বামীর পূজা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এই দেবতামিথুন চন্দ্র রোহিণীকে সাক্ষী রাখিয়া আমি শপথ করিতেছি আজ হইতে তুমি যে স্ত্রীর প্রতি প্রণয়বান্ হইবে আমি তাহার সহিত প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইব।" মহিষী যখন তাঁহার উদার মহত্ত্বের এইরূপ পরিচয় দিতেছেন তখনও রাজার সেই হীন শঠবাক্য; তিনি বলিলেন, "হে ভীরু! তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা নিতান্ত ভুল, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহারো প্রতি অনুরক্ত নহি"। রাণী বলিলেন, "তুমি আর কাহারো প্রতি অনুরক্ত হও বা না হও, আমার যা কাজ আমি করিলাম, আমার প্রিয়ানুপ্রসাদনব্রত যথা নিয়মে সম্পাদিত হইল, এখন আমি চলিলাম।" এইরূপ অনাহূতভাবে মিথ্যা বলিয়া রাণী নিষ্ক্রান্ত হইবার মিনিট দুই তিন পরে রাজা উর্ব্বশীর সহিত প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

কোন অপ্রধান পাত্রের মুখে মিথ্যাবাক্য বেমানান হইত না। কিন্তু যাহাকে রাজার আদর্শ বলিয়া খাড়া করিতেছ তাহার এ হীনতা নিতান্ত অশোভন, কবি-কল্পনার অযোগ্য। হীনতার প্রতি লোকের বিরাগ উদ্রেক করাইবার অভিপ্রায়ে যদি সাহিত্যে তাহার কুৎসিৎ মূর্ত্তি চিত্রিত করা হয় তবেই সে চিত্রের কোন মূল্য আছে, তবেই তাহাতে শিল্পসৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত হয় না! কিন্তু এখানে সে অভিপ্রায়ে রাজার এ দারিদ্র্যের অবতারণা করা হয় নাই। কারণ এ হীনতা কবির নিকট হীনতা বলিয়াই ঠেকে নাই; তাহা যদি হইত তবে নাটকস্থ কোন পাত্র বা পাত্রীর মুখ দিয়া আভাষে আমাদের তিনি তাহা ইঙ্গিতেও জানিতে দিতেন। এই দৃশ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য দৃশ্যসমূহে, অগ্নিমিত্রে, রাজোচিত বৃহত্ত্বের কোন অভাব লক্ষিত হয় না। তাঁহার প্রতি দর্শকের শ্রদ্ধা উদ্রেক করাই কবির অভিপ্রায়। আর বিক্রমোর্ব্বশীতে রাজা পুরুরবস ত "রাজর্ষি" নামেই অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কবি যেরূপে আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্বের একখানি উজ্জ্বল ছবি আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভাবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়। কবি কখনই ইচ্ছা করেন নাই যে মহিষীর সহিত রাজার কপটাচরণের দৃশ্যে তাঁহার প্রতি আমাদের সে শ্রদ্ধার হ্রাস হউক। মানময়ী রমণীকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ভদ্রতাভিমানী ব্যক্তি ত দুটো মিথ্যা কথা বলিবেই—না হইলে যে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অপমান করা হয়—

"সামভেদোথ দানঞ্চ নত্যুপেক্ষে রসান্তরং।
তদ্ভঙ্গায় পতিঃ কুর্য্যাৎ ষড়ুপায়ানিতি ক্রমাৎ।"

এরূপ শাস্ত্রসম্মত মিথ্যাচরণে যে দর্শকের অপ্রীতি জন্মাইতে পারে তাহা কবির মনেই নাই।

কালিদাসের এই দুই নাটক পড়িয়া আমরা জানিতে পারি যে, ইহাদের রচনা কালের উচ্চতম আদর্শ আর যাহাই হউক, তখন সত্যানুরাগ চরিত্র-মহত্ত্বের একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত না। কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি; বিক্রমাদিত্যের যদি মিথ্যার প্রতি প্রবল ঘৃণা থাকিত তাহা হইলে কালিদাস তাঁহার রাজাদিগের মুখে দণ্ডে দণ্ডে এরূপ হীন মিথ্যা বাক্য দিতে সাহস করিতেন না; সে সময়কার ভদ্রসমাজে যদি মিথ্যার প্রতি প্রবল ঘৃণা থাকিত তাহা হইলেও কালিদাসের এরূপ করা চলিত না; সেক্ষপীয়র অনেক স্থলে নাটকের কোন পাত্রীর বর্ণনাচ্ছলে রাজ্ঞী এলিজ্যাবেথের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্রতা সমূহ চাপা দিয়া তাঁহার গুণ সমূহকেই অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে সে সময় সে সকল ক্ষুদ্রতাকে লোকে ক্ষুদ্রতা বলিয়াই জানিত, সেই জন্যই তাহার প্রসঙ্গ তুলিয়া কবি তাঁহার রাজ্ঞীর বিরাগ ভাজন হইতে চাহেন নাই। এই যুক্তি অনুসারে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশীর রাজাদ্বয়ের চরিত্রের এই ক্ষুদ্রতা বর্ণনে প্রকাশ

পাইতেছে যে এ ক্ষুদ্রতা সে সময় ক্ষুদ্রতা বলিয়াই গণ্য ছিল না। তাহা হইলে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি সাহস করিয়া তাঁহার রাজচরিত্রের এ হীনতার বর্ণনা করিতে পারিতেন না। অগ্নিমিত্র ও পুরুরবসের—বিশেষতঃ পুরুরবসের চরিত্রে আর সকল মহত্ত্বই বজায় আছে, কেবল এই একটী গলদ রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যেন অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের সহিত দুটো একটা মিথ্যা কথায় রাজার রাজভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। এই গ্রন্থ রচনার কালে কবি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া স্থান ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহার কিশোর-কল্পনা-জগতে সেই সময়কার অসম্পূর্ণ আদর্শের ছায়া পড়িয়াছে। শকুন্তলা রচনা কালে তাঁহার কবি-হৃদয়ের পূর্ণ-বিকাশ হইয়াছে, তখন আর তিনি দেশ-বিশেষ সময় বিশেষের কবি নহেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলার ষষ্ঠাঙ্কে দুষ্মন্ত চিত্রফলকে শকুন্তলাকে আঁকিয়াছেন। অর্দ্ধলিখিত চিত্র সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে চেটীকে তুলিকা আনিতে আদেশ করিলেন; সে অল্পক্ষণ পরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বাক্সর ভিতরে করিয়া তুলিকা আনিতেছিলাম পথে দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, পিঙ্গলিকা তাঁহাকে সব বলিয়া দিয়াছে, তাই তিনি আমার হাত হইতে বলপূর্ব্বক বাক্স কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "আমি আপনি গিয়া আর্য্যপুত্রকে ইহা দিয়া আসিব।"

এইবার একটা বিরক্তিজনক কৈফিয়ৎ তলবের অতি নিকট সম্ভাবনা। রাজা অসুস্থচিত্তে রাণীকে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু রাণী আসিলেন না, প্রতিহারী আসিল; রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বেত্রবতি, পথে রাণীর সহিত দেখা হয় নাই?"

"দেখা হইয়াছিল, তিনি এখানে আসিতেছিলেন কিন্তু আমাকে পত্রহস্তে আসিতে দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন।"

রাজা বলিলেন, "অহো দেবী কার্য্যজ্ঞা, রাজকার্য্যের ব্যাঘাত করিতে চাহেন না।"

রাজার মাথার উপর রাণীর সহিত একটা অপ্রীতিকর মিলন ঝুঁকিয়াছিল; কিন্তু কবির কৌশলে ভালয় ভালয় সে ফাঁড়া কাটিয়া গেল, দর্শকের সম্মুখে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিল না; এখন কবি বুঝিয়াছেন যে মানভঞ্জনের দৃশ্য চিত্রিত করিতে যাইলে রাজ্ঞ-প্রকৃতির আদর্শ-বৃহত্ত্ব ও সরলতাকে হীনতা ও কপটতায় পরিণত করা অনিবার্য্য হইবে সুতরাং সে দৃশ্যাঙ্কন পরিহার করাই কর্ত্তব্য। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রে কবির আশপাশ তাঁহার কবিত্ব-জগতের উপর আইনজারি করিয়াছিল, তিনি পরের অসম্পূর্ণ আদর্শে গড়িতেছিলেন, সেই জন্য সেই দুই গ্রন্থে অনেক অভাব অনেক অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়; শকুন্তলায় তিনি যাহা সৃজন করিয়াছেন, তাহা নিঁখুৎ, সম্পূর্ণ, কারণ যে অনুশাসন সর্ব্বকাল সর্ব্বদেশের পক্ষে সত্য— তাহারই দ্বারা তিনি এখানে প্রবোধিত হইয়াছেন। শিল্পসৌন্দর্য্য ইহাতে চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীসরলা দেবী।

বুদ্ধি-বিকাশ।

"THERE is no distinction but that of degree between what is known as reasoning by *generalisation* and reasoning by *analogy*. In both cases from certain observed resemblances we infer, with more or less probability, the existence of other resemblances." "It has been said, indeed, that analogy denotes not a resemblance between things, but between the relations of things." The Principles of Science: by Dr. W. S. Jevons, M. A.

অনুমান মাত্রই প্রত্যক্ষমূলক। যাহার কিছুই প্রত্যক্ষ নাই, তাহার অনুমানও নাই। তবে অনুমান ও প্রত্যক্ষে প্রভেদ কি? প্রত্যক্ষে অনুমান নাই; কিন্তু অনুমানে প্রত্যক্ষ আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষের সম্ভাবনার নামই অনুমান। দেশ, কাল, পাত্র, প্রভৃতি অবস্থা সহকারে যাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইত, আপাততঃ তাহার আংশিক প্রত্যক্ষ হইতে অবশিষ্ট অপ্রত্যক্ষকে মানসিক ধ্যানে সংযোজনা করাই অনুমানের কার্য্য। যদি সকল সময়, সকল অবস্থায়, সকল বিষয় সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে আর অনুমানের আবশ্যক থাকিত না। তাহা হয় না বলিয়াই অনুমান অপরিহার্য্য। অনুমান আমাদের একটী প্রশস্ত জ্ঞানমার্গ। এমন কি, আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই অনুমান সাপেক্ষ। পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ বা তদ্বৎ ছায়াই অনুমানের বেলাভূমি। ইহা অতিক্রম করিবার উহার শক্তি নাই। সুতরাং অপ্রত্যক্ষের অনুমান আছে; ইন্দ্রিয়াতীতের অনুমান নাই। অনুমান অপ্রত্যক্ষকে আবির্ভাব করিয়া থাকে; কিন্তু যথায় প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ, দেশ, কাল, অবস্থা, প্রভৃতি সহকারেও হইবার নহে, তথায় অনুমানের কোন অধিকারই নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষে ভ্রম নাই—ভ্রম অনুমানে। তবে রোগাদির কথা স্বতন্ত্র। যাহাকে সচরাচর কথায় প্রত্যক্ষ বলে, তাহার প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ ব্যতীত সমস্তই অনুমান। রামের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। শুদ্ধ তাঁহার মত কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হইল। স্মৃতিপটে সেই কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিবিশেষ সমন্বিত ভাবে আছে। আজ সেই সমন্বিত পূর্ণভাবের কণ্ঠস্বর-রূপ সামান্য আংশিক প্রত্যক্ষে অবশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ অনুমিত হইল। তাই বলিলাম রাম আসিয়াছেন। কিন্তু যদি আর কাহার রামের ন্যায় কণ্ঠস্বর থাকে, তাহা হইলেই অনুমান ভুল হইল। রাম আসিয়াছেন বলায় দোষ জন্মিল। তাই বলিলাম ভ্রান্তি অনুমানে—প্রত্যক্ষে নহে। প্রত্যক্ষের মাত্রায় অনুমানের সত্যাসত্য; তাহার দোষগুণে অনুমানের দোষগুণ নহে। তদ্ব্যতীত স্মৃতি, সাদৃশ্যনিরূপণ, প্রভৃতির দোষগুণেও অনুমানের দোষগুণ জন্মে। সম্মুখে মনুষ্য দেখিলাম। দৃষ্ট মনুষ্যের বর্ণ,

অবয়ব, গঠন, প্রভৃতি নয়নগোচর হইল। এই প্রত্যক্ষের সামগ্রীতে শারীরিক তাপ, কোমলতা, প্রভৃতি আপাততঃ অপ্রত্যক্ষ ত্বাচ্ প্রকরণ অনুমান করিলাম। প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলে স্থির হইল যে দৃষ্ট মূর্ত্তি কোন মনুষ্য বিশেষ। নিকটে আসিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিলাম প্রত্যাশিত তাপ, প্রভৃতি অনুভূত হইতেছে না। তখন বুঝিলাম ভুল হইয়াছে। দৃষ্ট মনুষ্য দর্পণের প্রতিবিম্ব বা ভাস্করখোদিত মূর্ত্তি মাত্র।

এপ্রকার ভ্রম সত্বেও অনুমান অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। ইহা সত্য নির্ণয়ের একটী প্রধান সোপান। সকল সময়েই অনুমান ব্যতীত আমাদের উপায়ন্তর নাই। প্রত্যক্ষ যতই সূক্ষ্ম হইবে এবং তাহার মাত্রা যতই প্রশস্তি লাভ করিবে, অনুমান ততই সত্যপ্রদ হইবে, সন্দেহ নাই। যদি কোন বস্তুবিশেষের দশটী গুণ থাকে, তাহার নয়টী প্রত্যক্ষ হইলে, অবশিষ্টটীর অনুমানে ভ্রমের সম্ভাবনা অতি সামান্য। এস্থলে পুনশ্চ বলা আবশ্যক যে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান নেয্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীতের অনুমান সঙ্গত নহে। সে অনুমান বৈজ্ঞানিক অনুমান নহে। তাহা কবির কল্পনা হইতে পারে; এবং তাহাই বা কি প্রকারে হইবে? কবির কল্পনাও প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করিতে পারে না। তবে সে অনুমান কেবল কথার কথা মাত্র।

অনুমানে সংসর্গ (Association) প্রবল। যাহা সতত একত্র দেখা যায়, তাহার একটী দেখিবামাত্র অপরটী স্বতঃই মনে আইসে। এই অনুমান সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়বোধকেই আমরা সচরাচর কথায় প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি। প্রাচীর মধ্যে বৃক্ষশাখা দৃষ্টিগোচর হইল, এবং সেই দৃষ্ট শাখা হইতে অদৃষ্ট স্কন্ধ, মূল, প্রভৃতি অনুমান করিয়া মনে বৃক্ষের পূর্ণ মূর্ত্তি উপস্থিত করিলাম। প্রাচীর মধ্যে দৃষ্ট শাখাগুলির অবশ্যই অদৃষ্ট স্কন্ধ, মূল, প্রভৃতি আছে; অনুমানে ইহাই স্থিরসিদ্ধ হইল। কেননা, স্কন্ধ, মূল, শাখা, প্রভৃতি সতত সমন্বিত ভাবেই দেখা যায়। কিন্তু যদি কেহ বস্তুতঃই কয়েকটি শাখা বৃক্ষ হইতে সদ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রাচীর মধ্যে বৃক্ষাকারে সাজাইয়া থাকেন, তাহা হইলেই উক্ত অনুমান ভ্রান্ত হইল।

প্রত্যক্ষ অনুমানের মূল, কিন্তু সাদৃশ্য অনুমানের প্রাণ। এই সাদৃশ্য ব্যাপার না থাকিলে, অনুমান আদৌ থাকিতে পারে না। সম্মুখে কুসুম দেখিলাম। বস্তুতঃ কুসুম নয়নগোচর হয় নাই। পূর্ব্বদৃষ্ট কুসুম সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ মাত্র দেখিলাম। মনে কর, ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের সামগ্রীও অভ্যাস বশতঃ নেত্রগোচর হওয়ায়, তাহার আকার, অবয়ব, প্রভৃতি দৃষ্ট হইল। কিন্তু ঠিক সেই আকার, অবয়ব, বর্ণ, প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। তৎসদৃশ পড়িয়াছিল। এতদুভয়ের সৌসাদৃশ্য অনুভূত হওয়ায়, উভয়কেই কুসুম বলিলাম। এস্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট কুসুম সদৃশ বর্ণ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, পূর্ব্বদৃষ্ট কুসুমের সদৃশ কোমলতা, গন্ধ, প্রভৃতি অনুমিত হইল। এইরূপ দৃষ্ট কুসুমে কতক সদৃশ ভাব

অনুভূত এবং কতক সদৃশ ভাব অনুমিত ; সুতরাং বর্ত্তমান কুসুমজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান মূলক, এবং এতদুভয়ই সাদৃশ্যে পরিপূর্ণ।

একত্বে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্বই বিজ্ঞানদর্শনের ভিত্তি। সার উইলিয়ম হামিল্টনের একথা অত্যন্ত সারবান্। ফলে বহুত্বে একত্ব ভাবই সাদৃশ্যে গাঁথা। সাদৃশ্য ব্যতীত একত্ব নাই। এ অনন্ত বিশ্বে সাদৃশ্যসূত্রই জগজ্জনীন প্রকৃতির প্রাণ ও বন্ধন। নতুবা বিশুদ্ধ সমন্বিত বিরাট মূর্ত্তিতেও একত্ব নাই। সাদৃশ্যে বিসদৃশ, বিসদৃশে সাদৃশ্য বিজ্ঞানদর্শনের একমাত্র গতি ও নিয়তি।

সাদৃশ্যসিদ্ধান্ত দ্বিবিধ। বাস্তবিক ও সাম্বন্ধিক। এতদুভয়েই আমরা দৃষ্ট সাদৃশ্য হইতে কোন অদৃষ্ট সাদৃশ্যের অস্তিত্ব অনুমান বা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। অবশ্য সত্য-পক্ষে সে অনুমানের ন্যূনাধিক্য আছে। বাস্তবিক সাদৃশ্যে (Generalisation) ব্যাপ্তি অধিক ; সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে (Analogy) পরিসর নাই——গভীরতা আছে। যদি ক ও খ গুণদ্বয় অনেক বিষয়ে সতত একত্র দেখা গিয়া থাকে এবং কখনই পৃথক্ দেখা যায় নাই, তাহা হইলে সময়ান্তরে ক দেখিবামাত্রই খ থাকিবার নিতান্ত সম্ভাবনা স্বতঃই মনে আসিবে। মনে কর, যদি বর্ণ আর কাঠিন্য চিরন্তন সমন্বিত ভাবে দেখিয়া থাকি, কদাপি পৃথক্ না দেখি, তাহা হইলে এ গুণদ্বয়ের কোনটী থাকিলে অপরটী অনুসন্ধান করিলে পাইব বলিয়া মনে প্রত্যাশা ও বিশ্বাস জন্মে। বাস্তবিক সাদৃশ্যসিদ্ধান্তের এইরূপ ভাব।

সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে বস্তুর সংখ্যা অল্প, সদৃশ গুণ বা লক্ষণের সংখ্যাই অধিক। কোন নক্ষত্র বিশেষের (Mars) দুই কেন্দ্রে (Pole) দুইটী শ্বেত চিহ্ন আছে, উহা পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের সদৃশ। তাহার সদৃশ চিহ্ন অপর কোন বস্তুতেই আমাদের প্রত্যক্ষ নাই। সাদৃশ্য এত প্রবল যে আমরা অনায়াসে উক্ত শ্বেতবিন্দুদ্বয়কে হিমতুষারমণ্ডিত স্থল বলিয়া অনুমান করি। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনা মাত্র। মনে কর, দুইটী সদৃশ বস্তুর পরস্পর কোন পাঁচটী গুণ উভয়েই সমন্বিত ভাবে দেখা যায়, এবং যদি উক্ত বস্তুদ্বয়মধ্যে কোনটীতে কোন একটী গুণাধিক্য দেখা যায়, তাহা হইলে সেই গুণ দ্বিতীয় বস্তুটী পরীক্ষা করিলেও পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রত্যাশা হয়। লাপলাস বলেন সদৃশ বস্তুর মূলে সদৃশ কারণ আছে, তাই সদৃশ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সম্ভাবনার উপর সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যসিদ্ধান্তের (Reasoning by Analogy) নির্ভর। এই সাদৃশ্য যতই অবিকল হইবে, ততই সম্ভাবনার আতিশয্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বিষয় আধিক্যে বা সদৃশ লক্ষণ আধিক্যে এই সম্ভাবনা বা প্রত্যাশা প্রবল হয়। এতদুভয়ের তারতম্যে সম্ভাবনার তারতম্য হইয়া থাকে। বিষয়াধিক্যের অভাব সদৃশ লক্ষণাধিক্যে, বা সদৃশ লক্ষণাধিক্যের অভাব বিষয়াধিক্যে, বিদূরিত হয়।

দুইটী বস্তুতেও বাস্তবিকসাদৃশ্য অনুমান নেয্য। কিন্তু তজ্জন্য বস্তুদ্বয়ের কোন সাধারণ ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। রামধনু এককালে দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া গণ্য ছিল। এককালে

তদ্দর্শনে লোকের মনে কত আশা, কত ভরসা, কত ভাব, কত বিস্ময় উপস্থিত হইত! রজর বেকন কর্ত্তৃক ইহার রহস্য ভেদ হইল। আর কোন পদার্থে এইরূপ বর্ণোচ্ছ্বাস হয় কি না দেখা যাক্। জল বা শিশির বিন্দুতে বঙ্কিম সূর্য্যরশ্মি পড়িলে ঐরূপ সুন্দর বর্ণছত্র দেখা যায়। যেই আমরা এই আপাততঃ ভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করিলাম, অমনি সাধারণ্যপাত আরম্ভ হইল ; সুতরাং দৃষ্ট বস্তুতে যাহা পাইলাম, তাহাই রামধনুতে প্রয়োগ করিলাম। উক্ত নবলব্ধ জ্ঞান অন্য কোন নূতন বিষয়ে নিয়োজিত না হইলেও, আমাদের দৃষ্ট বিষয়গুলির জ্ঞান প্রবল করিল, এবং তৎসমুদায়ই যে কোন সাধারণ ব্যাপারের ফল বিশেষ, এই বিশ্বাসই মনে ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল।

বাস্তবিক সাদৃশ্য হইতে মন অল্পে অল্পে অলক্ষিত ভাবে সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যের অনুমানে প্রবর্ত্তিত হয়। এতদুভয়ের পার্থক্য শুদ্ধ মাত্রায় দেখা যায়। বাস্তবিক সাদৃশ্যে বা সাধরেণ্যে আমরা নানা বিষয়ে কোন সদৃশ গুণ বা লক্ষণ দেখি, সুতরাং সে সাদৃশ্য ব্যাপ্ত, গভীর নহে। যখন চিন্তার সামগ্রী অল্প এবং সদৃশ গুণ বা লক্ষণ অনেক, তখনই আমরা সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে (Analogy) সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি, এবং সেই সব সদৃশ ভাবও অত্যন্ত গভীর হইবার প্রত্যাশা করি। মন্ত্রি ও কর্ণধারের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্ ; কিন্তু কর্ণধারের তরীর সহিত যে সম্বন্ধ, মন্ত্রিরও রাজ্যের সহিত সেই সম্বন্ধ ; সুতরাং সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে মন্ত্রিকে রাজ্যের কর্ণধার বলা যাইতে পারে। মানুষ ও গোরু সম্পূর্ণ পৃথক্ ; কিন্তু চারিটি ও তিনটি মানুষে যে সম্বন্ধ চারিটি ও তিনটি গোরুতেও সেই সম্বন্ধ সময় ও দেশ (Space) বিসদৃশ হইলেও উভয়ের সম্বন্ধে উভয়ের পরিমাণ। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সাপেক্ষ। সময়ের পরিমাণ দূর, দূরের পরিমাণ সময়। স্বর্ণপদার্থে ও স্বর্ণশব্দে কোন সাদৃশ্যই নাই ; তথাপি উভয়ে সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে গাঁথা। আওডিন্ ও ক্লোরিণে সাদৃশ্য আছে ; তা বলিয়া একের সকল গুণই অপরের সকল গুণের সহিত সর্ব্বতোভাবে সমান নহে ; তাহা হইলে তো এতদুভয়ে একজাতীয় পদার্থই হইত। তবে ক্লোরিণের কয়েকটি গুণের সদৃশ গুণ আয়োডিনে আছে, এবং তাহাও মাত্রায় সমান নহে। জেরিমি বেন্থাম বলেন যে কোন দৃশ্য বা ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহার অনুরূপ বা সদৃশ ঘটনা বা দৃশ্যের সহিত সংযোজনা করাই মনের প্রথম গতি।

সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যসিদ্ধান্ত (Reasoning by Analogy) তত নিশ্চয়াত্মিক নহে। কোন ভূমির গোধূমের নমুনা দেখিয়া তত্রস্থ সমস্ত গোধূমের অনুমান যত দূর সঙ্গত, গোধূম দেখিয়া তণ্ডুলের অনুমান ততদূর সঙ্গত নহে। গোধূমে গোধূমে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্য আছে, বিসদৃশ লক্ষণ নাই বলিলেই হয় ; কিন্তু তণ্ডুলে গোধূমে সদৃশ, ভাব থাকিলেও অনেক বিসদৃশ লক্ষণ আছে। সুতরাং উক্ত অনুমান নিসংশয় নহে। সকল সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যসিদ্ধান্তই এইরূপ। জলতরঙ্গে জলতরঙ্গে যে প্রকার সাদৃশ্য আছে, জলতরঙ্গে বায়বীয় তরঙ্গে ততদূর নাই ; কিন্তু এতদুভয়ে সাম্বন্ধিক সাদৃশ্য বিশেষ প্রবল।

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ায় ও অপরাপর ইতর জন্তুর শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার, জীবদের বৃদ্ধিতে ও জাতির বৃদ্ধিতে অনেক সাদৃশ্য আছে। মনুষ্যবুদ্ধিতে এই সকল সাদৃশ্য নিরাকৃত হইয়া থাকে। যতদিন অধিকতর সদৃশলক্ষণাক্রান্ত বস্তু না পাওয়া যায় ততদিন জ্ঞানকল্পে উহারা নিতান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পরমন আমার অনুমানের সামগ্রী। অনুভূতি সকল জ্ঞানেরই মূল। তাহার অন্তস্তলে যাইবার আমাদের শক্তি নাই। মানসিক ব্যাপারে তাহাই মৌলিক তত্ত্ব। তবে পরের অনুভূতির আমার স্বতঃ জ্ঞান নাই। তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না। পরের অনুভূতি আমার অনুমিতি মাত্র। দৈহিক কার্য্য দেখিয়া আমরা পরের মন অনুমান করিয়া থাকি। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে কোন্ প্রকার দৈহিক কার্য্যে পরের মন অনুমিত হয়। কোন্ প্রকার দৈহিক কার্য্য মনব্যঞ্জক? আমার নিজের মানসিক প্রক্রিয়া দেহে যে যে প্রকারে স্ফূর্ত্তি পায়, আমি পরের সেই সেই প্রকার দেহের কার্য্য দেখিয়া তাহার মানসিক ক্রিয়ার অনুমান করি। আমার সকল মানসিক ক্রিয়া দেহে স্ফূর্ত্তি পায় না, বা পাইলেও আমার জানিবার শক্তি নাই; সুতরাং পরের সকল প্রকার মনোভাব দৈহিক কার্য্য দেখিয়া আমার জানিবার সাধ্য নাই। তবে পরের সকল প্রকার মানসিক ভাব না জানিতে পারিলেও কতক জানা সম্ভব। অতএব দৈহিক কার্য্য দেখিয়া পরের মনের ভাব যত সামান্যই জানা যাক্ না কেন, তাহাতে যে অন্ততঃ মনের শুদ্ধ অস্তিত্ব জানিতে পারি, ইহার আর লেশমাত্র সংশয় নাই। দৈহিক ভাবভঙ্গি দেখিয়া শুদ্ধ পরমনের অস্তিত্ব অনুমান অনায়াসসাধ্য বলিতে হইবে।

তবে কি প্রকার দৈহিক কার্য্য মনব্যঞ্জক? অবশ্য সকল প্রকার দৈহিক কার্য্য কিছু মনজ্ঞাপক নহে। অন্তঃকরণ, ফুস্‌ফুস্, প্রভৃতির গতি যেমন মনজ্ঞাপক নহে, শারীরিক স্পন্দন, প্রতিশেক কার্য্য (reflex action) প্রভৃতিও সেইরূপ। তবে কোন্ জাতীয় কার্য্য মনব্যঞ্জক? মনের নিদর্শন কি? দৈহিক কোন্ প্রকার কার্য্য মনের মানদণ্ড?

পরিণতিবাদের স্তম্ভ-স্বরূপ ডাক্তার রোমেনিস্ বলেন যে মন শব্দে আমরা দ্বিবিধ বস্তু বুঝিয়া থাকি, এবং বস্তুতঃ তাহারা উভয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মন শব্দে আপনার মন ও পরমন এতদুভয়ই বুঝায়। লোকে এ প্রকার পার্থক্যে হাসিতে পারেন। মন দ্বিবিধ; আপনার ও পরের! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এতদুভয়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ এ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্নও বটে। আপনার মনের জ্ঞান ও পরমনের জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্। নিজ মনের অনুশীলনে হয় কোন চিন্তাস্রোত, না হয় কোন অনুভূতির স্রোত, না হয় কোন ইচ্ছাপ্রবাহ সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। মনোবিজ্ঞানের ইহাই মৌলিক তত্ত্ব, এবং শুদ্ধ তাহা নয়, ইহা মাত্রই আমি জানি ও জানিতে পারি। অন্যের মনের

আলোচনায় তাহার কিছুই পাই নাই। দৈহিক কার্য্যমাত্র লইয়া উক্ত প্রকার চিন্তা, অনুভূতি, প্রভৃতি অনুমান করি। আমার নিজ মনের উত্তেজনায় যে সকল দৈহিক কার্য্য ঘটিয়া থাকে, এবং যাহার কারণ বা পূর্ব্বতন ঘটনা মানসিক, তাহার দ্বারাই আমি পরমন অনুশীলন করিয়া থাকি। আপনার মনের অবস্থাভেদে যে সকল দৈহিক কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, আমি সাম্বন্ধিক সাদৃশ্য (Analogy) বলে পরের তদনুরূপ দৈহিক কার্য্য দেখিয়া তাহার মনের তদ্বৎ পরিবর্ত্তন বা ভাব অনুমান করিয়া থাকি। তবে কি প্রকার দৈহিক কার্য্য মনব্যঞ্জক? কোন্ প্রকার দৈহিক কার্য্য চৈতন্যজ্ঞাপক? যে সকল দৈহিক কার্য্য দেখিলে নির্ব্বাচন বা পছন্দের (choice) ভাব মনে আইসে, তাহারাই মনব্যঞ্জক "What activities of an organism are to be taken as indicative of consciousness? The answer that comes most readily is,—All activities that are indicative of choice; wherever we see a living organism apparently exerting intentional choice, we may infer that it is conscious choice, and, therefore, that the organism has a mind."—Dr. G. J. Romanes.

ডাক্তার রোমেনিসের কথা শুনিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিদান অকাট্য। সেণ্ট জর্জ্জ মিবার্ট তাঁহার সম্পূর্ণ মতবিরোধী হইয়াও একথা খণ্ডনে প্রয়াস পান নাই। আর কেনই বা পাইবেন? ইহার প্রত্যাখ্যানের ফল কি? কে নির্ব্বাচনজ্ঞাপক দৈহিক কার্য্যকে মনব্যঞ্জক না বলিবেন? ইহা তো সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে কথাটী সত্য হইলেও বিশেষ জ্ঞানপ্রদ বলিয়া বোধ হইবে না। (choose) এর বাঙ্গালা অর্থ মনোনীত করণ; সুতরাং মনোনীত করণে কে মন অস্বীকার করিবেন? নির্ব্বাচনজ্ঞাপক দৈহিক কার্য্য মনোজ্ঞাপক বটে। কে মনোব্যঞ্জক দৈহিক কার্য্যকে মনোব্যঞ্জক না বলিবেন? নির্ব্বাচনজ্ঞাপক আর মনোজ্ঞাপক একই কথা। বরং নির্ব্বাচনে মনের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া আসিতেছে। ইহাতে শুদ্ধ অনুভূতি বা চৈতন্য নাই। স্মৃতি, ইচ্ছা, বুদ্ধি, কার্য্যশীলতা, প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তি স্বতঃই আসিতেছে। কেন না, ইহা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিধায়ক। সুতরাং নির্ব্বাচনক্রিয়ায় মানসিক প্রায় সকল গুণই বুঝাইতেছে। তবে আর নির্ব্বাচনজ্ঞাপক দৈহিক কার্য্যে মন অনুমিত হইবার আশ্চর্য্য কি? এস্থলে দেখা উচিত যে আমরা কি বস্তুতঃই নির্ব্বাচনজ্ঞাপক দৈহিক কার্য্য দেখিয়া মন অনুমান করি? পরের মন জানিবার কি এই এক প্রকার বাহ্যিক লক্ষণমাত্র আছে? আমরা কি মনোব্যঞ্জক আর কোন প্রকারই দৈহিক কার্য্য জানি না? যদি না হয়, তাহা হইলে ডাক্তার রোমেনিসের নিদানই শিরোধার্য্য। নতুবা তাঁহার কথায় অব্যাপ্তি দোষ আসিতেছে।

আচার্য্য এলেকজণ্ডার বেন বলেন যে শুদ্ধ সুখদুঃখ অনুভবে জৈবনি ক্রিয়ার ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। "A very considerable number of the facts may be brought

under the following principle : namely, that states of pleasure are connected with an increase, and states of pain with an abatement, of some, or all, of the Vital Functions." এস্থলে শুদ্ধ অনুভূতি (feeling) দৈহিক লক্ষণ বা কার্য্য পাওয়া যাইতেছে। নির্ব্বাচনক্রিয়া ব্যতীত অনুভূতিজ্ঞাপক দৈহিক ক্রিয়াও আছে। তবে আর পরমন জানিবার জন্য নির্ব্বাচনজ্ঞাপক ক্রিয়াই একমাত্র উপায় নহে। হার্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার হাস্য-তত্ত্বে (Physiology of Laughter) বলেন যে অনুভূতির আতিশয্য দেহে প্রকাশ পায়। "That feeling passing a certain pitch habitually vents itself in bodily action" and that "an overflow of nerve-force undirected by any motive, will manifestly take first the most habitual routes ; and if these do not suffice, will next overflow into the less habitual ones." ডাক্তার রোমেনিস্ ডার্বিণের একজন প্রধান শিষ্য। এক্ষণে ডার্বিণের এবিষয়ে মত কি, দেখা আবশ্যক। তাঁহার ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে (Expression of the Emotions) ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে দৈহিক কার্য্যে শুদ্ধ অনুভূতিও জানা যায়। মনুষ্য এবং ইতর জন্তুতে যে সকল ইচ্ছাশূন্য দৈহিক ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের তিনি তিনটি প্রধান-নিয়মাধীন করিয়াছেন। এস্থলে ইচ্ছাশূন্য কথাটী স্মরণ রাখা আবশ্যক ; কারণ নির্ব্বাচন-ক্রিয়ায় ইচ্ছা প্রবল। "I will begin by giving the three principles, which appear to me to account for most of the expressions and gestures involuntarily used by man and the lower animals under the influence of various emotions and sensations." (1) "The Principle of serviceable associated Habits." (2) "The Principle of Antithesis." (3) "The principle of actions due to the constitution of the Nervous System, independently from the first of the Will, and independently to a certain extent of Habit." কোন জীববিশেষের জীবনে এ নিয়ম তিনটি প্রযোজ্য নহে ; পরিণতিস্রোতে ইহাদের প্রমাণ বুঝিতে হইবে। কতকগুলি এ প্রকার দৈহিক ভাবভঙ্গি আছে যাহাতে শুদ্ধ আপাততঃ কোন ইচ্ছা প্রকাশ পায় না, এমত নহে, পরিণতির অনন্তস্রোতেও কখন ইচ্ছামূলক ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। সুতরাং নির্ব্বাচনক্রিয়ায় পরমন বুঝিবার ব্যত্যয় ঘটিতেছে। যদি এ সকল ভাবভঙ্গিই ইচ্ছামূলক না হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাচনভাব কেমনে মনে আসিতে পারে? মহাত্মা ডার্বিণের উক্ত গ্রন্থ হইতে আরও কয়েক স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"But man himself cannot express love and humility by external signs, so plainly as does a dog, when with drooping ears, hanging lips, plexious body, and wagging tail, he meets his beloved master. Nor can these

movements in the dog be explained by acts of volition or necessary instincts, any more than the beaming eyes and smiling cheeks of a man when he meets an old friend." এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ডার্বিণের মতে নির্ব্বাচন কার্য্য ব্যতীত মনোভাব জানিবার অন্য উপায় আছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে নির্ব্বাচন কার্য্যে ইচ্ছা, স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রভৃতি আছে। কিন্তু ডার্বিণের ভাবভঙ্গি সমস্তই ইচ্ছাশূন্য। বিশেষতঃ তাঁহার উল্লিখিত তৃতীয় নিয়মটী আমাদের বিশেষ মত প্রতিপোষক। মনে কোন বেগ উপস্থিত হইলে স্নায়বীয় শক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন দিকে পরিচালিত না হইলেও আপনিই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

"Some strange commotion
Is in his brain : he bites his lip and starts ;
Stops on a sudden, looks upon the ground,
Then, lays his finger on his temple ; straight,
Springs out into fast gait ; then, stops again,
Strikes his breast hard ; and anon, he casts,
His eyes against the moon." Hen. VIII.

সেক্ষপীয়রের উক্ত দৈহিক কার্য্য সমুদায়ে নির্ব্বাচন বুঝিলাম না। উক্ত কার্য্যকলাপে তো আদৌ উদ্দেশ্যই নাই ; সুতরাং নির্ব্বাচনজ্ঞাপক নহে। বরং কোন উদ্দেশ্য নাই, নির্ব্বাচন লক্ষণ নাই বলিয়াই উহাদের দ্বারায় মনের ভয়ানক বেগ বুঝাইতেছে। উদ্দেশ্য বা নির্ব্বাচন লক্ষণ থাকিলে কোন মতেই মনের অতদূর বেগ বুঝাইত না। এক্ষণে দেখা গেল উদ্দেশ্যশূন্য, ইচ্ছাশূন্য, নির্ব্বাচনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য দৈহিক ভাবভঙ্গিতে মনের ভয়ানক বেগ প্রকাশ পাইতেছে। হাস্য, ক্রন্দন, ব্রীড়া, কম্পন, প্রভৃতি দৈহিক কার্য্যের উদ্দেশ্য কি? অথচ উহারা নির্ব্বাচনজ্ঞাপক না হইলেও বিশেষ মনোভাব প্রকাশক বলিতে হইবে। কাহার হাস্যমুখ দেখিলে কে না তাহার হর্ষ অনুমান করিবেন? অথচ ইহাতে নির্ব্বাচনজ্ঞাপক কি আছে? তবে দৈহিক নির্ব্বাচনজ্ঞাপক কার্য্যে ইচ্ছা, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রভৃতি সকলই বুঝা যায় বটে, কিন্তু মনের শুদ্ধ ভাব, চৈতন্য বা অনুভূতি অন্য প্রকারেও জানা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলেই পরমন বা চৈতন্য জানিবার পক্ষে যথেষ্ট হইল। ইতর লোকে অপ্রতিভ হইলে মস্তক কণ্ডূয়ন, চক্ষুমর্দ্দন, প্রভৃতি করিয়া থাকে এবং লজ্জায় চক্ষু মুদিত করে, তাই লজ্জা বিশেষকে সাদা কথায় চক্ষুলজ্জা বলে। এই সকল কার্য্যের কোন অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা দেখা যায় না। অথচ ইহারা মনোব্যঞ্জক। হাস্য, ক্রন্দন, ব্রীড়া, কম্পন প্রভৃতির আবশ্যকতা বুঝা যায় না। বরং শোকদুঃখব্যঞ্জক কার্য্যে উদ্দেশ্যের বৈপরীত্য বা ব্যাঘাত জন্মে। ইচ্ছায় কে কোথায় কাঁদিয়া থাকে? কাহার অভিপ্রায় যে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়? ইহারা তো

আপাততঃ ইচ্ছামূলক নহে, পরিণতি-প্রবাহে কখন ছিল বলিয়াও প্রতিপন্ন করা দুঃসাধ্য। এসকল কার্য্যে অভ্যাসও নাই, বুদ্ধিও নাই ; অথচ তৎসমুদায় দ্বারা মনের বিশেষ ভাব বুঝা যায়। মনে কর, কোন জীব কাঁপিতেছে দেখিলাম। তাহার মনোভাব অবিকল না বুঝিলেও বুঝিতে পারি। কেন না, শীত, জ্বর, প্রলাপ, বার্দ্ধক্য, ক্লান্তি, ভয়, রাগ, আনন্দ, প্রভৃতিতে লোক কাঁপিতে পারে। সুতরাং কোন্ মনগতিকে কাঁপিতেছে, তাহা নিশ্চয় বলিতে না পারিলেও উহার কোন একটীতে যে এপ্রকার কার্য্য হইতেছে, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে, এবং তাহার যে কোন একটী বা কয়েকটী অনুভূতিতে যে প্রকার হইতেছে তাহার আর সন্দেহ থাকে না। এক্ষণে আর অনুভূতি পক্ষে সংশয় রহিল না, তবে অনুভূতি বিশেষে সংশয় থাকিতে পারে, এবং তাহাও অপরাপর অবস্থা সন্দর্শনে নির্ণয় হইবারও সম্ভব। ফলে স্থূল কথা এই যে তাহার মন বা চৈতন্য পক্ষে আর সংশয় থাকিল না। তাহা হইলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইল। কিন্তু এস্থলে উদ্দেশ্য ধরিয়া বা নির্ব্বাচনজ্ঞাপক কার্য্য দেখিয়া মনের অনুমান হইতে পারে না। কোন না, কম্পনে ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, প্রভৃতি কিছুই নাই। অধিকন্তু মনোবেগ যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির উপর বিশেষ কার্য্য করে। ইহাও আমাদের আর একটী প্রমাণ। কারণ উক্ত কার্য্যাদিতে ইচ্ছা, অভ্যাস, বা উদ্দেশ্য নাই। বরং ইচ্ছায় তৎসমুদায় দমন করা যায় না। তাই বলি নির্ব্বাচন ব্যতীত মনোজ্ঞাপক অন্যান্য কার্য্য আছে। ইহার আর সন্দেহ নাই। যন্ত্রণায় ধর্ম্ম বা মুখভঙ্গির উদ্দেশ্য কি? তাহাতে নির্ব্বাচনের তো কোন লক্ষণই বুঝা যায় না।

"The existing quantity of liberated nerve-force, which in an inscrutable way produces in us the state we call feeling, must expend itself in some direction——must generate an equivalent manifestation of force somewhere ;....."

বরং ভয়ানক মনোবেগে ইচ্ছাশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে এবং নির্ব্বাচন ক্রিয়ার ব্যত্যয় জন্মে। অনেক দৈহিক কার্য্য এমন আছে যে তাহা ইচ্ছায় দমন করা যায় না। দুঃখের শ্বাস, অশ্রু, বাক্‌রোধ, ভ্রূকুঞ্চন, প্রভৃতি ইচ্ছামূলক কার্য্য নহে, এবং ইহাদের উদ্দেশ্যও নাই। কিন্তু ইহারা নির্ব্বাচনজ্ঞাপক না হইলেও অনুভূতিজ্ঞাপক বটে। "Under a transport of Joy or of vivid Pleasure, there is a strong tendency to various purposeless movements and to the utterance of various sounds." "The above purposeless movements and increased heart-action may be attributed in chief part to the excited state of the sensorium, and to the consequent undirected overflow, as Mr. Herbert Spencer insists, of nerve force." "On the whole we may conclude that the principle of the direct action of

the sensorium on the body, due to the constitution of the nervous system, and from the first independent of the will, has been highly influential in determining many expressions."

এই সকল প্রমাণ বা বচন মহাত্মা ডার্বিণের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। অধিকন্তু মনোভাবব্যঞ্জক দৈহিক ক্রিয়া মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবেরই প্রায় স্বাভাবিক ;—শিক্ষা, অভ্যাস বা অনুকরণের উপর নির্ভর করে না। বরং তাহারা এতদূর স্বভাবসিদ্ধ যে ইচ্ছা দ্বারায় সংবরণ করা দুঃসাধ্য। রাগে অন্তঃকরণের উদ্বেগ কি ইচ্ছায় সংবরণ করা যায়? সদ্যপ্রসূত সন্তানের ক্রন্দন ইহার আর একটি প্রমাণ। সে ক্রন্দনে চৈতন্য বুঝা যায়; নির্ব্বাচনের ভাব বুঝা যায় না। অনেক প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াই চৈতন্যমূলক কার্য্য করিয়া থাকে; সে সকল ক্রিয়ায় নির্ব্বাচন ভাব থাকিলেও, তদ্বারায় ব্যাখ্যা করা যায় না। অভ্যাসবশতঃ ঐ সকল দৈহিক কার্য্য ইচ্ছার বশীভূত হইলেই নির্ব্বাচনজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। নির্ব্বাচনের আর একটি ব্যাঘাত এই যে কি অন্ধ, কি চক্ষুষ্মান, কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেই কতকগুলি এক প্রকার দৈহিক কার্য্যে মনের ভাববিশেষ প্রকাশ করে। মনুষ্য ও ইতর জন্তু ভয়ানক বিভিন্ন হইলেও কতকগুলি মনোভাব একজাতীয় দৈহিক কার্য্যে প্রকাশ করিয়া থাকে। নির্ব্বাচন ক্রিয়ায় বিভিন্ন দৈহিক কার্য্যেরই সম্ভাবনা। অধিকন্তু তাহাদের অনেকগুলিই আবহমানকাল পরিণতিচক্রে ঘুরিয়া আসিতেছে। "The far greater number of the movements of expression, and all the more important ones, are, as we have seen, innate or inherited: and such cannot be said to depend on the will of the individual."—Darwin.

তবে নির্ব্বাচনক্রিয়ায় বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রভৃতি জানা যায় ; কেননা, তদ্দ্বারায় উহারাই প্রকাশ পায়। ফলে তাহাদের অন্তস্তলে তখন চৈতন্য স্বীকার্য্য ; নতুবা নির্ব্বাচনক্রিয়া অর্থশূন্য। অধিকন্তু নির্ব্বাচন ক্রিয়ায় চৈতন্য প্রমাণ করিতে গেলে অনেক সময় পরিণতিবাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। কারণ আপাততঃ উদ্দেশ্যশূন্য, ইচ্ছাশূন্য, মনোভাবব্যঞ্জক দৈহিক কার্য্য এককালে পরিণতির সুদূর তিমির গহ্বরে অভিপ্রায়মূলক অর্থাৎ নির্ব্বাচনজ্ঞাপক ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেই বা হয় কই? সকল ভাবভঙ্গির ব্যাখ্যা সে প্রকার দৈহিক কার্য্যে নাই। সুতরাং কখনও যে পরিণতির কোন ক্রমে সে সকল দৈহিক কার্য্যের কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছিল বলিয়া বোধ হয় না। আর যদ্যপি তাহাই হয়, যে উক্তরূপ দৈহিক কার্য্য এককালে উদ্দেশ্যমূলক ছিল। একথার উত্তর এই যে পূর্ব্বে উহারা মনোজ্ঞাপক ছিল,—এখন আর নাই। সুতরাং তাহাতেও নির্ব্বাচনব্যঞ্জক দৈহিক কার্য্যে মন বা চৈতন্য অনুমিত হইতেছে না।

নির্ব্বাচনক্রিয়া যে মনের উচ্চ লক্ষণ জ্ঞাপক, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সে উচ্চ লক্ষণের মূলে চৈতন্য স্বীকার্য্য ; সে চৈতন্য বা অনুভূতি দৈহিক কার্য্যেও

প্রকাশ পায় ; তাহা বুঝিবার জন্যও নির্ব্বাচনক্রিয়ার আবশ্যক নাই। অবশ্য চৈতন্য বা অনুভূতি ত দৈহিক কার্য্যে প্রতিভাত হয় ; কিন্তু সে দৈহিক কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাচনজ্ঞাপক না হইলেও হইতে পারে ; এবং তাহারা অন্যরূপ না হইবেই বা কেন ? আমাদের সকল দৈহিক কার্য্যই কি নির্ব্বাচনজ্ঞাপক ? শুদ্ধ অনুভূতি বা চৈতন্যজ্ঞাপক অনেক দৈহিক লক্ষণও আছে। এক্ষণে মানুষের অন্যরূপ দৈহিক কার্য্য দ্বারায় না হয় মনোভাব জানা গেল, সামান্য কীটপতঙ্গ,বৃক্ষলতা, প্রভৃতির মন যে তদ্ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। তাহাদের আর মনোব্যঞ্জক ভাবভঙ্গ কি পাইবে ? যাঁহারা বৃক্ষলতাদির চৈতন্য স্বীকার করেন, উক্ত তাঁহারা নির্ব্বাচনক্রিয়ার উপর নির্ভরই করিয়া থাকেন। অনেকে বৃক্ষের মূল প্রায় শাখার সমদিকে যায় বলিয়া বৃক্ষের মন বা চৈতন্য অনুমান করেন। উক্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বাচনব্যঞ্জক ;—শাখার তলে তাপ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা অল্প, তাই যেন বৃক্ষমূল আত্মরক্ষার জন্য সেই দিকেই বর্দ্ধিত হয়। বাতায়নে ক্ষুদ্র বৃক্ষ রাখিলে সে সূর্য্যালোকের জন্য বাহিরদিকে বক্র হইতে থাকে। লতাগুল্মের কার্য্য দেখিলেও অনেকটা নির্ব্বাচনের ভাব মনে আইসে। তাই তাঁহারা বৃক্ষলতাদির চৈতন্য বা মন আছে বলিয়া থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এ ব্যাখ্যার অনেক পূর্ব্বেই লোকে বৃক্ষলতাদির চৈতন্য স্বীকার করিতেন। তাঁহারা তো এ প্রকার নির্ব্বাচনজ্ঞাপক কথাই জানিতেন না। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বরং পূর্ব্বব্যাখ্যা সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। লজ্জাবতী মোক্ষিভোজা লতা প্রভৃতি হইতে বৃক্ষাদির, চৈতন্য বৈজ্ঞানিকের প্রথম অনুমান। পূর্ব্বে শুদ্ধ জীবনীশক্তি সাদৃশ্যে লোকে বৃক্ষাদির চৈতন্য অনুমান করিত। এক্ষণে নির্ব্বাচন ক্রিয়া সত্ত্বেও লতাবৃক্ষাদির চৈতন্য অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা লজ্জাবতী লতার আকুঞ্চন প্রতিশেক কার্য্যে ব্যাখ্যা করেন, এবং বৃক্ষাদির মূল প্রভৃতির কার্য্যে নির্ব্বাচনভাব দেখিতে পান না। কারণ বৃক্ষাদির কার্য্য অনেক সময় সাপেক্ষ। আমাদের দৈহিক কার্য্য প্রায় মানসিক ক্রিয়ার অবিলম্ব বা সমকালীন ফল। ঐ সকল কার্য্য সময় সাপেক্ষ না হইলে সাদৃশ্য সম্বন্ধে সকলেই উহাদের চৈতন্য স্বীকার করিতেন। যদি আপন চৈতন্য হইতে পরের চৈতন্য অনুমিত হয়, তাহা হইলে আপন চৈতন্য প্রকাশক অনুরূপ দৈহিক কার্য্যই আবশ্যক। এস্থলে নির্ব্বাচন কার্য্যই নির্ব্বাচনকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইতেছে না। তবে কি নির্ব্বাচনকার্য্য আবার প্রমাণ সাপেক্ষ। অবশ্য, তাহা না হইলে সকল সময় বুঝা যায় না। তাহার আবার প্রমাণ কি ? প্রমাণ আমার সহিত সাদৃশ্য। অধিকন্তু নির্ব্বাচন ক্রিয়া আবার অনেক সময় বুঝিতে গেলে, অগ্রে চৈতন্য স্বীকার করিতে হয় নতুবা নির্ব্বাচন ক্রিয়াকে নির্ব্বাচন ক্রিয়া বলিয়া জানা যায় না। যদি চৈতন্য স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে এ নির্ব্বাচনের অন্য ফল থাকিতে পারে, চৈতন্যজ্ঞাপক বলা যায় না। অনেক সময় মন আছে ধরিয়া নির্ব্বাচন ক্রিয়া বুঝি ; আবার অনেক মনোব্যঞ্জক ক্রিয়ায়ও নির্ব্বাচন নাই।

মনে মনে বার্ত্তাবহন বা মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি।

মহা সমস্যায় পড়িয়াছি। কয়েক জন বন্ধুতে মিলিয়া সে দিন হার্পার্স ম্যাগাজিন পড়িতে পড়িতে আমাদের মধ্যে মহাতর্ক,—তাহাতে "মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি" বলিয়া যে প্রবন্ধটি আছে, তাহা'রহস্যাত্মক বা গম্ভীর প্রবন্ধ ? প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, মার্ক টোয়েন—আমেরিকার বিখ্যাতনামা কৌতুকবিৎ,—তাই কেহ বলেন, ইহা কৌতুক না হইয়া যায় না—ইংলণ্ডের "সাইকিক্যাল রিসার্স সোসাইটির" উপর ইহা ঠাট্টা। কেহ বলেন, না তাহা নহে, তাঁহার জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার উদাহরণ দিয়া গম্ভীরভাবে 'তিনি মানসিক-শক্তি-অনুসন্ধান-সমিতির' পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। আমার কিন্তু কোন পক্ষে মত দিতে সাহস হইতেছে না। আজ কালকার দিনে ভোটের মত জোর আর নাই, তাই লেখাটি অনুবাদ করিয়া ভোটে দিলাম, যে পক্ষে অধিক ভোট হইবে, আমিও সেই পক্ষের এক জন। এখন পাঠক বিচার করুন, ইহা কৌতুক নয়, কি কৌতুকময় ?

অনুবাদক।

হার্পার্স ম্যাগাজিন্ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু :—

আমার অনেক দিনের লেখা এই কাগজ তাড়ার উপর চোখ বুলাইয়া গেলেই আপনি দেখিতে পাইবেন—যে, এক সময় আমি একটি মস্ত সত্য আবিষ্কার করি ; যে সত্যটি আদিকাল হইতে সকলেই অদ্ভুত ঘটনার সংযোগ, অন্য ভাষায় দৈবযোগ বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাড়িৎশক্তি দ্বারা বার্ত্তা প্রেরণ যেরূপ দৈবযোগ, ইহাও সেইরূপ দৈবযোগ ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমি ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া ইহার নাম রাখি মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি। ইংলণ্ডের মানসিক শক্তি অনুসন্ধান সমিতি অল্পদিন মাত্র এই একই বিষয়ে অনুসন্ধান তৎপর হইয়া তাহার নাম দিয়াছেন টেলিপ্যাথি এবং আমা দ্বারা কখনো জীবনে যাহা হইত না তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া, এই যুগের একটি মহৎকার্য্য সাধিত করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের কৃপায় মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি আর এখন হাস্যজনক ব্যাপার নহে ; তাহা সর্ব্বজনের বিশ্বাস্য সামান্য সত্য।

আমার এই পুরাতন প্রবন্ধে ১৮৭৪ কিম্বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঘটিত বনাঞ্চা পুস্তক সংক্রান্ত মানসিক বার্ত্তা বহনের এক অসাধারণ অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ পাইবেন। এই ঘটনাই আমার উক্ত দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং ইহার পর হইতে আমি এসম্বন্ধে যত প্রমাণ পাই, তাহা লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করি। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে গিয়া আমি যে সময় A Tramp Abroad নামে পুস্তক রচনা করি আমার এই

হস্তলিপির অধিকাংশ ঘটনা উক্ত পুস্তকের জন্য সেই সময় লেখা হয়। কিন্তু পরে ভাবিলাম উক্ত বিদ্রূপাত্মক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলে ঐ ঘটনাগুলিও কৌতুকজনক মূর্ত্তি ধারণ করিবে। কাজেই তাহা হইতে বিরত হইয়া, ইহার ৮।৯ বৎসর পরে গম্ভীর প্রবন্ধাকারে উহা আমেরিকান রিভিউ পত্রে ছাপাইতে প্রেরণ করিলাম। কিন্তু সম্পাদক বলিলেন; সেই সকল সামান্য দৈবযোগ ঐরূপ গম্ভীরভাবে তিনি তাঁহার পত্রে ছাপাইতে সাহস করেন না; তাহাতে তাঁহার পত্রের ক্ষতি হইবে। তবে আমি নাম দিয়া ছাপাইলে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না, কেননা তাহাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না, সুতরাং ঘটনাগুলি অপ্রকাশিত রহিল।

তাহার পর কালের কি পরিবর্ত্তন! আমার এই সকল সামান্য অভিজ্ঞতা, যাহা তখন একটি গম্ভীর পত্রের পক্ষে অনুপযুক্ত বিষম ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, মানসিক শক্তি অনুসন্ধান সমিতির প্রসাদে এখন তাহা সাধারণ দৈনিক সুস্পষ্ট ঘটনা। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ নিরাপদ সামান্য বিষয়ও মহা অনর্থময় মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আপাততঃ এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতেছি।

একটা ঘটনা হ'য়েছে! এমন অনেকের অনেকবার হয়—সকলেই একটু ভেবে, মীমাংসা না কর্ত্তে পেরে শেষে হাল ছেড়ে দেন। ঘটনাটা বিশেষ কিছুই নয়, কিছুদিন আগে আমি বল্লুম যে, ফ্র্যাঙ্ক মিলেট বোধ হয় জানে না, আমরা জার্ম্মাণিতে আছি তা হলে আমাকে চিঠি লিখতো। তার পর থেকে আমি রোজই মনে করি, তাকে আজ একখানা চিঠি লিখ্‌বো, কিন্তু রোজই ভাবি আর দুদিন যাক্—এই রকম ক'রে ছ সপ্তাহ কেটে গেল তখন ঠিক ক'র্‌লুম আজ নিশ্চয়ই লিখ্‌বো। লিখেই বল্‌লুম এ চিঠি এখান থেকে ২৫ ক্রোশ না যেতে যেতেই আমিও ফ্র্যাঙ্কের চিঠি পাবো, কেননা প্রায়ইত এই রকমই হয়,—আমারও চিঠি যে সময় যাচ্ছে তারও চিঠি সেই সময় আস্‌ছে। হয় সত্যি! কিন্তু কেন? এ'কে আমরা বলি দৈব যোগ (Coincidence or accident) কিন্তু নাম করণটা কি ঠিক্! অনেক সময় আমরা চিঠি লিখতে বসেই মনে মনে কেমন টের পাই যে যাকে চিঠি লিখচি সেও যেন আমায় লিখচে—এক সঙ্গে দুজনেই চিঠি পাবো। সময়ে সময়ে এ ভাবটা এত মনে আসে যে আমরা দু চার কথায় চিঠি শেষ করি, কারণ তার চিঠিতো পাবই—মিছামিছি আর বড় চিঠি লিখে লাভ কি? আমার তো অনেকবার এই রকম মনে হয়, আমি তখন চিঠি লেখা বন্ধ করি। যাক যা ব'ল্‌ছিলুম বলি, ছ' সপ্তাহ পরে আমি ফ্র্যাঙ্ক মিলেট্‌কে চিঠি লিখি, সেও সে দিন আমায় লিখেছিল, দুটো চিঠি ঠিক এক দিনে আমরা দুদিকে দুজনে পেলুম। মিলেট তার চিঠিতে লিখেছে যে সে ছ' সপ্তাহ ধরে আমার ঠিকানা খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু পায় নি; অবশেষে তার হঠাৎ আজ মনে হ'ল Berlin Embassy তে লিখলে আমি পাব। এটা কি দৈবযোগ!

কারবারি লোককে কাজের চিঠি লিখতে আমার যেমন বিরক্ত ধরে এমন আর কিছুতে না—তারা আগে লিখবে বলে ফেলে রেখে রেখে অগত্যা শেষে লিখতে বসি। কিন্তু জানি যে এবার ঠিক তারাও লিখবে। যদি বল তবে ত' তখন না লিখলেই হয়—কিন্তু আমি যদি ফেলে রাখি তবে তারাও ফেলে রাখবে—ঠিক শ্যামদেশীয় জমক ছেলেদের মত দুজনে এক সঙ্গে গাঁথা—সেও যেমন ক'র্‌বে আমিও তাই ক'র্‌বো। আমি বাড়ী ছাড়বার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে Electric bell বসাবার দরকার হয়, আমি New york এর কোন কারখানার লোককে এ কাজের ভার দিই। তারা এসে যে কাজ করে সেটা আমার মনের মত হয় নি। তাই তখন তাদের টাকা না দিয়ে ব'ল্‌লুম কাজ ঠিক হলে টাকা পাবে। তাদের হাতে অন্য অনেক কাজ ছিল তাই আজকাল ক'রে কিছুতে আসে না—দু মাস কেটে গেল তখন নিতান্ত বিরক্ত হয়ে চিঠি লিখতে বসলুম কিন্তু নিশ্চয় মনে হলো যেন তারাও কাজে আস্‌ছে তাই অমনি দু কথা লিখলুম। তার পর দিন সকালে উঠে দেখি খুব ভোর থেকে এসে তারা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে. তখন আমার চিঠিও ডাকে দেওয়া হয় নি। এটা যদি ঘটনার সংযোগ হয় তবে ঘট্‌তে তো তিন মাস নিয়েছিল।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা ওয়াসিংটন সহরে গিয়ে একটা হোটেলে ছিলুম; রাত দশটা পর্য্যন্ত বসে তামাক খেতে লাগলুম। তখনও ঘুম এলো না, ভাবলুম বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি। রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এ রাস্তা ও রাস্তা ক'রে বেড়াতে লাগলুম; আমি জান্‌তুম মিষ্টার 'ও' আমার একজন বন্ধু এ সহরে আছেন। মনে হলো পথে যদি দেখা হয় তবে বেশ হয়, কিন্তু তাই বলে রাত্রে যে খুঁজবো এমন কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না, বিশেষতঃ আমি জান্‌তুম না তিনি কোথায় থাকেন। বারটার পর চারিদিক এমন নির্জ্জন হয়ে এলো যে আমার কেমন একলা একলা মনে হতে লাগলো, সে জন্যে আমি রাস্তার ধারে একটা চুরোটের দোকানে গিয়ে উঠলুম; এইখানে কতকগুলো লোক রাজনীতি আলোচনা কর্‌ছিল। ১৫ মিনিট তাদের কথাবার্ত্তা শোনার পর হঠাৎ দৈববাণীর মত আমার মনে হলো, এখন আমি এই দরজার বাইরে গিয়ে বাঁদিকে দশপা গেলেই মিঃ ও-কে দেখতে পাবো। আমি ক'র্‌লুমও তাই। বাইরেটা তখন বড় অন্ধকার, আমি তাঁর মুখ দেখতে পেলুম না, তাঁর সামনে একটা ছাতা ছিল, তিনি এক জনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে চলে যাচ্ছেন। আমি কথার স্বর শুনে চিন্তে পেরে গিয়ে তাঁকে থামালুম। আমি যে ঘরের বাইরে গিয়ে 'ও' কে দেখতে পাবো এ কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়। কিন্তু এইটে হবে তা যে আগে থেকে আমি জানতে পেরেছিলুম এইটেই আশ্চর্য্য ব্যাপার!

অনেক সময় আমরা একটা লোকের নাম করি আর দেখি লোকটা এসে উপস্থিত! এই গুলোকে দৈবযোগ বলে উড়িয়ে দেওয়া বেশ সুবিধা, কিন্তু প্রতিদিনের এই সকল দৈবযোগের মধ্যে কোন কি গূঢ় রহস্য নেই! আমি ত তা মনে করতে পারিনে।

এখন আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করি। দু তিন বছর আগে একদিন সকালে—সেদিন ২রা মার্চ্চ—আমি আয়েসে শুয়ে শুয়ে একথা সেকথা ভাবছি হঠাৎ একটা জলন্ত নূতন ভাব আমার মনে এল, যেন দুর্গের মধ্যে একটা কামানের গোলা এসে পড়ে চারিদিকে হুলস্থূল বাধিয়ে দিলে। সাদাসিধে কথায় বলতে গেলে ভাবটা এই যে—আমার মনে হোল একটা বিশেষ বিষয়ে বই লেখার এই উপযুক্ত সময়। গ্রেট বনাঞ্জা আজকালকার একটি নূতন আশ্চর্য্য! আজকাল সকলে সে সম্বন্ধেই কথা কহেন। নেভেডা রৌপ্য খনির সম্বন্ধে বই লেখার এই উপযুক্ত সময়, আর উইলিয়ম এইচ রাইট ইহার উপযুক্ত লেখক। এঁর সঙ্গে আমি দশ বৎসর পাশাপাশি একসঙ্গে কাজ করেছিলুম। এখন তিনি বেঁচে আছেন কিনা জানি না। যাহক আমি তবু একটা চিঠি লিখব। এই ভেবে প্রথম আমি আস্তে আস্তে চিঠি আরম্ভ করলুম যে এই বিষয়ে একটা বই লিখলে ভাল হয়। কিন্তু লিখতে লিখতে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। তখন আমি আর একটা কাগজে—বই লিখলে কিকি বিষয় লেখা উচিত—বিষয়গুলি কিরকম করে সাজান উচিত লেখার ধরণ কি রকম হওয়া উচিত—এক কথায় সংক্ষেপে বইটার একরূপ খসড়া করে গেলুম। আর কাউকে এ রকম লেখা পাঠাতে আমার সাহস হোত না, কিন্তু তাঁকে আমি বেশ চিনতুম—জানতুম যে ভাল ভেবে যে কাজ করা যায় তা তিনি মন্দ ভাবে নেন না। সেইজন্য এই চিঠি ও বই পাঠাতে যাচ্চি এমন সময় মনে হোল যে আমার কথামতে বই লেখা হলে যদি শেষে এ বই কেউ না ছাপাতে চায় ত তাঁর মুস্কিল। সেই জন্য আগে কোন ছাপা-ওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তবে তাঁকে লেখা ভাল। চিঠিটা আর তাঁকে না পাঠিয়ে আমার নিজের বই যে ছাপত তার বাড়ী গেলুম। দেখলুম সে লোক বাড়ী নেই, তার নামে একটা চিঠি লিখে রেখে চলে এলুম। চার পাঁচ দিন হয়ে গেল; এ চিঠির কোন উত্তর পেলুম না, এর মধ্যে এ বিষয়ের কথা আমার মন থেকে সব চলে গেল। ৯ই মার্চ্চ সকালে ডাকহরকরা আমাকে কতকগুলো চিঠি এনে দিলে এর মধ্যে এক খানা খুব পুরু চিঠি ছিল। উপরের লেখাটা চেনা চেনা মনে হোল কিন্তু প্রথমে লেখকের নাম মনে এল না। তার পর ক্রমে মনে এল। এ সময়ে আমার একজন আত্মীয় এখানে উপস্থিত ছিলেন তখন আমি তাঁকে বল্লুম দেখ আমি তোমাকে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাই। এই চিঠিটা না খুলে আমি তোমাকে এতে যা আছে সমস্ত বলে দেবো। ভার্জিনিয়ার নেভেডা থেকে ২রা মার্চ্চ তারিখে মিঃ রাইট এই চিঠিটা লিখেছিলেন। সেখানকার রূপোর খনি সম্বন্ধে তাঁর একটা বই লিখতে ইচ্ছে আছে,—এই ধরণে এই এই বিষয়ে তিনি লিখবেন মনে করছেন। আর বনাঞ্জা সম্বন্ধে আমার মত কি তাই জিজ্ঞাসা করছেন। তার পরে চিঠি খুলে আমি দেখালুম আমি যা যা এবং যে তারিখ বলেছি চিঠিতে ঠিক তাই আছে। এক

কথায় আমি তাঁকে যা লিখেছিলুম তিনি আমাকে ঠিক তাই লিখেছেন। আমার চিঠি তখনও বাক্স বন্ধ। এর ভিতরে দিব্য দৃষ্টির কিছুই ছিল না; দিব্য দর্শন বলতে বোঝায় যে দিব্য দর্শকেরা প্রত্যেক কথাটা দেখতে পায়। আমি চিঠিটার প্রত্যেক কথা জানতুম তা নয়; কেবল ভাবটাই জানতুম। এরকম ঘটনার সংযোগকে যে দৈবযোগ বলা যায় তা নয়। এমন বিস্তারিত ঘটনা সংযোগ সংসারে ঘটে না; দৈবাৎ দু এক বিষয়ে মিল থাকতে পারে কিন্তু সব বিষয়ে হয় না। আমার সন্দেহ করবার কোন কারণ ছিল না যে রাইটের মন আর আমার মন তিন হাজার মাইল দূর থেকে পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করছিল। তবে দুজনের মনে এই এক ভাব যে একই সঙ্গে উদয় হয়েছিল তাও আমার মনে হয় না, এক জনের ভাব আর এক জনে সংক্রামিত হয়েছিল এই আমার বিশ্বাস। আমার ভারি জানবার ইচ্ছা হলো আসলে কার মনে এ ভাবটা প্রথমে এসেছিল এবং সেই জন্য তাঁকে বিস্তারিত করে এই বিষয়টা লেখবার জন্য তখনি চিঠি লিখলুম। উত্তর প'ড়ে বুঝলুম যে তাঁর মনেই ভাবটা আগে এসেছিল এবং তাঁর মনই আমার কাছে সে খবরটা পাঠায়। এখন বিবেচনা করে দেখ যে কেমন একটা নূতন ভাব তিন হাজার মাইল দূর থেকে অজ্ঞাত ভাবে আর এক জন চুরী করেছে। যদি কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে তিনি এইরূপ আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাস পড়লেই জান্‌তে পারবেন যে একই সময়ে অনেক লোক একই আবিষ্কার করেছিল। পৃথিবীতে অনেক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তাড়িৎসংবাদ ছিল না তার পর আমেরিকায় প্রফেসর হেনরী, ইংলণ্ডে হুইট্‌ষ্টোন সমুদ্রের উপরে মর্স এবং মিউনিচে এক জন জার্ম্মাণ একই সময়ে টেলিগ্রাফি আবিষ্ক্রিয়া করেন। ইহা কি সম্ভব নহে যে আবিষ্কারকগণ অজ্ঞাত ভাবে দূর হইতে পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন?

গত বসন্ত কালে সাহিত্য ব্যবসায়ী আমার একজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি কথায় কথায় বল্লেন, যে তিনি একটা নূতন আবিষ্ক্রিয়া করেছেন, তাঁর মাথায় একটা নূতন ভাব এসেছে, এবং ব্যাপারটা কি তাও আমাকে খুলে বল্লেন। তখন আমার লেখা একটা কাগজ আমি তাঁকে দিয়ে বল্লুম যে তাঁর ওই নূতন ভাবের মর্ম্মটা আমার এই কাগজ লেখা আছে। এটা আমি এক সপ্তাহ আগে লিখেছিলুম আর এ ভাবটা তার আগের নবেম্বর মাস থেকে আমার মাথায় ঘুরছে। আমি যখন লিখেছিলুম তখন আর কি তাঁর মাথায় ওই ভাবটা গিয়েছিল।

নিম্ন লিখিত একটী সত্য ঘটনার বিবরণ এখানে আমি খবরের কাগজ থেকে তুলে দিচ্চি। ঘটনাটী যখন নূতন ঘটে তখন তার বিবরণ আমি উক্ত বন্ধুর কাছে আগে শুনেছিলুম।

"আটলাণ্টিক মন্‌থ্‌লী" নামক মাসিক পত্রিকায় সম্পাদক Mr. H. 'Dr. Breen's

Practice' নামক একটি গল্প ছাপাইতে দেন। এই সময়ে New York থেকে আর একটি মহিলা এই কাগজের জন্য সম্পাদকের কাছে আর একটি গল্প পাঠান। উভয় গল্পেরই মর্ম্ম এক। Mr. H. সেটি পড়ে সেই মহিলাটির সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর যন্ত্রস্থ লেখা দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে তিনি ঐ গল্পটি পড়বার আগেই এ গল্প লিখেছিলেন। এই রকম আর একটী ঘটনা আমি অপরের কাগজ থেকে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্চি। মিস অ্যালকটের "Moods" নামক নভেলের পুনঃ সংস্করণ দেখে Boston Post নামক পত্রের সম্পাদকের একটি কথা মনে আসে। Moods ছাপাইবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, মিশ অ্যানা গ্রেন প্রণীত এমেলি চেষ্টার নামক পুস্তকের সহিত ইহার আশ্চর্য্য মিল! যদিও দুই জনে দুই জনের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং শত শত মাইল দূরে থাকেন। এমন কি এ দুখানি পুস্তকের প্রথমাংশের গল্প ও নাম পর্য্যন্ত এক; শেষ অংশের ঘটনা কেবল সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তখন Moods এর ব্যক্তিগণের নাম পরিবর্ত্তিত করে ছাপান হল।

আমার মনে আছে আমি তিন চারবার খবরের কাগজে দেখেছি যে চার পাঁচ জন লোকে একটা কবিতা আপনার বলে অধিকার করতে চান। Beautiful snow, Nothing to wear, Rock me to sleep mother, ইত্যাদি আরো কয়েকটি সুপরিচিত কবিতা সম্বন্ধে এইরূপ হাঙ্গামা হয়েছিল। আমার মতে মানসিক টেলিগ্রাফিই এইরূপ যত অনর্থের মূল।

আমি মেসমেরেজম বা ক্লেয়ারভয়েন্‌স্ ঘটনা কখন দেখিনি কিম্বা ভূতও দেখিনি কারণ দেখবার সুবিধা হয় নাই। কিন্তু সমভাবপ্রবণ, অন্য কথায় যে দুই মানুষের মনোভাবের সুর একই রকম তাদের ভাবের মধ্যে যে আদান প্রদান চলতে পারে এ আমার বিশ্বাস। এক এক সময় হঠাৎ কতকগুলি এমন ভাব মনে আসে তখন মনে হয় যেন কত যুগযুগান্তর থেকে এই ভাব মনে ছিল। হ'লেও হতে পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে সমভাবপ্রবণ মনুষ্যের বিশেষ অবস্থায় একজনের মনের চিন্তা ও অনুভূতি আর একজনে সংক্রামিত হলেই এরূপ হয়।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি এই পর্য্যন্ত লিখি; তখন আমি হাইডেনবার্গে ছিলাম। ইচ্ছা ছিল পরে পরে এ সম্বন্ধে যা দেখব তা সব এক সঙ্গে করে লিখব; এর মধ্যে এতবার এক সঙ্গে চিঠী যাতায়াত করেছে যে ওটার আর নূতনত্ব নাই; যা হোক এর থেকে আমি একটা কাজের সঙ্কেত বার করেছি; আমি যার কাছে এখন চিঠি পেতে চাই তখনি তাকে একটা চিঠি লিখি; তারপর চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলি। নিশ্চয় জানি যে এবার তার আমাকে চিঠি লিখতেই হবে; এইরূপ বিশ্বাসটা এখন আমার একটা বদ্ধমূল কুসংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রকম হওয়াই স্বাভাবিক; হাইডেনবর্গে থেকে আমি কিছুদিন ভিনিসে এসে থাকি; এক দিন আমরা গ্র্যাণ্ড ক্যানেলে নৌকা চড়ে যাচ্চি হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলুম; ফিরে দেখি আর

একটা নৌকা দ্রুতবেগে আমাদের পিছনে পিছনে আসছে—আর মাঝিটা আমাকে থামতে ইঙ্গিত করছে। আমি থামলুম—সে লোকটা আমাদের কাছে এল; তাতে একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি ভিনিসের বাসেন্দা, অত্যন্ত বিপদে পড়েছেন; তিনি বল্লেন হোটেল ব্রিটানিয়াতে একজন নিউইয়র্কবাসী ভদ্রলোক সস্ত্রীক আছেন তাঁর ছেলের খোঁজ পাবার আশায় তিনি এক সপ্তাহ হ'ল এখানে এসেছেন, এখনও কোন খোঁজ পাননি; মহিলাটি দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়েছেন, পিতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন; আট মাস পূর্ব্বে সান ফ্রান্সিস্কো হতে পুত্রের শেষ চিঠি পান তার পর আর কোন খবর নাই। এখন তাঁহারা মনে করছেন সান ফ্রান্সিস্কোয় টেলিগ্রাফ করবেন। আগে তিনি টেলিগ্রাফ করেন নি, কারণ তাঁহার মনে হয়েছিল যে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে; তাঁর ইচ্ছা আমি তাঁর হয়ে টেলিগ্রাফ করি কিন্তু আমি এ কাজে হাত দিতে রাজী নই কারণ খবর না আসে ত মায়ের নিশ্চয় মৃত্যু; সেই জন্য আমি তোমাকে ডাকতে এসেছি তুমি যদি গিয়ে বাপকে একটু বুঝিয়ে বলে ৭।৮ দিন টেলিগ্রাফ বন্ধ কর্ত্তে পারত মা বাঁচতেও পারে; তুমি এখন শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো।"

আমি তাঁর সঙ্গে চল্লুম। মনে মনে ঠিক করলুম কি কত্তে হবে, ভদ্রলোকটীর সঙ্গে দেখা হলে আমি বল্লুম আমার কতকগুলো কুসংস্কার আছে কিন্তু তা নিতান্ত উড়িয়ে দেবার মতন নয় তুমি যদি এখনি ফ্রান্সিস্কোতে টেলিগ্রাফ কর ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছেলের খবর পাবে। ফ্রান্সিস্কো থেকেই যে খবর পাবে তা বলতে পারিনে তবে যেখান থেকে হোক পাবে। তার পর দিন দুপুর বেলা তার ছেলের কাছ থেকে এক চিঠি এল। এই ঘটনায় লোকটী আমার কাছে এমন কৃতজ্ঞ হ'ল যেন সত্যি সত্যি এই চিঠি পাওয়াটা আমিই ঘটিয়েছি। তার ছেলে শান ফ্রান্সিস্কো থেকে একটা মালের জাহাজে যাত্রা করে এবং অনেক মাস পরে প্রথম একটা বন্দরে পৌঁছিয়েই সেখান থেকে চিঠী লেখে। এর থেকে মানসিক টেলিগ্রাফির যদিও কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না, আমি কেবল দেখাচ্ছিলুম যে, আমার মনে এই কুসংস্কারের প্রভাব কতটা বদ্ধমূল। কিন্তু আর কতকগুলি ঘটনা আমি বলচি যার থেকে মানসিক টেলিগ্রাফীর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বৎসর পূর্ব্বে একদিন সোমবার সকালে মেলে কতকগুলি চিঠি পেয়ে তার মধ্য হতে একখানা চিঠী নিয়ে আমার বন্ধুকে বল্লুম এটা অমুকের কাছ থেকে এসেছে, আর তিনি লিখেছেন যে শনিবার দিন তিনি নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন ইচ্ছা ছিল বিকালে হঠাৎ এখানে এসে পড়বেন কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। আমার কথা সব ঠিক খেটে গেল অথচ আমরা যথার্থই জানতুম না যে তিনি নিউইয়র্ক যাবেন।

আমার ভারি তামাক খাওয়া অভ্যাস আমি ২৪ ঘণ্টাই চুরুট খাই—৭ বছর থেকে আমি মার্ব্বেলপিলারের উপরের ছবির পাশে দেশলাই রাখি যে যখন ইচ্ছা নিতে পারব। আমার চাকর এই দেশলাইগুল' নিয়ে বাতী জ্বালে কিন্তু আর

রেখে যায় না। কিছুতে তাকে ৭ বছরে এ অভ্যাস ছাড়াতে পারিনে। একদিন আমার পরিবারেরা যখন এখানে নেই তখন আমাদের বাড়ীর একজন লোককে বল্লুম, এই ছুটীর মধ্যে,——সে লোকটা বল্লে আমি তোমার কথার শেষ বলতে পারি—

আমি বল্লুম কি? সে বল্লে "এই ছুটীর মধ্যে জর্জ্জের দেশ্লাই নেওয়া অভ্যেসটা ছাড়াতে হবে।" সে ঠিক বললে, আমি ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। আর একদিন গত গ্রীষ্মকালে একদিন একটা গাছের তলায় বসে আছি এমন সময় একটা পাগলামী ভাব মাথায় এল, তখন একজনকে বল্লুম—ধর আমি যদি ৯২ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচতুম, তা হলে বোবা অন্ধ দন্তহীন হয়ে গেছি এমন সময় যদি——" সে বল্লে থাম কি বলছ তা বলে দিচ্চি—এমন সময় যদি একজন এসে বলে তুমি এখন আর্ল হবে—" হাঁ তাই আমিও বলতে যাচ্ছিলুম কিন্তু তার আগে ও কথা আমার কিছুই মনে আসে নি।

বর্ত্তমান শতাব্দী আবিষ্ক্রিয়ার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে বলে মনে হয়; কিন্তু তবুও ফ্রেণোফণের আবিষ্ক্রিয়া (ফ্রেণোফণ অর্থাৎ—মনে মনে কথাবার্ত্তা কহিবার পদ্ধতি) হইতে পারে। টেলিফোন টেলিগ্রাফে আর আমাদের কাজ চলে না। আমিও যখন এটা লিখচি সেই সময়ে বোধ হয় পৃথিবীর আর এক অংশেও আর এক জন ঠিক এই কথা লিখছে—এখন কথা এই যে সে আমায় ভাব দিচ্ছে কিম্বা আমি তাকে ভাব দিচ্চি।

ভল্টেয়ারের ক্যালডিডি আর জন্সনের রাসেলাস অনেকটা এক ধরণের। জন্সন বলতেন যে যদি দুখানা বই ঠিক পরে পরেই না বার হত তবে কেউ বিশ্বাস করত না যে কেউ না কেউ আর একজনের চুরী করিয়া লেখে নাই। অথচ প্রকৃত পক্ষে দুজনের মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান। ডারুইন আর ওয়ালেস্ যে প্রায় একই সময়ে মনুষ্যের ক্রমাভিব্যক্তি মত বাহির করিয়াছিলেন তা অনেকেই জানেন। তবে অবশ্য ওয়ালেস অপেক্ষা ডারুইনের মনে এই মতটা বেশী সুস্পষ্ট ভাবে ছিল। ডিফারেন্‌স্যাল ক্যালকুলাশ আর নেপ্‌চুন গ্রহ আবিষ্কারেও এইরূপ সংযোগ ঘটিয়াছিল। ইজিপ্টের হস্তলিপি পাঠের সাট বা আলোকের তরঙ্গ বিজ্ঞান—আর নূতন রসায়ন আবিষ্ক্রিয়াতেও এই রকম হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক জগতের এই সংযোগ গুলির উল্লেখ করিয়া জন ফ্রিস্‌কি বলেন যে এক সময়ে এই বিষয়গুলির বিষয়ে পৃথিবীতে অনেক লোকই ভাবছিলেন সেই জন্য কাছাকাছি সময়ে সকলের মনেই একরূপ ভাবোদয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু এক জনের মন থেকে আর সকলের পাওয়াই বা কেন না সম্ভব? যা হোক জীবন্ত মন যে মনের উপর কার্য্য করিবে সেটা আশ্চর্য্য নয় কিন্তু অচেতন পদার্থও যে মনের উপর কাজ করে তাহাই আশ্চর্য্য! সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটীর দিব্য দর্শকের হাতে কোন লোকের পরিহিত কাপড়, বই, ব্যবহৃত কোন দ্রব্য দিলে সে যেমন সেই অপরিচিতের খবর বলে দিতে পারে সেই রকম মনে মনে মানসিক

টেলিগ্রাফিতেও অচেতন পদার্থের সঙ্গে মনের সঙ্গে টেলিগ্রাফ না চলবে কেন? একবার একজন মহিলা দূর থেকে আমায় লেখেন যে তাঁর ছেলে নিউইয়র্কে গিয়ে তিন সপ্তাহ থাকবে আর আমি যদি নেমন্তন্ন করি ত একদিন এসে দেখা করবে। চিঠিটা পড়ে কোথা ফেল্লুম পরে ও কথাটাই একেবারে ভুলে গেলুম। প্রায় তিন সপ্তাহ যায় তখন একদিন হঠাৎ মনে হ'ল। দেখলুম কাজটা বড় খারাপ হয়েছে। ত্রুটি স্বীকার করে তার ছেলের ঠিকানা চেয়ে মহিলাটীকে একখানা চিঠি লিখলুম। কিন্তু শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখলুম যে আমার বোধ হচ্চে এ চিঠি তোমার পাবার আগে তোমার ছেলের কাছ থেকেই আজ আমি একখানা চিঠি পাব। একটু পরেই চিঠি এল। আমি যখন চিঠি লিখছিলুম সেই সময় এ চিঠিখানা ডাকঘরে ছিল তখনও বিলি হয় নি। আর এর থেকেই নিশ্চয় আমার মাথায় কথাটা এসেছিল। এবার এর চেয়ে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা বলছি কিন্তু এটা মনের উপর মনের কি অচেতন পদার্থের টেলিগ্রাফী তা বলতে পারছি নে। একজন ব্যবসায়ী হটিফিল্ডে একটী নূতন বাড়ী সাজিয়ে দেবার ভার নেয়। বাড়ীটার কতকগুলি ঘরের দেয়ালে কাগজ মড়াতে হবে, এখন ঘরের মাপ ধরতে বোধ হয় ভুল হয়েছিল,—কারণ প্রায় সমস্ত দেয়ালে কাগজ আঁটা সারা হয়ে কেবল আধখানা আন্দাজ কাগজ কম পড়লো। যে কাগজের কল থেকে মহাজন কাগজ এনেছিল তাদের কাছে আবার কাগজ চাওয়াতে তারা বললে আমাদের কাগজ আর নেই। যে প্যাটার্ন থেকে ছাপান হয়েছিল তাও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সুতরাং তৈরী করাও হতে পারে না। তবে যে যে লোক ওই কাগজ নিয়েছেন তাঁদের নাম লেখা আছে। তাদের কারো কাছে সম্ভবতঃ আধখানা কাগজ চেয়ে পাওয়া যেতে পারে। সকলকে চিঠি লিখে খোঁজ করতে অনেক সময় গেল কিন্তু আশ্চর্য্য কারো কাছেই কাগজ নেই। তখন স্থির হ'ল যে ঘরের ও কাগজ সব খুলে অন্য রকম কাগজ দেওয়া যাবে। সকাল বেলা লোক এসে কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছে একটু কি কাজে তাকে অন্য দিকে কে ডাকলে। লোকটা গিয়ে দেখলে যে একজন অপরিচিত লোক এই বাড়ীটী দেখতে চাচ্ছেন। বাড়ীটী দেখবার উপযুক্ত, অনেক লোকই দেখতে আসত, কিন্তু গৃহস্বামী এখানে থাকতেন না সেই জন্য বিনা অনুমতিতে দেখান হত না। ঘটনা ক্রমে আজই গৃহস্বামী কাগজওয়ালার কাজ দেখতে এসেছিলেন। তাঁর কাছে খবর দিতে তিনি নিজে এসে লোকটীকে বাড়ী দেখাতে নিয়ে গেলেন আর কাগজওয়ালারা কিরূপে কাজ করবে তা দেখার জন্য প্রথমে ওই ঘরেই গেলেন। গৃহস্বামী ঘরে গিয়ে কাগজওয়ালাকে কাগজ খুলতে আজ্ঞা করায় অপরিচিত কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কারণ শুনে বল্লেন, কি আশ্চর্য্য আমার ঘরেও অল্পদিন হল এই কাগজ দিয়েছি আর ঠিক আধখানা কাগজ বেঁচেছে আমি সেটা পাঠিয়ে দেব, খুলবেন না। ঠিক যে সময় গৃহস্বামী এসেছিলেন সেই সময় যদি অপরিচিত না আসতেন তবে বাড়ী দেখাও হত না। আর কাগজও পাওয়া যেত না। এটা কি অদ্ভুত ঘটনা নয়?

এ বিষয়গুলি অনেকদিন হ'ল আমার লেখা ছিল এর কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলুম, এখন হঠাৎ ছাপাবার কথা মনে এল কেন জান? একজন সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস কল্লেন যে কখনও জেগেজেগে স্বপ্ন দেখেছ? আমি অমনি কি একটা উত্তর করতে যাচ্ছি হঠাৎ দেখতে পেলুম প্রশ্নটা কি গভীর। যে জিজ্ঞেস করেছিল সে এর গভীরত্বটা বোঝে নি কিন্তু আমি দেখলুম যে এতদিন আমি যেটা বুঝতে পারছিলুম না এবার হয়ত বা তা বুঝতে পারব। অসীম রহস্যের দরজা পেলুম। এর মানেটা এই—সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটীর সব বই আমি পড়েছি। তারা দেখি, যে গল্প বলতে আসে তাকে আগে জিজ্ঞেস করে তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার যে তোমার তখন বেশ জ্ঞান ছিল? তুমি জেগে ছিলে? লোকটা যদি ভেবাচাকা খেয়ে গিয়ে স্পষ্ট না কিম্বা হাঁ না বলতে পারে ত তার কথা গ্রাহ্য হয় না। যদি স্পষ্ট বলে জেগেছিলুম তখন কথাটা লোকে বিশ্বাস করে। মহিলাটীর কথায় আমার মনে হ'ল যে অনেক সময় লোকে অজ্ঞাত ভাবে ঘুমোতে পারে। ঘুমচ্ছে তা জানে না—ভাবছে জেগে আছি। অজ্ঞান তবু মনে করছে জ্ঞান আছে। জ্ঞান যে ছিল সে তা প্রমাণ করবারও উপায় পাই নি। আমার একটা মস্ত ঘটনা মনে এল। আমাদের ঘরের দাওয়ায় একদিন দাঁড়িয়ে আছি দেখি একজন অজানা লোক আমাদের বাড়ার দিকে আসছে। ভাবলুম আমায় বিরক্ত না করে দরজায় ঘণ্টা বাজিয়ে ভিতরে গেলেই বাঁচা যায় আমাকে ঘরের লোক জানলেই দাঁড়াবে, তাই এমন ভাব করলুম যেন আমিও অজানা লোক ভিতরে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। লোকটা আমার কাছাকাছি এসেছে—দরজা থেকে ১০ ফিট মাত্র অন্তর—হঠাৎ আর দেখতে পেলুম না। কি আশ্চর্য্য! বাতাসে মিলিয়ে গেল নাকি? আমার ত আহ্লাদের সীমা নাই। সত্যি সত্যি নিজ চক্ষে ভূত দেখলুম! এবার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসটা লিখে সাইকিক্যাল সোসাইটীতে পাঠাব। যেখানে ভূত দাঁড়িয়েছিল দেখলুম। চারদিক ভাল করে দেখলুম কোন চিহ্ন নেই, তাড়াতাড়ি উৎসাহে লিখতে ঘরে গেলুম। গিয়েই ত চক্ষুস্থির। ভূত দেখি নিশ্চিন্ত ভাবে চৌকীতে বসে আছে যেন বহুর খানেক আগে থাকতেই এসেছে। খানিকক্ষণ ত বসে রইলুম, তারপর তাকে জিজ্ঞেস কল্লুম "তুমি কি ওই দরজা দিয়ে এলে?" "হাঁ"—

কিকরে এলে?"

"আমি ঘণ্টা নাড়তে চাকর এসে দরজা খুলে দিয়ে গেল।"

আমি ত অবাক! লোকটা ঘণ্টা নাড়লে, তারপর জর্জ্জ গড়িমিসি চালে এসে দরজা খোলারও ত সময় চাই—যদিই বা দৈবী সে তাড়াতাড়ি আসে তবু ত দুমিনিট। দুমিনিট লোকটা দরজায় আমার চোখের উপর দাঁড়িয়ে রইল আর আমি দেখতে পেলুম না?

আমি ত এতদিন কিছুতেই এই সমস্যা ভাঙ্গতে পারিনি ভাঙ্গবার চেষ্টাতেই বোধ হয় নিঃশ্বাস ফুরোতো হঠাৎ সে দিন ওই লোকটার—জেগে কি স্বপ্ন দেখেছ" এই প্রশ্নে আমার বুদ্ধিটা খোলসা হয়ে গেল। বুঝলুম সেই মিনিটটা আমি ঘুমিয়েছিলুম: তাইত! লোকটা যদি ও ঘরে না গিয়ে চাকরদের ঘরে কি কোথাও যেত তবে ত আমি জানতুম যে আমি ভূত দেখেছি!!

কি করে বলা যায় কখন ঘুমচ্চি কখন জেগে আছি? শুনেছি লোকে আঙ্গুল কামড়ে পরীক্ষা করে। তা ঘুমিয়েও ত আঙ্গুল কামড়ান যায়!

একটী স্মরণীয় ঘটনা।

(ক্ষুদ্র গল্প)

১৮৫৭ সাল—পশ্চিমে তখন সিপাহীর হাঙ্গামা—ঘোর অরাজকতা—চারিদিকে কেবল গুলির সন্ সন্ শব্দ আর বন্দুকের দুম দাম। সেই সময়ে আমি কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতাম। ৫৭ সালের পর যে সকল বাঙ্গালি পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাঙ্গলার শস্য শ্যামল ভূমি দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহারা তার পর অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন। আমিও তাহাদের মধ্যে একজন।

কমিশেরিয়েটের চাকরী শুনিতে ভাল কিন্তু হাঙ্গাম ঢের। লোকে বলে কমিশেরিয়েট লুটের ভাণ্ডার কিন্তু লড়াই বাধিলে যদি মাথাটা লুট না হয় তাহা হইলেই রক্ষা। লড়াই বাধিলে যেমন লাভের পথ খোলা তেমনি অন্যদিকে আবার শত্রুর তীক্ষ্ণ গুলিতে মাথাটা যাইবার পথও খুব প্রশস্ত। একথাটা যে দিবালোকের ন্যায় সত্য তাহা একদিন বেশ টের পাইলাম।

কমিশেরিয়েটের বাবু—সুতরাং বড় বড় মিলিটারি সাহেবের সঙ্গে আমার খুব বনিয়া গিয়াছিল। অধিক কি আমার মনিব আমাকে অনেক সময় বন্ধুর ন্যায় ভাবিতেন। অত বড় সৈনিক পুরুষ তথাপি তিলমাত্র দাম্ভিক ভাব দেখাইতেন না। আমি প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম তাঁহার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতাম তাঁহার গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম মেম সাহেবের ফরমাস্ শুনিতাম আর তাঁহার অনুকম্পায় আমার যথেষ্ট পদোন্নতিও হইয়াছিল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন লক্ষ্ণৌ প্রদেশে সিপাহী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছে। মফঃস্বলের কথা দূরে থাক্ নিজ সহরেই হুলস্থুল কাণ্ড। অতবড় সহরটার দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ, রাস্তাঘাট চলাচল শূন্য, গৃহ পরিজন শূন্য, শটক আরোহী শূন্য ও নগর শান্তি শূন্য হইয়াছে। ইংরাজের আর সহরের রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। ইংরাজ দেখিলেই সিপাহীর অলক্ষ্য গুলি আসিয়া তাহার মাথা উড়াইয়া দেয়।

আমি জেনারেল রিচার্ডের অধীনে বড় বাবু ছিলাম। এই বিদ্রোহের সময় একদিন মেম সাহেবের ঘরে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, কথাবার্ত্তাটা অবশ্য সিপাহীদের সম্বন্ধেই হইতেছিল, এমন সময়ে সাহেব আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন আমায় দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! তুমি আসিয়াছ—ভালই হইয়াছে, তোমাকে বড়ই দরকার। তুমি না আসিলে আমি হয়ত এখনই লোক পাঠাইতাম। এই দেখ কমিসনার সাহেবের হুকুম।"

আমি কমিশনার—স্যর হেনরি লরেন্সের হুকুম পড়িলাম। আমার মনিব পাঁচশত

সৈন্য লইয়া কানপুর যাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। কানপুরে গিয়া সিপাহীদের গতি-রোধ করিতে হইবে, আবার সেখানকার কাজ সারিয়া সীতাপুর হইয়া দরিয়াগঞ্জের কাছে ছাউনী গাড়িয়া মফঃস্বলের বিদ্রোহীদের বাধা দিতে হইবে। হুকুম বড়ই জরুরি। সাহেব বলিলেন—"বাবু! দেখিলেত কাল ভোরে কুচ করিতে হইবে। তোমাকে ত আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে, অতএব পূর্ব্বাহ্নে আমার স্ত্রী পুত্রদের রেসিডেন্সিতে কমিশনার সাহেবের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও।"

আমি সাহেবের কথামত কাজ করিলাম কিন্তু সঙ্গে যাইতে এবার বড় ভয় হইতে লাগিল। কোথায় বিঘোরে প্রাণ যাইবে, কোথায় সিপাহীর গুলি খাইয়া পড়িয়া থাকিব, কোথায় কলিকাতা—কোথায় কানপুর—কোথায় আমি—কোথায় বা আমার স্ত্রী পুত্র এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় রাত্রিটা কাটাইলাম। পর দিন প্রাতে উঠিয়াই সাহেবের ছাউনীতে গেলাম।

সাহেব হৃষ্টমনে প্রাতরাশ খাইতেছেন। তিনি ত মাথাটা আগে বিক্রী করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতবর্ষে চাকরি করিতে আসিয়াছেন। তিনি সৈনিক পুরুষ—সমরেই তাঁহার আনন্দ সুতরাং তিনি স্বভাবতই প্রফুল্ল। সাহেব আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! ভয় কি—চিন্তা কি? আমার সঙ্গে তুমি সর্ব্বদাই থাকিবে—" আমি ভাবিলাম তোমার সঙ্গে থাকিলে মৃত্যুর সহিত আমার বড় দূর সম্পর্ক হইবে না, তোমার টুপীওয়ালা মাথা সিপাহীর গুলির নিশ্চিত শীকার বইত নয়? তোমার কাছে থাকিলে আমায় আগে মরিতে হইবে।"

তারপর দুচার ঘণ্টা পরে আমরা কানপুরের দিকে চলিলাম। আমার জিম্মায় রসদ—কানপুরে কাজ সারিতে আট দশদিন লাগিল। তারপর আমরা দরিয়াগঞ্জের দিকে চলিলাম। দরিয়াগঞ্জের কাছে তিরধূনার মাঠে আমাদের ছাউনী হইল আমাদের দলে গোরাই বেশী। তদ্ভিন্ন শিখ ও একদল হিন্দুস্থানী সিপাহী ছিল ইহারা তখনও ইংরাজের নেমক মানিয়া চলিতেছিল।

সিপাহীরা একদিন নটা দশটার সময় পাকাদি করিতেছে এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক ও বালিকা নিকটস্থ মাঠের দিক হইতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের দেখিয়া সিপাহীরা রন্ধন ছাড়িয়া ব্যাপারটী কি দেখিতে ছুটিল। অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল, আধপেষা আটা আর ভিজা কাঠে ফুৎকারের চেষ্টা এই কৌতূহলের মধ্যে ঢাকা পড়িল।

আগন্তুকদের মধ্যে একটী বৃদ্ধা—তিনটী প্রৌঢ়া ও একটী বালিকা। সিপাহীরা তাহাদের কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল —তাহারা কোন কথার উত্তর দেয় না কেবল চুপ করিয়া থাকে। তাহাদের বেশ ভূষা অতি মলিন তাহারা জাতিতে বেদিয়া বলিয়া বোধ হইল। প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না দেখিয়া সিপাহীরা তাহাদিগকে শত্রুর চর বলিয়া আটক করিল।

সিপাহীর ধাক্কা খাইয়া বুড়ী সর্ব্বাগ্রে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওঃ—তাহার কি ভীষণ কর্কশ চীৎকার!! আজও তাহা আমার মনে আছে। বৃদ্ধার চীৎকারে সকলেই চেঁচাইতে লাগিল। সিপাহীরা যত ধমক দেয় বুড়ীও সুরের মাত্রা তত বেশী করিয়া চড়াইয়া দেয়। ক্রমে দেখিতে দেখিতে একটা মস্ত হট্টগোল হইয়া পড়িল।

শেষে আর থাকিতে না পারিয়া আমি সেই ক্ষেত্রে গেলাম। সিপাহীদের বলিলাম ইহাদের ছাড়িয়া দাও কেন বৃথা গোল বাড়াইতেছ। সিপাহীরা বলিল "বাবু সাহেব, ও হুকুম করিবেন না, এবেটীরা শত্রুর চর! ছাড়িয়া দিলে কাহারও আর মাথা থাকিবে না। আমি বলিলাম—"আচ্ছা এক কাজ কর তোমরা এইভাবে ইহাদের সাহেবের কাছে লইয়া চল আমি সঙ্গে যাইতেছি বিচার করিয়া যাহা ভাল হয় সাহেবই করিবেন তোমরা আর ইহাদের তাড়না করিও না—এস আমার সঙ্গে এস।"

আমি আগে আগে চলিলাম তাহারা আমার পশ্চাতে চলিল সর্ব্ব পশ্চাতে ৪।৫ জন সিপাহী। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহাদের সঙ্গে একটী দশ বর্ষীয়া বালিকা ছিল। বালিকাটী মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দেখাইতেছিল—তাহার সেই মলিনতার মধ্যেও যেন রূপের তীক্ষ্ণ জ্যোতি ক্ষীণচ্ছটায় বাহির হইতেছিল, তাহার মুখে ঘোরতর প্রশান্তভাব, চক্ষুর্দ্বয় পূর্ণোৎফুল্ল--কেশভার কুঞ্চিত আলুলায়িত ও আগুলফ্ লম্বিত, মুখ খানি কুজ্ঝটিকাবৃত কমলিনীর ন্যায়। সে নিস্তব্ধ ভাবে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতে করিতে পিছু পিছু আসিতেছিল আমি তাহাকে এতক্ষণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, এক্ষণে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাড়ী কোথায় বাছা—তুমি এখানে কেন আসিয়াছিলে?"

সে প্রথমে উত্তর করিল না; আমি আরও মিষ্টস্বরে পুনরায় প্রশ্ন করিলে বালিকা তখন ভাঙ্গা বাঙ্গলায় উত্তর দিল, "আমরা ভিক্ষা করিয়া খাই সিপাহীদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিলাম—তাহারা আমাদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছে" এই কাঠখোট্টার দেশে কঠোর হিন্দুস্থানী ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানী বালিকার মুখে বাঙ্গলা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। শুনিয়াছিলাম—এদেশ হইতে বেদিয়ারা বাঙ্গালা দেশে গিয়া ছোট ছেলে ধরিয়া আনে—এ বালিকা কি তাই হইবে? আমার মনে বড় একটী কৌতূহল হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওরা তোমার কে?"

বালিকা বলিল—"উহারা আমার আত্মীয়—আমি ভিক্ষা ছাড়া হাত গণিতেও পারি—অদৃষ্টের কথাও বলিতে পারি।" বালিকা বোধ হয় জানিত বাঙ্গালীর ন্যায় অদৃষ্টবাদী জগতে খুব কম আছে।

আমি বলিলাম—"আচ্ছা আমার হাত গণিয়া দিতে পার? হাতগণা এখন থাক এখন বল দেখি সিপাহীদের সঙ্গে আমাদের কবে লড়াই বাধিবে?"

একটা দশ বৎসরের বালিকা অদৃষ্ট গণনা করিবে শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছিল।

বালিকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"১৪ই তারিখে বিদ্রোহীরা তোমাদের আক্রমণ করিবে তোমাদের অনেক লোক মরিবে। তুমি বাঁচিবে—এবং এই যুদ্ধে তোমার খুব সম্মান বাড়িবে।"

"আচ্ছা! আচ্ছা! চল সাহেবের কাছে চল সেখানে আমি তোমাকে ঘৃত ময়দা ও খাবার খাইতে নগদ পয়সাও দিব।" বালিকা আমার সঙ্গে চলিল তাহার পরিচয় লইবার এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই তাহা জানা গেল না।

বড় সাহেবের কাছে পৌঁছিলাম—তিনি তখন তাঁবুর মধ্যে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমাদের সঙ্গে এক দল লোক দেখিয়া বলিলেন, "বাবু! ব্যাপার কি?" আমি সব খুলিয়া বলিলাম—যুদ্ধ সম্বন্ধে গণনার কথাও বলিলাম। সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, বালিকাকে ভিতরে লইয়া আইস। বালিকা তাঁবুর ভিতরে গেলে সাহেব তাহাকে হিন্দীতে বলিলেন, "পরশু যুদ্ধ হইবে—এ কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, সত্য কথা বল কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে এনাম দিব।"

বালিকা বলিল—আমি গণনায় জানিয়াছি।

সাহেব বলিলেন—that's all humbug! আমার সাহেবের পাশে কাপ্তেন হরণ্ বসিয়াছিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে বালিকার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অদৃষ্টে কি আছে বল দেখি, ঠিক বলিতে পারিলে পুরস্কার দিব।" হরণ সাহেব ঠাট্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বালিকা তাহার হাত দেখিয়া বলিল, "পরশুকার যুদ্ধে তুমি নিশ্চয়ই মরিবে।"

সাহসী সৈনিকের কাছে মৃত্যু ও প্রণয় সঙ্গীত একই জিনিস—প্রণয় গীতির ন্যায় মৃত্যুর কথাও তাহাদের পক্ষে অতৃপ্তির বিষয় নয়। হরণ সাহেব হোঃ হোঃ করিয়া উঠিলেন, আবার বালিকার কাছে হাত লইয়া বলিলেন, "বল দেখি আমি মরিব কিসে?"

"বুকের ভিতর বন্দুকের গুলি গিয়া তোমায় আহত করিবে—আহত হইবার দেড় ঘণ্টা পরে তোমার মৃত্যু। ঐ সময়ে যদি কেহ তোমার সেবা করে ত তুমি বাঁচিতে পার। কিন্তু তোমার সেবা হইবে না ১৪ই তারিখে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়।"

হরণ সাহেব মনে মনে কি ভাবিলেন—পরে পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বালিকাকে দিতে গেলেন, সে তাহা লইল না। বড় সাহেব বলিলেন, "তুমি আমার হাত দেখদেখি।" বালিকা হাতখানি ধীরে ধীরে ধরিল, পরে সবেগে হাত ছুড়িয়া দিল। সাহেব বলিলেন, "কি দেখিলে?"

"আমি বলিব না।"

"না বলিবে ত দেখিলে কেন, কোন ভয় নাই, যাহা দেখিলে তাহাই বল।"

"না—আপনি রাগ করিবেন—"

"না—আমি রাগ করিব না—আমোদের জন্য গণাইতেছি রাগ করিব কেন, তুমি যা দেখিলে ঠিক বল—মিথ্যা বলিলে রাগ করিব।"

"বলিব—ঠিকই বলিব—আপনারও ১৪ই তারিখে মৃত্যু হইবে।"

"কোন্ ১৪ই?"

"তা বলিতে পারি না—গণনায় তাহা দেখিতে পাইতেছি না।"

"আচ্ছা কিসে আমার মৃত্যু হইবে?"

"আঘাত—অপঘাত—রক্তোচ্ছ্বাসের মধ্যে!!"

সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাইবে—বাবু ইহারা যা চায় তাই দিয়া বিদায় করিয়া দাও ইহারা গুপ্তচর নয়।" এই কথা বলিয়া সাহেব আবার লিখিতে বসিলেন—আমি বালিকাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া সাহেবের ঘরে গেলাম। হরণ সাহেব কিছু বিমর্ষ ও গম্ভীর। সাহেব বলিলেন, "হরণ, তুমি কি একটা ছেলে মানুষের গণনায় ভয় পেলে নাকি? চুপ করে কেন?"

হরণ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ ভয় পাইয়াছি বটে!! বালিকার কথায় ভয় পাইব ত তরবারি ধরিয়াছি কেন? তবে এই ভাবছি পরশ্ব যুদ্ধ হইবে এ মেয়েটা কি করিয়া জানিল? বোধ হয় এরা গুপ্তচর! God bless my soul!! উহাদের ছাড়িয়া দিয়া ভাল কাজ হয় নাই।" এমন সময়ে সাহেবের খানা আসিল, আমি নিজের আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৩ই কার্ত্তিক। ১৪ইএর প্রভাত হইল—আমার মনে কেবল বালিকার কথা জাগিতেছে। ভাবিলাম আজত ১৪ই, দেখি না কি হয়!! সাহেবেরা পূর্ব্বাহ্ন হইতেই সতর্ক—সকল সেনাই প্রভাত হইতে সশস্ত্র, শত্রুর গতিবিধি জানিবার জন্য ৫।৭ জন চরও পাঠান হইয়াছে, সে দিন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সৈনিকের গভীর পদবিক্ষেপ, অশ্বের খুর শব্দ, হ্রেষারব ও ইংরাজ গোরার "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" শব্দ চারিদিক আকুলিত করিতেছিল! বেলা একটার সময় একজন চর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল—হজরতগঞ্জের মাঠে দলে দলে বিদ্রোহী আসিয়া জমিতেছে। সমস্ত দিন ধরিয়া এইরূপে জমিতে পাইলে তাহারা আমাদের ধূলিগুঁড়ি করিয়া দিবে।"

সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তখনই কুচ করিবার হুকুম দিলেন—আমাদের সৈন্যেরা একবারে বিদ্রোহীদের উপর গিয়া পড়িল। সমস্ত দিনই গুড়ুম গড়াম চলিল—সন্ধ্যার সময় আমাদের সৈন্যেরা বিদ্রোহীদের তাড়াইয়া দিয়া জয়োল্লাসের সহিত ছাউনীতে ফিরিল।

সাহেব ঘোড়া হইতে নামিলেন, তাঁহার মুখ সমর জয়োল্লাসেও বিষণ্ণ, অঙ্গে সমর-ক্লান্তিজনিত স্বেদ চিহ্ন, দুই এক স্থানে সামান্য রক্তের দাগ, আমার মনে বালিকার ভবিষ্যৎ কথা জাগিতেছিল—আমি সাহেবকে অক্ষত শরীর দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলাম।

আমি বলিলাম, "কাপ্তেন হরণ কোথায়? তিনি ত ছাউনীতে ফিরিলেন না।"

সাহেব চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তাইত ভাবিতেছি, তাহার ত কোন সন্ধান পাইতেছি না—হায়! তাহার সম্বন্ধে বালিকার ভবিষ্যৎবাণী বুঝি সত্য হইয়া পড়িল!"

আমি বড় সাহেব ও চারি জন গোরা মশাল লইয়া হরণ সাহেবকে খুঁজিতে বাহির হইলাম, তখন সন্ধ্যার কাল ছায়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন, ক্ষেত্রের উপর পতিত রাশীকৃত রক্তাপ্লুত—মৃত, অর্দ্ধ মৃত নরদেহ।

বড় সাহেব ইংরাজের শব দেখিলেই তাহা আলো ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ এইরূপে খুঁজিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। নিরাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় একটী মৃত অশ্বের পার্শ্বে একজন ইংরাজ ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিল—"জল দাও।" শব্দ সাহেবের কাণে গেল—মশালধারীরা নিকটে আসিল—আহত ব্যক্তির শোণিতাক্ত মুখের উপর মশালের আলো পড়িলে, সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওঃ হরণ! হরণ! তোমার এই শোচনীয় দশা!! হা পরমেশ্বর!" সাহেব নিজ হাতে মৃতদেহ সরাইয়া হরণের আহত দেহ উদ্ধার করিলেন।

এই সময়ে একটা বিদ্রোহী সিপাহী শায়িতাবস্থাতেই বন্দুকের ঘোড়া টিপিয়া বড় সাহেবের উপর লক্ষ্য করিতেছিল—আমার হাতে তরবারি ছিল—আমি বাঁটের বাড়ি সেই পিশাচের মস্তকে দারুণ আঘাত করিলাম—সে সেই আঘাতে বিকট চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার নিক্ষিপ্ত গুলিতে সাহেবের পার্শ্বের একজন গোরা মরিল। সাহেব সব দেখিলেন—সহাস্যে—সকৃতজ্ঞতায় বলিলেন—"বাবু, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিলে—এ কথা আমার স্মরণ থাকিবে।"

হরণ সাহেবকে আমরা ধরাধরি করিয়া দূরে ফাঁকা জায়গায় আনিলাম। তাঁহার আহত স্থান ধৌত করিয়া—জল ও ব্রাণ্ডি খাইতে দিলাম। কিছু বল পাইয়া হরণ বলিতে লাগিলেন—"ভাই! যুদ্ধের প্রথমেই আমি আহত হইয়াছি। এই দেখ আমার বুকের ভিতর দিয়া গুলি গিয়াছে আর আমার জীবনের আশা নাই, দাও জল—জল—" আমি জল দিলাম—হরণ বলিতে লাগিলেন—"জেনারেল প্রিয়তম রিচার্ড, তোমার নিকট শেষ বিদায়। কিন্তু আমার দুটি অনুরোধ, আমার গচ্ছিত টাকা বিলাতে আমার বৃদ্ধ মাতাকে পাঠাইয়া দিও—আর সেই বালিকা—সেই হতভাগিনী বালিকা—ওঃ তাহাকে যদি দেখিতে পাও তাহা হইলে দুই শত মুদ্রা পুরস্কার দিও। তার ভবিষ্যৎ কথা সব সত্য—ভাই, তুমি সাবধানে থাকিও আর একটু জল—প্রাণ যায়—বড় যাতনা।"

আমি জল ও ব্রাণ্ডি দিলাম, হরণ আবার বলিতে লাগিলেন—"রিচার্ড, আমি তোমার উপকার করিব—তোমার সেই শেষ দিন— সেই সাংঘাতিক ১৪ই মে যে দিন আসিবে, সেই দিন আমার প্রেতাত্মা তোমায় সাবধান করিয়া দিবে, বালিকার কথা সব সত্য—ভুলিও না।" হরণ ঢলিয়া পড়িলেন--মৃত্যু তাঁহার যাতনা শেষ করিল। আমি ভাবিলাম সেই বালিকা যাদুকরী না কি!! ইহার পর আট বৎসর কাটিয়া গেল। সিপাহীর হাঙ্গামা শেষ হইল। সাহেব খুব বাহাদুরী পাইলেন—বালিকা আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিল তাহাও ফলিল—অর্থাৎ আমারও পদোন্নতি হইল। কিন্তু বালিকা বড় সাহেবের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল তাহা ফলিল না। কত ১৪ই মে কাটিল—(এই তারিখ হইলেই সাহেব বিষণ্ণ হন)। আমি ভাবিলাম বালিকার কথা মিথ্যা হউক প্রভুর পরমায়ু বৃদ্ধি হউক।

সাহেব এক বৎসরের ছুটী লইয়াছেন—তিনিও বিলাত যাইবেন আমিও দেশে ফিরিব, সবই ঠিকঠাক। আমরা তখন মিরাটে।

এক দিন আমরা বৈকালে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমন সময়ে সাহেব বলিলেন—"বাবু! আজ কয় তারিখ? ১৩ই মে না?"

আমি বলিলাম—"হাঁ--আজ ১৩ই মে।" "ওঃ কাল তবে ১৪ই।" সাহেব বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আমায় ধীরে ধীরে বলিলেন—"বাবু! আট বৎসর পূর্ব্বে হজরতগঞ্জের লড়াইয়ের মাঠে সেই বালিকা যা বলে মনে পড়ে? কাপ্তেন হরণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ে?" আমি বলিলাম—"ও সব কথা ভাবিয়া কেন আপনি বৃথা কষ্ট পাইতেছেন—প্রতি বৎসরের ১৪ই মে তারিখে ত আপনি এইরূপ বিষণ্ণ হন। কিন্তু কৈ কিছু ত হয় না—পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন—সে বালিকা মিথ্যাবাদিনী। হঠাৎ দুই একটা কথা লাগিয়া গিয়াছে বলিয়া কি সবই সত্য হইবে?"

সাহেব বলিলেন—"বাবু! তুমি বিশ্বাস কর বা না কর আমি ত সে কথা ভুলিতে পারিতেছি না।" এ কথার পর তিনি সহসা একটা কাজে উঠিয়া গেলেন—আমি চলিয়া আসিলাম।

তার পর দিন ১৪ই মে। সমস্ত দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল।

সন্ধ্যা হইল। আকাশে চন্দ্র উঠিল—চন্দ্রের বিমল আলোকে চারিদিক সুধা ধবলিত হইল। আমরা সকলে বারাণ্ডায় বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছি মেম সাহেব স্বামীকে বলিলেন—"প্রিয়তম! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। ১৩ই মে ত কাটিল—যখন সন্ধ্যা হইয়াছে তখন আর কিসের ভয়? বাড়ীত আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়।" আমি ঘাড় নাড়িয়া মেম সাহেবের কথার সমর্থন করিলাম—কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী হিন্দু ভাবিলাম তোমার ভবিতব্যে যদি রক্তাপ্লুত শরীরে মৃত্যু লিখিয়া থাকে ত কেহই রাখিতে পারিবে না। সাহেব বলিলেন—"প্রিয়তমে হেলেনা,—এখনও আশ্বস্ত হইও না—যদি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরাপদে কাটে তবে বুঝিব এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। কত ১৪ই মে কাটিয়াছে কিন্তু আজকের মত মন কখনও এত কাতর হয় নাই।"

সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই ফটকের কাছে কুকুরটা ভয়ানক ডাকিয়া উঠিল, তাহার ডাক আর থামে না, সকলের চক্ষু সেই দিকে ফিরিল। কুকুরটা যেন

কাহাকে তাড়াইয়া কামড়াইতে যাইতেছে অথচ পারিতেছে না। কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। সাহেবের পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্র দ্বারের নিকট গেলেন, কুকুরটা খানিকক্ষণ থামিল।

তাঁহারা চলিয়া আসিলেন, আবার সেটা ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল। সাহেব নিজে দ্বারের নিকট গেলেন, কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন; যেন তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমার ভয় পাইল। এক মুহূর্ত্তে তিনি শবের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটনাটা দেখিয়া আমার মনে হরণ সাহেবের মৃত্যুকালীন কথাগুলি মনে হইল।

সাহেব বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বলিলেন, "তোমরা যে যার ঘরে যাও", তিনি নিজের শয্যায় গিয়া নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিলেন, রাত্র তখন সাড়ে এগারটা, আর আধ ঘণ্টা পরেই ১৪ই মে কাবার; সুতরাং আমরা কেহই সে স্থান ত্যাগ করিলাম না। আধ ঘণ্টা নিরাপদে কাটিলেই বালিকার কথা মিথ্যা হইবে ভাবিয়া আমি মনে মনে পুলকিত হইলাম, কিন্তু হায়! ভবিতব্যকে কে কোথায় ঠকাইয়াছে!!

আমরা পাশের ঘরে বসিয়া আছি, আমরা অর্থাৎ সাহেবের পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্র এবং আমি, এমন সময় সাহেব আবার বাহিরে ছাদের উপর আসিলেন, মেম সাহেব তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে বড় গরম সাহেব বারান্দায় বসিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন।

দুই প্রহর হইতে দশ মিনিট বাকী আছে এমন সময় সহসা আস্তাবলের দিক হইতে একটা ভয়ানক গোলমাল উঠিল, আমরা সকলেই ছাদের উপর আসিলাম, সেই গোলমালের মধ্যে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের উচ্চ শব্দ—ক্রন্দনের শব্দ ক্রমে কাছে আসিতে লাগিল, সহসা ফিরোজা রক্তাপ্লুত কলেবরে আসিয়া সাহেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বলিল, "খোদাবন্দ রক্ষা করুন, আমার স্বামী ছোরা লইয়া আমায় খুন করিতে আসিতেছে—ঐ দেখুন—ঐ!" ফিরোজা সাহেবের বাবুর্চ্চির স্ত্রী।

ফিরোজার কথা শেষ হইতে না হইতে দুর্ব্বৃত্ত বাবুর্চ্চি ছোরা হস্তে একেবারে আমাদের কাছে আসিল, ফিরোজা সরিয়া পলাইল—সাহেব অন্য চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, "এই হতভাগাকে আজ আস্তাবলে বন্ধ করিয়া রাখ, কাল সকালে পুলিসে দিব।" সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই দুরাত্মা উন্মত্ত ব্যাঘ্রবৎ সাহেবের উপর লাফাইয়া পড়িল, তাহার তীক্ষ্ণধার ছোরা সাহেবের বক্ষঃস্থল আমূল ভেদ করিল। সাহেব শীঘ্রই মাটিতে পড়িয়া রক্তমাখা হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। বালিকার ভবিষ্যৎবাণী প্রত্যেক অক্ষরে তৃতীয় বার প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইল। আমি ভাবিলাম অদৃষ্ট লিপি অখণ্ডনীয়; নতুবা আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন?

আমরা সাহেবকে ঘরে তুলিয়া আনিলাম। তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর রক্তে ভাসিতেছে, বিছানা শোণিতস্রাবে ঘোর লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছে; সকলের দৃষ্টি ঘড়ির দিকে। দুই মিনিট পরে দ্বিপ্রহর বাজিল ও সেই সঙ্গে সাহেবের

প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিল। হজরৎগঞ্জের মাঠে সেই বালিকার ভবিষ্যদ্বাণী এবং কাপ্তেন হরণের শোচনীয় মৃত্যু আমার চক্ষের সম্মুখে নাচিতে লাগিল।

তাহার পর ৩৪ বৎসর কাটিয়াছে, আমি এখন পলিতকেশ—অশীতিপর বৃদ্ধ। বাঙ্গলায় বসিয়া পুত্র পৌত্রাদি বেষ্টিত হইয়া পেন্সন ভোগ করিতেছি, কিন্তু ১৮৬৯ সালের ১৪ই মের শোচনীয় লোমহর্ষক ঘটনা আজও আমার চক্ষে স্পষ্ট চিত্রিত। আমি আজও চক্ষের সম্মুখে জেনারেল সাহেবের সেই রক্তাপ্লুত ভীষণ দেহ দেখিতেছি!!

তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর আর নাই কর, ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে মুগ্ধ হইয়া আমায় ঠাট্টাই কর, আর যাই কর, যাহা আমি আজও ভুলিতে পারিতেছি না—যাহা আজও আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত তাহাই তোমাদের বলিলাম।

শ্রীহঃ—

জাতীয় মহাসমিতি ও তাহার বিরোধী সম্প্রদায়।

গত ডিসেম্বর মাসে জাতীয় মহাসমিতির ৬ষ্ঠ অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে; মহাসমিতি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র এই অল্প কালের মধ্যে ইহার উপর দিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আক্রমণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, জগতের মহাকার্য্যসমূহ শত শত আক্রমণের পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়, বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম না করিলে কোন গুরুতর কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না, যে কার্য্য যত গুরুতর তাহার বাধা তত কঠোর, কিন্তু ন্যায়, সত্য ও কর্ত্তব্যের পথ হইতে সে সমস্ত বাধা দূর হইয়া যায়; বিবিধ আক্রমণ এ পর্য্যন্ত মহাসমিতির কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, সকলেই জানেন প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত সমিতির বল বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই মাতৃপূজার জন্য সমবেত ভারতসন্তানের আগ্রহ ক্রমে অধিকই লক্ষিত হইতেছে, এ আগ্রহের শিথিলতা কোন দিনই দেখা যায় নাই।

একটি মাত্র কারণে এ পর্য্যন্ত সমিতিকে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, সে কারণটী উপযুক্ত কয়েকজন ভারতবাসীর মহাসমিতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করা; মহাসমিতির জন্মাবধি এপর্য্যন্ত কয়েক জন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাকে রাজকার্য্যের জন্য সমিতির কার্য্য হইতে দূরে থাকিতে হইয়াছে; মান্যবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্যবর শ্রীযুক্ত ত্রিম্বক তেলাং, মান্যবর শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার,

ইহারা সকলেই জাতীয় মহাসমিতির প্রাণ স্বরূপ ছিলেন, এই সকল মহাত্মার অভাবে সমিতির যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ক্ষতিতে সমিতি গৌরবান্বিত। যাঁহারা এই জাতীয় মহাসমিতির শুভাকাঙ্ক্ষী নহেন, যাঁহারা মহাসমিতির প্রবল বিদ্বেষী তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন সমিতির পরিচালকদিগকে ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট কিরূপ উপযুক্ত লোক বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের হস্তে কিরূপ গুরুভার অর্পিত হইতেছে। তাঁহারা আরও বুঝিতে পারেন গবর্ণমেণ্ট সমিতির প্রতিকূল নহেন নতুবা গুরুতর বিচার কার্য্যে সমিতির পরিচালকদিগের মধ্য হইতে লোক মনোনীত হইবে কেন? এরূপ অবস্থায় যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের তীব্র সমালোচনা করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করেন তাঁহাদের কথা উত্থাপন না করাই ভাল।

বৃটিশ রাজকবি লর্ড টেনিসন তাঁহার কবিতার এক স্থানে বলিয়াছেন ("The old order changeth yielding place to new, and god fulfils himself in many ways")। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া এবং কাহারো কাহারো শোচনীয় মৃত্যুতে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আমরা কবি বাক্যের এই সত্য বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য সমিতি পাইতেছে না বটে, কিন্তু মাননীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়কে আমরা মহাসমিতির অন্যতম পরিচালক রূপে পাইয়াছি; মহামতি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ মহাসমিতির এক প্রধান গ্রন্থি ছিলেন, অকালে সে গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু আমরা ভরসা করি শত স্বদেশভক্ত সাধু তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবেন, মাতৃপূজায় সন্তানের অবহেলা লক্ষিত হইবে না।

মহাসমিতি এই ৬ বৎসরে যাহা করিয়াছে তাহা যে আশাপ্রদ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিরই এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চান না তাঁহাদের বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, কিন্তু যাঁহারা বুঝিতে চাহেন তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবেন যে মহাসমিতি দ্বারা অনেক কাজ ইতিমধ্যে সাধিত হইয়াছে। সমিতি চিরনিদ্রিত ভারতসন্তানের নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাহাদের হৃদয়ে নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয়বিধ বলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—এ দেশব্যাপী আন্দোলন, রাজনৈতিক উন্নতিলাভের জন্য এ আগ্রহ, জাতীয়-জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীর এ আকুল আকাঙ্ক্ষা, মহাসমিতি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ছিল কি? কন্‌গ্রেসের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পারসী, শিখ, হিন্দু, মুসলমান, সিন্দু, বেরার, বম্বে, নাগপুর, বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্নভাষী অধিবাসীগণ কি পরস্পরের সন্ধান লইতেন? কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সহিত কি জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমার অভাব কি? কেন তুমি এত কষ্ট পাইতেছ?

নিশ্চয়ই এ সকল ছিল না। কিন্তু আজ একজন বঙ্গবাসী এক জন মারহাট্টীর জন্য, এক জন মারহাট্টা এক জন শিখের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এ দৃশ্য ভারতে অনেক দিন দেখা যায় নাই। সুসভ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ন্যায় ও ধর্ম্মের শান্তিময় পতাকার নীচে সুখে বাস করিবে ইহাই সকলের ইচ্ছা, সম্মিলিত প্রজাশক্তি রাজশক্তির সহায়তা করিবে, গবর্ণমেণ্টের হস্তে কর্ত্তব্যপূর্ণ নিরপেক্ষ শাসন দণ্ড তুলিয়া দিবে ইহাই সকলের অভিলাষ, এ ইচ্ছাতে কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, কেহবা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কিন্তু এরূপ ইচ্ছা উপহসিত হইবার মত লঘু নহে, এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নহে; কন্‌গ্রেস ভারতীয় প্রজাসমিতির শক্তি। শত্রুরা ইহাকে নিন্দা করেন, ভীরুরা উপহাস করেন কিন্তু কন্‌গ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মিত্র, কন্‌গ্রেস গবর্ণমেণ্টকে যে পরামর্শ দান করিবে তদনুসারে কাজ করিলে ভারতে বৃটীসশাসন হিমাদ্রির ন্যায় অটল রহিবে, কোন প্রবল শত্রুর আক্রমণই তাহার ভিত্তি কম্পিত করিতে পারিবে না। ইংরাজের শিক্ষায় ভারতবাসীর হৃদয়ে যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, কন্‌গ্রেস তাহারই অঙ্কুর মাত্র, সেই শিক্ষার সংব্যবহার যাহাতে হয় কন্‌গ্রেসের তাহাই প্রধান লক্ষ্য, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের বিরাগ উৎপাদন করা কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্য নহে।

অনেকে বলিবেন কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বার্থ আছে, কন্‌গ্রেসের স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ নষ্ট করিতে হইবে, প্রজার স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে রাজার স্বার্থ হানি করিতে হইবে সুতরাং কন্‌গ্রেস যে গবর্ণমেণ্টের মিত্র ইহা কিসে প্রমাণ করা যায়?

এ কথার উত্তর দিতে হইলে বেশী দূর যাইতে হইবে না। সকল উচ্চ বা নিম্ন কার্য্যই, কি নিজের মঙ্গল, কি স্বদেশের উন্নতি ব্রত, কি সমাজের সংস্কার, কি একতা-বন্ধন, সকলের মধ্যেই স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে স্বার্থ দুই প্রকার; উচ্চ স্বার্থ ও নীচ স্বার্থ। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যদি পরের অনিষ্ট করা যায় তাহাই নীচ-স্বার্থ, নিন্দাকর, জঘন্য; কিন্তু সমগ্র জাতিগত, দেশগত, সমাজগত উন্নতির চেষ্টা তাহাও স্বার্থমূলক কিন্তু তাহা উচ্চ স্বার্থ। প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি লোকের স্বার্থ এক না হইলে, এবং সেই সাধারণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সকলের একাগ্রতা না জন্মিলে একতা লক্ষিত হয় না; কন্‌গ্রেসে আমাদের যে সেরূপ স্বার্থ আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কেবল তাহাই নহে; আমাদিগকে এইরূপ স্বার্থসাধনে এক সংকল্প করিয়াছে বলিয়াই কনগ্রেসের গৌরব। গভর্ণমেণ্টের ভ্রমের জন্য যদি আমরা অনর্থক অসুবিধা সহ্য করি, তবে সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য চেষ্টা, দেশের উন্নতির চেষ্টা ক্ষুদ্রতা বা নিন্দনীয় কার্য্য নহে। কিন্তু তবে আমরা যেন আমাদের স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশে সমিতির কার্য্য করিতেছি; কিন্তু কোন্ স্বার্থের আশায় মুগ্ধ হইয়া

মহাপ্রাণ হিউম ভারতীয় মহাসমিতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন? নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া স্বজাতীয়গণের উপহাসের পাত্র হইয়া ধর্ম্মের নিমিত্ত অসহায় বিপন্নের উদ্ধারের জন্য তিনি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন্ পার্থিব স্বার্থ থাকিতে পারে?

তবে বিরোধী সম্প্রদায় যদি বলেন আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু চাহিবারই বা আমাদের কি অধিকার আছে। আমরা বিজিত পরপদদলিত ঘৃণিত অপদস্থ। যে ঘৃণা ও উপেক্ষায় বেষ্টিত হইয়া আমরা বর্দ্ধিত হইতেছি সেই ঘৃণার প্রতিদান ভিন্ন নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করা ভিন্ন আমাদের আর কি অধিকার আছে।

এ কথা যাঁহারা বলিবেন—তাঁহারা শুদ্ধ জাতীয় মহাসমিতির বিরোধী নহেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও বিরোধী। তাঁহারা শুদ্ধ মনে করিয়া দিতে চাহেন গবর্ণমেণ্ট আমাদের শত্রু, গবর্ণমেণ্ট জেতা, আমরা বিজিত; গবর্ণমেণ্ট জুতা মারিবেন—আমরা পিট পাতিয়া দিব আর মনে মনে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বনাশ কামনা করিব। গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের যে একটা পবিত্র সম্বন্ধ আছে, গবর্ণমেণ্টের সহিত আমরা যে এক গুরুতর নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ তাহা তাঁহারা মনেও স্থান দিতে পারেন না, এমনি তাঁহাদের অবিশ্বাস! নতুবা আমরা চেষ্টা করিলেও গবর্ণমেণ্টের কাছে ন্যায্য অধিকার টুকু পাইব না—ইহা মনে করিয়া তাঁহারা বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহারাই গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের জেতা বিজিত ভাব, দা কুমড়া সম্বন্ধ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চান, ইহা অবিশ্বাস কি রাজভক্তি? এই নির্লজ্জ নিশ্চেষ্টতা কি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচায়ক? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার রাজভক্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। আমরা যদি শতবর্ষ পূর্ব্বের আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের কথা মনে করি, সে কালের সহিত একালের তুলনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? সেই চিরান্ধকারময়, অত্যাচারপূর্ণ, দেশব্যাপী বিদ্বেষ ও অহঙ্কারের আস্ফালনে আচ্ছাদিত, অন্তঃপ্রবাহিত কুরুচি, নীচতা এবং মূর্খতার লীলাক্ষেত্র—আর আজ এই উষালোকরঞ্জিত, জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর, শিক্ষা সুনীতিপূর্ণ উন্নতিশীলের সমাজ; কাহার দ্বারা দেশে এ অনুকূল পরিবর্ত্তন আনীত হইয়াছে? কে আমাদের সে দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিয়াছেন? প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ইঙ্গিতে এখনও আমাদিগকে কে বলিয়া দিতেছেন তোমরা উপযুক্ত হইতেছ, নিজের সম্মান, নিজের সত্ব রক্ষা কর? আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অশেষ চেষ্টাতেই আমরা এ উন্নতি লাভ করিয়াছি, ইংরাজ জাতিই আমাদের মৃতপ্রায় প্রাণের দ্বারে এ সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া আসিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে সমস্তই বৃটেনীয়ার মহাপ্রাণ সন্তানবর্গের প্রসাদে, ইহাতেও যদি আমরা বলি নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টি করিবার গবর্ণমেণ্টের অবসর নাই, কঠোর

শাসনে আমাদিগকে শাসিত করিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করা ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের অন্য উদ্দেশ্য নাই, অন্য কোন সম্বন্ধে আমরা গবর্ণমেণ্টের সহিত আবদ্ধ নই, তাহা হইলে আমরা শুদ্ধ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট অপরাধী নই, বিধাতার নিকটও আমরা অপরাধী।

আর গবর্ণমেণ্ট কি আমাদের কোন অধিকারই দেন নাই? বিজেতার আসন গ্রহণ করিয়া কি শুধু পীড়নই করিতেছেন? ম্যাজিষ্ট্রেটী, জজিয়তী, পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের উচ্চপদে, রেভিনিউ বোর্ডে, হাইকোর্টের উচ্চতম বিচারাসনে ব্যবস্থাপক সভায় কোথায় আমাদের প্রবেশাধিকার নাই? গবর্ণমেণ্ট ত স্পষ্টাক্ষরেই বলেন উপযুক্ত হইলে সকলেই—তাঁহাদের নিকট সমান অধিকার পাইবেন; তথাপি গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্দেহ করা, তথাপি আমাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিদ্রূপ কটাক্ষ নেত্রে মহাসমিতির দিকে দৃষ্টিপাত অতি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের কার্য্য সন্দেহ নাই।

যাঁহারা বলেন আমাদের স্বার্থ ও গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ঠিক বিপরীত, আমাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ নষ্ট হইবে তাঁহারা যে কেবল মাত্র ভ্রান্ত তাহা নহে, তাঁহারা অবিবেচক। এমন অনেক অধিকারই আছে যাহা প্রজার হাতে দিলে প্রজার মহা উপকার সাধিত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু মাত্র ক্ষতি নাই, এরূপস্থলে প্রজার স্বার্থ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের প্রতিবাদী নহে, উদাহরণ স্বরূপ আমরা অস্ত্র-আইন এবং ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির উল্লেখ করিতেছি, এ সমস্ত অধিকার দানে আমাদের যথেষ্ট উপকার, পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, যে সমস্ত কংগ্রেস বিদ্বেষী মনে করিবেন যে এই প্রকার অধিকার দানে ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি টলিয়া পড়িবে, তাঁহাদের সহিত কোন কথা কহা অনাবশ্যক।

তারপর ইন্‌কম্ ট্যাক্স, লবণ কর ইত্যাদি কিয়ৎ পরিমাণে উঠাইয়া দিলে গবর্ণমেণ্টের আয়ের কিছু ক্ষতি হয় একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ করিলে যে গবর্ণমেণ্টকে লালবাতি জ্বালাইয়া দেশে ফিরিতে হইবে এরূপ আমাদের বিশ্বাস নাই, লবণ করে ও ইন্‌কম্ ট্যাক্সে গরীব লোকের বাস্তবিকই কষ্ট হইতেছে। প্রজার কষ্টের জন্য রাজার এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত অতীব প্রয়োজনীয়, কংগ্রেস এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতেই গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণে চেষ্টা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টকে যে দিন আমরা পরিষ্কার বুঝাইতে পারিব যে এ সমস্ত বিষয়ে আর উদাসীন থাকা উচিত নহে সে দিন আমাদের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি; এরূপ মনে করাও অলীক স্বপ্ন দেখা নহে; গবর্ণমেণ্ট কি প্রজার প্রতি কখন সহানুভূতি প্রকাশ করেন না—গবর্ণমেণ্ট কি প্রজার প্রতি স্নেহবান নহেন, কখন কি প্রজাসমিতিকে কোন গুরুতর অসুবিধা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করেন নাই? দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী ইত্যাদি বিপদে গবর্ণমেণ্ট কি কখনো দুঃখপীড়িত প্রজার উপকারের জন্য মনোযোগী হন নাই? এরূপ অবস্থায়

আয়ের সামান্য ক্ষতি হইলেও প্রজা সমষ্টির সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ইন্‌কম ট্যাক্স, লবণ কর ইত্যাদির আধিক্য কমাইতে গবর্ণমেণ্টের যে কখনই প্রবৃত্তি হইবে না—এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত, বরং আমাদিগকেই চেষ্টা করিয়া সে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন করিতে হইবে। বৃথা আশা, বিদেশী ও বিধর্ম্মী গবর্ণমেণ্ট মুখ তুলিয়াও চাহিবে না বলিয়া বিজ্ঞতা প্রকাশ করা ও পরোক্ষে গবর্ণমেণ্টকে গালাগালী দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

শত্রুপক্ষ বলিয়া থাকেন, "তোমরা ত প্রতিবৎসরই আন্দোলন কর, আন্দোলনে কিছু কি ফল পাও, কেন বৃথা আন্দোলনে সময় ও অর্থের অপব্যবহার কর?" ইহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলি যে আন্দোলনে কোন ফল পাইতেছি না বলিয়াই যে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরে বসিয়া খুব করিয়া গুড়ুক টানিব ও পরের কুৎসা করিব এমন কোন কথা হইতে পারে না। দু পাঁচ বৎসরের সাধনায় যদি সিদ্ধি লাভ হইত তবে জগতে কোন কর্ম্মই অসম্পন্ন রহিত না, অনেক কাল পূর্ব্বেই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত, এবং এতদিন আমরা কল্পবৃক্ষের চাস আরম্ভ করিয়া দিতাম, কিন্তু একটা গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করা প্রকৃতই অনেক সময় এবং চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে পেট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদিগের অন্তর্বিবাদের ইতিহাসে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি রাজনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ দুই পাঁচ বছরের চেষ্টায় হয় না; দুইশত বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা রোমীয় প্লেবিয়ানগণ পেট্রিসিয়ানদিগের নিকট হইতে এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। প্লেবিয়ানগণ সময়ে সময়ে একত্র হইয়া তাঁহাদের সমিতিতে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহারই পর্য্যালোচনা করিতেন, সেই সকল প্রস্তাব বহুদিন ধরিয়াই পেট্রিসিয়ানদিগের দ্বারা অগ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু অবশেষে দীর্ঘকাল পরে প্লেবিয়ানদিগের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইয়াছিল, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইয়াছিল। চেষ্টা যত্ন করিলে আমাদের আশাও একদিন পূর্ণ হইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু চেষ্টা হীন হইয়া বসিয়া বসিয়া শুদ্ধ গালাগালী করিলে এই আশাপূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মহাসমিতির বিরুদ্ধবাদীদের আর একটা আপত্তি আছে। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন লইয়া তাঁহারা বলেন "তোমরা সাত শত লোক সাত কোটী লোকের প্রতিনিধি তাহার প্রমাণ কি? তোমরা কি এই সাত কোটী লোকের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছ, যদি না হইয়া থাক ত সাত কোটীর বক্তব্য তোমরা কোন মুখে বল? অতএব কংগ্রেস সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি নহে, কয়েকজন উদ্ধত, বিলাতী যুবকের বিকৃত মস্তিষ্কের ফল মাত্র।" এ সহজ আপত্তির মীমাংসা যে তাঁহারা করিয়া লইতে পারেন না—তাহা আমাদের বোধ হয় না; তাঁহারা একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবেন, তাঁহাদের আপত্তির কিছু মাত্র মূল্য নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি ২৫ কোটী ভারতবাসী সকলেই কি নিজে নিজে মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইবে? ইহা কি

সম্ভবপর? এই পঁচিশ কোটীর মধ্যে স্ত্রীলোক আছে, বালক আছে, বৃদ্ধ আছে, অন্ধ আছে, খঞ্জ আছে, পীড়িত আছে, দীন দরিদ্র মূর্খ সকলই আছে, এতদ্ভিন্ন আরো কত শত কারণে প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে যোগ দেওয়া অসম্ভব, শুদ্ধ ভারতবর্ষ নহে, সভ্যতর দেশেও ইহা অসম্ভব। তাহার পর প্রত্যেকেই যে একজন পৃথক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবে—তাহাও হইতে পারে না, প্রতিনিধি যিনি হইবেন, তাঁহার শিক্ষিত হওয়া, দায়িত্ব বোধ, কর্ত্তব্য জ্ঞান, অর্থ এ সমস্তই তাঁহার থাকা প্রয়োজন। ভারতবাসীর অধিকাংশই অশিক্ষিত, সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক লোকই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন; মনে করুন এক সবডিবিজানে ৫ হাজার লোকের বাস, কিন্তু সেখানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার মত লোক পাঁচজনের বেশী নাই, এরূপ অবস্থায় সেই পাঁচ জন মাত্রই নির্ব্বাচিত হইবেন। তাহার পর সেই পাঁচ হাজারের প্রত্যেকে ভোট দিয়া যে ঐ পাঁচজনকে নির্ব্বাচিত করিবে ইহারো কোন অর্থ নাই, এবং এরূপ কাজ একরকম অসম্ভব; সুতরাং সেই পাঁচ হাজারের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান, একটু শিক্ষিত এবং সাধারণের আন্দোলন বুঝিতে পারে তাহারই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহাদের মতামতই সাধারণের মত বলিয়া গৃহীত হয়। জাতীয় মহাসমিতিতে এইরূপই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, আর এই নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ মিউনিসিপাল কমিসনর, কেহ অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ লোকাল বোর্ডের মেম্বর, কেহ স্কুলের শিক্ষক, কেহ উকীল, কেহ ডাক্তার, কেহ মোক্তার, সকলেই কোন না কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকেন, যদি তোমরা মহাসমিতির দু পাঁচজন বিরোধী ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূকুটী করিয়া বল যে তাঁহারা প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত নহেন তাহা হইলে আমরা বিনয় নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিব এরূপ অবস্থায় কাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবার উপযুক্ত? বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, গৌরব, পদ প্রভৃতিতে যাঁহারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা যদি জন সাধারণের প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত না হন, তবে কাহারা উপযুক্ত হইবেন তাহা বুঝিতে পারি না, আপত্তিকারীগণ বোধ হয় ইঁহাদের অপেক্ষা উপযুক্ত লোকের নাম করিয়া সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।

বিরুদ্ধবাদীদের আর এক চমৎকার যুক্তি আছে, তাঁহারা চীৎকার করিয়া বলেন, জনকতক স্বার্থপর লোকের স্বার্থ লইয়া কন্‌গ্রেস; ভারতীয় সমগ্র প্রজাসমষ্টির ইহাতে কিছু স্বার্থ নাই, অথচ অসংখ্য প্রজাসমষ্টির নাম করিয়া কন্‌গ্রেসের কাজ চলিতেছে।

ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জ, হৃদয়হীন অপবাদ আর থাকিতে পারে না। আমরা বিরুদ্ধ বাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করি—কন্‌গ্রেসের আলোচ্য বিষয়গুলি তাঁহারা কি একবার চোখ খুলিয়া দেখিয়া থাকেন? ইন্‌কম ট্যাক্স গরীব লোকের মধ্যে হইতে উঠিয়া যাওয়া উচিত বলিয়া যখন কন্‌গ্রেসে প্রস্তাব করা হয়, তখন প্রতিনিধিগণ কি নিজ নিজ কথাই ভাবেন? যাহাদের তাঁহারা প্রতিনিধি সেই গরীবদের কথা কি তখন তাঁহাদের মনে আসে না?

কন্‌গ্রেসে যাহারা প্রতিনিধি হইয়া আসেন তাঁহারা প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন লোক; অন্তত তাঁহাদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্পই থাকে যাঁহারা ১০।১৫ টাকা ইন্‌কম ট্যাক্স দিতে কোন কষ্ট বোধ করেন, বিশেষ ইন্‌কম ট্যাক্সের কিছু অংশ যদি উঠিয়াই যায় তবে গরীবের উপর হইতেই আগে উঠিবে ধনীর উপর হইতে নহে। এরূপ অবস্থায় কোন্ বিবেচনায় বলিতে পারা যায় যে প্রতিনিধিগণ নিজের স্বার্থের জন্যই কন্‌গ্রেস করিতেছেন সাধারণের জন্য নহে। গরীব, দুঃখী নিরন্নের প্রতি যে কন্‌গ্রেসের দৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে আছে তাহার আরো প্রমাণ দেওয়া যায়; যদি লবণকরের বিষয় বিবেচনা করি তবে আমরা কি দেখিতে পাই? কন্‌গ্রেসের প্রতিনিধিগণের মধ্যে এমন লোক কেহই নাই যাঁহাদের লবণ কিনিয়া খাইতে কষ্ট হয়, প্রতিবাদকারীগণ কি বলিবেন পাঁচজন প্রতিনিধি নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য লবণের শুল্ক কমাইতে চেষ্টা করিতেছেন? লবণ-শুল্ক কমিলে কাহার সুবিধা, ভারতের দীন হীন নিরন্ন সন্তানের বেশী সুবিধা, না কন্‌গ্রেসের এই সমস্ত প্রতিনিধির বেশী সুবিধা? তাহার পর অস্ত্র আইনের কথা ধরুন, বৎসর বৎসর অরণ্য পশুর আক্রমণ হইতে কত পল্লীবাসীকে অকাল-মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়, তাহার কিছু কি ঠিক আছে? কত দরিদ্র কৃষকের কৃষিকার্য্যের অবলম্বন গো মহিষাদি গৃহপালিত পশু নিহত হইয়া তাহাদিগকে নিরবলম্ব করিয়া তুলে তাহার সংখ্যা আছে কি? কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সামান্য একখানি অস্ত্র মাত্রও ব্যবহার করিতে পায় না। এই সমস্ত অসুবিধা ও বিপদ দূর করিতেই কন্‌গ্রেস গবর্ণমেণ্টের নিকট অস্ত্র আইনের উচ্ছেদ কামনা করিয়া থাকেন, অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে। যাঁহারা জাতীয় মহাসমিতিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বন্দুক বা অন্য কোন অস্ত্রের পাশ লইয়া নির্ব্বিবাদে সেই সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন, কন্‌গ্রেসে এজন্য, এত আন্দোলন, আলোচনা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। পল্লীগ্রামে শ্রমজীবীগণ দিনান্তে দুই আনা বা দশ পয়সা উপায় করে, অনেকেই উপায়ের অর্দ্ধেক দিয়া মদ খায়, বাকি অর্দ্ধেক পরিবার প্রতিপালনে ব্যয় করে। ইহাতে ফল এই হয় যে তাহারা নিজে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আর একদিকে তাহাদের পরিবারগণ অনাহারে মরে; যাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে ও সস্তায় মদ না পায় তজ্জন্য কন্‌গ্রেস চেষ্টা করিতেছেন, এসমস্ত কি অন্যায় চেষ্টা? এসমস্ত কি পল্লীবাসী প্রজাসমূহের উপকারের জন্য নহে? এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা বলেন কন্‌গ্রেস জনকয়েক স্বার্থপর লোকের খেয়াল মাত্র, তাঁহাদিগকে আমরা হীনচেতা, নিন্দুক ভিন্ন আর কোন নামে অভিহিত করিতে পারি না।

আমরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোককে জাতীয় মহাসমিতির বিরোধী দেখিতে পাই; তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় ক তকগুলি হীনচেতা, ক্ষুদ্রহৃদয় ইউরোপীয় ও ইউরেসিয় দ্বারা পূর্ণ। তাঁহারা ভাবেন (অনেক সময় বলেনও) পশুবলে ভারত বিজিত হইয়াছে, পশুবলেই

রক্ষিত হইবে; দয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়পরতা, পরোপকার এ সমস্ত মনুষ্য-স্বাভাবিক গুণের তাঁহারা কোন ধার ধারেন না; এই সমস্ত লোক বৃটিশ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ। যে ভারতের শ্যামল ছায়ায় ইহারা প্রতিপালিত, যে ভারতের বক্ষে বসিয়া ইহারা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া আজন্ম অতিবাহিত করেন, সেই মাতৃস্বরূপিনী ভারতের জন্য ইহাদের বিন্দুমাত্রও ভক্তি শ্রদ্ধা নাই, এই সমস্ত কৃতঘ্ন ব্যক্তি মনুষ্য নামের অযোগ্য। শুধু স্বার্থপরতা হীনতা এবং ক্রূরতায় ইহাদের ক্ষুদ্রহৃদয় পূর্ণ, গবর্ণমেণ্ট যদি এই সমস্ত অদূরদর্শী হীনচেতার কথায় কর্ণপাত করিয়া তাহাদের পরামর্শমত কাজ করিতেন তাহা হইলে আজ আমাদের এতদূর দুর্দ্দশা হইত যে আমরা অশ্রু মুছিবারও সময় পাইতাম না, অন্য আন্দোলন ত দূরের কথা। বৃটনের সভ্য, ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারী, ধার্ম্মিক সন্তানগণ এই সমস্ত মানবগণকে কতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন জানি না, কিন্তু আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি এই সমস্ত উষ্ণমস্তিষ্ক শ্বেতপুরুষ স্বার্থান্ধ হইয়া মহাসমিতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলেন তাহা প্রলাপপূর্ণ ও প্রতিবাদের সম্পূর্ণ অযোগ্য, সে সমস্ত প্রতিবাদ গালাগালীর নামান্তর মাত্র।

এতদ্ভিন্ন ভারতবাসীর মধ্যেও অনেক আছেন, যাঁহারা কন্‌গ্রেসের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী; ইহাদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য, ধার্ম্মিক, পরোপকারী সাধুপ্রকৃতির লোকও আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইঁহারা কেন যে ভ্রান্ত হইয়া মহাসমিতির প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করেন এবং কেহ কেহ বা বিপক্ষতাচরণ করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; আমরা আশা করি ভগবান তাঁহাদের সুমতি দিবেন, তাঁহারা উৎসাহের সহিত এই জাতীয় মহোৎসবে সম্মিলিত হইবেন।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা অতি ভয়ানক প্রকৃতির; আত্মস্বার্থের পদতলে তাঁহারা জাতীয়স্বার্থ বলি দিতে অসংকুচিত চিত্ত, তাঁহারা যদি প্রকৃতই কন্‌গ্রেসের উপকার বুঝিতে না পারিতেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগকে আমরা কৃপার পাত্র মনে করিতাম, কিন্তু তাঁহারা কন্‌গ্রেসের অসীম উপকার বুঝিতে পারিয়াও নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য অথবা নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কন্‌গ্রেসের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণের নির্ব্বাচিত সহস্র সহস্র প্রতিনিধির প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা নিজেই পঁচিশ কোটী ভারতবাসীর প্রতিনিধি সাজিয়া বসেন, যেন তাঁহাদের অপেক্ষা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক ও সৎলোক এ ভারতে আর কেহ নাই তাঁহারা ভিন্ন আর কেহই যেন গরীবের দুঃখ বুঝিতে সক্ষম নহেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে মাঝে মাঝে তাঁহারা কন্‌গ্রেসের ডেলিগেটদিগকে যে অভদ্র ও অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া থাকেন ও তৎসম্বন্ধে নীচ রসিকতা প্রকাশ করেন, তাহাতে ভারতের সমগ্র প্রতিনিধিমণ্ডলী স্বকার্য্য হইতে বিরত হইবে; এই সমস্ত লোকের যে যুক্তি ও তর্ক তাহা শুধু বিরক্তিকর নহে হাস্যজনকও, আমার মনে পড়ে এই শ্রেণীর কয়েকজন লোক কিছু দিন পূর্ব্বে

অতি গম্ভীর ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য, হিন্দুর জাতি-মারা, ইহা অপেক্ষা হাস্যকর, বিরক্তিজনক, বাতুলতা কি থাকিতে পারে? আমরা এই শ্রেণীর লোকের কথাও উল্লেখ করিতাম না যদি তাহারা নির্দ্দোষী, সরল, অনভিজ্ঞ লোক-দিগকে মহাসমিতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা না করিত, সাধারণে তাহাদের কথা শুনিয়া ভ্রান্ত না হয় এই জন্যই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আমাদের দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে।

মহামতি হিউম এ বৃদ্ধ বয়সে যে ব্রতের উদ্যাপন করিতে প্রাণপাত করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের অগ্রণী পণ্ডিতবর মহাত্মা অযোধ্যানাথ যে ব্রত গ্রহণ করিয়া খাটিতে খাটিতে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, ধীশক্তিসম্পন্ন, বিচক্ষণ রমেশচন্দ্র মিত্র এই ভগ্নদেহেও যে মহাকার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিতে বদ্ধপরিকর, উদারচেতা, দেশহিতৈষী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ঘোষাল এবং বোম্বে, মান্দ্রাজ, উত্তর পশ্চিম সুদূর পঞ্জাব ও কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের সমগ্র জাতি অহঙ্কার ভুলিয়া, অভিমান ভুলিয়া, যে মহোদ্দেশ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে যাহারা হিন্দুধর্ম্ম নাশের চেষ্টা দেখিতে পায়, তাহারা কোন শ্রেণীর জীব তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আর ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারও কোন কারণ নাই। তাহারা এই জাতীয় জীবনের মহোৎসবের মধ্যেও নিজ নিজ হৃদয়ের অনুরূপ নীচতার ছবি মনশ্চক্ষে দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠে, জানি না তাহাদের এই বিভীষিকা দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না।

হিন্দুর জাতি কি এতই ভঙ্গপ্রবণ যে এই মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে অগ্রসর হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে? হিন্দুর জাতি কি এতই সংকীর্ণ যে তাহা কয়েকজন স্বার্থপর উদ্দেশ্যবিহীন লোকের প্রাচীর-বদ্ধ সীমা ভেদ করিলেই শূন্যে মিলাইয়া যাইবে? জাতীয় মহাসমিতিতে কি প্রকৃত হিন্দু কেহ নাই? তাঁহারা জানেন না তাঁহাদের ধর্ম্ম কিসে রক্ষিত হইবে আর তাহাদের ধর্ম্মনাশ চিন্তায় ভয়ানক আকুল হইয়া পাঁচজন ক্রমাগত তাঁহাদিগকে সাবধান করিতেছে ইহা হইতে হাস্যজনক আর কি হইতে পারে?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কুজ্ঝটিকা।

শীতকাল কোয়াসার দিন। প্রাতঃকালে যাহাদের ভ্রমণ অভ্যাস, তাঁহাদের পক্ষে কুয়াসার জলে মস্তকের কেশ, শ্মশ্রু, গুম্ফ আর্দ্র করা, বড় প্রীতিকর বোধ হয় না। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মহাসাগরবক্ষে পোতসঞ্চালন কত যে বিঘ্ন-সঙ্কুল তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। স্থলের উপর বাষ্পীয় শকট পরি-চালকেরাও পূর্ণ বেগে শকট চালনা করিতে পারেন না; নিতান্ত শঙ্কিতমনে ও সতর্কিতভাবে ধীরে ধীরে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে অথবা উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া গাড়ী চালাইতে হয়। আমাদের সহরের বাষ্পীয় ট্রাম-চালকেরা সিঙ্গল লাইনের উপর দিয়া কুয়াসার সময় গাড়ী চালাইতে কত কষ্ট পায়, যাঁহারা কখন এরূপ বিপদের সময় ট্রামে আরোহী হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। ইহা ব্যতীত কৃষি ও উদ্যানব্যবসায়ীরা জানেন নবাঙ্কুরিত তরুলতা ও উদ্ভিদের পক্ষে কুয়াসা কত অপকারী। আমাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা কম অপকারী নহে। তাই যদি কুয়াসা সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা একটু আলোচনা করি, বোধ হয় আমাদের পাঠকদিগের অপ্রীতিকর হইবে না।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরেই কুয়াসার অধিক উপদ্রব। সহরে লোকসংখ্যা অনেক। নানা প্রকারের জান্তব ও ঔদ্ভিদিক ধ্বংস ও ক্ষয় বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ক্রমাগতই বায়ু-রাশিতে মিলিত হইতেছে। প্রস্তর ও কঙ্কর নির্ম্মিত পথে অগণিত জন প্রবাহে ও শকট সঞ্চালনে নিয়তই রাশি রাশি ধূলিকণা গগণপথে উড্ডীন হইতেছে। রন্ধন ও বাষ্পযন্ত্র পরিচালন জন্য কল কারখানা হইতে রাশি রাশি কয়লা ও কাষ্ঠ জ্বলিয়া প্রভূত ধূম ও তৎসহযোগে অঙ্গারকণা শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। সুতরাং সহরে কুয়াসা ঘন হইবার সুবিধা অনেক। পল্লীগ্রামে জনতা নাই, ধূঁয়া ও ধূলাও কম, অশ্ব, শকট, গো, মেষ প্রভৃতির তত অধিক যাতায়াত নাই, কাজেই তথায় কুয়াসা অনেক পাতলা। আমাদের ভারতবর্ষের কোন সহরেই তেমন কুয়াসা হয় না, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় না, যেমন ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরে হইয়া থাকে। লণ্ডনে কুজ্ঝটিকার এতই প্রাদুর্ভাব যে, বৈদ্যুতিক আলোকের আবি-ষ্কারের পর হইতে, অনেক সময়ে, কি দিবাভাগে, কি নিশাকালে, পথে পথে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিয়া কতক পরিমাণে অন্ধকার দূর করিয়া নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। কখন কখন ৬।৭ দিন দিবা রাত্রি অবিচ্ছিন্নভাবে কুজ্ঝটিকা দ্বারা সমস্ত সহর আঁধারময় হইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে "সূচীভেদ্য অন্ধকার"; লণ্ডনের কুয়াসা কুঠার-ভেদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিকই তাহা এত ঘন ও পর্ব্বতের

মত অচল যে অস্ত্রদ্বারা বিখণ্ড করিলেও যেন করা যায়! লণ্ডনের বিপুল জনতা, কয়লা পোড়ান ধূঁয়া, এবং লোকজন ও গাড়ী ঘোড়ার অহরহঃ গমনাগমন জন্য ধূলি উৎক্ষেপণই ঈদৃশ কুয়াসার প্রধানতম কারণ। বর্ত্তমান সময়ে অনেক বিচক্ষণ প্রাকৃতিক পণ্ডিত লণ্ডনের কুয়াসা ও ধূমের দুরূহ সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য মাথা ঘামাইতেছেন।

লণ্ডনের কথা যাক্। আমরা এক্ষণে কুয়াসার গঠন ও উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করি। কুজ্ঝটিকা যে জলের এক প্রকার-ভেদ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বৃষ্টি, শিশির, হিমানী, তুষার, করকা ইত্যাদি যেমন কোন বিশেষ অবস্থায় জলের রূপান্তর মাত্র, কুজ্ঝটিকাও তদ্রূপ। বিশেষ অবস্থায় পড়িয়াই জলীয় অণু সকল ভূপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। অনেক দিন হইতেই জানা ছিল যে শূন্যের বায়ুরাশি যখন জলীয় অণু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তখনই জলীয় অংশ বা জল পৃথক্ হইবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁপা ঠুলির মত আকার ধারণ করিয়া পৃথক্ হয় এবং ইহাই কুয়াসা। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে জলীয় অণু পৃথক্ হইবার এবং তাহার ফল স্বরূপ কুয়াসা গঠিত হইবার প্রধান কারণ বায়ুর সহিত ধূলিকণার বর্ত্তমানতা। তিনি বলেন যে বায়বীয় হইতে তরল কিম্বা তরল হইতে কঠিন পদার্থের অবস্থায় পরিণত হইবার সময় মৌলিকাণুগুলির একটু (Free Surface) বা মুক্ত আশ্রয় পাওয়া আবশ্যক যতক্ষণ একটি জলীয় মৌলিকাণু তার নিজের মত অণুকণা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, এবং ইহারা আবার জলীয় বাষ্প দ্বারা বেষ্টিত থাকে, ততক্ষণ উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু যদি তাদৃশ মৌলিকাণু বহির্দ্দেশে কোন কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। বায়ুরাশির সহিত সংমিশ্রিত অসংখ্য অসংখ্য ধূলিকণা জলীয় বাষ্পকণাকে এইরূপ মুক্ত আশ্রয় প্রদান করিয়া তাহাদিগের ঘনীভূত হইবার পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। ধূলিকণার প্রাচুর্য্য ও আকার এবং ইহাদিগের উপাদানের ক্রমানুসারে বাষ্পীয় কণা রাশির জমাট বাঁধিয়া কুজ্ঝটিকারূপে পরিগঠিত হইবার অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

শূন্যে গন্ধক কিম্বা লবণ পোড়াইলে প্রচুর কুয়াসা জন্মে। অনেক পদার্থ, যাহাদের জল শোষণ করিবার বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকিলে, যে আকাশে জলীয় অণু যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না, তাহা হইতেও নিজেদের জল-শোষক ধর্ম্ম-বলে জলীয় অণুগুলি একত্র টানিয়া লয় এবং পরে আপনাদের সাহায্যে অর্থাৎ মুক্ত আশ্রয় স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে কুয়াসারূপে পরিণত করে। অনেক পদার্থ যাহারা আদবেই জল-শোষণ করিতে পারে না, তাহারা আপনাদের তাপ নিঃসরণ ধর্ম্মের আধিক্য হেতু, শীঘ্র শীতল হইয়া অতি সহজেই প্রচুর কুয়াসা সৃষ্টি করিতে পারে। সহরের নানাবিধ দাহন কার্য্য কুয়াসা গঠনের প্রধান

সহায়। দাহ্য পদার্থ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া নিঃশেষ হইলেও কেবল দাহন ক্রিয়াও কুয়াসা সৃজনের এক প্রধানতম হেতু হইয়া থাকে।

কত ক্ষুদ্রতম রেণু দ্বারা কুয়াসা সৃজিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন বিজ্ঞানবিদ্ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন এক গ্রেণের শতাংশ পরিমাণ লৌহ খণ্ড যতবার উত্তপ্ত করা হইয়াছে, ততবারই এত প্রচুর রেণু উত্থিত হইয়াছে যে, তাহাতে কুয়াসা পরিগঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। তিনি আরো সূক্ষ্মতম যন্ত্র সাহায্যে দেখাইতে পারিয়াছিলেন যে এক গ্রেণের লক্ষাংশ পরিমাণ লৌহ কিম্বা তাম্র খণ্ডকেও যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে এত ধূলি রেণু উৎক্ষিপ্ত হয়, যৎসাহায্যে কুয়াসার ন্যায় পদার্থ পরিদৃষ্ট হইতে পারে এবং ইহাও দেখাইয়াছিলেন যদি এমন কোন কিছু দ্বারা (যেমন তুলা) ঈদৃশ সামান্য ও সূক্ষ্ম রেণুকণা বায়ু হইতে বিমুক্ত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কুয়াসা দেখা যায় না।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা যে কুয়াসা গঠনের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর, বাস্তবিকই বায়ুর সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু মিশ্রিত থাকে বলিয়াই আমরা অনেক ভাবে উপকার পাই। মনে কর যদি বায়ুরাশি হইতে কোনরূপে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু পর্য্যন্ত সরাইয়া লওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে কখনই কুজ্ঝটিকা সৃজিত হইতে পারিত না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইত যে, যখন এইরূপ রেণু-বিমুক্ত আকাশে বায়ু মণ্ডল জলীয় অণুদ্বারা পূর্ণ মাত্রাপেক্ষাও বোঝাই হইত তখন পৃথিবীর যে কোন পদার্থ সেই জলীয় কণা রাশিকে ঘনসম্বদ্ধ করিবার জন্য সহায়তা করিত। তৃণ, গাছ, পাতা, গৃহ, বাতায়ন, বস্ত্র, পুস্তক, টেবিল, চেয়ার, প্রভৃতি সমস্তই বহমান বায়ু সহকারে চালিত জলীয় কণাদ্বারা আর্দ্র হইয়া যাইত। বাহিরের ও গৃহাভ্যন্তরের সকল পদার্থই ভিজিয়া যাইত। এই জন্য আমরা বায়ুরাশির মধ্যে বিদ্যমান ধূলিকণার কাছে কৃতজ্ঞ রহিয়াছি বলিতে হইবে। তাহারা আপনাদের সাহায্যে জলীয় কণাকে সম্বদ্ধ করিয়া শূন্য গর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় বেলুনে পরিণত করিয়া কুয়াসা পরিগঠন করে। সেই জন্য আমরাও ভয়ানক আপদ বালাই হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গিয়াছি।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা আমাদের দৃষ্টি-যন্ত্রের অগোচর। কিন্তু ইহারা যখন জলীয় অনুকণাদ্বারা বেষ্টিত হয়, তখনই অল্প অল্প কুয়াসা বা ধোঁয়ার মত দেখায়। আর যদি ধূলিকণা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেই কুয়াসা ঘন দেখায় যদি ধূলিকণার সংখ্যা অল্প হয় এবং জলীয় বাষ্পও অল্প হয়, তাহা হইলে, প্রত্যেক রেণুকে অধিকতর পরিমাণে সম্বদ্ধ-বাষ্পকণা বহন করিতে হয়। তখনকার কুয়াসা লম্বা লম্বা ও বড় বড় ঠুলি বিশিষ্ট হয়। আর এক রকম কুয়াসা জন্মে যাহাকে "আর্দ্র কুয়াসা" বলে। এইরূপ কুয়াসায় সমস্ত জলীয় অংশ অথবা ইহার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত অসং-

লগ্ন ভাবে কেন্দ্রগত পদার্থের সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহার মধ্য দিয়া গমন করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া যায়। আর্দ্র কুয়াসার বিপরীত আর এক প্রকার কুয়াসাকে শুষ্ক কুয়াসা বলে। শুষ্ক কুয়াসার জলীয় কণা কেন্দ্রগত পদার্থের সহিত বিশিষ্টরূপে সংযুক্ত হয়। সহসা বিমুক্ত হইয়া পড়ে না। সুতরাং শুষ্ক কুয়াসার ভিতর দিয়া অনেক দূর ভ্রমণ করিলেও কেশ পরিচ্ছদ তেমন আর্দ্র হয় না।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে লণ্ডন সহরে একপ্রকার কুয়াসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ কুয়াসা ভূ-সংলগ্ন না হইয়া আলোক স্তম্ভ অপেক্ষাও উচ্চে অবস্থান করে। এই নিমিত্ত ইহাকে "উচ্চ কুয়াসা" নামে আখ্যাত করা হয়। আমাদের এখানেও যদি কেহ কোন শীত-রজনীতে ময়দানের মধ্য দিয়া গমন করেন, হয়ত তিনি দেখিতে পাইবেন, কোন কোন স্থানে গ্যাস-পোষ্টের মাথার উপর কুয়াসার স্তর জমিয়া রহিয়াছে। উহার ভিতর দিয়া আকাশের একটি নক্ষত্রও দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু নিম্নে বেশ পরিষ্কার; কুয়াসার লেশ মাত্র নাই। তবে আমাদের এ কুয়াসা সূর্য্যোদয় হইলে অপসৃত হইয়া যায়, কিন্তু লণ্ডনের উচ্চ কুয়াসা সূর্য্য-কিরণের সম্মুখেও তিরোহিত হয় না। আর এত ঘন ভাবে জমাট বাঁধিয়া থাকে যে সূর্য্য-কিরণের একটি রেখাও কুয়াসার স্তর ভেদ করিয়া নিম্নে আসিতে পারে না। কাজে কাজেই নিশার আঁধার দূর করিবার জন্য সমস্ত রাত্রি যেমন পথে পথে আলোক জ্বলে, দিবসেও সেইরূপ কৃত্রিম আলোক পথ ঘাট আলোকিত করে। ঈদৃশ বিশ্রী কুয়াসার কারণ আজও নির্ণীত হয় নাই।

কুয়াসা গঠনে রেণু বা ধূলিকণা প্রধান সহায় বলিয়া কুয়াসা দ্বারা বায়ুরাশি মধ্যে কি পরিমাণে অন্যান্য পদার্থ সূক্ষ্ম রেণুরূপে মিশিয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বায়ুর পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা বুঝিবার ইহা একটি অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। বলিতে গেলে কুয়াসা আকাশের আবর্জ্জনা পরিষ্কারক।

প্রবল বৃষ্টি ধারাও বায়ুরাশির সমুদয় ধূলা ও ময়লা প্রধৌত করিতে পারে না। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণুর উপর বৃষ্টিধারার কোন ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু রেণু যত সূক্ষ্ম হউক না কেন, তাহা জলীয় অনুকণা সম্বদ্ধ করিবার সহায়তা করিতে পারে। সুতরাং পৃষ্ঠে ও চতুর্দ্দিকে যখন বাষ্পকণা আশ্রয় লয়, তখন তাহাদের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া তাহাকে নিম্নে অবতরণ করিতেই হয়। এইরূপে জান্তব বা ঔদ্ভিদিক ধ্বংস ও ক্ষয়জাত যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বায়ুরাশির সহিত মিশ্রিত থাকে, যত প্রকারের ধূলা বা অন্যান্য স্থূল অণু আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুকে দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর করে, সকলেই কুয়াসার সময় বাষ্পাণুভারে পৃথ্বীতলে পতিত হয় এবং সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করিয়া দেয়।

কুয়াসা যতই কেন ঘন হউক না, ইহার কিয়দংশ ধরিয়া লইয়া, তাহাকে আরো ঘনসম্বদ্ধ করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উহার উপাদান নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তবে অন্য উপায় অবলম্বনে কুয়াসার মধ্যস্থ অন্যান্য পদার্থ ঠিক করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জল দ্বারা ক্ষাণিকটা কুয়াসা ধুইয়া লইয়া তাহা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান নির্ণয় করা যাইতে পারে। কিম্বা কুয়াসা বিলীন হইবার পর তৃণ, পুষ্প পত্রের উপর যে সব পদার্থ রাখিয়া যায়, তাহা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়াও মিশ্রিত পদার্থ সকল ঠিক করা যায়। পল্লীগ্রামের অপেক্ষা সহরের কুয়াসায় নানাবিধ পদার্থের অণু মিশ্রিত থাকে। সহরে কুয়াসায় অঙ্গার, এমোনিয়া, হাইড্রো-কারবন্, গন্ধক-দ্রাবক, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, লৌহ, নানাবিধ খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এই জন্য সহরের কুয়াসার বর্ণ শাদা হয় না। পল্লীগ্রাম কিম্বা সমুদ্রের কুয়াসা পরিষ্কার শুভ্র বর্ণ। ইহাদের ভিতর শাদা আলোক শাদাই দেখায়, কিন্তু সহরের কুয়াসার ভিতর শাদা আলোক লাল বর্ণের দেখায়। সহরের কুয়াসায় নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে বলিয়া অনেক সময় কৃষ্ণ বর্ণের হয় এবং এই কারণেই অনেক সময় সূর্য্য-কিরণ প্রবল হইলেও তাহা শীঘ্র অন্তর্হিত হয় না। পল্লীগ্রামের কুয়াসা কখনই সূর্য্যোদয়ের পরে অধিকক্ষণ থাকিতে দেখা যায় না।

কুয়াসার সহিত অনেক প্রকারের দূষণীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং আমরাও নিশ্বাস দ্বারা ইহার অনেকাংশ গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং কুয়াসার অল্পতা ও আধিক্যানুসারে আমাদেরও সাধারণ স্বাস্থ্য অল্পাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপর্য্যুপরি কিয়দ্দিন কুয়াসা হইলে প্রায়ই কোন না কোন পীড়ার প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। অন্ততঃ এই সময়ে মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকে কুয়াসাকেই ঈদৃশ মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধির বা পীড়াধিক্যের কারণ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে অঙ্গার, ধূলা, নানাপ্রকার জান্তব ও ঔদ্ভিদিক ক্ষয় সঞ্জাত অণু-পূর্ণ কুয়াসা অস্বাস্থ্যকর বটে, কিন্তু মৃত্যুহার বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ উত্তাপের অকস্মাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি। ইহাও আবার দেখা যায়, অনেক প্রকারের রোগ, বিশেষতঃ যে সকল রোগের উৎপত্তি জীবাণু হইতে, কুয়াসার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ থাকে। আমরা জানি হাঁপানি-কাশি-রোগীরা কুয়াসার মধ্যে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া থাকে।

মনুষ্য শরীরে কুয়াসার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ ফল আমরা হয়ত তত সহজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু তরুলতার উপর বিশেষতঃ যে সকল উদ্ভিজ্জকে কাচের ঘরে বা গ্রিন হাউসে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হয় তাহাদের উপর ইহার অনিষ্টকারী ফল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। অরকিড কুয়াসায় নষ্ট হইয়া যায়। অনেক ভাল ভাল পাতার গাছ একবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ফুল একবার ফুটিয়াই কিম্বা কোরকাবস্থায় ঝরিয়া যায়।

ছোট ছোট চারা গাছের ডগা শুকাইয়া যায়। লতা গুল্ম এবং অনেক রবিশস্য কুয়াসার প্রাচুর্য্যে একবারে জ্বলিয়া যায়। যে সকল ছোট গাছ বেশ সতেজে পরিবর্দ্ধিত হয়, কুয়াসায় তাহারা একবারে মুসড়াইয়া যায়। উদ্ভিদ রাজ্যে কুয়াসার এত মন্দ ফল হইবার বিশেষ হেতু এই যে, কুয়াসা সূর্য্যকিরণ আবদ্ধ করিয়া রাখে। অথচ সূর্য্যকিরণ ব্যতীত বৃক্ষ-লতাদির শ্বাস প্রশ্বাস এবং পরিপোষণ সমাধা হয় না। রীতিমত শ্বাস প্রশ্বাস ও পরিপোষণ না হইলেই পত্রে জলীয় অংশ অধিক হইয়া পড়ে সুতরাং পত্র খসিয়া যায়, তরু গুল্ম নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সহরের কুয়াসাই এইরূপ অনিষ্টকর। পল্লীগ্রামের কুয়াসা এত অনিষ্টকর নহে। সম্প্রতি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সহরের কুয়াসার ঈদৃশ অপকারিতার বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে।

শ্রী শ্রীপতিচরণ রায়।

ছায়া।

তরুমূলে সাজাইয়া
ফল ফুলে চারু ডালা,
তুমি কি কুসুম নারী
শ্যাম রূপে দিবা আলা ?
সুশীতল গায়ে তব,
কি মাধুরী আজি নব
খুঁজিনু ধরণী সারা
কোথা নাহি তব তুলা !

জগত পথিক মাতা
ভানুর প্রেয়সী তুমি,
জাগ্রতে নয়ন পথে
মধুর স্বপন-বালা !
তোমার পবিত্র রূপে
অমর আভাষ ভাতে,
জ্যোৎস্না আসে, তব সাথে
ধরায় করিতে খেলা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

টেনিসন হইতে অনুবাদিত।

"THE MAY-QUEEN."

বসন্তের রাণী।

বসন্তের সন্ধ্যায়।

ডেকো তুমি প্রভাতে আমায়,—মা আমার, ডাকিও প্রভাতে,
মাগো সেই সুখময় দিন বর্ষ পরে আসিবে জগতে !
হরষের নববর্ষ মাগো, আনন্দের সেই দিন খানি !
মাতোয়ারা হৃদয় আমার, কাল আমি বসন্তের রাণী !

কালো বটে 'তারার' নয়ন, নহে কিন্তু এত মা উজল,
ছোট সে যে 'কুসুম,' 'কামিনী,' 'চপলা'র নয়ন চপল,
নহে তাহা 'কমলা'র মত, সবারি মুখেতে এই বাণী !
মাগো এই নূতন বরষে তাই আমি বসন্তের রাণী।

অচেতনে ঘুমাব জননি, জাগিবনা আমি ঘুম হ'তে,—
যদি তুমি না ডাক আমারে, স্নিগ্ধ সেই মধুর প্রভাতে।
গাঁথিব ফুলের মালা আর, পল্লব কোরক তুলে আনি—
সাজিব মা নূতন বরষে আমি কাল বসন্তের রাণী !

এসেছিনু উপত্যকা পথে, বুঝেছ কি দেখেছি কাহায় ?
বিমল সেতুর ধারে সেই বসে আছে গাছের ছায়ায় ?
হানিনু যে তীব্র দৃষ্টি কাল ভাবিছে সে তাই অনুমানি,
মাগো এই নূতন বরষে আমি হব বসন্তের রাণী।

সেত ভাবে দেবাত্মা আমায়, মোর এই উজল বিভায়,
আর আমি কথাটি না কয়ে চলে যাই আলো-শিখা প্রায়।
বলে তারা কঠিন হৃদয় আমি তাহা শুনেও না শুনি,
মাগো এই নূতন বরষে আমি কাল বসন্তের রাণী !

তারা বলে প্রেমের লাগিয়া মরে যাবে, তাও নাকি হয় !
মোর তাহে কিবা এসে যায় যদিই বা ভাঙ্গে সে হৃদয় ?

এ বসন্তে সুন্দর বালক বলে কত প্রেমের কাহিনী,
মাগো এই নূতন বরষে আমি কাল বসন্তের রাণী !

কাল ফুলি সাথে যাবে মোর, সেই খানে শ্যামল প্রান্তরে,
তুমিও যাইবে মাগো সেথা, রাণী হব দেখিবে কি করে,
চারি পাশে রাখাল বালক,—কোথা হতে এসেছে না জানি,
মাগো এই নূতন বরষে আমি কাল বসন্তের রাণী !

রাধালতা তরঙ্গের মত বেড়িয়াছে দুয়ারের গায় ;
প্রান্তর প্রণালী পাশ দিয়া কুসুম সুবাস বহে যায়।
ধূসর গুহার পাশে ওই সূর্য্যমুখী জ্বলিছে দামিনী !
মাগো এই নূতন বরষে আমি হব বসন্তের রাণী !

নিশার সমীর আসে যায়, প্রান্তরের দুর্ব্বাদল নিয়া,
তাতে যেন সুখী তারা আরো গগনেতে উঠে উজলিয়া,
এক বিন্দু বৃষ্টি কণা কাল পড়িবে না আমি তাহা জানি,
মাগো এই নূতন বরষে আমি হব বসন্তের রাণী !

নিস্তব্ধ উপত্যকা সব রবে কাল শ্যামল নবীন,
শিখরের চাঁপা কুঞ্জগুলি ফুটে কাল রবে সারাদিন !
কুসুমিত উপত্যকা বুকে হরষে বহিবে নির্ঝরিণী !
মাগো এই নূতন বরষে আমি হব বসন্তের রাণী।

ডেকো তুমি প্রভাতে আমায়, মা আমার, ডাকিও প্রভাতে,
মাগো সেই সুখময় দিন বর্ষ পরে আসিবে জগতে।
হরষের নূতন বরষ আনন্দের সেই দিন খানি !
মাতোয়ারা হৃদয় আমার, কাল আমি বসন্তের রাণী !

NEW YEAR'S EVE.

নববর্ষের সন্ধ্যায়।

ডেকো তুমি প্রভাতে আমায়, মা তোমার, সুমধুর স্বরে,
কাল আমি দেখে লব শেষ নববর্ষে নব প্রভাকরে !

শেষ এই নববর্ষ মাগো দেখে লব কাল শেষ বার,
তার পর সমাধির তলে ঘুমাব, মা কেঁদনা আমার।

আজ যবে অস্ত গেল রবি, দেখেছিনু রয়েছে পশ্চাতে—
পুরাতন সুখী সে বরষ শান্তি যাহা দেছে হৃদয়েতে,
নববর্ষ আসিতেছে মাগো কিন্তু আমি দেখিব না তায়,
বিকসিত কুসুমের দল শ্যামল সে গাছের পাতায়।

অতীত বসন্তে সুখে ছিনু সাজাইয়ে ফুলের মুকুটে
বসন্তের রাণী করেছিল যত সব সখী তারা জুটে,
তরুতলে কুঞ্জবন পাশে নেচেছিনু হরষেতে মোরা
যতক্ষণ প্রাসাদ শিখরে উঠে নাই সাতটি সে তারা।

গিরি শিরে ফুল নেই আর জানালায় শিশির যে ঝরে,
আমার বাঁচিতে সাধ যায় যতক্ষণ বসন্ত না ফিরে।
নীহার গলিয়া যাবে ওই প্রভাতের রবির কিরণে
মারবার আগে সাধ যায় চাহিতে একটি ফুল পানে !

বায়স ডাকিবে হোথা ওই, শিশুগাছ দুলিছে সমীরে,
কোকিলের সুমধুর স্বর বহে যাবে প্রান্তরের পারে !
ফিরিবে সাগর পার হতে বসন্ত সে বিহঙ্গের সনে
আমি হায় ! ঘুমাব একেলা, জীর্ণ দীন সমাধি শয়নে !

গির্জ্জা-মন্দির গবাক্ষেতে আর মোর সমাধি উপর,
উঠিবে গো প্রভাতে জননি, বসন্তের নব রবি কর !
ওই দূর হতে যাবে শোনা, যবে বন কুক্কুটের ধ্বনি,
গভীর নিদ্রার রবে মাগো নীরব এ বিশাল ধরণী !

কুসুম ফুটিলে মাঠে ফিরে সন্ধ্যার সে স্তিমিত আলোকে,
প্রান্তর উপর দিয়া আর দেখিবে না আসিতে আমাকে !
সেই সে গভীর অন্ধকারে সুশীতল বসন্ত সমীরে,
নব নব দুর্ব্বাদল পাশে আর সেই ক্ষুদ্র বাপীতীরে।

সমাধি করিও তুমি মোর সেইখানে সেফালি ছায়ায়,
যখন আসিবে তুমি মোরে দেখিতে সে নিরজনে হায়,

ভুলিবনা তোমারে জননী যখন যাইবে তুমি চলে !
শুনিব সে চরণ বিক্ষেপ মোর শিরে আর দুর্ব্বাদলে !

চিরকাল দুরন্ত আমি যে তুমি গো মা ক্ষমা কর মোরে,
আজ চুমি দাও মা আমার, ক্ষমা কর যাব কত দূরে।
কেন মা ফেলিছ অশ্রুজল, কেঁদোনা মা হয়ো তুমি স্থির !
আছে আর বালিকা তোমার মোর লাগি হয়ো না অধীর।

যদি আমি ফিরে আসি মাগো আমার সে শান্তিগেহ হতে,
তুমি কভু দেখিবে না মোরে আমি কিন্তু চাহিব সুখেতে।
কথা কিছু বলিতে পাবনা কি বলিছ পাব শুনিবারে,
যখন ভাবিবে তুমি মাগো আছি আমি অতি দূর দূরে।

বিদায় বিদায় দাও মাগো চিরতরে এ শেষ বিদায়,
তুমিত গো দেখিবে জননি, নিয়ে যাবে দ্বার দিয়ে হায়।
ফুলিকে দিওনা কভু যেতে যত দিন তৃণ না উপজে,
সেই ভাল-মেয়ে মা তোমার আমাদের দুজনার মাঝে।

পাবে সে খেলেনা গুলি মোর উদ্যানের ক্ষুদ্র সে কুটিরে,
নিতে বল সেগুলি তাহায় আর আমি আসিব না ফিরে,
বোলো তারে গোলাবের কুঞ্জ দেখে যেন যতনে আদরে,
আর সেই কুসুম সকল আছে যাহা জানালার ধারে।

বিদায় এখন তবে মা গো প্রভাতে মা তুলিও ডাকিয়ে,
সারা রাত রহিব জাগিয়া প্রভাতে পড়িব ঘুমাইয়ে।
কিন্তু মোর দেখিবারে সাধ নব রবি নূতন জগতে,
ডেকো তুমি প্রভাতে আমায়, মা আমার, ডাকিও প্রভাতে।

শেষ।

এখনোত রয়েছি জননি, ভেবেছিনু চলে যাব হায়,
মেষের শাবক ডাকে মাঠে—ওই দূরে—তাই শোনা যায়,
মনে হয় কি বিষাদ ভরা নববর্ষে প্রভাত নূতন,
অপরাজিতাটি হেথা রবে নীহার না আনিতে মরণ।

কি মধুর অপরাজিতাটি ফুটে আছে আকাশের তলে,
কি মধুর আনন্দ ধ্বনিতে ডাকে মাঠে মেষেরা সকলে,
এ ধরণী সকলি মধুর কুসুম মধুরতর আর,
জীবন হইতে মোর কাছে মধুর সে মরণের পার।

কি কঠিন মনে হত মাগো ছেড়ে যেতে স্নিগ্ধ রবিকরে,
তাঁরি ইচ্ছা হোক পূর্ণ হায় ! আর সাধ নাই বাঁচিবারে।
আর বেশী দেরি নাই মাগো মুক্ত হব আমি তাহা জানি,
দেবতা-সে-পুরোহিত মোরে বলেছেন শান্তি মাখা বাণী !

* * * * *

দেখায়ে দেছেন পাপরাশি, বুঝালেন অপার করুণা,
প্রদীপ জ্বেলিছি দেরি হলে, দেরিতে কি মেটেনা বাসনা !
আর কি ভালর ক্ষণ আছে ? কি কাজ করিব আর হায় !
নিভে গেছে বাসনা আমার চলে গেছে মিশিতে "তাঁহায়।"

শুনি নাই কুক্কুরের ধ্বনি ঝিঁঝিঁর সে মরণের গান,
এসেছে মধুর চিহ্ন এক নিশা দিবা মিলনের স্থান !
বস তুমি বিছানার পাশে দুটি হাতে ধর হাতখানি,
বোন তুমি বস এই পাশে, বলিব সে চিহ্নের কাহিনী।

বসন্তের সুখের প্রভাতে শুনেছিনু অপ্সরা আহ্বান,
যখন চাঁদিমা অস্ত যায় অন্ধকারে ডুবে ধরাখান।
গাছের সে চুপি চুপি কথা, বাতাস সজোরে বহে যায়,
বসন্তের সুখের প্রভাতে ডেকেছিল মোরে আয় আয় !

জাগিয়া চাহিয়া চারিদিক ভেবেছিনু ফুলিকে তোমাকে,
দেখিনু বসিয়া আছ মাগো কিন্তু নাহি দেখিনু আমাকে।
হৃদয়ের শক্তি সহ আমি প্রার্থনা করিনু দোঁহা তরে,
ভেসে এল উপত্যকা হতে সঙ্গীত তরঙ্গ বায়ু ভরে।

ভেবেছিনু মিছে এ কল্পনা কিন্তু শুয়ে শুনিনু শয্যায়
কি যেন অস্ফুট কথাগুলি কারা যেন বলিল আমায়,
হরষে কম্পিত হল যেন আমার এ হৃদয়টি-সারা,
সেই ধ্বনি আবার আসিল সমীরণে, আপনাতে হারা।

তোমরা ঘুমায়েছিলে মাগো ভাবিলাম এ ডাক আমার,
তাদের কখনো নয় এ'ত, আসে যদি এই তিনবার।
আবার আসিল ভেসে মাগো ওই দিকে জানালার পরে,
তার পর মিশাল আকাশে মরে বুঝি গেল তারা-করে।

তাই ভাবি নিকট সময়, বিশ্বাসত হইতেছে তায়,
আর জানি পরাণ আমার যাবে সেই সঙ্গীত যেথায়।
কিছু দুঃখ নাই মোর তায় আজি যদি শেষ হয়ে যায়,
কিন্তু ওই বোনটি রয়েছে সান্ত্বনা করিও তুমি তায়।

বিমলেরে করুণার কথা বোলো তারে অধীর না হয়,
আরো আছে উপযুক্ত তার, সুখী হবে পেয়ে যে হৃদয়।
বাঁচিলেও বলিতে পারি না—হলেও হতাম প্রণয়িণী,
কিন্তু মোর নিভেছে সকলি থেমে গেছে আকাঙ্ক্ষা-কাহিনী।

রবির কিরণ জ্বলে ওই, জ্যাতির্ম্ময় হয়েছে গগণ,
শত শত প্রান্তরের পরে জানি আমি বরষে কিরণ।
আমি আর যাব না সেথায় উজলিবে সেথা রবি করে।
উপত্যকা বুকে ফুলগুলি তুলিব না, তুলিবে অপরে।

কি মধুর অজানা নূতন মনে হয় আজি এ প্রভাত,
কথা যাহা বলিতেছি হায়, রবিতে হইবে প্রতিভাত।
চিরতরে সেইখানে যাব সত্যের আত্মারা যেথা আছে,
জীবনের তরে এত দুঃখ, কি আমরা চাই শুধু মিছে।

চিরতরে চিরতরে সেই আনন্দের সুখ নিকেতন,
রব মাগো আশাপথ চেয়ে নিরখিব তব আগমন।
শুয়ে রব ঈশ্বর আলোকে যেমন তোমার হৃদি পরে,
যেথা কেহ ব্যথা দেয় নাক শ্রান্ত প্রাণ পায় জুড়াবারে। *

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ক্ষেমী বাট্‌পাড়নী।

জনপ্রবাদে শুনা যায় ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের বগুলা ও কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসনদ্বয়ের মাঝা-মাঝি পূর্ব্বাংশে "মৈমা" নামক স্থানে ক্ষেমী বাট্‌পাড়নীর বাড়ী ছিল। তথায় নাকি অদ্যাপিও স্তূপাকার মৃত্তিকা রাশিকে লোকে "ক্ষেমীর ভিটা" কহিয়া থাকে। অথচ যশোহরের ৪ ক্রোশ উত্তরাংশে খাজুরা নামক বিখ্যাত পল্লির নিকট চিত্রানদীর তীরে অদ্যাপি "ক্ষেমার দেয়ার" বলিয়া প্রায় ৫।৬ বিঘা পতিত জমী শ্মশানে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। অনুমান এবং লোক প্রবাদ ভিন্ন যখন কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন যে কথাটী অধিকাংশ প্রাচীনগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় তাহাই ঠিক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, সুতরাং অনুসন্ধানে যতদূর জানিলাম তাহাতে আমার বিবেচনায় যশোহরের খেজুরা সন্নিহিত ভূমিতেই ক্ষেমার বাসস্থান ছিল। প্রায় ৫ বর্ষ হইল আমি কোন কার্য্যগতিকে কৃষ্ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে একদিন অবস্থান করিয়াছিলাম সেই সময় কয়েকজন বৃদ্ধ কৃষক এবং জনৈক বৃদ্ধা ভদ্র-বংশীয় রমণীর নিকট ক্ষেমার বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলাম তাহারা আমাকে যে গল্পটী বলিল তাহাতে উক্ত অনুমান আরো দৃঢ়ীকৃত হয়। তবে তাহারা মৈমা নামক স্থানের ভিটার কথাও কহিয়াছিল, আমি কিন্তু নিজে তাহা দেখি নাই।

কৃষকটী খুব আগ্রহের সহিত কহিল যে, একদিন ক্ষেমীর স্বামী তাহার পিতার চাকরী স্থান হইতে আসিতে পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় সেই সময় ক্ষেমঙ্করী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে দস্যুপতিকে পরাস্ত করিয়াছিল। সেই হইতে দস্যুদল নায়ক "রেজো ডাকাত" তাহার বশ্যতা স্বীকার করে এবং "ক্ষেমী দিদি" বলিয়া ডাকিতে থাকে। ফটকী নামক কোন এক নদীর তীরে এই ব্যাপার সংঘটন হয় বলিয়া ক্ষেমীর দলকে লোকে সাধারণত "ফট্‌কে ডাকাত" কহে। আমাদের অনুমান হয় যশোহরের উত্তরাংশে লুপ্ত প্রায় ফটকী

---

* অনুবাদে অনেকগুলি ফুলের নাম ও লোকের নাম বাঙ্গালায় দিতে হইয়াছে। নহিলে কবিতার মাধুর্য্য হ্রাস হয়।

নামক নদীই বোধ হয় এই ডাকুস্থান হইবে। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ রাজ্যের প্রথমে এই অংশটায় বড় অরাজকতা দেখা যায়, অথচ তখন এই স্থলে অনেক বড় লোকেরও বাস ছিল। যশোহরের এই অংশেই বর্ত্তমান নলডাঙ্গার আদিপুরুষ "বিষ্ণুদাস হাজরার" অভ্যুদয় হয়। আজ কাল যেখানে বেত্রবতী বা "বঙ্গ নদী" প্রবাহিত হইতেছে তাহারই তীরে এই রাজবংশের আদিম এবং বর্ত্তমান বাড়ি।

একদিন কোন একজন লোক ক্ষেমঙ্করীকে আসিয়া কহিল যে "রণবীর খাঁ" নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে তাহার পিতাকে বড় অপমান করিয়াছিল এই কথায় ক্ষেমী অমনি মুক্তকুণ্ডলা হইয়া অসিহস্তে সুপ্রসিদ্ধ ডাকাত সরদার দুলেবাগদি জাতীয় শম্ভুনাথ বাবুকে আসিয়া কহিল শম্ভু দাদা আইস আজ অনেক দিন তলোয়ারের খেলা হয় নাই আজ একবার বনবীরের সঙ্গে খেলা করিয়া আসি। সত্য মিথ্যা জানি না, দুই জনে নাকি নলডাঙ্গার বাড়ি আক্রমণ করিয়া অবমাননার প্রতিশোধ লইল। এইরূপ অনেকানেক বীরত্ব কাহিনী ক্ষেমীর নামে এ অঞ্চলে প্রাচীনদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষেমী ঠিক কোন সময় জীবিত ছিল জনপ্রবাদ তাহা স্থির বলিতে পারে না। যাহা শুনিয়াছি তাহাতে ইহাকে মুসলমান রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু আবার কোন একটি বিজ্ঞ পারসীনবীশ প্রাচীনের নিকট শুনিয়াছিলাম যে ক্ষেমীকে এবং তাহার সহকারি দস্যুশ্রেষ্ঠ শম্ভু বাগ্‌দিকে ইংরেজেরা আশান্ নগরের মাঠে ফাঁশী দিয়াছিল। এই কথায় প্রতিপন্ন হয় যে ক্ষেমী বাট্‌পাড়নী মুসলমান রাজ্যের একেবারে শেষ সময়ের লোক। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষেমি বাট্‌পাড়নী বঙ্গে শক্তি অবতার। তবে একা ক্ষেমি বাট্‌পাড়নিতে নহে শক্তির পরিচয় বাঙ্গালার অনেক স্থলেই আছে। আমরা শুনিয়াছি যে এই অঞ্চলে বর্ত্তমান খুলনা জেলার নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে একটি স্ত্রীলোক একমাত্র ঝাঁটার সাহায্যে রণোন্মত্ত একদল সৈনিক পুরুষকে নিবারণ করিয়াছিল—ইনি বৈদ্য বংশজাত কুলকামিনী। আবার মাগুরা মহকুমার অপর পারস্থ আঠার বাদার বিখ্যাত বলবান মনোহর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী স্বামীর সহিত জেদ করিয়া একটি বৃহত্তম শাল কাষ্ঠের দ্বারা নদীর ঘাট রোধ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে এদেশে এরূপ অনেক বীর্য্যবতী রমণীর অস্তিত্ব ছিল শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

মাগুরা।

না হ'লে চলে না।

"What I do and what I dream, include thee, as the wine
Must taste of its own grapes" Mrs. Browning.

কেহ কি আমায় বলিয়া দিবে না, তুমি আমার কে? কত সময় যখন আনমনে বসিয়া থাকি, ভাবি তুমি আমার কে? ভাবি বটে, কিন্তু ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাই না। এই ধরি, ধরি আর ধরিতে পারি না, বুঝি বুঝি করিয়া আর বুঝা হয় না। তোমাকে ভাবিয়াছিলাম, নিতান্ত সরলা, কিন্তু তোমার মধ্যে এ ইন্দ্রজাল কোথা হইতে আসিল? এ প্রতারণাটুকু তুমি কোথায় শিখিলে? একটা প্রাণ লইয়া এ ভাবে খেলা করিতে কি তোমার একটু মমতা হয় না?

প্রথম কি ভাবিয়াছিলাম, এরূপ ঘটিবে? পথ চলিতে চলিতে কত সুন্দর সুরভি ফুল দেখিতে পাই, দুদণ্ড সে শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক হয়, সে সুরভিতে প্রাণ পুলকিত হয়, কিন্তু আবার যখন জীবনের কাজকর্ম্মে রত হই, তখন সে সমস্ত কোথায় বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যায়। প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিলাম, তুমিও সেই ভাবে দুদণ্ডের জন্য প্রাণটাকে পুলকিত করিতেছ। তাই ত নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছিলাম! সৌন্দর্য্য মানব প্রাণকে শান্ত করে, কিন্তু তুমি কেন এ প্রাণে এত অশান্তি আনয়ন করিলে? যাহা দুর্ল্লভ, তাহার আশায় প্রাণটাকে পাগল করিলে কেন? এখন যে তোমাকে না হলে আমার চলে না!

যখন প্রত্যূষে উঠিয়া আনমনে বসিয়া আকাশের কোমল নীলিমা দেখিতেছি, নিদ্রোত্থিত বিহঙ্গের কলকণ্ঠে প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, প্রাতঃকালীন মলয়ের মৃদুসঞ্চালনে নিদাঘতাপক্লিষ্ট দেহ সুশীতল হইতেছে, তুমি তখন কোথা হইতে আসিয়া কি-যেন-কিসের অভাবে প্রাণটাকে অধীর করিয়া তুলিলে। আবার যখন কঠোর জ্ঞানালোচনায় নিবিষ্ট রহিয়াছি, ইন্দ্রিয়গণ আপন কার্য্য বিস্মৃত হইয়াছে, মন একাগ্রভাবে সেই কঠোর সমস্যায় আপনা হারাইয়াছে, তখন হৃদয়ের অতি গূঢ় প্রদেশ হইতে ও কার মুখখানি, ও কার হাসিটুকু হৃদিদর্পণে মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া প্রাণটাকে মধুময় করিয়া তুলিল, কি অপ্রাপ্য সুখের আশায় প্রাণটাকে বিচলিত করিয়া তুলিল? যখন জনকোলাহলের মধ্যে, জীবনের প্রখর রৌদ্রতাপে খাটিতে থাকি, তখনও কি তুমি এই মধুময় বিষের জ্বালা হইতে প্রাণটাকে মুক্ত হইতে দিবে না? সেই রৌদ্র তাপে তুমি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে বসিয়া কি সুস্নিগ্ধ ছায়ার কথা শুনাইতে থাক, প্রাণটা পাগল হইয়া উঠে। আচ্ছা, বল দেখি কাঙ্গালকে এ ভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনান কি নিষ্ঠুরতা নহে? তুমি ত শুদ্ধ ইহাতেও পরিতৃপ্ত নহ। যখন মনে করি, জীবনের সমস্ত আসক্তির কথা ভুলিয়া একবার পরমেশ চরণতলে জীবন উৎসর্গ করিব, তখনও তুমি কোথা হইতে আসিয়া

হৃদয়ে উপনীত হও। মন ভাবিয়াছিল আসক্তিশূন্য হইবার জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবে, কিন্তু হৃদয় কেমন করিয়া না জানি অন্য প্রার্থনা করিয়া ফেলিল! এ কি তোমার চাতুরী নয়? তুমি অহর্নিশি, সজনে নির্জ্জনে প্রাণে থাকিয়া এ ভাবে খেলা করিতেছ, অথচ ধরিতে গেলে ধরা দাও না। সময় সময় তোমাকে বড় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়।

কি জানি কেমন করিয়া তুমি এ প্রাণের সমস্ত কামনার সহিত মিশিয়া গিয়াছ! এখন তোমাকে ছাড়িয়া একটি আকাঙ্ক্ষাকেও যে প্রাণে স্থান দিতে পারি না, সমস্ত জীবনটাই যেন তাহা হইলে অর্থহীন হইয়া পড়ে। আচ্ছা, বল দেখি, এমনই করিয়া কি লোকের স্বাধীনতা হরণ করিতে হয়? লোককে চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ রূপে পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী করিতে হয়? এখন তোমাকে নহিলে যে আমার জীবন চালান ভার হইয়াছে। তাই কত সময় ভাবি, এতটা পরমুখাপেক্ষী হওয়া কি ভাল? ভাবিতে ভাবিতে কত সময় নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু সে ত বালির বাঁধ। তোমার চোকের কোণে অই যে কি একটু হাসি (হয়ত তাহা স্বপ্নেই দেখিয়া থাকিব!) তাহাতে সে সমস্ত বাঁধ কোথায় ভাসিয়া যায়। আচ্ছা, বল দেখি, তোমার অই কোমল জ্যোৎস্নাময়ী হাসির ডোরে এত দৃঢ় করিয়া এ কঠিন প্রাণটাকে বাঁধিলে কিরূপে? কিছুতেই ত তোমার এ কোমল ডোর ছিঁড়িতে পারি না! বরং যতই ছিঁড়িতে যাই, ততই বাঁধন আঁটিতে থাকে? কোন্ মোহিনী শক্তিতে তুমি এরূপ করিলে? তোমার সৌন্দর্য্য আছে, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু আর কি কাহারও সৌন্দর্য্য নাই? কেন, তোমার অপেক্ষা আরও ত কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি, তাহাতে ত প্রাণটা বাঁধা পড়ে নাই। তোমার ও সুন্দর মুখে যখন মধুর হাসি ফুটিয়া উঠে, তোমার ও গোলাবকোরকতুল্য অধর যখন কৌমুদীচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার ও চটুলনয়নের কোণে জ্বালাবিহীন চপলার আলো যখন প্রকটিত হয়, তখন তোমার সৌন্দর্য্য শতগুণ সুন্দর হয়—এ কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু এ হাসি কি আর কেহ হাসে না? তাহাও যে না দেখিয়াছি তা নয়। তবুও তাহাদের না হ'লে ত কিছুমাত্র যায় আসে না; কিন্তু তোমাকে না হ'লে চলে না কেন? এসব বাহিরের চাকচক্য,—তোমার অন্তরে সৌন্দর্য্য আছে, তোমার মনে বল আছে, তোমার শিরে বাণীর আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও কি এত দুর্ল্লভ? তাহাত আরও কতজনের রহিয়াছে। তবে তোমার এ কি রহস্য! কি দিয়া বাঁধিয়াছ এ হৃদয়কে? এত করিয়া ধরিতে যাই, এত করিয়া বুঝিতে চাই, কিন্তু তোমার মধ্যে এমন কি একটা যেন রহিয়াছে, যাহা আমার সমস্ত গণ্ডী কাটিয়া পলায়ন করে, আমি অকূলে দিশাহারা হইয়া যাই। এ কি অসীমে সীমা দিতে যাই বলিয়া এরূপ ঘটে? তোমার মধ্যে যে এত রহস্য, তাহা আগে বুঝি নাই। আচ্ছা তোমার রহস্য, তোমারই থাক। কিন্তু তোমাকে নইলে আমার চলে না কেন? হরি

হরি, সকল রহস্যের রহস্য ত অইখানে। তুমি ছিলে বাহিরে, অন্তরে আসিয়া অন্তরের মর্ম্মস্থানের সহিত এক হইয়া গেলে কিরূপে? আমি ছিলাম স্বতন্ত্র, আমার সে স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইল কিরূপে? কিছুই বুঝি না, তুমি কিরূপে জাগ্রত নিদ্রায় আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত বাসনা, সমস্ত উচ্চাভিলাষের সহিত এক হইয়া গিয়াছ। তোমাকে ছাড়িলে ত এখন আমার আমাকে খুঁজিয়া পাই না। প্রাণের শান্তি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, এক চির অতৃপ্ত বাসনা প্রাণের মর্ম্মস্থান দংশন করিতেছে, তাহার মধুর বিষে প্রাণ জর্জ্জরিত হইতেছে। এ বিষের মত জ্বালা, তবুও ত তাহা তুলিয়া ফেলি না। তুলিবার সাধ্য আছে কি? সে কথা সত্য। ইচ্ছা করিলেই বা পারি কই? কিন্তু ইচ্ছাও ত হয় না। এত অশান্তি, এত জ্বালা, তবুও তোমার মুখে কি যে মধুরতা আছে, তাহাতে এ অশান্তি, এ জ্বালাও মিষ্ট হইয়া যায়, এ মধুর-মরণ হইতে পলায়ন করিতে সাধ যায় না।

এ কি ভালবাসা? চিরদিন ত শুনিয়াছি, ভালবাসা শান্তিময়ী, আপনাতেই আপনি পরিতৃপ্ত। এ যদি ভালবাসা হইবে ত আমার প্রাণে এত অশান্তি কেন?—অতৃপ্তির বৃশ্চিক দংশনে প্রাণ সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হয় কেন? ভালবাসা ত শুনিয়াছি কামনাবিহীন,—আপনাকে দিয়াই সুখী, প্রতিদানে কিছু চায় না। কিন্তু আমার প্রাণ ত কামনাপূর্ণ, সত্য, আমি সামান্য জিনিসের ভিখারী নহি। কিন্তু ভিখারী ত বটে? আমি তোমার যৌবনের ভিখারী নহি, সংসারে ত যুবতীর অভাব নাই। তোমার রূপের জন্যও এ প্রাণ লালায়িত নহে, কারণ খুঁজিলে রূপসীর অপ্রতুল নাই। বিদ্যা বুদ্ধি চাহিলেও তাহা নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে। তবে এ সমস্ত একাধারে পাইলে এ হৃদয়ের এ ঘোর পিপাসা নিবৃত্ত হয় কি? হরি হরি, সেই ত তোমার কুহক জাল! সেই ত তোমার গভীর রহস্য!! যৌবনের সোহাগের উপর সোহাগ ঢালিয়া, রূপের মধ্যে রূপরাশি ফুটাইয়া, জ্ঞানের উপর জ্ঞান চাপাইয়া যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হইবে, সেত আর আমার তুমি হইবে না! সে বাহিরের দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া দূর হইতে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতে পারি, কিন্তু সে ত এ ভাবে আমার হৃদয়ের শোণিত হইবে না। এ সংসারে ত আমা অপেক্ষা কত শত শ্রেষ্ঠ লোক রহিয়াছে। তা' বলিয়াত আমি আত্মহত্যা করি না। তোমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রমণী সংসারে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমার কি? তুমি আমার যাহা, তাহারা ত আর আমার সে জিনিস হইতে পারিবে না। আমার বুকের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ডটা রহিয়াছে, তাহা না হইলে যেমন আমার চলে না, তোমাকে নইলেও আমার জীবন অচল হয়। এত কামনা যেখানে, তাহাকে কি ভালবাসা বলে? হরি হরি, সংসারে আসিয়া কিছুই বুঝিলাম না। আর কিছু বুঝি বা না বুঝি, তাহাতে বিশেষ দুঃখ নাই; কিন্তু তোমাকে যে বুঝিতে পারিলাম না, তোমার সীমা যে খুঁজিয়া পাইলাম না, এর বাড়া দুঃখ নাই।

উত্তর।

গত ফাল্গুন মাসের ভারতীতে মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি নামক একটী প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদক এই প্রবন্ধটি কৌতুক নয় কি কৌতুকময় এই বিষয়ে সংশয় বিশিষ্ট হইয়া তৎসম্বন্ধে সাধারণের মতামত জানিতে ইচ্ছুক। "মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি," পত্র পৃষ্ঠে এই কথাগুলি আমার নয়নগোচর হইয়াই আমার একটি পুরাতন অনুরাগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে! অতএব তৎসম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অন্যূন বিংশতি বৎসর কাল অবধি আমার মনে মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি সম্বন্ধে একটি অপ্রকাশিত সত্যের আলোচনা আছে। যখন আমি বিহার প্রদেশের ছাপরা নগরে ছিলাম কথা প্রসঙ্গে তখন একটি বন্ধু বলিয়াছিলেন, "প্রাচীন কালে আমাদেরও টেলিগ্রাফ ছিল, কেননা রামায়ণে মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লঙ্কাতে রাবণ স্মরণ করিলেন আর পাতালে তাঁহার পুত্র মহিরাবণ বুঝিতে পারিলেন যে, লঙ্কাতে পিতা ডাকিয়াছেন। কোথায় অরণ্যে বিপদে পড়িয়া দ্রৌপদী স্মরণ করিলেন আর দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গরুড় বাহনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" এই কথায় আমার মনে তখন একটা খট্‌কা উপস্থিত হইয়া আমাকে চিন্তান্বিত করিল। ভাবিলাম, তখন তো তারযোগে এখনকার প্রণালীতে খবরাখবর চলিত না। তবে অবশ্যই এমন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্যা প্রচলিত ছিল যাহা দ্বারা একের মনের ভাব দূরে থাকিয়াও অন্যে বুঝিতে পারিতেন। এখন ইহা মনুষ্যের জ্ঞান হইতে একবারে চলিয়া গিয়াছে। মানুষের নিকটে সে বিদ্যা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মনের যে বার্ত্তাবহ প্রকৃতি তাহা অহরহ কার্য্য করিতেছে। সে কি প্রকার তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই—মনে করুন, একটা গভীর হ্রদের নীচে কর্দ্দমের একটু স্থান কোন কারণে ফুট করিয়া ফাটিয়া গেল, আর তাহা হইতে বায়ু তাড়িত জলকণিকা জলরাশি ভেদ করিয়া উপরে ক্ষুদ্র বিম্বাকারে ভাসিয়া উঠিল। সেইরূপ একটি মনে কোন একটি ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি উত্থিত হইল, আর তাহা তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ে গিয়া আঘাত করিল এবং সেই বিষয় তদনুরূপ ভাব ধারণ করিল এবং সেই ভাব কারণ রূপে কোন একটা কার্য্যকে সম্পাদন করিয়া তুলিল। এইরূপ কার্য্য অহরহ চলিতেছে জিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্যা আমরা জানি না বলিয়াই আমরা তাহার দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতে পারি না। দেখুন, আমাদের দেশে কাহারো বিষম লাগিলে এই যে লোকে বলে, "কে গালি দিতেছে, জিব্ দাঁতে কাটিয়া গেলে বলে, "কে নাম করিতেছে" দুই জনে এক সময়ে একই কথা দৈবক্রমে বলিয়া ফেলিলে বলে "কেহ বাড়ীতে আসিতেছে" ইত্যাদি। ইহাই সেই মনস্তত্ত্ববিদ্যা বা মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফির অস্ফুট ছায়া।

আবার দেখুন, পক্ষীদিগের মধ্যে শকুনি প্রসিদ্ধ গোমাংসভুক্। কোন বনের মধ্যে বৃক্ষের বা ঝোপের অন্তরালে একটি মৃত গরু পড়িয়া আছে। যদি একবার একটি শকুনি তাহা দেখিতে পাইল, তবে আর রক্ষা নাই। অমনি এক দুই করিয়া ক্রমে পালে পালে দিগ্দিগন্তর হইতে শকুনি-সকল আসিয়া সেই স্থানে জমা হইতে লাগিল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে এমন সকল দূর ও বিভিন্ন দিক্ হইতে (অধ ঊর্দ্ধদিক্ এবং গাছ পালার মধ্য দিয়া এই পক্ষীরা আসিতে থাকে যে সেখান হইতে কোন ক্রমেই এই স্থান বা অন্য পক্ষীর আগমন দেখা যায় না। ইহাতে কি মনে হয়? কোন প্রকার মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা ইহাদের সহজ বোধের মধ্যে নিহিত আছে, যাহা দ্বারা ইহারা স্বজাতিকে ভোজ্য বস্তুর সমীপে আহ্বান করিয়া থাকে, ইহাকি মনে হয় না? প্রবাদ আছে যে, "গরু মরিলে শকুনির মাথায় টনক নড়ে।" হয়তো কেহ বলিবেন যে, শকুনি জাতির এমন একটি সূক্ষ্ম তীব্র ঘ্রাণ শক্তি আছে যাহা দ্বারা তাহারা দূরস্থ মৃত গরুর নিকটে চালিত হয়। যিনি এইরূপ বলেন তিনি সহজ চক্ষে কিম্বা অণুবীক্ষণ দ্বারা শকুনির ঘ্রাণশক্তি দর্শন করেন নাই, অবশ্যই অনুমান করিয়া বলেন। কিন্তু একটি মৃত গরু হয়তো দুই দিন একটি বনে পড়িয়া আছে, তাহাকে কেহ ছোঁয় নাই। তাহার পরে যখনি একটি শকুনিকে তাহার কাছে দেখা গেল, তাহার পরক্ষণেই দুই তিন করিয়া ক্রমে পালে পালে শকুনি আসিয়া পড়িতে লাগিল।"* গো-চর্ম্ম লোলুপ মুচী ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সর্ব্বদা শকুনি পক্ষীর গতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। এই সকল কথাকে আপনারা কল্পনাই বলুন আর কুসংস্কারই বলুন আমার কিন্তু বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে এই সকল ছায়াময় কথার মধ্যেই সেই মনস্তত্ত্ববিদ্যা বা মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফি বিদ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা আবার এক দিন দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গবেষণার দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। অথবা ইহা সাধারণের জ্ঞাতব্য বিদ্যা না হইলেও কোন কোন ধীর বিচক্ষণ ব্যক্তির তপস্যা লব্ধ বিদ্যা বলিয়া পরিচিত হইবে। এখন এই বিষয়ে আমার আধ্যাত্মিক আলোচনা যতটুকু খাটিয়াছে তাহা বলিতেছি।

ভাবুন, আপনি বিলাতে আছেন আর আমি ভারতে আছি, কিন্তু আপনি ও আমি কত নিকটে আছি জানেন? এত নিকটে আছি, যে তত নিকটে আর কেহ নাই। আর্য্য ঋষিদিগের গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ এইরূপ নির্ণিত হইয়াছে যে তিনি "অণোরণীয়ান্" অর্থাৎ অর্থাৎ অণু হইতেও অণু। আর সেই অণোরণীয়ান্ ঈশ্বরের মধ্যে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বেধ বিরহিত একটি বিন্দুর মধ্যে এই সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী সমন্বিত অনন্ত জগৎ নিহিত রহিয়াছে। এখন বুঝুন দেখি, আপনার মনটি বিলাতস্থ শরীরের মধ্যে থাকিয়া যে বিন্দুতে অবস্থান করিতেছে আমার এই ভারতস্থ শরীরের মধ্য-

---

* কিন্তু প্রথম শকুনিকে এখানে কে ডাকিয়া আনিয়াছিল? ভাং সং

গত মনটি ঠিক সেইখানে আছে কি না। যদি থাকে তবে আপনি যেখানে বসিয়া আমার বিষয় মনে কল্পনা করিতেছেন আমি ঠিক্ সেই খানে বসিয়াই তাহা জানিতে পারিব না কেন? তবে যে জানিতে পারি না তাহা কেবল ঐ বিষয়ক গভীর চিন্তা বা সাধনার দ্বারা অর্জ্জিত মনস্তত্ত্ব বিদ্যার অভাব বলিয়া।

আমাদের আত্মা জড় পদার্থ নহে। কিন্তু শরীর যে জড় পদার্থ তাহার সঙ্গে আত্মার কেমন সম্বন্ধ—কেমন বহির্যোগ। আত্মা ইচ্ছা করিল, "ভ্রমণ করি" অমনি পা চলিতে লাগিল। আত্মা ইচ্ছা করিল "গ্রহণ করি" অমনি হস্ত লইল। সেইরূপ আত্মা যখন ইচ্ছা করে তখন মন মনন করিতে থাকে। এই মনও হস্ত পদাদির ন্যায় জড় পদার্থ। তবে স্থূল জড় নহে, জড়ের তৈজস অংশ। প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থে এ কথায় এইরূপ উপদেশ আছে যে, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্টস্তন্মনঃ।" অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন ধাতুতে পরিণত হয়। এই তিনের স্থূল ধাতু পুরীষ, মধ্যম ধাতু মাংস এবং যাহা সূক্ষ্ম তাহা মন। অতএব মন আত্মার একটি প্রধান কারণ হইলেও তাহা জড় এবং অন্নমূলক। অন্ন বলিতে কেবল যে ভাত রুটী তাহা নহে। অন্ন ভাবৎ জড় পদার্থকে বলে। এখন দেখুন, আর এক হিসাবে, মন যদি অন্ন অর্থাৎ জড়মূলক হইল এবং প্রত্যেক জড় পদার্থে তড়িতের শক্তি বিদ্যমান রহিল তবে মনেও সেই তড়িৎ শক্তি না থাকিবে কেন? অতএব বুঝিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিলে, মনে মনে যে বার্ত্তা বহিত হইয়া থাকে, সে কথা তখন কল্পনা পরিহাসের কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সত্যের সিংহাসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?

আমেরিকার মার্ক টোয়েন সাহেব এই মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফির সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া তাঁহার বন্ধুদের নিকট হইতে যে রূপ পত্রাদি পাওয়ার কথা বলিয়াছেন আমি তাহার সাক্ষী দিতে পারি। আমারও এমন অনেক সময়ে ঘটিয়াছে যে প্রবাসস্থ বন্ধুকে পত্র লিখিব মনে করিতেছি। কিন্তু আলস্য বশতঃ এখন লিখি তখন লিখি মনে করিয়া লিখিতে পারিতেছি না। এই রূপে ১০।১৫ দিন, কখন বা ততোধিক বা তন্ন্যূন সময় যাইতে না যাইতেই সেই বন্ধুর পত্র পাইলাম। এইরূপ প্রায়ই ঘটে বটে, কিন্তু মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফির ইহা একটা বিশেষ প্রমাণ বলিয়া আমি স্বীকার করি না। যেহেতুক বন্ধুকে পত্র লেখা আবশ্যক এই ভাব উভয় বন্ধুরই মনের বিষয়। উভয়েরই মনে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং উভয়ই যে উভয়কে পত্র লিখিবার আবশ্যকতা স্বতন্ত্ররূপে অনুভব করিতেছেন না ইহা অসম্ভব নহে। আর এই কথা বলিয়া ইহার বিপরীত কথাও যে সম্ভব নহে তাহাও আমি বলিতেছি না। যাহা হউক ইহা হইতে দুই একটি অধিকতর বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করিতেছি।

বোধ হয় আপনারা কেহ কেহ জানেন যে আমার একজন অতি পূজনীয় গুরু আছেন

এবং আমি তাঁহার সেবা করিয়া থাকি। এমন অনেক সময়ে ঘটিয়াছে যে, আমি ভাবিতেছি, হয় তো গুরু আমাকে ডাকিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কাছে গেলাম। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমাকে ডাকিব মনে করিতেছি তা তুমি কি করে জানলে?" হয়তো আর এক সময়ে এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে গুরু আমাকে ডাকিতেছেন। ভারতীতে মেণ্ট্যাল টেলিগ্রাফির কথা পড়িবার ঠিক্ পূর্ব্বদিন আমি একজন চিকিৎসকের নিকট গিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে বসিয়া কথোপকথন করিবার মধ্যে মনে মনে ভাবিলাম যে, ইহাকে একবার আমার গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলে ইনি বুঝিতে পারেন যে যথার্থ ব্রহ্মবিৎ যোগী কি রূপ পুরুষ। আমার এইরূপ ভাবনায় ঠিক দশ মিনিট পরে সেই ভক্তাবধূত চিকিৎসক আমাকে বলিলেন যে "এক রোজ আপকা গুরুজীকা সাথ হামারা দর্শন করা দিজীএ।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, আমি যে এখনি ঐ কথাই ভাবিতেছিলাম!

উপসংহার এই খানেই করিলাম। পরন্তু আমার মত এই যে টোয়েন সাহেবের লেখাটি কৌতুকময় নহে, ইহা গম্ভীর প্রসঙ্গ। আর যদি তিনি রহস্য করিবার জন্যই ইহা লিখিয়া থাকেন তবে আমার মতে তাঁহার এই রহস্যাত্মক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া এখনো অতি-দূরস্থ একটি সত্যের আগমন পথ দেখা দিয়াছে—কৌতুকে যৌতুক হইয়াছে, যেমন সময়ে সময়ে শাপে বর হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

কবিতা।

বৈতরণী পার।

বার বার বাঁধি ঘর ভেঙ্গে যায় বার বার,
শ্রান্ত অবসন্ন তনু বাঁধিতে পারিনা আর!
বৈতরণী মহাপারে অসীম সংসার-বেলা,
বসি তার এক কোণে গেহ রচি করি খেলা।
কত আশা ভালবাসা চুণ বালি কত দিয়ে,
যতনের গড়া ঘর, মৃত্যুঢেউ যায় নিয়ে!
হতাশ ব্যথিত প্রাণে মেলি অশ্রুময় আঁখি!
কাতরেতে একদিঠে নদী পানে চেয়ে থাকি!
প্রতি বারে নিয়ে গেছে কত চুণ কত বালি,
হৃদয় ভাণ্ডার খানি হইয়ে গিয়েছে খালি!

দেখি চেয়ে ধীরে ধীরে বৈতরণী মাঝে হায়,
হৃদয়ের বালিগুলি স্রোতে ভেসে চলে যায়!
জানি না কেমনে পুনঃ প্রাণে ফিরে আনি বল,
নূতন আশার ছলে মুছে ফেলি আঁখিজল।
হৃদি প্রাণ পণ করে বাঁধি ঘর পুনরায়,
আবার নিঠুর ঢেউ ভেঙ্গেচুরে নিয়ে যায়!
বার বার বাঁধি তবু বার বার ভাঙ্গে গেহ,
বাঁধিতে পারি না আর শ্রান্ত অবসন্ন দেহ!
এখন রয়েছি আশে হৃদিহীন দেহ-ভার,
কবে ঢেউ নিয়ে যাবে বৈতরণী পরপার।

একা।

নিভৃত বনের ছায়ে লতিকাটী দোলে,
ফুল এক ফুটেছিল তার শ্যাম কোলে।
শিয়রেতে গাহে তার পাখী গুণ গান,
কাণের কাছেতে অলি ধরে প্রেম তান।
প্রজাপতি এল নিতে কোমল পরশ,
পাইয়া সুবাস তার সমীর হরষ।
দুদণ্ডে ফুরাল হাসি ফুল গেল ঝরে,
তারা গেল অন্য ফুল খুঁজিবার তরে!
ধূলিমাঝে একা শুধু রহিল পড়িয়া,
শোভাহীন লতিকাটী মরমে মরিয়া!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

আয়ান।

চক্ষুষ্মান্—হে আয়ান!—তবু তুমি আঁধা;
জড়পিণ্ড প্রায় তুমি থাক চিরদিন!
দেখেও কি দেখনা'ক? হইয়া স্বাধীন,
বিলাস বিভ্রমে ভ্রমে কলঙ্কিনী রাধা!
বিপণি, অরণ্য, গোষ্ঠ, যমুনা-পুলিন
যথা তথা গতি তার, নাহি মানে বাধা;
নিতি নিতি নববেশ!—চাহনি রঙ্গিন্!
মোহিনী মায়ায় বুঝি বিশ্ব যাবে বাঁধা?
কদম্ব শিহরি উঠে; বাঁশরী ফুকারে;
গোপ গোপিনীর পদ পড়ে তালে তালে;
সারা ব্রজ পড়ে ধরা কুহকের জালে;
এ নাগরী নাগরালি, বুঝিতে কে পারে?
হে আয়ান! হে সাংখ্যের পুরুষ মহান্!
রাধিকা প্রকৃতি তোমা করেছে অজ্ঞান!

নাম।

ইন্দ্র ধনু স্বর্ণ বর্ণে করিয়া রঙ্গিন্,
যে বিচিত্র চিত্র আঁকে চারু চিত্রকর;
সৌখিন সৌন্দর্য্য-গৃহে থাকি দুই দিন,
পড়ে রে কালের ঝুল তাহারো উপর,
চেতন কি অচেতন, নাহি যায় চিন;
প্রাণমন্ত্রে আমন্ত্রিত হইত সত্বর
স্ফূর্ত্তিময়ী মূর্ত্তি! সেও হয় রে বিলীন;
থাকে পড়ি স্তূপাকার ধবল মর্ম্মর।
হা অদৃষ্ট তুই তবে কোন দুরাশায়?
চাহিস্ খোদিতে নাম কালের পুলিনে?
আখর কি লেখা যায় নলিন তুহিনে?
ক্ষিপ্ত ত্রস্ত পুলিন বিরাম কভু পায়?
তুলিয়া বাড়ব বহ্নি জ্বালিয়া অম্বরে,
আঁকিবি কি অমরাখ্যা অগ্নির অক্ষরে?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মালবিকা-অগ্নিমিত্র।

(৩)

প্রথমাঙ্কে মালবিকার প্রতি রাজার নবানুরাগ মহিষীর মনের উপর বড় আচম্বিতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই তখন আর আত্মগোপনের সময় ছিল না। প্রথম ধাক্কায় আঘাতটা বড় বেশী বোধ হইয়াছিল, সেই জন্য তখন মহিষীর নিভৃত অন্তস্তলের দুঃখ ও ঈর্ষা দর্শকের সম্মুখে সহসা প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ঈর্ষা শুধু মালবিকার প্রতি ঈর্ষা নহে,—সপত্নীজাতীয় স্ত্রীলোক মাত্রের প্রতি ঈর্ষা—তা সে মালবিকাই হউক আর ইরাবতীই হউক। কিন্তু রাজ্ঞীর এ ভাব স্বাভাবিক নহে, দৈবাৎ এক দিন তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন! চতুর্থ অঙ্কে রাজ্ঞী ধারিণী যে সৌম্যতর উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন, সেই মূর্ত্তিই তাঁহার স্বাভাবিক মূর্ত্তি। এ ধারিণী, রাজার প্রণয়-ভিখারিণী, সপত্নীদ্বেষী, দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণী নহেন, ইনি মহিষী, রাজ-সংসারের কর্ত্রী, সপত্নী ইরাবতীর প্রতি স্নেহশালিনী, সুগৃহিণী। তৃতীয়াঙ্কে আমরা শুনিয়াছি তিনি ভগ্নপাদ প্রযুক্ত শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন। ইরাবতী তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, তিনি সস্নেহে তাহাকে মিষ্ট সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইরাবতি, অনেকক্ষণ যে তোকে দেখি নাই।" ইরাবতী এই মাত্র প্রমোদ উদ্যান হইতে রাজা ও মালবিকার প্রেমালাপে বিশ্রী রকম রসভঙ্গ করিয়া আসিতেছে। দুঃখে অভিমানে এখনো তাহার হৃদয় পূর্ণ। আর তাহার মনে হইল মালবিকা যখন অশোকদোহদ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তখন অবশ্য রাণীই তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব রাজাতে ও মালবিকাতে যে মিলন হইয়াছে তাহার জন্য রাণীই কতকটা দোষী। এই মনে করিয়া রাণীর উপরও তাহার অভিমান হইল, সে অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে বলিল, "আমাকে এমন মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেছেন কেন, এ হয় বিদ্রূপ কিম্বা মৌখিক ভদ্রতা মাত্র। আমি আপনার কে, মালবিকাই ত আপনার স্নেহের পাত্রী।" রাণী ইরাবতীর কথায় আশ্চর্য্য হইয়া জানিতে চাহিলেন কি ঘটিয়াছে। ইরাবতী তখন তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সব খুলিয়া বলিল। তাহার ফল এই হইল যে মালবিকা ও বকুলবালিকা কারারুদ্ধ হইল। চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভে রাজা বিদূষকের নিকট এই বিবরণ শুনিলেন। কারারক্ষিকার প্রতি আদেশ আছে রাণীর অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দর্শন ব্যতীত তাহাদের কারামুক্ত করিবে না। বিদূষক রাজার কামতন্ত্র সচিব। প্রণয় পথের কণ্টক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যে সব ফন্দী রাজার মাথায় আসে না, তাহা বিদূষকের মাথায় আসে; যে সকল চাতুরী রাজার অবলম্বন করা শোভা পায় না, বিদূষক রাজার হিতার্থে তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপকার করে। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক নামক কবির সৃষ্ট এই জীবটি আর কিছুই নহে, সে রাজারই হৃদয়ের

একাংশের বহিরাবির্ভাব, সে রাজার মূর্ত্তিমান হীনপ্রবৃত্তি। প্রণয়ব্যাপার সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সকল নীচতায় রাজা খাট হইবেন, বিদূষকের দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করাইয়া কবি রাজার মান রাখেন। বিদূষক রাজার সখানামে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু এই কি সখার আদর্শ? উদারপরায়ণ, নীচমনা ভাঁড়ের সহিত সখ্যরস করিয়া রাজার বন্ধুতাবাসনা কি সত্যই পরিতৃপ্ত হয়? তাহা হইতেই পারে না। কোন গম্ভীর রাজপ্রকৃতি এরূপ তরল, ইতরপ্রকৃতির সহিত কখনই যথার্থ সখ্যতা অনুভব করিতে পারে না। বিদূষকের "সখা" এই সংজ্ঞাটি ভ্রমাত্মক হইয়াছে, তাহাকে রাজার সহায় বলিলেই কবি তাহার উপযুক্ত নামকরণ করিতেন। তাহার প্রতি রাজা স্নেহপরায়ণ ছিলেন বলিয়া প্রমাণ হইতেছে না যে তাহার সহিত সখ্যতা অনুভব করিতেন, গৃহপোষ্য বানরের প্রতিও মানুষ স্নেহপরবশ হয়, তাই বলিয়া উক্ত জাতীয় জীবের সহিত সখ্যরসে যে আমাদের হৃদয় উথলিয়া উঠে এমনটা ঠিক বলা যায় না। যখন যে নারী রাজার প্রণয়িনী পদে অভিষিক্ত, বিদূষক তখন তাহারই দাস। আপাততঃ রাজা, ধারিণী ও ইরাবতীকে বরখাস্ত করিয়াছেন, সুতরাং বিদূষকও তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহাদের প্রতি অসম্মানসূচক ভাষা প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সে এখন মালবিকা ও বকুলবালিকাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত একটা জবর রকম পরামর্শ আঁটিয়াছে—রাজার কাণে কাণে তাহা খুলিয়া বলিল। রাজা তাহা অনুমোদন করিয়া রাজ্ঞীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। মহিষী সেবাপরায়ণা সখিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরিব্রাজিকার নিকট উপকথা শুনিতেছেন। রাজা আসিতে কথা বন্ধ হইল, পরস্পরে পরস্পরকে অভিবাদন করিলেন। রাজার শিষ্টাচারের কখন ত্রুটি হয় না; মহিষী যখন তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন রাজা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে কেন এ উপচার যন্ত্রণার দ্বারা তোমার রুগ্নচরণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ব্যথিত করিবে?" রাণীর অভ্যর্থনায়ও অনেকটা আনন্দ ও সম্মান ভাব প্রকাশ পাইল। মালবিকাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়া মহিষী রাজার ক্রোধের পাত্রী হইয়াছেন, রাজাও বিদূষকের সাহায্যে মালবিকাকে উদ্ধার করিয়া মহিষীর অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিতে কৃতসংকল্প—পরস্পরে পরস্পরের প্রতিকূলাচরণে উদ্যত—কিন্তু তাঁহাদের ভাব দেখিয়া কে তাহা বলিবে? ধারিণী যেন dowager রাজ্ঞী, তাঁহাতে ও ইরাবতীতে শাশুড়ী ও পুত্রবধূ সম্পর্ক, ইরাবতী তাঁহাকে ভক্তি সম্মান করে, তিনি ইরাবতীকে স্নেহ করেন। রাজার অনাচারের কথা শুনিয়া সংসারের শান্তির জন্য, পুত্রবধূ সুখের জন্য, সুগৃহিণী সেই অনাচারের উপলক্ষ্যকে দূরে সরাইয়াছেন—নারী হৃদয়ের গভীর প্রেমে বাস্তবিকই অনেকটা মাতৃভাব থাকে—। রাজাও যেন নিজের কুকর্ম্মের জন্য লজ্জিত। তাই এ বিষয়ে উভয়েই এরূপ ব্যবহার করিতেছেন, যেন এমন ঘটনা কখন ঘটেই নাই, যেন পরস্পরের প্রতি রাগের কোন কারণ নাই,

যেন মনে মনে উভয়ে উভয়ের নিকট অপরাধী নহেন। রাজা রাণীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন। পরিজনবর্গ তাঁহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। দর্শকের চোখের সম্মুখে একটী শান্তিপূর্ণ গৃহদৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে এমন সময় বিদূষক সসম্ভ্রমে যজ্ঞোপবীতে আঙ্গুল বাঁধিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া পড়িয়া বলিল, "রক্ষা কর, রক্ষা কর সখা, সর্পাঘাতে বুঝি প্রাণ যায়।" সকলে স্তম্ভিত, বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন করিয়া ইহা ঘটিল। বিদূষক বলিল, রাণী সন্দর্শনে আসিতেছিল, তাই শুধু হাতে না আসিয়া,' গোটা কতক ফুল পাড়িতে অশোকস্তবকে যেমন হাত বাড়াইয়াছে অমনি একটা কালসর্প কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া হাতে দংশন করিয়াছে। বিষের জ্বালায় ব্রাহ্মণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিষবৈদ্যের নিকট প্রেরণ করা হইল। এখন রাণীর মনের অবস্থা কল্পনাই করিতে পার। তাঁহার জন্য ফুল পাড়িতে গিয়া, ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইলেও প্রকারান্তরে তিনিই যে ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ এই মনে করিয়া রাণী আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। প্রতিহারী বৈদ্যের নিকট হইতে সম্বাদ লইয়া আসিল যে উদকুম্ভবিধানের দ্বারা ব্রাহ্মণের দেহ কোনরূপে সর্পচিহ্নাঙ্কিত করা আবশ্যক। রাণীর হাতে সর্পমুদ্রিত অঙ্গুরীয় ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "আপাততঃ এই অঙ্গুরীয় লইয়া যাও আবার আমাকে ফিরাইয়া দিও!" প্রতিহারী যেন অঙ্গুরীয় ফিরাইয়া দিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে রাণীর আদেশের অবজ্ঞা হইবে, সে রাজার সহ্য হইবে না এই ভাবে তিনি একটু অতি ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "কার্য্যসিদ্ধি হইলে অবিলম্বে অঙ্গুরীয় ফিরাইয়া দিয়া যাইবে।" যেন অঙ্গুরীয় ফিরাইয়া দিতে বিলম্ব হওয়ার উপর রাজার সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে না। কিছুক্ষণ পরে খবর আসিল বিদূষক আরাম হইয়াছে, রাণী নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন; রাজা রাজকার্য্যের ওজর করিয়া মহিষীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাহিরে আসিয়াই প্রতিহারীকে বলিলেন, "প্রমোদ বনের গূঢ় পথ নির্দ্দেশ করিয়া চল!" মাঝপথে বিদূষক আসিয়া তাঁহাদের ধরিল, প্রতিহারী বিদায় হইল। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে সে সর্পদংশনের বৃত্তান্ত আগাগোড়াই অলীক। সেই ছলে রাণীর অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টী যোগাড় করিয়া মালবিকাকে মুক্ত করাই বিদূষকের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বিদূষক রাজাকে জানাইল তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, প্রমোদবনে সমুদ্রগৃহে মালবিকা তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। রাজা একেবারে সিধা মালবিকার সম্মুখে উপস্থিত না হইয়া কিছুক্ষণ আড়াল হইতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। গোটা চার পাঁচ প্রচ্ছন্নশ্রবণের (Eavosdropping) দৃশ্য না থাকিলে সংস্কৃত নাটকই হয় না। এই অবসরে আর দুটী একটী রেখাপাতে মালবিকাকে কবি বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সমুদ্রগৃহের দেয়ালে একখানি চিত্র টাঙ্গান রহিয়াছে। সে চিত্রের আশে পাশে সখীরা চিত্রিত রহিয়াছে, সম্মুখে ইরাবতী ও রাজা।

রাজা ইরাবতীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন—তাঁহার নয়নে প্রেমের নেশা জাগিতেছে। তুমি যাহার প্রণয়াভিলাষী আর এক জনের প্রতি তাহার অতীত অনুরাগ কল্পনা করিতেই তোমার ভাল লাগে না—তাহার উপর সে অনুরাগেরএরূপ উজ্জ্বল চিত্র ত মনকে ক্ষুব্ধ, চঞ্চল করিবেই। মালবিকার এ ছবি ভাল লাগিল না, সে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "রাজা ভারি রূঢ়াচারী, এত লোক থাকিতে সকলকে অবজ্ঞা করিয়া ইরাবতীরই প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন কেন? আমি আর কেন মিথ্যা রাজার জন্য কাঁদিয়া মরি।" মৃদু ঈর্ষায়, মৃদু সংশয়ে, মৃদু অভিমানে বালিকার হৃদয় পূর্ণ হইল। বেশীক্ষণ সে ভাব রহিল না। রাজা আসিতেই আনন্দে সব অভিমান ভাসিয়া গেল। বিদূষক ও বকুলবালিকা হরিণ তাড়াইবার ছল করিয়া সরিয়া গিয়া রাজা ও মালবিকাকে একলা রাখিয়া গেল। রাজা সুবিধা পাইয়া আর্য্যাচ্ছন্দে মালবিকার সহিত কোর্টশিপ্ চালাইবার উদ্যোগ করিলেন। বলিলেন, তিনি বৃক্ষ, মালবিকা লতা, অতএব তাঁহাতে মালবিকার লতাবৎ আচরণই প্রার্থনীয়। মালবিকা লজ্জায় আনন্দে জড়সড় হইয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, "মহিষীর ভয়ে নিজেকে সে সুখ দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।" রাজা বুক ফুলাইয়া বলিলেন, "অয়ি ন ভেতব্যম্, ন ভেতব্যম্—ভয় কি হাম্ হ্যায়।" মালবিকা তখন হাস্যসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল "হ্যাঁ মহিষীর সম্মুখে আমারি দশাপন্ন বীর পুরুষের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে।" রাজা বলিলেন "কি বিপদ! সে বুঝি ভয়! সেত দাক্ষিণ্য! সে যাক্ আপাততঃ আমার প্রতি অনুগ্রহ হউক।" কোর্টশিপ্টা বেশ জমিয়া আসিতেছে এমন সময় দুরদৃষ্টক্রমে রঙ্গস্থলে ইরাবতীর পুনরাবির্ভাব। দু-দুইবার ধরা পড়িলে সহজ মানুষ কাবু হইয়া নির্ব্বাক হইয়া পড়ে—কিন্তু রাজা কখন স্ত্রীলোকের নিকট অপ্রতিভা হয়েন না। রাজার মুখে কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের প্রতি মিথ্যা তোষামোদ বাক্য বাধে না—এ বিষয়ে রাজার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে তারিফ করিতে হয়। এবার কিন্তু ইরাবতীর তরফে আর কাঞ্চী তাড়না নহে, অসম্বদ্ধ ভর্ৎসনাবাক্য নহে; শুধু মর্ম্মাহতের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি। রাজা যখন বলিলেন, "প্রিয়ে কেন অকারণে অসন্তোষ, এরূপ অস্থানে কোপ তোমায় শোভা পায় না।" ইরাবতী বলিল, "ঠিক বলিয়াছ, অস্থানে কোপ আমাদের শোভা পায় না বটে। স্বামী অন্যাসক্ত হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ন্যায় হতভাগিনীরা আবার রাগ করিতেছেন, এরূপ ধৃষ্টতার অপেক্ষা হাস্যকর আর কি আছে।" রাজার আর বড় কথা যোগাইয়া উঠিতেছে না, ভাবিতেছেন এখনকোন্ ছলে ইহার হাত হইতে মানে মানে নিষ্কৃতি পাই। সুবিধাক্রমে এই সময় প্রতিহারী আসিয়া খবর দিল যে কুমারী বসুলক্ষ্মীকে পিঙ্গল বানরে তাড়া করায় অন্তঃপুরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত বালিকা মহিষীর কোলে বসিয়া কাঁপিতেছে কেহ তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছে না। ইরাবতী এই সম্বাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত কোপের

কারণ ভুলিয়া সাবেগে বলিল, "মহারাজ! শীঘ্র গিয়া তাহাকে আশ্বাসিত কর, যেন তার সন্ত্রাসজনিত বিকার না হয়।" বসুলক্ষ্মী মহিষীর কনিষ্ঠা ভগিনী, অন্তঃপুরের সকলেরই আদরের পাত্রী। রাজা ও ইরাবতী তাড়াতাড়ি মহিষীর নিকট গমন করিলেন। এমন উপযুক্ত মুহূর্ত্তে তাহাদের সাহায্যে আসিয়াছে বলিয়া বিদূষক সেই পিঙ্গল বানরকে সুহৃদ্ সম্বোধনে সাধুবাদ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সকলেই চলিয়া গেল, কেবল বকুলবালিকা ও মালবিকা পড়িয়া রহিল। মালবিকা ব্যাচারা ভয়ে সারা। মহিষী যদি শোনেন ত না'জানি আরো কি গুরুতর দণ্ড দিবেন। কিন্তু এবার বুঝি আর তার দণ্ড পাইতে হইবে না। নেপথ্যে একটা রব উঠিল "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! পঞ্চরাত্র যাইতে না যাইতে সেই অশোক বৃক্ষে মুকুল ধরিয়াছে।" মালবিকা ও বকুলবালিকা সহর্ষে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। চতুর্থ অঙ্ক শেষ হইল।

যে সকল ইউরোপীয় সমালোচকেরা কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সন্দেহ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের যে যে দোষ ধরিয়াছেন, তাহার তালিকায় গঠন-পারিপাট্যের অভাবের উল্লেখ নাই। কিন্তু সাধনায় পূজনীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মালবিকাগ্নিমিত্রের সমালোচনায় এই গঠন পারিপাট্যের অভাবের চার্জ আনিয়াছেন। এই ত্রুটিরই উপর তিনি কিছু বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মালবিকাগ্নিমিত্রের গঠন তেমন পরিপাটি নহে বটে। সেইজন্যই আমরা কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়াছি। আর একটু গঠন-পারিপাট্য হইলে মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বাস্তবিকই সন্দেহের উদয় হয় যে, বুঝি কালিদাস এ গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ মিলাইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সন্দেহ অনেকটা ঘুচে।" কিন্তু নাটকের গঠন-পারিপাট্য বলিতে কি বুঝায়? গঠন আর কিছুই নহে—যে মূল উপসংহারের উপর নাটকের ভিত্তি তাহারই ক্রমোবিকাশের নিমিত্ত নাটকের অঙ্গে বিবিধ নূতন ঘটনাবলীর সমাবেশনের নাম গঠন। যে ঘটনার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে এই ক্রমোবিকাশের কোন যোগ নাই রঙ্গমঞ্চে তাহার অবতারণা করিয়া নাটকের গতি অনর্থক ভারাক্রান্ত, অসরল করা দোষের কথা, তাহাতেই গঠন-পারিপাটোর অভাব ধরা পড়ে। মালবিকাগ্নিমিত্রে সে দোষ নাই। ইহা কবির কাঁচা হাতের লেখা বটে কিন্তু ইহার গঠন যথেষ্ট আঁট, সমস্ত নাটকের ভিতর একটীও অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য সমাবিষ্ট হয় নাই। ফরাসীস্ ভাষায় যাহাকে বলে Raison d'etre, এই নাটকের প্রত্যেক ঘটনা সুসম্বদ্ধ ভাবে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া আপনাদের সেই Raison d'etre অর্থাৎ স্বীয়অস্তিত্বের সাফাই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বকুলবালিকা যখন রাজ্ঞীর বার্ত্তা লইয়া গণদাসের নিকট যাইতেছিল পথে তাহার কৌমুদিকার সহিত দেখা হয়। কৌমুদিকা তখন একটী নূতন, উজ্জ্বল, সর্পমুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ের প্রতি

মুগ্ধভাবে চাহিয়া রহিয়াছে, সে অঙ্গুরীয়টী এই সবে মাত্র স্বর্ণকারের নিকট হইতে মহিষীর জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বকুলবালিকাও তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিল, "সখি, এই মণির কিরণে তোর হাত ফুলের মত শোভা পাইতেছে;" তাহার পর তাহাদের অন্য কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল। এই অঙ্গুরীয়ের কথা বৃথায় উত্থাপিত হয় নাই, এখানে কবি এই যে অঙ্গুরীয়ের প্রস্তাবনা করিয়া রাখিলেন, সেই অঙ্গুরীয়ই পরে নাটকের বিকাশের অনেক সহায়তা করিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে গণদাসের পরীক্ষা শেষ হইলে, হরদাসের পরীক্ষা গ্রহণ করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইত না, ভবভূতি হইলে হয় ত এই সুবিধায় মালবিকার সহিত হরদাসের শিষ্যার তুলনা করিয়া দৃশ্যটী অতিরিক্ত দীর্ঘ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু হরদাসের পরীক্ষার সহিত নাটকের মূল ঘটনার যখন কোন যোগ নাই তখন তাহা ছাঁটিয়া দেওয়াই যথার্থ ড্রামাটিক্ হইয়াছে। এইরূপ ছোট খাট দৃষ্টান্ত হইতেও বুঝা যায় যে গঠন-পারিপাট্যের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পঞ্চমাঙ্ক কবির নাট্যরসজ্ঞতার সবিশেষ পরিচায়ক হইয়াছে। এই অঙ্কটী খুব জমাট; বিবিধ ঘটনার দ্রুতানুক্রমে একটা খুব বৈচিত্র্য ও সজীবতা অনুভব করা যায়। চতুর্দ্দিক্ হইতে অনুকূল কারণরাশি জড় হইয়া একই কার্য্যাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। পঞ্চমাঙ্কের আরম্ভেই রাণী মনে মনে মালবিকাকে রাজার সহিত বিবাহসূত্রে বাঁধিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তৃতীয়াঙ্কে অশোকতাড়নার দৃশ্যেই আমরা তাহার কতকটা আভাষ পাইয়াছিলাম। রাণী বলিয়াছিলেন, মালবিকার পাদতাড়নায় বৃক্ষ কুসুমিত হইলে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। মালবিকা অভাগিনীর একটীমাত্র অভিলাষ বটে; কিন্তু সেটী যে নিতান্ত সামান্য নয় তাহা রাণী জানেন। সব জানিয়া শুনিয়াও যখন রাণী তাহাকে এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন তখন অবশ্য তাহাকে স্বামীদানে স্থিরসংকল্প হইয়াই বলিয়াছেন। রাজার উপর রাণীর প্রভাবের গূঢ় রহস্যই বোধ হয় এই—যখন দেখেন কোন বিশেষ বস্তুলাভের প্রতি রাজার মনটা এতদূর ব্যগ্র হইয়াছে যে আর তাহাকে রাশ মানান সহজ হইবে না, রাশ পূর্ব্ববৎ সমান কড়া রাখিলে রাজা হয় ত অবশেষে হতাশার তাড়নে ভদ্রতা, সম্মানভাব সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রকাশ্য-বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবেন তখন রাশ ঢিলা দিয়া প্রসন্নভাবে আপনা হইতে সেই দুর্লভ বস্তু রাজার হাতে ধরিয়া দিয়া রাণী আপনার উদারতার পরিচয় দেন, এবং রাজার উপর তাঁহার টলমলপ্রায় প্রভাবকে অটলতর করিয়া রাখেন। উদ্যানপালিকার মুখে পুষ্পোদ্গম বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাণী পরিব্রাজিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার যদি প্রসাধন গর্ব্ব কিছুমাত্র থাকে, তবে আজ মালবিকাকে বিবাহ সাজে সাজাইয়া তাহা সার্থক কর দেখি।" আর রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে রাজকার্য্য সমাপ্ত হইলে আজ রাণী তাঁহার সহিত অশোকবৃক্ষের কুসুমশোভা পরিদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন।

সকলে নির্দ্দিষ্টসময়ে অশোক তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা উপস্থিত রহিয়াছেন তবু রাণী মালবিকাকে আড়ালে রাখিতে ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন না, তাহার উপর মালবিকার বিবাহের সাজ। রাণীর সংকল্প বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না। কিন্তু যতক্ষণ রাণী সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু না বলেন, ততক্ষণ আর কাহারো ভাবে ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার যো নাই যে তাহারা ঘুণাক্ষরেও তাহা অনুমান করিয়াছে। এ বিষয়ে যদি অতিবোধ প্রকাশ কর, চাই কি রাণী এখনো বাঁকিয়া দাঁড়াইতে পারেন। বিদূষক একবার রাজাকে বলিল "বন্ধু বিশ্রব্ধচিত্তে এই যৌবনবতীর প্রতি চাহিয়া দেখ।"

রাণী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার প্রতি?"

বিদূ। এই অশোকতরুর কুসুমশ্রী।

রাজা মনে মনে বলিলেন, "আমি যেন চক্রবাক্, প্রিয়া আমার সহচরী, আর এই অদত্তমিলনানুমতি ধারিণী আমাদের রাত্রি।"

পঞ্চমাঙ্কের আরম্ভ হইতেই নাটকে পাক ধরিয়াছে। কিন্তু উপসংহার এখনও বিলম্বিত হইতেছে। মহিষী ইচ্ছা করিয়াই এই বিলম্ব করিতেছেন। সন্দেহ, ও বিলম্বের দ্বারা প্রেমিকদের পীড়ন করিয়া বোধ হয় এক প্রকার কৌতুকানুভব করিতেছেন—"বাধা না পাইলে সখি সুখেতে কি সুখ আছে?" এই ক্ষণিক আশঙ্কাপূর্ণ বিরহের পর মিলনের সুখ আরো নিবিড়তর হইয়া আসিবে। তাহা ছাড়া রাজার অনুরাগ ও মহিষীর অনুমতি তাঁহার সহিত মালবিকার বিবাহের যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না, মালবিকার কুলশীল কাহারো জানা নাই, বিবাহের পূর্ব্বে এবং নাটক শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহা জানা আবশ্যক। কবি এতক্ষণ সেই অবসর খুঁজিতেছেন; তাই উপসংহার এখনও বিলম্বিত হইতেছে। রাজা নিজেকে চক্রবাক, মালবিকাকে তাঁহার সহচরী এবং ধারিণীকে রাত্রির সহিত তুলনা করিবার অনতিবিলম্বে কঞ্চুকী অমাত্যের নিকট হইতে এক বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইল। রাজসৈন্য বিদর্ভাধিপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া কুমার মাধবসেনকে কারামুক্ত করিয়াছে। বিদর্ভরাজ অগ্নিমিত্রকে যে বহুসংখ্যক মণিমাণিক্য, হস্তী, অশ্ব, দাস দাসী প্রভৃতি উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুইটী সঙ্গীত ব্যবসায়িনী পরিচারিকা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের এতক্ষণ মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। সম্প্রতি তাহারা বিশ্রামান্তে রাজদর্শনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।" রাজা তাহাদের লইয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন। চেটীদ্বয় প্রবেশ করিয়া মালবিকাকে দেখিয়া প্রথমটা চমকিয়া উঠিল তাহার পর তাহাকে প্রণাম করিয়া, ভর্তৃদারিকা বলিয়া সম্বোধন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মালবিকাও তাহাদের চিনিতে পারিয়া তাহাদের সহিত কাঁদিতে লাগিল। এই ব্যাপারে সকলে বিস্মিত হইয়া চেটীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরাই বা কে? মালবিকাই বা কে?" তাহারা বলিল "মালবিকা কুমার মাধবসেনের ভগিনী, আমরা তাঁহার পিতৃভবনের পরিচারিকা।" তখন সব বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। পরিব্রাজিকা, পণ্ডিতা কৌশিকী

আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি অমাত্য সুমতির ভগিনী। কুমার মাধবসেন-বন্দী হইলে আর্য্য সুমতি যুদ্ধের গোলেমালে কৌশিকী ও মালবিকাকে লইয়া পলায়ন করিলেন; পথে বিদিশগামী যাত্রীবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া বনপ্রান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন এমন সময় একদল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাহাদের সহিত যুদ্ধে সুমতি নিহত হইলেন, মূর্চ্ছাপন্না কৌশিকীকে মৃতা স্থির করিয়া দস্যুরা শুধু মালবিকাকে লইয়া পলায়ন করিল। দস্যুরা বোধ হয় দুর্গপাল বীরসেনের নিকট মালবিকাকে বিক্রয় করিয়া থাকিবে, পরে তিনি ধারিণীর নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কৌশিকী সংজ্ঞালাভ করিয়া ভ্রাতার শরীর অগ্নিসাৎ করিয়া, পরিব্রাজিকা বেশ ধারণ করিলেন। সেই বেশে রাণীর অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়া মালবিকাকে দেখিতে পান।

রাণী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তুমি জানিয়া শুনিয়া মালবিকার পরিচয় এতদিন গোপন করিয়া ভারি অন্যায় করিয়াছ, রাজকন্যাকে আমরা এতদিন দাসীভাবে রাখিয়াছি। একি লজ্জার কথা দেখদিকিন্!" কৌশিকী বলিলেন, "আমি অকারণে ইহা করি নাই। মালবিকার পিতা জীবিত থাকিতে এক জন সিদ্ধপুরুষ তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন সম্বৎসর দাসীভাবে থাকিয়া সদৃশ ভর্ত্তৃগামিনী হইবে।" অদৃষ্টের লিখন ত এড়াইবার নহে, অতএব যদি কোথাও না কোথাও দাসীভাবে থাকিতে হয় ত আপনার পাদশুশ্রূষা করাই ভাল, এই বিবেচনা করিয়া আমি এতদিন মালবিকার কুলশীল গোপন রাখিয়াছিলাম।" আজ কালকার মেয়ে হইলে হয় ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অনার্য্য অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া ভবিতব্যতাকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়েও অন্ততঃ তৎক্ষণাৎ মালবিকার পরিচয় প্রকাশ করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আর এতবড় নাটক খানা হইত না। খবরের উপর খবর; আবার কঞ্চুকী আসিয়া রাজার হাতে একখানি পত্র প্রদান করিল। রাজার পিতা পুষ্পমিত্র লিখিয়াছেন—রাজ্ঞী ধারিণীর পুত্র বসুমিত্র যবনদিগকে পরাজয় করিয়া অশ্বমেধীয় অশ্ব উদ্ধার করিয়া আনিয়া এই নবীন বয়সে আশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। বীরপুত্রের বীরপণার সম্বাদে রাণীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। রাণী ইরাবতীর নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে মালবিকার পরিচয় জানাইয়া বলিলেন অশোকবৃক্ষ কুসুমিত হইলে তিনি যে মালবিকার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আছেন ইরাবতী অনুমতি করিলেই তিনি তাঁহার সেই অঙ্গীকার পালন করিতে পারেন। ইরাবতী বলিয়া পাঠাইল মহিষীর সত্যচ্যুত হওয়া প্রার্থনীয় নহে। রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ব্বে হইতে তিনি যাহা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন তাহার জন্য আবার ইরাবতীর অনুমতির অপেক্ষা কেন? ইরাবতীর এ উত্তর তীব্রতাময়, সে ভগ্নহৃদয় বালিকা কেমন করিয়া প্রসন্নমনে স্বামীর সহিত মালবিকার বিবাহে অনুমতি দিবে। কিন্তু রাণীর অত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই, তিনি ইরাবতীর অনুমতি পাইয়াছেন সুতরাং আর বিলম্ব না

করিয়া রাজাকে বলিলেন, "তোমার মুখে পুত্রের বীরত্বের শুভ সম্বাদ পাইয়াছি এই লও তোমার পারিতোষিক গ্রহণ কর" এই বলিয়া রাজার হাতে মালবিকাকে সমর্পণ করিলেন। মহিষীর ইঙ্গিতে তাঁহার পরিচারিকাবর্গ অগ্রসর হইয়া মালবিকাকে "রাণী" বলিয়া অভিবাদন করিল। সংস্কৃত নাটক কখন ট্র্যাজেডি হয় না। মিলনান্ত বলিয়াই যে তাহারা ট্র্যাজেডি নহে তাহা নয়। মিলনের বুকের ভিতর শোকের যে অন্তঃসলিল প্রবাহিত হইলে আমরা কোন নাটককে ট্র্যাজেডি বলিয়া থাকি সংস্কৃত মিলনান্ত নাটকে সেই শোকের অন্তঃপ্রবাহ নাই। বিষবৃক্ষ যদি কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুতে শেষ না হইয়া নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের মিলনে শেষ হইত তাহা হইলেও বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি হইত। এখন যেমন নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনসুখের উপর কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর অভিশাপ চিরবিরাজমান রহিয়াছে, তখন তেমনি কুন্দ ও নগেন্দ্রের মিলনের উপর ভগ্নহৃদয় সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ চিরজাগরূক থাকিয়া সে মিলনকে ট্র্যাজেডিতে পরিণত করিত। সূর্য্যমুখীও নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই আত্মত্যাগ তাঁহাকে যে কতদূর পীড়া দিয়াছিল তাহা নগেন্দ্র সেই সময়ে না জানুন, কমলের সহিত সূর্য্যমুখীর নিভৃত আলাপে ও সূর্য্যমুখীর গোপন রোদনে পাঠকের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। কিন্তু রাজার সহিত মালবিকার বিবাহোদ্যোগের দৃশ্যে মহিষী একবারও আপনার মনেও দুঃখপ্রকাশ করেন নাই। ইরাবতীই না হয় এতদিন রাজার হৃদয়েশ্বরী ছিল, কিন্তু রাণীও ত তাঁহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, রাজার প্রেমে নিজের স্বত্ব ছাড়িতে চাহিতেন না, তবু স্বহস্তে তাঁহাকে আর একজনের হাতে বিলাইয়া দিতে তাঁহার যে কিছুমাত্র কষ্ট হইল এমন বোধ হইল না। কেমন শান্ত প্রসন্ন আনন্দের সহিত তিনি রাজার সহিত মালবিকার বিবাহ দিলেন। মহিষীর মনে যদি কিছু কষ্ট থাকে তবে নিজের কাছেও ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন নাই—আশ্চর্য্য সংযম বলিতে হইবে! কিন্তু এ সংযম অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে তাঁহারও একদিন ইরাবতীরই মতন দিন গিয়াছে। এই আত্মলয়ের নীচের স্তরে অনেক দুঃখ অনেক নিরাশা ফসিল (Fossil) আকারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সে নিরাশা যাতনা এখন এমন প্রশান্ত হর্ষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে যে মহিষী নিজেই আর বোধ হয় তাহাকে সহজে চিনিতে পারেন না। তাহা ছাড়া পুত্রের বীরত্বের সম্বাদে মহিষীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন রাজাকে মালবিকা দান করা আরো সহজ হইয়া আসিল। নিজে একটা বড় সুখ পাইলে আশে পাশের সকলকে সুখী করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সুখে আর তখন হিংসা দৃষ্টি থাকে না। স্বামীর প্রেমে মহিষীর সুখের আশা বিরল হইলেও পুত্র স্নেহে তাঁহার এক প্রশস্ত সুখের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। কবি আমাদের তাহাই দেখাইয়া দিলেন, সেই জন্য আর মালবিকা-অগ্নিমিত্র ট্র্যাজেডি হইতে পারিল না, ইহার উপসংহারে সকলেই সুখী, সকলেরই হাসি মুখ।

কিন্তু সকলেরই কি হাসি মুখ? ইরাবতীকে আমরা যেন একবারে ভুলিয়া না যাই। রাণী মালবিকাকে রাজার হাতে সমর্পণ করিয়া দিবার পর ইরাবতীর নিকট হইতে একজন দূতী আসিল। দূতীমুখে ইরাবতী রাজাকে বলিয়া পাঠাইয়াছে "তখন আপনার সহিত রূঢ়াচরণ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। এখন আপনি মালবিকাকে লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন, কিন্তু আপনার প্রসাদ হইতে আমাকে একেবারে বঞ্চিত করিবেন না।" শুষ্ক ক্রোধ, তীব্রতা, গর্ব্ব আর কতক্ষণ থাকিবে? যখন দেখিল স্বামী নিতান্তই আর একজনের হইয়া যাইতেছে, যখন আর ক্রোধ নিষ্ফল, তীব্রতা শুধু ব্যবধান বাড়াইবে মাত্র, তখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মনে হইল স্বামীর সহিত তাহার আর একেবারেই কোন সম্পর্ক থাকিবে না। স্বামীর জীবন হইতে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে! ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ বর্ষ, সুদীর্ঘ জীবন প্রসারিত রহিয়াছে, সেই সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া স্বামীর ঔদাসীন্য সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে! অত সহিবে না—ইহার অপেক্ষা দিনান্তে একমুঠা অনুগ্রহও ভাল। ক্ষুধিতা রমণীর গর্ব্ব টুটিল। হৃদয়ের ক্ষুধা বড় ভয়ানক ক্ষুধা, প্রেম যদি নাও মিলে ত অনুগ্রহ দিয়াই তাহার জ্বালা কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে হইবে—না হইলে নাচার। নিজে আড়ালে থাকিয়া দূতীমুখে ইরাবতীর এই অনুগ্রহভিক্ষা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী, মালবিকাগ্নিমিত্রের করুণারস এই খানে আসিয়া ঘনীভূত হইয়াছে। রাজার হইয়া মহিষী ইরাবতীকে আশ্বাস বাক্য প্রেরণ করিলেন। তাহার পর রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র, তোমার আর কি উপকার করিব বল।" রাজা বলিলেন, "আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিও, ইহার বেশী আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।"

"প্রেমের কাহিনী গান হয়ে গেল অবসান,
এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল।

শ্রীসরলা দেবী।

বুদ্ধি-বিকাশ।

"The face of a patient tells a long story, and it will be well for the student to closely observe its features, expression, color and temperature. The experienced physician reads out of it not only the degree of severity of an attack, but often also its whole general nature. But that must be learned by practice. There are shades so fine that they could not be well described, but which nevertheless stamp upon the whole a peculiar character." "Considering the eye as a whole, we find its general appearance frequently altered by disease. Without dwelling upon the language which the mental emotions—fright, terror, joy or sorrow, love or hatred—speak through them, we observe an unnatural lustre of the eyes in fevers; and a brilliance in consumptives."—Special Pathology and Therapeutic Hints by C. G Raue, M. D.

দৈহিক নির্ব্বাচনকার্য্য দেখিয়া আমরা অনেক সময় পরমনের উচ্চবৃত্তি অনুমান করিয়া থাকি বটে; কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য অন্যরূপেও বুঝা যায়। ফলে সাদৃশ্যসিদ্ধান্তে পরমন নিরূপিত হইয়া থাকে। আবার সময়ে সময়ে মন ধরিয়া লইয়া আমরা পরের দৈহিক কার্য্যের নির্ব্বাচন ভাব মীমাংসা করি। অগ্রে পরমন স্বীকার না করিলে অনেক সময় তাহার দৈহিক নির্ব্বাচন কার্য্য বুঝা যায় না। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে দৈহিক নির্ব্বাচন কার্য্যে পরমন জানিবার সঙ্গতি কই? যদি অগ্রে পরমনই স্বীকার করিয়া, দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাচনজ্ঞাপক কি না বুঝিতে হইল, তবে আর দৈহিক নির্ব্বাচনকার্য্য দ্বারা পরমন অনুমান করিবার সম্ভাবনা কোথায়? এস্থলে ডাক্তার কার্পেণ্টারের দেহতত্ত্ব হইতে কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

কোন লোকের মেরুদণ্ড কোন বিশেষরূপে আহত হওয়ায় তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিবার শক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল। পদদ্বয় জড়প্রায় নিশ্চেষ্ট। ইচ্ছায় কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচালিত হইত না। যখন তাহার কোন পদে নখ অথবা সূচি দ্বারায় সামান্যরূপে আঘাত করা যাইত, তখনি অমনি সেই পদ সবলে উৎক্ষিপ্ত হইত। এমন কি, দেখিলে সংজ্ঞা নাই বলিয়া বোধ হইত না। যেন তাহাতে তাহার তখন বিলক্ষণ যাতনা অনুভূত হইত। সহজ লোকের পদে ঐরূপ আঘাত করিলে যে যে লক্ষণ দেখা যায়, উহারও ঠিক সেইরূপই দেখা যাইত। অঙ্গুলিগুলি সমস্ত উপরদিকে বাঁকিয়া পড়িত। সমস্ত পদপল্লবও পশ্চাৎ প্রান্তে নির্ভর করিয়া উচ্চমুখ হইত, এবং জানুদেশ মুদ্রিত হইয়া শয্যা হইতে উচ্চ হইয়া উঠিত। এইরূপ ভাবে কয়েক সেকেণ্ড থাকিয়া পুনশ্চ সহসা শিথিল হইয়া পড়িত। যে পদে যখন আঘাত করা যাইত, তখন সেই পদটীই সেইরূপ হইত এবং অপরটী নিশ্চেষ্টই থাকিত। আবার একবারে পদদ্বয়ে ঐরূপ করিলে, দুইটীই একসঙ্গে অমনি হইতে থাকিত। মনে কর, উক্ত ব্যক্তির পক্ষাঘাতের কথা না জানিলে, উক্ত কার্য্যে কে না ভাবিতেন যে সে যাতনাবশতঃ পদ ইচ্ছাপূর্ব্বক সরাইয়া লইতেছে? উক্ত কার্য্যে নির্ব্বাচন ভাব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং কে উক্ত কার্য্যের অন্তস্তলে মানসিক পরিবর্ত্তন অস্বীকার করিবেন? তবে বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে উক্ত দৈহিক কার্য্যকে নির্ব্বাচন-জ্ঞাপক না বলি কেন? কি কারণে উক্ত অঙ্গশ্চালনকে প্রতিষেক কার্য্য বলিয়া নিরূপণ করি? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শুদ্ধ আমরা অগ্রে জানিয়াছি যে উক্ত ব্যক্তির উক্ত স্থান আহত হওয়ায় স্নায়ু বিশেষের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সুতরাং পদদ্বয়ে ইচ্ছাশক্তির আদৌ অধিকার নাই। রোগীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে তাহার পদদ্বয়ে সংজ্ঞাও নাই। কই, এস্থলে তো

আমরা নির্ব্বাচনকার্য্য দেখিয়া মানসিক প্রক্রিয়া বুঝিলাম না। বরং পরমনের অবস্থা জ্ঞানে তাহার দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাচনজ্ঞাপক, কি না, তাহারই সিদ্ধান্ত করিলাম। উক্ত ব্যক্তির পদদ্বয়ে সংজ্ঞা বা সায়ুত্তি থাকিলে উক্ত কার্য্যকে মানসিক ক্রিয়া-প্রতিসারিত দৈহিক অনুষ্ঠান বা নির্ব্বাচনকার্য্য বলিতাম; তাহা নাই বলিয়াই প্রতিষেক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত করিলাম। তাই বলি আমরা অনেক সময় পরমন ধরিয়া তাহার দৈহিক কার্য্যে নির্ব্বাচন ভাব অনুমান করিয়া থাকি। তবে আর দৈহিক নির্ব্বাচনকার্য্য দেখিয়া পরমন উপলব্ধি হয় কই?

অধিকন্তু উক্ত ব্যক্তির কখন কখন উক্ত প্রকার নখ বা সূচিকাঘাত অনুভূত হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন তাহার সেই আঘাত বা যাতনা বোধ হইত, তখন তাহার উক্তরূপ দৈহিক কার্য্য বিশেষ প্রবল হইত না। বরং অনুভূতি না হইলে উক্ত প্রকার দৈহিক কার্য্য অধিকতরই প্রবল হইত। এমন কি, পদতলে অতি সন্তর্পণে পালক স্পর্শ করিলে নখ বা সূচিকাঘাত অপেক্ষা পদদ্বয় অনেক অধিক সঞ্চালিত হইত। ডাক্তার কার্পেণ্টারের প্রসিদ্ধ দেহতত্ত্ব গ্রন্থে ইহার আরও অনেক বাহুল্য বিবরণ আছে(৪৮৫ পৃঃ)।

এক্ষণে বিশেষ দেখা যাইতেছে যে, উক্ত দ্বিবিধ অবস্থাতেই দৈহিক নির্ব্বাচন কার্য্য স্পষ্টই রহিয়াছে; অথচ একাবস্থায় শুদ্ধ চৈতন্য আছে; অপরে তাহাও নাই। কিন্তু ইচ্ছামূলক কার্য্য আদৌ উভয় অবস্থাতেই ছিল না। পদদ্বয়ে মানসিক কার্য্য-কারিতার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ছিল। ইচ্ছা থাকিলেও পদদ্বয়ে তাহার কার্য্য করিবার সামর্থ ছিল না। কখন কখন তাহার শুদ্ধ স্পর্শজ্ঞান হইত। কিন্তু অনুভূতি অভিমত অঙ্গ পরিচালনের শক্তি ছিল না। সুতরাং উক্ত ত্বাচ অনুভূতি কেবল তাহার প্রমুখাৎ শুনা কথা মাত্র—পদদ্বয়ের কার্য্য সন্দর্শনে নহে। ফলে সে সংজ্ঞাও সর্ব্বসময়ে থাকিত বা হইত না। অপিচ সংজ্ঞা থাকিলেও ইচ্ছানুরূপ অঙ্গশ্চালনের শক্তি ছিল না। সুতরাং ত্বাচজ্ঞান সত্ত্বেও—ইচ্ছাসত্ত্বেও—প্রশক্তি নাই; অর্থাৎ, পদদ্বয়ে ইচ্ছার গতিবা বা অধিকার নিতান্ত ছিল না। ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্ব্বাচনজ্ঞাপক কার্য্য ছিল অথচ তাহারা মনোজ্ঞাপক নহে। সে সকল দৈহিক কার্য্য প্রতিষেক কার্য্য মাত্র। এস্থলে ইচ্ছাশক্তির অবরোধ পূর্ব্বজ্ঞান, সুতরাং ইচ্ছানুরূপ কার্য্যশক্তি নাই বলিয়া নির্ব্বাচনকার্য্য নির্ব্বাচনকার্য্যই হইতেছে না। অথচ কখন কখন অনুভূতিও আছে। এস্থলে দৈহিক কার্য্য দেখিয়া না অনুভূতি—নাই ইচ্ছাবৃত্তি জানা যাইতেছে। ডাক্তার কার্পেণ্টারের গ্রন্থে আর কয়েকটী এই প্রকার পক্ষাঘাতের দৃষ্টান্ত আছে। তাহাদের সকলেরই শুদ্ধ প্রতিষেক কার্য্য মাত্র ছিল। ইচ্ছায় অঙ্গ সঞ্চালন করা দূরের কথা, সামান্য অনুভূতিও ছিল না। কোন রোগীকে, স্পর্শ বা আঘাত অনুভব করিতেছে, কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, সে পদপ্রতি চাহিয়া বলিত, "না মহাশয়, আমি তো কিছুই বোধ করিতেছি না, কিন্তু আমার পা করিতেছে।" তাহার পদ স্পর্শমাত্র আকুঞ্চিত হইতে দেখিয়া, সে ব্যক্তি এই কথাই বলিত। (৪৮৮ পৃঃ)।

ডাক্তার কার্পেণ্টার আমাদের মতপ্রতিপোষক না হইলেও, ইতর জন্তুদিগের দৈহিক নির্ব্বাচনকার্য্যকে প্রায়ই মনোজ্ঞাপক বলেন না। সুতরাং তাঁহাকে কতকটা ডাক্তার রোমেনিসের মতবিরোধী বলিতে হইবে। তাঁহার মতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতির দৈহিক নির্ব্বাচন কার্য্য প্রায়ই যান্ত্রিক (automatic)—মনোমূলক নহে। তিনি উহাদিগের দৈহিক কার্য্যকে কতকটা প্রতিষেক কার্য্যমধ্যে গণনা করেন। তাঁহার মতে মনুষ্য ও অপরাপর ইতর জন্তুর মেরুমজ্জা (Spinal cord) প্রতিষেক কার্য্যের মূল। উক্ত কার্য্যকলাপে ইচ্ছার কথা দূরে থাক, অনুভূতি বা চৈতন্য পর্য্যন্তও নাই। সুষুপ্তিতে বা বিকার অবস্থাতে (Coma) জীবদেহে যে সকল বাহ্যিক উত্তেজনার কার্য্যফল দেখা যায়, তাহার মূলে চৈতন্য আদৌ অনুমিত হয় না। কিন্তু তখনও প্রতিষেক কার্য্য দৃষ্ট হয়। ভেকের মস্তক বা মেরু মজ্জা ছেদ করিবার পরেও প্রতিষেক কার্য্য থাকে। তাহাতে উদ্দেশ্য বা নির্ব্বাচন লক্ষণও বিশেষ পাওয়া যায়; কিন্তু তথাপি তদ্দ্বারায় মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়াই উহাদের মূলে মানসিক প্রক্রিয়া স্বীকার্য্য নহে। সুতরাং নির্ব্বাচন ক্রিয়া সত্ত্বেও উহাদিগকে মানসিক প্রক্রিয়ার ফল বলা যায় না। এস্থলেও মনের কার্য্যকারিতা প্রথম অস্বীকার করায় নির্ব্বাচনজ্ঞাপক উদ্দেশ্যমূলক কার্য্যকেও প্রতিষেক কার্য্যমধ্যে গণনা করা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মনের অস্তিত্ব ধরিয়া আমরা অনেক সময় দৈহিক কার্য্যে নির্ব্বাচন বা উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকি। এস্থলে যদি মনের অস্তিত্ব প্রথমতঃ স্বীকার করা যাইত, তাহা হইলে উক্ত দৈহিক কার্য্য আর প্রতিষেক কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইত না।

"The abnormal reflex actions of the Spinal Cord of Man, though often powerful, have much less regularity and apparent *purposiveness*, than have the movements executed by the lower Vertebrata (as the frog) after decapitation or section of the Cord....." "We have already seen that the existence of even the most perfectly adapted combination of different muscular actions, all obviously bearing upon a definite object, cannot in itself justify our attributing this combination to design or Voluntary Choice on the part of the organism that executes it; whilst on the other hand, to remove these movements in any case from the category of automatic actions, would be to assign to the Spinal Cord a power of consciously selecting and directing them, such as we have every reason for believing to be limited to the higher parts of the Cerebro-Spinal centres." Dr. Carpenter's Physiology.

শুদ্ধ সরীসৃপ কেন, অনেক পক্ষীরও মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশ (Cerebrum) অপসৃত করিলে মাসাবধি কাল জীবিত থাকে। ডাক্তার কার্পেণ্টার বলেন (৫০৪ পৃঃ) যে উক্ত অবস্থায় তাহাদের প্রকৃত ইন্দ্রিয়বোধ আছে বলিয়া সপ্রমাণ করা যায় না; অথচ তখনও

তাহাদের এমন অনেক উচ্চদরের কার্য্য দেখা যায় যাহাদিগকে কোন মতে প্রতিষেক কার্য্যও বলা সঙ্গত নহে। যে প্রকার দৈহিক কার্য্য মানসিক প্রক্রিয়ার ফলমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, উক্ত কার্য্যগুলি তাহা হইতে কোনরূপেই পৃথক্ করা যায় না। এ প্রকার মস্তিষ্কশূন্য পক্ষী যে ভাবে বসিয়া থাকে তাহা দেখিলে তাহার চৈতন্য অস্বীকার করা অতীব কঠিন। চিত করিলে, উল্টাইয়া বসে; সরাইয়া দিলে, চলিয়া বেড়ায়; শূন্যে নিক্ষেপ করিলে, উড়িতে থাকে। ভেক হইলে ইতস্ততঃ লাফাইয়া বেড়ায়। মুখে স্পর্শ করিয়া ধরিলে পানাহারও করিয়া থাকে। একবারে ভয়ানক সতেজ আলোক তাহার চক্ষে লাগে না বটে; অথচ ঘরের আঁধার দিকে রাখিলে সে সর্ব্বদাই আলোকের দিকে সরিয়া আইসে। প্রতিবন্ধক সমস্ত অবাধে একে একে অতি সাবধানে নানাভাবে সুন্দররূপে এড়াইয়া যায়। ভয়ানক উচ্চ শব্দের তাহার অনুভূতি নাই সত্য; কিন্তু রাত্রে যখন চক্ষু মুদিয়া পক্ষের মধ্যে মুখ রাখিয়া নিদ্রা যায়, তখন সামান্য শব্দে বিশেষ সতর্ক ভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া চক্ষু মেলিয়া থাকে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনশ্চ যেন অচৈতন্যাবস্থায় পর্য্যবশিত হয়। চঞ্চু দ্বারা পক্ষবিন্যাস বা গাত্রকণ্ডূয়ন করাই তাহার প্রধান কার্য্য! লঞ্জেও কোন একটী কপোতের মস্তক হইতে মস্তিষ্কের উক্ত সমস্ত অংশ বিশেষ (Cerebram) বাহির করিয়াছিলেন। সেই কপোতের কতকটা আলোক অনুভূত হইত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সামান্য চৈতন্যও ছিল বলা যাইতে পারে। চক্ষে প্রবল আলোক পড়িলে সে চক্ষু মুদ্রিত করিত, এবং তাহাতে তাহার চক্ষের তারাও সঙ্কুচিত হইত। প্রথমে তাহাকে অন্ধকার গৃহে রাখা হইয়াছিল। তখন কোন আলোক লইয়া অল্পে অল্পে ঘুরাইলে সেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আলোকমুখে ঘুরিতে থাকিত।

অধিকন্তু গাঢ় নিদ্রায় কোন বাহ্যজ্ঞানই থাকে না; কিন্তু সে অবস্থাতেও একবারে নিতান্ত চৈতন্যের অভাবও বলা যায় না। চৈতন্য তখন তটস্থও বলিতে পারি না। তাহাকে ডাকিলে শুনিতে পায়, প্রবল আলোক চক্ষে পড়িলে কতকটা অনুভব হয় এবং দেহের স্বচ্ছন্দতার জন্য অনায়াসে পার্শ্বপরিবর্ত্তন প্রভৃতিও করিয়া থাকে। এ সকল কার্য্যকে আর প্রতিষেক কার্য্য বলিলে চলে না। অথচ তখন চৈতন্যের অবসাদও বটে। বাহ্যজ্ঞানও নাই বলিতে হইবে। আবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য মনেও থাকে না; অর্থাৎ, জাগিয়া উঠিলে সে কি কি রূপ করিয়াছে, বলিতে পারে না। আবার স্বপ্ন দেখিলে অনেক সময়, অন্য কিছু মনে থাক আর নাই থাক, ঐ স্বপ্নটী আদ্যন্ত মনে থাকে। এ সকল ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, নির্ব্বাচন কার্য্য দ্বারায় মনোজ্ঞান সকল সময় নিরূপিত হওয়া দূরের কথা, বরং মনোজ্ঞান হইতে অনেক সময় দৈহিক কার্য্যে নির্ব্বাচন বুঝা যায়।

অত্যন্ত তীব্র আলোকে চক্ষু আপনিই মুদিত হইয়া থাকে। ইহা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য নহে; প্রতিষেক কার্য্য মাত্র। অথচ ইহার বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে। ইহাতে নির্ব্বাচনকার্য্যও

(Intentional choice) বিশেষ প্রকাশ পায়। কিন্তু তথাপি বৈজ্ঞানিকদিগের মতে ইহা মনোজ্ঞাপক কার্য্য নহে। বস্তুতঃ সহসা চক্ষে তীব্র আলোক পড়িলে চক্ষু আমাদের আপনি অজানত মুদিয়া যায়। সুতরাং ইহা ইচ্ছা প্রভৃতির সাপেক্ষ কার্য্য নহে। নির্ব্বাচন-মূলক হইলেও, ইহাতে কোন মানসিক প্রক্রিয়া দেখা যাইতেছে না। ফলে উহাতে নির্ব্বাচন থাক আর নাই থাক—অনুভূতি আছে। যদি কেহ তীব্র আলোকে চক্ষু মুদিত করেন, বা কাহারও চক্ষু আপনি মুদিত হয়, তাহাতে তাঁহার আলোক অনুভূতি হয় নাই বলিয়া মনে আইসে না। তবে সে চক্ষু নিমীলনে ইচ্ছা না থাকিতে পারে এবং বস্তুতঃ না থাকারই সম্ভাবনা; সুতরাং তাহাতে নির্ব্বাচনও নাই; কিন্তু আলোক যে তাঁহার অনুভূত হইয়াছে—ইহার আর সন্দেহ কি? তবে কোন প্রকার চক্ষু রোগের বা অচৈতন্যা-বস্থার কথা স্বতন্ত্র।

সহসা ভয়ানক শব্দে লোক চম্‌কিয়া উঠে। তাহার সে দৈহিক কার্য্যে নির্ব্বাচন নাই; কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ অনুভূতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপিচ হাঁচি, কাশি, বমন, প্রভৃতি নির্ব্বাচনজ্ঞাপক হইয়াও ইচ্ছাধীন কার্য্য নহে; অথচ সে সকলে অনুভূতি আছে। ইচ্ছা করিয়া নাসারন্ধ্রে পালক দিয়া হাঁচিতে পারি—সত্য; কিন্তু পালক দিয়া ইচ্ছায় হাঁচি অবরোধ করা যায় না; অর্থাৎ, অনিচ্ছায়ও হাঁচিতে হয়। ফলে হাঁচিতেও নির্ব্বাচন ভাব স্পষ্টই রহিয়াছে। নাসারন্ধ্রে অন্য পদার্থ না থাকিতে দিবার উদ্দেশ্যই হাঁচির কারণ। কিন্তু হাঁচিতে মানসিক প্রক্রিয়া নাই। অথচ পালক স্পর্শ বিলক্ষণ অনুভূতির বিষয়। সুতরাং হাঁচিতে অনুভূতি রহিয়াছে, দৈহিক নির্ব্বাচনও স্পষ্ট প্রতীয়মান—অথচ উহা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য নহে; অর্থাৎ, হাঁচি মানসিক নির্ব্বাচন ক্রিয়ার বশবর্ত্তী দৈহিক ক্রিয়া নহে। বৈজ্ঞানিকেরা সেই জন্যই ইহাকে প্রতিষেক কার্য্য মধ্যে গণনা করিয়াছেন। উদ্গার, উজ্জৃম্ভন, গলাধঃকরণ, প্রভৃতি কার্য্য উদ্দেশ্য-মূলক হইলেও উক্ত শ্রেণীভুক্ত। কোন ঘৃণিত পদার্থ দর্শন, দুর্গন্ধ, কদর্য্য আস্বাদন, তরণীর আন্দোলন, প্রভৃতি নানা কারণে বমন হয়। ইচ্ছায় হয়ও না, নিবারণ করাও যায় না, অথচ উহাতে বিলক্ষণ অনুভূতিও আছে। গাত্রের স্থলবিশেষে অঙ্গুলি সংস্পর্শে হাসি আইসে। সে হাসিও ইহার আর একটী উদাহরণ স্থল।

"But another very curious illustration is afforded by the involuntary abridgment of the oxcito-motor actions of respiration, when the performance of these is attended with pain,—the dependence of this abridgment upon the direct stimulus of sensation, rather than upon voluntary restraint, being obvious from the fact that it often presents itself on one side only, a limitation which the Will cannot imitate." Dr. Carpenter's Physiology.

উন্মত্তের চৈতন্যসত্ত্বেও অনেক কার্য্যে নির্ব্বাচন দেখি না। মৃগী, মূর্চ্ছারোগ প্রভৃতিতে

দৈহিক কার্য্যে নির্ব্বাচন নাই। অথচ অনেকে উহাতে চৈতন্য স্বীকার করেন। তবে স্মৃতি প্রভৃতির কার্য্য বিলুপ্ত হয়, বলিয়া থাকেন। অনেক মনোজ্ঞাপক কার্য্যে নির্ব্বাচন নাই; আবার অনেক নির্ব্বাচন কার্য্যও মনোব্যঞ্জক নহে।

রাম স্বপনে শ্যামকে ডাকিলেন। সুষুপ্ত জানিয়া রাম বুঝিলেন যে শ্যাম তাঁহাকে ডাকেন নাই। এস্থলে নির্ব্বাচন কার্য্যেই নির্ব্বাচন নাই। মদোন্মত্ত লোকের চৈতন্য নাই বলিয়াই তাহার কার্য্য ধর্ত্তব্য নহে। তাহার দৈহিক কার্য্যে নির্ব্বাচন থাকিলেও, চৈতন্য নাই বলিয়া আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বাচন মধ্যে গণ্য করি না।

এদিকে সকল প্রতিষেক কার্য্যই (Reflex actions) প্রায় নির্ব্বাচন পরিজ্ঞাপক; কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের অন্তস্তলে মন বা চৈতন্য স্বীকার করেন না। ডাক্তার রোমেনিস স্বয়ংও একথা স্বীকার করেন। "Physiology, as we shall see in the next chapter, is very firm in denying that all apparent choice is due to mind. The host of reflex actions is arrayed against the proposition, and in view of such non-mental, though apparently intentional adjustments, we find the necessity for some test of the choice-elements as real or fictitious."

তবে পরমন জানিবার উপায় কি? সদৃশ দেহ বা দৈহিক লক্ষণ। আমাদের নিজের সদৃশ দেহ বা দৈহিক লক্ষণে পরমন জানা যায়। দেহের ভাবভঙ্গি প্রভৃতিও পরমন জ্ঞাপক বটে। কিন্তু তাহা একমাত্র উপায় নহে। মনের সকল অবস্থারই দৈহিক লক্ষণ আছে। মানসিক পরিবর্ত্তন দেহ দ্বারায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। মনে কর ভাষা; যাহাদের ভাষা আছে, তাহাদের মনের বিশ্লেষ শক্তিও আছে। সুতরাং ইহাতে আর আমার নির্ব্বাচন ধরিয়া মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই। এখন শুদ্ধ ভাষা দেখিয়া আমি মনের উচ্চবৃত্তি ধরিয়া লইব।

আমরা পরমন সদৃশ লক্ষণে অনুমান করিয়া থাকি। ইহাতে বাস্তবিক সাদৃশ্য (Generalisation) অপেক্ষা সাম্বন্ধিক সাদৃশ্য (Analogy) প্রবল। আমার জ্ঞান যত প্রশস্ত হইতে থাকে, আমি সেই সাদৃশ্য ততই বিশদ ভাবে বুঝিতে পারি। সুতরাং আমার জ্ঞান সহকারে সে সাদৃশ্যতত্ত্বও ক্রমশঃ সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। বালক ভূমে পড়িলে যে আঘাত পায়, ভূমে পদাঘাত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে। ভূমির তাহার ন্যায় কতক আকার প্রকার আছে; সুতরাং চৈতন্যও আছে। অসভ্যেরাও বালকের মত নদী, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতিকে সচেতন পদার্থ মনে করে; অর্থাৎ, তাহাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ঐ সকলকে তাহাদের আপনার সদৃশ জীব বলিয়া অনুমিত হয়। উহাদের গতিবিধিতে নিজ নিজ গতিবিধির সৌসাদৃশ্য মনে আইসে; সুতরাং উহাদের চৈতন্যের অনুমানও অপরিহার্য্য। ক্রমে জ্ঞান সহকারে সদৃশ ভাব যত সুন্দররূপে বুঝিতে পারে, ততই পূর্ব্ব চিন্তার চৈতন্য অপসারিত হইতে থাকে। নদী ছুটিতেছে; কেননা, তাহার জীবন আছে, চৈতন্য আছে, ইচ্ছা আছে; ক্রমে যখন সেই গতির নিজ গতির সহিত বিভিন্নতা

বুঝিতে পারিল; তখন মন হইতে পূর্ব্ব সদৃশ ভাবও অপসৃত হইল। তখন বুঝিল যে নদী বা বায়ুর তাহার ন্যায় আকার নাই—গতি নাই—বেগ নাই প্রকৃতি নাই। সুতরাং পূর্ব্ব সাদৃশ্য সিদ্ধান্ত মনে শিথিল হইল। এক্ষণে নদী, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি তাহার নিজের ন্যায় চৈতন্যবান জীবও নহে। তাই তাহাদের কার্য্যে চৈতন্য স্বীকার্য্য নহে।

ডাক্তার রোমেনিসের মতে চৈতন্যের কার্য্য নানামুখীন, অর্থাৎ, সমাবস্থায় সমরূপ নহে। ফলে যদি অবস্থাভেদে কার্য্য ভেদ না হয়, বা সমাবস্থায় বিভিন্ন কার্য্যই সম্ভবে, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? বিজ্ঞান তো অপরিহার্য্য নিয়মব্যবসায়ী। ভয়ে যদি সকলের দৈহিক কার্য্য একজাতীয় না হয়, তাহা হইলে আমার ভয়ে যে দৈহিক কার্য্য হইয়া থাকে, অপরের তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে দৈহিক কার্য্য দেখিয়া পরমন কি প্রকারে জানিতে পারি? মানসিক ও দৈহিক কার্য্য যদি অপরিহার্য্য নিয়মে গাঁথা না থাকে, তবে একের প্রত্যক্ষে অপরের অনুমান কিরূপে সম্ভবে? স্বভাবে অপরিহার্য্য নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আমার অনুমান অবশ্যম্ভাবী। নদী ও বায়ুর গতি মনোব্যঞ্জক নহে কেন? ডাক্তার রোমেনিস বলেন যে আমার দেহের সহিত উহাদের দেহের (উহাদের দেহই নহে) সাদৃশ্য সামান্য। তবে দৈহিক সাদৃশ্য কি উক্ত তত্ত্বের মূল ও ভিত্তি? আমরাও সেই কথা বলিতেছিলাম। সমাবস্থায় তাহাদের কার্য্যও এক জাতীয়—কোন বিশেষ বিভিন্নতা নাই। তাঁহার মতে মনোব্যঞ্জক না হইবার ইহা আর একটী কারণ। "Because the activities which they present are invariably of the same kind under the same circumstances." ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে রোমেনিসের মতে সমাবস্থায় নানামুখীন দৈহিক কার্য্যই মনোব্যঞ্জক। আমরা ততদূর বলি না। সামান্য জীবের চৈতন্যের লক্ষণও সামান্য, এবং সমাবস্থায় তাহার বিভিন্ন দৈহিক কার্য্যও ধরা যায় না। তবে যে আমরা আকার প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মন অনুভব করি, একথা সত্য। ইহাতে প্রতিপন্ন আরম্ভ হইতেছে যে সাদৃশ্যের মাত্রায় আমরা চৈতন্যের মাত্রাও নির্দ্ধারিত করি। এস্থলে সাদৃশ্য সিদ্ধান্তই প্রবল। অগ্রে সকলেরই চৈতন্য স্বীকৃত ছিল। ক্রমে সাদৃশ্য জ্ঞানের বৃদ্ধি সহকারে উহা সঙ্কোচিত হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে আমার সদৃশ জীবদেহে মন বা চৈতন্য অনুমিত হইতে লাগিল। সে জীবদেহে মস্তিষ্ক, স্নায়ু প্রভৃতি সকলি থাকা চাই। যে জীবের চক্ষু আছে—আমার সদৃশ চক্ষু—সে অন্যমনস্ক, নিদ্রিত, প্রভৃতি না থাকিলে, চক্ষুগোচর পদার্থকে অবশ্যই দেখিতে পায়। ক্রিমির আমার ন্যায় চক্ষু নাই,—ত্বক্ আছে, তবে তাহার অন্ততঃ স্পর্শজ্ঞান থাকাও সম্ভব। এপ্রকার অনুমান স্বতঃসিদ্ধ। প্রথম, পদার্থ মাত্রই সজীব ও সচেতন অনুমিত। বালক ও অসভ্য আজও তাহাই করিয়া থাকে। ক্রমে জ্ঞান সহকারে গতিবানের জীবন ও চৈতন্য অনুমিত হইতে লাগিল। পরে যাহার জন্ম, বৃদ্ধি, প্রভৃতি অবধারিত হইল; অর্থাৎ, জ্ঞান সহকারে যাহার আমার সহিত সাদৃশ্য অধিক সাব্যস্ত হইতে লাগিল, তাহারই মন স্বীকার্য্য রহিল। এক্ষণে মস্তিষ্ক

ও স্নায়ুমণ্ডলবিশিষ্ট জীবদেহে মন স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে। বৃক্ষলতাদিরও অনেকে আজকাল চৈতন্য স্বীকার করেন; কিন্তু তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং দৈহিক গঠন ও লক্ষণে সাদৃশ্যসিদ্ধান্ত দ্বারাই পরমন উপলব্ধি হইয়া থাকে। দেহের গঠন, অবয়ব, প্রকৃতি, গতি, প্রভৃতি সমুদায়ের সাদৃশ্যের উপর উক্ত অনুমান নির্ভর করে। ইহাদের যত অধিক সেই সাদৃশ্য পাওয়া যায় পরমনের প্রমাণ ততই প্রবল। "Each mind is known, by direct or immediate knowledge, only to itself. Other minds are known to us solely through the material organism.—"Prof. Bain.

দৈহিক চেষ্টা (Choice) পরমনে অনুমান ও প্রমাণ। একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যেহেতু বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রভৃতি নিরূপণ করিতে গেলে তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। ফলে শুদ্ধ অনুভূতি বা চৈতন্য জানিতে গেলে স্বতন্ত্র দৈহিক কার্য্যেও অনুমিত হইয়া থাকে। যদি নির্ব্বাচনকার্য্য ভিন্ন আমার নিজ মনের সহিত দেহের অন্য কোন প্রকার কার্য্য বা সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যখন আপন মনের নির্ব্বাচন প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য দেহে প্রতিফলিত হয়; তখন সেই প্রকার দৈহিক কার্য্য বা ভঙ্গি দেখিলে পরমনের যে তদ্বৎ অবস্থা অনুমান করিব, ইহার আর বিচিত্র কি? অধিকন্তু মনোভাবের প্রাচুর্য্যে এপ্রকার দৈহিক কার্য্য প্রকাশ পায়, যে তাহার কোন উদ্দেশ্যই বুঝা যায় না। চেষ্টা (Choice) বলা দূরের কথা, বরং সে সকল দৈহিক কার্য্য তদ্বিরুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। ত্রাসে যে প্রকার স্বর, ভঙ্গি, তালুর শুষ্কভাব, অন্তঃকরণের বেগ, শ্বাস, পেশীর কম্পন, মলস্থলী ও মূত্রাশয়ের অধীরতা, ইত্যাদি দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য বুঝা অসম্ভব। এমন কি, মনের সহিত দেহের এরূপ কার্য্য দেখা যায়, যে অনন্ত পরিণতিক্রমের সাহায্যেও তাহার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহারা যে কখন কোন কালে জীবপ্রবাহের কোন তরঙ্গে আবশ্যক ছিল, এমন বোধ হয় না; অথচ বিলক্ষণ মনোভাব প্রকাশকও বটে; সুতরাং তাহাদিগকে কোনমতে নির্ব্বাচনকার্য্য বলা যাইতে পারে না। রাগত হইয়া লোকে যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে কতক অভ্যাস, কতক স্নায়বীয় শক্তির আতিশয্য অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পরিচালিত হইতেই, দেখা যায়। আবার রাগ, ভয়, দুঃখ, প্রভৃতি অনেকগুলি দৈহিক কার্য্যের উদ্দেশ্য নাই। ভ্রূকুটী, সদ্যপ্রসূত শিশুর ক্রন্দন ও অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতি বরং কালসহকারে ইচ্ছাধীন কার্য্য হইয়া থাকে, এবং প্রথমতঃ নির্ব্বাচনব্যঞ্জক না হইলেও অভ্যাসবশতঃ তাহাতেই পরিণত হয়। মুখে মক্ষিকা বসিলে শিশু প্রথমে হস্ত দ্বারায় তাহা তাড়াইতে পারে না, কিন্তু ক্রমে জ্ঞান-সহকারে, অভ্যাস সহকারে তাহাতে কৃতকার্য্য হয়। অর্থাৎ, সে প্রথমে ইচ্ছানুগত মুখের স্থানবিশেষে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। বরং অনুদ্দিষ্ট দৈহিক কার্য্য ক্রমে উদ্দিষ্ট কার্য্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ, নির্ব্বাচনকার্য্য ক্রমে অভ্যাসবশতঃ অনির্দ্দিষ্ট স্নায়বীয় শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। "That the chief expressive actions, exhibited by man and by the lower animals, are now innate or inherited — that is, have not been learnt by the individual,—is admitted by every one." Darwin.

ব্রীড়ায় ত্বকের রক্তপ্রণালী শিথিল এবং ক্রোধে অন্তঃকরণ বেগবান হইয়া থাকে। জন্মিবামাত্র শিশু যে প্রকার মুখ ভঙ্গি করিয়া ক্রন্দন করে, পরেও সেইরূপ করিয়া থাকে। সর্ব্ব জাতীয় মানুষের মনোভাব বিশেষ দৈহিক লক্ষণে প্রকাশ পায় তবে উহাদের মধ্যে কতকগুলি অভ্যাস সহকারে পূর্ণতা লাভ করে মাত্র। আবার ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পরিণতি কোন চক্রে স্বেচ্ছাধীন ছিল এবং তখন তাহাদের উদ্দেশ্যও বুঝা যাইত; এক্ষণে তাহার আর কিছুই নাই।

নির্ব্বাচনসূচক কার্য্য ভিন্ন আমার অন্যরূপ দৈহিক কার্য্য আছে এবং সে সকলও মনের সহিত সমবায় সম্বন্ধে গাঁথা; সুতরাং সে সকল দৈহিক লক্ষণে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মনোভাব অনুমান না হয় কেন? সাদৃশ্যসিদ্ধান্তেই পরমন উপলব্ধি হয়; তবে সে সাদৃশ্য শুদ্ধ দৈহিক নির্ব্বাচনকার্য্যে আবদ্ধ নহে। আমার যে প্রকার মনের কার্য্যে যে প্রকার দেহের কার্য্য অপরিহার্য্য, পরের সেই প্রকার দৈহিক কার্য্য দেখিয়া আমি তাহার তদ্বৎ মনোভাব অনুমান করি। মনে কর, সম্মুখে একটী জীব রহিয়াছে। তাহা সজীব না নির্জ্জীব, সচৈতন্য না অচৈতন্য, এ মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে তাহার সদৃশ যাহা কিছু দেখিয়াছি তৎসমুদয়ই একে একে মনে করি এবং কোন নিকট সাদৃশ্য না পাইলে, দূর সাদৃশ্যই মনে আনিয়া তুলনা করিতে থাকি। যদি লক্ষণ দেখিয়া সজীব প্রমাণ হয়, অমনি উদ্ভিদ্ কিনা জানিবার জন্য সাধারণতঃ গতি দেখি; বৈজ্ঞানিক পাকস্থলীর সাদৃশ্য দেখেন। পরে কোন জন্তু বিশেষ বলিয়া জানা গেলে পুনশ্চ সাদৃশ্য বলে তাহাকে সরীসৃপ, মৎস্য, বা চতুষ্পদ প্রভৃতির একটি কোন শ্রেণীতে স্থান দিয়া থাকি, এবং যদি দেখি যে তাহার চক্ষু নাই, তবে বুঝি যে সে দেখিতে পায় না; আর যদি চক্ষু থাকে এবং আমাকে দেখিতে না পায় বুঝি অন্যমনস্ক আছে, কেননা, আমিও ঐরূপ করিয়া থাকি। পুনশ্চ সাদৃশ্য সিদ্ধান্তে কতক আমার ন্যায় মন অনুমিত হইল। আমার মস্তিষ্কের সহিত দেহের যে প্রকার কার্য্যসম্বন্ধ তাহারও মনের সহিত দেহের সেইরূপ সম্বন্ধ আছে। মনে কর, ক্ষুদ্র মেরুদণ্ডবিশিষ্ট কীট। তাহার মেরুদণ্ডে আমার মেরুদণ্ডে যত সাদৃশ্য থাক আর নাই থাক, আমার মেরুদণ্ডে ও দেহে যেরূপ সম্বন্ধ তাহার মেরুদণ্ডে ও দেহেও সেইরূপ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ অনুমানেই আমার পরমনের জ্ঞান সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

"The face and features are most susceptible to movement under feeling; hence the face is by pre-eminence the index to the mind," "Every feeling in proportion to its strength, is accompanied with movements, and with changes in the organic functions." "For a knowledge of the feelings of others, we must trust to external signs, interpreted by our own consciousness. The signs are (1) Expression, (2) the Conduct, and (3) the indications of the course of the Thoughts." "Different feelings express themselves differently, and that the stronger the feeling the stronger the expression."

শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

সাধারণ গ্রন্থাগার কলিকাতা

হোমিওপ্যাথিক।

এই ঔষধালয় ইং ১৮৮৫সালে স্থাপিত হইয়াছে।

অনেক নূতন ঔষধাদি এবার আসিয়াছে। আমাদের ঔষধের ডাইলিউসন (ক্রম) সম্বন্ধে কোনরূপ প্রবঞ্চনা নাই, দেখিয়া লইবেন। একবার অল্প পরিমাণে খরিদ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখুন! সুলভ মূল্য বলিয়া কেহ যেন ঔষধের গুণ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ না করেন, যদি কাহারও সন্দেহ হয়, একবার আসিয়া নিজের চক্ষে দেখিয়া যাইবেন।

চলিত ডাইলিউসন ১ হইতে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৵০ আনা ড্রাম। চলিত আদত আরোক (মাদার টিংচার)।৵০ আনা ড্রাম।

ডাক্তার রুবিনির কর্পূরের আরোক ১ আউন্স শিশি ॥০ আনা।

অর্দ্ধ মূল্য! অর্দ্ধ মূল্য!!

ওলাউঠার চিকিৎসার বাক্স। ১২ শিশির বাক্স,স্বতন্ত্র ১ শিশি কর্পূরের আরোক ও পুস্তক মূল্য ৫৲ টাকা, অর্দ্ধ মূল্য ২॥০ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা। ডাকমাসুল ॥০ আনা।

গৃহচিকিৎসার বাক্স। ২৪ শিশির বাক্স, পুস্তক সহিত মূল্য ১০৲ টাকা। অর্দ্ধ মূল্য ৫৲ টাকা। প্যাকিং ।০ আনা। ডাকমাসুল ৸০ আনা।

পল্লীগ্রামে যে স্থানে ডাক্তার কবিরাজের অভাব, সেই গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের একটী করিয়া ঔষধপূর্ণ বাক্স ও একখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক থাকিলে, অনেক উপকার হইবে। চিকিৎসকের অভাব না হইলেও ইহার দ্বারা অনেক সুবিধা আছে; সামান্য পীড়ায় আর ডাক্তারের দর্শনী ও ঔষধের টাকা দিতে হইবে না। যখন এত সুবিধা, তখন প্রত্যেক গৃহস্থের একটী করিয়া এরূপ সুলভ মূল্যের বাক্স ক্রয় করিয়া রাখা উচিত।

ওলাউঠার চিকিৎসা।

বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক মতের উৎকৃষ্ট পুস্তক; ইহাতে ওলাউঠা রোগের ইতিহাস, নিদান, কারণ নির্ণয়, লক্ষণ ইত্যাদি ও তাহার হোমিওপ্যাথিক মতের বিস্তারিত চিকিৎসা সরল ভাষায় লেখা আছে; ইহাতে আরও অনেকগুলি দেশীয় ফলপ্রদ ঔষধেরও ব্যবস্থা লেখা আছে। মূল্য ।০ আনা। ডাকমাসুল ১০ আনা।

বি, ঘোষ এণ্ড কোং, হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,

৭৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ঠন্‌ঠনের মোড়, কলিকাতা।

শীতল প্রলেপ।

যাঁহারা মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন।

ইহা মুখ ফাটার একটি মহৌষধ। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ, শীতল, ও লাবণ্যযুক্ত হয়। যে সকল মহিলাগণ পাউডার ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রথমে এই প্রলেপে মুখ আর্দ্র করিয়া তাহার উপর পাউডার দিলে পাউডারের সর্ব্ব প্রকার অপকারিতা দূর হইবে। অথচ পাউডারের যে উপকার ইহাতে তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হইবেন। চর্ম্মের কোমলতা ও চাকচিক্য বহুপরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে। দাম এক সিসি ॥০ আনা। ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের নিয়ম লেখা আছে। প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

কাশিয়াবাগান বাগানবাটী, অপার সারক্যুলার রোড, কলিকাতা।